অনীশ দেব

বিশ্বের সেরা রহস্য রোমাঞ্চ



বিশ্বের সেরা রহস্য রোমাঞ্চ

বিশ্বের সেরা

রহস্য রোমাঞ্চ



সম্পাদনা ও অনুবাদ

অনীশ দেব

পত্রভারতী®

www.patrabharati.com

পত্রভারতী®

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

পত্রভারতী বুকস প্রাইভেট লিমিটেড, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল
অলংকরণ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

BISWER SERA RAHASYA ROMANCHO
Horror Fiction from Around the World *by* Anish Dev
Published by PATRA BHARATI BOOKS Pvt. Ltd.
1/1 Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700009

Sales Office : PATRA BHARATI®
at 3/1 College Row, Kolkata 700009
+91-33-22411175, 9433075550
info@patrabharati.com
patrabharatibooks 9830806799

ISBN 978-93-94913-26-4

যে কথা বলতেই হবে

কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে পড়লাম, বসিরহাট মহকুমার এক গ্রামে হঠাৎ ঘড়া ভর্তি ব্রিটিশ আমলের রুপোর মোহর পাওয়া গেছে। চতুর্দিকে একেবারে হইহই রইরই কাণ্ড! গল্পকাহিনীতে গুপ্তধন পাওয়া একেবারে সত্যি হয়ে গেছে।

এই বইটাও আমাদের কাছে অনেকটা সেইরকম। হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি হারিয়ে যাওয়া হীরে মানিক! আমাদের প্রাণের মানুষ অনীশ দেব যতদিন আমাদের মধ্যে সশরীরে ছিলেন, বহুবার তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে রহস্য রোমাঞ্চ থ্রিলার হরর সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ নিয়ে। তিনি যে শুধু তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্যদের দিয়ে লিখিয়েছেন কিশোর ভারতী বা অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতে তাই নয়, নিজেও একটু ফাঁক পেলেই অনুবাদ গল্প লিখেছেন। তাঁর লেখা সাম্প্রতিক সময়ের অনুবাদ লেখাগুলি বই হয়ে বেরিয়েও গেছে।

কিন্তু ষাট সত্তর দশকে, কচি বয়েসে অনীশ দেব যে অজস্র গল্প-উপন্যাস দু'হাতে অনুবাদ করেছেন, সেগুলো কোথায়? গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে না? জিগ্যেস করলেই অনীশদা হেসে বলেছেন, 'হবে ত্রিদিববাবু, ব্যস্ত হবেন না। আমি আসলে ওইসব লেখা নিয়ে বসতেই পারছি না। অনেক আগের লেখা তো, একটু ঘষামাজা করা দরকার। শিগগিরই ধরে ফেলব, ব্যস, তারপরেই বই।'

সেই 'রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি' আর হল না! আচমকা প্রস্থান করলেন অনীশ দেব। তাহলে তাঁর লেখাগুলো কী করে পাব? যতটুকু চিনতাম তাঁকে, তিনি তো লেখাপত্র গুছিয়ে রাখার মানুষ। কিন্তু তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে শর্মিলা বউদি ও কন্যা মোনালিসার সঙ্গে হাত লাগিয়েও দু-একটি বাদে আর কিছু অনুবাদ পাওয়া গেল না। অনীশদার অন্যতম ভক্ত শিষ্য সংগ্রাহক গবেষক সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় বলল, 'একটুও ভাববেন না। আমার সংগ্রহে সেই সময়ের রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকা প্রায় সবই আছে। আমি কাজ শুরু করেছি। আশা করছি, কয়েক মাসের মধ্যে সব একাট্টা করে ফেলতে পারব। নীলাভর কাছেও কয়েকটা লেখা আছে। সব রেডি করে আপনাকে দিচ্ছি।'

অলক্ষ্যে নিয়তি মুচকি হাসল।

যে রবিবার সুমন্ত আমায় ফোন করে বলল, 'দাদা, কাজ নাইন্টি পার্সেন্ট শেষ। আমি বৃহস্পতিবার আপনাকে দিয়ে আসছি...', সেই বৃহস্পতিবারই বজ্রপাত। সাত সকালে ছোট ভাই অপূর্ব (চট্টোপাধ্যায়) ফোন করে জানাল, 'দাদা, সুমন্ত চলে গেছে।'

অতঃকিম? কয়েকদিন পরে অপূর্ব বেশ কয়েকবার পৌঁছে গেল সুমন্তর বাড়ি। নাঃ, কোথাও অনীশ দেবের লেখার চিহ্ন নেই। খুব মুষড়ে পড়লাম। অনীশদার মতো লেখকের অসাধারণ অনুবাদ গল্প উপন্যাসগুলোর অধিকাংশ কি চিরকালের মতো হারিয়েই যাবে? কয়েকটা অবশ্য আগেই পেয়েছি স্নেহের নীলাভ ভাওয়ালের কাছ থেকে, যে শৈশব থেকেই অনীশ দেবের পাগল ভক্ত।

এবার ভাগ্যদেবতা মৃদু হাসলেন।

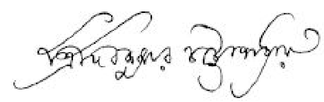
কিছুদিন পরে শর্মিলা বউদির হঠাৎ ফোন, 'ত্রিদিববাবু। আমাদের আগের বাড়িতে আপনার অনীশদার কয়েকটা অনেককালের পুরোনো ফাইল পেয়েছি। আমি হাত দিইনি। আপনারা কি একবার এসে দেখবেন?'

একে কী বলা যায়? হাতের মুঠোয় হঠাৎ গুপ্তধন পাওয়া নয়?

অনীশ দেবের অনুবাদে ১৮টি গল্প আর ৩টি বড় মাপের উপন্যাস নিয়ে এই বই 'বিশ্বের সেরা রহস্য রোমাঞ্চ', যার মধ্যে আছেন মপাসা থেকে ব্রাম স্টোকার, আগাথা ক্রিস্টি থেকে জেমস হেডলি চেজ, এইচ জি ওয়েলস থেকে রবার্ট ব্লচ।

আমাদের খুশির অন্ত নেই। না, শুধু পত্রভারতী পরিবার খুশি নয়, এ আনন্দ আমরা ভাগ করে নিতে চাই আপনাদের মতো অসংখ্য অনীশ ভক্তদের সঙ্গে। প্রসঙ্গত আপনাদের আরেকটা আবদারও করে রাখি, যদি এগুলি ছাড়াও অনীশ দেবের কোনও অনুবাদ বা নিজস্ব গল্প উপন্যাস আপনাদের নজরে আসে বা নিজস্ব সংগ্রহে থেকে থাকে, দয়া করে জানাবেন। প্রয়োজনে আমরা (পত্রভারতী ও অনীশ দেবের পরিবার) আর্থিক মূল্য দিতেও রাজি।

ভালো থাকবেন সকলে। কেমন লাগল, জানালে তৃপ্ত হব।



৩ জানুয়ারি ২০২৩
কলকাতা ৭০০০০৯

সুচিপত্র

গল্প



উপন্যাস

হাতের মুঠোয় পৃথিবী জেমস হেডলি চেজ

শুধু যাওয়া আসা জেমস হেডলি চেজ

আলোছায়ার খেলা আগাথা ক্রিস্টি

পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই

বয়স্ক সাহিত্য

আমি সিরিয়াল কিলার বলছি

গোয়েন্দা এসিজি সমগ্র

আগুন রঙের বুলেট

ভূতনাথের ডায়েরি সম্পূর্ণ

লাশতালাশ

অনীশের সেরা ১০১

অশরীরী ভয়ংকর

ভৌতিক অলৌকিক

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

বারোটি রহস্য উপন্যাস

সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র

কিশোর সাহিত্য

প্রতিঘাত সম্পূর্ণ

তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট সম্পূর্ণ

দেখা যায় না, শোনা যায়

ভয়পাতাল

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

বিজ্ঞান। জানা অজানা

পাই নিয়ে রূপকথা

বিজ্ঞানের হরেকরকম

কেমন করে কাজ করে যন্ত্র

রোমাঞ্চকর ধূমকেতু

সম্পাদিত ও পরিবেশিত বই

সেরা ১০১ ভৌতিক অলৌকিক

কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা

রক্ত ফোঁটা ফোঁটা

বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূতের গল্প

শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১, ২, ৩

রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প

গল্প

ড্রাকুলা'জ গেস্ট

ব্রাম স্টোকার



আমাদের যাত্রা যখন শুরু হল তখন মিউনিখের সূর্য উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, এবং আসন্ন গ্রীষ্মের খুশিতে বাস ভরপুর। রওনা হতে যাব, এমন সময় যে হোটেলে আমি আছি, তার পরিচালক হের ডেলব্রুক আমার গাড়ির কাছে নেমে এসে আমার 'শুভ যাত্রা' কামনা করলেন। তারপর জুড়ি গাড়ির দরজার হাতলে হাত রেখে কোচোয়ানকে বললেন, 'মনে থাকে যেন, রাত হবার আগেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। আকাশ ঝকঝকে হলেও উত্তুরে বাতাসে কেমন একটা কাঁপুনি দিচ্ছে, হয়তো হঠাৎ করে ঝড় উঠবে। অবশ্য আমি ভালো করেই জানি, দেরি তুমি করবে না।' বলে উনি একটু হেসে যোগ করলেন, 'কারণ তুমি তো জানো, আজকের রাতটা কিসের রাত।'

জার্মানি ভাষায় জোরালো স্বরে উত্তর দিল জোহান, 'হ্যাঁ, স্যার, জানি।' এবং টুপিতে হাত ঠেকিয়ে চকিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। শহরের বাইরে এসেই ওকে থামতে ইশারা করে আমি বললাম, 'বল দেখি, জোহান, আজ কিসের রাত?'

বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ও, 'ভাল্পার্গিসের রাত'। তারপর জার্মান সিলভারের তৈরি বিশাল এক শালগম সাইজের সেকেলে ঘড়িতে সময় দেখেই ও গাড়ি ছুটিয়ে দিল সজোরে, যেন নষ্ট হওয়া সময়টুকু পূরণ করতে চায়।

থেকেই থেকেই ঘোড়াগুলো মাথা ঝাঁকিয়ে সন্দেহজনক ভাবে বাতাসের গন্ধ শুঁকতে লাগল। আর আমি ভয়ে ভয়ে চারপাশে দেখতে লাগলাম। রাস্তাটা বেশ ভালোই নির্জন, কারণ আমরা তখন ছুটে চলেছি ঝোড়ো হাওয়ায় ধু-ধু হয়ে যাওয়া এক উঁচু মালভূমির ওপর দিয়ে। যেতে যেতে হঠাৎই একটা রাস্তা আমার নজরে পড়ল। দেখে মনে হল, সচরাচর সেটা ব্যবহার হয় না। একটা ছোট আঁকাবাঁকা উপত্যকার বুক চিরে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে গভীরে।

কিন্তু তার আকর্ষণ এতই তীব্র যে জোহানকে বিরক্ত করার ঝুঁকি নিয়েও ওকে ডেকে বললাম, ওই রাস্তা ধরে যেতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। ও হাজার রকম অজুহাত দেখাতে শুরু করল, এবং কথা বলতে বলতে ঘন ঘন ক্রুশ আঁকতে লাগল বুকের ওপর। এতে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল, সুতরাং ওকে নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। ও আত্মরক্ষার কায়দার উত্তর দিতে লাগল এবং প্রতিবাদ জানাতে বারবার ঘড়ি দেখতে শুরু করল।

অবশেষে আমি বললাম, 'শোন জোহান, আমি ওই রাস্তায় যেতে চাই। তোমার ইচ্ছে না থাকলে আমি তোমাকে আসতে জোর করব না, তবে শুধু এটুকু বল, তুমি কেন যেতে চাও না—?'

উত্তরে ও লাফিয়ে পড়ল নিজের ঘেরা জায়গা ছেড়ে, তারপর কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, যেন আমি না যাই। মনে হল, সব সময়েই ও যেন কিছু একটা আমাকে বলতে গিয়েও থমকে যাচ্ছে—সম্ভবত ভয় পেয়েই, কিন্তু প্রত্যেকবারই ও বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে শুধু বলছে, 'ভাল্পার্গিসের রাত!'

আমি ওর সঙ্গে তর্কে নামতে চাইলাম। কিন্তু কারো ভাষা না জানা থাকলে তার সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টাই বৃথা। হঠাৎই ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল, বার বার শুঁকতে লাগল বাতাসের গন্ধ। এতে ও ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎ লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে প্রায় ফুট বিশেক এগিয়ে নিয়ে গেল। ওকে অনুসরণ করে জানতে চাইলাম, কেন ও এমনটা করল? উত্তরে ও আবার বুকে ক্রুশ আঁকল এবং কাছেই একটা ক্রুশের দিকে ইশারা করে প্রথমে জার্মানি ভাষায় পরে ইংরেজিতে বলল, এখানে সে শুয়ে আছে, নিজেকে যে মেরে ফেলেছে।

কেউ আত্মহত্যা করলে তাকে চৌরাস্তার মোড়ে কবর দেবার প্রাচীন রীতিটার কথা আমার মনে পড়ল! ও, আত্মহত্যা! আশ্চর্য বটে!

দুজনে যখন কথা বলছি তখন হঠাৎই শুনতে পেলাম চিৎকার ও গর্জনের মাঝামাঝি এক অদ্ভুত শব্দ। শব্দটা আসছে বহু দূর থেকে, কিন্তু ঘোড়াগুলো ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ল, এবং ওদের শান্ত করতে জোহানের বেশ সময় লাগল। ফ্যাকাশে মুখে ও বলল, 'মনে হয় নেকড়ের গর্জন।'

অথচ এ সময়ে এদিকে কোন নেকড়ে থাকে না বলে শান্ত করার চেষ্টায় ঘোড়াগুলোকে যখন ও আদর করছে, আকাশে শুরু হল কালো মেঘের চঞ্চল আনাগোনা। সূর্যের আলো মুছে গেল, এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া যেন আমাদের গা ঘেঁষে ছুটে গেল পলকে। এই হাওয়ার ঝলক অনেকটা যেন এক বিপদ-সংকেত, কারণ সূর্য আবার দেখা দিল উজ্জ্বল হয়ে। হাতের আড়াল দিয়ে দিগন্তে চোখ রাখল জোহান। বলল, 'এই তুষার-ঝড়, তার আসতে আর দেরি নেই।' তারপর ও আবার তাকাল নিজের ঘড়ির দিকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধরে ও উঠে বসল গাড়ির ঘেরা জায়গায়।

মনে কেমন একটা জেদী ভাব জেগে ওঠায় গাড়িতে না উঠে আমি বললাম, 'এ রাস্তাটা যেখানে গেছে, সে জায়গাটার কথা কিছু বল দেখি—'

আবার ও বুকে ক্রুশ আঁকল এবং বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল। তারপর উত্তর দিল, 'জায়গাটা খুব খারাপ।'

'কোন জায়গাটা?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওই গ্রামটা।'

'ও, ওদিকে তাহলে একটা গ্রাম আছে?'

'না না। শ' শ' বছর ধরে কেউ ওখানে থাকে না।'

আমার কৌতূহল বেড়ে উঠল, 'কিন্তু তুমি যে বললে, ওখানে একটা গ্রাম আছে?'

'এক সময় ছিল।'

'তা এখন কোথায়?'

এ প্রশ্নে জোহান জার্মানি ও ইংরেজি মিশিয়ে এক লম্বা গল্প ফেঁদে বসল। ফলে ওর কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, কিন্তু এটুকু আঁচ করলাম যে, বহু শতাব্দী আগে ওখানে অনেক মানুষ মারা গেছে এবং সেখানেই তাদের কবর দেওয়া হয়েছে, তার পরেই মাটির নীচে শব্দ শোনা গেছে এবং কবর খুঁড়ে দেখা গেছে যে, মৃত স্ত্রী-পুরুষেরা সকলেই তরতাজা হয়ে বেঁচে আছে, ওদের ঠোঁট রক্তে লাল টুকটুকে। তখন

সেখানে জীবিত যে ক'জন ছিল তারা সকলেই নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যায় অন্যান্য জায়গায়। যেখানে জীবিত মানুষেরা বাস করে, আর মৃত মৃতই, অন্য-অন্য কিছু নয়।

শেষ কথা ক'টা বলতে ও স্পষ্টতই বেশ ভয় পেল। ওর মুখ হয়ে গেল সাদা, দরদর করে ঘামছে, কাঁপতে কাঁপতে চারপাশে দেখছে যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা এখুনি আবির্ভূত হবে ওর চোখে সামনে। অবশেষে হতাশ যন্ত্রণায় ও চিৎকার করে বলে উঠল, 'ভাল্পার্গিসের রাত।' এবং গাড়ির দিকে ইশারা করে আমাকে উঠতে বলল।

আমার নীল রক্ত এতে যেন জেগে উঠল। এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললাম, 'তুমি ভয় পেয়েছ জোহান—ভয় পেয়েছ! যাও, বাড়ি যাও, আমি একাই ফিরব। ভাল্পার্গিসের রাতের জন্য ইংরেজদের কোন মাথাব্যথা নেই।'

হতাশার ভঙ্গী করে জোহান ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল মিউনিখের দিকে। লাঠিতে ভর দিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম ওর যাওয়ার পথের দিকে। তারপর হাল্কা মনে সরু রাস্তাটা ধরে রওনা হলাম জোহানের না-পসন্দ্ উপত্যকার গভীরে। ওর আপত্তির বিন্দুমাত্রও কারণ আমার নজরে পড়ল না। মনে হয়, সময় অথবা দূরত্বের চিন্তা না করে আমি ঘণ্টাদুয়েক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি, এবং একটিও মানুষ কিম্বা বাড়ি আমার চোখে পড়েনি। জায়গাটা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, ওটা জনমানবহীন নির্জন।

বিশ্রামের আশায় একটু বসলাম, তাকিয়ে দেখলাম, চারপাশে। হঠাৎ খেয়াল হল, পথচলা শুরু করার সময় যে রকম ঠান্ডা ছিল, এখন সেটা তার চেয়ে অনেক বেশি—দীর্ঘশ্বাসের এক অদ্ভুত শব্দ যেন আমাকে ঘিরে রয়েছে, সঙ্গে কখনও-সখনও অনেক ওপর থেকে ভেসে আসছে এক চাপা গর্জন। ওপরে তাকিয়ে নজরে পড়ল আকাশে বিশাল ঘন মেঘের দল অস্থির গতিতে ভেসে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। বাতাসে আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত। আমার কেমন যেন শীত করতে লাগল।

ভাবলাম, এতক্ষণ হেঁটে আসার পরিশ্রমের পর এখন চুপচাপ বসে রয়েছি, তাই হয়তো শীত করছে, সুতরাং আবার পথচলা শুরু করলাম। সময়ের দিকে কোন খেয়াল না রেখেই আমি পথ চলেছি। ফলে যখন ঘন হয়ে আসা গোধূলির আলো চারিদিকে জাঁকিয়ে বসল, তখনই আমার দুশ্চিন্তা শুরু হল, কী করে পথ চিনে বাড়ি ফিরে যাব। দিনের উজ্জ্বল আলো এখন মিলিয়ে গেছে। বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা, অনেক ওপরে ভেসে যাওয়া মেঘের মিছিল যেন দলে আরও ভারী হয়েছে। সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে বহু দূর থেকে কিছু একটা ছুটে আসার শব্দ আর সেটা ভেদ করে কিছুক্ষণ পরে পরেই ভেসে আসছে এক রহস্যময় চিৎকার—এটাকেই জোহান নেকড়ের চিৎকার বলেছিল।

তাকিয়ে আছি, হঠাৎই বাতাসে এক ঠান্ডা কাঁপুনি খেলে গেল এবং শুরু হল তুষারপাত। পেরিয়ে আসা মাইলের পর মাইল গাছপালাহীন নির্জন পথের কথা আমার মনে পড়ল, সুতরাং, আশ্রয়ের খোঁজে দ্রুতপায়ে রওনা হলাম সামনের জঙ্গলের দিকে।

আকাশ ক্রমে আরও কালো হয়ে উঠল, বরফ পড়তে লাগল আরও ঘন হয়ে, আরও জোরে—অবশেষে এক সময় আমার সামনে ও চারপাশের মাটি হয়ে উঠল এক চকচকে সাদা গালিচা, যার শেষ প্রান্ত মিলিয়ে গেছে দূরের অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে। ক্রমে বাতাসের গতি বেড়ে উঠল, হয়ে উঠল ঝোড়ো হাওয়া, তখন আমি বাধ্য হয়ে বাতাস ঠেলে ছুটতে শুরু করলাম। ক্ষণে ক্ষণেই আকাশ চিরে দিচ্ছে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ, আর সেই আলোয় নজরে পড়ল আমার ঠিক সামনেই ঘন তুষারে ঢাকা ইউ ও সাইপ্রেস গাছের গায়ে মাখামাখি জটলা।

অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেই গাছপালার আশ্রয়ে। আর সেই অপেক্ষাকৃত নিঝুম জায়গায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম অনেক উঁচুতে ছুটে যাওয়া বাতাসের শন্ শন্ শব্দ। দেখতে দেখতে ঝোড়ো অন্ধকার মিশে গেল রাতের অন্ধকারে। ক্রমে মনে হল ঝড় শান্ত হয়ে আসছে! এখন মাঝে মাঝে শুধু শোনা যাচ্ছে

দুরন্ত হাওয়ার ঝটকা। সেই মুহূর্তে নেকড়ের অপার্থিব চিৎকার যেন হাজারো প্রতিধ্বনি তুলল আমার চারদিকে।

কখনও কখনও অলসভাবে ভেসে যাওয়া ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে বিক্ষিপ্ত চাঁদের আলো। সেই আলোয় দেখলাম সাইপ্রাস ও ইউ গাছের এক ঘন জটলার কিনারায় এসে আমি দাঁড়িয়েছি। তুষারপাত থেমে যাওয়ায় আমি আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং আরও খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম জায়গাটা। মনে হল যে সব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আমার চোখে পড়ছে তার মধ্যে একটা বাড়ি জীর্ণ হলেও এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং সেখানেই হয়তো আমি কিছুক্ষণের জন্যে আশ্রয় পেতে পারি।

ঝোপঝাড়ের কিনারা ঘুরে এগিয়ে যেতেই আবিষ্কার করলাম একটা নিচু দেওয়াল বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে, এবং এই দেওয়াল অনুসরণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেতরে ঢোকার সরু পথ খুঁজে পেলাম। এটুকু নজরে পড়া মাত্রই ভেসে যাওয়া মেঘ চাঁদকে আড়াল করে দিল, কিন্তু সামনেই আশ্রয়ের হাতছানি, অতএব আমি অন্ধের মত হাতড়ে এগিয়ে চললাম।

হঠাৎই এক নিস্তব্ধতার মুখোমুখি হয়ে আমি থমকে দাঁড়ালাম। ঝড় থেমে গেছে, এবং সম্ভবত নিঃশব্দ স্তব্ধ প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিতে আমার হৃদপিণ্ডও যেন বন্ধ করেছে তার স্পন্দন। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে! কারণ হঠাৎই মেঘ চিরে এসে পড়ল চাঁদের আলো, আমাকে জানিয়ে দিল যে আমি এক কবরখানায় এসে দাঁড়িয়েছি, এবং আমার সামনেই যে চৌকো স্তূপটা রয়েছে সেটা একটা সমাধি-প্রস্তর, ওটার ওপরে ও চারপাশে ছড়িয়ে থাকা তুষারের মতই শুভ্র তার রং।

হঠাৎ চাঁদের আলোর হাত ধরে ভেসে এলো ঝড়ের এক ভয়ংকর দীর্ঘশ্বাস এবং অসংখ্য কুকুর অথবা নেকড়ের মতো চাপা একটানা গর্জন করে সে যেন তার পুরোনো তোলপাড় আবার শুরু করল। এক অদ্ভুত আকর্ষণে আমি এগিয়ে চললাম মার্বেল পাথরে তৈরি সেই সমাধির দিকে। দেখতে ওটা কার, এবং কেনই বা এইরকম একটা জায়গায় এই রকম একটা জিনিস একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওটার চারপাশ ঘুরে অবশেষে ডরিস-দেশীয় দরজার ঠিক ওপরে জার্মানী ভাষায় লেখা কথাগুলো পড়তে পারলাম!

স্টাইরিয়ার গ্রাৎস্-এর কাউন্টেস ডলিংগেন
প্রার্থিত মৃত্যুকে পেয়েছেন ১৮০১

সমাধি-প্রস্তরের ঠিক ওপরে নিরেট পাথরে যেন পুঁতে দেওয়া হয়েছে এক বিশাল লোহার গজাল কিম্বা শূল। ওটার পিছন দিয়ে যেতেই নজরে পড়ল বড় বড় রুশ হরফে খোদাই করা রয়েছে : মৃতেরা দ্রুত চলে।

পুরো ব্যাপারটায় এমন একটা অপার্থিব গা ছমছমে আমেজ ছিল যে আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল, যেন এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাব। এই প্রথম মনে হল যে জোহানের উপদেশ শুনলেই বোধ হয় ভালো ছিল। হঠাৎই একটা চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল, এই রহস্যময় পরিস্থিতে আকস্মিক আঘাতের মতোই ঝলসে উঠল সেটা—'আজকের রাত ভাল্পার্গিসের রাত'!

ভাল্পার্গিসের রাত! লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী যে রাতে শয়তান যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়—সমস্ত কবর খুলে যায়, মৃতেরা বেরিয়ে আসে বাইরে, চলে বেড়ায়। যে রাতে জল, স্থল, অন্তরীক্ষের সমস্ত অশুভ জিনিস আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। আমার শেখা সমস্ত দর্শন, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত সাহস এক জায়গায় জড়ো করলাম, যেন অন্ধ আতঙ্কে ভেঙে না পড়ি।

এবার এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ফুঁসে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। মাটি এমন ভাবে কাঁপতে লাগল যেন হাজার হাজার ঘোড়া দুদ্দাড় করে তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে এবং এইবার তুষার নয়, বিরাট আকারের সব শিলাপিণ্ড দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল এবং তার আঘাতে গাছের ডালপালা, পাতা, সব খসে পড়তে লাগল, সাইপ্রাস গাছের আশ্রয় হয়ে দাঁড়াল বিপজ্জনক। ফলে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম এবং রওনা হলাম আশ্রয়

দিতে পারে এমন এক ও একমাত্র জায়গা লক্ষ্য করে—সমাধি-প্রস্তরের গভীর ডরিসীয় দরজা। বিশাল ব্রোঞ্জের দরজায় গায়ে গুঁটিসুঁটি মেরে দাঁড়িয়ে মুষলধারে শিলাবৃষ্টির হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পেলাম।

দরজায় গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই ওটা সামান্য নড়ে উঠল এবং খুলে গেল ভেতর দিকে। এই নিষ্ঠুর ঝড়ের মুখে কোন সমাধির আশ্রয়ও অনেক বেশি সুখের, ভেবে যেই আমি ভেতরে ঢুকতে যাব, ঠিক তক্ষুনি অসংখ্য রেখায় আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে সারা আকাশে আলোর রোশনাই জ্বালিয়ে দিল। সেই মুহূর্তে সমাধির অন্ধকারে চোখ ফিরিয়ে আমি স্পষ্ট দেখলাম, একটা শবাধারে ঘুমিয়ে আছে ভারী গাল ও টুকটুকে লাল ঠোঁট এক সুন্দরী মহিলা—আমি যেমন বেঁচে আছি, এ দৃশ্য তেমনি সত্যি। বজ্রপাতের শব্দটা আকাশে ভেঙে পড়তেই যেন এক দানবের হাত আমাকে চেপে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরের বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মধ্যে।

সমস্ত ঘটনাটা এত আকস্মিক ভাবে ঘটল যে মানসিক ও শারীরিক আঘাত পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই টের পেলাম অসংখ্য শিলাপিণ্ড তোড়ে আছড়ে পড়ছে আমার ওপর। একই সঙ্গে এক অদ্ভুত আচ্ছন্ন করা অনুভূতি যেন আমাকে বলে দিল, আমি একা নই। এবার চোখ ফেরালাম সমাধির দিকে। সেই মুহূর্তেই দেখা গেল চোখ ধাঁধানো এক আলোর ঝলকানি! সেটা আঘাত করল সমাধির ওপরে গাঁথা লোহার শূলের ওপর। তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মার্বেল পাথর চুরমার করে আগুনের তাণ্ডব ধরিয়ে যেন সরাসরি ঢুকে গেল মাটিতে। এক যন্ত্রণাময় মুহূর্তের জন্য উঠে দাঁড়াল সেই মহিলা, আগুনের শিখা তাকে জড়িয়ে লকলক করে জ্বলছে এবং তার মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার ডুবে গেল বজ্রপাতের শব্দে।

শেষ যা শুনতে পেলাম তা হল এই সব ভয়ংকর শব্দরোলের মিশ্রণে জন্ম নেওয়া এক বিচিত্র শব্দ, কারণ ততক্ষণে সেই দৈত্যের হাত আবার আমাকে বজ্রমুঠিতে আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে, শিলাবৃষ্টি আছড়ে পড়ছে আমার শরীরে এবং নেকড়ের গর্জনে কেঁপে উঠছে চারিদিকের বাতাস। শেষ যে দৃশ্য মনে আছে তা হল অস্পষ্ট সাদা এক চলমান স্তূপ, যেন চারপাশের সমস্ত সমাধি তাদের আচ্ছাদিত মৃতদেহের প্রেতাত্মাগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে এবং তারা দুরন্ত শিলাবৃষ্টির সাদা ধোঁয়াশা ভেদ করে আমাকে ক্রমশ ঘিরে ধরছে।

ধীরে ধীরে অস্পষ্ট ভাবে চেতনা ফিরে আসতে লাগল, তারপর এক গভীর ক্লান্তির অনুভূতি। কয়েক মুহূর্তের জন্য কিছুই মনে করতে পারলাম না, তারপর আস্তে আস্তে চেতনা ফিরে আসতে লাগল। আমার পা দুটোয় অসহ্য অস্থির যন্ত্রণা, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ওদের একচুল নড়াতে পারছি না। পা দুটো যেন অসাড় হয়ে গেছে। আমার ঘাড়ে এক বরফশীতল স্পর্শ এবং মেরুদণ্ড, কান, সব যেন আমার পায়ের মতই মৃত, অথচ তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির, কিন্তু আমার বুকে এক অদ্ভুত উষ্ণ স্পর্শ তৃপ্তির স্বাদ এনে দিচ্ছে। এ যেন এক দুঃস্বপ্ন—সঠিক বলতে গেলে, এক বাস্তব দুঃস্বপ্ন কারণ আমার বুকে চাপানো এক ভারী পাথর আমার শ্বাস-প্রশ্বাসকে কষ্টকর করে তুলছে।

এক অগাধ স্তব্ধতা আমাকে ঘিরে ধরল, যেন সারাটা পৃথিবী ঘুমে অচেতন কিংবা মৃত—শুধু থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে থাকা হয়তো কোন জন্তুর চাপা হাঁপানির শব্দ। গলায় টের পেলাম এক উষ্ণ কর্কশ স্পর্শ, তারপর ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি হলাম। আমার হৃৎপিন্ড যেন বরফে জমে গেল, রক্তের জোয়ার ছুটে গেল আমার মস্তিষ্কের শিরায় শিরায়। একটা বিশাল জন্তু আমার শরীরের ওপর বসে আমার গলা চাটছে। চোখের ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে দেখলাম আমার মুখের ঠিক সামনেই এক প্রকাণ্ড নেকড়ের দুটো বিশাল জ্বলন্ত চোখ। হাঁ করা লাল মুখে ধারালো সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করছে এবং ওটার গরম ঝাঁঝালো নিশ্বাস আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি।

আরও কিছু সময়ের জন্য আমার স্মৃতিশক্তি অচল হল। তারপর শুনতে পেলাম একটা চাপা গর্জন! পরক্ষণেই এক তীক্ষ্ণ চিৎকার—একবার, দুবার, বারবার। তারপর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা সমবেত কণ্ঠে শুনতে পেলাম, হ্যালো! হ্যালো! অতি সাবধানে মাথা তুলে শব্দ লক্ষ্য করে তাকালাম, কিন্তু সমাধিক্ষেত্র আমার দৃষ্টি আড়াল করল। নেকড়েটা তখনও অদ্ভুত ভাবে চিৎকার করছে এবং একটা লাল

আভা সাইপ্রাস কুঞ্জে চলে ফিরে বেড়াতে লাগল, যেন শব্দটাকে অনুসরণ করছে। কণ্ঠস্বরগুলো আরো কাছে আসতেই নেকড়েটার গর্জন আরও দ্রুত আরও জোরালো হয়ে উঠল। সাড়া দিতে বা নড়াচড়া করতে আমি ভয় পেলাম।

তারপর হঠাৎ ঘিরে থাকা গাছের আড়াল থেকে শোনা গেল একদল ঘোড়াসওয়ারের ঘোড়া ছুটিয়ে আসার শব্দ, হাতে তাদের জ্বলন্ত টর্চ। নেকড়েটা আমার বুক ছেড়ে উঠে পড়ল, রওনা হল সমাধিস্থলের দিকে। একজন ঘোড়সওয়ারকে (টুপি ও লম্বা সামরিক বেশ দেখে ওদের সৈনিক বলেই মনে হল) দেখলাম বন্দুক তুলে তাক করতে। অন্য একজন তার হাতে ঠেলা মারল, গুলিটা শিস দিয়ে বেরিয়ে গেল আমার মাথার ওপর দিয়ে। সে নিশ্চয়ই আমাকে নেকড়ে বলে ভুল করেছে। চুপিসারে পালিয়ে যাওয়া জন্তুটাকে আর একজন দেখতে পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল গুলির শব্দ। তারপর, দু-চার কদমেই ঘোড়সওয়ারের দল কাছে এসে গেল—কেউ এলো আমার কাছে, আর কেউ কেউ গেল বরফে সাজানো সাইপ্রাস গাছের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নেকড়েটাকে অনুসরণ করতে।

ওরা কাছে আসতেই আমি নড়াচড়া করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু শক্তি খুঁজে পেলাম না। অথচ আমি আমার চারপাশে যা যা হচ্ছে তার সবই দেখতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি। দু-তিনজন সৈনিক ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আমার পাশে। একজন আমার মাথা তুলে ধরল, হাত রাখল আমার বুকে। 'ভালো খবর, কমরেড!' সে চিৎকার করে উঠল, 'ভদ্রলোক এখনো বেঁচে আছেন।'

তারপর কিছুটা ব্র্যান্ডি ঢেলে দেওয়া হল আমার গলায়, শরীরে যেন শক্তি ফিরে এল, এবার চোখ পুরোপুরি মেলতে পারলাম, তাকালাম চারিদিকে। গাছের সমারোহে, আলো ও ছায়া চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে, শুনতে পেলাম লোকজনের চিৎকার করে পরস্পরকে ডাকাডাকির শব্দ। ভয়ার্ত চিৎকারে বিস্ময় প্রকাশ করতে করতে ওরা ক্রমে এক জায়গায় জড়ো হল, ভূতে পাওয়া মানুষের মতো অন্যান্যরা কবরখানায় গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এল, টর্চের আলো ঝলসে উঠতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে। দূরের লোকজন সবাই যখন কাছে চলে এল তখন আমাকে ঘিরে থাকা লোকেরা অধীর আগ্রহে ওদের প্রশ্ন করল, 'কি হল, ওটাকে পাওয়া গেল?'

উত্তর পাওয়া গেল ঝটিতি, 'না। শীগগির চল—জলদি। এ জায়গায় থাকা ঠিক নয়, বিশেষ করে আজকের রাতে।'

'ওটা কী ছিল?' একাধিক সুরে ধ্বনিত হল এই প্রশ্ন।

উত্তর পাওয়া গেল বিভিন্ন এবং অস্পষ্ট, যেন সবাই এক বিশেষ আবেগে কথা বলতে চাইছে অথচ কি এক আতঙ্কে নিজেদের জিভের রাশ টেনে ধরছে।

'ওটা—ওটা—একটা—' দিশেহারা চিন্তা নিয়ে তোতলা স্বরে বলতে চাইল একজন, 'একটা নেকড়ে—অথচ নেকড়েও ঠিক নয়—' বলল আর একজন।

'পবিত্র গুলি ছাড়া ওটাকে কিছু করা সম্ভব নয়।' স্বাভাবিক সুরে মন্তব্য করল তৃতীয় কোন ব্যক্তি।

'এ রাতে যেমন বেরিয়েছি, তেমনি উচিত শিক্ষা হয়েছে। আমাদের হাজার মার্ক আমরা সত্যি খেটে উপায় করেছি।' চতুর্থজনের মুখ ফুটে বেরিয়ে এল।

'ভাঙা মার্বেল পাথরের ওপর রক্ত ছিল।' আর একজন বলল, 'সেটা তো আর বজ্রপাত থেকে আসেনি। আর এই ভদ্রলোক—এঁর আর কোন ভয় নেই তো? গলাটা একবার দেখ। দেখ কমরেড, নেকড়েটা এই ভদ্রলোকের গায়ের ওপর শুয়ে তাঁর রক্ত গরম রেখেছে।'

অফিসারটি আমার গলায় দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'ভদ্রলোকের আর কোন ভয় নেই, চামড়ায় কোন ক্ষত হয়নি। এ সবের মানে কি? নেকড়েটার চিৎকার না শুনলে আমরা এঁকে খুঁজেই পেতাম না।'

'নেকড়েটার কি হল?' আমার মাথাটা যে তুলে ধরেছিল সে জিগ্যেস করল। 'ওটা নিজের আস্তানায় ফিরে গেছে।' লম্বাটে বিবর্ণ মুখ লোকটি উত্তর দিল, আতঙ্কে সে কাঁপছে, 'এখানে অনেক কবর রয়েছে, তারই একটায় হয়তো ওটা থাকে। এসো, কমরেড—জলদি চল। এই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে আমরা চলে যাই।'

অফিসারটি আমাকে তুলে ধরলেন বসানোর ভঙ্গিতে, আদেশের সুরে কী যেন বললেন, তখন কয়েকজন মিলে আমাকে বসিয়ে দিল ঘোড়ার পিঠে। সে লাফিয়ে উঠে বসল আমার পিছনে, আমাকে জড়িয়ে ধরল, দু'হাতে, এগোতে নির্দেশ দিল সবাইকে। অতএব সাইপ্রাস গাছের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা সামরিক শৃঙ্খলায় দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম।

আমার জিভ তখনও বিদ্রোহ করায় আমি চুপ করে থাকতে বাধ্য হলাম। নিশ্চয়ই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কারণ পরের যে ঘটনা মনে আছে, তা হল আমি দাঁড়িয়ে আছি, দু'পাশে দুজন সৈনিক আমাকে ধরে রেখেছে। চারিদিকে প্রায় উজ্জ্বল দিনের আলো, আর উত্তর দিকে প্রতিফলিত হয়েছে সূর্যের আলোর এক লাল রেখা, আনকোরা তুষারের ওপর যেন রক্ত ঢেলে তৈরি করা হয়েছে এক পায়ে চলা পথ।

অফিসার তখন অন্যান্যদের বলছেন যা তারা দেখেছে তা যেন কাউকে না বলে।

শুধু যেন বলে যে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ইংরেজকে পাওয়া গেছে, আর একটা বিরাট কুকুর তাকে পাহারা দিচ্ছিল।

'কুকুর! ওটা তো কুকুর ছিল না।' সবচেয়ে ভয় পাওয়া মানুষটা বাধা দিয়ে বলল, নেকড়ে দেখলে আমার চিনতে ভুল হয় না।

তরুণ অফিসার শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'আমি বলছি কুকুর।'

কুকুর! ব্যঙ্গভরে পুনরাবৃত্তি করল অন্য জন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সূর্যের তেজে সঙ্গে সঙ্গে তার সাহসও বাড়ছে, তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'ভদ্রলোকের গলাটা দেখুন। এটা কি কোন কুকুরের কাজ, স্যার?'

সহজাত প্রবৃত্তিবশে আমি হাত দিলাম গলায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। ওরা আমাকে ঘিরে ধরল দেখবার জন্য, কেউ কেউ তাদের জিন থেকে ঝুঁকে পড়ল, আর তখনই আবার শোনা গেল 'সেই তরুণ অফিসারের কণ্ঠস্বর, আমি যা বললাম—কুকুর। এ ছাড়া অন্য কিছু বলতে গেলে সবাই আমাদের কথায় হাসবে।'

এরপর আর একজন অশ্বারোহী সৈনিকের ঘোড়ায় আমাকে তুলে দেওয়া হল, এবং আমরা মিউনিখের শহরতলী অঞ্চলে ঢুকে পড়লাম। সেখানে হঠাৎই একটা জুড়ি গাড়ি দেখতে পেয়ে আমাকে সেটাতে তুলে দেওয়া হল। গাড়ি ছুটে চলল আমার হোটেল অভিমুখে—তরুণ অফিসারটি আমার সঙ্গী হলেন, আর একজন সৈনিক ঘোড়ায় চড়ে আমাদের অনুসরণ করল, বাকিরা ফিরে গেল তাদের ব্যারাকে।

আমরা হোটেলে পৌঁছতেই হ্রে ডেলব্রুক এত তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন যে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। অফিসারটি আমাকে অভিবাদন করে যখন বিদায় নিতে চলেছে, তখন আমি তাকে এবং তার সাহসী কমরেডদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। সে খুব সহজ গলায় উত্তর দিল যে সে ভীষণ খুশি হয়েছে, এবং অনুসন্ধানকারী দলকে তুষ্ট করার জন্য হের ডেলব্রুক আগেই সব ব্যবস্থা করেছেন। এই হেঁয়ালিভরা কথায় হোটেল পরিচালক হাসলেন, এবং অফিসারটি কাজের ওজর দেখিয়ে বিদায় নিল।

'কিন্তু হ্রে ডেলব্রুক'—আমি জানতে চাইলাম, 'সৈন্যদলের লোকেরা আমাকে কি করে, আর কেনই বা খুঁজতে গেল?'

নিজের কাজের জন্য যেন লজ্জায় কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, তারপর উত্তর দিলেন, 'আমার ভাগ্য ভালো যে আমার দলের সেনাপতির কাছ থেকে ছুটি পেয়েছি এবং অনুসন্ধানের জন্য স্বেচ্ছা সৈনিকের দল চাইতে

পেরেছি।'

'কিন্তু কী করে জানলেন যে আমি পথ হারিয়েছি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'কোচোয়ান তার ভাঙাচোরা গাড়ি নিয়ে এখানে এসেছিল, ঘোড়াগুলো পালিয়ে যাওয়ার পর তার গাড়ি উলটে যায়।'

'কিন্তু শুধু এই কারণেই তো আর সৈন্য বাহিনী থেকে অনুসন্ধান-দল পাঠানো যায় না?'

'না, না।' সে উত্তর দিল, আসলে কোচোয়ান আসার আগেই আপনি যার অতিথি সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে এই তারটা আমি পাই—বলে পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম মেসেজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। এবং আমি পড়লাম ঃ

বিসত্রিজ

আমার অতিথি সম্পর্কে সাবধান—তাঁর নিরাপত্তা আমার কাছে অমূল্য। তাঁর যদি সামান্য কিছুও হয়, বা তিনি হারিয়ে যান, তাহলে তাঁকে খুঁজে বের করে নিরাপত্তা অটুট রাখতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখবেন না। ভদ্রলোক ইংরেজ, ফলে ভ্রমণ বিলাসী। তুষার, নেকড়ে ও অন্ধকার রাত প্রায়ই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। যদি তার বিপদের সামান্যতম আভাসও পান একটা মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। আপনার উৎসাহ ও প্রচেষ্টার যথাযথ উত্তর আমায় ঐশ্বর্য দেবে।

—ড্রাকুলা

কাগজটা হাতে নিয়ে মনে হল ঘরটা আমার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর তৎপর হোটেল পরিচালক যদি আমাকে না ধরে ফেলতেন তাহলে আমি হয়তো পড়েই যেতাম। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই কেমন একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েছে এবং সেটা এতই অপার্থিব যে কল্পনা করা দুঃসাধ্য। আমি যেন বিপরীত শক্তির হাতে এক খেলনা হয়ে গিয়েছিলাম—এই চিন্তার আভাসটুকুই আমাকে যেন অসাড় পঙ্গু করে দিল। নিঃসন্দেহে আমি এক ধরনের রহস্যময় কোন নিরাপত্তার আশ্রয়ে ছিলাম। এক দূর দেশ থেকে ঠিক সঙ্কট মুহূর্তে এসেছে এক তারবার্তা, তুষার-ঘুম ও নেকড়ের দাঁত থেকে বাঁচিয়ে আমাকে বিপদমুক্ত করেছে।

লুকুণ্ডু

এডওয়ার্ড লুকাস হোয়াইট



একথা ঠিক যে চোখে দেখা প্রমাণকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই, টুম্বিল বলল, আর যখন চোখ ও কানের মধ্যে কোন বিবাদ থাকে না, তখন তো সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সব সময় তা হয় না, ছোট্ট করে বলে উঠল সিঙ্গলটন।

প্রত্যেকেই ঘুরে তাকাল সিঙ্গলটনের দিকে। অগ্নি-আধারের দিকে পিছন ফিরে তার কাছাকাছি পাতা গালিচার ওপর দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল টুম্প্লি। তার উপস্থিতির প্রভাব বরাবরের মতই সারা ঘরে জাঁকিয়ে বসেছে। আর সিঙ্গলটন, রোজকার মতো, ঘরের এক কোণে যথাসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু যখন সে কথা বলে, তখন তা না শুনে উপায় থাকে না। সুতরাং আমরা সকলেই ঘুরে তাকালাম তার দিকে। আমাদের প্রত্যাশাভরা নীরবতা যেন গল্পকারকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, আফ্রিকায় আমার চোখে দেখা, কানে শোনা, একটা ঘটনা ভাবছিলাম —

ঘরের সবাই পলকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে বসল, প্রতিটি চোখ সিঙ্গলটনের ওপর নিবদ্ধ, নতুন করে কয়েকটা চুরুটে আগুন ধরানো হল। সিঙ্গলটনও একটা ধরালো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেটা নিভে গেল, আর সে দ্বিতীয়বার সেটা ধরাবার চেষ্টা করল না।

পিগমিদের আবিষ্কারের আশায় আমরা তখন গ্রেট ফরেস্ট-এ ঘোরাঘুরি করছি। ভ্যান রিটেন-এর এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে স্ট্যানলি ও অন্যান্যরা যে সব বামনদের আবিষ্কার করেছেন তারা সাধারণ নিগ্রো ও আসল পিগমিদের মিশ্রণে জন্ম নেওয়া বর্ণসঙ্কর ছাড়া আর কিছুই নয়। ভ্যান রিটেন-এর আশা ছিল, সে এমন এক জাতের মানুষ আবিষ্কার করবে যারা বড় জোর ফুট তিনেক লম্বা, কি তারও কম। তখনও আমরা, সে-রকম জাতের কোন মানুষের সন্ধান পাইনি।

আদিবাসীদের সংখ্যা খুবই কম, শিকারও সচারাচর চোখে পড়ে না, শিকার ছাড়া খাদ্য বলতে আর কিছুই নেই, চারদিকে গভীর ঘন স্যাঁতস্যাঁতে জঙ্গল। যে সব আদিবাসীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে তারা এই প্রথম সাদা চামড়ার মানুষ দেখছে, এবং বেশির ভাগই কোনদিন সাদা মানুষের নামও শোনেনি। আকস্মিক ভাবে, একদিন সন্ধ্যা মুখোমুখি, জনৈক ইংরেজ আমাদের তাঁবুতে এল শ্রান্ত ক্লান্ত জীর্ণ চেহারা। তার কথা

আমরা কারো কাছেই শুনিনি, সে কিন্তু আমাদের কথা শুনেছে এবং পাঁচ দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে পায়ে হেঁটে আমাদের তাঁবুতে এসে পৌঁছেছে। তার গাইড ও কুলি দুজনও একই রকম পরিশ্রান্ত।

ইংরেজ লোকটির নাম ইচাম। বিনয়ের সঙ্গে সে নিজের পরিচয় দিল, এবং আমাদের সঙ্গে বসে এত স্বাভাবিক শান্তভাবে খেতে লাগল যে বিশ্বাসই করা যায় না, গত পাঁচ দিনে সে মাত্র তিনবার সামান্য কিছু খেয়েছে, এ কথা আমাদের কুলিরা ইচামের কুলিদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর ধূমপানে ব্যস্ত হয়ে সে তার আসার কারণ খুলে বলল।

আমাদের বড় সাহেবের অবস্থা খুব খারাপ, ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে সে বলল, এই ভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে তাঁর বাঁচার কোন আশা নেই। আমি ভাবছিলাম, যদি...

স্পষ্ট সহজ সুরে কথাগুলো সে বললেও আমি লক্ষ্য করলাম, তার খোঁচা খোঁচা গোঁফের নীচে ছোট ছোট ঘামের ফোঁটা চকচক করছে। নির্দয় প্রকৃতির মানুষ ভ্যান রিটেনকে দেখে বিচলিত হয়েছে বলে মনে হল না। সে একমনে শুনতে লাগল। আমি অবাক হলাম। কারণ সে এক কথায় সাফ প্রত্যাখ্যান করার মানুষ। অথচ দিব্যি ইচামের হোঁচট খাওয়া দ্বিধায় ভরা কথায় টুকরোগুলো শুনে চলেছে। এমন কি কয়েকটা প্রশ্নও করল।

কে তোমার বড় সাহেব?

স্টোন—তোতলা স্বরে বলল ইচাম।

আমরা দুজনেই তড়িৎস্পৃষ্ঠের মতো চমকে উঠলাম।

র‍্যাল্ফ্ স্টোন? আমাদের ঠোঁট চিরে একই সঙ্গে বেরিয়ে এল।

ইচাম মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

কয়েক মিনিট আমি ও ভ্যান রিটেন চুপ করে রইলাম। ভ্যান রিটেনকে কখনও না দেখলেও আমি ওর সঙ্গে কলেজে পড়েছি, অনেক দিন তাঁবুর বাইরে ধুনী জ্বেলে আমরা ওর বিষয়ে আলোচনাও করেছি। বছর দুয়েক আগে বালুঙা দেশের দক্ষিণ ল্যুবোতে এক আদিবাসী রোজার সঙ্গে ওর নাটকীয় শত্রুতার কথা আমাদের কানে এসেছিল। অবশেষে সেই ডাইনী রোজা স্টোনের কাছে পরাজিত হয়, এবং তার উপজাতির সকলেই উচিত শিক্ষা পায়। এমন কি জাদুকর রোজার বাঁশিটা ভেঙেচুরে তার টুকরোগুলো স্টোনকে দেওয়া হয়। এ নিয়ে বালুঙা তখন বেশ সরগরম ছিল।

আমরা ভেবেছিলাম, স্টোন আফ্রিকা ছেড়ে চলে গেছে, আর না গেলেও দূর কোন প্রান্তে রয়েছে। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখছি সে আমাদের কাছাকাছিই রয়েছে, এবং সম্ভবত আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য বানচাল করে দেবে।

ইচাম-এর মুখে স্টোনের নাম শুনতেই আমার সমস্ত পুরোনো কথা মনে পড়তে লাগল। মনে আছে, দ্বিতীয় বিয়ের কিছুদিন পরই ও অন্ধকার মহাদেশ আবিষ্কারের নেশায় ঘরছাড়া হয়েছিল। ভ্যান রিটেন মনে মনে যা-ই ভাবুক মুখে প্রশ্ন করল, ল্যুবোতে স্টোনের সঙ্গে তুমি ছিলে?

না—ইচাম বলল, ওয়ার্ণার ছিল। সে মারা গেছে। আমি স্টোনের দলে ঢুকেছি স্ট্যানলি জলপ্রপাতের কাছে।

ওর সঙ্গে আর কে কে আছে?

শুধু জাঞ্জিবারের বেয়ারা আর চাকর-বাকর—ইচাম উত্তর দিল।

বেয়ারাগুলো কোন্ জাতের? ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।

মং-বাটু—ইচাম সহজ সুরে বলল।

এতে আমি আর ভ্যান রিটেন দারুণ অবাক হলাম। কোন দলের নেতা হবার যে জন্মগত স্বাভাবিক গুণ স্টোনের ছিল, এ যে তার নতুন প্রমাণ। কারণ আজ পর্যন্ত তাদের দেশের বাইরে মং-বাটুদের দিয়ে কেউ বেয়ারার কাজ করাতে পারেনি। তাছাড়া, খুব দুর্গম বা দূরদেশ অভিযানেও তাদের পাওয়া যেত না।

মং-বাটুদের মধ্যে তোমরা কত দিন ছিলে? ভ্যান রিটেনের পরের প্রশ্ন।

কয়েক সপ্তা—ইচাম উত্তর দিল, স্টোন ওদের কথাবার্তা ভাষা শিখে ফেলেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এই মং-বাটুরা বালুণ্ডা জাতেরই একটা শাখা। এবং পরে ওদের আচার ব্যবহার দেখে তাঁর সে ধারণা আরও জোরদার হয়েছিল।

স্টোনের এই অবস্থা কদ্দিন?

এক মাসের কিছু বেশি। একটু থেমে ইচাম যোগ করল, আমার নিজের শরীরটাও খুব ভালো ঠেকছে না...

তোমাদের সাহেবের আসলে হয়েছেটা কী? ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।

কার্বাঙ্কলের মতো বড় বড় ফোঁড়া।

এ রকম দু-একটা ফোঁড়া আর তেমন কি—ভ্যান রিটেন মন্তব্য করল।

এগুলো ঠিক কার্বাঙ্কল নয়—বিশদ হতে চাইল ইচাম, তাছাড়া একটা দুটো তো হয়নি, একসঙ্গে অনেকগুলো করে হচ্ছে। কখনও পাঁচটা কিংবা সাতটা—এই রকম। এগুলো যদি সতিই কার্বাঙ্কল হত, তাহলে সাহব বোধ হয় আর বাঁচতেন না। তবে অন্যদিক থেকে এগুলো কার্বাঙ্কলের চেয়েও খারাপ।

তার মানে?

মানে—একটু ইতস্তত করে ইচাম বলল, কার্বাঙ্কলের মতো এই ফোঁড়াগুলো তত গভীর বা ছড়ানো নয়, সে রকম যন্ত্রণাও নেই, জ্বরও হয় না। কিন্তু এই রোগ থেকে মনে হয় মানসিক রোগ দেখা দেয়। প্রথমটার বেলা আমি পটি বেঁধে দিয়েছি, কিন্তু অন্যগুলো তিনি খুব কায়দা করে আমাদের নজর থেকে লুকিয়ে রেখেছেন। ওগুলো খুব ফুলে উঠলে স্টোন আস্তানা ছেড়ে বাইরে বেরোন না, আর আমাকে পটি পাল্টাতেও দেন না বা কাছে থাকতে বলেন না।

ব্যান্ডেজ তোমাদের হাতে কী রকম আছে? ভ্যান রিটেন প্রশ্ন করল।

আছে মোটামুটি—চিন্তিত স্বরে ইচাম বলল, কিন্তু উনি ও সব ব্যবহার করতে চান না। একই ব্যান্ডেজ বার বার ধুয়ে ব্যবহার করেন।

আর ফোঁড়াগুলোর কী চিকিৎসা করছে?

ক্ষুর দিয়ে কেটে সমান করে দিচ্ছে।

কী! প্রায় চিৎকার করে উঠল ভ্যান রিটেন।

ইচাম কোন উত্তর দিল না, কিন্তু এক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছু মনে কর না—ভ্যান রিটেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তুমি আমাকে ভীষণ চমকে দিয়েছিলে। না, ওগুলো তাহলে কার্বাঙ্কল নয়। কার্বাঙ্কল হলে অনেক আগেই স্টোন মারা যেত।

সে তো আপনাকে আগেই বলেছি—অস্ফুট ভাবে বলল ইচাম।

স্টোন নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে—অবাক স্বরে মন্তব্য করলর ভ্যান রিটেন।

ঠিক তাই—ইচাম বলল, আমার কথাবার্তা কিছুই শুনছেন না।

এ রকম ভাবে ক'টা কার্বাঙ্কলের চিকিৎসা ও করেছে?

দুটো—অন্তত আমি তাই জানি। মাথা নীচু করে বলল ইচাম, যেন লজ্জা পেয়েছে, কুঁড়েঘরের দেওয়ালের ফাটল দিয়ে আমি দেখেছি। সাহেব হয়তো কোন ভর হওয়ায় এ সব কাণ্ড করছেন, এ কথা ভেবে আমি সব সময় তাঁর ওপর নজর রাখার চেষ্টা করেছি।...আমার বিশ্বাস, বাকি ফোঁড়াগুলোও উনি একইভাবে চিকিৎসা করেছেন।

খাওয়া দাওয়া কী রকম করছে? ভ্যান রিটেন জিগ্যেস করল।

একেবারে নেকড়ের মতো। দুটো বেয়ারার চেয়েও বেশি। ইচাম বলল।

হাঁটতে পারছে?

সামান্য হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারেন, তবে যন্ত্রণায় চিৎকার করেন—সহজ গলায় ইচাম জবাব দিল।

জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে?

মাত্র দুবার—ইচাম বলল, প্রথম ফোঁড়াটা ফেটে যাবার পর একবার, আর পরে একবার। তখন উনি কাউকে কাছে আসতে দেন না। কিন্তু আমরা শুনতে পেতাম, উনি কথা বলছেন। এতে আদিবাসীরা ভীষণ ভয় পেয়েছিল।

প্রলাপ বকছে কি আদিবাসীদের ভাষায়? ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।

না, তবে ওই জাতীয় অন্য কোন ভাষায়। হামিদ বুরগাশ বলছিল, উনি বালুণ্ডার ভাষায় কথা বলছেন। বালুণ্ডা ভাষা আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হচ্ছিল কয়েকটা শব্দের সঙ্গে মং-বাটুর শব্দের মিল আছে। যাই হোক, মং-বাটু বেয়ারারা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। শুধু ওরা নয়, জাজ্জিবারর লোকেরাও ভয় পেয়েছে, এমন কি হামিদ বুরগশি আর আমিও বাদ পড়িনি। তবে আমাদের ভয়ের কারণ অন্য। স্টোন সাহেব দু'রকম গলায় কথা বলছিলেন।

দু'রকম গলায়? ভ্যান রিটেন যেন প্রতিধ্বনি তুলল।

হ্যাঁ—ইচাম বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ল, দুরকম গলায়, যেন দুজন লোক কথা বলছে। একটা তাঁর নিজের গলা, আর অন্যটা সরু তীক্ষ্ণ স্বর। এ রকম স্বর আমি কখনও শুনিনি। স্টোন সাহেবের কথার দু'একটা শব্দ আমি বুঝতে পেরেছিলাম—অনেকটা আমার জানা মং-বাটু শব্দের মতো। যেমন, নেদ্রু, মিটিবাবা, আর নিদো—এগুলোর মানে হল মাথা, কাঁধ আর ঊরু, সরু গলায় যে সব চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম, তার মধ্যে খুন, মৃত্যু, ঘৃণা এই শব্দ তিনটে আমি পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি। হামিদ বুরগাশও এই কথাগুলো শুনতে পেয়েছে। ও আমার চেয়ে অনেক ভালো মং-বটু ভাষা জানে।

বেয়ারারা কী বলছিল? ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।

ওরা খালি বলছিল, 'লুকুগু, লুকুগু!' এ শব্দটার মানে আমি জানতাম না, হামিদ বুরগাশ বলল যে এটা মং-বাটু শব্দ—মানে চিতাবাঘ। ইচাম বলল।

না, এর মানে ডাকিনী-বিদ্যা—ভ্যান রিটেন বলল। তারপর প্রশ্ন করল, দুটো স্বর কি একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছিল, না একটা অন্যটার উত্তর দিচ্ছিল?

ইচামের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভাঙা গলায় ও উত্তর দিল, কখনও কখনও দুটো স্বরই একসঙ্গে শোনা যাচ্ছিল।

একসঙ্গে! ভ্যান রিটেনের ঠোঁট চিরে বেরিয়ে এল।

শুনে তো সবার ওই রকমই মনে হয়েছিল। একটু থামল ইচাম, তারপর জিগ্যেস করল, আচ্ছা, বলুন তো, কোন মানুষ কী একই সঙ্গে কথা বলতে আর শিষ দিতে পারে?

তার মানে? ভ্যান রিটেন প্রশ্ন করল।

স্টোনের কথা আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম—গম্ভীর, ভারী, শান্ত কণ্ঠস্বর। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ জোরালো এক শিসের শব্দ, সেই শব্দে মেশানো রয়েছে এক অদ্ভুত শ্বাসের টান। জানেন তো, যতই জোরে একটা বুড়ো লোক শিস দিক না কেন, তার সুর কোন ছেলে, বাচ্চা মেয়ে যুবতীর শিসের সুরের চেয়ে আলাদা। যে কোন কারণেই হোক, বয়স্ক লোকদের শিসের সুর অনেক ভারী হয়। একটা খুব ছোট্ট মেয়ে যদি একটানা শিস দিয়ে যায়, তাহলে যে রকম শোনায়, ওই শিসের শব্দটা ঠিক সেই রকম। তবে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও তীব্র, আর ওটা শোনা যাচ্ছিল স্টোনের গম্ভীর গলা ছাপিয়ে।

তোমরা ওর কাছে গিয়েছিলে? ভ্যান রিটেন উত্তেজিত স্বরে জানতে চাইল।

না, যাইনি—বলল ইচাম, কারণ তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, এই সময়ে কেউ যেন তাঁর কাছে না যায়। যদি যায়, তাহলে তাকে মরতে হবে। তাঁর কথার চেয়েও আচরণে আমরা বেশি ভয় পেয়েছি। এ যেন কোন রাজা তাঁর মৃত্যুশয্যায় পবিত্র নির্জনতা রক্ষা করতে আদেশ করছেন।

ও—ভ্যান রিটেন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল।

সাহেবের অবস্থা খুব খারাপ—অসহায় সুরে বলল ইচাম, যদি আপনারা...

স্টোনের প্রতি ইচামের মমতা, ভালোবাসা তার রীতিমাফিক আচরণের খোলস ছাপিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, স্টোনের পুজোই তার একমাত্র ব্রত।

অন্যান্য অনেক দক্ষ মানুষের মতো ভ্যান রিটেন-এর মধ্যেও কিছুটা কঠিন স্বার্থপরতাবোধ রয়েছে। এবারে সেটা প্রকাশ পেল। সে বলল, আমরাও স্টোনের মতো প্রাণ হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যে কোন দুজন অভিযাত্রীর মধ্যে রক্ত ও অনুভূতির বন্ধন সে অস্বীকার করে না, কিন্তু এক্ষেত্রে মরণাপন্ন একজন অভিযাত্রীর জন্য কোন অভিযাত্রী দলের মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াটা নেহাৎই বোকামি মাত্র—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভ্যান রিটেন-এর যুক্তি তর্কের সামনে ইচাম নির্বিকার অথচ অপরাধী ভঙ্গীতে বসে রইল। যেন প্রধান-শিক্ষকের সামনে কোন ইসুকলের চেলে চুপচাপ বকুনি খেয়ে চলেছে। অবশেষে ভ্যান রিটেন বলল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি পিগমিদের খোঁজে এসেছি। শুধু পিগমিদের খোঁজে।

তাহলে দেখুন তো, এগুলো হয়তো আপনার কৌতূহলের খোরাক জোগাতে পারে—খুবই শান্ত গলায় ইচাম বলল।

খাটো জামার পাশ-পকেট থেকে দুটো জিনিস বের করে সে ভ্যান রিটেন-এর হাতে দিল। জিনিস দুটো গোল, আকারে কুলের চেয়ে সামান্য বড়, পাঁচফলের চেয়ে অল্প ছোট। হাতের চেটোয় মুঠো করে ধরা পক্ষে ঠিক মাপের। জিনিস দুটোর রঙ কালো। প্রথমটা আমি ওগুলো ভালো করে দেখার চেষ্টা করিনি।

পিগমি! অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল ভ্যান রিটেন, সত্যিকারের পিগমিই বটে!

আরে, এরা দেখছি দু-ফুটের বেশি লম্বা হবে না। তুমি বলতে চাও এগুলো প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মাথা?

আমি কিছুই বলতে চাই না—ইচাম বলল, আপনি নিজের চোখেই দেখুন।

একটা মাথা ভ্যান রিটেন আমার দিকে এগিয়ে দিল। অস্তায়মান সূর্যের আলোয় সেটা খুব কাছ থেকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম। মাথাটা শুকিয়ে নিখুঁত ভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে, এবং পেশীগুলো অসম্ভব শক্ত। যেখানে কেটে নেওয়া গলার চামড়া কুঁচকে ভাঁজ হয়ে রয়েছে সেখান থেকে কশেরুকার অংশবিশেষ বাইরে বেরিয়ে আছে। ছুঁচলো চোয়ালের ওপর ক্ষুদে থুতনিটুকু বেশ চোখে পড়ে, টান টান হয়ে সরে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁকে ছোট ছোট সাদা দাঁত সমান ভাবে সাজানো, ছোট্ট নাকটা চ্যাপটা, কপাল উঁচু ও চওড়া, লিলিপুট মাথায় মসৃণ চামড়ার ওপর এখানে ওখানে চোখে পড়ে থোকা থোকা পশমী চুলের বনসাই ঝোপ। না, বাচ্চা, ছেলেমানুষ, বা যুবক—এরকম কোন ছাপই মুখটার মধ্যে নেই, বরং কোন প্রৌঢ়ের বয়েসের ছাপই সেখানে চোখে পড়ে।

এগুলো কোত্থেকে পেয়েছ? ভ্যান রিটেন প্রশ্ন করল।

জানি না—ইচামের নিখুঁত উত্তর শোনা গেল, ওষুধের খোঁজে স্টোন সাহেবের জিনিসপত্র হাঁটকাতে গিয়ে এগুলো পেয়েছি। উনি কোত্থেকে পেয়েছেন তা বলতে পারছি না। তবে এটুকু শপথ করে বলব, এই এলাকায় ঢুকবার সময় ওগুলো তাঁর সঙ্গে ছিল না।

ঠিক বলছ? বড় বড় চোখ ইচামের চোখে স্থির রেখে ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।।

হ্যাঁ। ঠিকই বলছি—অস্ফুটে জবাব দিল ইচাম।

এই মাথাগুলো তুমি পরীক্ষা করে দেখেছ?

খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি?

ভ্যান রিটেন তার নোটবই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে সেটা ভাঁজ করে সমান তিন ভাগে ভাগ করল। এক টুকরো আমাকে দিল, আর এক টুকরো দিল ইচামকে।

আমি মনে মনে একটা জিনিস ভেবেছি—ভ্যান রিটেন বলল, সেটা খতিয়ে দেখার জন্য আমি চাই, আমরা প্রত্যেক এই কাগজে মাথাগুলো দেখে আমাদের যা মনে হচ্ছে সেটা লিখে ফেলি। তারপর তিনটে লেখা মিলিয়ে দেখা যাবে।

ইচামকে একটা পেন্সিল দিলাম, সে লিখতে শুরু করল। তার লেখা হয়ে গেলে পেন্সিলটা সে আমাকে ফিরিয়ে দিল। আমি লেখা শেষ করলাম।

তিনটে লেখা পড়—নিজের লেখাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ভ্যান রিটেন বলল।

ভ্যান রিটেন লিখেছে ঃ বুড়ো বালুন্ডা রোজা।

ইচাম লিখেছে, বুড়ো মং-বাটু রোজা।

আর আমি লিখেছি ঃ বুড়ো কাটোংগো যাদুকর।

দেখেছ! ভ্যান রিটেন উত্তেজিত হয়ে বলল, পিগমিদের সঙ্গে এই মাথাগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

আমিও ভেবেছিলাম—ইচাম বলল।

অথচ তুমি বলছ এগুলো স্টোনের কাছে আগে ছিল না?

না। এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। ইচাম জোরের সঙ্গে বলল।

ব্যাপারটা নিয়ে তাহলে একটু খোঁজ করা দরকার, ভ্যান রিটেন বলল, চল, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আর সবার আগে আমি স্টোনকে বাঁচাবার চেষ্টা করব।

সে হাত বাড়িয়ে ধরতেই প্রচণ্ড আবেগে ইচাম তার হাতে হাত মেলাল। ইচামের চোখে মুখে তখন শুধুই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে।

একমাত্র উৎকণ্ঠার ঘোরেই হয়তো ইচাম পাঁচ দিনে আমাদের তাঁবুতে এসে পৌঁছতে পেরেছিল, কারণ ফেরার সময় চেনা পথ হওয়া সত্ত্বেও এবং আমাদের দলের সাহায্য পেয়েও তার একই রাস্তা পেরোতে আট দিন সময় লাগল।

দেখলাম, স্টোনকে বেশ যত্ন-আত্তির মধ্যেই রাখা হয়েছে। ইচামের নির্দেশে উঁচু জারিবা কাঁটাগাছ দিয়ে কুঁড়েঘরগুলো ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কুঁড়েঘরগুলো বেশ শক্ত পোক্ত ভাবে তৈরি, মাথার ওপর খড়ের ছাউনি দেওয়া। আর স্টোনের ঘরটা যতখানি ভালো ভাবে করা সম্ভব ততখানি যত্ন নিয়েই তৈরি করা হয়েছে। হামিদ বুরগাশ একাই মং-বাটু দলটাকে ধরে রেখেছে, একটা লোকও দল ছেড়ে পালায়নি, এবং তার নির্দেশে নিয়ম শৃঙ্খলা দিব্যি মেনে চলছে। এ ছাড়া সে একজন করিৎকর্মা পরিবেষক ও বিশ্বাসী ভৃত্য।

স্টোন একটা ক্যাম্বিশের খাটে শুয়ে ছিল, খাটের পাশেই একটা খাটো ক্যাম্বিশের টেবিল। তার ওপরে একটা জলের বোতল, কয়েকটা ওষুধের শিশি, স্টোনের হাতঘড়ি ও খাপে ভরা ক্ষুর।

স্টোনকে দেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সবল বলেই মনে হল, কিন্তু সে যেন অন্য কোন জগতে রয়েছে, অচেতন, এক ঘোরের মাঝে ডুবে রয়েছে। আমরা যে ঘরে ঢুকেছি, তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি, সেটা যেন সে দেখতেই পাচ্ছে না। স্টোনকে দেখা মাত্রই আমি চিনতে পারলাম। অবশ্য ওর তারুণ্যের তেজ ও সৌন্দর্য কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু মাথার সোনালি ঢেউ খেলানো চুল এখনও সুপ্রচুর, চোয়ালের রেখার দৃঢ়তার ছাপ, মুখে অসুস্থতা জনিত কয়েক দিনের সোনালি দাড়ি। স্টোনের চোখের তারা ঘোলাটে, আর মুখ থেকে প্রলাপের যে সব টুকরো শোনা যাচ্ছে তা নিতান্তই অর্থহীন শব্দাংশ মাত্র।

স্টোনের গায়ের চাদর সরাতে ও ব্যান্ডেজ খুলতে ভ্যান রিটেনকে সাহায্য করল ইচাম। ভ্যান রিটেন এবারে ভালো করে তাকে দেখল। বহুদিন শয্যাশায়ী কোন মানুষের তুলনায় স্টোনের স্বাস্থ্য বেশ ভালোই মনে হয়। হাঁটু, কাঁধ ও বুক ছাড়া শরীরের আর কোথাও কোন ক্ষতের দাগ নজরে পড়ল না। দু-হাঁটুতে ও হাঁঠুর ঠিক ওপরে অসংখ্য বৃত্তাকার শুকনো ক্ষতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক কাঁধের কাছেও একই ধরনের অজস্র ক্ষতচিহ্ন। দু-তিনটে ক্ষত দেখে মনে হল সদ্য সদ্য করা হয়েছে, আর চার-পাঁচটা ক্ষত এখনও ভালো

করে সেরে ওঠেনি। বুকের দু-পাশের পেশীর ওপর দু-দুটো টাটকা ফোঁড়া দেখা গেল। বাঁদিকেরটা ডানদিকের চেয়ে একটু ওপরে ও শরীরের পাশ ঘেঁষে বেড়ে উঠেছে।

না, জিনিসগুলো ঠিক ফোঁড়া বা কার্বাঙ্কল নয়, তবে কোন শক্ত ভোঁতা পিণ্ড যেন স্টোনের স্বাস্থ্যমণ্ডিত মাংস ও চামড়া ভেদ করে মাথা তুলেছে।

এ দুটো এখন কাটব না—ভ্যান রিটেনর বলল, ইচামও সায় দিল তার কথায়।

স্টোনকে আবার পরিপাটি করে ঢাকা দেওয়া হল।

সূর্যাস্তের ঠিক আগে ওকে আমরা আবার দেখলাম। সে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে। বুকের ছাতি বিশাল ও শক্তিশালী, কিন্তু সেই ঘোরটা যেন এখনও কাটেনি। ইচামকে ওর কাছে রেখে আমরা পাশের কুঁড়েঘরে গেলাম রাত কাটাতে। জঙ্গলের যে নৈশ গুঞ্জন কানে এল তা গত কয়েক মাসে শোনা শব্দের চেয়ে কিছু নতুন নয়, এবং খুব তাড়াতাড়িই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘন জমাট অন্ধকারে হঠাৎই আবিষ্কার করলাম আমি জেগে রয়েছি এবং কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছি। দুটো কণ্ঠস্বর আমার কানে এল, একটা স্টোনের অন্যটা শ্বাসটানা হিসহসে স্বর। প্রথম স্বরটা স্টোনের বলে চিনতে পারলেও দ্বিতীয় স্বরটা আমার অচেনা। সেই স্বরের শক্তি সদ্যোজাত কোন শিশুর কান্নার শব্দের চেয়েও অনেক কম, কিন্তু তার মধ্যে দূর দূরান্তে পৌঁছে যাবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। কান পেতে আছি, শুনতে পেলাম অন্ধকারে ভ্যান রিটেনের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। একটু পরে সেও বুঝতে পারল আমি জেগে রয়েছি, শুনছি। ইচামের মতো আমিও বালুণ্ডা ভাষা খুব অল্প স্বল্পই জানি, কিন্তু তবুও দু-একটা শব্দ বেশ বুঝতে পারলাম। ক্ষণস্থায়ী নীরবতায় যতিচিহ্নিত কথোপকথন শুনতে লাগলাম একমনে।

তারপর হঠাৎই দুটো গলা একসঙ্গে দ্রুত শোনা গেল, স্টোনের গম্ভীর মেজাজী স্বর, যেন সে সম্পূর্ণ সুস্থ, আর সেই তীক্ষ্ণ হিসহিসে কণ্ঠ, দুজনেই একসঙ্গে তাড়াহুড়ো করে কথা বলছে—দুটো মানুষ ঝগড়া করছে।

আমি আর পারছি না—বলল ভ্যান রিটেন, চল, গিয়ে দেখি।

তার কাছে একটা চোখাকৃতি বৈদ্যুতিক নৈশ-বাতি ছিল। ভ্যান রিটেন সেটা হাঁতড়ে বের করল এবং বোতাম টিপে আমাকে সঙ্গে আসতে বলল। কুঁড়েঘরের বাইরে বেরিয়ে সে আমাকে চুপচাপ দাঁড়াতে ইশারা করল, সহজ প্রবৃত্তি বশে আলোটা নিভিয়ে দিল, যেন আলো জ্বালাতে ওর শুনতে অসুবিধে হচ্ছে।

বেয়ারাদের জ্বালানো ধুনীর হালকা আলো ছাড়া আমরা মোটামুটি অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে। গাছের পাতার গোলকধাঁধা ভেদ করে তারা আলো অতিকষ্টে ঠিকরে এসে পড়ছে, শোনা যাচ্ছে বহতা নদীর অস্ফুট ছলছল শব্দ। দুটো স্বর একই সঙ্গে আমরা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু হঠাৎই তীক্ষ্ণ হিসহিসে স্বরটা পালটে গেল এক ক্ষুরধার চেরা শিসের শব্দে। স্টোনের অনুযোগের খাপছাড়া কথার মাঝেই পথ কেটে নিয়ে সেই শিস নির্লজ্জ বিদ্রোহী ঢঙে পা ফেলে যেন এগিয়ে চলেছে।

ওঃ ভগবান। ভ্যান রিটেন অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল।

হঠাৎই সে আলোটা নিভিয়ে দিল।

ইচামকে আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করলরাম। স্বাভাবিক, কারণ এত দিনের দায়িত্বের বোঝা আজ ভ্যান রিটেনের কাঁধে তুলে দিতে পেরে সে এই মুহূর্তে দীর্ঘদিনব্যাপী দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির শিকার হয়ে নিজেকে গভীর অচেতনতার হাতে সঁপে দিয়েছে।

শিষের শব্দ এখন থেমে গেছে, এবং দুটো স্বর আবার একসঙ্গে শোনা যাচ্ছে। দুটো স্বরই ভেসে আসছে স্টোনের খাট থেকে। কেন্দ্রীভূত উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, স্টোন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, শুধু তার হাত দুটো এখন মাথার ওপর দিকে রাখা এবং গায়ের চাদর তুলে বুকের ব্যান্ডেজটা সে ছিঁড়ে ফেলেছে।

তার ডান বুকের ফোলা পিণ্ডটা ফেটে যাচ্ছে। ভ্যান রিটেন সেটা লক্ষ্য করে আলো ফেলতেই আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম—তার গায়ের মাংস ফুঁড়ে একটা মাথা বেরিয়ে এসেছে। মাথাটা ইচামের দেখানো শুকনো

নমুনার মতো, যেন লিলিপুট সাইজের কোন বালুণ্ডা রোজার মাথা। রঙ কুচকুচে কালো, আলো পড়ে চকচক করছে, ক্ষুদে ক্ষুদে পাপী চোখ দুটোর সাদা অংশ ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। নিগ্রোদের মতো পুরু লাল ঠোঁট জোড়া দেখলেই ঘেন্না হয়, সেই ঠোঁট সরে গিয়ে চোখে পড়ছে ছোট ছোট ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি। কালো মাথাটার ছোট্ট খুলির ওপর থোকা থোকা আঁশের মতো চুল। ওইটুকু মুখে নিখুঁত ভাবেই সমস্ত কিছু আমাদের নজরে পড়ল। চরম বিদ্বেষে মাথাটা এপাশ-ওপাশে ঘুরছে এবং সেই অদ্ভুত কৃত্রিম হিসহিসে স্বরে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। স্টোন তারই মাঝে বাধা দিয়ে অধস্ফুটভাবে নানান প্রলাপ বকছে।

স্টোনের দিক থেকে ফিরে ইচামকে অনেক কষ্টে জাগিয়ে তুলল ভ্যান রিটেন। জেগে উঠে সব দেখে শুনে ইচাম হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

তুমি ওকে দুটো ফোঁড়া কেটে ফেলতে দেখেছ? ভ্যান রিটেন জিগ্যেস করল।

কোন রকমে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ইচাম।

তাতে কি খুব রক্ত বেরিয়েছিল? ভ্যান রিটেনের স্বর উৎকণ্ঠিত।

না, খুব অল্প—ইচাম উত্তর দিল।

ওর হাত দুটো চেপে ধর—ইচামকে নির্দেশ দিল ভ্যান রিটেন।

স্টোনের ক্ষুরটা তুলে নিয়ে হাতের আলোটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। স্টোনকে দেখে মনে হল না, সে আলো দেখতে পাচ্ছে বা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে। কিন্তু সেই ছোট্ট মাথাটা অস্থিরভাবে আমাদের লক্ষ্য করে চিৎকার করতে লাগল।

ভ্যান রিটেন-এর হাত অটল স্থির, এবং সে ক্ষুরের আঘাত করল নিশ্চিত অথচ ধীর শান্ত ভঙ্গীতে। আশ্চর্য রকম অল্প রক্তপাত হল স্টোনের শরীর থেকে। তখন ভ্যান রিটেন সাধারণ ক্ষতের মতো করে সেখানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

যে মুহূর্তে আঁচিলের মতো কালো মাথাটা কেটে ফেলা হল সেই মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে গেল স্টোনের প্রলাপ। স্টোনের সবরকম পরিচর্যা সেরে আমার হাত থেকে আলোটা প্রায় ছিনিয়েই নিল ভ্যান রিটেন। তারপর একটা পিস্তল বের করে খাটের আশেপাশে মেঝেটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল, ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় পিস্তলের বাঁটটা দু-একবার মেঝেতে ঠুকল।

আমরা ফিরে এলাম আমাদের কুঁড়েঘরে, কিন্তু সে রাতে আর ঘুমোতে পেরেছি কিনা সন্দেহ আছে।

পরদিন দুপুর নাগাদ প্রকাশ্য দিনের আলোর স্টোনের ঘর থেকে আমরা আবার দুটো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ইচামকে তার প্রহরার জাগয়ায় ঘুমন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। স্টোনের বুকের বাঁদিকের ফোঁড়াটা এবার ফেঁটে গেছে, এবং অবিকল আর একটা আবলুষ কাঠের মতো চকচকে কালো মাথা সেখানে দেখা দিয়েছে। মাথাটা চঞ্চলভাবে ছটফট করছে আর মিহি গলায় অবিরাম বকবক করছে। সেই মিহি কথার স্রোতকে বাধা দিয়ে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে স্টোনের ভারী কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করা প্রলাপের অংশ। ইচাম ঘুম ভেঙে উঠল, এবং আমরা তিনজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে সব দেখতে লাগলাম।

ভ্যান রিটেন স্টোনের ক্ষুরটা তুলে নিয়ে খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। পুঁচকে মাথাটা তাকে লক্ষ্য করে হিসহিসে তীব্র স্বরে খিঁচিয়ে উঠতে লাগল।

তখনই হঠাৎই স্টোন বলে উঠল, আমার ক্ষুর হাতে...কে তুমি?

চমকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল ভ্যান রিটেন।

এখন স্টোনের চোখ অনেক উজ্জ্বল, অনেক পরিষ্কার। সে এখন কুঁড়েঘরের চারদিকে চঞ্চল চোখে তাকাচ্ছে।

সব শেষ—সে বলল, সব শেষ হয়ে এসেছে—আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি। ইচামকে যেন সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সিঙ্গলটন! ওঃ সিঙ্গলটন! আমার ছোটবেলার সব প্রেতাত্মারা আজ আমার মৃত্যু দেখতে

এসেছে! আর তুমি, অচেনা প্রেতচ্ছায়া...কালো দাড়ি, হাতে আমার ক্ষুর! ওঃ, ভগবান!

আমি ভূত নই, স্টোন, আমি বললাম, আমি বেঁচে আছি। ইচাম আর ভ্যান রিটেনও সত্যিকারের বেঁচে আছে। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।

ভ্যান রিটেন! অবাক বিস্ময়ে সে বলে উঠল, যাক, আমার অসমাপ্ত কাজ তাহলে সুযোগ্য হাতেই পড়বে। ভাগ্য তোমার সহায় হোক, ভ্যান রিটেন।

ভ্যান রিটেন তার আরও কাছে এগিয়ে গেল।

এক মিনিট একটু নাড়াচাড়া বন্ধ কর দেখি—প্রবোধ দেখার সুরে সে বলল, চিমটি কাটার মতো সামান্য ব্যথা লাগবে মাত্র।

এ রকম অনেক চিমটি কাটার ব্যথা আমি সহ্য করেছি, পরিষ্কার স্বরে উত্তর দিল স্টোন, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। নিশ্চিন্তে মরতে দাও। সর্পদানবা হাইড্রাও এর কাছে কিচ্ছু না। তুমি বড়জোর দশটা, একশোটা, হাজারটা মাথা কেটে ফেলতে পারো, কিন্তু অভিশাপ তো আর কেটে ফেলতে বা তুলে নিতে পারবে না! যা প্রতিটি হাড়ের মজ্জায় ঢুকে গেছে তা কি মাংস কেটে বের করা যাবে? আমাকে নিয়ে আর কাটা-ছেঁড়া করবে না, কথা দাও—

তার স্বরে ছেলেবেলাকার সেই আদেশের সুর এবং এই সুর সবাইয়ের মতো ভ্যান রিটেনকেও বিচলিত করল।

কথা দিলাম—ভ্যান রিটেন বলল।

এই শব্দ দুটো উচ্চারণ করা মাত্র স্টোনের চোখ আবার ঝাপসা হয়ে এল।

তাকে ঘিরে আমরা তিনজনে বসে রইলাম, দেখতে লাগলাম, সেই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত ক্ষুরে দানবটা কি ভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে স্টোনের মাংস ভেদ করে। এক সময় দুটো সরু সরু বীভৎস কালো হাত বেরিয়ে এল বাইরে। তাতে ছোট ছোট ফুটকির মতো নখের আকৃতি পর্যন্ত নিখুঁত, আর হাতের চেটোর গোলাপী রঙ কি ভয়ংকর রকম স্বাভাবিক। হাত-দুটো এলোপাথাড়ি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে গেল স্টোনের চিবুকের কাছে। টান মারল স্টোনের সোনালি দাড়িতে।

আমি আর সইতে পারছি না—চিৎকার করে উঠল ভ্যান রিটেন, এবং ক্ষুরটা আবার তুলে নিল হাতে।

সেই মুহূর্তে স্টোনের চোখ খুলে গেল, কঠিন দৃষ্টিতে যেন আগুন জ্বলছে।

ভ্যান রিটেন তার কথার খেলাপ করবে? স্পষ্টভাবে বলল সে, কক্ষনো না!

কিন্তু তোমাকে যে বাঁচাতেই হবে—রুদ্ধ কণ্ঠে ভ্যান রিটেন বলল।

আমাকে আর বাঁচানোর প্রশ্ন ওঠে না। আমার সব দুঃখ কষ্ট এখন শেষ হতে চলেছে—স্টোন বলল, আমার সময় এসে গেছে। এই অভিশাপ আমাকে বাইরে থেকে দেওয়া হয়নি, এ অভিশাপ জন্ম নিয়েছে আমার শরীরের ভেতর থেকে—যেমন এই ভয়ংকর ক্ষুদে মানুষটা। আমি এবার চলি—

তার চোখ বুজে এল, আমরা অসহায় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলাম, কালো কুচকুচে ক্ষুদে মানুষটা তীক্ষ্ণ স্বরে তখনও রাশি রাশি কথা ছুড়ে দিচ্ছে।

মুহূর্ত কয়েক পরেই স্টোন আবার কথা বলল, সব রকম ভাষা তুমি জানো? তার গলার স্বর এখন আরও ভারী হয়ে এসেছে।

আর হঠাৎই সেই ক্রমে-বেরিয়ে আসা লিলিপুট দানব ইংবেজি ভাষায় উত্তর দিল, হ্যাঁ, সব রকম জানি বটে, বাবু—তার ছোট্ট জিভ বেরিয়ে এল বাইরে, ঠোঁট কেঁপে উঠল, মাথা নাড়তে লাগল এপাশ ওপাশ। স্পষ্ট দেখতে পেলাম অদ্ভুত প্রাণীটার পাঁজরগুলো ওঠানামা করছে—যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের ছন্দে কাঁপছে।

ও কি আমাকে ক্ষমা করেছে? চাপা রুদ্ধ কণ্ঠে জিগ্যেস করল স্টোন।

যদ্দিন দেওদারু গাছের পাতায় শ্যাওলা দুলবেক, তদ্দিন লয়—মাথা চিঁ চিঁ করে বলল, যদ্দিন পঁচারট্রেন হ্রদের ওপর তারা ঝিলিক মারবেক, তদ্দিন লয়।

আর তক্ষুনি স্টোন এক ঝটকায় কাৎ হয়ে গেল একপাশে। পরমুহূর্তেই সে মারা গেল।

সিঙ্গলটনের কণ্ঠস্বর থামতেই সারা ঘরে কিছুক্ষণের জন্য নেমে এল নিথর নিস্তব্ধতা। আমরা পরস্পরের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। টুম্বলি বোকার মতো সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল, তুমি নিশ্চয়ই সেই লিলিপুট প্রাণীটাকে কেটে অ্যালকোহলে ডুবিয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছ?

সিঙ্গলটন কঠোর অভিব্যক্তি নিয়ে তার দিকে ফিরে তাকাল।—স্টোনকে আর কোন রকম কাটাছেঁড়া না করেই আমরা কবর দিয়েছিলাম। সে বলল।

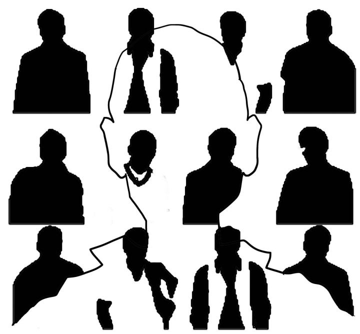
কিন্তু—বিচারবুদ্ধি হীন টুম্বলি বলে উঠল, গোটা ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য।

সিঙ্গলটনের মুখের পেশী কঠিন হল।

আমি আশা করিনি তুমি এ কাহিনী বিশ্বাস করবে, সে বলল, কারণ প্রথমেই তো ভাই বলে নিয়েছি, নিজের চোখে দেখেও, কানে শুনেও ওই ঘটনার কথা আবার যখন ভাবি, তখন নিজেই আর বিশ্বাস করতে পারি না।

মি

এক্স-প্রাইভেট এক্স



‘না,’বিষণ্ণ হেসে জ্যাকসন বলল, ‘দুঃখিত। আমি তোমাদের খেলা নষ্ট করতে চাই না। শুধু শুধু না খেলে আর লাভ কি? কারণ আমাকে বাদি দিয়েও তোমাদের অনেক লোক থাকবে খেলবার জন্যে, কিন্তু লুকোচুরি আমি মরে গেলেও খেলব না।’

সময়টা বড়দিনের আগের রাত, তারুণ্যের যথাযথ উচ্ছ্বাস নিয়ে আমরা চোদ্দজনের দল উপস্থিত। রাতের খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালোই হয়েছে, এখন ছেলেমানুষী খেলার মরসুম, আর আমাদের মেজাজও সে সব খেলা খেলতে কোমর বেঁধে তৈরি। রাজি আমাদের সবাই, শুধু জ্যাকসন বাদে। যখন কেউ এমন লুকোচুরি খেলার কথা প্রস্তাব করল, তখন একবাক্যে সকলেই হই-হই করে সমর্থন জানিয়েছে। একমাত্র তার কথাতেই ভিন্ন সুর বেজে উঠেছে।

খেলাধুলো বা হুল্লোড় ভণ্ডুল করে দেওয়াটা জ্যাকসনের স্বভাব নয়। কে একজন জিগ্যেস করল, তার শরীর খারাপ লাগছে কিনা।

‘না, শরীর ঠিক আছে। তবে—’ ছোট্ট হাসি হেসে তার সরাসরি প্রত্যাখ্যানকে সামান্য মোলায়েম করল জ্যাকসন, ‘লুকোচুরি খেলার মধ্যে আমি নেই।’

একজন জিগ্যেস করল, কেন। উত্তর দেবার আগে একটু ইতস্তত করল সে।

‘মাঝে মাঝে একজনের বাড়িতে আমি বেড়াতে যাই, গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আসি। সেই বাড়িতে অন্ধকারে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে একবার একটি মেয়ে মারা যায়। মেয়েটা বাড়ির আনাচ-কানাচ ভালো করে চিনত না। সেখানে চাকর-বাকরদের যাতায়াতের জন্য দরজা দেওয়া একটা সিঁড়ি ছিল। ফলে ওকে কেউ তাড়া করতেই ও দরজাটা খুলে একলাফে ভেতরে ঢুকে পড়ে এই ভেবে, যে এটা কোন শোবার ঘর-টর হবে, এবং সিঁড়ির নীচে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে মেয়েটা মারা যায়।’

আমাদের চোখে মুখে কৌতূহলের ছায়া নেমে এল। মিসেস ফার্ণলি বলে উঠলেন, ‘কী সাংঘাতিক! যখন এটা হয় তখন আপনি সেখানে ছিলেন?’

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল জ্যাকসন।

‘না’, সে বলল, ‘তবে অন্য একটা ঘটনার সময় আমি সেখানে ছিলাম। সেটা আরো সাংঘাতিক।’ কথা শেষ করতে গিয়ে স্পষ্ট শিউরে উঠল সে। তারপরই জ্যাকসন প্রসঙ্গের পরিবর্তন করল, ‘জানি না, তোমাদের

কেউ কখনও ''মি'' নামে একটা খেলা খেলেছ কিনা। এটা সাদামাটা লুকোচুরি খেলার এক চমৎকার উন্নত বুদ্ধিদীপ্ত রূপ। খেলাটার নাম তৈরি হয়েছে ''আমি'' শব্দটার সংক্ষিপ্ত চেহারা থেকে—''মি''। লুকোচুরি জাতীয় খেলা খেলতে গেলে এই খেলাই ভালো। এসো, তোমাদের নিয়ম কানুনগুলো বলে দিই—'

'প্রত্যেক খেলোয়াড়কে প্রথমে একটা করে ছোট্ট কাগজের চিরকুট দেওয়া হবে। তার মধ্যে একটা কাগজ ছাড়া বাকি সবগুলোই সাদা। এবং সেই একটা কাগজে ''মি'' শব্দটা লেখা আছে। এই কাগজটা যে পাবে, সে-ই হল ''মি''—এবং ''মি'' যে কে হল, সেটা ''মি'' নিজে ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। এবার সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে, তারপর ''মি'' চুপিচুপি ঘর থেকে সরে পড়বে কোথাও লুকিয়ে পড়ার জন্যে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাকি খেলোয়াড়রা বেরিয়ে পড়বে তার খোঁজে, কিন্তু সত্যি সত্যি যে তারা কাকে খুঁজছে, তা তারা নিজেরাই জানে না। একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে আর একজনের দেখা হলেই সে ''মি'' শব্দটা চেঁচিয়ে বলে তাকে চ্যালেঞ্জ করবে, এবং তখন অন্য খেলোয়াড়টি, যদি সে সত্যিই ''মি'' না হয় তাহলে ''মি'' বলেই উত্তর দেবে।

'আসল ''মি'' কিন্তু এভাবে চ্যালেঞ্জ করলে কোন উত্তর দেবে না। চুপ করে থাকবে। তখন দ্বিতীয় খেলোয়াড়টি ''মি''-এর পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়বে। এবার ওদের দুজনকে আবিষ্কার করবে কোন তৃতীয় খেলোয়াড়, চ্যালেঞ্জ করবে, এবং কোন উত্তর না পেয়ে চুপচাপ ওদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়বে। এই ভাবে খেলোয়াড়দের সারি ক্রমশ লম্বা হবে, এবং সবচেয়ে শেষে যে এসে হাজির হবে তাকে যা হোক কিছু খেসারত দিতে হবে। এ এক হই-চই করা প্রচণ্ড হুল্লোড়ের খেলা। তোমার খেলে দেখতে পারো—'

আমি মন্তব্য করলাম যে খেলাটা খুব চমৎকার, এবং জানতে চাইলাম, জ্যাকসন নিজে কখনও এ খেলা খেলেছে কি না।

'হ্যাঁ, খেলেছি'। সে উত্তর দিল, 'যে বাড়িটার কথা বলছিলাম, সেই বাড়িতে।'

'আর ওই মেয়েটা সেখানে ছিল? ওই যে, যে মেয়েটা ঘাড় মটকে—'

জ্যাকসন কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল।

'জানি না, মেয়েটা সেখানে ছিল কি ছিল না। হয়তো ছিল। কারণ আমি জানি সেদিন আমরা মোট তেরোজন ছিলাম, যেখানে মাত্র বারোজন থাকার কথা। শপথ করে বলতে পারি, ওর নাম আমি জানতাম না, নইলে অন্ধকারে ওই ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শোনার পর আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যেতাম। না, ও খেলা আমি কিছুতেই আর খেলছি না...'

আমাদের আমন্ত্রক, টিম ভাউস, চারপাশে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসল। যে হাসির অর্থ খুব ধীরে এক চোখ টিপে আরও নোংরা ভাবে প্রকাশ করা যায়।

'নাও, গল্প শোনার জন্যে তৈরি হও,' সে ঘোষণা করল।

'গল্প সত্যিই একটা আছে, তবে সেটা শোনাব কি শোনাব না নির্ভর করছে...'

কথা থামিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকসন।

'না, খেলার জন্য খেসারত তো তোমাকে এমনিতেই দিতে হবে, 'টিম বলল, 'সুতরাং আগেভাগেই সেটা দিয়ে দাও। তোমাকে এখানে এই মুহূর্তে সেই গল্পটা শোনানোর দণ্ড দেওয়া হল।'

শুরু হল জ্যাকসনের গল্প...

তোমাদের কারো কারো হয়তো স্যাংস্টনদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মানে, ক্রিস্টোফার স্যাংস্টন ও তার স্ত্রী। ওরা আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হয়, অন্তত ভায়োলেট স্যাংস্টন তো বটেই। বছর আষ্টেক আগে উত্তর ও দক্ষিণ ডাউন্স-এর মাঝামাঝি, সারে ও সাসেক্স-এর সীমান্তের ওরা একটা বাড়ি কেনে, এবং পাঁচ বছর আগে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল ওদের সঙ্গে থেকে বড়দিনটা কাটিয়ে আসার জন্যে।

বাড়িটা বেশ পুরোনো, কোন্ যুগের তা সঠিক বলতে পারব না, এবং 'এলোমেলা' এই বিশেষণটা সেটার চরিত্রে স্পষ্ট খাপ খেয়ে যায়। বাড়িটা যে খুব বড় ছিল তা নয়, কিন্তু ওটার যে মূল নির্মাতা সে জায়গা বাঁচানোর দিকে মনোযোগ দেয়নি, প্রথম প্রথম যে কেউই চট করে সেখানে পথ হারিয়ে ফেলবে।

যাই হোক, বড়দিন তো কাটাতে গেলাম। ভায়োলেট চিঠিতে আশ্বাস দিয়েছিল যে আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের প্রায় সকলেই আমার পরিচিত, আর যে দু-একজন নতুন, তারা এক কথায় 'দারুণ'। অন্যান্য সকলে দু-দিন আগে পৌঁছলেও দুর্ভাগ্যবশত কাজের চাপে আমি পৌঁছলাম একদিনে দেরিতে—বড়দিনের আগের দিন প্রায় নৈশভোজের সময়ে। সকলে তখন পোশাক-আশাক পরতে ব্যস্ত। সুতরাং আমি সোজা চলে গেলাম নিজের ঘরে তৈরি হয়ে নিতে। শত তাড়াতাড়ি সত্ত্বেও আমি নেমে এলাম সবার শেষে, সকলে তখন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। বসবার ঘরে পা রাখা মাত্রই নৈশভোজ ঘোষণা করা হল। কোন রকমে তাড়াহুড়ো করে পরিচিত সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের কাজটুকু সেরে নিলাম, এবং অপরিচিত দু-তিনজনের সঙ্গে পরিচয়ের পালা শেষ করলাম। তারপর আমার হাত এগিয়ে দিতে হল মিসেস গরম্যানের দিকে।

এত কথা বলার কারণ একটাই ঃ ওই ব্যস্ততার মধ্যে নতুন আলাপ হওয়া একটি দীর্ঘাঙ্গী তামাটে চেহারার সুন্দরী মেয়ের নাম আমি ঠিক খেলায় করতে পারিনি। সব কিছুই যেন তাড়াহুড়ো করে হতে লাগল, আর আমি ববরাবরই লোকের নাম-ধাম মনে রাখার ব্যাপারে দারুণ পণ্ডিত। মেয়েটির অভিব্যক্তি শীতল, চতুর, যেন সাবধান করে দিচ্ছে। যে সব মেয়েদের দেখে মনে হয় পুরুষ সম্পর্কে সব জানে, এ মেয়ে সেই জাতের, এবং সেই কারণেই পুরুষরা ওদের চোখে অপ্রিয়। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে বেশ আগ্রহই জাগে, এবং আমারও যে কৌতূহল হল না তা নয়। কে মেয়েটি? কাউকে সেকথা জিগ্যেস করলাম না কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম, খুব শিগগিরই কেউ না কেউ ওকে নাম ধরে ডাকবে।

দুর্ভাগ্যবশত ওর কাছ থেকে অনেকটা দূরেই আমাকে টেবিলে বসতে হল, এবং যেহেতু মিসেস গরম্যান সে রাতে চমৎকার খোশমেজাজে ছিলেন সেহেতু মেয়েটির পরিচয় নিয়ে দুশ্চিন্তা খুব শিগগিরই আমি ভুলে গেলাম।

স্যাংস্টনদের নিয়ে আমরা মোট বারোজন ছিলাম। আমাদের সকলেই তরুণ, অথবা তরুণ হতে চেষ্টা করছি। দলের মধ্যে স্যাংস্টনরাই বয়েসে সবার বড়, এবং ওদের কলেজে পড়া ছেলে রেগিই হয়তো সবচেয়ে ছোট। খাওয়া-দাওয়ার পর খেলার কথা উঠতে রেগিই 'মি' খেলার প্রস্তাব দিল। আমি যেমন তোমাদের বললাম, সেভাবে ও খেলার নিয়ম-কানুনগুলো আমাদের শিখিয়ে দিল।

ব্যাপারটা আমারা সবাই বুঝে নিতেই ওর বাবা ফোড়ন কাটল, 'এ সব খেলা খেলতে গেলে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝামাঝি যে দরজাটা আছে ওটা সম্পর্কে সাবধান থেক। বহুদিনই ভেবেছি দরজাটা খুলে নেব, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। জানা না থাকলে অন্ধকারে মনে হতে পারে যে ওটা কোন ঘরের ঢোকার দরজা। কিন্তু আসলে ওখানে রয়েছে চাকর-বাকরদের যাতায়াতের একটা খাড়া সিঁড়ি। বছর দশেক আগে একটা মেয়ে সত্যি সত্যিই ওখান থেকে পড়ে ঘাড় মটকে মারা গিয়েছিল তখন এইন্সটিরা এ বাড়িতে থাকত।

আমি জানতে চাইলাম দুর্ঘটনাটা কী ভাবে ঘটেছিল। উত্তরে স্যাংস্টন বলল যে এক বড়দিনের উৎসবে লুকোচুরি খেলার সময় দৌড়ে লুকোতে গিয়ে মেয়েটা সোজা নিচে পড়ে যায়। সবাই যখন ওকে তুলে নিয়ে আসে তখন ও মারা গেছে। আমরা নিজেদের ভালোর জন্যেই কথা দিলাম যে আমরা খুব সাবধান থাকব।

সুতরাং নৈশভোজের পালা শেষ হতেই আমাদের খেলা শুরু হল। রেগি স্যাংস্টন চারদিকে ঘুরে ফিরে নিশ্চিত হয়ে নিল যে চাকর-বাকরদের ঘর ও আমাদের জমায়েত হওয়া বসবার ঘরটা ছাড়া সারা বাড়ির প্রতিটি আলোই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাগজের টুকরো নিয়ে ছোট ছোট বারোটা পুরিয়া তৈরি করে দু-হাতের মুঠোয় সেগুলো ঝাঁকিয়ে নিল রেগি। তারপর একটা একটা করে তুলে দিল প্রত্যেকের হাতে। এর

মধ্যে এগারোটা কাগজই সাদা, এবং বারো নম্বর কাগজে ''মি'' কথাটা লেখা রয়েছে। এই লেখা কাগজটা যে পাবে তাকেই লুকোতে হবে। অতএব আমরা সেই কাগজের পুরিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার কাগজটা খুলে দেখি সেটা সাদা। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘরের সবক'টা আলো নিভে গেল এবং টের পেলাম অন্ধকারে কেউ একজন চুপিসাড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে।

মিনিটখানেক পরে একজন সংকেত করতেই আমরা ছুট লাগালাম দরজা লক্ষ্য করে। কে যে ''মি'' হয়েছে তা আমি অন্তত ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। পাঁচ-দশ মিনিট ধরে আমরা ঘরে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, দিশেহারা ভাবে শুধু ছুটোছুটি করে বেড়ালাম, আর একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করছি ও উত্তর দিচ্ছি, 'মি?—মি!'

একটু পরেই গোলমাল হুটোপুটি কমে এল এবং মনে হল, ''মি''-কে হয়তো খুঁজে পাওয়া গেছে। অবশেষে একসারি খেলোয়াড়কে খুঁজে পেলাম। চিলেকোঠায় যাবার একটা সরু সিঁড়ির ওপরে ওরা দম বন্ধ করে স্থির হয়ে বসে আছে। চ্যালঞ্জ করে নীরব উত্তর পেয়ে আমিও ঝটপট ওদের দলে যোগ দিয়ে ফেললাম, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরও দুজন দলছুট খেলোয়াড় এসে হাজির হল, শেষ খেলোয়াড় হওয়ার ভয়ে একে অপরকে দৌড়ে হারাবার চেষ্টা করছে। দুজনের একজন স্যাংস্টন, এবং স্বাভাবিক ভাবেই সে শেষ খেলোয়াড় হয়ে খেসারতের খাতায় নাম লেখাল। একটু পরেই সে চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'আমরা সবাই তো এসে গেছি, তাই না?'

স্যাংস্টন একটা দেশলাই জ্বালল, তাকাল সিঁড়ি বরাবর ওপর দিকে, এবং গুণতে শুরু করল। গুণতে খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, কারণ সিঁড়ির ধাপগুলো এক একজন দখল করলেও আমরা একটা কিংবা দুটো ধাপ ছেড়ে বসেছিলাম, ফলে আমাদের প্রত্যেকেরই মাথা দেখা যাচ্ছিল।

'...নয়, দশ, এগারো, বারো, তেরো,' সে গোণা শেষ করে জোরে হেসে উঠল, 'ধ্যুৎ, এ যে দেখছি একজন বেশি হচ্ছে!'

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যাওয়ায় সে আর একটা কাঠি জ্বালল এবং আবার গুণতে শুরু করল। বারো পর্যন্ত গুণে বিস্ময়ের এক অস্ফুট শব্দ করে উঠল স্যাংস্টন—'এখানে দেখছি তেরোজন রয়েছে!' সে অবাক হয়ে বলল, 'এবং আমি নিজেকে এখনও গুনিনি।'

'যত সব বাজে ইয়ে!' আমি হেসে বললাম, 'তুমি নিশ্চয়ই নিজেকে দিয়ে গুণতে শুরু করেছ, আর এখন নিজেকে আবার গুণতে চাইছ।'

স্যাংস্টনের ছেলের বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বলে উঠল, আরও উজ্জ্বল আরও সুস্থির এই আলোতে আমরা সকলেই গুণতে শুরু করলাম। সত্যিই আমরা আসলে বারোজন রয়েছি। স্যাংস্টন উঁচু গলায় হেসে উঠল। বলল, 'কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, আমি তেরোজনই গুণেছি।'

সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গা থেকে ভয়োলেট স্যাংস্টনের সামান্য সচকিত কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'মনে হচ্ছিল, আমার দু-ধাপ ওপরে কে যেন একজন বসে আছে। ক্যাপ্টেন র‍্যানসাম, আপনি কি ওপরের দিকে সরে গেছেন?'

র‍্যানসাম জানালেন যে না তিনি সরেননি। তিনি আরও বললেন যে তাঁরও মনে হয়েছে, তাঁর ও ভয়োলেটের মাঝে কেউ যেন বসে রয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যে অস্বস্তিকর কি যেন একটা শূন্যে ভেসে রইল, একটা শীতল তরঙ্গের রেশ যেন ছুঁয়ে গেল আমাদের। সেই ছোট্ট একটা মুহূর্তের জন্যে মনে হল, অপ্রাকৃত অদ্ভুত কিছু একটা যেন ঘটে গেছে এবং হয়তো সেটা আবারও ঘটবে। তারপর আমরা দল বেঁধে সজোরে হেসে উঠলাম, স্বস্তি ফিরে পেলাম আবার। সত্যিই আমরা মোট বারোজন রয়েছি, এবং বারোজনই যে ছিলাম যে নিয়ে তর্কের কোন অবকাশ নেই। হাসতে হাসতেই আমরা সদলবলে ফিরে গেলাম বসবার ঘরে। নতুন করে খেলা শুরু করতে।

এবার ''মি'' হলাম আমি, এবং ভালো কোন লুকোবার জায়গা খুঁজে বের করার আগেই ভায়োলেট স্যাংস্টন আমাকে ধরে ফেলল। খুব শিগগিরই সার বাঁধার পালা শেষ হল, দু-তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা বারোজন লাইন করে দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর কিছুক্ষণের বিরতি। ভায়োলেট একটা চাদর আনতে বলায় ওর স্বামী দোতলায় রওনা হল চারদরটা ওর ঘর থেকে নিয়ে আসতে। সে যেতে না যেতেই রেগি জামার আস্তিন ধরে আমাকে টান মারল। তাকিয়ে দেখি ওর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা, দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে।

'শিগগির!' রেগি ফিসফিস করে বলল, 'বাবা ফিরে আসার আগেই ধূমপানের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে এক্ষুনি ব্রাণ্ডি হুইস্কি যা হোক কিছু একটা দাও!'

ঘরের বাইরে এসে আমি জানতে চাইলাম, ব্যাপারটা কি, কিন্তু সে তখুনি কোন জবাব দিল না। ভাবলাম, আগে কিছু খাইয়ে ওকে চাঙ্গা করি, তারপর সব জিগ্যেস করব। সুতরাং ব্র্যান্ডি ও সোডা মিশিয়ে দিতেই রেগি এক ঢোকে সেটা শেষ করে হাঁফাতে লাগল, যেন এইমাত্র অনেকটা দৌড়ে এসেছে।

'আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,' আমাকে লক্ষ্য করে লাজুক হেসে বলল সে। 'কেন, কী ব্যাপার?'

'জানি না। এইবার তো তুমি ''মি'' হয়েছিলে, তাই না? যাই হোক, কে ''মি'' সে আমি জানতাম না, এবং মা অন্যান্যদের সঙ্গে বাড়ির পশ্চিম অংশে গিয়ে যখন তোমাকে খুঁজে বের করছে, তখন আমি পুব দিকে রওনা হয়েছি। আমার শোবার ঘরে জামাকাপড় রাখার এক বিশাল আলমারি আছে, ভেবেছিলাম, আমার পালা এলে ওখানে লুকাব, ফলে মনে হল, ''মি'' হয়তো ওই আলমারিতেই লুকিয়েছে। অন্ধকারে পাল্লা খুলে হাতড়াতে শুরু করলাম। কারো হাত আমার হাঠে ঠেকল। ''মি?'' আমি ফিসফিস করে জানতে চাইলাম, এবং উত্তর না পেয়ে ভাবলাম আমি হয়তো ''মি''কে খুঁজে পেয়েছি।

'জানি না কেন, তবে এটা সত্যি যে একটা শিউরে ওঠা অনুভূতি আমাকে আঁকড়ে ধরল। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, তবে মনে হল, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। সুতরাং টর্চলাইট বের করে জ্বেলে ধরলাম। দেখি কেউ নেই! কিন্তু বিশ্বাস কর, হলফ করে বলছি, কারো হাত আমার হাতে ঠেকেছে, আর সারাক্ষং তো আমি আলমারির দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাহলে আমাকে পাশ কাটিয়ে কে পারবে বাইরে বেরোতে?' সে আবার হাঁফাতে লাগল, 'তোমার কি মনে হয় বল তো?' সে জিগ্যেস সকরল।

স্বাভাবিক ভাবেই আমি বললাম, 'সব তোমার মনের ভুল।'

সে শব্দ করে খাটো হাসি হাসল। বলল,—'তুমি তো ওই কথাই বলবে—মনের ভুল, তাছাড়া আর কি?' একটু থেমে ঢোক গিলল রেগি, 'মনের ভুল ছাড়া আর কি ই বা হতে পারে, কী বলো?'

আমি ওকে সমর্থন জানিয়ে আশ্বস্ত করলাম যে ঘটনাটা নিঃসন্দেহে মনের ভুল। তারপর আমরা যখন বসবার ঘরে ফিরে এলাম তখন আর সবাই নতুন করে খেলা শুরু করবে বলে আমাদের দুজনের জন্যেই অপেক্ষা করছে।

ব্যাপারটা আমার কল্পনা কিনা জানি না, তবে মনে হল, ''মি'' খেলার প্রতি সব রকম আগ্রহ ও উৎসাহ যেন সবার মন থেকে মিলিয়ে গেছে। যদি সেই মুহূর্তে কেউ অন্য কোন খেলার প্রস্তাব দিত তাহলে বাজি রেখে বলতে পারি সকলে ''মি'' খেলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। শুধু আমি কেন, ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়ে আরো অনেকেই হয়তো বুঝতে পারছিল এ বাড়িতে কোন অশুভ প্রভাব আছে। কিন্তু কেন এ রকম মনে হল? স্যাংস্টন বারোজনের জায়গায় তেরোজনকে গুণেছে বলে? নাকি তার ছেলে খালি আলমারিতে কারো হাতের ছোঁওয়া পেয়েছে বলে? না, এ সব ছাড়াও আরও কিছু একটা আছে? যাই হোক খেলা আবার শুরু হল, এবং আমরা অজ্ঞাত ''মি''কে ধাওয়া করে একই রকম হই-হুল্লোড় তুলে ছুটোছুটি আরম্ভ করলাম। কিন্তু মনে হল, আমাদের মধ্যে অনেকেই যেন অভিনয় করছে। খেলার আনন্দ কমে যাওয়ার কারণ শুধুই সেই অপ্রাকৃত অনুভূতি। কেন জানি না, মনে হল, সবার সঙ্গে মিশে ''মি''কে খোঁজাখুঁজির পালা শুরু করি, কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই খেলা জেতার প্রবল ইচ্ছেয় এবং ''মি''কে খুঁজে

পাওয়ার ব্যাপারে সর্ব প্রথম হওয়ার লোভে একই দলছুট হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এবং পশ্চিম প্রান্তে দোতলায় দেওয়াল ঘেঁষে যাওয়ার সময় একজোড়া হাঁটুর সঙ্গে আমার আচমকা সংঘর্ষ হল।

হাত বাড়াতেই একটা ভারী নরম পর্দার স্পর্শ পেলাম। তখন বুঝলাম, আমি কোথায় এসেছি। এখানে দেওয়ালে গভীর খাঁজ-কাটা লম্বা লম্বা অনেকগুলো জানালার সামনে মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে নক্সাকাটা পর্দা। এই রকমই একটা জানলার তাকে পর্দার পিছনে কোণ ঘেঁষে কেউ একজন বসে রয়েছে। হুঁ, তাহলে ''মি''কে ধরে ফেলেছি। সুতরাং পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম এবং আঙুলের স্পর্শে কোন মহিলার নগ্ন বাহু অনুভব করলাম।

বাইরের রাত অন্ধকার, এবং জানলাটা শুধু যে পর্দা দেওয়া তাই-ই নয়, ভেতরে শার্সির নীচ পর্যন্ত ঝুলছে ভেনিস দেশীয় পাখি। ফলে পর্দা ও জানালার মাঝের অন্ধকারে ছ' ইঞ্চি দূরে নিজের হাত রেখেও আমি দেখতে পাচ্ছি না, কোণে বসে থাকা মহিলাকে দেখে তো দূরের কথা!

''মি''? ফিসফিস করে জিগ্যেস করলাম।

কোন উত্তর নেই। ''মি''-কে চ্যালেঞ্জ করলে সে উত্তর দেয় না। সুতরাং ওর পাশে আমি বসে পড়লাম, দলের মধ্যে প্রথম হওয়ায় অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললাম, 'কে তুমি? তোমার নাম কী, ''মি''?'

আমার পাশের অন্ধকার থেকে ফিসফিসে উত্তর ভেসে এল, 'ব্রেণ্ডা ফোর্ড'।

নামটা আমার অচেনা, কিন্তু সেই কারণেই আরও স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারলাম মেয়েটি কে হতে পারে। সেই লম্বা শীতল অভিব্যক্তির তামাটে চেহারার মেয়েটিই এ বাড়িতে একমাত্র অতিথি যার নাম আমি জানি না। সুতরাং আমার সঙ্গিনী ও ছাড়া আর কেউ নয়। ওর সম্পর্কে আমার কি রকম ধারণা হয়েছিল ও ঠিক হুল্লোড়বাজ প্রকৃতির নয়। ফলে চাপা গলায় দু-একটা টুকিটাকি প্রশ্ন করেও ওর কাছ থেকে কোন উত্তর পেলাম না।

''মি'' চুপচাপ থাকারই খেলা। ''মি'' এবং অন্যান্য যারা তাকে খুঁজে পাবে তাদের সকলেই চুপ করে থাকার কথা যাতে বাকি খেলোয়াড়রা সহজে তাদের খুঁজে না পায়। কিন্তু এখনে তো ধারে কাছে কেউ নেই, আর ব্রেণ্ডা খেলার নিয়মকানুনগুলো বড় বেশি বেশি মেনে চলছে। আবার কথা বলেও যখন কোন উত্তর পেলাম না, তখন আমার কেমন বিরক্তি লাগল। মেয়েটি বোধ হয় ঠান্ডা, নাক উঁচু জাতের, পুরুষদের ঘৃণা করে, আমাকে ওর ভালো লাগছে না, ফলে ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে মনে মনে চাইলাম, সবাই আমাদের এক্ষুনি খুঁজে বের করে ফেলুক।

ভাবতে অবাক লাগে, খাওয়ার টেবিলে যে মেয়েটিকে প্রথম দেখে একই সঙ্গে কৌতূহল ও আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম, এখন তার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। বরং এক অদ্ভুত ঘৃণা আমার মনের অতল থেকে পাক দিয়ে উথলে উঠছে গলা পর্যন্ত। জোর দিয়ে বলতে পারি, মেয়েটির নীরবতা এ ঘৃণার কারণ নয়। অন্য কোন কিছু। ওর অঙ্গাঙ্গী উপস্থিতি আমার কাছে যেন ক্রমে বেড়ে ওঠা এক আশঙ্কার রূপ নিল। একান্ত প্রার্থনা শুরু করলাম, যাতে শিগগিরই কেউ সেখানে চলে আসে।

প্রার্থনায় সাড়া মিলল। হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। পর্দার ওপাশে কেউ আমাকে হাঁটু ছুঁয়ে গেল। তারপর ভারী পর্দা সরে গেল একপাশে এবং একটি মেয়েলি হাত অন্ধকারে দিশেহারা ভাবে ঘুরে ফিরে এসে থামল আমার কাঁধে। ফিসফিসে গলায় কেউ জিগ্যেস করল, ''মি?''

সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস গরম্যানকে চিনতে পারলাম।

স্বাভাবিক ভাবেই কোন উত্তর উনি পেলেন না। সুতরাং ভেতরে ঢুকে খসখস শব্দ তুলে আমার পাশে বসে পড়লেন। তারপর 'কে, টনি না?' চাপা গলায় উনি জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ,' আমি ফিসফিস করে উত্তর দিলাম।

'তুমি ''মি'' হয়েছ?'

'না, যে হেয়েছে সে আমার এ পাশে বসে আছে।'

আমাকে ডিঙিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন মিসেস গরম্যান। শুনতে পেলাম, তাঁর হাতের নখ একটা মেয়েলি রেশমী গাউনের ওপর আঁচড়ের শব্দ তুলল।

'কী খবর ''মি''! কেমন আছ? কে তুমি? ওহ্ হো, কথা বলার তো নিয়ম নেই, তাই না? যাকগে, টনি, ও সব নিয়ম-টিয়ম ভাল্লাগে না। জানো, এই খেলা খেলতে খেলতে আমি যেন হাঁফিয়ে উঠছি। এর চেয়ে সববাই এক জায়গায় আগুনের ধারে বসে কিছু একটা খেললে কত ভালো হয়।'

'যা বলেছেন,' সাগ্রহে সায় দিলাম আমি।

'এবারে নীচে গিয়ে অন্য কিছু একটা খেলার প্রস্তাব দাও না। এই খেলাটায় কেন জানি না গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে, এই খেলায় এমন একজন খেলোয়াড় রয়েছে যার থাকার কথা নয়।'

আমারও একই কথা মনে হচ্ছিল, কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। আমরা এ কথা সে কথায় সময় কাটাতে লাগলাম।

কতক্ষণ এই ভাবে কেটেছে জানি না, হঠাৎ কানে এল পায়ের শব্দ এবং পরক্ষণেই রেগির চিৎকার, এই যে! এখানে কেউ আছ নাকি?'

'হ্যাঁ আছি', আমি উত্তর দিলাম।

'তোমার সঙ্গে মিসেস গরম্যান আছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ, বেশ ভালো জুটি বেঁধেছে। তোমাদের দুজনকেই খেসারত দিতে হবে। তোমাদের জন্যে সেই থেকে আমরা অপেক্ষা করছি।'

'তা কেন, তোমরা তো ''মি''-কে এখনও খুঁজে পাওনি!' আমি প্রতিবাদ করলাম।

'তোমরা পাওনি বল!' রেগি পাল্টা জবাব দিল, 'কারণ এবারে আমিই ''মি'' হয়েছিলাম।'

'কিন্তু ''মি''-তো আমাদের সঙ্গে রয়েছে,' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'হ্যাঁ,' সমর্থন করলেন মিসেস গরম্যান।

পর্দা সরে গেল একপাশে, এবং পরমুহূর্তেই আমরা রেগির টর্চের চোখে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে শুরু করলাম। আমি প্রথমে মিসেস গরম্যানের দিকে তাকালাম, তারপর চোখ ফেরালাম আমার অন্য পাশে। আমার ও দেওয়ালের মাঝে জানালার তাকে রয়েছে কিছুটা শূন্য জায়গা! সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম, এবং মনে হল, না দাঁড়ালেই ভালো হত—কারণ আমার মাথা ঘুরছে, ভীষণ দুর্বল লাগছে নিজেকে। 'এই তো, এখানে একটা মেয়ে ছিল,' আমি তবু বলে উঠলাম, 'আমি ওঁকে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেছি।'

'আমিও'—মিসেস গরম্যানের কণ্ঠস্বর তার স্বাভাবিকতা হারিয়েছে।

রেগি অদ্ভুত কাঁপা গলায় হেসে উঠল। কারণ সে রাতে ওরও এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হয়েছে।

'কেউ নিশ্চয়ই মজা করে বেড়াচ্ছে,' সে মন্তব্য করল, 'নীচে আসছ তো?'

বসবার ঘরে যখন পৌঁছলাম তখন আমরা আমাদের জনপ্রিয়তা মোটামুটি হারিয়েছি। রেগি একেবারে বোকার মতো বলে ফেলেছে যে পর্দার পিছনে জানালার তাকে বসা অবস্থায় সে আমাদের আবিষ্কার করেছে। আমি লম্বা তামাটে চেহারার মেয়েটিকে দোষারোপ করলাম। ও প্রথমে ''মি'' হওয়ার ভান করে চুপি চুপি সরে পড়েছে। ও কিন্তু সে কথা অস্বীকার করল। এরপর আমরা ''মি'' খেলা ছেড়ে অন্য খেলায় মেতে উঠলাম।

কিছুক্ষণ পর ফাঁক পেয়ে স্যাংস্টন আমাকে সুরাপানের আহ্বান জানিয়ে ডেকে নিয়ে গেল ধূমপান কক্ষে। মনে হল, সে আমার প্রতি কিছুটা বিরক্ত হয়েছে, এবং সে বিরক্তির কারণ স্পষ্ট হল তার পরবর্তী কথায়।

'টনি'—গম্ভীর ভাবে শুরু করল ক্রিস্টোফার স্যাংস্টন, 'মিসেস গরম্যানের সঙ্গে পর্দার আড়ালে বসে তুমি ফস্টিনষ্টি করতে চাও কর—জোয়ান বয়েসে আমারও ও সব ভালো লাগত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সকলে মিলে খেলার মাঝে, সববাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে, ও সব করতে হবে।

'কিন্তু সত্যিই ওখানে আর একজন ছিল,' আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম, ''মি'' হওয়ার ভান করছিল। আমার ধারণা ওই লম্বা, তামাটে চেহারার মেয়েটি, মিস ফোর্ড—ওই ছিল, কিন্তু এখন ফ্যাসাদে পড়ে অস্বীকার করছে। এমনকী ও ফিসফিস করে নিজের নামটা পর্যন্ত আমাকে বলেছে।'

স্যাংস্টন অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। মনে হল, মদের গ্লাসটা এখুনি তার হাত থেকে পড়ে যাবে।

'মিস কী—কী নাম বললে?' সে চিৎকার করে জানতে চাইল।

'মিস ফোর্ড—ব্রেণ্ডা ফোর্ড। এই নামই তো বলেছে মেয়েটা—'

গ্লাসটা নামিয়ে আমার কাঁধে হাত রাখল স্যাংস্টন।

'শোন ভাই, সে বলল, 'ইয়ার্কি ঠাট্টা আমি পছন্দ করি, কিন্তু তার একটা মাত্রা আছে। বাড়ির সব মেয়েরা ভয়-টয় পেয়ে ফিট হয়ে পড়ুক তা আমি চাই না। কারণ দশ বছর আগে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে যে মেয়েটা ঘাড় মটকে মারা যায়, তারই নাম ছিল ব্রেণ্ডা ফোর্ড!'

লেভিটেশান

জোসেফ পি. ব্রেনান



অরগ্যানের বিচিত্র মেলা একরাতের জন্য এল রিভারভিলে। গ্রামের সীমান্তে যে বিশাল পার্কটা আছে সেখানে তাদের পসরা সাজিয়ে তাঁবু খাটিয়ে বসল। সময়টা অক্টোবরের শুরুর এক উষ্ণ আরামের সন্ধ্যা। ফলে সাতটা বাজতে না বাজতেই সেই হই-হুল্লোড়-আমোদ-প্রমোদের মেলায় লোকের ভিড় জমে গেল।

এই ভ্রাম্যমান মেলা শুরু খুব যে বড় বা জমকালো তা নয়, তবে রিভারভিলে এর কদর আছে। কারণ সিনেমা, থিয়েটার, খেলার মাঠ, শহুরে সবকিছুর থেকে দূরে এক পাহাড়ি এলাকায় নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই রিভারভিল।

রিভারভিলের স্থানীয় অধিবাসীরা খুব উঁচুদরের খেলা দেখতে হয়তো চায় না, সুতরাং সেই পুরোনো মোটা মেয়ে, উল্কি-কাটা মানুষ এবং বাঁদর-খোকা দেখেই তাঁরা খুশি হয়, মুগ্ধ হয়ে আলোচনা করতে থাকে নিজেদের মধ্যে। চিনেবাদাম ও মাখন দেওয়া পপ্‌কর্ণ খেতে ওরা ব্যস্ত, একই সঙ্গে কাপের পর কাপ গোলাপী লেমোনেডে চুমুক দিয়ে চলেছে, আর রঙচঙে চকলেটের গা থেকে কাগজের মোড়ক খুলতে খুলতে ওদের আঙুল চটচটে হয়ে উঠেছে।

সবাই বেশ আরামে দিলখুশ হয়ে খেলা দেখছিল, তখনই এক ম্যাজিসিয়ানের দালাল ফলাও করে চিৎকার শুরু করল। বেঁটে, মোটা, পরণে চেক কাপড়ের স্যুট, মুখে লম্বা এক চোঙ। দালালটা প্রাণপণে চেঁচালেও, ম্যাজিসিয়ান তাঁবুর সামনে তৈরি কাঠের মঞ্চের পিছনে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেমন যেন নির্বিকার, অবজ্ঞার ভাব—ভিড় করে জমায়েত হওয়া জনতার দিকে সে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ পরে যখন প্রায় জনাপঞ্চাশ লোক মঞ্চের সামনে জড়ো হয়েছে, তখন আলোয় এসে দাঁড়াল ম্যাজিসিয়ান। জনতার মধ্যে শোনা গেল চাপা গুঞ্জন।

ওপর থেকে ঠিকরে পড়া কর্কশ আলোয় ম্যাজিসিয়ানকে ভীষণ অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ক্ষয়ে আসা লম্বা রোগা চেহারা, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, এবং গর্তে বসা কুচকুচে কালো দুটো চোখ আকারে বিশাল ও ধকধক করে জ্বলছে! মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। ম্যাজিসিয়ানের গায়ে ঘন কালো স্যুট ও সেকেলে সরু টাই—সব মিলিয়ে সাক্ষাৎ শয়তানের ছাপ।

শীতল দৃষ্টিতে জনতাকে জরিপ করল সে, তার অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠল তাচ্ছিল্য এবং চাপা বিদ্বেষ। তার গমগমে স্বর সহজেই পৌঁছে গেল ভিড়ের শেষ সারি পর্যন্ত। সে বলল, আপনাদের মধ্যে থেকে যে কোন

একজনের সাহায্য আমার দরকার। যদি দয়া করে স্টেজে আসেন—

সবাই আশেপাশে তাকাতে লাগল, ঠেলতে লাগল একে অপরকে, কিন্তু মঞ্চের দিকে কেউই এগিয়ে এল না।

ম্যাজিসিয়ান কাঁধ ঝাঁকাল। ক্লান্ত কলায় সে বলল, আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ না এলে এ খেলা দেখানো সম্ভব নয়। আমি আপনাদের হলফ করে বলছি, এই খেলায় ভয়ের কিছু নেই। এ নেহাৎই নিরীহ খেলা।

প্রত্যাশা নিয়ে চারপাশে তাকাল সে, আর ঠিক তখনই জনৈক যুবক কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগল মঞ্চের দিকে। হাত বাড়িয়ে তাকে মঞ্চে উঠতে সাহায্য করল ম্যাজিসিয়ান, এবং ছেলেটিকে একটা চেয়ারে বসাল।

আরাম করে বসুন—ম্যাজিসিয়ান বলল, এক্ষুনি আপনাকে আমি হিপনোটাইজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তখন আপনাকে যা বলব আপনি তাই শুনবেন।

ছেলেটি চেয়ারে বসে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ছটফট করতে লাগল।

ম্যাজিসিয়ান তার বিশাল চোখ যুবকের চোখে স্থির রেখে তার মনোযোগ ফেরাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎই ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন রঙিন পপকর্ণের একটা বিরাট প্যাকেট ছুড়ে মারল মঞ্চের দিকে। মঞ্চের আলোর ওপর দিয়ে উড়ে এসে প্যাকেটটা থপ করে পড়ল চেয়ারে বসে থাকা যুবকের ঠিক মাথায়।

ছেলেটি চকিতে ঝাঁকুনি দিল একপাশে, আরেকটু হলেই সে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই একটু আগের নিশ্চুপ হয়ে থাকা জনতা গলা ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

ম্যাজিসিয়ান রাগে কাঁপতে লাগল। মুখ-চোখ লাল করে ভয়ংকর ক্রোধে সে তাকিয়ে রইল দর্শকদের দিকে।

কে ছুড়ল এটা? হোঁচট খাওয়া গলায় জানতে চাইল সে।

সবাই আস্তে আস্তে চুপ করে গেল।

ম্যাজিসিয়ান তখনও তাদের দিকে লাল চোখে তাকিয়ে। অনেকক্ষণ পরে তার মুখ আবার ফ্যাকাশে হল এবং বন্ধ হল শরীরের কাঁপুনি, কিন্তু তার উজ্জ্বল চোখ দুটো একই ভাবে জ্বলতে লাগল।

অবশেষে মঞ্চে বসা যুবকটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ম্যাজিসিয়ান, ছোট্ট করে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে বিদায় দিল, তারপর আবার ফিরে তাকাল দর্শকদের দিকে। মাঝপথে বাধা পড়ার জন্য খেলা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে—নিচু গলায় বলল ম্যাজিসিয়ান, আর তার জন্য নতুন কাউকে দরকার। যিনি পপকর্ণ এর প্যাকেট ছুড়ে মেরেছেন আশা করি মঞ্চে আসতে তাঁর আপত্তি নেই?

প্রায় ডজনখানেক লোক একসঙ্গে ঘুরে তাকাল ভিড়ের পিছন দিকে, আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকা জনৈকের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে পেল ম্যাজিসিয়ান, তার কালো চোখ যেন ধিকধিক জ্বলে উঠল। গম্ভীর ঠাট্টার সুরে সে বলল, এ খেলায় যিনি বাধা দিয়েছেন তিনি আসতে ভয় পাচ্ছেন। ছায়ায় লুকিয়ে পপকর্ণের ঠোঙা ছুড়তেই বোধ হয় তাঁর ভালো লাগে।

অপরাধীর ঠোঁট চিরে আকস্মিক ভাবেই বেরিয়ে এল এক অস্ফুট চিৎকার, এবং সে দু-হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগল মঞ্চের দিকে। তার চেহারায় তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। বরং প্রথম যুবকের সঙ্গে যেন অনেকটা মিল আছে। দুজনকে দেখেই সাদামাটা ক্ষেতী-মজুর বলে মনে হয়।

তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে দ্বিতীয় যুবক মঞ্চের ওপর চেয়ারে গিয়ে বসল, এবং স্পষ্টই দেখা গেল, প্রায় কয়েক মিনিট ধরে সে ম্যাজিসিয়ানের আরাম করে-বসার নির্দেশকে অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করল। তবে একটু

পরেই তার একরোখা ভাব মিলিয়ে গেল এবং অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো সে তাকিয়ে রইল তার চোখের সামনে স্থির হয়ে থাকা ম্যাজিসিয়ানের জ্বলজ্বলে দুটো চোখের দিকে।

মিনিট খানেক পরেই ম্যাজিসিয়ানের আদেশে সে উঠে দাঁড়াল এবং মঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। শোনা গেল দর্শকদের দ্রুত শ্বাস নেবার শব্দ।

এবারে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ুন—ম্যাজিসিয়ান সুর করে বলতে লাগল, ঘুমিয়ে পড়ুন ধীরে ধীরে...এই তো আপনার চোখে ঘুম নেমে আসছে...গভীর ঘুম...আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবার আপনাকে আমি যা যা আদেশ করব, সব আপনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। আমার প্রতিটি আদেশ আপনাকে শুনতেই হবে। যা বলব তাই...

একঘেয়ে সুরে জে চলল তার কথাগুলো। একই কথা সে বার বার বলতে লাগল। জনতার মুখে টুঁ শব্দটি নেই। সবাই চুপচাপ ছবির মতো দাঁড়িয়ে।

হঠাৎই ম্যাজিসিয়ানের সুর পাল্টে গেল, এবং দর্শকরা টান টান হয়ে উঠল।

উঠে দাঁড়াবেন না—আস্তে আস্তে ওপরে ভেসে উঠুন! ম্যাজিসিয়ান আদেশ দিল, ভেসে উঠুন ওপরে—! তার কালো চোখ বন্য আগুনের মতো স্বপ্রভ হয়ে জ্বলতে লাগল। দর্শকরা শিউরে উঠল।

উঠুন ওপরে—!

তখন চমকে উঠে একসঙ্গে শব্দ করে শ্বাস টানল জনতা।

মঞ্চে টান টান হয়ে শুয়ে থাকা যুবকের একটি পেশীও নড়ল না, কিন্তু সে এই অবস্থায় ভেসে উঠতে লাগল ওপরে। প্রথমটা এত ধীরে যে ঠিক বোঝাই গেল না, কিন্তু পরক্ষণেই তার গতি ক্রমে বাড়তে লাগল।

উঠুন—! গমগম করে উঠল ম্যাজিসিয়ানের কণ্ঠস্বর।

ছেলেটি ভাসতে ভাসতে ক্রমশ মঞ্চ থেকে কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল এবং তখনও তার গতি থামেনি।

দর্শকদের মনে তখন দৃঢ় বিশ্বাস যে এটা এক ধরনের ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে দেখতে লাগল। ছেলেটি যেন বাতাসে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, নিরাবলম্ব হয়ে দোল খাচ্ছে সামান্য।

হঠাৎই দর্শকদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হল, নিবদ্ধ হল অন্যজনের ওপর। ম্যাজিসিয়ান এক হাতে নিজের বুক চেপে ধরেছে, কয়েক পা টালমাটাল পায়ে এগিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মঞ্চের ওপর।

ডাক্তার ডাক্তার—সবাই চেঁচিয়ে উঠল। চেকস্যুট পরা দালাল তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল, ঝুঁকে পড়ল মঞ্চে পড়া থাকা নীরব দেহটার ওপর।

সে নাড়ী দেখল, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে দাঁড়াল। কেউ এক বোতল হুইস্কি এগিয়ে দিল তার দিকে, কিন্তু সে শুধুই কাঁধ ঝাঁকাল।

হঠাৎই জনতার ভিড় থেকে একটি মহিলা চিৎকার করে উঠল।

সবাই ফিরে তাকাল তার দিকে, এবং পরক্ষণেই মহিলাটির দৃষ্টি অনুসরণ করে তারা ওপরে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে আরও চিৎকার শোনা গেল—কারণ ম্যাজিসিয়ানের ঘুম পাড়ানো ছেলেটি তখনও পরে উঠে চলেছে! সবাই যখন মরণাপন্ন ম্যাজিসিয়ানের দিকে তাকিয়ে ছিল, তখনও তার গতি থামেনি! এখন মঞ্চ থেকে সে সাত ফুট ওপরে এবং অবাধে ভেসে চলেছে। ম্যাজিসিয়ান মরে যাবার পরও সে তার শেষ আদেশ—'উঠুন!' অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে!

ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দিয়ে দালালটা পাগলের মতো লাফ দিল ওপর দিকে, কিন্তু বেঁটে হওয়া তার হাত পৌঁছল না। শূন্যে ভেসে চলা শরীরটাকে তার আঙুল কোন রকমে স্পর্শ করল মাত্র, তারপরই সে বিকট শব্দে পড়ে গেল মঞ্চের ওপর।

যেন কোন অদৃশ্য দড়ির টানে ছেলেটি কাপ হয়ে শয়ে থাকার ভঙ্গিতে ভেসে চলল ওপরে।

মেয়েরা কোন অদৃশ্য দঁড়ির টানে ছেলেটি কাঠ-হয়ে-শুয়ে-থাকা ভঙ্গীতে ভেসে চলল ওপরে।

মেয়েরা পাগলের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল, পুরুষরা চিৎকারে দিশেহারা। কেউই বুঝতে পারছে না কি করবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা দালালের চোখে আস্তে আস্তে জন্ম নিল আতঙ্ক। মঞ্চে লুটিয়ে পড়ে থাকা ম্যাজিসিয়ানের দিকে মরিয়া হয়ে একবার তাকাল সে।

নেমে এসো, ফ্রাঙ্ক! নেমে এসো! জনতা চিৎকার করে উঠল, ফ্র্যাঙ্ক! জাগো, নেমে এসো। থামো, ফ্র্যাঙ্ক—!

কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের পাথরের মতো দেহ ক্রমেই আরও উঠতে লাগল। ওপরে—ওপরে—আরো ওপরে। এক সময় মেলার তাঁবুর মাথায় পৌঁছে গেল নরম চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া আকাশে।

দর্শকদের অনেকে ভয়ে মুখ ঢাকল হাতে, মুখ ফিরিয়ে নিল। যারা তখনও তাকিয়ে ছিল, তারা দেখল ফ্র্যাঙ্কের শরীরটা আকাশে ভাসতে ভাসতে ক্রমে একটা বিন্দুর আকার নিল, যেন একটা ছোট্ট কয়লার টুকরো ভেসে চলেছে চাঁদের দিকে। তারপর সেটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দি ইনএক্সপিরিয়েন্সড গোস্ট

এইচ.জি. ওয়েলস্



যে পরিবেশের মাঝে বসে ক্লেটন তার শেষ গল্প শুনিয়েছিল সেটা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। বেশির ভাগ সময়টাই সে বসে ছিল ঘরের ঐ কোণে, বড় সড় অগ্নি-আধারের পাশে রাখা প্রাচীন সোফাটার ধার ঘেঁষে, আর তার পাশেই বসে ছিল স্যান্ডারসন—নিজের নাম লেখা ব্রোসলি মাটির পাইপ থেকে ধূমপানে মগ্ন। ইভান্সও ছিল, আর ছিল অভিনয় জগতের রত্ন উইশ—অবশ্য সে খুব বিনয়ীও বটে। সেই শনিবারটায় আমরা সকলে মিলে মারমেইড ক্লাব-এ এসেছি সকালবেলায়, শুধু ক্লেটনই এর ব্যতিক্রম, কারণ কালকের রাতটা সে ক্লাবেই কাটিয়েছে—এবং এ ঘটনা থেকেই তার গল্পের অনিবার্য সূত্রপাত। যতক্ষণ বল দেখা যায়, ততক্ষণ আমরা গল্‌ফ্ খেলেছি। রাতের খাওয়া-দাওয়াটাও সেরে নিয়েছি এবং প্রত্যেকের মেজাজে গল্পের যন্ত্রণা সহ্য করার মতো একটা শান্ত দয়ার আবেশ। ক্লেটন গল্প শুরু করতেই আমরা স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিয়েছি সে গাঁজাখুরি কোনো কাহিনী শোনাচ্ছে। তবে এ কথা সত্যি যে, সে কাহিনীর শুরু করেছিল অত্যন্ত সহজ-সরল ভঙ্গীতে, যেন কোন সত্যি ঘটনা শোনাচ্ছে। কিন্তু আমরা ভেবেছি, সেটা মানুষটার দুরারোগ্য গল্প বলার কায়দা।

জানো, কাল রাতে এখানে আমি একা ছিলাম? স্যান্ডারসনের নেড়েচেড়ে দেওয়া একটা জ্বলন্ত কাঠের গুড়ি থেকে ঠিকরে ওঠা আগুনের ফুলকি-বৃষ্টির দিকে অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন চোখে তাকিয়ে থেকে ক্লেটন মন্তব্য করল।

শুধু ক্লাবের পোষা জন্তু-জানোয়ারগুলো ছাড়া—বলল উইশ।

হ্যাঁ, তবে ওরা বাড়ির ওদিকটায় শোয়—বলল ক্লেটন, যাই হোক, কাল রাতে—সে হাতের চুরুটে কিছুক্ষণ এক মনে টান দিল, যেন নিজের আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে ইতস্তত করছে। তারপর বেশ শান্ত ভাবেই বলল, আমি একটা ভূত ধরেছি!

ভূত ধরেছ! বল কী? স্যান্ডারসন বলল, কই দেখি?

তখন চার-সপ্তাহ আমেরিকায় ঘুরে আসা ক্লেটনের একান্ত অনুগত ভক্ত ইভান্স চিৎকার করে উঠল, ভূত ধরেছ, তুমি? ওঃ, দারুণ! শিগগির বল, কী করে কী হল।

ক্লেটন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল, বলল, কেউ যে আড়ি পাতবে তা নয়, তবে ভূত নিয়ে গুজব ছড়িয়ে ক্লাবের চমৎকার পরিচর্যা-পরিবেশন পণ্ড হয়ে যাক তা আমি চাই না। তাছাড়া এটা ঠিক

নিত্যকার ভূত নয়।

মনে হয় না ওটা আর কখনও আবার আসবে।

তার মানে ভূতটা তুমি ধরে রাখনি? স্যান্ডারসন বলল।

ধরে রাখতে মন চাইল না—বলল ক্লেটন।

আমরা জোর গলায় হেসে উঠতেই ক্লেটনকে একটু বিমর্ষ মনে হল। ছোট্ট করে হেসে সে বলল, বুঝতে পারছি, তবে সত্যিই ওটা একটা ভূত ছিল। আমি ঠাট্টা করছি না। বিশ্বাস কর।

স্যান্ডারসন তার লালচে চোখ ক্লেটনের ওপর রেখে পাইপে গভীর টান দিয়ে, অনেক কথার চেয়েও বেশি ইঙ্গিতময় এক সরু ধোঁয়ার ফোয়ারা ছুড়ে দিল।

ক্লেটন ব্যাপারটা গায়ে মাখল না—এ আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা।

তোমরা তো জানো, আমি ভূত-টুত একেবারে বিশ্বাস করি না, আর আমিই কিনা শেষে একটা ভূত ধরে বসলাম, এখন গোটা ব্যাপারটাই আমার হাতে।

আরো কিছুক্ষণ গভীর ধ্যানে ডুবে রইল সে, তারপর দ্বিতীয় একটা চুরুট বের করে একটা অদ্ভুত দর্শন ছুরি দিয়ে সেটা ফুটো করতে লাগল।

তুমি ওটার সঙ্গে কথা বলেছ? উইশ প্রশ্ন করল।

তা ধর প্রায় ঘণ্টাখানেক বলেছি।

মিশুকে আড্ডবাজ? সন্দেহ-বাতিকদের দলে নাম লিখিয়ে আমিও শ্লেষের খোঁচাটা দিলাম ক্লেটনকে।

বেচারা খুব বিপদে পড়েছিল—চুরুটের ডগার ওপর ঝুঁকে পড়ে ক্লেটন বলল। সে মুখে প্রতিবাদ বা বিরক্তির লেশমাত্র নেই।

কাঁদছিল? কে যেন জানতে চাইল।

স্মৃতি রোমন্থন করে বাস্তবিকই এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্লেটন। বলল, হা ভগবান! সত্যিই কাঁদছিল বেচারা।

তুমি মেরেছ ওকে? যথাসম্ভব আমেরিকান কায়দায় প্রশ্ন করল ইভান্স।

তাকে উপেক্ষা করে ক্লেটন বলল, কখনো বুঝিনি, ভূতদের এ রকম করুণ অবস্থা হতে পারে—সে আবার আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রাখল, পকেট হাঁতড়ে দেশলাই খুঁজে বের করে চুরুটে আগুন ধরাল।

আমি অবশ্য একটা সুযোগ নিয়েছি—অবশেষে সে মন্তব্য করল।

আমরা এতটুকু ব্যস্ততা না দেখিয়ে প্রতীক্ষায় রইলাম।

যে সব ভূতরা সাধারণত ভয় দেখিয়ে বেড়ায়, তারা বুনো ঘোড়ার মতো গোঁয়ার্তুমি করে একই জায়গায় বার বার ফিরে আসে। কিন্তু এ বেচারা সেরকম নয়। প্রথম দেখাতেই ওকে আমার খুব দুর্বল বলে মনে হয়েছে।

চুরুটের টানে নিজের বক্তব্যকে যতিচিহ্নিত করে ক্লেটন বলল, ওর সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল লম্বা বারান্দাটায়। প্রথম আমিই ওকে দেখতে পাই—আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ভূত বলে আমি চিনতে পারলাম। ওর চেহারাটা কেমন স্বচ্ছ আর সাদাটে, সোজা ওর বুক ভেদ করে বারান্দায় শেষ মাথার ছোট্ট জানালার আলোর রেশটুকু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। শুধু চেহারা নয়, ওর হাবভাব পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল ঠেকছিল। যেন কী করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। একটা হাত কাঠের দেওয়ালে ভর রেখে অন্য হাতটা মুখের কাছে নাড়ছে। ঠিক—এই রকম!

চেহারা কী রকম ছিল? স্যান্ডারসন বলল।

রোগা। ছোটখাটো, মাথায় খোঁচা খোঁচা কদমছাঁট চুল। কান দুটো বিচ্ছিরি। কাঁধ ভীষণ সরু। পরণে ভাঁজ করা কলার দেওয়া খাটো কেনা জ্যাকেট, ঢোলা প্যান্টুলটা পায়ের কাছটায় ছিঁড়ে গেছে। চুপিসারে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছি। সঙ্গে আমার কোনো আলো ছিল না—পায়ে ছিল হালকা চটি। সিঁড়িতে উঠেই ওকে

আমার নজরে পড়ল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম—ভাল করে ওকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। ভয় কিন্তু একটুও পাইনি। বরং অবাক হয়েছি আর কৌতূহলও গেছে বেড়ে। ভাবলাম, ওঃ ভগবান! এদ্দিনে তাহলে একটা ভূতের দেখা পেলাম। আর গত পঁচিশটা বছর আমি কিনা এক মুহূর্তের জন্যেও ভূতে বিশ্বাস করিনি!

হুম্—বলল উইশ।

আমি সিঁড়ি বেয়ে ওঠা মাত্রই ভূতটা আমাকে দেখতে পেল। চকিতে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। সব মিলিয়ে অপরিণত যুবকের মুখ, থুতনি ও নাকের গড়ন কেমন দুর্বল, ঠোঁটের ওপরে খোঁচা খোঁচা গোঁফ। এক মুহূর্ত আমরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—ও কাঁধের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে—এবং জরিপ করতে লাগলাম পরস্পরকে। তারপরই মনে হয় নিজের উঁচুদরের পেশার কথা ওর মনে পড়ল। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে টান টান হয়ে খাড়া হল, মুখটা সামনে বাড়িয়ে হাত দুটো ভূতুড়ে নিয়ম মাফিক দু'পাশে ছড়িয়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে। আর এগিয়ে আসবার সময় মুখটা হাঁ করে এক হালকা টানা চিৎকার করে আমাকে ভয় দেখাতে চাইল। কিন্তু না—ওটা শুনে এক ফোঁটাও ভয় পেলাম না। খাওয়া-দাওয়া করে আমি তখন এক বোতল শ্যাম্পেন শেষ করেছি, আর একা একা থাকার ফলে হয়তো দু-তিন পেগ—না, হয়তো চার-পাঁচ পেগ হুইস্কিও টেনে ফেলেছি, সুতরাং আমার শরীর তখন নিরেট পাথরের মতো—ভয় পাওয়া তো দূরস্থান! ভূতটাকে বললাম—'বোকার মতো চেঁচিও না! এটা তো তোমার আস্তানা নয়। তাহলে কী করছ এখানে?'

স্পষ্ট দেখলাম, ও কুঁকড়ে গেল। তারপর আবার চিৎকার করল, 'ওঁ-ওঁ-ওঁ—'

'রাখ তোমার ভূতুড়ে চিৎকার! তুমি কি এ ক্লাবের মেম্বার?' আমি বললাম, আর ওকে যে আমি পাত্তাই দিচ্ছি না সেটা দেখাবার জন্যে ওর শরীরের একটা কোণা ভেদ করে বেরিয়ে গেলাম, তারপর মনোযোগ দিলাম মোমবাতি জ্বালতে। ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে আবার জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কি মেম্বার?'

আমাকে জায়গা দিতে ও একটু সরে গেল, ওর মুখের ভাব কী রকম যেন মনমরা হল।

তারপর আমার চোখের নাছোড়বান্দা নীরব প্রশ্নের উত্তরে বলল, না, আমি মেম্বার নই—আমি একটা ভূত।

'সে যা-ই হও, তাতে তো আর মারমেইড ক্লাবের ভেতরে যথেচ্ছ ঘোরাঘুরি করা যায় না। তুমি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাও, না কি?' খুব সাবধানে আমাকে কথাবার্তা বলতে হচ্ছিল, কারণ, নইলে আমার হুইস্কি-জনিত বিশৃঙ্খল ব্যবহারকে ও ভেবে বসবে আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। জ্বলন্ত মোমবাতিটা হাতে নিয়ে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম, 'তুমি এখানে করছটা কী?'

ও ততক্ষণে হাত নামিয়ে চিৎকার বন্ধ করে ফেলেছে, লজ্জা পেয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে ও বলল, 'আমি এখানে ভয় দেখাতে এসেছি।'

'কে বলেছে তোমাকে ভয় দেখাতে?' শান্ত গলায় বললাম।

'বললাম তো, আমি ভূত—' যেন নিজের পক্ষ সমর্থনে ও বলল।

'সে হও গিয়ে, কিন্তু ভদ্রলোকদের প্রাইভেট ক্লাবে এসে এভাবে ভয় দেখাবার কোনো অধিকার তোমার নেই, এখানে মেয়েরা, বাচ্চারা প্রায়ই আসে। তাদের কেউ যদি হঠাৎ তোমার মুখোমুখি পড়ে যায়, তাহলে তো সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে যাবে। একবারও ভেবেছ সে কথা?'

'না তো, স্যার—ভাবিনি।'

'ভাবা উচিত ছিল। তাছাড়া এ জায়গাটার ওপর তোমার কি কোনো দাবী আছে? মানে, এখানে তুমি খুন-টুন কিছু হয়েছিলে?'

'না স্যার, সে-রকম কিছু নয়, তবে আমি ভাবছিলাম, জায়গাটা বেশ সেকেলে গোছের, ওক্ কাঠের দেওয়াল চারদিকে, তাই—'

'এটা একটা অজুহাত হল?' আমি শক্ত গলায় বললাম, 'এখানে আসাটা তোমার খুব ভুল হয়েছে—' বন্ধুত্বে ভরা আদেশের সুরে আরও বললাম, 'আমি হলে আর মোরগের ডাক শোনার অপেক্ষা করতাম না—এক্ষুণি উধাও হয়ে যেতাম।'

ও ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল। 'আসলে কী জানেন, স্যার—' ও বলতে শুরু করল। আমি হলে কিন্তু এই মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যেতাম—' বেশ জোর দিয়ে আমি বললাম।

'আসলে—স্যার—মানে—আমি অদৃশ্য হতে পারছি না।'

'পারছ না?'

'না স্যার। মানে, আমি কী যেন একটা ভুলে গেছি। কাল মাঝরাত থেকে আমি শুধু এখানে ঘোরাঘুরি করছি, আলমারিতে, দেরাজে, শোবার ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে থেকেছি। মনটা কেবলই ছটফট করছে। আগে কখনও আমি ভয় দেখাতে আসিনি—মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হতো।'

'না এলেই ভাল হতো?'

'হ্যাঁ স্যার। আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ঠিকভাবে পেরে উঠছি না। কী একটা ছোট্ট ব্যাপার যেন ভুলে গেছি, আর মনে করতে পারছি না।'

এ কথা শুনে, বুঝলে, আমি যেন একেবারে বোল্ড আউট হয়ে গেলাম। ও আমার দিকে এমন মনমরা চোখে তাকাল যে আমি আর তর্জন-গর্জনের সুর বজায় রাখতে পারলাম না। 'ভারী অদ্ভুত তো—' বললাম আমি, এবং কথা বলার সময় মনে হল নীচের তলায় কারো চলাফেরার শব্দ পেলাম।—'চল, আমার ঘরে চল। সেখানে গিয়ে তোমার সব কথা শুনব। আমি ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না।' ওকে ধরে আমার সঙ্গে নিতে চাইলাম। কিন্তু বুঝতেই পারছ, সে চেষ্টা একরাশ ধোঁয়াকে মুঠো করে ধরবার চেষ্টারই মতো! আমার ঘরের নম্বরটা কিছুতেই আমার মনে পড়ছিল না। বেশ কয়েকটা শোবার ঘর খোঁজাখুঁজির পর আমার ঘরের দরজা নজরে পড়ল। একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে ওকে বললাম, 'যাক, এইবার বসে ধীরে-সুস্থে তোমার গপ্পোটা বলো দেখি। মনে হচ্ছে, তুমি বেশ ভাল ঝামেলাতেই পড়েছ।'

যাই হোক, ও বসতে রাজি হল না, বলল, আমার আপত্তি না থাকলে ও বরং ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করতে চায়। তাই হল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এক দীর্ঘ-গভীর আলোচনায় ডুবে গেলাম। একটু পরে হুইস্কি ও সোডার আমেজটা কিছুটা কমে এলে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম, কী ভয়ংকর বিপজ্জনক ভূতুড়ে ব্যাপারেই না আমি আগাপাস্তলা জড়িয়ে পড়েছি। অর্ধ-স্বচ্ছ শরীর নিয়ে পর্দাঘেরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন সেকেলে শোবার ঘরে ও দিব্যি এপাশ-ওপাশ নিঃশব্দে পায়চারি করছে। নিয়ম-মাফিক ভূতের মতোই ওর চেহারা ও চালচলন—তফাত শুধু হালকা গলার স্বরটুকুতে। আমার মোমবাতি দানের ম্লান আলো ওর শরীর ভেদ করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, চোখে পড়ছে দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে বাঁধানো খোদাইয়ের কাজগুলো, আর ও আমাকে শুনিয়ে চলল ওর করুণ জীবন-কাহিনী—যা সদ্য সদ্য শেষ হয়েছে এই পৃথিবীর বুকে। ওর মুখের চেহারা খুব সাধু না হলেও বলতে পারি, স্বচ্ছ হওয়ার ফলে ওর পক্ষে সত্যি বলা ছাড়া পথ ছিল না।

তার মানে? হঠাৎই চেয়ারে সোজা হয়ে বসে উইশ বলল।

কী মানে? ক্লেটন জানতে চাইল।

এই—স্বচ্ছ হওয়ার ফলে—সত্যি বলা ছাড়া পথ ছিল না—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমিও বুঝিনি—অননুকরণীয় আশ্বাসের ভঙ্গীতে ক্লেটন বলল, তবে কথাটা যে সত্যি, এটুকু বলতে পারি। ওর কাছে শুনলাম, কীভাবে ও মারা গেছে—লণ্ডনের এক পাতাল-ঘরে ও মোমবাতি হাতে নেমেছিল

কোথায় গ্যাস লিক্ করছে দেখতে—আর বেঁচে থাকতে লন্ডনেরই এক বেসরকারি ইস্কুলের ইংরিজির মাস্টার ছিল।

বেচারা! আমি মন্তব্য করলাম।

যা বলেছ। বেঁচে থাকলেও ওর জীবন ছিল উদ্দেশ্যহীন, মরে গিয়েও তাই। ও তার বাপ-মা, মাস্টারমশাই—অনেকের কথাই বলল। কেউ ওকে বুঝত না, কোনো আমল দিত না। সত্যিকারের বন্ধু বলতে কেউ ছিল না ওর। সফলতা ওর জীবনে কোনো দিন আসেনি। খেলাধূলা ও বরাবরই এড়িয়ে চলেছে এবং পরীক্ষায় ফেল করেছে বারবার। একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছিল আর ঠিক সেই সময়েই ঘটল ওই গ্যাস-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা। 'এখন তাহলে কোথায় আছ?' আমি জানতে চাইলাম, 'মানে—'

দেখলাম, ব্যাপারটা ওর কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। মানে যেখানেই ও থাক, ওর সঙ্গে এখন রয়েছে একদল স্বজাতীয় ভূত, আর ওরা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই কোনো বাড়িতে গিয়ে আস্তানা গাড়বার কথা আলোচনা করে। হ্যাঁ, কোনো বাড়িকে ভূতুড়ে বাড়ি বানাবার মতলব আর কি! ওদের কাছে এই ব্যাপারটা ভীষণ রোমাঞ্চকর, তবে ওদের বেশির ভাগই সব সময় ভয়ে পিছিয়ে আসতে চায়। সুতরাং, অবশেষে ও আবির্ভূত হয়েছে।

আশ্চর্য বটে! জ্বলন্ত আগুনের দিকে চোখ রেখে উইশ বলল।

ওর কথাবার্তা শুনে আমার মোটামুটি এই রকমই মনে হয়েছে— ক্লেটন বিনয়ের সঙ্গে বলল, এক মনে পায়চারি করতে করতে মিহি সুরে ও কথা বলে গেছে—শুধু কথা—নিজের করুণ অবস্থা সম্পর্কে। ভয় দেখাতে এসে এই বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলায় পড়ে ও ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছিল। সবাই ওকে বলেছিল এতে নাকি খুব মজা হবে। তা, সেই মজা পাওয়ার আশাতেই ও ক্লাবে এসে উদয় হয়েছিল, কিন্তু কোথায় কী! ওর সারা জীবনের ব্যর্থতার লিস্টে আরো একটা ঘটনা যোগ হল মাত্র। ও বলল, যখনই যা কিছু ও করতে গেছে, সেটাই নাকি কেমন তালগোল পাকিয়ে ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ওর কথা আমি একটুও অবিশ্বাস করিনি। যদি অন্তত কারো সহানুভূতিও ভূতটা পেত—এই পর্যন্ত বলে ও একটু থামল নজর করে দেখল আমাকে, তারপর মন্তব্য করল যে শুনতে অবাক লাগলেও আমিই নাকি প্রথম ব্যক্তি যে ওর প্রতি একটু হলেও সহানুভূতি দেখিয়েছি—এটুকু দয়াও কারও কাছ থেকে ভূতটা পায়নি।

তক্ষুনি আমি বুঝতে পারলাম, ও আসলে কি চায়, এবং মন মনে রাজিও হলাম ওকে সাহায্য করতে। চটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এ সব নিয়ে বেশী মন খারাপ কোরো না। যে করে হোক তোমাকে আবার ফিরে যেতেই হবে। নাও আর একবার তৈরি হয়ে চেষ্টা কর দেখি।' আমি এমনিতে নিষ্ঠুর হতে পারি, কিন্তু একজন যখন আমাকে সত্যিকারের বন্ধু বলে সম্মান দিয়েছে তখন তাকে সাহায্য না করাটা আমার সহ্যের বাইরে—তা সে মানুষ হোক আর ভূতই হোক। আমার কথায় ও বলল, 'আমি পারছি না।'

'পারতেই হবে।' আমি বললাম এবং ও সত্যিই চেষ্টা করতে লাগল।

চেষ্টা! বলল স্যান্ডারসন, কেমন করে?

হাত নাড়াচাড়া করে, ক্লেটন বলল।

হাত নাড়াচাড়া করে?

হ্যাঁ, বিভিন্ন জটিল ভঙ্গীতে হাত নাড়াচাড়া করে। ঐ ভাবেই ও এখানে এসে হাজির হয়েছিল, এবং একইভাবে ওকে আবার অদৃশ্য হতে হবে। ওঃ ভগবান! কী কাজেই না ফেঁসেছি!

কিন্তু, শুধু হাত নেড়ে কেমন করে—আমি বলতে শুরু করলাম।

তুমি দেখছি সব কিছুরই জট খুলতে চাও—আমার দিকে ফিরে বিশেষ কয়েকটা শব্দের ওপর জোর দিয়ে ক্লেটন বলল, কেমন করে আমি জানি না। শুধু জানি, ও অন্তত তাই করেছিল। বহু চেষ্টার পর, বুঝলে, এক সময় ওর হাতের ভঙ্গীগুলো ঠিক ঠিক হতেই ভূতটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভঙ্গীগুলো তুমি খেয়াল করেছিলে? স্যান্ডারসন ধীরে ধীরে বলল।

হ্যাঁ—বলল ক্লেটন, মনে হল কিছু একটা ভাবছে, ভঙ্গীগুলো ভারী অদ্ভুত। আমি আর সেই রোগা আবছা ভূতটা বসে আছি সেই নিস্তব্ধ জনশূন্য সরাইখানায়। আমাদের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনো শব্দ সেখানে ছিল না। শুধু ছিল ওর হাতের নাড়াচাড়ায় শূন্যে তৈরি এক আবছা ছবি। একটা মোমবাতি শোবার ঘরের অন্ধকার দূর করছে, আর দ্বিতীয় একটা জ্বলন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ড্রেসিং-টেবিলে, আলো বলতে সব মিলিয়ে ওইটুকুই —কখনো-সখনো মোমবাতির আলো ক্ষণিকের জন্যে দপ্ করে জ্বলে উঠছে দীর্ঘ তন্বী বিহ্বল শিখায়। আর অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে লাগল। 'আমি পারছি না—ও বলল, আমার দ্বারা সম্ভব নয়—!' এবং হঠাৎই বিছানার পায়ের দিকে ছোট্ট চেয়ারে বসে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভগবান! কী হয়রানি একবার বোঝ।

'কী হচ্ছে কী এসব?' থাম, এ কথা বলে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু...আমার হতচ্ছাড়া হাতটা ওর শরীর ভেদ করে চলে গেল! মনে আছে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছিটকে সরিয়ে নিয়েছি আমার হাত। সামান্য শিউরে উঠে সরে এসেছি ড্রেসিং-টেবিলের কাছে। তারপর, ওকে মদৎ দিতে আমিও চেষ্টা করতে শুরু করলাম।

কী করে! স্যান্ডারসন বলল, হাত নাড়াচাড়ার ভঙ্গী করে?

হ্যাঁ, তাই।

কিন্তু—কী একটা ভেবে বলতে শুরু করেছিলাম আমি, কিন্তু সেটা খেয়াল করে উঠতে পারলাম না।

আশ্চর্য ব্যাপার তো—পাইপের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে স্যান্ডারসন বলল, তার মানে, তোমার এই ভূতটা সমস্ত রহস্যই তোমার কাছে—

ফাঁস করে দিয়েছে কিনা? হ্যাঁ, দিয়েছে।

হতে পারে না—বলল উইশ, এ সম্ভব নয়। কারণ, তাহলে তুমিও ওর সঙ্গে উধাও হয়ে যেতে।

ঠিক বলেছ—আমি আমার মনের কথা ফিরে পেয়ে সমর্থন জানালাম।

কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপচাপ।

শেষ পর্যন্ত ও পারল? স্যান্ডারসন জানতে চাইল।

হ্যাঁ, পারল, তবে অনেক চেষ্টার পর—বলতে পারো হঠাৎই হয়ে গেল। ও তো হতাশই হয়ে পড়েছিল, তারপর আমাদের দুজনের মধ্যে এক চোট হল, তখন হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে পুরো ভঙ্গীটা আস্তে আস্তে করে দেখাতে বলল, যাতে ও ভালো করে লক্ষ্য করতে পারে। 'আপনারটা খুঁটিয়ে দেখলে আমি বুঝতে পারব আমার ভুলটা কোথায় হচ্ছে', বলল ভূতটা। এবং সত্যিই পারল। কিন্তু হঠাৎ ও একটু রুক্ষ গলায় বলল, 'আপনি এভাবে তাকিয়ে থাকলে আমি পারব না—এই জন্যে তখন থেকে সব খালি গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনাকে দেখে আমি আরও নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি।' যাই হোক, কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি হল। বুঝতেই পারছ, আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ভূতটা একেবারে বুনো ঘোড়ার মতো বেঁকে বসল। সুতরাং, অগত্যা আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, তাকিয়ে রইলাম বিছানার পাশে রাখা পোশাক আলমারির আয়নায়।

ও একেবারে ঝটপট শুরু করে দিল। আয়না দিয়ে আমি ওর সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। হাত দুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, এই ভাবে, এই রকম করে, বিচিত্র সব ভঙ্গী করতে শুরু করল ভূতটা, তারপর হঠাৎই ঝুপ করে এসে পরল শেষ ভঙ্গীটা—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো হাত টান টান করে ছড়িয়ে দাও দু'পাশে—এই রকম, ঠিক এই ভাবে ও দাঁড়াল। তারপরই উধাও! হাপিশ! হাওয়া! আয়না ছেড়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম ওর দিকে। কিন্তু কোথায় কে! জ্বলন্ত মোমবাতি ও হোঁচট খাওয়া চিন্তা নিয়ে ঘরে আমি সম্পূর্ণ একা। ব্যাপারটা কী হল? সত্যিই কি কিছু ঘটেছে? না অতক্ষণ ধরে আমি স্বপ্ন দেখেছি?...আর ঠিক তখনই

সিঁড়ির দেওয়াল-ঘড়িটা যবনিকাপাতের বিচিত্র সুরে আবিষ্কার করল, রাত একটার ঘণ্টা বাজানোর পক্ষে সময়টা বেশ জমে উঠেছে। সুতরাং!—ঢং! ব্যস্, আমার শ্যাম্পেন ও হুইস্কির তাবৎ নেশা তখন কেটে গেছে। আর কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে—ভীষণ অদ্ভুত। ওঃ ভগবান!

চুরুটের ছাইটাকে এক মুহূর্তে সে জরিপ করল, তারপর বলল, 'এই-ই সব।

তারপর তুমি ঘুমোতে চলে গেলে? ইভান্স প্রশ্ন করল।

তাছাড়া আর কী করব?

আমি উইশের চোখে তাকালাম। আমরা সবাই মিলে ক্লেটনকে ব্যঙ্গ করতে চাইলাম, কিন্তু ওর কথায় ও ব্যবহারে এমন কিছু একটা ছিল যে শেষ পর্যন্ত সেটা আর পেরে উঠলাম না।

আর সেই হাত নাড়ার কায়দাগুলো? বলল স্যান্ডারসন।

ওগুলো আমি এখনই করে দেখাতে পারি।

তাই নাকি। একটা পেনসিল-কাটা ছুরি বের করে পাইপের গর্তের ভেতরটা চাঁছতে চাঁছতে বলল স্যান্ডারসন, তাহলে করে দেখাও!

দেখাচ্ছি—বলল ক্লেটন।

দেখ, ওতে কোনো কাজ হবে না—ইভান্স বলল।

কিন্তু, যদি হয় তাহলে—আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

জানো, আমার মনে হচ্ছে, এ সব নিয়ে ছেলেমানুষী না করাই ভালো, বলল উইশ, তারপর পা ছড়িয়ে আয়েস করে বসল।

উইশের সঙ্গে আমাদের বিতর্ক শুরু হল। তার মতে ওই সব ভঙ্গী যদি ক্লেটন নকল করতে যায় তাহলে সেটা একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ভীষণ ঠাট্টা করা হবে। কিন্তু গল্পটার এক বর্ণও কি তোমার বিশ্বাস হয়? আমি জানতে চাইলাম।

উইশ চকিতে চোখ ফেরাল ক্লেটনের দিকে। সে তখন অগ্নি-আধারের জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কী যেন ওজন করে দেখছে।

হ্যাঁ, বিশ্বাস হয়—অর্ধেকেরও বেশি বিশ্বাস হয়—উইশ বলল।

ক্লেটন—আমি বললাম, তোমার গল্পের গাঁজাখুরি ধরে ফেলা আমাদের কম্মো নয়। গল্পটা এমনি ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু ওই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা...তুমি আমাদের মনে একেবারে সত্যি ঘটনার মতো গেঁথে দিয়েছ। নাও বাবা, এবারে স্বীকার করে ফেল যে পুরোটাই গুল-তাপ্পি ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে ক্লেটন উঠে দাঁড়াল, অগ্নি-আধারের সামনে বিছানো কার্পেটের ঠিক মাঝখানটায় গিয়ে থামল, এবং ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে মুখ করে। এক মুহূর্ত সে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল, তারপর সারাটাক্ষণই তার চোখ গভীর মনোযোগে স্থির হয়ে রইল মুখোমুখি দেওয়ালের ওপর। ধীরে ধীরে সে তার দু'হাত তুলে ধরল চোখের সমান্তরাল করে, এবং শুরু করল...

এখানে বলে রাখা ভালো, প্রাচীন এবং বর্তমান স্থাপত্য কর্মের নানান্ রহস্য নিয়ে স্যান্ডারসন অনেক গবেষণা করেছে। ফলে ক্লেটনের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী সে রক্তাভ চোখে গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগল। ক্লেটনের শেষ হলে সে বলল, মন্দ নয়। তুমি জোড়াতালি দিয়ে মোটামুটি ভালোই দেখিয়েছ, তবে একটা ছোট্ট জায়গা বাদ পড়ে গেছে।

জানি—ক্লেটন বলল, তারপর হাত ছুড়ে, দুলিয়ে, ছোট্ট এক অদ্ভুত মোচড় দিয়ে থামল, এই-টা তো? ভূতটা তো এই জায়গাটাই বার বার ভুলে যাচ্ছিল। দাঁড়াও, এবার পুরোটা তোমাদের প্রথম থেকে করে দেখাই।

অস্তমিত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল ক্লেটন। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, সেই হাসিতে সামান্য ইতস্তত ভাব ছিল। সে বলল, তাহলে শুরু করছি—

আমি হলে কিন্তু করতাম না—বলল উইশ।

না না, ঠিক আছে। ইভান্স বলল, পদার্থ অবিনশ্বর। তোমার কি ধারণা এ সব ভোজবাজি ক্লেটনকে অশরীরী জগতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? মোটেই না। আমি তো বলব, ক্লেটন ভায়া, যতক্ষণ না তোমার হাতজোড়া কাঁধ থেকে খুলে পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তুমি চেষ্টা করে যাও।

আমার মত তা নয়—উঠে দাঁড়াল উইশ, এগিয়ে এসে ক্লেটনের কাঁধে হাত রাখল, যে করে হোক তোমার গল্পটা আমাকে তুমি অর্ধেকেরও বেশি বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছ, ফলে আমি চাই না তুমি এসব নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করো।

হায় কপাল! উইশ দেখছি ভয় পেয়ে গেছে। আমি বললাম।

হ্যাঁ, ভয় পেয়েছি! আমার দিকে ফিরে তীব্র গলায় বলল উইশ, আমার ধারণা ওইসব হাতের ভঙ্গী ঠিক ঠিক নকল করলে ক্লেটনও উধাও হয়ে যাবে। উইশের মনোভাব হয় সত্যি, নয়তো বলতে হয়, ও অভিনয় প্রশংসা করার মতো।

ও সব কিছু হবে না—আমি চিৎকার করে বললাম, এ পৃথিবীকে ফাঁকি দেবার একটাই মাত্র উপায় মানুষের হাতে আছে, আর সে হতে ক্লেটনের এখনও তিরিশ বছর দেরি। তাছাড়া...ওই রকম একটা ভূত! তোমার কী মনে হয়?

গতিশীল হয়ে আমাকে বাধা দিল উইশ। ছড়িয়ে থাকা চেয়ারের বৃত্ত ছেড়ে সে এগিয়ে এলো, টেবিলের পাশে এসে থমকে দাঁড়াল।

ক্লেটন—সে বলল, তুমি একটা বোকা।

রসিকতার আলো দু'চোখে ঝিকিয়ে হাসি ফিরিয়ে দিল ক্লেটন।

উইশ ঠিকই বলেছে। তোমাদের ধারণা ভুল—ক্লেটন বলতে শুরু করল। আমিও উধাও হয়ে যাব। এই সব হাত নাড়াচাড়ার বিচিত্র ভঙ্গী যেই শেষ হবে, বাতাস কাটার শব্দের রেশ যখন শিস দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে অমনি—হুস্!—এই কার্পেট পড়ে থাকবে সম্পূর্ণ খালি, অবাক বিস্ময়ে সারাটা ঘর হয়ে যাবে স্তম্ভিত, এবং পনেরো স্টোন ওজনের সুবেশ এক ভদ্রলোক টুপ্ করে গিয়ে পড়বে অশরীরী জগতে। এতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। তোমাদেরও থাকবে না। ফালতু তর্কের মধ্যে আমি আর যেতে চাই না। সোজাসুজি চেষ্টা করেই দেখা যাক।

না! চিৎকার করে সামনে এক পা এগিয়ে এলো উইশ এবং পরক্ষণেই থমকে দাঁড়াল। কারণ ক্লেটন তখন হাত তুলে সেই প্রেতাত্মার হাত নাড়ার ভঙ্গীগুলো আবার নকল করতে শুরু করেছে।

ততক্ষণে আমরা এক অদ্ভুত উত্তেজনার চরমে পৌঁছে গেছি—বিশেষ করে উইশের আচরণের জন্য। ক্লেটনের দিকে নিশ্চল চোখ রেখে আমরা সকলে বসে আছি। বিশেষ করে আমার তখন এক বিচিত্র কঠিন নিঃসাড় অবস্থা, যেন আমার মাথার পিছন থেকে ঊরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত গোটা শরীরটা ইস্পাতে পরিণত হয়ে গেছে। আর ক্লেটন এক অদ্ভুত শান্ত মুখভাব নিয়ে নিজের অবয়ব ঝুঁকিয়ে দুলিয়ে ওর হাত নাড়াচাড়ার ভঙ্গী করে চলল। যতই সে শেষের দিকে এগোতে লাগল ততই আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল, একটা হিমেল হাওয়া যেন আমাদের চোখ মুখ ছুঁয়ে গেল। শেষ ভঙ্গীটুকু ছিল হাত দুটোকে টান টান করে দু'পাশে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তার সঙ্গে মুখ তুলে ধরা। যখন সে যবনিকা পতনের কায়দায় হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিল, আমার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। যদিও মানছি, এর কোনো মানে হয় না। তবে ব্যাপারটা অনেকটা যেন ছমছমে ভূতুড়ে গলার মতো। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর অদ্ভুত ছায়াময় এক বাড়ির ভেতর বসে এই ঘটনার সাক্ষী থাকা। মনে মনে ভাবতে থাকলাম, সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত ও—?

মুখ ওপরে তুলে, দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে, নিশ্চিন্ত উজ্জ্বল অভিব্যক্তি নিয়ে ঝুলন্ত আলোর আভায় এক বিস্ময়কর মুহূর্ত ধরে দাঁড়িয়ে রইল ক্লেটন। সেই একটা মুহূর্ত আমাদের কাছে যেন একটা যুগ। আর তার পরেই আমাদের বুক ভেদ করে বেরিয়ে এল স্বস্তির এক অনন্ত দীর্ঘশ্বাস এবং আশ্বস্ত হওয়ার একগুচ্ছ অস্ফুট শব্দ, না! কিছুই হয়নি। কারণ, চোখের সামনেই দেখছি ক্লেটন অদৃশ্য হয়নি। ব্যাপারটা পুরোটাই বোগাস। আসলে সে একটা গাঁজাখুরি গপ্পো ফেঁদে সেটা আমাদের প্রায় বিশ্বাস করানোর জন্য এত কাণ্ড করে চলেছে!

...ঠিক তক্ষুনি ক্লেটনের মুখটা পাল্টে যেতে লাগল।

এই পালটে যাওয়াটা যেন কোন আলো ঝলমলে বাড়ির সমস্ত আলো পলকে নিভিয়ে দেবার মতো। ওর চোখ হঠাৎই হয়ে গেল স্থির, অচল, অনড়, ঠোঁটের হাসি গেঁথে গেল ঠোঁটের ওপরেই। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্লেটন। শুধু ওর শরীরটা অল্প অল্প দুলতে লাগল।

সেই মুহূর্তটাও যেন একটা যুগ। তারপরই শোনা গেল চেয়ার নাড়াচাড়ার শব্দ, জিনিসপত্র পড়ে যাবার শব্দ, এবং আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ক্লেটনের হাঁটুজোড়া যেন হঠাৎই রণে ভঙ্গ দিল, ও হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। পলকে উঠে দাঁড়িয়ে ইভান্স ওকে ধরে ফেলল দু'হাতে...

আমরা সকলে স্তম্ভিত। অন্তত এক মিনিট কেউ গুছিয়ে কোনো কথা বলতে পারল না। আমরা বিশ্বাস করছি, আবার বিশ্বাস করতেও পারছি না...জটিল হতবুদ্ধি ভাব কাটিয়ে যখন সম্বিৎ ফিরে পেলাম, তখন দেখি, আমি ক্লেটনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছি, ওর খাটো কোট ও জামা ছিঁড়ে ফেলে স্যান্ডারসন ওর বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করে দেখছে...

এ রহস্যের প্রকৃত সমাধান করা আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির বাইরে। ভৌতিক যাদুমন্ত্রের কোনো হাত এতে আছে কিনা আমি জানি না। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে হাত নাড়াচাড়ার সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়া যে মুহূর্তে ওর শেষ হল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর চেহারা পুরোপুরি পালটে গেছে, ও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমাদের চোখের সামনে—এবং মারা গেছে!

দি ওয়েল

উইলিয়াম ওয়াইমার্ক জ্যাকবস



এক প্রাচীন গ্রাম্য বাড়িতে বিলিয়ার্ড-ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন পুরুষ, কথা বলছিল পরস্পরের সঙ্গে। যে খেলায় এতক্ষণ ওরা অনিচ্ছা ভরে মগ্ন ছিল, এখন তা শেষ করে ওরা বসল গিয়ে খোলা জানালার কাছে। সামনেই এক বিশাল পার্ক। সেদিকে চোখ রেখে অলস কথোপকথন শুরু হল দুজনের।

তোমার তো সময় হয়ে এল, জেম কিছুক্ষণ নীরবতার পর একজন বলল, এবার ছ' সপ্তাহ ধরে হাই তুলে তোমার মধুচন্দ্রিমা কাটাবে।

জেম বেনসন তার লম্বা হাত-পা চেয়ারে ছড়িয়ে বসল এবং প্রতিবাদের এক অদ্ভুত গম্ভীর শব্দ করল।

জিনিসটা কখনও আমার মাথায় ঢুকল না! হাই তুলে বলে চলল উইলফ্রেড কার, অবশ্য এ আমার না বোঝারই কথা, নিজের চাহিদা মেটাবার পয়সাই কখনও আমার ছিল না, দুজনের তো দূরের কথা। তবে আমি যদি তোমার মতো বড়লোক হতাম, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য চোখে দেখতে পারতাম।

এই মন্তব্যের শেষ অংশে এমন ইঙ্গিত ছিল যে তার জ্ঞাতিভাই বেনসন উত্তর দেবার কোন চেষ্টা করল না। বরং জানালার দিয়ে নির্নিমেষ তাকিয়ে শান্ত ভাবে ধূমপান করে চলল।

তোমার মতো বড়লোক আমি নই—মিস্টার কার আবার বলতে শুরু করল, সময়ের স্রোতে আমি আমার নৌকো ভাসিয়ে নিয়ে যাই এবং কখনও কখনও বন্ধু-বান্ধবদের দরজায় নোঙর ফেলি, তাদের ঘরে গিয়ে নৈশভোজে ভাগ বসাই।

জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রেখেই জেম বেনসন বলল, তোমার পক্ষে এ নেহাৎ খারাপ নয় উইলফ্রেড, যে তোমার নোঙর ফেলার দরজা আছে, নৈশভোজ আছে—আর আছে বন্ধু-বান্ধব।

এবার মিস্টার কার বলল, সত্যি বলছি, জেম তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি, মহাভাগ্যবান ব্যক্তি। যদি পৃথিবীতে অলিভ-এর চেয়ে ভালো কোন মেয়ে থাকে তাহলে তাকে আমি একটিবার দেখতে চাই।

হুঁ। অপর জন শান্ত স্বরে বলল।

মেয়েটার তুলনা নেই—কার বলে চলল, বাইরে এত ভালো ভদ্র। ও ভাবে, তুমি বুঝি নীতি ধর্মের গুরুমশাই!

প্রাণ খোলা আনন্দের হাসি হাসল সে, কিন্তু অন্য জন এ হাসিতে যোগ দিল না। ওর ন্যায়-অন্যায় বোধটা খুব বেশি—আনমনা ভাবে বলে চলল কার, জানো, ও যদি একবার টের পায় সে আসলে তুমি একটি—

আসলে কি? ভয়ানক ভাবে মুখিয়ে উঠল বেনসন, আসলে আমি একটি কী?

লোকে তোমাকে যা জানে, আসলে তুমি তা নও—বর্ণচোরা হাসিতে মুখ ভরিয়ে উত্তর দিল উইলফ্রেড কার, আর এ কথা টের পেলে আমার ধারণা, অলিভ তোমাকে ছেঁড়া চটির মতো ছুড়ে ফেলে দেবে।

অন্য কোন আলোচনা করো—ধীর স্বরে বেনসন বলল, তোমার রসিকতা সব সময় আমার ভালো লাগে না।

এই মুহূর্তে অন্য আর একটাই আলোচনা আমি করতে পারি—সেটা হল আমার আর্থিক অবস্থা—উইলফ্রেড কার র্যাক থেকে বিলিয়ার্ড খেলার লাঠি তুলে নিয়ে বিলিয়ার্ড টেবিলের অন্য প্রান্তে যেতে যেতে ধীরে স্বরে বলল।

অন্য কোন আলোচনা থাকালে কর—আবার বলল বেনসন।

এই দুটো বিষয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে—বলল কার, বিলিয়ার্ড লাঠিটা রেখে দিয়ে জরীপ করতে লাগল তার জ্ঞাতি ভাইকে।

চুরুটের শেষ প্রান্তটুকু জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল বেনসন, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

আমার কথা কোন্ পথে এগোচ্ছে ধরতে পেরেছ? অবশেষে কার বলল।

বেনসন চোখ খুলে তাকাল, জানালার দিকে ইশারা করে মাথা নাড়ল, তুমি কি আমার চুরুটের পথে যেতে চাও?

তোমার কথা চিন্তা করেই আমি স্বাভাবিকা পথে যেতে চাই—নির্লজ্জ ভাবে পাল্টা উত্তর দিল অন্যজন, আমি জানালা দিয়ে বিদায় নিলে হাজারো প্রশ্ন উঠবে, আর তুমি তো জানো, আমার একটু বাচাল স্বভাব আছে—জিভ পাতলা মানুষ।

নিজেকে অনেক চেষ্টায় সংযত রেখে বেনসন উত্তর দিল, আমার ব্যাপারে কথা না বললেই হল, তুমি বকবক করে গলা ভেঙে ফেললেও আমার আপত্তি নেই।

আমি খুব বিপদে পড়েছি—কার ধীরে ধীরে বলল, আগামী দু-সপ্তাহের মধ্যে যদি পনেরোশো পাউন্ড জোগাড় না করতে পারি, তাহলে আমাকে হয়তো পথে দাঁড়াতে হবে।

সে তোমার কাছে আর নতুন কী? বলল বেনসন।

পথে দাঁড়ানোরও রকমফের আছে—উত্তর দিল অপর জন, তাছাড়া বাড়ির ঠিকানাটাও তখন যুতসই হবে না। সত্যি বলছি জেম, তোমার কাছে পনেরশো হবে?

না—জেম বেনসন সহজ সুরে বলল।

কারের মুখ ফ্যাকাশে হল। ভারী গলায় বলল সে, আমাকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে বলছি—

তোমাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আমি ক্লান্ত—কারের দিকে ফিরে তাকে খুঁটিয়ে মেপে নিল বেনসন, বলল, আর বাঁচিয়েই বা লাভ কী! যদি বিপদে পড়ে থাক তাহলে নিজেই সে বিপদ কাটিয়ে ওঠ। তোমার অটোগ্রাফ বিলিয়ে বেড়ানোর বাতিকটা এবার একটু কমাও।

ওটা বোকামি—মানছি—কার বলল, ও রকম আর করব না। ও ভালো কথা, আমার কাছে কিছু অটোগ্রাফ বিক্রি আছে। নেবে নাকি!

কার? অপরজন প্রশ্ন করল।

তোমার।

বেনসন চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল, শান্ত স্বরে জিগ্যেস করল, ব্ল্যাকমেল?

সে তুমি যে নামে খুশি ডাকো—কার বলল, আমার কাছে কিছু চিঠি বিক্রি আছে, দাম পনেরোশো পাউন্ড। আর আমি এমন একজন লোককে জানি, যে শুধু তোমার কাছ থেকে অলিভকে পাওয়ার জন্য এই

চিঠিগুলো পনেরোশো দিয়ে কিনতে রাজি আছে।

যদি তোমার কাছে আমার সই করা কোন চিঠিপত্র থেকে থাকে, তাহলে ভালোয় ভালোয় সেগুলো আমাকে দিয়ে দেওয়া উচিত—খুব আস্তে আস্তে বলল বেনসন।

চিঠিগুলো আমার—হালকা সুরে কার বলল, যাকে তুমি লিখেছিলে সেই মেয়েটি আমাকে দিয়েছে। এ কথা হলফ করে বলতে পারি যে সব ক'টা চিঠিই ভদ্রলোকের মতো লেখা নয়।

হঠাৎই উইলফ্রেড কারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বেনসন, কোটের কলার ধরে টেবিলের ওপরে ধরাশায়ী করল তাকে। তারপর—চিঠিগুলো ফেরত দাও—বড় বড় শ্বাস ফেলে বলল সে।

ওগুলো আমার সঙ্গে নেই—ধস্তাধস্তি করতে করতে কার বলল, আমি অত বোকা নই। ছাড়, নইলে দাম আরো বেড়ে যাবে।

বেনসন শক্ত সমর্থ হাতে উইলফ্রেড কারকে টেবিল থেকে তুলল, হয়তো টেবিলে ওর মাথা ঠুকে দেবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু কি ভেবে হঠাৎই ছেড়ে দিল। কার ঝটিতি উঠে বসল।

বেনসন বলল, তাহলে তুমি চিঠিগুলো আমাকে দেবে না?

নিশ্চয়ই দেব—তবে যে দাম বলেছি সেই দামে—কার বলল, কিন্তু মনে রেখ, যদি তোমার ওই নোংরা হাত দ্বিতীয়বার আমার গায়ে ওঠে তাহলে চিঠির দাম দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যাক, এখন আমি চললাম, তোমাকে ব্যাপারটা ভাবার জন্যে কিছু সময় দিয়ে গেলাম।

বাক্স থেকে একটা চুরুট তুলে নিয়ে ধরাল সে, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার জ্ঞাতি ভাই জেম বেনসন দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর জানালার দিকে ফিরে প্রচণ্ড রাগে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল।

একটু পরেই বাইরে তাকিয়ে সে তার ভাইকে দেখতে পেল। ধীরে ধীরে পা ফেলে চলে যাচ্ছে। লক্ষ্য করতে লাগল সে তার ভাইয়ের অপসৃয়মান শরীরটা, চাঁদের আলোয় যেন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বেনসন।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেকে শুভরাত্রি জানাতে মিসেস বেনসন যখন ঘরে এসে ঢুকলেন তখন ঘরটা খালি। টেবিলটা ঘুরে ধীর পায়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন জানালার সামনে, দেখতে পেলেন দ্রুত পা ফেলে তাঁর ছেলে বাড়ির দিকে ফিরে আসছে।

সে জানলার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

শুভরাত্রি—মিসেস বেনসন বললেন।

শুভরাত্রি—গভীর স্বরে বেনসন বলল।

উইলফ্রেড কোথায়?

ও চলে গেছে—বেনসন বলল।

চলে গেছে?

হ্যাঁ, কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল...ও আবার টাকা চাইছিল, আর আমিও খোলাখুলি না বলে দিয়েছি। মনে হয় না ও আর এখানে আসবে।

বেচারা উইলফ্রেড! মিসেস বেনসন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সব সময় ও একটা না একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। তুই ওকে আজেবাজে কথা কিছু বলিসনি তো? যতখানি বলা উচিত তার বেশি বলিনি—কঠোর স্বরে তাঁর ছেলে উত্তর দিল, শুভরাত্রি।

দুই

কুয়োটা পুরোনো পার্কের এক কোণে দাঁড়িয়ে। বহু বছর অব্যবহারে উশৃঙ্খল ঘন আগাছার ঝোপে ওটা প্রায় চোখের আড়ালে চলে গেছে। একটা ভাঙা ঢাকনায় কুয়োর মুখ অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে, তার ঠিক

ওপরেই একটা মরচে ধরা পুরোনো কপিকল, জোরালো বাতাসে এলোমেলো পাইন গাছের সমবেত সঙ্গীতের তালে তালে কপিকলটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তোলে। সূর্যের সরাসরি আলো কখনও কুয়ো পর্যন্ত পৌঁছয় না, ফলে তার আশপাশের মাটি ভিজে স্যাঁতসেঁতে এবং ঘাসের রঙ সবুজ। অথচ পার্কের বাকি অংশটা ঝাঁ ঝাঁ গরমে হাহাশ্বাস তুলছে।

গ্রীষ্মের নিঃঝুম সুগন্ধী সন্ধ্যায় দুজন মানুষ পার্কে পায়চারি করছিল, হাঁটতে হাঁটতে তারা এগিয়ে চলল কুয়োটার দিকে।

এই জঙ্গলে ঢোকার কোন মানে হয় না—অলিভ পাইন গাছের সীমানার কাছে দাঁড়িয়ে অস্বস্তির চোখে তাকিয়ে জেম বেনসন বলল।

পার্কের সবচেয়ে সেরা জায়গা—বলল মেয়েটি, জানো, এ জায়গাটা আমার দারুণ ভালো লাগে।

জানি, কুয়োর পাড়ে বসে থাকতে তোমার আরও ভালো লাগে—বেনসন ধীরে ধীরে বলল, কিন্তু আমার সেটা পছন্দ নয়। কোন দিন বেশি ঝুঁকে পড়লে তুমি কুয়োতে পড়ে যাবে।

আর সত্যের মুখোমুখি হব—অলিভ হালকা সুরে বলল, এসো—

ও ছুটে হারিয়ে গেল পাইনের ছায়ার ঘেরাটোপে, আগাছার ডালপালা শব্দ করে ভাঙতে লাগল ওর ছুটন্ত পায়ের নীচে। বেনসন ধীর পায়ে ওকে অনুসরণ করল, আবছায়া পরিসীমা পার হয়েই সে দেখতে পেল অলিভকে ঃ কুয়োর কিনারায় চমৎকার ভঙ্গীতে বসে আছে ও, পা দুটো লুকিয়ে রয়েছে কুয়োকে ঘিরে থাকা ঘাস ও আগাছার ঘন বিন্যাসের গভীরে।

ও ইশারায় বেনসনকে ওর পাশে এসে বসতে বলল, এবং একটা বলিষ্ঠ হাতের বাঁধনে ওর কোমর ধরা পড়তেই ও অনুচ্চ গলায় হাসল।

জায়গাটা আমার দারুণ লাগে—দীর্ঘ নীরবতাকে ছুটি দিয়ে ও বলল, কি অন্ধকার ছমছমে! জানো জেম, এখানে একা বসে থাকতে আমার সাহসই হবে না! হয়তো ভাবব, সব জঙ্গল আর গাছের পেছনে কত কী ভয়ঙ্কর জিনিস লুকিয়ে রয়েছে, এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। ও বাবা!

তার চেয়ে বরং চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি—নরম গলায় বলল বেনসন, এই কুয়ো এলাকাটা সব সময় খুব স্বাস্থ্যকর নয়, বিশেষত গরমের সময়। চল, চলে যাই।

মেয়েটি অবাধ্য ঝাঁকুনিতে সারা দেহ নাকিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে নিজের জায়গায় আরও ভালো করে বসল।

শান্তিতে তোমার চুরুট খাও। ও শান্ত স্বরে বলল, এখানে বসে নির্জনে কথা বলতে আমার বেশ ভালো লাগছে। উইলফ্রেড-এর খবর কিছু পেয়েছ?

উহুঁ, কোন খবর নেই।

বড় অদ্ভুত ভাবে উধাও হয়ে গেল, তাই না? ও বলে চলল, মনে হয়, নতুন কোন বিপদ, আর তোমার নামে আবার সেই গদগদ ভাষায় চিঠি পাঠাবে ঃ প্রিয় জেম, আমাকে এবারের মতো বাঁচাও।

জেম বেনসন একরাশ সুগন্ধী ধোঁয়ার মেঘ উড়িয়ে দিল বাতাসে, চুরুটটা দাঁতের ফাঁকে চেপে কোটের হাতা থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলল মাটিতে।

তোমাকে ছাড়া ও যে কি ভাবে চলত কে জানে—বেনসনের হাতে অনুরাগী চাপ দিয়ে অলিভ বলল, বহুদিন আগেই ও হয়তো তলিয়ে যেত। আমাদের বিয়ের পর, জেম, নতুন সম্পর্কের সুবাদে আমি ওকে কিছুটা জ্ঞান দেব। ও একটু ছন্নছাড়া, কিন্তু ওর কয়েকটা ভালো গুণও আচে। বেচারা।

দুর্ভাগ্য বশত সেই চমৎকার গুণগুলো আমার ঠিক নজরে আসেনি। অস্বাভাবিক তিক্ততায় বলল বেনসন।

ও আর কারও শত্রু নয়, নিজেরই শত্রু—বেনসনের আকস্মিক বিস্ফোরণে চমকে উঠে বলল অলিভ।

তুমি ওর সম্পর্কে কতটুকু জানো? সংক্ষিপ্ত স্বরে বলল অপরজন, ব্ল্যাকমেল করতে ওর বাধত না, নিজের সামান্য লাভের জন্যে বন্ধুর জীবন ধবংস করতে পর্যন্ত ওর বিবে আটকায়নি। একটা লোফার, ইতর,

মিথ্যেবাদী!

গম্ভীর অথচ শান্ত দৃষ্টিতে মেয়েটি তাকাল তার দিকে, কোন কথা না বলে তার একটা হাত টেনে নিল কাছে, এবং ওরা নিশ্চুপে বসে রইল।

এদিকে সন্ধ্যা গভীর হয়ে লীন হয়ে যায় রাতে, গাছের শাখা প্রশাখায় পরিস্রুত চাঁদের পর্যাপ্ত আলো ওদের ঘিরে ফেলে রূপোলি তন্তজালে। অলিভের মাথা তখন বেনসনের কাঁধে। হঠাৎই এক তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ও লাফিয়ে উঠল!

কী ওটা? রুদ্ধশ্বাসে আর্তনাদ করে উঠল অলিভ।

কীসের কথা বলছ? জানতে চাইল বেনসন, লাফিয়ে উঠে ওর হাত চেপে ধরলর সুদৃঢ় মুঠিতে।

হঠাৎই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম—বেনসনের কাঁধে আস্তে আস্তে হাত রাখল ও, মনে হল, এইমাত্র যে কথাগুলো বললাম, সেগুলোই আমার কানে বাজছে। আমি স্পষ্ট শুনলাম যেন কেউ আমাদের ঠিক পেছন থেকেই ফিসফিস করে বলল, জেম, আমাকে এবারের মতো বাঁচাও!

কল্পনা—বলল বেনসন, কিন্তু তার গলা কেঁপে গেল, আসলে তুমি এই অন্ধকারে, গাছের ছায়ায় ভয় পেয়েছ। চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

না, ভয় আমি পাইনি—বলল মেয়েটি, তারপর আবার বসল নিজের জায়গায়—তুমি সঙ্গে থাকলে আমি কাউকে ভয় পাই না, জেম। কেন যে বোকার মতো চেঁচিয়ে উঠলাম!

বেনসন কোন উত্তর না দিয়ে চুরুট টানতে লাগল। তার চুরুটের টান এত গভীর হল যে প্রতি প্রশ্বাসে চুরুটের আগুনে তার মুখ আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল। দৃঢ় ও কঠিন ইস্পাত সুলভ একটা হাত সে বাড়িয়ে দিল অলিভের পিছন দিয়ে, অবশেষে থামল এসে ইঁটবাঁধানো পাঁচিলের ওপর।

তোমার শীত করছে না তো? ও একটু নড়ে উঠতেই নরম গলায় জানতে চাইল জেম বেনসন।

না—ও কেঁপে উঠল, বছরের এ সময়টা তো শীত করার কথা নয়, কুয়োটার ভেতর থেকে কেমন একটা ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে বাতাস উঠে আসছে।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই কুয়োর গভীর থেকে একটা জলের ছলকানির শব্দ ভেসে এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চাপা আতঙ্কিত চিৎকার করে কুয়োর পাড় থেকে দ্বিতীয়বার লাফিয়ে উঠল অলিভ।

কী হল আবার? ভয়ার্ত সুরে জিগ্যেস করলর বেনসন। ওর পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মারল কুয়োর মধ্যে, যেন অলিভের ভয়ের কারণটা এখুনি উঠে আসবে কুয়ো থেকে।

ওঃ, আমার ব্রেসলেট—দুঃখে কেঁদে ফেলল অলিভ, আমার মায়ের দেওয়া। ওটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে।

তোমার ব্রেসলেট! যান্ত্রিক ভাবে পুনরাবৃত্তি করল বেনসন, তোমার ব্রেসলেট! কোনটা, হীরেরটা?

যেটা আমার মায়ের ছিল—অলিভ বলল, ওটা সহজেই তোলা যাবে, কি বলো?

আগে যে করে হোক কুয়োর জলটা আমাদের বের করে দিতে হবে।

তোমার ব্রেসলেট! বোকার মতো আবার বলল বেনসন।

জেম, কী হয়েছে তোমার? ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইল অলিভ।

কারণ যে মানুষটাকে ও ভালোবাসে, সে এখন নিঃসীম আতঙ্কে জরীপ করছে অলিভকে। তার বিকৃত মুখের ফ্যাকাশে পাণ্ডুর রঙের জন্যে চাঁদের আলোই একমাত্র দায়ী নয়। ভয়ে কুঁকড়ে কুয়োর কিনারার দিকে সরে গেল অলিভ।

ওর আতঙ্ক বেনসনের চোখ এড়াল না, অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে স্বাভাবিক করে ওর হাত ধরল সে। চাপা স্বরে বিড় বিড় করে বলল, আমার ছোট্ট খুকু সোনা! আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ তো! যখন তুমি বোধ হয় আমার কাছ থেকে পড়ে যাচ্ছ কুয়োর ভেতর—নীচে—অনেক নীচে—

বেনসনের গলা ভেঙে গেল, আর উদভ্রান্ত অসহায় মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে, তাকে আঁকড়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

এই, কী হচ্ছে! কেঁদো না লক্ষ্মীটি, কেঁদো না—আদরের সুরে বলল বেনসন।

কাল সকালে আমরা কাঁটা-বঁড়শি দড়ি নিয়ে এখানে আসব, তারপর মাছ ধরার মতো খুঁজে তুলে আনব ব্রেসলেটটা। একটা নতুন খেলা হবে, না? অর্ধেক হাসি অর্ধেক কান্না মেশানো বলায় বলল অলিভ।

না ওটা অন্য ভাবে তুলতে হবে—বেনসন বলল, তবে দেখো, কাল সকালের মধ্যেই জিনিসটা তুমি ফেরত পাবে। কিন্তু কথা দাও, তার আগে ব্রেসলেটটা যে হারিয়েছে সে কথা কাউকে তুমি বলবে না। কথা দাও।

অবাক হয়ে অলিভ বলল, কথা দিলাম। কিন্তু কেন?

প্রথমত, জিনিসটা খুব দামি—আর, তাছাড়া—তাছাড়া আরও অনেক কারণ আছে। আর...জিনিসটা তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়াটা তো আমারই কর্তব্য।

কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে আনবে নাকি? দুষ্টুমি করে ও জানতে চাইল।

চল, বাড়ি চল—শান্ত গলায় বেনসন বলল, তোমার মাথায় যত সব আজেবাজে বীভৎস খেয়াল চাপছে।

মেয়েটি ফিরে তাকিয়ে বেনসনের হাত ধরল, আলগা পায়ে দুজনে রওনা হল বাড়ির দিকে।

মিসেস বেনসন বাইরের উঠোনে বসে ছিলেন, ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। অনুযোগের সুরে ছেলেকে বললেন, ওকে এতক্ষণ বাইরে রেখেছিস কী করতে? কোথায় ছিলি তোরা?

কুয়োর পাড়ে বসে ছিলাম—হেসে বলল অলিভ, আমাদের ভবিষ্যৎ আলোচনা করছিলাম।

জায়গাটা মোটেই ভালো নয়—জোরের সঙ্গে বললেন মিসেস বেনসন, আমার মনে হয়, কুয়োটা ভরাট করে ফেলা উচিত, জেম।

ঠিক আছে—ধীরে ধীরে সে বলল, অনেক আগে যে কেন করা হয়নি কে জানে।

তার মা অলিভকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই খালি চেয়ারটায় বসল বেনসন, দু'হাত দু'পাশে অস ভাবে এলিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়। কিছুক্ষণ পরে সে উঠে পড়ল, রওনা হল দোতলার বিশেষ একটা ঘরের দিকে। ঘরটায় খেলাধূলার নানান সাজ-সরঞ্জাম থাকে। সেখান থেকে সমুদ্রে মাছ ধরার একটা দড়ি ও কয়েকটা বঁড়শি নিয়ে সে চুপিসাড়ে আবার নেমে এল নীচে। পার্ক পেরিয়ে হালকা পায়ে রওনা হল কুয়োটার দিকে। তারপর দড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিয়ে কুয়োর পাড়ে বসে সেটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল ভেতরে।

ঠোঁট টিপে বসে রইল বেনসন, শুধু কখনও কখনও চমকে উঠে তাকাতে লাগল চারপাশে, যেন এক্ষুনি কাউকে দেখতে পাবে গাছের সারির আড়াল থেকে উঁকি মেরে তার দিকে লক্ষ্য রাখছে। বার বার সে দড়ি ফেলে চেষ্টা করতে লাগল, অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে, সে শুনতে পেল কুয়োর ভেতরের দেওয়ালে কিছু একটা ধাক্কা খাওয়ার ছোট্ট ধাতব শব্দ।

বেনসনের শ্বাসপ্রশ্বাস স্তব্ধ হল, ভয় ও ত্রাস ভুলে গিয়ে সে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে দঁড়িটাকে টেনে তুলতে লাগল, যাতে বঁড়শিতে গাঁথা জিনিসটা খুলে পড়ে না যায়। ওর নাড়ির স্পন্দন দ্রুত হল, চোখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল। দড়ি ক্রমে ছোট হয়ে আসতেই সে বঁড়শিতে গাঁথা জিনিসটা অস্পষ্ট দেখতে পেল, এবং অবিচলিত হাতে বাকি দড়িটুকু টেনে তুলল। দেখল, ব্রেসলেটের বদলে সে একগোছা চাবি বঁড়শিতে গেঁথেছে।

অস্ফুট চিৎকার করে বঁড়শিতে ঝাঁকুনি দিয়ে চাবির গোছাটা সে আবার জলে ফেলে দিল, তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। রাতের নিস্তব্ধতা ভাঙতে কোন শব্দ সাহসী হল না। কিছুক্ষণ পায়চারি, হাত-পা ছড়িয়ে, আবার কুয়োর কাছে ফিরে এসে তার কাজ শুরু করল।

আরও এক ঘণ্টা কি তারও বেশি সে দড়ি নিয়ে বৃথাই চেষ্টা করল। আগ্রহের তেজে ভয়-ডর সে ভুলেই গেল, এবং কুয়োর ভেতরে চোখ নামিয়ে ধীরে অথচ সতর্ক ভাবে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। দু-দুবার বঁড়শিটা বিঁধল এবং শত চেষ্টা করেও এবার সে আর ছাড়াতে পারল না। তখন দড়িটাকে কুয়োর ভেতরে ফেলে দিয়ে মাথা নীচু করে সে হেঁটে ফিরে এল বাড়িতে।

প্রথমে সে গেল বাড়ির পিছন দিকের আস্তাবলে, তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল। অবশেষে জামা কাপড় না ছেড়েই বিছানায় গা এলিয়ে দিল, তলিয়ে গেল অস্বস্তিভরা ঘুমে।

আর কেউ জেগে ওঠার আগেই সে ঘুম থেকে উঠল এবং চুপিসারে নেমে এল নীচে। তারপর ধীর পায়ে রওনা হল আস্তাবলের দিকে।

মরচে ধরা পাম্পের হাতলের ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ এবং লাল টালি বাঁধানো উঠোনে ছড়িয়ে থাকা জলের দাগ জানিয়ে দেয় আরও একজনের ঘুম ভেঙেছে। মাত্র কয়েক পা এগোতেই বেনসনের নজরে পড়ল শক্তিশালী চেহারার বালি রং চুল একটি লোক পাম্পের কাছে বসে প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁফাচ্ছে।

সব কিছু তৈরি, জর্জ? সে শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ বাবু—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালে হাত বুলিয়ে লোকটি বলল, বব ভেতরে সব ব্যবস্থা শেষ করে এনেছে। নাইবার পক্ষে চমৎকার সকাল। ও কুয়োর জল নিশ্চয়ই বরফের মতো ঠান্ডা হবে।

জলদি কাজ শেষ করো—অধৈর্য ভাবে বলল বেনসন।

ঠিক আছে বাবু—জর্জ বলল, পাম্পের ওপরে রাখা একটা খুব ছোট্ট তোয়ালে তুলে নিয়ে জোরে জোরে মুখ ঘষল—ঝটপট শেষ কর বব।

তার ডাকে সাড়ো দিয়ে আস্তাবলের দরজায় একটি লোক আবির্ভূত হল। তার কনুইয়ের কাছে গলানো এক লাছি শক্ত দড়ি ও হাতে একটা ধাতব বাতিদানে বসানো মোমবাতি।

তার বাবুর নজর অনুসরণ করে জর্জ বলল, এটা হাওয়াটা পরখ করার জন্যে বাবু। অনেক সময় এঁদো কুয়োর হাওয়াতে বিষ থাকে। ওতে এই মোমবাতি যদি জ্বলে তাহলে বুঝতে হবে মানুষের কিছু হবে না।

বেনসন সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল এবং জর্জ তড়িঘড়ি তার শার্টের কলার তুলে ওয়েস্টকোটে হাত গলিয়ে তাকে অনুসরণ করল।

ওরা তিনজন বড় বড় ভিজে ঘাসের মধ্যে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেল কুয়োর কাছে। সব দড়িটাকে ছুড়ে ফেলল মাটিতে এবং বাবুর কাছ থেকে ইশারা পেয়ে বাতিদানে বসানো মোমবাতিটা তার দিকে এগিয়ে দিল।

বেনসন তার কাছ থেকে মোমবাতিটা নিয়ে দড়ির সঙ্গে বাঁধল। তারপর সেটা কুয়োর পাড়ে বসিয়ে দেশলাই জ্বেলে ধরাল এবং আস্তে আস্তে নামাতে শুরু করল নীচে—কুয়োর ভেতরে।

শক্ত করে ধরুন বাবু—তাড়াতাড়ি বলে উঠল জর্জ, একটু কাত করে না নামালে দড়িটাই পুড়ে যাবে—

তার কথা শেষ হতে না হতেই দড়িটা পুড়ে গিয়ে মোমবাতিটা ছিটকে পড়ল জলে।

বেনসন চাপা স্বরে দিব্যি কাটল।

দাঁড়ান, এক্ষুনি আর একটা নিয়ে আসি—যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল সে।

বলি এখানে মালিকটা কে? তুমি না আমি! কর্কশ গলায় বলল বেনসন।

জর্জ ধীর পায়ে আবার ফিরে এল, বাবুর চোখে এক পলক তাকিয়ে তার প্রতিবাদ জিভেই থেমে গেল, এবং সে গম্ভীর মুখে বেনসনের কার্যকলাপ দেখতে লাগল।

বেনসন ততক্ষণে কুয়োর পাড়ে বসে গায়ের জামা-কাপড় খুলতে শুরু করেছে জর্জ ও বব দুজনেই অবাক কৌতূহলী চোখে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নীরব মুখমণ্ডলে তখন তার হিংস্র প্রতিজ্ঞার ছাপ।

দড়ির ফাঁস দেওয়া প্রান্তটা দু'হাতের তলায় গলিয়ে নিল বেনসন, তারপর কুয়োর পায়ে বসে একটা পা ঝুলিয়ে দিল ভেতরে।

জর্জ দড়িটা শক্ত করে চেপে ধরল এবং ববকেও একই কাজ করতে ইশারা করল।

জল পেলেই আমি চেঁচিয়ে বলব—বলল বেনসন, তখন আরও গজ তিনেক দড়ি ঝপপট ছেড়ে দিও যাতে কুয়োর তলায় পৌঁছতে পারি।

ঠিক আছে বাবু—দুজনেই সমস্বরে উত্তর দিল।

বেনসন দ্বিতীয় পা-টাও ঝুলিয়ে দিল ভেতরে, তারপর ধীরে ধীরে বলল, জর্জ, দড়িটে টান দেওয়া মাত্রই কিন্তু আমাকে তুলতে শুরু করবে। নাও এখন দড়ি নামাও।

ওদের হাত থেকে দড়ি নেমে চলল। এক সময় অন্ধকার গহ্বর থেকে এক প্রতিধ্বনিময় চিৎকার ও হালকা ছলাৎ শব্দ ওদের জানিয়ে দিল বেনসন জলে পৌঁছে গেছে। আরও তিন গজ ওরা দঁড়ি ছাড়ল, তারপর হাতের মুঠো আলগা করে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষায় রইল।

বাবু নীচে নেমে গেছে—চাপা গলায় বব বলল।

অপর জন সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল, হাতের তালু দুটো সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে আরও শক্ত হাতে দড়ি চেপে ধরল।

পুরো একটা মিনিট কেটে গেল, ওরা দুজন অস্বস্তিভরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর হঠাৎই এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি ও তার পরবর্তী অপেক্ষাকৃত দুর্বল ধারাবাহিক ঝাঁকুনিতে দড়িটা ওদের হাত থেকে প্রায় ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল।

টান্! টান্! চিৎকার করে উঠল জর্জ, এবং কুয়োর গায়ে এক পা চেপে প্রাণপণে টানতে লাগল দড়িটা—শিগগিরই টান! মনে হচ্ছে, বাবু কোথাও ঠেকে গেছে, নড়ছে না, টান—

ওদের আসুরিক পরিশ্রমে দড়িটা ধীরে ধীরে উঠতে লাগল, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে, অবশেষে শোনা গেল জলের ভেতরে এক ভয়ংকর হুটোপাটির শব্দ এবং তাকে অনুস্বরণ করে অন্ধকার গহ্বর থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে এল অমানুষিক আতঙ্কের এক হিমেল চিৎকার!

ওঃ, কী ভারী লাগছে বাবুকে! হাঁফাতে হাঁফাতে বলল বব, কোথাও আটকে গেছে নাকি! বাবু চুপচাপ থাকুন, দোহাই আপনার, নড়চড় করবেন না।

কারণ টান-টান দড়িটা তার শেষ প্রান্তে ঝুলন্ত ওজনের ধস্তাধস্তিতে ভয়ঙ্কর ভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে।

ওরা দুজন উঃ-আঃ করে হাঁফাতে হাঁফাতে এক ফুট দু-ফুট করে দড়িটাকে টেনে তুলতে লাগল।

এই তো, হয়ে গেছে বাবু—আনন্দে চিৎকার করে বলল জর্জ।

ওর একটা পা কুয়োর গায়ে সর্ব শক্তিতে গাঁথা, আর দু'হাতে দড়ি টেনে চলেছে অক্লান্ত ভাবে, দড়ির বোঝা ক্রমে উঠে আসছে ওপরে। সজোরে এক লম্বা টান মারতেই একটা মৃত মানুষের মুখ উঁকি মারল কুয়োর কিনারায়, তার দুচোখ ও নাকের ফুটো কাদায় বোজা! তার ঠিক পিছনেই তাদের বাবুর অমানুষিক বীভৎস মুখ—কিন্তু এটা জর্জের নজরে পড়ল অনেক দেরিতে—কারণ এক বিকট চিৎকার করে দড়ি ছেড়ে দিয়ে সে তখন পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় তার সঙ্গী ছিটকে পড়েছে মাটিতে, দড়ি পিছলে গেছে তার হাতের মুঠো থেকে। সুতরাং পরক্ষণেই শোনা গেল প্রচণ্ড এক ঝপাং শব্দ।

বোকা কোথাকার! থতিয়ে বলল বব, অসহায় ভাবে ছুটে গেল কুয়োর কাছে।

ছোট! ছোট! জর্জ চিৎকার করে উঠল, ছুটে আর একটা দড়ি নিয়ে আয়!

কুয়োর ভেতরে ঝুঁকে পড়ে প্রাণান্ত চিৎকারে ডাকতে লাগল সে। তার সঙ্গী তখন পাগলের মতো চেঁচাতে ছুটে চলেছে আস্তাবলের দিকে। জর্জের কণ্ঠস্বর নির্মম পৌনঃপুনিকতায় প্রতিধবনিত হয়ে ফিরতে লাগল কুয়োর ওপর থেকে নীচে, নীচে থেকে ওপরে। কিন্তু আর সব তখন একেবারে চুপচাপ।

দি ভ্যানিশড্ ফেসেস্

টম ক্রিস্টেনসেন



একটা সময় ছিল যখন আমি প্রতি রাতে শহরতলীর পথে পথে বহুক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বেরিয়ে পড়তাম। আমার মা-বাবা এই নৈশ ভ্রমণে মোটেই খুশি ছিলেন না, ফলে আমার শোবার ঘরে কাঠের দেওয়ালে প্রতিটি ফাটলের ওপর ধর্মীয় বিধি লেখা কাগজের চিরকুট আঠা নিয়ে লাগিয়ে দিতেন, কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা। প্রতি সন্ধ্যায় আমি বেরিয়ে পড়লাম, এবং গভীর রাতে ফিরে এসে এমন একটা জায়গায় সামান্য ফাটল দিয়ে বাইরের বাতাস ঘরে এসে ঢুকছে। এতে আমি এক অদ্ভুত দুষ্টুমির আনন্দ পেতাম, কারণ সেই ফাটল দিয়ে সমস্ত অশুভ আত্মা ঘরে এসে ঢুকতে পারে, আর ওদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগত না। মনের অস্থির অনুভূতি আমি কখনও হারাতে চাই না।

পথে বেড়াতে বেরিয়ে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতাম। গভীর রাতে অপ্রত্যাশিত ভাবে ওদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে পড়ায় ওদের সেই সব মুখ আমি দেখতে পেতাম, সেগুলো ওরা লুকিয়ে ফেলতে পারলেই স্বস্তি পেতো। আমি লক্ষ্য করতাম, ওদের মুখের ওপর অন্ধকারের প্রতি আতঙ্কের অসংখ্য রেখা, নিজেদের প্রতি ভয়ের করাল ছায়া। এই সব মুখ আমি সংগ্রহ করতাম, এবং দিনের বেলা তুহিন-আনন্দে সেগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতাম। অনেকটা যেন শয়তান-নাচের মুখোস সংগ্রহ করার মতো। শুধু একটা মুখোসই তাতে নেই, আমার নিজেরটা।

একদিন সন্ধ্যায় কিয়োবাশি জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখি আমার বন্ধু কাপড় ব্যবসায়ী, মাৎসুয়ার দোকান থেকে হালকা আলো বেরিয়ে আসছে। ওর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছে আজ থেকে দুবছর আগে, সুতরাং আপন মনেই হেসে উঠে ওর দোকানে ঢুকে পড়লাম। মনে এক অদ্ভুত শীতল ঘৃণা। নিজের আচরণে আমি নিজেই বিস্মিত। মুখোস সংগ্রহ করতে করতে আমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি?

আমাকে সাদর আহ্বান জানিয়ে মাৎসুয়া চা-পানের অনুরোধ করল। পিতলের ধুনীটা সামনে এগিয়ে দিল যাতে আমি হাত দুটো গরম করতে পারি।

শুনেছি তুমি নাকি অন্ধকারে পথে পথে ঘুরে বেড়াও? এ কি সত্যি? আমার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ!

কখনো কোন আত্মার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

না।

কখনো 'মুজিনা' দেখেছ?

না! মুজিনা কাকে বলে আমি জানি না।

আমিও জানি না, তবে একজন ধর্মযাজককে আমি জিগ্যেস করেছিলাম যে আমি যা দেখেছি সেটা কি, তাতে উনি বলেছিলেন, ওটা মুজিনা।

কিন্তু মুজিনা কি? আমি জানতে চাইলাম।

জানি না, সেই ধর্মযাজকও বলতে পারেননি।

নিজের হাঁটুতে চোখ রেখে আমি বসে রইলাম, কিন্তু মাৎসুয়া আর কিছু বলছে না দেখে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ওর দিকে চোখ তুলে দেখলাম, মুখ হাঁ করে শূণ্যদৃষ্টি নিয়ে বসে আছে। মনে হল, ওর ভেতরটা যেন ফাঁপা হয়ে গেছে।

তারপর দুটো আলোর কণা ওর কালো চোখের গভীরে হঠাৎই জন্ম নিল, এবং ক্রমশ যেন কাছে আসতে লাগল, অনেকটা অন্ধকার রাস্তা ধরে এগিয়ে আসা লণ্ঠনের মতো। অবশেষে ওরা ওপরের স্তরে উঠে এল। ও চোখ বন্ধ করে আর্তনাদ করে উঠল এবং সংবিত ফিরে পেল।

ওঃ, কী ভয়ঙ্কর! মাৎসুয়া বলল, মুজিনা কী বীভৎস—সে আমি বলে বোঝাতে পারব না, কারণ বোঝানোর মতো কিছু নেই—মুজিনা নৃশংস, তবে পালাবার সুযোগ দেয়—আপাতভাবে। যদি ওটা একটা কান ছিঁড়ে নিত—অথবা কাউকে খেয়ে ফেলত—তাহলে আমি হয়তো বুঝতে পারতাম—কিন্তু মুজিনা সে সব কিছুই করে না—ওঃ, আমার ভীষণ ভয় করছে।

মাৎসুয়া হাঁ করল, যেন এক্ষুনি চিৎকার করে উঠবে, এবং সেইভাবেই অনেকক্ষণ বসে রইল। অনিঃসৃত সেই পাগলা-করা দীর্ঘ চিৎকারে আমার কানে যেন তালা লেগে গেল।

তারপর এক সময় ওর মুখ বন্ধ হল, এবং কোন রকম ভূমিকা না করেই চাপা গলায়, অনেকটা গানের ভঙ্গীতে ও বলতে শুরু করল। যেন এ গল্প ওর মুখস্থ হয়ে গেছে।

একদিন রাতে একটা মাঠের ওপর দিয়ে সংক্ষেপে পথ সারছিলাম। সাধারণত এই সময়েই লোকে অশুভ জিনিসের দেখা পায়। চারদিকে ঘন অন্ধকার, কিছুই নজরে পড়ছে না। তাহলে কেমন করে আমি ছোট্ট পুকুর, একটা গাছ আর ওই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম? আকাশে চাঁদ ছিল না, এবং সেই পুকুর, গাছ কিংবা মেয়েটির কাছ থেকেও কোন আলো আমার চোখে আসেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি দেখতে পেলাম। মেয়েটি মাথা ঝুঁকিয়ে বিষণ্ণভাবে বসে ছিল। কান্নার তীব্র দমকে ওর কাঁধ দুটো থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে ওর খুব কাছে বসলাম, ভয় হচ্ছিল, ও হয়তো পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এখানে কোন যুবতীর বসে থাকা ঠিক নয়—আমি ওকে বললাম, এবং ওর কাঁধে হাত রাখলাম। একই সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, ওর পরণের কিমোনো অদ্ভুত সুন্দর রেশমের তৈরি। আমি তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিলাম। আমার দোকানেও কখনও এত ভালো রেশমী কাপড় আসেনি। এখনও যেন সে কাপড় আমি অনুভব করতে পারছি।

রাতে এই সময়ে এ জায়গায় ভয় আছে! আমি বলে চললাম, কিন্তু ও আরও ঝুঁকে পড়ল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলল। পোশাকের চওড়া হাতার ও নিজের মুখ লুকিয়ে রইল।

আপনার কোনও সাহায্য দরকার থাকলে বলুন? কীসের দুঃখে—

ও একটু সরে বসল।

আমি আপনাকে সাহায্যই করতে চাই। আমি আপনাকে কিছুতেই আত্মহত্যা করতে দেব না! দয়া করে কাঁদবেন না!

ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, যেন আমার কথায় ক্লান্তি বোধ করছে। তারপর আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু আমি চলে যেতে পারলাম না। ওকে একা রেখে আমি যেতে পারি না। সুতরাং উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাছে গেলাম।

আসুন! এই বিপজ্জনক পুকুরের কাছ থেকে আমরা চলে যাই! আমি বললাম। তখন ও ঘুরে দাঁড়াল। দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে রেখেছে। মনে হল যেন ওর কান্না ভেজা চোখ দুটো আমার কাছ থেকে লুকোতে চাইছে। তারপর ও কপাল ও নাকের ওপর দিয়ে হাত বুলোনোর একটা ভঙ্গী করল। আমি ঝুঁকে পড়লাম। ওর মুখটা দেখতে চাইলাম, ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম, ওর চোখে চোখ রাখতে চাইলাম, কিন্তু—ওর কোন চোখ নেই, নাক নেই, মুখ নেই। ওর গোটা মুখমণ্ডল ডিসের মতই মসৃণ।

মাৎসুয়া আমার দিকে চোখ ফেরাল, যেন সাহায্যের আশায়, কিন্তু আমি দেখলাম, ওর গাল দুটো ভাঙা এবং সেগুলো ওর মুখোসের ওপর মজাদার ভাঙাচোরা রেখার জন্ম দিয়েছে। ওর মুখের প্রতিটি অদ্ভুত খুঁটিনাটি আমি নিষ্ঠুর স্পষ্টভাবে দেখতে লাগলাম। কেন, তা বলতে পারি না।

আমি সরবে হাসলাম, নিজের দৃঢ় ভরাট গালে আত্মতুষ্টিতে হাত বুলিয়ে বললাম, এই তোমার মুজিনা? আমার কথায় নিষ্করুণ ব্যাঙ্গ ঝরে পড়ল।

এমনি করে হেসে উড়িয়ে দিও না! মাৎসুয়া অনুনয় করে বলল, সে যে কি ভয়ঙ্কর কি বলব! আরেকটু হলে আমি ভয়েই মরে গিয়েছিলাম। মাঠ ধরে আমি তখন ছুটতে শুরু করেছি, উঁচু নিচু জমিতে হোঁচট খেতে খেতে ছুটে চলেছি, আর এমন ভয়ংকর চিৎকার করে চলেছি যেন আমার আত্মা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পালাতে চাইছে, আরও জোরে ছুটতে চাইছে। ওই মেয়েটি তারপর কী করেছে জানি না। আমি ঘুরে তাকাতে সাহস পাইনি—

মাৎসুয়া এক মুহূর্ত থামল এবং শরীরের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় জড়ো করে আবার তার কাহিনী শুরু করল। ও আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

এক টুকরো টিস্যু কাগজ নিয়ে আমি নাক মুছলাম। তারপর ভুরু ওপর-নীচ করে শরীরের হাল্কা ক্লান্তিটুকু দূর করতে চাইলাম।

গল্পের খেই ধরে একঘেয়ে গুণগুণ স্বরে মাৎসুয়া আবার বলতে শুরু করল ঃ

তখন, সৌভাগ্যবশে, কিছু দূরে একটা ছোট্ট আলো আমার নজরে পড়ল। ঠিক বুঝতে পারলাম না, আলোটা কোন খোলা জানালা দিয়ে আসছে, না রাস্তা থেকে আসছে, কিন্তু এটুকু মনে হল কাছাকাছি কোন লোকালয় রয়েছে, এবং আমি যেন ভীষণ স্বস্তি পেলাম। আলোটা ক্রমশ বড় হতে লাগল। সামান্য নড়েও উঠল, আর যেন কাউকে দেখতে পেলাম। আলোটা রাস্তা ধরেই এগিয়ে আসছে।

আমি ছুটে গেলাম সেই আলো লক্ষ্য করে এবং আবিষ্কার করলাম, এক ফেরিওয়ালা তার জিনিসপত্রের ডালা নামিয়ে সবে সাজতে শুরু করেছে।

বাঁচান! বাঁচান! আমি চিৎকার করে উঠলাম।

ছোট্ট আলোটা তার সস্তা নীল প্যান্টের ওপর এক লাল্চে আভা ছড়িয়ে দিয়েছে, এবং তার হাতের কয়েকটা ছোট গামলায় প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে পড়েছে।

কী হয়েছে? চিৎকার করছেন কেন? সে রুক্ষ সংক্ষিপ্ত স্বরে প্রশ্ন করল।

ওঃ, সে আমি বলতে পারব না!

রাস্তার চোর-ডাকাত বেরিয়েছে নাকি? সে অবজ্ঞার সুরে বলল।

না, না! আমি কিছু বুঝতে পারছি না! আর আপনাকে বলতেও পারছি না,

যন্ত্রণাকাতর চিৎকার করে আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ও—তাহলে বোধ হয় এই ব্যাপার? নিজের মুখের ওপর হাত বুলিয়ে সে উত্তর দিল, এবং তখন আমি দেখতে পেলাম। লণ্ঠনের আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, তার চোখ, নাক, মুখ কিছু—ঠিক একটা ডিমের মতো!

কী করে যে বাড়ি ফিরেছিলাম জানি না।

মাৎসুয়া সামনে ঝুঁকে বসল। ও এখনও আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে। ওর কপালে অসংখ্য খাপছাড়া রেখা এবং ওর ঠোঁট যেন ঝুলে পড়েছে।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না! ও ফিস ফিস করে বলল, মাঝ রাতে হঠাৎ হঠাৎ আমি জেগে উঠি এবং এক ভয়ংকর যন্ত্রণা টের পাই—সেই আতঙ্ক যেন এখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি। কি করে সেই রাতের কথা আমি ভুলব? কী করব আমি এখন? আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব!

ওর জন্য আমার মনে এতটুকু দরদ হল না। ওর মুখের চেহারা এত হাস্যকর আর কথাগুলো এত গতানুগতিক যে আমি হেসে উঠে বললাম, এই সব?

মাৎসুয়া বিহ্বলভাবে চোখ তুলে তাকাল এবং একই সঙ্গে আমি আমার ঠান্ডা কপাল মুছলাম। আমার কপালে ওর মত কোন ভাঁজ নেই ভেবে এক শয়তানি আনন্দ অনুভব করলাম।

হঠাৎই মাৎসুয়ার মুখ পাল্টে গেল। উদভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ হাঁ করে এক বিকট চিৎকার করে উঠল।

আমি ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি নিয়ে চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে রইলাম।

মুজিনা! আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে ও চিৎকার করে উঠল। বিরাট এক গর্তের মতো ওর মুখ এখনও হাঁ করা। ওর গলা থেকে এক অদ্ভুত ঘরঘর শব্দ উঠে এল, আর তার পরই শুরু হল আকস্মিক, দীর্ঘ, চিৎকারের মিছিল। ও লাফিয়ে উঠল, ধুনীটাকে উল্টে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল দোকানের বাইরে।

ও পাগল হয়ে গেছে, এই কথা ভেবে আমি যেমন বসে ছিলাম তেমনই বসে রইলাম। লক্ষ্য করলাম, ধুনীর জ্বলন্ত কাঠকয়লাগুলো মেঝের কার্পেট পুড়িয়ে গর্ত করে ফেলেছে। একটা ছোট্ট আগুনের শিখা কার্পেটের এক প্রান্ত লেহন করে তার যাত্রা শুরু করল। অন্য প্রান্ত ধরে আরো একটা শিখা একইভাবে এগিয়ে চলল। এক সময় ওদের দেখা হল, এবং এক বিশাল শিখা জন্ম নিল। সেটা ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। মনে হল, ধোঁয়ায় আমার চোখ জ্বলছে, ফলে আমি হাত তুলে চোখ ঘষতে গেলাম। তখনই আবিষ্কার করলাম, আমার কোন চোখ নেই। মুখের ওপর হাত বোলালাম। আমার মুখ ডিমের মতোই মসৃণ! নিঃসীম আতঙ্কে আমি লাফিয়ে উঠলাম, ছুটে গেলাম ড্রয়ারের কাছে, এক হ্যাঁচকায় ড্রয়ার খুলে একটা আয়না বের করে তাতে দেখলাম। একটা সাদা ডিম্বাকৃতি খোল, তাতে কোন আঁচড়টি পর্যন্ত নেই! আমার চুলগুলো অপার্থিব ভঙ্গিতে ডিমের ওপর গজিয়ে উঠেছে।

কিন্তু চোখ, যা দিয়ে আমি এ সব দেখছি? আমার সেই চোখ কোথায়?

ডিমের সাদা খোল ভেদ করে আমি আয়নায় তাকালাম। দেখলাম, ডিমটা আমার মাথার নড়াচড়া অবিকল নকল করে চলেছে—আমার চুল দিয়ে আমারই ঘাড়ের ওপর বসে আছে।

আতঙ্কে সবকিছু ভুলে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম, আয়নাটা হাতে নিয়ে আগুনের লকলকে শিখা ভেদ করে লাফিয়ে পড়লাম, এবং ছুটে বেরিয়ে গেলাম রাস্তায়। চারপাশে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন লোক চুপচাপ শান্ত পায়ে এগিয়ে আসছে। ওরা এখনও আগুন দেখতে পায়নি।

চট করে হাত তুলে মুখ ঢাকা দিয়ে ছুটে চললাম বাড়ির দিকে।

বাড়ি ফিরে একটা টুপি দিয়ে মুখ আড়াল করে আয়নাটা হাতে নিয়েই মা-বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তোমাদের কাছে ধর্মীয় বিধি লেখা আর কোন কাগজ আছে? আমার ঘরে এখনও একটা ফাটল রয়েছে যেটা দিয়ে মুজিনা ঢুকে পড়তে পারে।

কয়েক চিলতে কাগজ এনে ওঁরা তৎক্ষণাৎ সেই ফাটলের ওপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমি মাৎসুয়ার আয়নাটা তুলে ধরলাম, গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো পুরোনো দামি হাত-আয়না, পিছনে সারসের ছবি খোদাই করা। আয়নায় তাকিয়ে আমি আবার নিজের পুরোনো মুখটা ফিরে পেলাম।

পরদিন শুনলাম কিয়োবাশির একটা বিরাট এলাকা পুড়ে সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেছে এবং এক মাঠের ওপর এক ছোট্ট পুকুরে মাৎসুয়ার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। তার পর থেকে অন্ধকার হয়ে এলেই আমি আর বাইরে বেরোতে সাহস পাই না। আমার মা-বাবা ভাবেন আমি পড়াশোনা করি এবং প্রার্থনা করি, কিন্তু আমি বসে থাকি মাৎসুয়ার আয়নাটা হাতে নিয়ে, পরীক্ষা করি নিজের মুখ। মুখটা কোথাও কি শক্ত হয়ে উঠেছে? ওটা কি পালটে যাচ্ছে একটা মসৃণ ডিমে? এখন আমি শুধু একটা মুখোসই খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করি, সে আমার নিজের মুখ, সে মুখকে আমি ভীষণ ভয় পাই।

হোয়েন আই ওয়াজ ডেড

ভিনসেন্ট ও' সুলিভ্যান



র‍্যাভেনেল হলে এটাই সবচেয়ে খারাপ। বারান্দাগুলো ছায়াময় ও লম্বা, ঘরগুলো অন্ধকার ছাতা-ধরা, ছবিগুলো পড়ন্ত মলিন ও তাদের বিষয়বস্তু আরও শোচনীয়। হেমন্তের কোন সন্ধ্যায়, যখন বাগানের গাছগুলোয় বাতাস কেঁদে কেঁদে ফেরে, শুকনো পাতা শিষ দেয়, গুঞ্জন তোলে, আর বৃষ্টির ফোঁটা ঝাঁপিয়ে পড়ে জানালায়, তখন যে অল্পসাহসী মানুষেরা দিশেহারা হয়ে পড়বে সে আর আশ্চর্য কী! সুতরাং আমার পরিচিত লোকেরা যখন র‍্যাভেনেল-এ থাকতে ভয় পায়, তখন আমি অবাক হই না। এমন কি উইলভার্ন পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল ঃ অথচ সে সৈন্যদলে চাকরি করে, নিয়মিত পোলো খেলে, ওর অন্তর আরও সাহসী হওয়া উচিত ছিল। ও যে দিন বিদায় নেয় তার আগের দিন রাতে আমি ওকে আবার তত্ত্ব বোঝাচ্ছিলাম ঃ যদি কয়েক ফোঁটা মানুষের রক্ত নিজের সামনে ফেলে খুব গভীর মনোনিবেশ করা যায় তাহলে কিছুক্ষণ পরে কোন পুরুষ বা নারীকে দেখতে পাওয়া যাবে, সে সারারাত তোমাকে সঙ্গ দেবে এমন কি দিনের বেলায় অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় সে তোমার সঙ্গে দেখাও করতে পারে। যখন এই সব তত্ত্ব ওকে বুঝিয়ে বলছি ও আমাকে বাধা দিল।—ভাই, অ্যালিস্টেয়ার! ও বলতে শুরু করল, যে করে হোক এ জায়গাটা তুমি ছাড়ো, শহরে যাও, একটু ঘরে ফিরে দ্যাখ—সত্যি, এ বাড়িটা তোমার ছাড়া উচিত।

হ্যাঁ, আমি জবাব দিলাম, যাই আর হোটেলের বাজে খাবার আর ক্লাবের বাজে আলোচনার বিষে মরি। না ভাই, ধন্যবাদ। আর আমার স্বাস্থ্যের জন্যে তুমি যে রকম চিন্তিত হয়ে পড়ছ, তাতে আমি মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়ছি।

ঠিক আছে, তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর, মেঝেতে পা ঠুকে ও বলল, কালকের পর আমি যদি আর একটা দিনও এ বাড়িতে থাকি তো কি বললাম—এখানে একমাত্র পাগল থাকতে পারে!

ও-ই ছিল আমার শেষ অতিথি, ও চলে যাবার কয়েক সপ্তাহ পরে সামনে কয়েক ফোঁটা রক্ত ফেলে আমি লাইব্রেরি ঘরে বসে ছিলাম। এ-ক'দিনে আমার তত্ত্ব প্রায় নির্ভুল হয়ে উঠেছে কিন্তু তাতে একটা গোলমাল ছিল।

যাকে আমি সব সামনে দেখতাম সে ছিল এক বৃদ্ধা, মাথার চুল সিঁথি কেটে সমান দু-ভাগে ভাগ করা সেই চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত, তার একপাশ সাদা, আর অন্যপাশ কালো। তার বয়েসে নুয়ে পড়া চেহারাটা আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম কিন্তু শুধু একটা খুঁৎ ছিল। তার কোন চোখ ছিল না, আর যখন আমি

চোখ দুটোকে কল্পনা করে আপ্রাণ দেখতে চেষ্টা করতাম, তখন তার শরীরটা কুঁচকে গিয়ে পচে যেত আমার চোখের সামনেই। কিন্তু আজ রাতে আমি একমনে ভাবছি, শুধু ভাবছি, এত মনোযোগ দিয়ে আগে কখনও ভাবিনি, এবং দেখতে পেলাম চোখ দুটো ধীরে ধীরে এসে যেন হামাগুড়ি দিয়ে মাথায় জায়গা মতো বসে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ভারী কিছু একটা পড়ে যাওয়ার ভয়ঙ্কর শব্দ বাইরে থেকে ছিটকে এল আমার কানে। এক ঝটকায় দরজা খুলে গেল, দুজন ঝি ঢুকল ঘরে। ওরা আমার চেয়ারের নিচে পাতা কার্পেটটা দেখল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে সাদা হয়ে গিয়ে 'ওঃ ভগবান!' বলে চিৎকার করে জড়োসড়ো হয়ে বেরিয়ে গেল।

লাইব্রেরিতে এভাবে ঢুকবার সাহস তোমাদের হল কোত্থেকে? আমি কঠোর স্বরে জানতে চাইলাম। কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না, সুতরাং ওদের পিছু নিলাম। দেখলাম, বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে বাড়ির সব ঝি চাকরেরা এক জায়গায় জটলা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মিসেস পেল্ল—তীক্ষ্ণ স্বরে প্রধান পরিচারিকাকে লক্ষ্য করে আমি বললাম, কালকেই যেন এই মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। এত বড় আস্পর্ধা! আপনার আরও সাবধান হওয়া উচিত।

কিন্তু সে আমার কথা কানেই তুলল না। তার মুখ তখন আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠেছে।—ওঃ ভগবান! সর্বনাশ! মিসেস পেল্ল বলল, চল, আমরা সবাই মিলে লাইব্রেরিতে যাই—সবাইকে লক্ষ্য করে শেষ কথাগুলো বলল সে।

এ বাড়ির মালিক এখনো আমি, না আর কেউ, মিসেস পেল্ল? একটা টেবিলে সজোরে ঘুষি মেরে আমি জানতে চাইলাম।

ওদের কেউ যেন আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, বা আমার কথা শুনেও শুনছে না, বলতে গেলে আমি যেন এক মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চলেছি। ওদের অনুসরণ করে আমিও বারান্দা ধরে রওনা হলাম, এবং নানা রকম আদেশের সুরে বার বার বারণ করলাম লাইব্রেরি ঘরে ঢুকতে। কিন্তু ওরা আমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল এবং ফায়ার প্লেসের সামনে পাতা কার্পেট ঘিরে জটলা করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ওদের তিন-চারজন কি সব টানাটানি করতে লাগল, ধরে তুলতে লাগল—যেন কোন নিস্তেজ দেহ টেনে তুলে নিয়ে আসছে, তারপর সেই অদৃশ্য বোঝা নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে একটা সোফায় নিয়ে গিয়ে রাখল। আমার পুরোনো পরিচারক সোম্স্ কাছেই দাঁড়িয়ে।

বেচারা, দাদাবাবু! চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে সে বলল, আমি তাঁকে ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি। আর উনি কিনা এভাবে মারা গেলেন, এই কচি বয়েসে! আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম।—এসব কি ব্যাপার, সোম্স্? চিৎকার আমি করে বললাম, আমি মরিনি, এই তো আমি—এই তো, তোমার সামনে!

সে কিন্তু এতটুকু নড়ল না, সুতরাং আমি একটু ভয় পেলাম।—সোম্স্, ওকে ডাকলাম, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? ছোটবেলায় আমার সঙ্গে কত খেলা করেছ মনে নেই? ওদের বল যে আমি মরিনি, প্লিজ সোম্স্, সোম্!

আমার মনে হয় গ্রামে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনা উচিত মিস্টার সোম্স্—মিসেস পেল্ল বলল, এবং সোম্স্ কাউকে পাঠাবার জন্য বেরিয়ে গেল।

এই ডাক্তার লোকটা একটা অপদার্থ গর্দভ। তাকে আমি বাড়ি থেকে একবার বের করে দিয়েছিলাম, কারণ ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে সে বিশ্বাসী ছিল, এবং একই সঙ্গে নিজেকে একজন বিজ্ঞানের লোক বলে দাবী করত। সে আমার বাড়ির চৌকাঠ যেন না মাড়ায়, এই ছিল আমার ইচ্ছে। সুতরাং আমি মিসেস পেল্লকে চিৎকার করে বারণ করতে থাকলাম, যেন ডাক্তারবাবুকে না ডাকা হয়। কিন্তু সে আমার কথা শুনতে পেরেছে বলে মনে হল না।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হল লাইব্রেরি ঘরের দরজায়।—এই যে! তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বললাম, আবার কোন নতুন প্রার্থনা শেখাতে এসেছেন বুঝি?

সে এমনভাবে আমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল যে আমার ব্যঙ্গ টের পেয়েছে বলে মনে হল না। তারপর সে সোফার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। মাথার শিরা ছিঁড়ে গেছে মনে হয়—সোম্স্ এবং মিসেস পেল্লকে লক্ষ্য করে একটু পরে সে বলল, মারা গেছেন ঘণ্টা কয়েক হবে। বেচারা! তোমরা টেলিগ্রাম করে ওঁর বোনকে খবর দাও, আমি কফিনওয়ালাকে খবর দিচ্ছি—

মিথ্যেবাদী কোথাকার! আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললাম, ছোটলোক পাজী মিথ্যেবাদী! কোন্ সাহসে আমার চাকর-বাকরদের তুই বলছিস যে আমি মরে গেছি—যেখানে আমি তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি!

সোম্স্ ও মিসেস পেল্ল-এর সঙ্গে ডাক্তার ততক্ষণে বারান্দা ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে, আমার দিকে ওরা একবার ফিরেও তাকাল না।

সারাটা রাত আমি লাইব্রেরিতে বসে রইলাম। আশ্চর্যই বলতে হবে, আমার একটুও ঘুম এল না, আর খিদেও পেল না। সকাল হতেই সব লোকেরা এসে গেল, এবং আমার শত বারণ সত্ত্বেও ওরা আমার চোখে অদৃশ্য এমন কোন জিনিসকে ঘিরে কি সব কাজ করতে লাগল। সুতরাং সুতরাং সারাটা দিন আমি হয় লাইব্রেরিতে বসে রইলাম নয় গোটা বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রাতে লোকজনেরা আবার ফিরে এল—এবার সঙ্গে একটা কফিন নিয়ে। তখন নিতান্তই রসিকতাবশে, ভাবলাম এত সুন্দর একটা কফিন খালি পড়ে থাকবে, ফলে রাতটা আমি সেই কফিনে শুয়েই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সবাই যখন এসে হাজির হল, তখনও আমি বিশ্রামে মগ্ন। তারপর কফিনওয়ালা আমার দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিল। আশ্চর্য লোক বটে!

সেই দিন সন্ধ্যায় নিচের তলায় নেমে আসতেই নজরে পড়ল হলঘরে কিছু মালপত্র রাখা আছে, এবং জানতে পারলাম আমার বোন এসে পৌঁছেছে। বিয়ের পর এতদিন ওকে দেখিনি। তাছাড়া এই নোংরা পৃথিবীতে সব থেকে বেশি কাউকে যদি আমি ঘেন্না করে থাকি তো সে আমার ওই বোন। ওকে দেখতে খুব সুন্দর, লম্বা, তামাটে রঙ ও ঋজু শরীর, আর ওর সব থেকে প্রিয় দুটো জিনিস ঃ পরনিন্দা-পরচর্চা ও পোশাক-পরিচ্ছদ। হয়তো এই জন্যেই আমি ওকে অপছন্দ করি। সাড়ে ন'টা নাগাদ একটা ভীষণ সুন্দর ঢিলে পোশাক গায়ে দিয়ে আমার বোন লাইব্রেরি ঘরে এল, এবং শিগগিরই বুঝতে পারলাম, আর সকলের মতই ও আমার উপস্থিতি একটুও টের পাচ্ছে না। যখন দেখলাম, ও কফিনের পাশে—আমার কফিনের পাশে, হাঁটু গেড়ে বসল, তখন আমি রাগে কাঁপতে লাগলাম কিন্তু যখন ও কফিনের বালিশে ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল, আমি জ্ঞানগম্যি হারিয়ে বসলাম। সুতো কাটার একটা ছুরি সামনের টেবিলের ওপর পড়েছিল ঃ সেটা তুলে নিয়ে ওর ঘাড় লক্ষ্য করে সজোরে বসিয়ে দিলাম। আমার বোন চিৎকার করে ঘর ছেড়ে ছুটে পালাল।

শিগগির এসো! শিগগির এসো! ও চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে লাগল, ভয়ে উত্তেজনায় ওর গলার স্বর কাঁপছে—মৃতদেহের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে!

তখন আমি মনে মনে অভিসম্পাত দিলাম।

তৃতীয় দিন সকালে ভীষণ তুষারপাত হল। এগারোটা নাগাদ দেখলাম, কালো পোশাক পরে গ্রামের লোকেরা বাড়িতে এসে ভিড় করেছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য। লাইব্রেরিতে গিয়ে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শিগগিরই সব লোকজন এসে উপস্থিত হল, কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে কফিন কাঁধে তুলে নিল। তারপর বেরিয়ে গেল ঘরে ছেড়ে। আর, আমি বসেই রইলাম, বিষণ্ণ হয়ে ভাবলাম, আমার কাছ থেকে কোন জিনিস যেন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে ঃ কিন্তু সেটা যে কি, তা ঠিক বুঝতে উঠতে পারলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা চিন্তায় বিভোর রইলাম, স্বপ্ণ দেখলাম তারপর আমি এগিয়ে গেলাম নীচে হলঘরের দরজার

দিকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোন চিহ্নই আর চোখে পড়ছে না কিন্তু একটু পরেই দূরে নজরে পড়ল, তুষারের সাদা পটভূমিতে একটা কালো সুতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে।

আমি মরিনি! যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। তাজা তুষারের মুখ ঘষলাম, আর তুষারের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম আমার ঘাড়ে, মাথায়—ওঃ ভগবান, আমি মরিনি! আমি বেঁচে আছি! বেঁচে আছি!

ওয়াজ ইট এ ড্রীম

গী দ্য মপাসাঁ



ওকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম!

মানুষ কেন ভালোবাসে? মানুষ কেন ভালোবাসে? কি অদ্ভুত লাগে যদি কেউ পৃথিবীতে শুধু একজনকেই দেখে, মনে একজনকেই ভাবে অন্তরে একজনকেই চায় এবং তাঁর ঠোঁটে থাকে শুধু একটাই নাম—যে নাম ক্রমাগত উঠে আসে ঝর্ণার জলের মতো, আত্মার গভীর স্তর থেকে পৌঁছে যায় ঠোঁটের সীমারেখা পর্যন্ত, যে নাম সে উচ্চারণ করে বার বার, অনলসভাবে সর্বত্র ফিস ফিস করে ঈশ্বরের প্রার্থনা-সঙ্গীতের মতো।

আমাদের গল্পটা এবার আপনাদের বলব, কারণ প্রেমের গল্প বলতে শুধু একটাই, এবং সে গল্প বরাবর সেই একই। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং তারপর থেকে আমি বেঁচে ছিলাম ওর কোমলতায়, ওর আদরে, ওর আশ্লেষে, ওর পোশাকে, ওর কথায়, একেবারে এমন ভাবে আষ্টেপৃষ্টে ওর প্রতিটি জিনিসে বাঁধা পড়েছিল যে আমাদের এই পৃথিবীতে রাত কি দিন তার পরোয়া আমি করিনি, এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবেনি আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি।

আর তার পরই ও মারা গেল। কেমন করে? আমি জানি না, তারপর থেকে থেকে আর কিছুই জানি না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ও ভিজে ফিরল বাড়িতে, এবং পরদিন থেকেই কাশতে শুরু করল, এক সপ্তাহ চলল এই কাশি, তারপরই ও বিছানা নিল। ঠিক কি যে হয়েছিল আমার এখন স্পষ্ট মনে নেই, তবে ডাক্তারবাবুরা এসেছে, লেখালেখি করেছে, আবার চলেও গেছে। ওষুধ কিনে আনা হল এবং অন্যান্য মহিলারা সে ওষুধ ওকে খাইয়ে দিল। ওর দুটো হাত গরম, কপাল যেন পুড়ে যাচ্ছে, আর দু'চোখ উজ্জ্বল ও বিষণ্ণ। আমি কথা বলতেই ও উত্তর দিল, কিন্তু কি কথা আমরা বলেছি আমার মনে নেই। সবকিছু আমি ভুলে গেছি, সবকিছু, সবকিছু! ও মরে গেল, আর আমার স্পষ্ট মনে আছে ওর সেই হালকা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস। নার্স বলে উঠল, আহা রে! তখন আমি বুঝলাম, সব বুঝতে পারলাম!

আর কিছুই আমি জানি না, কিছু না। একজন ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, কে, আপনার প্রণয়িনী? আর আমার মনে হল উনি যেন ওকে অপমান করছেন। ও মরে গেছে, সুতরাং এ কথা বলার অধিকার এখন আর কারো নেই, সুতরাং আমি সেই ধর্মযাজকের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। আর একজন এলেন, নরম ও দয়ালু প্রকৃতির। তিনি যখন ওর কথা আমাকে শোনাতে লাগলেন তখন আমি শুধু চোখের জল ফেলে চললাম।

ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে সবাই আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে, কিন্তু ওরা কে কি বলেছে কিছুই আমার মনে নেই, বরং কফিনের কথাটা আমার মনে আছে, মনে আছে ওকে শুইয়ে দিয়ে কফিনে ঠোকার হাতুড়ির শব্দ। ওঃ! ভগবান, ভগবান!

ওকে কবর দেওয়া হল! করব! ওকে! ওই গর্তে! কিছু কিছু লোক এল—মেয়ে বন্ধুর দল। আমি লুকিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম। ছোটা শেষ করে বিভিন্ন পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম, একসময় পৌঁছলাম বাড়িতে এবং পরদিনই পাড়ি দিলাম দেশান্তরে।

গতকালই আমি প্যারিসে ফিরে এসেছি, এবং নিজের ঘরে ঢুকতেই নতুন এক দুঃখের ঢেউ নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর, আমাকে গ্রাস করল, মনে হল, জানলা খুলে এখুনি লাফিয়ে পড়ি নীচের রাস্তায়। কারণ আমার চোখের সামনে আমাদের ঘর, আমাদের বিছানা, আমাদের আসবাবপত্র, কোন মানুষের মৃত্যুর পর তার জীবনের যতটুকু পড়ে থাকা সম্ভব তার সবটুকুই উপস্থিত। এসব জিনিসের মাঝে আমি আর একমুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, এই দেওয়াল একদিন ওকে ঘিরে ছিল, আশ্রয় দিয়েছিল, এই দেওয়ালের প্রতিটি অদৃশ্য ফাটলে রয়েছে ওর সহস্র পরমাণুর স্বাক্ষর, ওর ত্বক ও নিশ্বাসের অস্তিত্ব। সুতরাং টুপিটা তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলাম, এবং সেই দরজার কাছে এসেছি চোখ পড়ল হলঘরের বিশাল আয়নাটায়। আয়নাটা ও-ই এখানে বসিয়েছিল, যাতে বাইরে বেরোবার সময় ও নিজের আপাদমস্তক দেখতে পায়, পরখ করতে পারে সাজগোজ ঠিক আছে কি না, সুন্দর দেখাচ্ছে কি না, পায়ের জুতো থেকে মাথার টুপি পর্যন্ত সবকিছু নিখুঁত হল কি না।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আয়নাটার সামনে। এই আয়না কত বার ওর ছায়া বুকে ধরেছে—এত বহু বার যে সে ছায়া নিশ্চয়ই স্থায়ী হয়ে আছে আয়নার কাঁচের গভীরে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করলাম, আমার চোখ কাঁচের ওপরে স্থির—সমতল, গভীর, শূন্য কাঁচে—যে কাচ ওকে গ্রহণ করেছে সম্পূর্ণ ভাবে, অধিকার করেছে আমারই মতো, আমার প্রণয়াচ্ছন্ন দৃষ্টির মতো। মনে হল যেন আয়নাটাকে আমি ভালোবাসি। ওটা স্পর্শ করলাম, ঠান্ডা। ওঃ, সেই স্মৃতি! বিষণ্ণ আয়না, জ্বলন্ত আয়না, ভয়ঙ্কর আয়না, তুমি মানুষকে কত যন্ত্রণা দাও! সেই মানুষই সুখী যার হৃদয় ভুলে যায় কতটুকু সে পেয়েছিল, কতটুকু সে দেখেছিল, তার গভীরে চোখ মেলে কে তাকিয়েছিল, ভুলে যায় তার অনুরাগে-ভালোবাসায় প্রতিফলিত হওয়া সবকিছু! সত্যি, কি কষ্টই না আমি পাচ্ছি!

সে সব কিছু না ভেবে, না জেনে আমি বেরিয়ে এলাম, রওনা হলাম কবরখানার দিকে। ওর সাদাসিধে সমাধি আমি খুঁজে পেলাম—একটা সাদা ক্রুশচিহ্ন ও এই কটি কথা লেখা ঃ

‘ও ভালোবেসেছিল, ভালোবাসা পেয়েছিল, অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছে।’

ওর ক্ষয়ে যাওয়া শরীর এর নীচেই শুয়ে রয়েছে! কী ভয়ঙ্কর! মাটিতে মাথা রেখে আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম, এবং অনেক অনেকক্ষণ বসে রইলাম সেখানে। তারপর এক সময় লক্ষ্য করলাম, অন্ধকার নেমে আসছে, এবং এক অদ্ভুত পাগল করা ইচ্ছে—হতাশ কোন প্রেমিকের ইচ্ছে—আমাকে গ্রাস করল। ইচ্ছে করল, ওর সমাধিতে চোখের জল ফেলে সারাটা রাত কাটিয়ে দিই, কাটিয়ে দিই শেষ একটা রাত। কিন্তু আমাকে এখানে দেখতে পেলেই বের করে দেওয়া হবে। কী করে সেটাকে রোধ করি? বুদ্ধি আমার আছে, সুতরাং উঠে দাঁড়িয়ে মৃতের শহরে ঘুরতে শুরু করলাম। হেঁটে চললাম, শুধু হেঁটে চললাম। যে শহরে আমরা বাস করি তার তুলনায় এই শহর কত ছোট। অথচ জীবিতদের চেয়ে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি। আমাদের দরকার হয় বিশাল বিশাল বাড়ি, চওড়া রাস্তা, যে চারপুরুষ একসঙ্গে দিনের আলো দেখে তাদের জন্যে চাই যথেষ্ট জায়গা।

আর মৃতদের সমস্ত পুরুষের জন্যে, যে মনুষ্যত্বের ধারা নেমে এসে আমাদের ছুঁয়েছে, তাদের জন্যে প্রায় কিছুই দরকার হয় না, কিচ্ছু না। পৃথিবীর মাটি তাদের ফিরিয়ে নেয়, এবং বিস্মৃতি তাদের মুছে ফেলে। ঈশ্বর

তোমাদের মঙ্গল করুন!

কবরখানার শেষপ্রান্তে পৌঁছে হঠাৎই বুঝতে পারলাম আমি একেবারে প্রাচীন অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখানে মৃতেরা শুয়ে আছে অনেক দিন ধরে, এবং ওদের দেহ এখন মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে, এখানকার ক্রুশ চিহ্নগুলো ক্ষয়ে গেছে কালের প্রকোপে, আর আগামীকাল থেকেই সম্ভবত নতুনদের এখানে এনে শোওয়ানো হবে। অযত্নে বেড়ে ওঠা অসংখ্য গোলাপ ও বিশাল কালো সাইপ্রেস গাছে জায়গাটা ছেয়ে আছে—এক বিষণ্ণ অথচ সুন্দর বাগান, নরমাংসে লালিত পালিত।

আমি এখানে একা, সম্পূর্ণ একা। সুতরাং একটা সবুজ গাছের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে বসলাম, ঘন ও মলিন শাখা-প্রশাখার মাঝে নিজেকে পুরোপুরি লুকিয়ে ফেললাম। জাহাজডুবি হওয়া কোন মানুষ যেমন করে ভাসমান কাঠের টুকরো আঁকড়ে ধরে, ঠিক তেমনি করে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে আমি অপেক্ষায় রইলাম।

যখন পুরোপুরি অন্ধকার হল, আমি আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, এবং হালকা ধীর ও নিঃশব্দ পায়ে মৃত মানুষে আকীর্ণ ওই মাটিতে পায়চারি করতে শুরু করলাম। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু ওর সমাধি আর দ্বিতীয়বার খুঁজে পেলাম না। দু-হাত সামনে বাড়িয়ে, হাতে, পায়ে, হাঁটুতে, বুকে, এমন কি মাথাতেও পর্যন্ত বিভিন্ন সমাধির ধাক্কা খেয়ে আমি এগিয়ে চললাম, কিন্তু তবুও ওকে খুঁজে পেলাম না। অন্ধের মতো আমি পথ হাঁতড়ে চললাম, স্পর্শে অনুভব করলাম সমাধি-প্রস্তরগুলো, ক্রুশগুলো, তাদের লোহার রেলিং, ধাতুর মালা ও বিবর্ণ ফুলের অঞ্জলি! আঙুলে অনুভব করে অক্ষরে আঙুল বুলিয়ে, তাদের নামাগুলো আমি পড়তে লাগলাম। কী ভয়ঙ্কর রাত! কী ভয়ঙ্কর রাত! ওকে আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না।

আকাশে চাঁদ নেই। এ এক অদ্ভুত রাত! আমি ভয় পেলাম। কবরের দুই সারির মাঝে সরু পথটায় দাঁড়িয়ে আমি ভীষণ ভয় পেলাম। কবর! কবর! কবর! কবর ছাড়া আর কিছু নেই। আমার ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, চারপাশে, প্রতিটি জায়গায় শুধু কবর আর কবর! তারই একটার ওপরে বসে পড়লাম, কারণ আর আমি হাঁটতে পারছি না, আমার হাঁটু যেন ভেঙে পড়ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন! আর সেই সঙ্গে আরও একটা শব্দ কানে এলে। কীসের শব্দ? এক অস্পষ্ট, নাম-না-জানা শব্দ। শব্দটা কি আমার মাথার ভেতর থেকে আসছে, না কি এর জন্ম দিয়েছে অভেদ্য রাত, অথবা মানুষের মৃতদেহ রোপিত এই রহস্যময় মাটির গভীর স্তর? চারপাশে ভালো করে তাকালাম, কিন্তু কতক্ষণ যে ওখানে বসে ছিলাম বলতে পারি না, আতঙ্কে আমি তখন অসাড়, স্থবির, ভয়ে শরীর ঠান্ডা, চিৎকার করে ওঠার জন্যে আমি তৈরি, হয়তো মরবার জন্যেও।

হঠাৎই মনে হল, যে মার্বেল পাথরের ওপর আমি বসে আছি সেটা নড়ছে। সত্যিই নড়ছে, যেন কেউ ওঠা আস্তে তুলে ধরছে। একলাফে আমি পাশের কবরে গিয়ে পড়লাম, এবং দেখলাম, হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখলাম, এইমাত্র ছেড়ে আসা পাথরটা ওপরে উঠছে। তারপর দেখা গেল মৃত মানুষটাকে, এক উলঙ্গ কঙ্কাল, পিঠ কুঁজো করে পাথরটা ঠেলে তুলছে। রাত ঘন অন্ধকার, কিন্তু আমি পরিষ্কার সব দেখতে পেলাম। ক্রুশ চিহ্নের ওপর লেখা আছে ঃ

'এখানে শুয়ে আছেন জ্যাক অলিভ্যাঁ—একান্ন বছর বয়সে মারা গেছেন। পরিবারের সকলকে তিনি ভালোবাসতেন, তিনি দয়ালু ও সম্মানিত ছিলেন, এবং ঈশ্বরের করুণায় মুক্তি লাভ করেছেন।'

সমাধি-প্রস্তরে লেখা কথাগুলো মৃত ব্যক্তিও পড়ল, তারপর রাস্তা থেকে একটা ছোট্ট ছুঁচলো পাথর সে কুড়িয়ে নিল, এবং অক্ষরগুলোকে অতি যত্নে ঘষে তুলতে লাগল। ধীরে ধীরে সে মুছে ফেলল লেখাগুলো, এবং সেখানে সেগুলো খোদাই করা ছিল, সেই জায়গাটা দেখতে লাগল চোখের অন্ধকার কোটর মেলে। তারপর, চকমকি দেশলাই দিয়ে ছোট ছোট ছেলেরা দেওয়ালে লেখে, সেই রকম করে তার তর্জনীর হাড়ের প্রান্ত দিয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে সে লিখতে লাগল ঃ

'এখানে বিশ্রাম করছেন জ্যাক অলিভ্যাঁ, একান্ন বছর বয়েসে মারা গেছেন। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার বাসনায় তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুকে নির্দয় ব্যবহারে ত্বরান্বিত করেছেন, নিজের স্ত্রীকে যন্ত্রণা দিয়েছেন, পুত্রকন্যাদের কষ্ট দিয়েছেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, যাঁকে সম্ভব লুণ্ঠন করেছেন এবং চরম দুর্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন।'

লেখা শেষ করে মৃত মানুষটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দেখতে লাগল নিজের সদ্যসমাপ্ত সৃষ্টি। ফিরে তাকিয়ে দেখি সমস্ত কবরই খোলা, আর সেখানে থেকে সমস্ত মৃতদেহগুলো বেরিয়ে এসেছে, সমাধি-প্রস্তরের ওপর থেকে মুছে দিয়েছে তাদের আত্মীয়দের লেখা সুন্দর কথাগুলো এবং পরিবর্তে লিখে দিচ্ছে নিখাদ সত্যিটুকু। আর আমি দেখলাম, প্রত্যেকেই তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছেন—বিদ্বেষপরায়ণ, অসাধু, ভণ্ড, মিথ্যেবাদী, দুর্বৃত্ত, কুৎসাপ্রিয়, পরশ্রীকাতর, দেখলাম, ওরা চুরি করেছে, প্রতারণা করেছে, কোন রকম লজ্জাকর ও জঘন্য কাজ বাদ দেয়নি, এই সব আদর্শ পিতারা, বিশ্বস্ত স্ত্রীরা, অনুরক্ত পুত্রেরা, চরিত্রবতী কন্যারা, এইসব সৎ ব্যবসায়ীরা, এই সব নারী ও পুরুষেরা, যাদের সকলে সমস্ত নিন্দার ঊর্ধ্বে বলে এতদিন জেনে এসেছে। নিজেদের চিরন্তন আবাসের প্রবেশ পথে ওরা সকলে একই সঙ্গে লিখে চলেছে সত্যি কথাটুকু ভয়ঙ্কর ও পবিত্র সত্য, ওরা বেঁচে থাকতে যা কেউ জানত না, অথবা না জানার ভান করে এসেছে।

ভাবলাম, ও নিজেও হয়তো ওর সমাধি প্রস্তরে কিছু না লিখেছে, সুতরাং এখন নির্ভয়ে আধখোলা কফিন, মৃতদেহ ও কঙ্কালের সমারোহ ভেদ করে আমি ছুটে চললাম ওর কাছে, মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এক্ষুনি ওকে খুঁজে বের করতে হবে। শবাচ্ছাদন-বস্ত্রে ওর মুখ ঢাকা ছিল, কিন্তু মুখ না দেখেও আমি ওকে পলকে চিনতে পারলাম, আর সেই মার্বেল পাথরের ক্রুশ চিহ্নে, যেখানে একটু আগেও লেখা ছিল—

ও 'ভালোবেসেছিল, ভালোবাসা পেয়েছিল, অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছে।'

সেখানে এখন লেখা রয়েছে—

'নিজের প্রেমিককে প্রতারণা করতে একদিন বৃষ্টিতে ও বেরিয়েছিল, তারপর সর্দির প্রকোপে মৃত্যুবরণ করে।'

মনে হয়, পরদিন সকলে ওই কবরের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় ওরা আমাকে আবিষ্কার করে।

ড্রয়ার নাম্বার ফোর্টিন

ট্যাল্মেজ পাওয়েল



আমার চাকরি নিয়ে ঠাট্টা করবেন না, প্লিজ। কলেজ এলাকার ছেলেছোকরাদের কাছ থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অনেক খোঁচা সহ্য করেছি। শহরের লাশ-রাখা ঘরে রাতের কেরাণীর কাজ যে আমার খুব একটা পছন্দ তা নয়, তবে তার কতকগুলো সুবিধেও আছে।

প্রথমত, এ চাকরিতে দিনের বেলায় কলেজে পড়াশোনা করার সুবিধে রয়েছে এবং রাতে সামান্য নিয়ম-মাফিক কাজ ও তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে বই নিয়ে বসার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

ক্যালকুলাসের কোন অঙ্ক নিয়ে যখন মাথার মধ্যে তোলপাড় করছি, তখন লেবেল লাগানো নম্বর দেওয়া ড্রয়ারে শুয়ে থাকা বাসিন্দারা আমাকে একটুও বিরক্ত করে না। অন্তত আমি তাই ভাবতাম।

এই রাতেও আমি এসে রোজকার মতো ওলাফ ডেলিকে ছুটি দিলাম। ওলাফ সব সময় কাজ নিয়ে লেগে থাকে, কাজ নিয়ে লেগে থাকে, কারণ ওর বয়েস আর খোঁড়া পা। চাকরি ছেড়ে পালাবার এই মুহূর্তটার জন্যেই যেন প্রতি দিন ও বেঁচে থাকে। সুতরাং বরাবেরের মতো এক নিশ্বাসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে 'হ্যালো' এবং 'বিদায়' বলল ওলাফ, তারপর খোঁড়া পায়ে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে লাশ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

গভীর নিস্তব্ধতায় ভরা পাশের ঘরে এসে ফ্লাক্স, ট্রানজিস্টর রেডিয়ো ও কয়েকটা পড়ার বই ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখলাম। আমি এখন সম্পূর্ণ একা। রেকর্ডের ভারী খাতাটা সামনে টেনে নিলাম চোখ বুলিয়ে নেবার জন্য।

রোজকার নাম-ধামগুলো ওলাফ ওর পরিষ্কার টানা হাতের লেখায় লিখে রেখেছে। জলে ডোবা যুবক। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত মহিলা ও পুরুষ। বিছানায় আগুন লাগা সত্ত্বেও জেগে ওঠেনি এমন এক মাতাল। ছুরির লড়াইয়ে হেরে যাওয়া যুবক। নদীতে পাওয়া মহিলার মৃতদেহ।

নাঃ, ওলাফের দিনটা রোজকার মতই কেটেছে। গত সপ্তার বুড়িটার মতো কোন লাশ আসেনি।

বুড়িটা জঘন্য, নোংরা সেই রকমই নোংরা এক বাসায় একা একা থাকত। এমনিতে ছিল বদ্ধ পাগল, কিন্তু সব সময়েই এক স্বপ্নের দেশে বাস করত, যেখানে সে নোংরা নয়, বুড়ি নয়, সকলের করুণার পাত্রী নয়! বরং সে ভাবত, অন্ধকারের শক্তির ওপর তার খবরদারি ক্ষমতা রয়েছে সে এগুরের চতুর্থা মায়বিনী।'

অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ডিপো ছিল সেই বস্তি অঞ্চলটা এবং বুড়ির প্রতিবেশীরা সত্যি সত্যিই তাকে ডাইনী ভাবত, তার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করত। অবশ্য তাকে দেখেও তাই মনে হত ঃ কঙ্কালের মতো মুখ,

লম্বা নাকের ডগায় একটা আঁচিল, মুখে একটাও দাঁত না থাকায় থুতনীটা ছুঁচলো ও লম্বা মনে হত, আর ভাঙা দু-গালের ওপর ঝুলে থাকত নোংরা চুলের গোছা। হাত গুণে, ভবিষ্যৎ বলে, ভালোবাসার মন্ত্রপুত ওষুধ বেচে, তার আধপেটা খাবার জুটে যেত। তবে বুড়িটার একটা গুণ ছিল কারো খারাপ সে করত না, অন্তত তার প্রতিবেশীরা তাই বলত।

কিন্তু একদিন, এক ভ্যাপসা গরমের রাতে, নিজের বাড়ির ছাদে উঠে গেল সেই 'এণ্ডরের চতুর্থ মায়াবিনী'। কেউ ঠিক জানে না, সে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, না উড়ে চাঁদে যাবার চেষ্টা করেছিল। সে যাই হোক, ছ'তলা নীচের অ্যাসফল্টের রাস্তা থেকে তাকে চেঁছে তোলা হয়, নিজে আসা হয় এখানে, এবং চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারে জমা দেওয়া হয়। শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাক্সে বন্দী হয়ে সে চারদিন ছিল। তারপর দূরের কোন্ রাজ্য থেকে তার এক কেতাদুরস্ত ছেলে এসে হাজির হল মৃতদেহ দাবী করতে।

সে চলে যাবার পরেও ওলাফ ডেলি স্বস্তি পায়নি। বুড়ো খালি বলেছে, মাইরি বলছি, চোদ্দো নম্বর ড্রয়ার থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোচ্ছে, ঠিক যেন গন্ধকের মতো।

আমি কিন্তু টের পাইনি। যে বদ গন্ধ আমার নাকে ধরা পড়ে তা হল কেমিষ্ট্রি ল্যাবরেটরির গন্ধ, যেখানে ক্লাসের পড়াশোনার সঙ্গে তাল রাখতে আমাকে রোজ হিমসিম খেতে হয়।

রেকর্ডের খাতা থেকে চোখ সরিয়ে ঘরগুলোয় নিয়ম-মাফিক টহলে বেরোলাম। পাশের ঘরটা আকারে বেশ বড়, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত, ঠান্ডা এবং নিষ্প্রাণ। ঘরের মেঝে তকতকে ধূসর টালিতে বাঁধানো, এবং তা থেকে সামান্য অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ নাকে আসছে। ঘরের ও প্রান্তে বড় দু-পাল্লার দরজা। সেটা পেরোলেই ছোট্ট বারান্দা ঃ মৃতদের প্রথম সেখানে এনে রাখা হয়। দরজার কাছেই ছোট ছোট চাকা লাগানো লম্বা সরু মার্বেল পাথরের টেবিল। সুখের কথা, এই মুহূর্তে সেটা খালি, ঘষে মেজে পরিষ্কার করা, এবং অনিবার্য ব্যবহারের জন্যে অপেক্ষা করছে। শীতাতপ যন্ত্রের চাপা ফিসফিসে গুঞ্জন যেন শোনার চেয়ে অনুভব করা যায় বেশি।

আমার ডানদিকে অতিকায় মৌচাকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি ড্রয়ারের থাক। এখানেই মৃতদেহগুলো রাখা হয় কেউ দাবী করবে বলে, নয়তো শেষমেষ কোম্পানির খরচায় সেগুলো কবর দেওয়া হয়।

যে যে ড্রয়ারে লাশ আছে, সেগুলোয় জাহাজের টিকিটের মতো কার্ড লাগানো আছে। লাশ রাখার সময়েই সরু তার দিয়ে কার্ডটাকে ড্রয়ারের হাতলের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়।

নিছক কোন শব্দ শোনার আশাতেই হালকা সুরে শিস দিতে দিতে ড্রয়ারের কার্ডগুলো রেকর্ড খাতায় দেখা নামগুলোর সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে নিতে লাগলাম আমি।

চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের কাছে আসতেই একটা গন্ধ যেন নাকে এল। গন্ধ শুঁকতে গিয়ে হাঁচি পেল। 'এই তাহলে ওলাফ ডেলির গন্ধ!' আপন মনেই বিড়বিড় করে বললাম।

চোদ্দ নম্বরে কোন দেহ আছে বলে রেকর্ড খাতায় ওলাফ কোন নাম লেখেনি, কিন্তু ড্রয়ারের হাতলে দেখছি কার্ড ঝুলছে! ড্রয়ারের কাছে এসে ঝুঁকে পড়লাম, হাত বাড়ালাম কার্ডটার দিকে। আমার ঠোঁট থেকে শিসের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল নিস্তব্ধতায়।

অন্যমনস্ক ভাবেই কার্ডটাকে একবার উলটে দেখলাম তারপর আবার, আরো একবার—আগের চেয়ে আরে বেশি ক্ষিপ্রতায়।

সোজ হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগলাম। কার্ডের দু-পাশটাই সাদা। ওলাফ বুড়ো হতে পারে, কিন্তু এখনও ওর ভীমরতি ধরেনি। ড্রয়ারের কার্ডে নাম লিখতে ভুলে যাওয়াটা তো ওর স্বভাব নয়।

তারপর আপন মনেই হেসে উঠলাম। ব্যাটা বুড়ো বোধ হয় আমার সঙ্গে মস্করা করতে চাইছে। ওলাফ যে ঠাট্টা মস্করাও করতে পারে এ ধারণা আমার আগে ছিল না।

আমার ঠোঁটে শিসের সুর আবার ফিরে এল। ড্রয়ারটার হাতল ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। ছোট ছোট রোলারে ভর করে ড্রয়ারটা সরসর করে খুলে এল। আমার শিসের সুর পালটে গেল এক চাপা চিৎকারে, এবং মাঝপথেই থমকে গেল।

ড্রয়ারের মেয়েটা বয়েসে যুবতী। মাথার চুল সোনালী। যথেষ্ট সুন্দরী, এমন কী মরে যাবার পরেও।

জুতোর ভেতরে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল গুটিয়ে যেতে চাইল। মেয়েটার দিকে অপলকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটার মুখের গড়ন চমৎকার, গায়ের চামড়া বিবর্ণ তামাটে সার্টিনের মতো। চোখ দুটো এমন ভাবে বোজা ঠিক যেন ঘুমোচ্ছে, লম্বা লম্বা চোখের পাতা যেন ঘন ছায়ার রেখা। পরণে সাদা নাইলনের ইউনিফর্ম, কলারে নার্সদের পিন আঁটা। একমাত্র ব্যক্তিগত সাজ সজ্জা বলতে একটা সোনার ব্রেসলেট ঃ সরু চেনের সঙ্গে লাগানো একটা লকেট। লকেটে দুটি আদ্যাক্ষর খোদাই করা ঃ জেড. এল.।

স্বর্ণকেশীর চোখ সরিয়ে চটপট এলাম পাশের ঘরে। টেবিলে রাখা রেকর্ডের খাতাটা এক ঝটকায় কাছে টেনে নিলাম। বুড়ো ডেলির প্রতি আমি অবিচার করতে চাই না।

রোজকার ভর্তির নামের লিস্টে আঙুল বুলিয়ে চললাম। ইতস্তত করলাম। আগের পাতা উল্টে গতকালের লিস্টে চোখ বোলালাম। তারপর তার আগের দিন। নাঃ, চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে কাউকেই ভর্তি করা হয়নি।

আবার লাশ-ঘরের দিকে রওনা হলাম। শিস দিতে ঠোঁট ছুঁচলো করলাম, তবে শিসের শব্দ বেরোল না। দু-ঘরের মাঝের দরজাটার ওপর দিকটা কাঁচের। কাঁচ ভেদ করে চোখ মেলে দিলাম। দরজা খোলার কোন প্রয়োজন নেই। চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারটা আমি খোলা রেখেই এসেছি, এবং স্বর্ণকেশী জেড এল. এখনও সেখানে রয়েছে এ সত্য জীবনের মতই বাস্তব ও মৃত্যুর মতই অমোঘ।

সন্তর্পণে টেবিলে বসলাম, রুমাল বের কপালে বুলিয়ে নিলাম।

একটা গভীর শ্বাস টেনে ফোন তুলে নিলাম। ডায়াল করলাম ওলাফ ডেলির নম্বর। ওর ফোন যখন বাজছে, আমি তখন একটা চোরা চাউনি ছুড়ে দিলাম লাশ-ঘরের দিকে।

ছ'বার কি সাত বার ফোন বাজার পর ওলাফের বউ ঘুম-জড়ানো গলায় জবাব দিল।—না, ওলাফের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়, সে এখনও বাড়ি ফেরেনি।

তারপর হঠাৎই ও একটু নরম সুরে বলে উঠল, এক মিনিট ধরুন। মনে হয় ও ফিরে এসেছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে বউয়ের কাছ থেকে ফোনটা নিল ওলাফ।

হ্যালো, কী ব্যাপার?

আমি টুলি ব্র্যানসন বলছি, মিস্টার ডেলি।

তোমার ইয়ার দোস্ত কে কোথায় বোতল খুলেছে তার জন্যে আমি তোমার জায়গায় গিয়ে ডিউটি দিতে পারব না।

না, স্যর, তা নয়—আমি বললাম, আসল ব্যাপারটা হল, চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের মেয়েটা সম্পর্কে আমার কিছু খবরাখবর দরকার।

চোদ্দো নম্বরে তো কেউ নেই, টুলি।

হ্যাঁ, স্যর, আছে। চোদ্দো নম্বরে একটা মেয়ে আছে। অল্পবয়েসি সোনালি চুল ফুটফুটে একটা মেয়ে, মিস্টার ডেলি। মরেছে বলে বিশ্বাসই হতে চায় না। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। শুধু খাতায় মেয়েটার নাম এন্ট্রি করতে আপনি ভুলে গেছেন।

শুনতে পেলাম মিসেস ডেলি ওলাফকে জিগ্যেস করছে, কী ব্যাপার। বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওলাফের স্বর পালটে গেল, মনে হয় ব্র্যানসন ছোকরা আজ রাতে ওর ফ্লাস্কে হুইস্কি নিয়ে এসেছে।

না স্যর—ওলাফকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, যা অবস্থা তাতে আমার হুইস্কিরই দরকার, কিন্তু সঙ্গে তো এক ফোঁটাও নেই। শুধু যা আছে তা হল চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে একটি সোনালি চুল মেয়ের

মৃতদেহ, যার নামটা আপনি খাতায় টুকতে ভুলে গেছেন।

এ রকম ভুল আমার কি করে হবে? ওলাফ জানতে চাইল।

জানি না, কিন্তু হয়েছে—আমি বললাম, এই তো মেয়েটা চোখের সামনেই রয়েছে। বিশ্বাস না হলে নিজে এসে স্বচক্ষে দেখে যান।

তাই করতে হবে দেখছি, খোকা! তুমি আমার নামে বিরাট বদনাম দিচ্ছ!

ও এত জোরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল যে আমার কানের পর্দা কেঁপে উঠল। অত্যন্ত শান্তভাবে ফোন নামিয়ে রাখলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে ফ্লাক্স থেকে কফি ঢাললাম, একটা সিগারেট ধরিয়ে কফিতে চুমুক দিলাম, এবং একটা সিগারেট ধরালাম।

আর এক ঢোক কফি খেয়ে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ালাম। আর তখনই লক্ষ্য করলাম, ইতিমধ্যে তিন তিনটে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছি এবং অ্যাসট্রে থেকে সেগুলোর ধোঁয়া এঁকেবেঁকে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্লিষ্ট হাসি হেসে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্যে দুটো টান দিয়ে সিগারেট নিভিয়ে দিলাম।

ঝোড়ো সমুদ্রের জাহাজের মাস্তুলের মতো ওর খোঁড়া পা নিয়ে ওলাফ এসে হাজির হল। ওর আগুনঝরা দৃষ্টির উত্তর দিলাম হাসি দিয়ে। যতখানি সম্ভব আশ্বাস ঢেলে দিলাম সে হাসিতে। তারপর ওকে ইশারা করলাম লাশ-ঘরের দিকে।

সুইংডোর ডোর ঠেলে ওলাফ লাশ-ঘরে ঢুকল আমি ঠিক ওর পিছনে পিছনে। চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারটা এখনো হাট করে খোলা। ও ড্রয়ার পর্যন্ত যাওয়ার কষ্টটা করল না। বরং ড্রয়ারটার দিকে এক পলক দেখেই বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল আমার মুখোমুখি।

ব্র্যানসন! ও রাগে গর্জে উঠল, আমার বয়েস বিশ বছর কম হলে তোমার নাকটা থেঁৎলে দিতাম! তোমার সাহস আছে বলতে হবে, একটা ক্লান্ত বুড়ো মানুষকে এই হতচ্ছাড়া জায়গায় টেনে এনেছ। আর আমি ভাবতাম আজকালকার ছেলে-ছোকরার মধ্যে তুমি অনেক ভালো।

কিন্তু, মিস্টার ডেলি...

আর কিন্তু বলে লাভ নেই ছোকরা! তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব।

উদ্ভ্রান্তের মতো আবার তাকালাম চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের দিকে। ওই তো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে। সোনালি চুল, সুন্দরী এবং মৃত।

আমাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে ওলাফ বেরিয়ে যেতে চাইল ঘর থেকে। আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। ভয়ে আমার অবস্থা মুরগীর ছানার মতো, এবং পারলে পালক সমেত খোলস ছেড়ে দিই।—শুনুন শুনুন, আমি চিৎকার করে উঠলাম। মেয়েটাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো! আমি জানি স্পষ্ট দেখেছেন!

আমার গা থেকে হাত সরাও—ওলাফ চেঁচিয়ে জবাব দিল, ঠিক যা আছে আমি স্পষ্ট তাই দেখতে পাচ্ছি। একটা খালি ড্রয়ার। ঠিক তোমার ফাঁপা মগজের মতই খালি।

আমি ওর হাত খামচে ধরলাম, প্রাণ গেলেও ছাড়ছি না।—এ আপনি কি ধরনের ঠাট্টা করছেন আমার মাথায় ঢুকছে না...

ঠিক তাই। আমারও মাথায় ঢুকছে না আমার চেয়েও জোর চেঁচিয়ে বলল ওলাফ, তবে ঠাট্টাটা নেহাৎই বস্তাপচা!

তাহলে আপনি ড্রয়ারটার দিকে আর একবার দেখুন, আর এই খামখেয়ালিপনা বন্ধ করুন।

আমার যা দেখার আমি দেখেছি। কোন গর্দভ দামড়া ছাড়া এক বুড়োকে রাত-বিরেতে তার বাড়ি থেকে বেরুবে না!

এক ঝটকায় ওলাফ হাত ছাড়িয়ে নিল, ঝড়ের মতো দরজা পার হয়ে বেরিয়ে গেল। সদর দরজায় পৌঁছে ও থামল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে শাসাল আমাকে—হাড়-হাভাতে বজ্জাত ছোকরা—ও বলল, কাল

থেকে অন্য চাকরি খুঁজতে শুরু কর! এ কথা বলে ও চলে গেল।

ওলাফকে অনুসরণ করে আমি পাশের ঘর পর্যন্ত এসেছিলাম, এবার ঘুরে তাকালাম লাশ-ঘরের দিকে। একটা হতাশার আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। কাচের শার্সি দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি জেড. এল. এখনও চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারেই রয়েছে।

লক্ষ্মী মেয়ে আমার—আপন মনেই বিড়বিড় করে বললাম, চলে যাও দেখি, এই আমি চোখ বন্ধ করছি, সেই ফাঁকে তুমি কেটে পড়।

চোখ বন্ধ করলাম, আবার খুললাম, না, মেয়েটা যায়নি, ড্রয়ারেই রয়েছে।

হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের কাছে গিয়ে ধপ করে চেয়ারটায় বসে পড়লাম। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারলাম না, কারণ কাজের ব্যস্ততার ইঙ্গিত দিয়ে দরজার কলিং বেল বেজে উঠল।

আচমকা তীক্ষ্ণ শব্দে চেয়ার ছেড়ে প্রায় হাতখানেক লাফিয়ে উঠলাম। চেয়ারটা পায়ে লেগে ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

স্মিথ আর ম্যাকলিন তখন শতছিন্ন পোশাক পরা এক বুড়েকে স্ট্রেচার থেকে নামিয়ে রাখছে মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপর।

বেচারা এক চলন্ত ট্রাকের সামনে গিয়ে হাজির হয়—স্মিথ বলল।

কোন পরিচয়-পত্র নেই—ম্যাকলিন বলল, জন ডো নাম দিয়ে এটাকে বরফ-ঘরে ঢুকিয়ে দাও।

একেবারে থেঁৎলে গেছে, তাই না ব্র্যানসন? জন ডো-র ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে নিয়ে দাঁত বের করে হাসল স্মিথ। ও সব সময়ে আমার সঙ্গে এ রকম বজ্জাতি করে, কারণ ও জানে আমার পাকস্থলী তেমন মজবুত নয়।

হ্যাঁ, তা যা বলেছ—আমি বললাম, ঠোঁটের ওপর থেকে ঘাম মুছে নিলাম, তবে এই মেয়েটার মতো নয়। ওর গায়ে এতটুকু দাগ পর্যন্ত নেই।

মেয়ে?

হ্যাঁ—আগ্রহ ঝরে পড়ওল আমার কণ্ঠস্বরে, সুন্দর সোনালি চুল মেয়েটা। চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে যে আছে।

স্মিথ ও ম্যাকলিন দুজনেই বাইরে বের করা খোলা ড্রয়ারটার দিকে দেখল। তারপর তাকাল পরস্পরের চোখে।

টুলি ভাই—ম্যকলিন বলল, তোমার শরীর কেমন আছে?

ভালোই আছে—আমি জবাব দিলাম। স্পষ্ট টের পেলাম আমার কপালের ভাঁজে বরফ জমতে শুরু করেছে।

ঘুমের কোন গণ্ডগোল হয়নি তো? কোন বাজে স্বপ্ন-টপ্ন বার বার দেখো নি তো?

কই না তো—আমি বললাম, কিন্তু চোদ্দ নম্বরের মেয়েটা...তোমরা যদি ওকে এনে না থাকো তাহলে হয়তো কলিন্স আর স্নেভলি এনেছে। ওরাই তাহলে মেয়েটা সম্পর্কে খবর-টবর দিতে পারবে।

স্মিথ আর ম্যাকলিন যেন আমার কাছ থেকে সরে গেল। তারপরই স্মিথের দম-ফাটা হাসি লাশ-ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে দিল।

সুন্দরী মেয়ে, সোনালি চুল, চোদ্দ নম্বর ড্রয়ার, যেখানে ওই হতভাগা ছিটেল্ বুড়িটা ছিল...ঠিক আছে, ব্র্যানসন, বুঝেছি।

ম্যাকলিন হতভম্ব হয়ে তার সঙ্গীর দিকে তাকাল, বুঝেছি মানে?

খুব সহজ—স্মিথ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বেচারা টুলির এখানে একা একা ভীষণ একঘেয়ে লাগে। এই আমাদের সঙ্গে একটু মজা করবার জন্যে এই গপ্পো ফেঁদেছে, কি বল টুলি?

স্পষ্টই বোঝা গেল মেয়েটাকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না, আর পাবেও না। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি যদি আরও জোর করি, তা হলে বিপদটা শেষ পর্যন্ত আমারই হবে। সুতরাং মাখন তোলা দুধের মতো সাদা হাসিতে ফেটে পড়লাম—যা বলেছ—বললাম স্মিথকে, খাটুনির কষ্টটা তো ভুলতে হবে।

স্মিথ কনুই দিয়ে খোঁচা মারল আমার পাঁজরে—দেখ টুলি ভায়া, এই লাশ যেন গরম হয়ে না ওঠে—। আর একদফা হাসি হেসে ও চলে গেল। কিন্তু স্মিথের পিছন পিছন বেরোবার সময় ম্যাকলিন বারকয়েক ঘাড় ফিরিয়ে চিন্তিত দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে গেল আমার দিকে।

আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাইরের দরজাটা বন্ধ হল। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গীর ভীষণ প্রয়োজন। 'লাশ-ঘরে আমি একা জীবিত প্রাণী' এ কথা ভেবে এই প্রথম আমার পাকস্থলী যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল ঠিক ঠান্ডা শুকনো খেজুরের মতো।

এত সাবধানে চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারকে পাশ কাটিয়ে চলে এলাম যেন এক গভীর খাদের ওপর দিয়ে এক ভঙ্গুর কাঁচের সেতু পার হচ্ছি।

চলে যাও বলছি—জেড. এল. কে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বলে উঠলাম, তুমি মোটেই সত্যি নও। এমন কি মৃতদেহ পর্যন্ত নও। নিছকই একটা—একটা ছায়া যে ছায়া আমি আমি ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সুতরাং কেটে পড়।

যাকে উদ্দেশ্য করে এত কথা বলা সে নির্বিকার রইল। বরং কোন্ সুরে অস্তিত্বহীন একটা মৃতদেহের সঙ্গে কথা বলছি তা ভেবে আমি নিজেই ভয় পেলাম।

পাশের ঘরের টেবিলে ফিরে এসে বসলাম। কয়েক সেকেন্ড এক বিচিত্র কাঁপুনি দিয়ে গেল আমার শরীরে। তারপর একটা উৎসাহী চিন্তা ঝলসে উঠল মনের মধ্যে। হয়তো ওলাফ ডেলি, স্মিথ ও ম্যাকলিন, সবাই মিলে আমার সঙ্গে মজা করছে। হয়তো জেড. এল-এর মৃতদেহ কলিন্স আর স্নেভলিই নিয়ে এসেছে, কারণ দিনের বেলায় ওরাই লাশ এনে জমা দেয়। তারপর ওরা হয়তো ভেবেছে এই কলেজের ছোকরাকে ভয় দেখিয়ে দারুণ একটা মজা করা যাবে।

মেজাজটা সামান্য ভালো হল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে জুড লরেন্সকে ফোন করলাম। জুড আমার বাবার গল্ফ্ খেলার সঙ্গী এবং হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের সাদা পোশাক ডিটেকটিভ। আমার সম্পর্কে ওর ধারণা ভালোই, এবং সত্যি বলতে কি, এ চাকরিটার জন্যে ও-ই আমার হয়ে সুপারিশ করেছিল।

জুডকে বাড়িতে পেলাম না। ও তিনটে থেকে এগারোটা ডিউটি করে বেড়াচ্ছে। সুতরাং পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করলাম। শুনলাম, জুড সই করে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ওরা চেষ্টা করে লকার রুমে জুডকে পেল।

টুলি ব্র্যানসন, মিস্টার লরেন্স।

কেমন চলছে, টুলি?

একটা মুশকিলে পড়ে গেছি।

বলে ফেল। ওর জোরালো মেজাজি স্বরে দ্বিধার লেশমাত্র নেই।

হ্যাঁ, মানে...মনে হচ্ছে, একটা লাশের ব্যাপারে আমাদের রেকর্ড খাতায় একটু গোলমাল হয়েছে। একটা মেয়ে। সোনালি চুল। নার্স। নামের আদ্যাক্ষর জেড. এল.।

তাহলে ওলাফ ডেলিকে ফোন করে দ্যাখ, টুলি।

হ্যাঁ, স্যার, কিন্তু জানেন তো, ডিউটি থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ওলাফের কি অবস্থাটা হয়! এতক্ষণে ও স্বপ্নের দেশে পৌঁছে গেছে, আর আমি ওকে এ সময়ে বিরক্ত করতে চাই না। ও ভীষণ ক্ষেপে যাবে।

জুত দরাজ গলায় হেসে উঠল, নাঃ, বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না। মেয়েটার সম্বন্ধে আর কিছু তাহলে জানো না?

না, যা বললাম শুধু তাই। মেয়েটা বেওয়ারিশ নয়, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। এর মতো মেয়ে, বিশেষ করে স্বাভাবিক কারণে যে মারা গেছে, বেসরকারি কবরখানায় যার যাওয়ার কথা, এখানে আসার কথা নয়।

সুতরাং মর্গে যখন এসেছে তখন মেয়েটা স্বাভাবিক ভাবে মারা যায়নি, জুড বলল।

সে ছাড়া আর কী হতে পারে।

খুন?

অন্য কোন কারণ তো মনে পড়ছে না—আমি বললাম, মেয়েটা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক অবস্থায় মারা গেছে।

ঠিক আছে, টুলি। দেখছি, তোমার জন্যে কী করতে পারি।

আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে বলে ভীষণ খারাপ লাগছে।

কষ্ট—ও বলল, কষ্টের কী আছে? গোটা দুয়েক টেলিফোন করলেই কাম ফতে হয়ে যাবে।

ধন্যবাদ, মিস্টার লরেন্স।

ফোন রেখে দিলাম। জুড লরেন্সের টেলিফোনের অপেক্ষা করতে করতে উঠে গেলাম লাশ-ঘরের দরজার কাছে। আস্তে আস্তে শার্সির ফাঁক দিয়ে নজর চালিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলাম আমি যে, চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারে মেয়েটার ছায়া এখনও আছে।

হ্যাঁ আছে। পা টেনে টেনে আবার ফিরে এলাম টেবিলের কাছে। মনে হল আমি যেন এক ক্লান্ত বৃদ্ধ মানুষ।

অবশেষে ফোন যখন বাজল, আমি ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলাম।

সিটি মর্গ। টুলি ব্র্যানসন বলছি।

আমি জুড, টুলি।

আপনি কি...

হোমিসাইড থেকে কোন খবর নেই, টুলি। জেড. এল. নামে কোন সোনালিচুল মেয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় খুন হয়নি।

ও—সত্যিকারের যন্ত্রণার আর্তনাদকে মাঝপথে টুঁটি টিপে থামিয়ে দিলাম।

নার্সদের খাতা-পত্তরেও খোঁজ নিয়েছি—জুড তখন বলে চলেছে, তোমার বর্ণনা নার্সকে পাওয়া গেছে। যুবতী, সোনালি চুল, সবে ট্রেনিং শেষ করেছে। ওর নাম জেলা ল্যাংট্রি। থাকে ৭১১ ইস্টল্যান্ড অ্যাভিনিউতে। সম্প্রতি সিটি হসপিটালে কাজে ঢুকেছে। যদি ওর কোন বিপদ-আপদ হয়ে থাকে, তাহলে তা গত আধ ঘণ্টায় হয়েছে। কারণ কিছুক্ষণ আগেই শিফ্ট বদলের সময় ও ডিউটি শেষ করে বাড়ি রওনা হয়ে গেছে।

জুডের কথা ও চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের ছায়া যোগ করলে একটাই অবিশ্বাস্য উদ্ভট সম্ভাবনা বাকি থাকে। সেটা এতই ভয়ঙ্কর ও অপার্থিব যে আমার মাথার চুল ছুঁচের মতো খাড়া হয়ে উঠল।

মিস্টার লরেন্স, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, জেলা ল্যাংট্রি কোন দিনই জীবিত অবস্থায় বাড়ি পৌঁছবে না।

তার মানে? কী বলছ তুমি, টুলি?

এন্তরের চতুর্থ মায়াবিনী যে ড্রয়ারে...আমার কথা জড়িয়ে গেল, বুড়িটার মন ভীষণ নরম ছিল। কখনও লোকের ক্ষতি করত না। শুধু ভালো করত।

কী সব আবোল-তাবোল বকছ? তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল জুড, টুলি, তুমি নেশা করেছ নাকি?

না, স্যর।

শরীর ঠিক আছে তো?

আমি—মানে...ইয়ে, হ্যাঁ, স্যর। অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার লরেন্স।

বিশ মিনিট পরে আমার ঝরঝরে চার-চাকা ইস্টল্যান্ড অ্যাভিনিউতে এসে থামল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে নম্বর খুঁজতে খুঁজতে পা চালালাম। বুঝলাম, ঠিক জায়গাতেই এসেছি, এবং ৭১১ নম্বর সহজেই পেয়ে গেলাম। একটা ছোট সাদা রঙের বাড়ি, সঙ্গে লাগোয়া ছোট উঠোন।

জায়গাটা অন্ধকার, নির্জন, শান্ত।

সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন গর্দভ মনে হচ্ছে তখন হঠাৎই সামনের চৌরাস্তা থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এল। তাকিয়ে দেখি, একটা সরকারী বাস ভারী শরীর নিয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা দলছুট মেপ্ল্ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, একটা মেয়ের ছায়া-শরীর ইস্টল্যান্ড অ্যাভিনিউ ধরে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু বাস থেকে মেয়েটা একা নামেনি। ওর ঠিক পিছনে আরও লম্বা, ভারী একটা ছায়া ঃ একটা লোক। দৃশ্যটা দেখে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেল।

মেয়েটা টের পেল ওর পিছনে কেউ আসছে। তাই তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করল। লোকটাও চলার গতি বাড়িয়ে দিল। মেয়েটা পিছন ফিরে তাকাল। আরও জোরে পা চালাল বলতে গেলে এখন ছুটছে।

ফুটপাথে লোকটার পায়ের শব্দ স্পষ্ট ও দ্রুত লয়ে বাজতে লাগল। সে মেয়েটার ঘাড়ের ওপর এসে পড়তেই মেয়েটার চিৎকার মাঝপথে থেমে গেল।

ফুটপাথে ওরা তখন যুঝে চলেছে। লোকটা বাহুর খাঁজে মেয়েটার গলা চেপে ধরেছে, মেয়েটা হাত-পা ছুড়ছে আর ছটফট করছে।

মেপ্ল্ গাছের আড়াল থেকে আমি এমন ভাবে ছুটে গেলাম যেন অদৃশ্য দামামা আমাকে রক্তের হোলিখেলায় যোগ দেবার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। লোকটা আমার পায়ের শব্দ পেয়ে মেয়েটাকে ছেড়ে দিল। আমি সরাসরি গিয়ে লোকটার ওপরে পড়লাম। আমার কাঁধ ওর পেটে আঘাত করল।

লোকটা সজোরে একটা হাঁটু তুলল। আঘাতটা আমার থুতনিতে এসে লাগল।

আমি ফুটপাথে বসে পড়লাম, এবং লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাল।

শক্ত অথচ কোমল হাত আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। এই প্রথম আমি জেলা ল্যাংট্রির চোখের দিকে তাকালাম। ছায়াময় রাতে কৃতজ্ঞতা মাখানো ভারী সুন্দর ধোঁয়াটে চোখ।

আপনার লাগেনি তো? দম ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করলাম।

না, ঠিক আছি। আপনি?

না না, আমার কিছু হয়নি, আমি বললাম।

মেয়েটা আস্তে আস্তে আস্থা ফিরে পাচ্ছে।

ভাগ্যিস্ ঠিক সময়ে আপনি এসে পড়েছিলেন!

আমি—ইয়ে—মানে এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম—ওকে বললাম, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই। ওই লোকটার নামে পুলিশে রিপোর্ট করে লাভ নেই। কারণ মুখ দেখতে পাইনি। ওরা ধরতে পারবে না।'

আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম—ও বলল, একটু এগিয়েই আমার বাড়ি।

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। মেয়েটা বলল, ওর নাম জেলা। আর আমিও বললাম, আমার নাম টুলি। ওর বাড়ির দরজায় পৌঁছে আমরা পরস্পরের চোখে তাকালাম, এবং আমি জানতে চাইলাম কখনও ওকে ফোন করলে কোন অসুবিধে আছে কি না, ও বলল, হাতের কাছে টেলিফোন খালি পেলেই করতে। দেখলাম, ও বাড়িতে ঢুকে গেল। গাড়িতে ফিরে আসার সময়ে আমি শিস দিতে শুরু করলাম।

মর্গে ফিরে এসে সোজা এগিয়ে গেলাম চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের দিকে। আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে জেলা ল্যাংট্রির ছায়াকে ড্রয়ারে আর দেখা যাবে না, কারণ এইমাত্র ওকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সুতরাং চোদ্দ নম্বর ড্রয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। না, আমার অনুমানে অন্তত কোন ভুল হয়নি।

জেলা ল্যাংট্রির ছায়া ড্রয়ারে আর নেই। নতুন যে মেয়েটা রয়েছে তার মাথায় সুন্দর একরাশ লাল চুল!

আর্কেডিয় কুরঙ্গ

আগাথা ক্রিস্টি



সামান্য উষ্ণতার আশায় মেঝেতে পা ঠুকলেন এরকুল পোয়ারা। হাতের আঙুলে সজোরে ফুঁ দিলেন। তাঁর গোঁফের কোণ বেয়ে টপটপ করে গলে পড়ছে তুষারের কণা।

দরজায় টোকা মেরে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করলো। আচরণে ধীরস্থির, মোটা-সোটা, গ্রাম্য মেয়ে। দু'চোখে যথেষ্ট কৌতূহল নিয়ে সে অপলকে চেয়ে রইলো এরকুল পোয়ারোর দিকে। সম্ভবত ঠিক এরকম কাউকে সে আগে কখনও দেখেনি।

সে জানতে চাইলো, 'আপনি কি ঘণ্টি বাজিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। দয়া করে একটু আগুনটা জ্বেলে দেবার ব্যবস্থা করবে?'

মেয়েটি চলে গেলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাগজ ও কাঠ নিয়ে ফিরে এলো। বিশাল ভিক্টোরিও তাপচুল্লীর সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে আগুন জ্বালানোর প্রস্তুতি শুরু করলো সে।

এরকুল পোয়ারা তাঁর মেঝেতে পা ঠোকা, হাত দোলানো এবং আঙুলে ফুঁ দেবার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তিনি এই মুহূর্তে বেশ বিরক্ত। কারণ তাঁর গাড়ি একটি মূল্যবান মেসারো গ্রাৎস্—একটা গাড়ির কাছে যতখানি যান্ত্রিক সূক্ষ্মতা তিনি আশা করেন, সে মাপকাঠি অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করেনি। তাঁর ড্রাইভার, জনৈক যুবক, যে ভালো অঙ্কের মাইনে পেয়ে থাকে, শত চেষ্টাতেও গাড়ির অবস্থার উন্নতি করতে পারেনি। অবশেষে প্রতিবাদের চরম নোটিস জানিয়ে জনপদ থেকে দেড় মাইল দূরের এক দ্বিতীয় শ্রেণীর রাস্তায় গাড়িটা স্তব্ধ হয়েছে। তখন শুরু হয়েছে তুষারপাত। এরকুল পোয়ারো তাঁর চকচকে বার্নিশ-করা চামড়ার জুতো পরেই সেই দেড় মাইল অতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছেন। তারপর এসে পৌঁছেছেন নদীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাম হার্টলি ডীন-এ। গ্রীষ্মকালে এই গ্রামে প্রাণচঞ্চলতার প্রতিটি লক্ষণ দেখা গেলেও শীতে এর চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত—নিষ্প্রাণ। সুতরাং একজন অতিথির আবির্ভাবে, 'ব্ল্যাক সোয়ান' অতিথিশালা রীতিমতো আতঙ্ক প্রকাশ করেছে। মালিক ভদ্রলোক যথেষ্ট বাকচাতুরী দেখিয়ে জানিয়েছেন যে স্থানীয় গ্যারেজ থেকে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যেতে পারে এবং তাতে এই অসম্পূর্ণ যাত্রা সম্পূর্ণ করা যেতে পারে।

এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এরকুল পোয়ারা। তাঁর ল্যাটিন অহমিকা-বোধ ক্ষুন্ন হয়েছে। গাড়ি ভাড়া করবেন তিনি? তাঁর নিজেরই তো গাড়ি রয়েছে—যথেষ্ট বড় গাড়ি দামী গাড়ি। শহরে ফিরে যেতে হলে

তিনি নিজের গাড়িতেই যাবেন, অন্য কোন গাড়িতে নয়। আর গাড়ি মেরামতের কাজ যদি তাড়াতাড়িও শেষ হয়, তাহলেও এই বরফের মধ্যে তিনি কাল সকালের আগে রওনা হচ্ছেন না। তাঁর এখন প্রয়োজন একটা ঘরের, একটা তাপচুল্লীর, এবং রাতের খাবার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালিক ভদ্রলোক তাঁকে ঘরে নিয়ে গেছেন, পরিচারিকাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাপচুল্লীতে আগুন জালানোর ব্যবস্থা করতে, তারপর ফিরে গেছেন স্ত্রীর কাছে সাম্প্রতিক খাদ্য সরবরাহ-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে।

এক ঘণ্টা পরে তাপচুল্লীর আরামদায়ক উষ্ণতার দিকে পা ছাড়িয়ে এরকুল পোয়ারো ক্ষমাশীল মনোভাব নিয়ে রোমন্থন করছিলেন তাঁর সদ্যসমাপ্ত নৈশভোজের স্মৃতি। সত্যি যে স্টেকগুলো কোথাও শক্ত কোথাও অসম্ভব নরম ছিলো, ব্রাসেলস স্প্রাউটগুলো ছিলো আকারে বড়, ফ্যাকাশে, আর থকথকে, আলুগুলোর ভেতরটা ছিলো পাথরের মতো শক্ত। সেদ্ধ আপেলের টুকরো অথবা তাকে অনুসরণকারী পায়েসের কথাও তেমন বলার মতন নয়। চীজটা যেমন শক্ত, বিস্কুটগুলোও ছিলো তেমনি নরম। লাফিয়ে ওঠা আগুনের শিখার দিকে সন্তুষ্ট চোখে তাকিয়ে তরল কাদার কাপে, যাকে আলংকারিক ভাষায় কফি বলা হয়, সন্তর্পণে চুমুক দিতে দিতে ভাবলেন এরকুল পোয়েরো, তা হলেও, পেট খালি থাকার চেয়ে ভর্তি অবস্থা অনেক ভালো, আর বরফ বিছানো পথে বার্নিশ-করা চামড়ার জুতো পায়ে হেঁটে আসার পর তাপচুল্লীর পাশে বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া নেহাতই স্বর্গ!

দরজায় টোকা মারার শব্দ করে পরিচারিকাটি ঘরে ঢুকলো।

'স্যার, গ্যারেজের লোক এখানে এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

এরকুল পোয়ারো। সৌজন্যের সুরে উত্তর দিলেন, 'তাকে ওপরে আসতে অনুমতি দেওয়া হোক।'

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে চলে গেলো। পোয়ারো স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করলেন, তাঁর সম্পর্কে মেয়েটির বর্ণনা আগামী বহু বছর ধরে ওর বন্ধুবান্ধবদের আনন্দের খোরাক যোগাবে।

দরজায় আর একবার টোকা মারার শব্দ হলো একটু ভিন্ন ধরনের শব্দ এবং পোয়ারো ডেকে উঠলেন, ভেতরে এসো।'

তিনি অনুকূল মনোভাব নিয়ে তাকালে যুবকটির দিকে। ঘরে ঢুকে কেমন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, টুপিটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে দু হাতে।

তিনি ভাবলেন, উপস্থিত যুবক তাঁর দেখা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সুদর্শন পুরুষদের অন্যতম নির্দশন। তার সরল মুখমণ্ডলে গ্রীক দেবতার সঙ্গে বাহ্যিক সাদৃশ্যের ছায়া অত্যন্ত স্পষ্ট।

যুবকটি চাপা নীরস কণ্ঠে বললো, 'গাড়িটার কথা বলতে এলাম স্যার। ওটা আমরা গ্যারেজে নিয়ে এসেছি। আর গোলামালটা কোথায় তাও ধরে ফেলেছি। মাত্র ঘণ্টা খানেক লাগবে সারাই করতে।'

পোয়ারো বললেন, 'কি গোলমাল হয়েছে?'

যুবকটি সাগ্রহে গাড়ির ইঞ্জিন-সংক্রান্ত পরিভাষায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। পোয়ারো সম্মতি জানিয়ে শান্তভাবে মাথা নাড়লেন, কিন্তু তিনি শুনছিলেন না কিছুই। নিখুঁত দেহসৌষ্ঠবকে তিনি বরাবরই শ্রদ্ধা করেন। তাঁর মতে, চারপাশে চশমাওলা ইঁদুরের সংখ্যা বড় বেশি। খুশি হয়ে আপন মনেই তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, একজন গ্রীক দেবতা—আর্কেডির কোন তরুণ মেষপালক।'

যুবকটি হঠাৎই থেমে গেলো। ঠিক তখনই এরকুল পোয়ারোর ভুরুর বুনুনি ঘন হয়ে উঠলো সেকেন্ডের জন্য। তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিলো নান্দনিক, দ্বিতীয়টি মানসিক। দৃষ্টি উঁচিয়ে ধরতেই তাঁর চোখজোড়া তীক্ষ্ম হয়ে এলো কৌতূহলে।

তিনি বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি।' একটু থেমে তিনি আবার যোগ করলেন, 'তুমি এইমাত্র যা যা বললে সবই আমার ড্রাইভার আমাকে জানিয়েছে।'

যুবকের দু গালে পলকে ছড়িয়ে পড়া রক্তাভা পোয়ারোর নজর এড়ালো না। ঘাবড়ে গিয়ে তার আঙুলগুলো চেপে বসলো টুপিটার ওপর।

সে তোতলা হয়ে বললো, 'ওই-হ্যাঁ, স্যর। সে আমি জানি।'

এরকুল পোয়ারো মসৃণ কণ্ঠে বলে চললেন, 'কিন্তু তুমি ভেবেছো নিজের মুখে সে কথা আমাকে জানালে ভালো হবে?'

'অ্যা—হ্যাঁ, স্যর। ভাবলাম, নিজের মুখে খবরটা আপনাকে দিয়ে আসি।'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'তোমার দায়িত্বজ্ঞান প্রশংসা করার মতো। ধন্যবাদ।'

শেষ কথাগুলোর আলোচনার পরিসমাপ্তির অস্পষ্ট অথচ নির্ভুল ইঙ্গিত থাকলেও তিনি কখনোই ভাবেননি যুবকটি বিদায় নেবে, এবং তাঁর অনুমানকে অভ্রান্ত প্রমাণিত করে সে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

তার আঙুলগুলো এক অজ্ঞাত আক্ষেপে পশমের টুপিটাকে সজোরে আঁকড়ে ধরতে লাগলো। আরও নীচু এবং বিহ্বল স্বরে সে বললো, 'ইয়ে—মাপ করবেন, স্যর—এ কথা কি সত্যি যে আপনিই সেই গোয়েন্দা ভদ্রলোক—মানে, আপনিই মিঃ হারকিউলিস পরিট?' নামটাকে সযত্নে উচ্চারণ করলো সে।

পোয়ারো বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

যুবকের মুখমণ্ডলে রক্তের ঝলক উঁকি মারলো।

সে বললো, 'খবরের কাগজে আপনার সম্পর্কে একটা লেখা পড়েছিলাম।'

'হুঁ—'

ছেলেটির দু'গাল এখন ঘোর লাল। তার দু চোখে যন্ত্রণার ছায়া—যন্ত্রণা এবং আকুতি। এরকুল পোয়ারো তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন।

তিনি নরম স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, বলো, কি জানতে চাও?'

উত্তরে শব্দগুলো ভেসে এলো দুরন্ত গতিতে।

'ভয় হচ্ছে, আপনি হয়তো এটাকে আমার তরফে চরম ধৃষ্টতা বলে মনে করবেন, স্যর। কিন্তু ঘটনাচক্রে এভাবে এ জায়গায় আপনার এসে পড়াটা—মানে, এরকম সুযোগ নষ্ট করা যায় না, বিশেষ করে আপনার সম্পর্কে কাগজে পড়বার পর। কত ঘটনা আপনি শুধু বুদ্ধি দিয়ে মিটমাট করে দিয়েছেন। যাই হোক, ভাবলাম, আর কিছু না হোক একবার আপনাকে জিগ্যেস করে দেখবো। শুধু জিগ্যেস করাতে তো ক্ষতি নেই, বলুন?'

এরকুল পোয়ারো মাথা নাড়লেন। তিনি বললেন, 'তুমি কোন ব্যাপারে আমার সাহায্য চাও?'

যুবক সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লো। শুষ্ক বিহ্বল কণ্ঠে সে বললো, 'একটি—একটি মেয়ের ব্যাপারে। আপনি—আপনি যদি ওকে খুঁজে দেন।'

'খুঁজে দেবো? তার মানে সে কি হারিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, স্যর।'

এরকুল পোয়ারো চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন।

তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারি, ঠিক। কিন্তু যাদের কাছে তোমার প্রথমে যাওয়া দরকার তারা হলো পুলিশ। এটা ওদেরই কাজ, আর এসব ব্যাপারে ওদের আমার চেয়ে অনেক বেশি হাত আছে।'

ছেলেটি নড়েচেড়ে দাঁড়ালো।

অপ্রতিভ স্বরে সে বললো, ' সে আমি যেতে পারবো না, স্যর। ব্যাপারটা ঠিক পুলিশে যাবার মতন নয়। বলতে গেলে ঘটনাটা একটু অদ্ভুত।'

এরকুল পোয়ারো স্থির চোখে দেখলেন তার দিকে। তারপর একটা চেয়ার নির্দেশ করলেন।

ঠিক আছে, তাহলে বোসো—কি নাম তোমার?'

'উইলিয়ামসন, স্যর, টেড উইলিয়ামসন।'

'বোসো, টেড। পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো।'

'ধন্যবাদ, স্যর।' সে চেয়ারটা টেনে অতি সন্তর্পণে তার কিনারায় বসলো। তার দু চোখে এখনও সারমেয়সুলভ আকুতি।

এরকুল পোয়ারো নরম সুরে বললেন, 'বলো।'

টেড উইলিয়ামসন গভীর শ্বাস নিলো।

'মানে, জানেন, স্যর, ঘটনাটা ঘটেছিলো ঠিক এইরকম। ওকে আমি মাত্র একবারই দেখেছি। ওর সঠিক নাম-ঠিকানা কিছুই আমি জানি না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত, বিশেষ করে আমার চিঠি ফিরে আসাটা।'

'প্রথম থেকে শুরু করো।' বললেন এরকুল পোয়ারো, 'তাড়াহুড়োর কোন প্রয়োজন নেই। শুধু যা যা ঘটেছে সেইটুকুই আমাকে শোনাও।'

'বলছি, স্যর। আপনি হয়তো "গ্রাসলন' চেনেন, স্যর, ব্রিজ পার হয়ে নদীর ধারে যে বড় বাড়িটা?'

'আমি এখানে কিছুই চিনি না।'

'বাড়িটা স্যর জর্জ স্যান্ডারফিল্ডের। গ্রীষ্মকালে সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে বা পার্টি দিতে তিনি বাড়িটা ব্যবহার করে থাকেন—তিনি নিয়ম মেনে শুধু হাসিখুশি হল্লোড়বাজ লোকদেরই নেমন্তন্ন করেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী এই সব। সে যাক, আসল ঘটনা ঘটে গত জুন মাসে—বাড়ির ওয়ারলেসটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওঁরা আমাকে ডেকে পাঠান সেটা সারাই করতে।'

পোয়ারো সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়ালেন।

'আমি তো গেলাম। ভদ্রলোক তখন তাঁর অতিথিদের নিয়ে নদীতে বেড়াতে গেছেন, রাঁধুনীও বাড়িতে ছিলো না, আর তাঁর চাকরও তাঁর সঙ্গে গেছে লঞ্চে অতিথিদের পানীয় ও খাবার পরিবেশন করার জন্যে। বাড়িতে ছিলো শুধু ওই মেয়েটা—ও ছিলো একজন মহিলা অতিথির পরিচারিকা। ও-ই দরজা খুলে আমাকে নিয়ে গেলো ওয়ারলেস সেটটার কাছে, এবং যতক্ষণ আমি কাজ করেছি সারাক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলো। সুতরাং আমাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়। ওর নাম নিটা, ওই আমাকে বলেছে। ওর মালকিন একজন রুশীয় নর্তকী।'

'মেয়েটি জাতিতে কি, ইংরেজ?'

'না, স্যর, মনে হয় ফরাসী হবে। ওর কথায় এক অদ্ভুত টান ছিলো। কিন্তু ইংরেজি ও ভালোই বলছিলো। ও—ও বেশ সহজভাবে কথাবার্তা বলতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে আমি ওকে জিগ্যেস করি ও আমার সঙ্গে সে রাতে সিনেমায় যেতে পারবে কিনা, কিন্তু ও বলে রাতে দিদিমণির ওকে দরকার হতে পারে। তবে ও ইচ্ছে করলে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে বিকেল নাগাদ, বেরোতে পারে, কারণ অতিথিদের লঞ্চে বেড়িয়ে ফিরতে ফিরতে দেরি হবে। সুতরাং, মোট কথা হলো আমিও বিকেলটা মালিককে না জানিয়ে ছুটি নিয়ে নিই (আর সেজন্য বরখাস্ত হতে হতে বেঁচে গেছি) এবং নদীর তীরে আমরা দুজনে বেড়াতে যাই।'

সে একটু থামলো। একটা অস্পষ্ট হাসি তার ঠোঁটে খেলা করছে। দু চোখ স্বপ্নিল।

পোয়ারো মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'ওকে দেখতে কেমন, সুন্দর?'

'ওরকম সুন্দরী আপনি দেখেননি। ওর চুল ছিলো সোনার মতো—ঘাড়ের কাছ থেকে দুপাশে ডানার মতো উঠে গেছে—আর ভীষণ হাসিখুশি, ছটফটে ওর স্বভাব। আমি—আমি ওকে দেখা মাত্রই ওর প্রেমে পড়েছি, স্যর। এতটুকু বানিয়ে বলছি না।'

পোয়ারো সম্মতি জানালেন নীরবে।

উইলিয়ামসন বলে চললো, ‘ও তারপর বলেছে ওর দিদিমণি আবার দিন পনেরোর মধ্যে এখানে আসবেন এবং তখন আমরা দেখা করবো বলে ঠিক করি।’ সে একটু থামলো, ‘কিন্তু ও আর আসেনি। ওর কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করেছি, কিন্তু ওর দেখা পাইনি, অবশেষে সাহস করে আমি ওই বাড়িতে গেছি, গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি। ওরা বললো, রুশীয় ভদ্রমহিলা ওর তাঁর পরিচারিকা দুজনেই বাড়িতে রয়েছেন। ওরা পরিচারিকাকে ডেকে পাঠায়, কিন্তু সে আসতেই দেখলাম সে নিটা নয়! একটা ময়লা রঙের রুক্ষ চেহারার মেয়ে—যদি কাউকে সাহসী বলতে হয় তো একেই বলতে হয়। ওরা ওকে মেরি বলে ডাকছিলো। ‘তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছো?’ ও বললো, মুখে একগাল বোকা-বোকা হাসি। ও নিশ্চয়ই বুঝেছিলো আমি একটু থতমত খেয়ে গেছি। বললাম, ও-ই কি সেই রুশীয় ভদ্রমহিলার পরিচারিকা, আর আমি যাকে আগে দেখেছি সে যে অন্য মেয়ে সে বিষয়েও কি যেন বলেছি, তখন ও জোরে হেসে উঠেছে, বলেছে, আগের পরিচারিকাকে হঠাৎই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘ছুটি দেওয়া হয়েছে?’ অবাক হয়ে বলেছি, ‘কি জন্যে?’ মেয়েটা একটা কাঁধ ঝাঁকানোর ভঙ্গি করে হাত ওল্টালো। ‘আমি কি করে জানবো?’ ও বললো, ‘আমি তো তখন ছিলাম না।’

‘সত্যি, স্যর, এ ঘটনায় আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। সেই মুহূর্তে কি বলবো ভেবে পাইনি।

‘কিন্তু পরে সাহস সঞ্চয় করে আমি মেরির সঙ্গে আবার দেখা করলাম। নিটার ঠিকানা চাইলাম ওর কাছে। ওকে বলিনি যে নিটার পদবী আমি জানি না। যদি আমার কথামতো কাজ করে তাহলে ওকে একটা উপহার দেবো বলে কবুল করেছিলাম—ও সেই ধরনের মেয়ে যারা লাভ ছাড়া কোন কাজ করতে চায় না। সে যাক, ঠিকানা ও আমাকে এনে দিল—নর্থ লণ্ডনের একটা ঠিকানা, আমি সেই ঠিকানায় চিঠি লিখলাম নিটাকে—কিন্তু দিন কয়েক বাদেই চিঠিটা ফিরে এলো—খামের ওপর “এই ঠিকানায় বর্তমানে নেই “ লিখে পোস্ট অফিস ওটাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।’

টেড উইলিয়ামসন থামলো, তার চোখ,গভীর নীল। স্থির চোখ, পোয়ারোর দিকে নিবদ্ধ। সে বললো, ‘এবারে তো বুঝলেন, স্যর? এটা নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া যায় না। কিন্তু আমি ওকে খুঁজে বার করতে চাই। জানি না, কি ভাবে ওর খোঁজ করবো। যদি—যদি আপনি ওর সন্ধান আমাকে এনে দেন ...’ তার মুখের রঙ গাঢ় হলো, ‘আমার—আমার খুব সামান্য কিছু জমানো টাকা আছে। পাউন্ড পাঁচেক হবে—হয়তো টেনেটুনে দশ পাউন্ড ও হতে পারে।’

পোয়ারো শান্ত কণ্ঠে বললেন, ‘আর্থিক দিকটা এক্ষুনি আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রথমে এই কথাটা ভেবে দ্যাখো—এই মেয়েটি, নিটা—সে তোমার নাম, কোথায় কাজ করো, তা জানতো?’

‘হ্যাঁ, স্যর, জানতো।’

‘সুতরাং ইচ্ছে করলেই সে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতো?’

টেড ধীরে ধীরে বললো, ‘হ্যাঁ, স্যর। ‘

‘তাহলে তোমার কি মনে হয় না—হয়তো—’

টেড উইলিয়ামসন তাঁকে বাধা দিলো।

‘আপনি বলতে চাইছেন, স্যর, আমি ওকে ভালবাসলেও ও আমাকে ভালবাসেনি? কি জানি, হয়তো সেটা সত্যি হতে পারে। কিন্তু আমাকে ওর ভালো লেগেছে—এতে কোন ভুল নেই—নিছক মজা করার জন্যে ও আমার সঙ্গে মেশেনি। আর আমিও অনেক ভেবেছি,স্যর, হয়তো এসবের পেছনে কোন কারণ আছে। কেন না,স্যর, যে সব লোকের সঙ্গে ও ছিলো তারা খুব সুবিধের ছিলো না। হয়তো ও কোন বিপদে পড়েছে, বুঝতেই পারছেন কি বলতে চাইছি।’

‘তার মানে সে মা হতে চলে ছিলো? তোমার জন্য?’

'না, স্যর, আমার জন্য নয়।' টেডের মুখে রক্তের আকস্মিক ঝলক, আমাদের মধ্যে সেরকম সম্পর্ক ছিলো না।'

পোয়ারো চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

তিনি মৃদু স্বরে বললেন, 'আর তোমার ধারণা যদি সত্যি হয়-তা সত্ত্বেও তুমি ওকে খুঁজে বার করতে চাও?'

টেড উইলিয়ামসনের মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস সীমাহীন।

সে বললো, 'হ্যাঁ, স্যর, চাই, এবং সেটাই শেষ কথা। ও যদি অরাজী না হয় তাহলে আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। যে বিপদেই ও পড়ুক না কেন তাতে আমার কথার কোন নড়চড় হবে না। শুধু আপনি যদি একটু কষ্ট করে ওর খোঁজ আমাকে এনে দেন, স্যর?'

এরকুল পোয়ারো স্মিত হাসলেন। তিনি আপন মনেই বললেন, "সোনালী ডানার মতো চুল। "হুঁ, আমার ধারণা এটাই হারকিউলিসের তৃতীয় শ্রমের পরীক্ষা। যদি আমার স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে থাকে, তাহলে সেটা ঘটেছিলো আর্কেডিতে।'

টেড উইলিয়ামসনের অনেক পরিশ্রমে লিখে দেওয়া নাম ও ঠিকানা লেখা কাগজটার। দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইলেন এরকুল পোয়ারো।

মিস ভ্যালেটা, ১৭ আপার রেনফ্রু লেন, এন.১৫।

এই ঠিকানায় গিয়ে তিনি নতুন কিছু জানতে পারবেন কিনা কে জানে। সম্ভবত পারবেন না। কিন্তু টেড তাঁকে এর বেশি কোন সূত্র দিতে পারেনি।

সতেরো আপার রেনফ্রু লেন চেহারায় মলিন হলেও চরিত্রে সম্ভ্রান্ত। পোয়ারোর টোকার উত্তরে দরজা খুলে দিলেন জনৈক ঝাপসা-চোখ শক্তসমর্থ মহিলা।

'মিস ভ্যালেটা?'

'অনেক দিন হলো চলে গেছে সে।'

দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, পোয়ারো একধাপ এগিয়ে চৌকাঠে পা রাখলেন।

'তার ঠিকানাটা হয়তো আপনি আমাকে দিতে পারবেন?'

'উঁহু। সে কোন ঠিকানা রেখে যায়নি।'

'এ বাড়ি ছেড়ে সে গেছে কবে?'

'গত গ্রীষ্মে।'

'সঠিক তারিখটা আমাকে বলতে পারেন?'

দুটো আধ ক্রাউনের বন্ধুত্বপূর্ণ ঠোকাঠুকির টুংটাং শব্দ শোনা গেলো পোয়ারের ডান হাত থেকে। ঝাপসা-চোখ ভদ্রমহিলা যেন যাদুমন্ত্রবলে নরম হলেন। হয়ে উঠলেন দয়ার প্রতিমূর্তি।

'আপনাকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য, স্যর। দাঁড়ান, ভেবে দেখি। আগষ্ট, না, তারও আগে—জুলাই—হ্যাঁ, জুলাই মাসেই হবে। জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তা নাগাদ। খুব তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছিলো মেয়েটা। বোধহয় ইটালিতেই ফিরে গেছে।'

'তাহলে সে ইটালিয়ান ছিলো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর।'

'আর এক সময়ে সে একজন রাশিয়ান নর্তকীর পরিচারিকা ছিলো, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মাদাম সিমোলিনা না কি যেন নাম। থেসপিয়ানে নাচতেন তিনি, যে নাচ দেখবার জন্যে এখানকার লোকেরা একেবারে পাগল। তিনি ছিলেন নামী তারকাদের একজন।'

পোয়ারো বললেন, 'মিস ভ্যালেটা চাকরি ছাড়লো কেন, জানেন?'

মহিলা একমুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন, ‘নাঃ, জানি না।’

‘তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তাই না?’

‘মানে—যদ্দুর শুনেছি একটু-আধটু জল ঘোলা হয়েছিলো! কিন্তু জানবেন, মিস ভ্যালেটা আমাকে কিছুই খুলে বলেনি। মন খুলে কথা বলবার মতো মেয়ে সে ছিলো না। কিন্তু তাকে দেখে মনে হতো রেগে আগুন হয়ে আছে। মেয়েটার মেজাজও ছিলো অত্যন্ত খারাপ—একেবারে আইটালিয়ান মেজাজকালো চোখজোড়া সব সময়েই কটমট করতো, যেন আপনার বুকে ছুরি বসাতে পারলে তার মন ঠাণ্ডা হয়। তার মেজাজ খারাপ থাকলে আমি তো ধারেকাছেও ঘেঁষতাম না!’

‘তাহলে মিস ভ্যালেটার এখনকার ঠিকানা আপনি জানেন না?’

উৎসাহ দিতে টুংটাং শব্দে আবার বেজে উঠলো আধ ক্রাউন দুটো।

উত্তরের সুর সত্যি বলেই মনে হলো ঃ ‘যদি জানতাম, স্যর, আপনাকে সে খবর দিতে পারলে অত্যন্ত খুশি হতাম। কিন্তু বললাম তো—মেয়েটা তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ চলে যায়, আর এই সার কথা।’

পোয়ারো চিন্তিতভাবে আপন মনেই বললেন, হুঁ, এই সার কথা।

মুক্তি আসন্ন একটি ব্যালের জন্য দৃশ্যপট আঁকছে অ্যামব্রোস ভ্যান্ডেল। সেই কাজের সাগ্রহ বিরতির সামান্য মোড় ফেরাতেই তার কাছ থেকে বেশ সহজেই খবরাখবর পাওয়া গেলো।

‘স্যান্ডারফিল্ড? জর্জ স্যান্ডারফিল্ড? বড় বাজে লোক। টাকার গড়াগড়ি খাচ্ছে জানি, কিন্তু লোকে বলে যে দু-নম্বরী আদমী। কালো ঘোড়া। কোন নাচুনীর সঙ্গে লটরপটর? নিশ্চয়ই, মশাই, ছিলো বৈকি—কাত্রিনার সঙ্গে। কাত্রিনা সামুশেনকা। আপনি নিশ্চয়ই তাকে দেখেছেন? কি বলবো, মশাই—দারুণ মাল। কি নাচের কায়দা! ‘দ্য সোয়ান অফ টুওলেলা’—এটা নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন? ওতে দৃশ্যসজ্জা আমার ছিলো। আর ডিবুসি না ম্যানাইন-এর ওটা দেখেছেন ‘লা বিশ ও বোয়া’? ওতে মাইকেল নভগিনের সঙ্গে মেয়েটা নেচেছিলো। মাইকেলের তুলনা নেই, কি বলেন?’

‘তাহলে মিস কাত্রিনা স্যর জর্জ স্যান্ডারফিল্ডের বান্ধবী ছিলেন?’

‘হ্যাঁ, সপ্তাহশেষের ছুটিগুলো তো তার সঙ্গে তার নদীর ধারের বাড়িতেই মেয়েটা কাটাতো। শুনেছি লোকটা নাকি বেশ জমকালো পার্টি দেয়।’

‘মাদমোয়াজেল সামুশেনকার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পারেন?’

‘কিন্তু, মশাই, সে তো এখানে আর নেই। প্যারিস না কোথায় যেন হুট করে চলে গেছে। জানেন, লোকে বলে সে নাকি বলশেভিক গুপ্তচর না কি যেন ছিলো—অবশ্য আমি তা বিশ্বাস করি না—জানেন তো, লোকে এ ধরনের কথা বলতে ভালোবাসে। কাত্রিনা সবসময় ভান করতো যে সে একজন হোয়াইট রাশিয়ান—তার বাবা রাজকুমার না গ্র্যান্ড ডিউক ছিলো—সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে। এবং লোকে যেগুলো সহজে হজম করতে পারে।’ ভ্যান্ডেল একটু থামলো, এবং ফিরে এলো নিজের বিষয়ে, ‘আর আমি যা বলছিলাম, যদি আপনাকে বাথশেবার মনন বুঝতে হয় তাহলে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে সেমিটিক ঐতিহ্যে। আমি একে বলি—’

মহানন্দে বলে চললো সে।

স্যর জর্জ স্যান্ডারফিল্ডের সঙ্গে এরকুল পোয়ারো যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন তার সূত্রপাত তেমন শুভ হলো না।

অ্যামব্রোস ভ্যান্ডেল বর্ণিত “কালো ঘোড়া “ যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছেন মনে হলো। স্যর জর্জ বেঁটেখাটো সমর্থ পুরুষ,মাথার চুল মোটা এবং কালো, ঘাড়ে চর্বির থাক।

তিনি বললেন, ‘বলুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? ইয়ে—আপনার সঙ্গে বোধহয় আগে কখনও পরিচয় হয়নি, তাই না?’

'না, এই প্রথম।'

'হুঁ, তা কি ব্যাপার? স্বীকার করছি, আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। '

'খুবই সামান্য ব্যাপার—শুধু একটা খবর জানতে এসেছি।'

স্যর জর্জ অস্বস্তিভরে সশব্দ হাসি হাসলেন।

'আমার কাছ থেকে কোন ভেতরকার খবর জানতে চান? জানতাম না, টাকা লগ্নির ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ আছে।'

'ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য আমি আসিনি। আমি এসেছি একজন মহিলার খোঁজে।'

'ও,' স্যর জর্জ স্যান্ডারফিল্ড আরামকেদারায় শরীর এলিয়ে বসলেন। তিনি যেন স্বস্তি পেলেন। তাঁর স্বরে এখন অপেক্ষাকৃত সহজ সুর।

পোয়ারো বললেন, 'আশা করি, মাদমোয়াজেল কাত্রিনা সামুশেনকার সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিলো?'

স্যান্ডারফিল্ড সশব্দে হাসলেন।

'হ্যাঁ। মুগ্ধ করার মতো মেয়ে। নিতান্ত দুঃখের কথা যে ও লন্ডন ছেড়ে চলে গেছে।'

'উনি লন্ডন ছেড়ে গেলেন কেন?'

'কি জানি, মশাই, জানি না। হয়তো প্রযোজকদের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। ও অল্পেতেই রেগে উঠতো, জানেন—একবারে রাশিয়ান মেজাজ। দুঃখিত যে আপনাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারলাম না, কারণ ও এখন কোথায় আছে তা আমার ধারণার বাইরে। ওর সঙ্গে কোন যোগাযোগই রাখিনি।'

উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরে পাওয়া গেলো আলোচনার পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত।

পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু আমি মাদমোয়াজেল সামুশেনকার খোঁজে এখানে আসিনি।'

'ওর খোঁজে আসেননি?'

'না, আমি তাঁর পরিচারিকার খোঁজে এসেছি।'

'ওর পরিচারিকা?'

স্যান্ডারফিল্ড অপলকে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

পোয়ারো বললেন, 'তাঁর পরিচারিকাকে হয়তো আপনার মনে আছে?'

স্যান্ডারফিল্ডের যত অস্বস্তি আবার ফিরে এলো।

হতবুদ্ধি স্বরে তিনি বললেন, 'পাগল, কি করে মনে থাকবে? অবশ্য এটুকু মনে আছে যে ওর পরিচারিকা একটা ছিলো। তবে একটু বাজে ধরনের ছিলো মেয়েটা। উঁকি মারা, আড়িপাতার স্বভাব ছিলো। আমি হলে ও মেয়ের কোন কথাতেই কান দিতাম না। মেয়েটা ছিলো যাকে বলে জন্মমিথ্যুক।'

পোয়ারো বিড়বিড় করে বললেন, 'তাহলে মেয়েটি সম্পর্কে অনেক কথাই আপনার মনে আছে দেখছি?'

স্যান্ডারফিল্ড তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'ওপর ওপর দেখে যেটুকু মনে হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। ওর নামটা পর্যন্ত আমার মনে নেই। দাঁড়ান, মেরি না কি যেন—নাঃ, এ ব্যাপারে কোনরকম সাহায্যই আপনাকে করতে পারলাম না দুঃখিত।'

পোয়ারো শান্ত স্বরে বললেন, 'মেরি হেলিনের নাম আমার থেসপিয়ান থিয়েটার থেকেই জানা হয়ে গেছে—সঙ্গে জেনেছি ওর ঠিকানা। কিন্তু স্যর জর্জ, আমি বলছি সেই মেয়েটির কথা, মেরি হেলিনের আগে যে মাদমোয়াজেল সামুশেনকার কাছে ছিলো। আমি নিটা ভ্যালেটার কথা বলছি।'

স্যান্ডারফিল্ড অপলক বিমূঢ়।

তিনি বললেন, 'ওকে আমার একটুও মনে পড়ে না। শুধু মেরির কথাই আমার মনে আছে। ছোটখাটো ময়লা রঙের মেয়ে, দু চোখে নোংরা চাউনি।'

পোয়ারো বললেন, 'যে মেয়েটির কথা আমি বলছি সে গত জুলাইয়ে আপনার বাড়ি, গ্রাসলনে ছিলো।'

গোমড়া মুখে বললেন স্যান্ডারফিল্ড, 'সে যাই হোক, ওকে যে আমার মনে নেই শুধু এটুকুই আমি বলতে পারি। মনে হয় না সে সময় কাত্রিনার সঙ্গে কোন পরিচারিকা ছিলো। হয়তো আপনার কোন ভুল হচ্ছে।'

এরকূল পোয়ারো নেতিবাচক মাথা নাড়লেন। না, তিনি মনে করেন না তাঁর কোন ভুল হচ্ছে।

ছোট্ট ধূর্ত চোখে চকিতে পোয়ারোকে দেখলো মেরি হেলিন এবং সঙ্গে সঙ্গেই চোখ সরিয়ে নিলো। মসৃণ সুষম স্বরে বললো ও, 'কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, মঁসিয়ে, মাদাম সামুশেনকা আমাকে চাকরি দেন জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে। তাঁর আগের লোক নাকি হঠাৎই চাকরি ছেড়ে চলে গেছে।'

'কখনও কি শুনেছো সে কেন চাকরি ছেড়ে চলে গেছে?'

'সে হঠাৎ চলে গেছে—শুধু এটুকুই শুনেছি। হয়তো শরীর খারাপ বা ওই রকম কিছু হয়েছিলো। মাদাম আমাকে কিছু বলেননি।'

পোয়ারো বললেন, 'তোমার দিদিমণির কাছে কাজ করতে তোমার কখনও অসুবিধে হয়নি?'

মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকালো।

'দিদিমণি বড় খেয়ালি। এই কাঁদছেন তো এই হাসছেন। কোন কোন সময় এত নিরাশ হয়ে পড়তেন যে কথাও বলতেন না, খেতেনও না। কখনও পাগল হয়ে উঠতেন আনন্দে। অবশ্য নাচিয়েরা ওই রকমই হয়। এর নাম মেজাজ।'

'আর স্যর জর্জ?'

মেয়েটি সচকিতে চোখ তুলে তাকালো। একটা অসদ্ভাবের চাউনি ঝিকিয়ে উঠলো ওর দু চোখে।

'ও, স্যর জর্জ স্যান্ডারফিল্ড? তাঁর সম্পর্কে আপনি জানতে চান? হয়তো আসলে এই খবরটা আপনি জানতে চাইছিলেন? অন্যটা তাহলে নেহাৎই অজুহাত ছিলো, হ্যাঁ? হুঁ, স্যর জর্জ, ওঁর সম্পর্কে কিছু অদ্ভুত খবর আপনাকে শোনাতে পারি, কি করে—'

পোয়ারো বাধা দিলেন, 'তার কোন প্রয়োজন নেই।'

মেয়েটি অবাক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো, মুখ হাঁ করে। ওর চোখে হতাশাজনিত ক্রোধ।

'আমি সব সময়েই বলি আপনার অজানা কিছু নেই, আলেক্সি পাভলোভিচ্।'

যথাসম্ভব তোষামোদী সুরে শব্দগুলো মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন এরকুল পোয়ারো।

তিনি আপন মনেই ভাবছিলেন যে হারকিউলিসের এই তৃতীয় শ্রমের পরীক্ষার কল্পনাতীত ঘোরাঘুরি এবং সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয়েছে। নিখোঁজ পরিচারিকার এই ছোট্ট ঘটনা তাঁর দেখা যাবতীয় রহস্যের মধ্যে দীর্ঘতম এবং সর্বাপেক্ষা জটিল বলে ক্রমশ নিজেকে জাহির করছে। প্রত্যেকটি সূত্র, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করেছে অদৃশ্য নিশানায়।

সেই একই কারণ তাঁকে এই সন্ধ্যায় নিয়ে এসেছে প্যারিসের স্যামোভার রেস্তোরাঁয়, যার মালিক,কাউন্ট আলেক্সি পাভলোভিচ্, অহঙ্কার প্রকাশ করে থাকেন এই কথা বলে যে অভিনয়-জগতের খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে।

তিনি এখন মাথা নাড়লেন আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে।

'ঠিকই বলেছেন, ভাই,আমার অজানা কিছু নেই—সব সময়েই আমাকে জানতে যয়। আপনি জিঞ্জেস করছেন মেয়েটা কোথায় গেছে—আমাদের ছোট্ট সামুশেনকা, সুন্দরী নাচুনী? হুঁ! ক্ষুদে মেয়েটা জবর জিনিস ছিলো।' আঙুলের ডগায় চুমু খেলেন তিনি, 'কি আগুন—কি ছলাকলা! মেয়েটার হতো—ওর সময়ে প্রিমিয়ার ব্যালেরিনা হতে পারতো ও—কিন্তু হঠাৎই সব শেষ—ও নিঃশব্দে সরে গেলো—পৃথিবীর শেষপ্রান্তে—আর দেখতে দেখতে লোকে ভুলে গেলো ওর কথা। '

'তিনি এখন আছেন কোথায়?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'সুইজারল্যান্ডে। ভ্যাগ্রেলে আল্পসে। যারা ক্রমশ রোগা হয়ে যায়, শুকনো কাশির কবলে পড়ে, তারাই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ও আর বাঁচবে না, ওর দিন শেষ হয়ে এসেছে। ও অদৃষ্টে বিশ্বাসী। মৃত্যু ওর অনিবার্য।'

বিষণ্ণতার ঘোর কাটাতে কাশলেন পোয়ারো। তাঁর তথ্যের প্রয়োজন।

'ঘটনাচক্রে তাঁর একজন পরিচারিকার কথা কি আপনার মনে আছে? নিটা ভ্যালেটা নামে একজন পরিচারিকা?'

'ভ্যালেটা? ভ্যালেটা? একজন পরিচারিকাকে একবার স্টেশনে দেখেছি—যখন কাত্রিনাকে লণ্ডনের ট্রেনে তুলে দিতে গেছি তখন। মেয়েটা ইটালিয়ান ছিলো, পিসায় দেশ, তাই না? হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে ও পিসা থেকে এসেছিলো, জাতে ইটালিয়ান।'

এরকুল পোয়ারো আর্তনাদ করে উঠলেন।

'তাহলে তো,' বললেন, তিনি, 'আমাকে পিসায় রওনা হতে হয়।'

পিসার ক্যাম্পো সান্টোতে দাঁড়িয়ে ছিলেন এরকুল পোয়ারো। তাকিয়ে আছেন একটি কবরের দিকে।

তাহলে এইখানে এসেই তাঁর অনুসন্ধান শেষ হলো—এই সামান্য একমুঠো মাটির ঢিবির কাছে এসে। এর নীচেই শুয়ে আছে সেই হাসিখুশি মেয়েটি যে একজন ছাপোষা ইংরেজ মিস্ত্রীর হৃদয়ে এবং কল্পনায় আন্দোলন এনেছিলো।

সেই আকস্মিক অদ্ভুত প্রেমের এই পরিসমাপ্তিই হয়তো সবচেয়ে ভালো হলো। জুলাইয়ের সেই অপরাহ্নে স্বপ্নময় কয়েক ঘণ্টার স্মৃতির মধ্যেই মেয়েটি চিরকাল বেঁচে থাকবে যুবকটির মানসে। বিরুদ্ধ দুই জাতির সংঘাত শ্রেণীবিভেদের সংঘাত স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, এ সবেরে সম্ভাবনা চিরতরে নিশ্চিহ্নে মুছে গেছে।

বিষন্ন ভাবে মাথা নাড়লেন এরকুল পোয়ারো। তাঁর মন ফিরে গেলো ভ্যালোটা পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলোচনার মুহূর্তে। মা, গোলগাল গ্রাম্য মুখ; ঋজু, শোকার্ত বাবা; ময়লা রঙ, সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর বোন।

'হঠাৎই হয়েছে, সিনর, একেবারে হঠাৎ। যদিও অনেক বছর ধরেই এখন তখন ওর ব্যথা উঠতো। ডাক্তারবাবু আমাদের পছন্দ-অপছন্দের সুযোগ দেননি—তিনি বলেছেন, একটুও দেরি না করে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশান করাতে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করবার পর সেই অবস্থাতেই ও মারা যায়। ওর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।'

মা নাক টানলেন সশব্দে, বিড়বিড় করে বললেন, 'বিয়াংকা খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিল। অত অল্প বয়েসে ও মারা যাবে ভাবা যায় না।'

এরকুল পোয়ারো আপন মনেই পুনরাবৃত্তি করলেন, ও বড় অল্প বয়েসে মারা গেছে।

এই সংবাদই তিনি বয়ে নিয়ে যাবেন সেই যুবকের কাছে যে তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর সাহায্য চেয়েছে।

ও তোমার জন্য নয়, বন্ধু। ও বড় অল্প বয়েসে মারা গেছে।

তাঁর অনুসন্ধান শেষ—শেষ হলো এইখানে, যেখানে আকাশের পটভূমিতে লীনিং টাওয়ারের ছায়াময় অবয়ব, যেখানে প্রথম বসন্তের ফুলোরা আসন্ন জীবন ও খুশির প্রতিশ্রুতিতে মেলে ধরেছে তাদের বিবর্ণ গোলাপী শরীর।

এই চূড়ান্ত রায়কে মেনে নিতে তাঁর মনের বিদ্রোহী অস্বীকারের কারণ কি বসন্তের চঞ্চলতা? নাকি অন্য কিছু? তাঁর মস্তিষ্কের অন্দরমহলে কোন অস্বস্তি—কয়েকটা শব্দ—একটা কথা—একটা নাম? পুরো ব্যাপারটাই বড় বেশি পরিচ্ছন্ন ভাবে শেষ হলো না—চোখে লাগার মতো মিলে গেলো না খাপে খাপে?

এরকুল পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সমস্ত সন্দেহের নিরসন করতে গেলে আর ও একটা জায়গায় তাঁর যাওয়া দরকার। ভ্যাগ্রে সে আল্পস—সেখানে তাঁকে যেতেই হবে।

এই হচ্ছে, তিনি ভাবলেন, সত্যি সত্যি পৃথিবীর শেষপ্রান্তে। এই বরফের থাক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একচালা ঘরগুলো যার প্রতিটিতে শুয়ে আছে নিশ্চল এক একটি মানুষ, লড়াই করছে ছলনাময়ী মৃত্যুর সঙ্গে।

সুতরাং অবশেষে তিনি এসে পৌঁছলেন কাত্রিনা সামুশেনকার কাছে। শয্যা-আচ্ছাদনের ওপরে দীর্ঘ, কৃশ দু-হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছেন তিনি। ভাঙা দু গালে গাঢ় লালচে আভা। তাঁকে দেখে এক টুকরো স্মৃতি চঞ্চল হয়ে উঠলো পোয়ারোর মনে। ওঁর নাম তাঁর মনে ছিলো না, কিন্তু ওঁর নাচ তিনি দেখেছেন—শিল্পকে ভুলিয়ে দেওয়া শিল্পকলার চুড়ান্ত নৈপুণ্যে আত্মহারা হয়ে গেছেন, তিনি মুগ্ধ হয়েছেন একই সঙ্গে।

তাঁর মনে পড়লো 'হান্টার' মাইকেল নভগিনের কথা,অ্যামব্রোস ভ্যান্ডেলের মস্তিষ্ক অকল্পনীয় অদ্ভুত অরণ্যে তাঁর ছন্দোময় লম্ফন এবং আবর্তনের কথা। তাঁর আরও মনে পড়লো সুন্দর ভেসে যাওয়া 'হিণ্ড'-এর কথা, শিকারের আশায় যে চির-অনুসৃত, এবং চির-আকাঙ্ক্ষিত—মাথায় শিং বসানো একটি সোনালী সুন্দর প্রাণী, যার পা দুটো ঝিকমিকে ব্রোঞ্জের। তাঁর মনে পড়লো গুলিবিদ্ধ আহত অবস্থায় ওর অন্তিম পতনের কথা, আর মাইকেল নভগ্রিন তখন হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে, নিহত হরিণের দেহ হাতে নিয়ে।

কাত্রিনা সামুশেনকা ঈষৎ কৌতূহল নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

কাত্রিনা বললেন, 'আপনাকে আগে কখনও দেখিনি, তাই না? কি চান আপনি আমার কাছে?'

এরকুল পোয়ারো অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালেন।

'প্রথমে, আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই—আমার অতীতের একটি সন্ধ্যাকে আপনার শিল্পের মাধ্যমে মনোরম করে তোলার জন্য।'

কাত্রিনা হালকাভাবে হাসলেন।

'আর একটু প্রয়োজনেও আমি এখানে এসেছি। বহুদিন ধরে আমি আপনার একজন পরিচারিকার খোঁজ করছি—তার নাম ছিলো নিটা।'

'নিটা?'

কাত্রিনা অবাক চোখে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখ পরমাশ্চর্য, আয়ত।

প্রশ্ন করলেন কাত্রিনা, 'নিটার সম্বন্ধে আপনি—কি জানেন?'

'সবই বলবো আপনাকে।'

পোয়ারো তাঁকে বললেন সেই সন্ধের কথা, যেদিন তাঁর গাড়ি খারাপ হয়েছিলো। বললেন টেড উইলিয়ামসনের কথা, কি ভাবে সে আঙুলে টুপি নাড়াচাড়া করতে করতে বাধো-বাধো স্বরে বলেছিলে তার ভালোবাসা ও যন্ত্রণার কথা। অত্যন্ত মনোযোগে সব শুনলেন কাত্রিনা।

পোয়ারোর কথা শেষ হতে তিনি বললেন, 'বড় দুঃখের, সত্যি বড় দুঃখের।'

এরকুল পোয়ারো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি, 'এটা আর্কেডির গল্প, তাই না? এই মেয়েটি সম্পর্কে আমাকে কতটুকু বলতে পারেন, মাদাম?'

কাত্রিনা সামুশেনকা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'একজন পরিচারিকা আমার ছিলো—জুয়ানিটা। খুব ভালো ছিলো মেয়েটা—হাসিখুশি, উচ্ছল। ঈশ্বরের আদরের মানুষের যা সচরাচর ঘটে থাকে ওরও তাই হলো। অল্প বয়েসেই মারা গেলো ও।'

এ তো পোয়ারোর নিজের কথা—শেষ কথা—অনিবার্য শব্দনিচয়। এখন সেই কথাই তিনি আবার শুনছেন—তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষান্ত হলেন না।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, মারা গেছে।'

এক মিনিট নীরব রইলেন এরকুল পোয়ারো, তারপর বললেন, 'কিন্তু তবুও একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না, আমি স্যর জর্জ স্যান্ডারফিল্ডকে আপনার এই পরিচারিকার কথা জিগ্যেস করেছিলাম এবং তাঁকে দেখে মনে হয়েছিলো যেন ভয় পেয়েছেন। প্রশ্ন হলো, কেন?'

নৃত্যপটিয়সীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ বিরক্তির অভিব্যাক্তি ছায়া ফেললো।

আপনি শুধু বলেছেন আমার একজন পরিচারিকা। সে ভেবেছে আপনি মেরির কথা বলছেন—জুয়ানিটা চলে যাবার পর যে মেয়েটা আমার কাছে আসে। সম্ভবত ও জর্জকে কোন একটা ব্যাপার নিয়ে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছি। বড় বদ ছিলো মেয়েটা। লুকিয়ে চুরিয়ে খুটখাট করার স্বভাব ছিলো ওর, সব সময় ড্রয়ার খুলে চিঠিপত্র ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করতো।'

পোয়ারো মৃদুস্বরে বললেন, 'ও, তাহলে সেই জন্য।'

তিনি এক মিনিট থামলেন, তারপর আবার অশান্ত সুরে বলে চললেন, 'জুয়ানিটার পদবী ছিলো ভ্যালোটা, সে পিসায় অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করাতে গিয়ে মারা যায়। তাইতো?'

নর্তকী কাত্রিনা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাবার পূর্বমুহূর্তে তাঁর মুখমণ্ডলে প্রচ্ছন্ন অথচ উপস্থিত ইতস্তত ভাবটুকু পোয়ারোর নজর এড়ালো না।

'হ্যাঁ।'

আত্মমগ্ন ভাবে বললেন পোয়ারো, 'কিন্তু তবুও। একটা ছোট্ট গোলমাল থেকে যাচ্ছে—তার আত্মীয়রা তাকে বিয়াংকা বলে উল্লেখ করছিলো, জুয়ানিটা নয়।'

কাত্রিনা তাঁর কৃশ কাঁধ ঝাঁকালেন।

তিনি বললেন, 'বিয়াংকা—জুয়ানিটা, এতে কি আসে যায়? আমার মনে হয় ওর আসল নাম ছিলো বিয়াংকা, কিন্তু জুয়ানিটা নামটা বেশি স্বপ্নময় বলে মনে হওয়ায় ও নিজের ওই নাম রাখে।'

'ও, আপনার তাই মনে হয়?' একটু থামলেন পোয়ারো, তারপর কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বললেন, 'কিন্তু এর অন্য একটা কারণ আমার জানা আছে।'

'কি কারণ?'

পোয়ারো সামনে ঝুঁকে এলেন।

তিনি বললেন, 'যে মেয়েটিকে টেড উইলিয়ামসন দেখেছিলো তার চুল ছিলো সোনালী ডানার মতো, সে-ই বলেছে।'

আরও কাছে ঝুঁকে এলেন পোয়ারো। কাত্রিনার চুলের কম্পমান ডেউ দুটো স্পর্শ করলো তাঁর আঙুল।

'সোনালী ডানার মতো, সোনালী শিংয়ের মতো? যে ভাবে আপনি দেখবেন, এটা নির্ভর করবে কি ভাবে আপনাকে লোকে দেখছে, শয়তানের বেশে না দেবদূতের ভূমিকায়! দুটোর যে কোন একটা আপনি হতে পারেন। নাকি এ দুটো তরাসিত সেই হরিণের সোনালী শিং?'

কাত্রিনা বিড়বিড় করে বললেন, 'তরাসিত সেই হরিণ...' এবং তাঁর স্বরে চূড়ান্ত নৈরাশ্য।

পোয়ারো বললেন, 'প্রথম থেকেই টেড উইলিয়ামসনের বর্ণনা আমাকে বিচলিত করেছে—আমাকে কিছু একটা মনে করিয়ে দিয়েছে—সেই কিছু একটা আপনি, ঝিকমিকে ব্রোঞ্জের পায়ে অরণ্যের বুক চিয়ে নেচে নেচে ছুটে চলেছেন। আমার ধারণা কি আপনাকে খুলে বলবো, মাদমোয়াজেল? আমর মনে হয় কোন একটা সপ্তাহ আপনার কোন পরিচারিকা ছিলো না, আপনি 'গ্রাসলন' এ একাই গিয়েছিলেন, কারণ বিয়াংকা ভ্যালেটা ইটালিতে ফিরে গেছে এবং নতুন কোন পরিচারিকা আপনি তখনও রাখেননি। বর্তমানে যে অসুস্থতার শিকার আপনি হয়েছেন তার লক্ষণ তখনই আপনি অনুভব করতে পারছিলেন, এবং যখন সকলে সারাদিনের জন্য নৌকাবিহারে রওনা হলো আপনি থেকে গেলেন বাড়িতে। দরজায় শুনলেন ঘণ্টির শব্দ, আপনি দরজা খুলে দিলেন, দেখলেন—বলবো, কি দেখলেন? আপনি দেখলেন শিশু-সরল এক যুবককে

দেবতার মতো যার রূপ! এবং তার জন্য একটি মেয়ের জন্ম দিলেন আপনি—না, জুয়ানিটা নয়—ইনকগিনিটা—আর তার সঙ্গে ঘণ্টা কয়েক পায়ে হেঁটে বেড়ালেন আর্কেডিতে।'

এক সুদীর্ঘ নীরবতা। তারপর কাত্রিনা চাপা ভগ্ন স্বরে বললেন, 'অন্তত একটা বিষেয়ে আমি আপনাকে সত্যি কথা বলেছি। এ গল্পের সত্যিকারের পরিণতিটা আপনাকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। নিটা অল্প বয়েসে মারা যাবে।'

'উহুঁ, অসম্ভব!' এরকুল পোয়ারো যেন বদলে গেছেন। তিনি সশব্দে চড় মারলেন সামনের টেবিলে। হঠাৎই তিনি হয়ে উঠেছেন বাস্তববাদী, পার্থিব ব্যবহারিক।

তিনি বললেন, 'তার কোন প্রয়োজন নেই। আপনাকে মরতে হবে না। নিজে বাঁচবার জন্য আপনাকে লড়তে হবে, পারবেন না?—সেই সঙ্গে বাঁচাতে হবে আর একজনকে।'

কাত্রিনা মাথা নাড়লেন বিষাদে, হতাশায়।

'সেখানে আমার বেঁচে থাকার জন্যে কি আছে?'

'অভিনয় জীবন নেই, মানছি! কিন্তু ভেবে দেখুন, অন্য এক জীবন তো রয়েছে। আচ্ছা, মাদামোয়াজেল, সত্যি কথা বলুন দেখি, আপনার বাবা কি সত্যিই কোন রাজকুমার কি গ্র্যান্ড ডিউক ছিলেন, নাকি কোন জেনারেল?'

কাত্রিনা শব্দ করে হেসে উঠলেন।

তিনি বললেন, 'বাবা লেনিনগ্রাডে লরি চালাতো!'

চমৎকার! তাহলে গ্রামের একজন গ্যারেজ মিস্ত্রীর স্ত্রী হতে আপনার অসুবিধেটা কোথায়? আপনি হতে পারবেন দেবশিশুর মতো সুন্দর সন্তানদের জননী, যাদের পায়ে সম্ভবত ফুটে উঠবে আপনার অতীতের নাচের ছন্দ।'

কাত্রিনা মুহূর্তে স্তব্ধ-নিঃশ্বাস হলেন।

'কিন্তু এসব নিছকই কল্পনা অবাস্তব!'

'সে যাই হোক,' অসীম আত্মতুষ্টির সুরে বললেন এরকুল পোয়ারো, আমার বিশ্বাস এ কল্পনা পুরোপুরি সত্যি হতে চলেছে।

দ্য আর্কেডিয়ান ডিয়ার

নিখুঁত খুনের কাছাকাছি

হেনরি হোল্ট



ক্লাবের আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে একটা খানদানী চুরুটে আগুন ধরালেন মিস্টার ডেভিড পোরলক। দুনিয়ার যা কিছু ভালো সবেতেই তাঁর আজ দিল খুশ। একটু আগেই নৈশভোজ সেরেছেন মেজাজী কেতায়। সব কাজ এভাবেই সারেন তিনি। সুগন্ধী ধোঁয়ার প্রথম রেখা ওপরে ভেসে উঠতেই তিনি মনোযোগ দিলেন পানপাত্রের সোনালি তরলে। গ্লাস ঠোঁট ছোঁয়াতে যাবেন এমন সময় একজন পরিচালক রুপোর ট্রে-তে করে একটা কার্ড বয়ে নিয়ে এল।

'ডিটেকটিভ-ইন্সপেক্টর, নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে, নিলিপ্ত মুখে কার্ডটা পড়লেন মিস্টার পোরলক, 'কী ব্যাপারে এসেছেন?'

'উনি বলেননি, স্যার।'

'ওঁকে ভিজিটরদের ঘরে বসাও। আমি কয়েকমিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।'

পানীয় শেষ করলেন মিস্টার পোরলক, তারপর ধীরে সুস্থে রওনা হলেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তাঁর কাছে কী জানতে চায়?

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, স্যার, 'ইন্সপেক্টর সিলভার বললেন, 'ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিস্টার চার্লস ক্যাভেন্ডিশের ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি।'

'ক্যাভেন্ডিশ? কেন, ওঁর কী হয়েছে?' চটপট কৌতূহলী হয়ে মিস্টার পোরলক জানতে চাইলেন।

'মানে, সত্যি কথা বলতে কি, আমিও ঠিক জানি না। মনে হচ্ছে, তিনি কেমন রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছেন।'

পোরলক ক্রমশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎই যেন সহজ হলেন।

'রাবিশ!' বলতেন তিনি, 'ক্যাভেন্ডিশের মতো লোক কখনও উধাও হতে পারেন না। কাল রাতেই তো উনি এখানে আমার সঙ্গে ডিনার খেয়েছেন। না, না, সেরকম গোলমেলে কিছু হতেই পারে না।'

'সকলের আশা তাই, কিন্তু কাল রাতে তিনি বাড়ি ফেরেননি। আর তারপর থেকে কেউ ওঁকে দেখেনওনি।'

দিশেহারা দৃষ্টি নিয়ে সি.আই.ডি. অফিসারের দিকে তাকিয়ে রইলেন পোরলক।

'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। কাল চলে যাওয়ার সময় মিস্টার ক্যাভেন্ডিশ তো ঠিকই ছিলেন।'

‘তখন ক’টা হবে, স্যার?’

‘এই প্রায় এগারোটা, কি তার ঠিক পরেই। আমি ততটা খেয়াল করে দেখিনি।’

‘উনি কি বলেছিলেন কোথায় যাচ্ছেন?’

‘না। তবে আমি স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছি বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। সে ছাড়া আর কিছু ভাবার তো কোনও কারণ ছিল না।’

লোহার মতো ধূসর গোঁফে আঙুল ছোঁয়ালেন সিলভার।

‘তাঁকে দেখে কি তখন নরমাল মনে হয়েছিল, স্যার?’

‘অবশ্যই। সত্যি কিথা বলতে কি, উনি দারুণ খোশমেজাজে ছিলেন। পরের শনিবার দুজনে মিলে মাছ ধরতে যাওয়ার প্রোগ্রামও করেছিলাম।’

‘আপনি আর মিস্টার ক্যাভেন্ডিশ বোধহয় পুরনো বন্ধু?’

‘হ্যাঁ। পঁচিশ বছর আগে আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। এই উধাও হওয়ার ব্যাপারটাকে আমি খুব একটা সিরিয়াসলি নিতে পারছি না, ইন্সপেক্টর। দেখবেন, খুব শিগগিরই উনি সশরীরে এসে হাজির হবেন। অবশ্য যদি না ওঁর কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে।’

‘আমরা সব হসপিটালে খোঁজ নিয়েছি। সেখানে ওঁর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।’

‘এক মিনিট, উনি যেন বলছিলেন—হ্যাঁ, উনি আমাকে যেন বললেন, ওঁর স্ত্রীর ইস্টবোর্ন না কোথায় যেন গেছেন।’

‘মিসেস ক্যাভেন্ডিশ কাল রাতে হঠাৎই ফিরে এসেছেন, স্যার, আর এসেই ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছেন। আজ ভোর চারটের সময় তিনি আমাদের ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়েছেন। আমরা বহু খোঁজখবর করেছি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সবে আজ সন্ধেবেলা চিফ ক্যাশিয়ারের হঠাৎ খেয়াল হয় যে, তিনি মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে গতকাল বলতে শুনেছিলেন, উনি নাকি রাতে আপনার সঙ্গে ডিনার সারবেন।’

‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা শুনে একটু ইয়ে হওয়ারই কথা।’ পোরলক মন্তব্য করলেন।

‘কাল রাতে ঠিক কী হয়েছিল একুট খুলে বলবেন, স্যার—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।’

‘না, না, আপত্তির কী আছে। কাল রাত আটটার সময় ক্লাবে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ডিনারের পর আমরা একটু বিলিয়ার্ড খেলেছিলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে যাই।’

‘ফ্ল্যাটে ক’টার সময় পৌঁছেছিলেন, স্যার?’

‘তা দশটা তো হবেই।’

‘ওখানে যাওয়ার বিশেষ কোনও কারণ ছিল?’

‘হ্যাঁ। আমার কাছে খুব চমৎকার পুরনো নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডি ছিল। আমি চেয়েছিলাম ক্যাভেন্ডিশ ওটা একটু চেখে দেখুক।’

‘ও, তার মানে উনি আপনার ফ্ল্যাটে ঘণ্টাখানেকের বেশি ছিলেন?’

‘তা হবে।’

‘যখন ওঁকে ছেড়ে দেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন?’

‘আমার ফ্ল্যাটের দরজায়।’

‘তার মানে লিফটে চড়ে তিনি একাই নেমে গিয়েছিলেন?’

‘না। আসলে উনি লিফটে নামেননি। বলছিলেন, ওটার জন্যে অপেক্ষা করতে বিরক্ত লাগছে।’

‘আপনি কি আর ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, স্যার?’

‘না। একটু পড়াশোনা করলাম, তারপর মাঝরাত নাগাদ শুতে গেলাম।’

ইন্সপেক্টরের আঙুল আবার চলে গেল গোঁফের দিকে।

'ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে,' তিনি বললেন, 'আপনিই ওকে শেষ দেখেছেন।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। যদি না অবশ্য আমাদের বাড়ির রাতের দারোয়ান ওঁকে বেরোনার সময় দেখে থাকে। লোকটা নিচের হলে ওর ছোট্ট অফিসেই সাধারণত বসে থাকে। তবে জানি না, কাল ক্যাভেন্ডিশকে বেরোতে দেখেছে কি না।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার। এরকম একটা ব্যাপারে আমাদের তো খোঁজখবর করতেই হবে। তবে আপনি যেমন বললেন, আমরাও চাই খুব শিগগিরই উনি সশরীরে এসে হাজির হোন।'

'ব্যাপারটা সত্যিই বেশ অদ্ভুত। ব্যাঙ্ক ম্যানেজাররা সাধারণত বেশ শক্ত ধাতের ভরসা করার মতো মানুষ হয়। দেখুন, ওঁর হয়তো স্মৃতিভ্রম হয়েছে, পথ হারিয়ে কোনদিকে চলে গেছেন। এখন সত্যিই বড় চিন্তা হচ্ছে।'

আরও একদিন কেটে গেল। খবরের কাগজগুলো ব্যাপারটায় খুব মারাত্মক আগ্রহ না দেখিয়ে কয়েকটা সাবধানী প্যারাগ্রাফ ছাপল, কারণ মানুষ তো রোজই উধাও হয়ে যাচ্ছে। ঠিকই যে, এক্ষেত্রে উধাও-হয়ে-যাওয়া মানুষটি একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, ফলে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। ওয়্যারলেসে এস.ও.এস. পাঠিয়ে আরও খানিকটা প্রচার পাওয়া গেল। তবে সপ্তাহের শেষে অন্যান্য আরও ঘটনা জনতার নজর কেড়ে নিল। আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ভদ্রলোক অস্থায়ীভাবে চালকের আসনে বসে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম দিব্যি সামাল দিতে লাগলেন।

সুতরাং, মাসখানেক পর এই উধাও হওয়ার ব্যাপারটা প্রায় সকলেই ভুলে গেল। শুধু ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে চিনতেন তাঁরা ভুলতে পারলেন না। আর মিসেস ক্যাভেন্ডিশ ধরে নিলেন যে, রহস্যময় এক বিচিত্র ঢঙে তিনি বিধবা হয়েছেন।

মিস্টার ডেভিড পোরলক রীতিমতো আয়েসী ভদ্রলোক। তিনি ঠিক করলেন এই জুন মাসের কয়েকটা সপ্তাহ পারীতে কাটিয়ে আসবেন। কারণ এই সময়টাই ওই পূর্তির শহরের সেরা সময়। ভিক্টোরিয়া স্টেশনের ক্লোকরুমে তাঁর সব মালপত্র জমা দেওয়া হল। তারপর তিনি দু-একটা কাজ সেরে ক্লাব এলেন লাঞ্চ সারতে। কিন্তু সামনে সাজিয়ে দেওয়া উৎকৃষ্ট মাছের পদের স্বাদ নেবার আগেই ডিটেকটিভ-ইন্সপেকটর সিলভারের কার্ড তাঁর কাছে হাজির করল একজন পরিচারক।

সামনের খাবারের দিকে একপলক তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন মিস্টার পোরলক।

'ওঁকে বলো, আমি এক্ষুনি নিচে আসছি।' পরিচারককে এ-কথা বলে ছুরি আর কাঁটাচামচ তুলে নিলেন তিনি। এরপর যখন তিনি নিচে নেমে এলেন, ডিকেটটিভ সিলভার তখনও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন।

'আবার কী ব্যাপার, ইন্সপেক্টর?' অভিজাত মানুষটি আলগা সৌজন্য দেখিয়ে জানতে চাইলেন, 'আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, কারণ আজই আমি পারী চলে যাচ্ছি।'

'ওই মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের ব্যাপারটার জন্যেই এসেছি, স্যার। আমরা এখনও ওটার ফাইল ক্লোজ করতে পারনি।'

'ওহ্, হ্যাঁ, ঠিকই তো। আপনারা একবার কোনও কিছু কামড়ে ধরলে সহজে ছাড়েন না, তাই না?'

'ছাড়তে চেষ্টা তো করি, কিন্তু না পারলে আর কী করব। এই কেসটার জট আমরা এখনও চাড়াতে পারিনি।'

'আমার তো মনে হয় ওঁর মেমোরি লস হয়েছে।'

'আপনি হয়তো সেটা ভাবতে পারেন, স্যার—তবে ওঁর ডাক্তার মোটেও সেরকম ভাবেন না।' সিলভার বললেন, 'তিনি স্পষ্ট বলেছেন, অ্যামেনেসিয়া আর যারই হোক, মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের হবার নয়।'

'তাহলে আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি।' খানিকটা বিমূঢ়ভাবে আনমনা গলায় বললেন পোরলক।

'কিন্তু আমরা কখনও হাল ছাড়ি না।'

'যাকগে, আপনি কী জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, বলুন। আমি বোধহয় আপনাকে কয়েক মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না।'

অবিচলিত ইন্সপেক্টর তাঁর লোহা-ধূসর গোঁফে আঙুল চালাতে লাগলেন।

'দুঃখিত, স্যার, এরকম একটা ব্যাপারে আমরা তাড়াহুড়ো করতে পারি না। আরও দু-একটা পয়েন্ট আছে যেগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার—যদি অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকে। মিস্টার ক্যাভেন্ডিশ উধাও হওয়ার পরদিন আপনি আমাকে যা যা বলেছিলেন তার সমস্ত নোট এখানে রয়েছে।'

'এ তো জানা কথা, আমার আর কিছু বলার নেই। তখনই যা বলার সব বলেছি।'

'হতে পারে, স্যার। কিন্তু তা সত্ত্বেও রুটিন মাফিক কাজ তো আমাদের করতেই হবে। এখানে লেখা আছে দেখছি আপনি মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে নিয়ে আপনার ফ্ল্যাট গিয়েছিলেন রাত দশটায়। আর, তারপর আপনি আর বেরোননি?'

পোরলক ছোট্ট করে হাসলেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু এসব তো প্রাচীন ইতিহাস। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—'

'আপনি ক'দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছেন, স্যার?'

'ওহ্, একমাস কি বড়জোর ছ'সপ্তাহ। পারীতে গিয়ে কেমন লাগে তার ওপর নির্ভর করছে ক'দিন থাকব।'

'আপনি কী কী লাগেজ সঙ্গে নিচ্ছেন জানতে পারি কি?'

মিস্টার পোরলক যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। এ-প্রশ্নে খানিকটা যেন অবাক হলেন তিনি।

'জানি না এর সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কী সম্পর্ক, তবে আপনি যদি সত্যিই আনতে চান, তাহলে আমার বলতে কোনও আপত্তি নেই।'

'বললে ভালো হয়, স্যার।' অবিচলিত সিলভার উত্তর দিলেন।

'দাঁড়ান, মনে করে দেখি। একটা ট্রাঙ্ক, একা সুটকেস আর একটা অ্যাটাচি কেস। কিন্তু এসব জেনে আপনার কোন উপকারটা হবে সেটা একটু বলবেন?'

'সেরকম কোনও কারণ নেই, স্যার। তবে ওই যে, একটু আগে আপনি বললেন, কোনও কিছু কামড়ে ধরলে আমরা সহজে ছাড়ি না। একদিন না একদিন আমরা জানতে পারবই মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের কী হয়েছে। কিন্তু তদ্দিন পর্যন্ত তো হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না, সবরকম চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।'

'সত্যি, আপনাদের তারিফ করতেই হয়। তবে আমি আর কোনও সাহায্য করতে পারব বলে মন হয় না। এবার যদি আমাকে মাপ করেন, ইন্সপেক্টর—'

'আপনি আমাকে মাপ করবেন, স্যার। আরও দু-একটা ব্যাপার আমাদের খতিয়ে দেখা বাকি আছে। আপনি যদি আর একটু সাহায্য করেন তাহলে আমি খুব জলদি কেসটা গুছিয়ে নিতে পারব। তারপর আপনি এসব ব্যাপার পুরো ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্তে যেখানে খুশি যেতে পারেন। নেহাত ফরমালিটি হিসেবে জিগ্যেস করছি, আপনার মালপত্রগুলো এখন কোথায় আছে বলবেন?'

'নিশ্চয়ই। ভিক্টোরিয়া স্টেশনের ক্লোকরুমে। কিন্তু এসব ব্যাপার কি একটু হাস্যকর ঠেকছে না?'

'যেখানে একজন ভদ্রলোকের জীবন-মরণ সমস্যা, স্যার, সেখানে আমাদের সবকিছুই খতিয়ে দেখতে হবে—তা সেটা অন্য কারও চোখে হাস্যকর লাগুক আর না-ই লাগুক। আমার প্রশ্নের উত্তর না দেবার মতো কোনও কারণ নিশ্চয়ই আপনার নেই?'

'একেবারেই না। তবে বেকার সময় নষ্ট হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

'আমার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে যেতেও নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না?'

‘আপনি যেতে চাইলে আমার আর আপত্তির কী আছে।’ মিস্টার পোরলক বললেন, ‘কিন্তু এখনও আমি আপনার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছি না।’

‘স্রেফ রুটিন ব্যাপার, স্যার।’ বিড়বিড় করে বললেন ইন্সপেক্টর, ‘পুলিশের কাজের ষোলো আনাই তো প্রায় তাই। আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করলে কোনও কোনও পাবলিক খাড়া হয়ে বসে, কিন্তু ওসব আমরা গায়ে মাখি না। তবে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যাতে কেউ অনর্থক বেশি উত্তেজিত না হয়। এবার কি তাহলে আমরা রওনা হব, স্যার?’

পোরলকের কাঁধ সামান্য নড়ল। তারপর তিনি রাজি হলেন।

ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছে ইন্সপেক্টর বললেন, ‘এবার স্যার, আপনার জিনিসগুলো আমি একটু খেতে চাই। আপনার কাছে নিশ্চয়ই ক্লোকরুম টিকিট আছে?’

ক্লান্ত হেসে পোরলক টিকিটটা ইন্সপেক্টরকে দিলেন।

‘এই নিন। আর মালপত্র খুলে যদি দেখতে চান তাহলে এই নিন চাবির গোছা। জানি না আপনি ঠিক কী খুঁজতে চাইছেন, তবে আমার জামাকাপড়গুলো কম এলোমেলো করলে খুশি হব।’

প্রায় অপরাধী-মুখে সিলভার ট্রাঙ্কের তালা খুললেন। ট্রাঙ্কের ভেতরটা ওপর ওপর দেখে নিয়ে আবার তালা বন্ধ করে দিলেন।

‘ঠিক আছে, স্যার।’ বললেন তিনি, ‘আপনি আশা করি কিছু মনে করেননি?’

‘বিন্দুমাত্র না।’ বেশ আন্তরিকভাবেই জবাব দিলেন মিস্টার পোরলক, ‘এবারে বলুন তো, আমার ট্রাঙ্কটা খুলে দেখার কারণ কী?’

‘ভেতরে কী আছে দেখার জন্য, স্যার।’ অমায়িক উত্তর পাওয়া গেল।

‘ও। এবার আপনি সন্তুষ্ট তো?’

‘হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখা প্রমাণ তো মানতেই হয়।’ আলতো করে নিজের গোঁফে টান মারলেন সিলভার : ‘ভালো কথা, স্যার, আপনার কি আর কোনও লাগেজ আছে?’

‘আশ্চর্য লোক মশাই আপনি! একমাসের জন্য পারী গেলে আর কত মাল সঙ্গে নিতে লাগে!’

‘আজ সকালে আপনার ফ্ল্যাট থেকে শুধু এই লাগেজগুলোই আপনি নিয়ে বেরিয়েছেন?’

‘কী বলতে চাইছেন, ইন্সপেক্টর?’

‘আমি শুধু আমার প্রশ্নের উত্তর চেয়েছি, স্যার।’

‘পারীতে আমি শুধু এই লাগেজগুলোই নিয়ে যাচ্ছি।’

‘আমি জানতে চেয়েছি, আজ সকালে আপনার ফ্ল্যাট থেকে শুধু এই লাগেজগুলোই আপনি নিয়ে বেরিয়েছেন কি না।’

‘নিশ্চয়ই।’

মুহূর্তের জন্য সিলভারের চোখ বিকিয়ে উঠল যেন।

‘আপনার ঠিক মনে আছে তো?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—’

‘এই একটা ট্রাঙ্ক, একটা সুটকেস, আর একটা অ্যাটাচি কেস?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।’

‘আরও ভালো করে ভেবে ঠিক ঠিক জবাব দিলে ভালো হয়, মিস্টার পোরলক।’

‘আমার পাঁচরকম কথা বলা অভ্যেস নেই, ইন্সপেক্টর।’ অবিচলিত স্বরে উত্তর পাওয়া গেল।

‘ও। তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আপনি ভুলে গেছেন।’

‘ভুলে গেছি? কী?’

'আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি বাড়ি থেকে দুটো ট্রাঙ্ক নিয়ে এই ক্লোকরুমে এসেছেন।'

চিন্তায় মিস্টার পোরলকের চোখ কয়েক মুহূর্তের জন্য ছোট হল। তিনি বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ইন্সপেক্টর। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তবে ব্যাপারটা কী জানেন, আপনার এই জিজ্ঞাসাবাদের চোটে আমার সবকিছু কেমন গুলিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আরও একটা ট্রাঙ্ক আছে বটে। ওতে বেশ কিছু দামি জিনিসপত্র আছে—মানে, নানান ট্রফি, মেডেল এইসব। আমি বাইরে কোথাও গেলে ওগুলো ফ্ল্যাটে রেখে যাই না। ওই ট্রাঙ্কটার কথা একেবারে ভুলেই গেছিলাম—আপনি বললেন তাই মনে পড়ল।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার। খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে আপনি যখন বাইরে যাওয়ার তাড়াহুড়োয় রয়েছেন। ওই ট্রাঙ্কটা কোথায় রেখেছেন?'

'আমার ব্যাঙ্কের স্ট্রং-রুমে। সবসময় ওখানেই রেখে যাই।'

'ওটা যদি খুলে একপলক দেখি তাতে আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না?'

'একেবারেই না। এই নিন চাবি। ফিরে আসার আগে ওটা আমার দরকার পড়বে না। গুডবাই, ইন্সপেক্টর। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সত্যিই নাছোড়বান্দা। তবে এছাড়া আপনাদের কোনও উপায়ও তো নেই। এবার আমাকে যেতে হবে।'

সিলভার যেন মুহূর্তে আরও খানিকটা সতর্ক হলেন।

'না, স্যার, এভাবে আমাদের রুটিন চেক আপটা শেষ করা যাবে না। আমার সঙ্গে আপনাকে ব্যাঙ্কে যেতে হবে।'

'সে কী অদ্ভুত কথা! আমার ট্রেন ফেল হয়ে যাবে।'

'তা হলেও কিছু করার নেই, স্যার। আপনাকে আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যেতে হবে।'

পোরলকের মর্যাদাবোধ আবার উঁকি মারল।

'আপনি কি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন না, ইন্সপেক্টর? আপনার খামখেয়ালিপনার সঙ্গে তাল মেলানোরও একটা সীমা আছে। আমার বেড়াতে যাওয়ার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে রয়েছে অথচ—'

'কোনও উপায় নেই, স্যার। আমি শুধু আমার ডিউটি করছি। কারও বেড়াতে যাওয়ার সবকিছু ঠিকঠাক করা আছে বলে ডিউটির তো ক্ষতি করতে পারি না।'

পোরলককে কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিচলিত বলে মনে হল।

অবশেষে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। এ এক জঘন্য বিরক্তিকর ব্যাপার, কিন্তু আপনি যদি এরকম গোঁ ধরেন তাহলে তো কিছু করার নেই—আমাকে যেতেই হবে।'

'ঠিক ধরেছেন, স্যার।' উত্তর দিলেন সিলভার, 'ট্যাক্সিতে যেতে খুব একটা সময় লাগবে না।'

স্টেশনের বাইরে এসে ওঁরা একটা ট্যাক্সি ধরলেন।

ট্যাক্সিতে ওঠার ঠিক আগে পোরলক বলে উঠলেন, এক মিনিট। আমাকে একটু সিগারেট কিনতে হবে।'

'আরে, আমারও তো কিনতে হবে।' সিলভার বললেন।

দশ সেকেন্ড পর পোরলক পা বাড়িয়ে ডিটেকটিভকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবার চেষ্টা করেই ট্রাউট মাছের মতো ছিটকে পালালেন। কিন্তু সিলভার চটপট টাল সামলে নিয়ে তাঁকে তাড়া করলেন। চোর-পুলিশ খেলা চলল খুব সামান্য নয়, আর তারপর, সংক্ষিপ্ত ধস্তাধস্তির পর একটা ধাতুর বালা শক্ত করে এঁটে দেওয়া হল অভিজাত মানুষটির কবজিতে।

'নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে এটা করলাম।' বললেন সিলভার, 'এবার, যদি কিছু মনে না করেন, আমরা ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হব।'

যানবাহনের ভিড়ে ট্যাক্সি চলতে শুরু করতেই মিস্টার পোরলক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'জুন মাসে পারীর গাছের-সারি-দেওয়া বড় রাস্তাগুলো বড় সুন্দর দেখায়।' তিনি বললেন।

উত্তরে সি.আই.ডি. ইন্সপেক্টর মন্তব্য করলেন, 'আমিও সেরকমই শুনেছি। শিগগিরই আমার ছুটিতে যাবার কথা। ভাবছি বউকে নিয়ে ওখানে ঘুরে আসব।'

ট্র্যাফিক-বাতির নির্দেশে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'মনে হচ্ছে, আমার আর কখনও পারীতে যাওয়া হবে না।' আনমনা সুরে পোরলক বললেন।

'ব্যাঙ্কের ওই ট্রাঙ্কে আমি যা ভাবছি তা যদি থাকে তাহলে আর আপনার যাওয়া হচ্ছে না।'

'আপনার কাছে কি একটা সিগারেট হবে?'

'সরি। আমি সিগারেট খাই না।'

মিস্টার পোরলক অদ্ভুত চোখে তাঁকে দেখলেন।

'আপনি তাহলে গোড়া থেকেই জানতেন।'

'জোরদার আন্দাজ তো একটা ছিলই।'

'আপনার জবাব নেই, ইন্সপেক্টর। কেউ যে এটা ধরে ফেলবে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। একটা নিখুঁত খুন করতে পেরেছি ভেবে আমি নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছিলাম। আপনি ব্যাপারটা ধরলেন কেমন করে?'

'স্রেফ রুটিন।' মন্তব্য করলেন সিলভার।

'আপনি বড় বিনয়ী। মানতেই হয় আপনার প্রতিভা আছে।'

'প্রতিভা? ইয়ে, মানে, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ওসব ব্যাপারকে আমরা খুব একটা পাত্তা দিই না, স্যার। শৌখিন কায়দা-কানুনের কোনও সময় আমাদের নেই। স্রেফ ঘাম ঝরিয়ে হাল না ছেড়ে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে যাই।'

'নিশ্চই আমি কোথাও কোনও ভুল করেছি। আমার কৌতূহলটা একটু মেটাবেন না?'

'শুনলে আপনি হয়তো খুশি হবেন, স্যার, আপনি বেশ গুছিয়েও কাজ করেছিলেন। ক্যাভেন্ডিশকে আপনি খুন করেলন কেন? প্রথমে মোটিভ খুঁজে বের করে তারপর পেছন দিকে হেঁটে যাওয়াটাই আমাদের তদন্তের ঢঙ, কিন্তু এক্ষেত্রে—'

'মোটিভ ছিল আমার একটা গোপন ব্যাপার, ইন্সপেক্টর। ক্যাভেন্ডিশনই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি হঠাৎ করে ব্যাপারটার আঁচ পেয়ে যেতে পারতেন, আর তার ফল হিসেবে আমাকে লম্বা সময়ের জন্যে জেলে যেতে হত। উনি যে সত্যি সত্যি ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিলেন তা নয়, তবে বিপদের ভয় ছিল। ওঁকে পথ থেকে সরাতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। নেহাত আপনি গোঁ না ধরলে উনি ওই বন্ধ ট্রাঙ্কে বন্দি হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্যে নিজেরই ব্যাঙ্কের স্ট্রং-রুমে পড়ে থাকতেন। স্ট্রং-রুমে রেখে যাওয়া জিনিস নিয়ে ব্যাঙ্ক কখনও মাথা ঘামায় না। মিস্টার ক্যাভেন্ডিশ নিজেই আমাকে এই আইডিয়াটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। মাস ছয়েক পর যখন ব্যাপারটা সবাই প্রায় ভুলে যেত, তখন ট্রাঙ্কটা বের করে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করব ভেবেছিলাম। আমার কাছে প্ল্যানটা নিখুঁত মনে হয়েছিল, আমার ভুলটা কোথায় হয়েছিল বলুন তো?'

গতানুগতিক গলায় সিলভার বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয় না আপনার কোথাও ভুল হয়েছে—মানে, আপনার ছক অনুযায়ী কোথাও ভুল হয়নি।'

'আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসেন তখনও আমার ব্যবহার খুব স্বাভাবিক ছিল।'

'খুবই স্বাভাবিক। আপনি যে ব্যাপারটায় পার পেয়ে যাননি সেটা নিতান্তই একটা তাজ্জব কাণ্ড। ওই যে, আমি বলছিলাম না, আমরা কিছুতেই হাল ছাড়ি না। তারপর, আজ হোক আর কাল হোক, তুচ্ছ বিচিত্র কোনও সূত্র আমাদের হাতে এসে যায়। তা থেকে শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না, তবু আমরা সেটার শেষ না দেখে ছাড়ি না।'

'কোন তুচ্ছ বিচিত্র সুর আমার সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এল জানতে পারি?'

'প্রথমে তো আপনি মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে আপনার ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে এক গ্লাস পুরনো নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডি খাওয়ালেন। তারপর, যখন তিনি সেই ব্র্যান্ডি চেখে দেখছিলেন—মনে রাখবেন, এটা নিতান্তই আমার

অনুমান—তখন আপনি তাঁর মাথায় এক ঘা কষিয়ে দিলেন।'

'না, আপনার অনুমান এতটুকু ভুল নেই।'

'যাই হোক, এটাই আমার কাছে সম্ভব বলে মনে হয়েছিল। তারপর আপনি ওঁকে খতম করে ঢুকিয়ে দেন ট্রাঙ্কের মধ্যে। এই ট্রাঙ্কটা আগে আপনি বহুবার ওই ব্যাঙ্কের স্ট্রং-রুমে জমা দিয়েছিলেন। সুতরাং সেখানকার কেরাণীরা নেহাত অভ্যাসবশেই ওটা নিয়ে নেবে।'

'কেন নেবে না, বলুন?'

'অবশ্যই। আপনি তো জানেন আপনাদের ফ্ল্যাট-বাড়িতে একজন রাতের দারোয়ান ডিউটিতে ছিল। সে আপনাকে আর মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। সুতরাং আপনার মনে হয়েছিল, মিলিগান—মানে, ওই দারোয়ান—যদি মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে আবার বাড়ি থকে বেরিয়ে যেতে দ্যাখে তাহলে আপনি ডবল নিশ্চিন্ত হবেন।'

'বলে যান, শুনছি।'

'আপনার আর মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের চেহারা অনেকটা একইরকম। আপনাদের হাইট প্রায় সমান, আর মুখেও মিল ছিল কিছুটা। শুধু তফাতের মধ্যে ওঁর গোঁফ ছিল আর আপনার মুখ দাড়ি-গোঁফহীন পরিষ্কার। তাছাড়া ওঁর চোখে ছিল সোনালী ফ্রেমের চশমা, আপনার ছিল না। আগে থেকে তৈরি করে রাখা একটা নকল গোঁফ আপনি নাকের নীচে বসিয়ে নিলেন, ওঁর চশমাটা চোখে লাগিয়ে নিলেন, আর ভুরুজোড়া ওঁর মতোই ঘন করে নিলেন। আপনি ভেবেছিলেন, লিফটের কলিং বেল টিপলে মিলিগান লিফট নিয়ে ওপরে আসবে। ছদ্মবেশে ওর সঙ্গে লিফটে করে নামাটা যথেষ্ট ঝুঁকির ব্যাপার হবে। তাই মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের হ্যাট-কোট পরে ওঁর ছদ্মবেশে সোজা সিঁড়ি নেমে আপনি বেরিয়ে এলেন রাস্তায়।'

'একদম ঠিক বলেছেন।' মিস্টার পোরলক মন্তব্য করলেন, 'আমার ধারণা, ছদ্মবেশটা কাজে দিয়েছিল। পরে আমি ক্যাভেন্ডিশের ওভারকোটের পকেটে কয়েকটা পাথরের টুকরোসমেত টুপিটা ঢুকিয়ে দিয়ে টেমস নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম—ভেবেছিলাম ওটা ডুবে যাবে।'

'হয়তো আপনি ঠিকই ভেবেছিলেন।' সিলভার সায় দিলেন।

'আমি ভোর চারটের সময় ফ্ল্যাটে ফিরে আসি। জানতাম, তখন ওই রাতের দারোয়ান রোজকার মতো চেয়ারে বসে ঝিমোবে। আমি ঠিক জানি, ও আমাকে তখন দেখতে পায়নি। আর দেখলেও বা কি—আমি প্রায়ই ওরকম দেরি করে ফিরে আসি।'

'না, মিস্টার পোরলক, তখন ফিরে আসার সময় মিলিগান আপনাকে দেখতে পায়নি।'

'তাহলে আমার পা ফসকাল কোথায় এখনো বুঝতে পারছি না।'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।' সি.আই.ডি. ইন্সপেক্টর মন্তব্য করলেন, 'আমিও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি অনেক পরে। আমরা জানতাম, মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে শেষ জীবিত দেখেছে রাতের ওই দারোয়ান। সেইজন্যেই বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। শেষে ও একটা ভারি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলেছে। এটা ও তেমন জরুরি বলে ভাবেনি। এমনিতে লোকটা খুঁটিয়ে সবকিছু খেয়াল করার লোক নয়। তবে ওর অভ্যেস হল সবসময় লোকের হাতের দিকে দেখা। যেমন, আমার অভ্যেস পায়ের দিকে দেখা। এক-একজনের এক-একরকম অভ্যেস। মিলিগান বলেছে, 'মিস্টার ক্যাভেন্ডিশ' বেরিয়ে যাওয়ার সময় ও ওঁর হাতের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর মনে হয়েছিল, হাত দুটো যেন অনেকটা আপনার মতো দেখতে—লম্বা, সরু আঙুল—আর্টিস্টদের ধরনের। তাতে আমার মনে হল, ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। খোঁজ নিয়ে জানলাম, মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের হাত ছিল চওড়া, বেঢপ। ব্যস, তখন মনে হল, কিছু একটা হদিস পেয়ে গেছি।'

'সেটা কবে?'

‘কাল বিকেলে। তারপর থেকেই আমরা আপনার ওপরে কড়া নজর রেখেছি। আপনি ডেডবডিটা নিয়ে কী করেছেন তা আমাদের জানার কোনও উপায় ছিল না। ওটা যে আপনি ফ্ল্যাটেই রেখে দিয়েছেন তা ভাবিনি —যদিও আপনার ফ্ল্যাটটা সার্চ করে দেখব বলে ভাবছিলাম। যদি আপনি ট্রাঙ্কগুলো দিনকয়েক আগেও সরিয়ে ফেলতেন, তাহলে আমরা বোধহয় এখনও গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতাম। কিন্তু আমাদের লোক আজ সকালে ওগুলো আপনার ফ্ল্যাট থেকে বের করতে দেখেছে। আর তারপর—তারপর বাকিটা তো ছকবাঁধা রুটিনমাফিক কাজ।’

উদ্দেশ্য জটিল

আগাথা ক্রিস্টি



(টিউসডে ক্লাবে হাজারো খুন নিয়ে আলোচনা করতেন ওরা দু'জন। স্যর হেনরী ক্লিথারিং, আর্টিষ্ট জয়েস লেম্প্রিয়ের, ধর্মযাজক ডক্টর পেণ্ডার, আইনজ্ঞ মিষ্টার পেথারিক, লেখক রেমণ্ড ওয়েষ্ট এবং মিস জেন ম্যার্পল।

কিন্তু কোন খুন ছিল না এই কাহিনীতে, তাই বোধহয় সবচেয়ে কঠিন ও রহস্যময় মনে হয়েছে সবার কাছে—অবশ্য একজন বাদে। তার কাছে কোন কিছুই কঠিন নয়—তার নাম মিস জেন ম্যার্পল।)

মিষ্টার পেথারিক গলা ঝাড়লেন—কিন্তু তার মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল যার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে তার দিকে তাকালেন।

আমার মনে হয়, আমার সমস্যাটা আপনাদের কাছে একটু নীরস ঠেকবে। আমতা আমতা করে বললেন তিনি, কারণ এতক্ষণ আমরা যেসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সবই অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। আমি যে সমস্যাটির কথা বলতে চলেছি তাতে (দুর্ভাগ্যবশত) কোন রক্তপাতের বালাই নেই। কিন্তু তবু সমস্যাটি অত্যন্ত রহস্যময় এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আর একটা কথা বলা প্রয়োজন তা হল—সমস্যাটির সঠিক সমাধান আমি জানি।

এটা ঠিক আইন সঙ্গত হল না, তাই না? প্রশ্ন করলেন জয়েস লেম্প্রিয়ের, মানে আইনের দিক দিয়ে...।

মিঃ পেথারিক তার চশমার ওপর দিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে হাসলেন। —না না, আপনার ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ যে গল্পটা আমি বলব সেটা অত্যন্ত সহজ এবং সরল—কারোরই বুঝতে অসুবিধা হবে না গল্পটা।

আইনের মারপ্যাঁচ বাদ দিন এখন, মিস ম্যার্পল বললেন।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মিঃ পেথারিক তাকালেন মিস ম্যার্পলের দিকে।

আমি ঠিক এখনই কিছু কথা দিতে পারছি না, তবু আপনি শুরু করুন গল্পটা।

ঘটনাটা আমার এক ভূতপূর্ব ক্লায়েন্টকে জড়িয়ে। ধরুন তার নাম—মিষ্টার ক্লোড—সাইমন ক্লোড। তার টাকা পয়সা ছিল প্রচুর এবং কাছাকাছিই একটা বিরাট বাড়িতে থাকতেন। তার একমাত্র ছেলে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। কিন্তু তার একটি বাচ্চা মেয়ে ছিল—সে থাকত সাইমনেরই বাড়িতে। মেয়েটির মা মেয়েটিকে জন্ম দেবার সময় মারা গিয়েছিল। সাইমন ভীষণ ভালবাসতেন তার এই নাতনীটিকে। তার কোন কাজেই আপত্তি জানান নি তিনি। একটা বাচ্চাকে ঘিরে যে কোন লোকের দুনিয়া থাকতে পারে একথা বিশ্বাস হত সাইমনকে

দেখলে। তাই যখন এগারো বছর বয়সেই মেয়েটি নিউমোনিয়ায় মারা গেল তখন সাইমন যে আঘাত পেয়েছিলেন তা আমার পক্ষে বোঝোনো সম্ভব নয়।

হতভাগ্য সাইমনকে কেউই সমবেদনা জানাতে পারেনি। এই কিছুদিন আগে তার এক ভাই মারা গেছে। সাইমন তার অবস্থা দেখে তার ছেলেমেয়েদের নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। এটা তার মহানুভবতার পরিচয় বলতে পারেন, কিন্তু বৃদ্ধ সাইমন কোনদিনই গ্রেস, মেরী বা জর্জকে ভালবাসতে পারেননি—যেমন তিনি ভালবাসতেন তার ছোট নাতনীকে। জর্জ্জ ক্লোড কাছাকাছিই একটা ব্যাঙ্কে চাকরী পেল। গ্রেস, ফিলিপ গ্যারড নামে এখন তরুণ রিসার্চ কেমিষ্টকে বিয়ে করল। কিন্তু মেরী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মেয়ে। সে বাড়িতে থেকে কাকার দেখাশোনা করত। হয়ত সে তার কাকাকে ভালবাসত। বেশ শান্তির সঙ্গেই কেটে যেতে লাগল দিনগুলো। সাইমনের নাতনী ক্রিষ্টোবেল মারা যাবার পরে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন নতুন উইল করানোর জন্য। সেই উইলে তিনি তার বিশাল বিষয় সম্পত্তি সমান তিন ভাগে ভাগ করে লিখে দিলেন জর্জ্জ মেরী ও গ্রেসের নামে।

এইভাবে দিন যেতে লাগল। একদিন রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা হল জর্জ্জ ক্লোডের। আমি তাকে সাইমনের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। কারণ অনেকদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। জর্জ্জের মুখের ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বলল, আপনি যদি গিয়ে কাকাকে একবার বোঝাতে পারতেন, দুঃখ করে বলল সে, এই আত্মা-টাত্মার ব্যাপারগুলো দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

কি সব আত্মার কথা বলছ? খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

তখন জর্জ্জ আমাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। কিভাবে সাইমন ধীরে ধীরে স্পিরিচুয়ালিজমে অনুরক্ত হয়ে ওঠেন এবং কিভাবে তার সঙ্গে এককজ আমেরিকান মিডিয়াম, মিসেস ইউরডাইস স্প্র্যাগের দেখা হয়। এই মহিলাটি একজন এক নম্বরের প্রতারক এবং তার ভড়ং-এর সুযোগে সাইমনের উপর আশাতীত আধিপত্য বিস্তার করেছেন। বাড়িতে কাকা ওই মেয়েটির কথায় অনেকগুলো সিয়াঁসে বসেছিলেন এবং তাতে নাকি ক্রিষ্টোবেলের আত্মা তার ঠাকুরদাকে দেখা দিয়েছিল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে যারা স্পিরিচুয়ালিজমকে ঠাট্টা এবং অবজ্ঞা করেন তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। আম একট জিনিসই বিশ্বাস করি, তা হল প্রমাণ। এবং আমার মনে হয় যে, যদি আমরা নিরপেক্ষ ভাবে প্রমাণগুলোকে স্পিরিচুয়ালিজমের দিক থেকে দেখি তবে ব্যাপারটাকে ঠিক অবিশ্বাসও কার যায় না। তাই আমি স্পিরিচুয়ালিজম বিশ্বাস করি না ঠিক, কিন্তু অবিশ্বাসও করি না। কতগলা এমন প্রমাণ আছে যেগুলোকে কেউ ঠিক অবিশ্বাস করতে পারে না।

অন্যদিকে স্পিরিচুয়ালিজমকে পুঁজি করে অনেক ঠগ প্রতারক আবির্ভূত হয়। তাই জর্জ্জ আমাকে যখন ঐকথা বলল তখন আমি স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিলাম যে মিসেস ইউরডাইস স্প্র্যাগ একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতারক, তিনি নাতনীরি প্রতি সাইমনের অপত্য স্নেহের সুযোগ নিয়ে সাইমনকে ঠকাবার তালে আছেন। অর্থাৎ তিনি যে বিপদে পড়েছেন তা তিনি নিজেও জানেন না।

যতই আমি ব্যাপারটা চিন্তা করতে থাকলাম, ততই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমি জর্জ্জ, মেরীকে খুবই স্নেহ করতাম! তাই মনে হল যে মিসেস স্প্র্যাগ এবং সাইমনের উপর তার আধিপত্য ভবিষ্যতে ওদের ওপর বিপদ ডেকে আনতে পারে।

তাই প্রথম সুযোগেই একটা ছুতো করে দেখতে গেলাম সাইমনের সঙ্গে। সেখানেই দেখা হল মিসেস স্প্র্যাগের সঙ্গে। তাকে দেখে আমার ধারণা দৃঢ় হল। তিনি যেন একজন সম্মানিত অতিথি হিসাবে বাড়িতে রয়েছেন। মিসেস স্প্র্যাগ মধ্যবয়স্কা শক্ত সমর্থ্য মহিলা। পরণে সুরুচিসম্পন্ন সুন্দর পোশাক—তবে সাজের আধিক্যটা সহজেই নজরে পড়ে। তার কথাবার্তায়ও কোনো খুঁদ দেখলাম না। বেশ সহানুভূতি সম্পন্ন বলেই মনে হল। তবে এটা যে তার অভিনয় তাও আমার অজানা রইল না।

তার স্বামীও তার সঙ্গে ঐ বাড়িতে ছিলেন। মিষ্টার এ্যাবসালোম স্প্র্যাগ একজন রোগা লিকলিকে চেহারার মানুষ। তার মুখমণ্ডলে সর্বদাই একটা বিষাদের ছায়া অথচ চোখ জোড়ায় রয়েছে শৃগালের মত চোরা চাউনি।

সাইমনকে একা পাওয়া মাত্রই কৌশলে স্প্র্যাগ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম। তিনি দেখলাম মিসেসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইউরডাইস স্প্র্যাগ দারুণ চমৎকার মহিলা। সাইমনের প্রার্থনার উত্তরে ভগবানই তাকে সাইমনের কাছে পাঠিয়েছেন। তার টাকার প্রতি কোনো লোভ নেই, কোনা ব্যথিত হৃদয়কে (সাইমন ক্লোভের) তিনি যে সাহায্য করতে পারছেন তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। ক্রিষ্টোবেলের জন্য মিসেস স্প্র্যাগের মনে যেন মাতৃস্নেহ দেখা দিয়েছে। সাইমন তাকে প্রায় নিজের মেয়ের মতই মনে করেন, ইত্যাদি। তারপর তিনি আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন—কিভাবে তিনি ক্রিষ্টোবেলের কথা শুনতে পেয়েছেন, ক্রিষ্টোবেল তাকে বলেছে যে, সে তার মা ও বাবার সঙ্গে ভালই আছে...। এরকম আরও অনেক কথা। শেষে যে কথাটা বললেন তা হল, ক্রিষ্টোবেল প্রত্যেকবারই এই এক কথা বলেছে, মা আর বাবা মিসেস স্প্র্যাগকে খুব ভালোবাসেন।

কিন্তু পেথারিক, হঠাৎ থেমে তিনি বললেন, তুমি হয়তো আমাকে উপহাস করবে।

না, আমি তোমাকে উপহাস করবো না। বরং যারা এসব বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন, বই লিখেছেন তাদের দেওয়া প্রমাণগুলো আমি দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করব। এবং তারা যদি কোনো মিডিয়ামের প্রশংসা করেন তবে তাকে আমি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করব। আশাকরি মিসেস স্প্র্যাগ মিডিয়াম হিসেবে জনস্বীকৃতি পেয়েছেন।

সাইমন উচ্ছ্বসিত ভাবে মিসেস স্প্র্যাগের প্রশংসা করতে লাগলেন। বার বার বলতে লাগলেন যে তিনি ঈশ্বর প্রেরিত। গত গ্রীষ্মে তার সঙ্গে সাইমনের দেখা হয়। সাইমনের ভাগ্য খুব ভাল যে মিসেস স্প্র্যাগের মতো একজন মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছেন...।

বিচলিত অবস্থায় আমি ফিরে এলাম। সবই আমি বুঝতে পারলাম, কিন্তু কি করব ভেবে উঠতে পারলাম না। অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ফিলিপ গ্যারডকে (গ্রেসের স্বামী) চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালাম। খুব সতর্কতার সঙ্গে আমি ব্যাপারটার তাকে লিখে জানালাম। এই মহিলাটি যদি সাইমনের যে অনতিবিলম্বে কোন নামকরা স্পিরিচুলায়িষ্টিক চক্রের সংস্পর্শে আসা প্রয়োজন এও লিখলাম। আমার মনে হল এসব ব্যবস্থা করতে ফিলিপের অসুবিধা হবে না।

গ্যারড বিনাবিলম্বে ব্যবস্থা-পত্র করতে শুরু করল। ও বুঝতে পেরেছিল যে সাইমনের স্বাস্থ্য খুব ভাল নয়! তাই এসব ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী যে ফল তা ও এড়াতে চাইল। কারণ আর বেশী দিন এভাবে চলচে মেরী, গ্রেস এবং জর্জ্জ যে সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে তা ও বুঝতে পারল! ফিলিপ প্রফেসর লংম্যানকে সঙ্গে করে সাইমনের বাড়িতে এল। লংম্যান স্পিরিচুয়ালিজম সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন এবং বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি অতিথি হিসেবে এসে দু-একটা সিয়াঁসেতে অংশগ্রহণ করলেন। ফিরে গিয়ে কিছুদিন বাদে তিনি ফিলিপকে চিঠি লিখে জানালেন যে মিসেস স্প্র্যাগের ব্যাপারটা জালিয়াতি কিনা তা ধরতে পারেননি। কিন্তু তার যেন মনে হয়েছে ব্যাপারটা নির্ভেজাল নয়। তিনি এও লিখলেন যে ফিলিপ ইচ্ছে করলে তার এই চিঠিটা সাইমনকে দেখাতে পারেন এবং প্রফেসার লংম্যান একজন খাঁটি মিডিয়ামের সঙ্গে সাইমনের পরিচয় করিয়ে দেবেন।

ফিলিপ লংম্যানের এই চিঠিটা সোজা নিয়ে গিয়ে সাইমনকে দেখাল। কিন্তু ফল যা হবার তাই হল। সাইমন রাগে জ্বলে উঠলেন। এটা মিসেস স্প্র্যাগের মহত্বকে ছোট করার একটা নীচ, হীন চক্রান্ত! মিসেস তাকে আগেই বলেছিলেন যে শহরের অনেক স্পিরিচুয়ালি ওকে হিংসা করে। সাইমন প্রায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন যে লংম্যান মিসেস স্প্র্যাগকে ঠগ বা প্রতারক বলেন নি। তার জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়ে মিসেস দেবদূতের মত আবির্ভূতা তা হয়ে তাকে শান্তি, সুখ, আনন্দ, সব দিয়েছেন। তিনি সব সময়ই

মিসেসকে সমর্থন করবেন। তার জন্য যদি পরিবারের সবার সঙ্গেই তার ঝগড়া হয় তো হোক। পৃথিবীতে সবার চেয়ে ইউরডাইসকেই বেশী ভালবাসেন।

ফিলিপকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন সাইমন। কিন্তু আচমকা এই উত্তেজনা ও রাগের ফলে তার শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। গত একমাস ধরে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে রিলেন বিছানায়। তারপর যা অবস্থা দাঁড়াল তাতে তার পক্ষে বিছানা ছেড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনাই রইল না, অর্থাৎ যতদিন না মৃত্যু এসে তাকে মুক্তি দিচ্ছে ততদিন আর তার নড়বার ক্ষমতা নেই। ফিলিপ চলে যাওয়ার দুদিন পরে আমি সাইমনের কাছ থেকে এক জরুরী ডাক পেলাম। একটুও দেরী না করে আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম তার বাড়িতে। সাইমন বিছানায় শুয়েছিলেন। যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গেছেন। আমার মনে হল তার অবস্থা খুব খারাপ। তিনি শ্বাসকষ্টে হাঁপাচ্ছিলেন।

আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি। কোন তর্ক করো না পেথারিক। কিন্তু আমি মারা যাওয়ার আগে, যে আমার জন্য সবচেয়ে বেশী করেছে তার প্রতি আমার কর্তব পালন করতে চাই। আমি নতুন উইল করব পেথারিক।

নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তুমি আমাকে বল কি করতে হবে, আমি সেটা থেকে উইল ড্রাফট করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

না না, তা হয় না। সাইমন বললেন, হয়তো আমি কাল পর্য্যন্ত নাও বাঁচতে পারি। আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী সব লিখে রেখেছি এই কাগজটায়—তিনি বালিশের নীচে হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, দেখ, এটা ঠিক আছে কিনা?

বালিশের নীচ থেকে একটুকরো পেন্সিলে লেখা কাগজ বার করলেন তিনি। খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত ঐ কাগজের ভাষা। সাইমন তার ভাইপো, ভাইঝিদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার পাউণ্ড করে দিয়ে যাচ্ছেন। আর অবশিষ্ট বিশাল সম্পত্তি রেখে যাচ্ছেন ইউরভাইস স্প্র্যাগের নামে—তার প্রতি 'কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার' বশে।

আম মনে মনে অসন্তুষ্ট হলাম, কিন্তু নিরর্থক। মস্তিষ্ক বিকৃতির কোন কথাই ওঠে না, কারণ বৃদ্ধ সাইমন আর যে কেন মানুষের মতোই প্রকৃতিস্থ।

তিনি ঘণ্টা বাজাতেই দুজন পরিচালিকা এসে ঘরে প্রবেশ করল। এম্মাগণ্ট লম্বা, মধ্যবয়স্কা মহিলা। সে বহু বছর ধরে সাইমনের কাছে কাজ করছে এবং তার প্রচুর সেবা যত্নও করেছে। তার সঙ্গে যে ঢুকল সে রাঁধুনী—বয়স তিরিশের কাছাকাছি, স্বাস্থ্যবতী। সাইমন তার ঘন ভ্রু-যুগলের নীচ দিয়ে আগুন ঝরা চোখে তাকালেন তাদের দিকে।

আমি চাই যে তোমরা আমার উইলের সাক্ষী হও। এম্মা আমার পেনটা নিয়ে এস।

এম্মা তাড়াতাড়ি ডেস্কের কাছে গেল পেনটা আনতে।

না না, বাঁ দিকের ড্রয়ারটা নয় এম্মা। ইতস্ততঃ করে সাইমন বললেন, তুমি জানো না যে ওটা ডানদিকের ড্রয়ারে থাকে?

না সাইমন, এটা বাঁদিকেরটাতেই রয়েছে। এই যে। পেনটা হাতে করে বলল এম্মা।

তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ভুল করে ওখানে রেখেছো। একটু রাগত কণ্ঠে বললেন সাইমন, জিনিসপত্র ঠিক জায়গায় না রাখা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি।

গজ গজ করতে করতেই তিনি পেনটা এম্মার হাত থেকে নিলেন এবং তার করা ড্রাফটাকেই আমার কথামত শুদ্ধ করে কপি করলেন। তারপর তিনি নিজের নাম সই করলেন। তার নীচে এম্মা গন্ট এবং রাঁধুনী—লুসী ডেভিট—ওরাও সই করল। আমি উইলটা ভাঁ করে একটি লম্বা নীল খামে ভরলাম। স্বাভাবিকভাবেই উইলটা সাধারণ কাগজেই লেখা হয়েছিল—আপনারা তো বুঝতেই পারছেন?

এম্মা এবং লুসী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই সাইমন হঠাৎ হাঁফ ছেড়ে শুলেন। তার মুখ যন্ত্রণাবিকৃত হয়ে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়লাম তার ওপর। এম্মা গণ্ট যেতে গিয়েও ফিরে এল। কিন্তু সাইমন সামলে নিয়ে হাসলেন—কষ্টকৃত হাসি।

কোন ভয় নেই পেথারিক—আমি ঠিকই আছি। আমার কর্তব্য পালিত হয়েছে, এখন আমি শান্তিতে মরতে পারব।

এম্মা আমার দিকে তাকাল—অর্থাৎ সে ঘর ছেড়ে যাবে কিনা? আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে সে চলে গেল। কিন্তু যাবার আগে নীল খামটা মাটি থেকে তুলে আমার হাতে দিয়ে গেল। খামটা উত্তেজনার মুহূর্তে আমার কোল থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। আমি ওটাকে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম।

পেথারিক, তুমি হয়তো আমার উপর বিরক্ত হয়েছে। সাইমন বললেন, তুমিও আর সবার মত আমার ইচ্ছের বিপক্ষে—

প্রশ্নটা তা নয় সাইমন। আমি বললাম, মিসেস স্প্র্যাগ হয়তো প্রতারক নন। তুমি তাকে কৃতজ্ঞতা বশে তোমার সম্পত্তির সামান্য কিছু অংশ দিয়ে যেতে পারতে। কিন্তু একজন অজানা অচেনা মহিলার জন্য তোমার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দের বঞ্চিত করা—আমার মনে হয় কাজটা তুমি ঠিক করছ না।

একথা বলে আমি ঘর ছেড়ে বেরোলাম। আমার যথাসাধ্য আমি করেছি। আমি সাইমনের কাছে উইল সম্বন্ধে প্রতিবাদ করেছি। আর কিই বা আমি করতে পারি।

হলঘরে বেরী সাইমনের সঙ্গে আমার দেখা হল।

মিঃ পেথারিক, শুধু মুখে আপনি যাবেন না। আসুন, অন্ততপক্ষে এক কাপ চা আপনাকে খেয়ে যেতে হবে, আসুন। মেরীর সঙ্গে আইম ড্রইরুমে ঢুকলাম।

ঘরের কোণায় ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ঘরের ভেতরটা বেশ সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো। আমার ওভারকোটটা খুলতেই মেরী এসে আমার হাত থেকে নিল। এমন সময় জর্জ্জ ঘরে ঢুকতে মেরী কোটটা ওর হাতে দিল। জর্জ্জ কোটটাকে নিয়ে গিয়ে দূরের একটা চেয়ারের উপর রাখল। তারপর ও ফিরে এসে আমরা যেখান বসেছিলাম (ফায়ার প্লেসের কাছে) সেখানে বসল। আমরা চা পান করতে লাগলাম—সেই সঙ্গে কথাবার্তাও হচ্ছিল। কথায় কথায় জর্জ্জ বলল যে এষ্টেটের একটা জরুরী সমস্যা মিঃ ক্লোড তার হাতে তুলে দিয়েছেন। সে এখন কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না, মহা চিন্তায় পড়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আমি যদি তাকে একটু সাহায্য করি তবে সে খুব উপকৃত হবে। আমি বললাম যে তবে ষ্টাডিতে (যেখানে এস্টেট সংক্রান্ত কাগজপত্র থাকে) খাওয়াই ভাল। আমরা স্টাডিতে গেলাম। আমি কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করলাম। জর্জ্জ ও মেরী তখন আমার সঙ্গেই ছিল।

মিনিট পনেরো পরে আমার কাজ শেষ হলে আইম বিদায় গ্রহণ করলাম। তখন হঠাৎ মনে পড়ল যে আমার ওভারকোটটা ড্রইংরুমেই আছে—তাই ওটাকে আনতে গেলাম। ঘরে একমাত্র মিসেস স্প্র্যাগ উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে চেয়ারের উপর কোটটা ঝুলছিল তার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছিলেন। একটু লক্ষ্য করতেই বুঝলাম, তিনি অনাবশ্যক ভাবেই চেয়ারের ওপর যে কাপড়ের ঢাকনা ছিল সেটা টানাটানি করছিলেন। আমাদের দেখেই তিনি মুখ চোখ লাল করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

এই ঢাকনাটা কিছুতেই ঠিকভাবে ফিট করছে না, অনুযোগের সুরে বললেন তিনি, আমি একটা ঠিক মাপমত তৈরী করতে পারি কিনা দেখি।

আমি ওভারকোটা নিয়ে গায়ে দিলাম। তখনই খেয়াল করলাম যে উইলের খামটা মাটিতে পড়ে আছে। আমি ওটাকে তুলে পকেটে রাখলাম। তারপর বিদায় নিলাম।

অফিসে পৌঁছে আমি যা যা করলাম তা পরপর আমি বলে যাচ্ছি। ওভারকোট খুলে, উইলটা পকেট থেকে বের করে হাতে নিয়ে আমি টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় আমার কর্মচারী ঘরে ঢুকে বলল যে

কেউ আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চায় এবং আমার ঘরে যে এক্সটেনসন লাইন আছে সেটা খারাপ হয়ে গেছে। তাই আমি তার সঙ্গে বাইরের ঘরে গেলাম ফোন ধরতে। কথাবার্তা সেরে মিনিট পাঁচেক বাদে আমি যখন এলাম দেখি আমার কর্মচারী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে সে বলল, মিঃ স্প্র্যাগ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, স্যর। আমি তাকে আপনার অফিস রুমে বসতে বলেছি।

আমি আমার অফিসরুমে ফিরে গিয়ে দেখি মিঃ স্প্র্যাগ টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন। আমাকে দেখে অত্যন্ত মোলায়েমভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার নিয়ে বকতে শুরু করলেন। তার স্ত্রী কোমলস্বভাবা মহিলা। লোকে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে নানা কথা বলছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যত সংক্ষেপে পারলাম তার কথার জবাব দিলাম। আমার কথায় বোধহয় বিরক্তির আভাস পেয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং হঠাৎই চলে গেলেন। তখনই আমার মনে পড়লো যে আমি ভুল করে উইলটা টেবিলের উপরই রেখে গেছি। আম ওটাকে নিয়ে খামটা সীল করলাম। তারপর ওটার ওপর নাম লিখে সিন্দুকে রেখে দিলাম।

এইবার গল্পের সর্বাপেক্ষা জটিল অংশের সম্মুখীন হব আমরা, দু'মাস পরে মিঃ সাইমন মারা গেলেন। আমি সমস্ত দীর্ঘ আলোচনা, কথাবার্তা বাদ দিয়ে যা ঘটলো তাই বলছি।

সীল করা খামটা যখন খোলা হল, তখন তার ভেতর থেকে উইলের বদলে পাওয়া গেল একটা সাদা কাগজ।

মিস্টার পেখারিক থামলেন। সবার কৌতূহল মুখের ওপর একবার করে চোখ বুলিয়ে হাসলেন।

আপনারা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা প্রশংসা করবেন? দু'মাস ধরে সীল করা খামটা আমার সিন্দুকেই পড়ে ছিল। কারো পক্ষে সেটাকে বদল করা সম্ভব ছিল না। না, যেই এটা করুক না কেন সে খুব কম সময়েই পেয়েছিল—তা হল উইল সই করার পর থেকে সিন্দুকে আটকানো পর্যন্ত। এখন প্রশ্ন হল কার সবচেয়ে বেশী সুযোগ ছিল এবং এর ফলে সবচেয়ে বেশী লাভবান কে হবে?

সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পয়েণ্টগুলো আমি সংক্ষেপে আপনাদের বলছি। উইল সাইমন সই করলেন এবং আমি সেটাকে খামে ভরলাম; এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। ওটা আমি পকেটে রাখলাম। এরপর মেরীর হাতে গেল কোটটা; ওর থেকে জর্জ্জের হাতে। জর্জ্জ যখন কোটটা নিয়ে চেয়ারে রাখল সে আমার চোখের সামনেই ছিল। যতক্ষণ আমি স্টাডিতে ছিলাম, মিসেস ইউরডাইস স্প্র্যাগ উইলটা বের করে দেখবার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন। আমি ফিরে এসে ওটাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই উইলটা বের করে রেখেছিলেন। তার ওটা পাল্টে সাদা কাগজ ভরবার সুযোগ ছিল। কিন্তু কোন উদ্দেশ্য নেই। কারণ, তিনি দেখেছেন যে উইলে তার নামে সম্পত্তির বিশাল অংশ রয়েছে। তাই তিনি নিশ্চয়ই সেটা পাল্টে সাদা কাগজ রেখে তার সৌভাগ্য বৃক্ষের পায়ে নিজে হাতে কুড়ুল মারবেন না। মিঃ স্প্র্যাগের বেলায়ও তাই। তার সুযোগ ছিল ওটাকে বদল করবার; আমার অফিসে তিনি দু'তিন মিনিট সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তার স্বার্থহানি ছাড়া আর কোন লাভ হত না। তাই আমরা এক বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। দু'জন লোক—যাদের সুযোগ ছিল কিন্তু কোন উপায় ছিল না। এবং আর দুজন—জর্জ্জ ও মেরি—যাদের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু কোন সুযোগ ছিল না। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমি কিন্তু এম্মাকে বাদ দিচ্ছি না। ওরও উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু সুযোগ ছিল না। কারণ খামটা তুলে আমার হাতে দেওয়ার মধ্যে ভেতরের উইলটা পাল্টানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে যদি সুযোগ পেতো তবে সে সেটা পাল্টাতে দ্বিধাত করত না। কারণ সে একজন অনুগত পরিচারিকা ছিল এবং বহুবছর সাইমনের কাছে কাজ করেছে। তার পক্ষে বদলে অন্য ডুপ্লিকেট খাম, দেওয়াও সম্ভব ছিল না, কারণ খামটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। তার ডুপ্লিকেট ও বাড়ীতে কারো পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল।

মিঃ পেথারিক হাসিমুখে তাকালো উপস্থিত পাঁচজনের দিকে।

আমার মনে হয় আমি বেশ ভালভাবেই গল্পটা আপনাদের বলতে পেরেছি। এটাই হল আমার ছোট্ট সমস্যা। এবার আপনাদের মতামত শুনতে পেলে আমি খুব খুশী হব।

মিস ম্যার্পল চাপা হাসি হাসলেন। মনে হল কাহিনীর কোন বিশেষ অংশ তার আছে খুবই আনন্দদায়ক বলে মনে হয়েছে।

কি হল, আণ্ট জেন? ব্যাপারটা কি আমরা শুনতে পারি না? রেমণ্ড ওয়েস্ট বলল।

আমি টমি সিমণ্ডস—ভীষণ দুষ্টু ছেলে—ওর কথা ভাবছিলাম। খুব দুষ্টুমী করে কিন্তু সময়ে সময়ে ভারী মজা করে। এমনিতে সব সময় মন হয় অন্য ছেলেদের মতই দুষ্টুমীর চিন্তা। এই সেদিন ও স্কুলে মিসেস ভার্সটন-এর ছেলের গায়ে রং দিয়ে দিয়েছিল। মিসেস ভার্সটন যখন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে টমিকে বকতে এলেন তখন টমি বলল, আনম ওর গায়ে দিইনি। মিসেস ভার্সটন ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখেন টমির কথা ঠিক। তখন নিরে ছেলের কান মলে দিয়ে বললেন, বিল, আর কখনও মিথ্যে কথা বলবে না। ভীষণ মজার ব্যাপার, আমি ও ছোটবেলার ঐ রকম দুষ্টুমী করতাম।

হতে পারে মজার ব্যাপার। কিন্তু আণ্ট জেন, এর সঙ্গে মিঃ পেখারিকের কাহিনীর তো কোন সম্বন্ধ দেখছি না। —রেমণ্ড বলল।

না না, সম্বন্ধ আছে, মিস ম্যার্পল বললেন, দুটোই মুগ্ধ করার মত গল্প। সহজ অথচ চতুর প্রশ্ন তাই না, মিঃ পেথারিক?

আমি ভাবছি আপনি সত্যিই এর উত্তরটা জানেন কিনা? আইনজীবী পেথারিক মিটমিটে হাসি হাসলেন।

একটুকরো কাগজের উপর মিস ম্যার্পল কিছু লিখে সেটা ভাঁজ করে পেখারিকের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

তিনি ওটা খুলে পড়লেন। তারপর সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন ম্যার্পলের দিকে, মাই ডিয়ার মিস ম্যার্পল, এমন কোন সমস্যা কি পৃথিবীতে আছে যার উত্তর আপনি জানেন না?

ছোটবেলা হতেই জানতাম এগুলো। অনেক খেলা করেছি এই জিনিসগুলো নিয়ে। লজ্জা নম্র কণ্ঠে জবাব দিলেন মিসেস ম্যার্পল।

আমার মনে হচ্ছে আমাকে এ সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন স্যর হেনরী, সম্ভবত মিঃ পেথারিক কোন আইনের ভেল্কীর কথা চেপে যাচ্ছেন।

না না। মিঃ পেথারিক বললেন, মোটেও না। অতি সাধারণ সহজ সমাধান এই গল্পটার। মিস ম্যার্পলের কথায় আপনারা কান দেবেন না। তার দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা রকমের।

সমাধানটা আমরা নিশ্চয়ই বের করতে পারব। জোর গলায় বললো রেমণ্ড ওয়েস্ট, ঘটনাগুলো এমনিতে অত্যন্ত সরল এবং সাধারণ। ঠিকভাবে বলতে গেলে পাঁচজন হাত দিয়েছিল খামটায়। স্প্র্যাগরা উইলটা বদল করতে পারত, কিন্তু তার কোন অর্থ হয় না—কারণ ব্যাপারটা হত ওদের স্বার্থবিরুদ্ধ। সুতরাং বাকী রইল তিনজন। আমার মনে হয় জর্জ্জ ক্লোডই বদল করেছে উইলটা—যখন সে কোটটাকে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে রাখছিল। মিঃ পেথারিক, এখানে আপনাকে মনে রাখতে হবে সাধারণ যাজুকরদের হাত সাফাই-এর কথা। জর্জ্জ ক্লোড হয়তো। আপনার চোখের সামনেই ঐ হাত সাফাইটা করেছিল আপনার চোখে ধুলো দিয়ে।

আমার কিন্তু মনে হয় মেয়েটাই এর জন্য দায়ী। জয়েস বলল, হয়তো এম্মা দৌড়ে নীচে গিয়ে মেরীকে বলেছিল ওপরে কি হচ্ছে। তখন মেরী আরেকটি নীল খাম (সাদা কাগজ ভরা) নিয়ে পাল্টাপাল্টি করে দিয়েছিল।

স্যর হেনরী মাথা নাড়লেন। আমি তোমাদের কারো সঙ্গেই একমত হতে পারলাম না। ধীরে ধীরে বললেন তিনি, আমার মনে হয় হাত সাফাইয়ের ব্যাপারটা স্টেজে বা গল্প উপন্যাস চলতে পারে, কিন্তু বাস্তবে নয়, বিশেষ করে একজন বিচক্ষণ আইনজীবীর চোখের সামনে। কিন্তু আমার একটা মতমত আছে। সেটা যে

সত্যি তা আমি বলছি না, শুধু মাত্র আমার ধারণার কথাই আমি বলবো। এটা বলা বোহয় যুক্তিসঙ্গত, যে স্প্র্যাগরা প্রফেসর লংম্যানের সঙ্গে সাইমনের সাক্ষাৎকারের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত ছিল।

যদি সাইমন প্রফেসর কথায় তাদের অবিশ্বাস করে, যা খুবই সম্ভব ছিল তবে মিঃ পেথারিকের আগমনের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা ব্যাখ্যা ওরা করতে পারে। হয়তো ওদের বিশ্বাস ছিল যে, সাইমনের আগেই মিসেস স্প্র্যাগের নামে উইল করেছিলেন। এখন মিঃ পেথারিককে ডাকার কারণ সেই উইল নষ্ট করে নতুন উইল তৈরী করা। তাতে মিসেস স্প্র্যাগ বঞ্চিতও হতে পারেন, তার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাই যদি হয়, তবে মিসেস স্প্র্যাগ উইলের মর্ম জানতে চেয়েছিলেন নিশ্চিত হবার জন্য।

কিন্তু উইল পাল্টানোর পর ওটা পরে দেখবার আগেই মিঃ পেথারিক এসে ঘরে ঢুকলেন। হয়তো মিসেস স্প্র্যাগ ওটা না পরেই, ধরা পড়ার ভয়ে ফায়ার প্লেসে ফেলে দিয়েছিলেন।

জয়েস বলল, অসম্ভব! কোন মেয়েই ঐ অবস্থায় ওটাকে না পড়ে পোড়াতে পারে না। ধরা পড়লেই বা, তিনি তো আর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতেন না।

সমাধানটা ঠিক জোরালো নয়। স্বীকার করলেন স্যর হেনরী, আশা করি মিঃ পেথারিক, আপনি ব্যাপারটাতে সাহায্য করেননি?

যদিও খুবই হাস্যকর অবাস্তব চিন্তা তবু মিঃ পেথারিক উঠে দাঁড়ালেন।—সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। প্রতিবাদ করলেন তিনি।

ডঃ পেণ্ডার, আপনার কি ধারণা? প্রশ্ন করলেন স্যর হেনরী।

আমার সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তবে মনে হয় বদলের ব্যাপারটার জন্য মিঃ অথবা মিসেস স্প্র্যাগই দায়ী। মোটিভ, স্যর হেনরী যা বললেন তাই। যদি মিসেস স্প্র্যাগ উইলটা মিঃ পেখারিক চলে যাবার পর পড়ে থাকেন তাহলে তিনি পড়বেন উভয় সঙ্কটে। সম্ভবত তখন তিনি উইলটাকে সাইমনের কাগজপত্রের সঙ্গে রেখে দেবেন—তিনি মারা গেলে যেন ওখান থেকে উইলটা আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তা যখন পাওয়া যায়নি, তা থেকে এটা ধরে নেওয়া যায় যে এম্মা হঠাৎই ওটা দেখতে পায় এবং ওটাকে নষ্ট করে ফেলে।

ডঃ পেণ্ডারের সমাধানটাই বোধহয় সঠিক। বলল জয়েস, তাই না মিঃ পেথারিক?

আইনজীবী মিঃ পেথারিক ঘাড় নাড়লেন।

এবার আমি গল্পের বাকী অংশ বলব। উইলটা না পেয়ে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। আপনাদের মতই আমি তখন অকুল পাখারে। আমার ধারণা আমি কোনদিন আসল ব্যাপারটা জানতে পারতাম না, যদি না একজন এ রহস্যের উপর চতুরভাবে আলোকপাত করত।

প্রায় একমাস পরে ডিনারের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি ফিরিপ গ্যারডের বাড়ি গেলাম। খাওয়া দাওয়ার পর সে একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা বলল।

আমি আপনাকে ঘটনাটা বলতে পারি তবে আশাকরি আপনি সেটা গোপন রাখবেন।

নিশ্চয়। আমি জবাব দিলাম।

আমার এক বন্ধু তার এক আত্মীয়ের কাছ হতে উত্তরাধিকার আশা করেছিল। কিন্তু হঠাৎ সে জানতে পারল সেই আত্মীয় একজন অপদার্থকে সবকিছু দিয়ে যাচ্ছেন। আমার বন্ধু তার পদ্ধতির ব্যাপারে সামান্য নীতি-জ্ঞানহীন বলতে পারেন। সেই আত্মীয়ের বাড়িতে একজন পরিচারিকা ছিল যে আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর পক্ষে ছিল (আমার বন্ধুর)। আমার বন্ধু তাকে কতগুলো সহজ নির্দেশ দিয়েছিল। সে একটা ফাউন্টেন পেন পরিচারিকাটিকে দিয়ে বলেছিল তার মনিবের (সেই আত্মীয়) রাইটিং টেবিলের ড্রয়ারে রাখতে—যে ড্রয়ারে সব সময় পেন থাকত সে ড্রয়ারে নয়, অন্য ড্রয়ারটায়। তাকে বলা হয়েছিল যে, যদি কোনদিন তার মনিব কোন কাগজপত্রে তাকে সাক্ষী হতে বলে এবং পেন আনতে বলে তবে সে যেন বন্ধুর দেওয়া

পেনটা এনে দেয়। আর কোন কথা সে মেয়েটিকে জানায়নি। কিন্তু পরিচারিকা মেয়েটি অত্যন্ত অনুগত ছিল এবং সে বন্ধুর কথা অনুযায়ী কাজ করেছিল।

হঠাৎ সে বলল মিঃ পেথারিক, আপনার নিশ্চয়ই শুনতে খারাপ লাগছে না?

না না, আমি মনোযোগ দিয়েই শুনছি। আমাদের চোখাচোখি হল।

আমার বন্ধু কিন্তু আপনার পরিচিত নয়।

নিশ্চয়ই নয়। আমি আপনার বন্ধুকে চিনিই না।

শুনে খুশী হলাম। বলল ফিলিপ গ্যারড।

একটু থেমে সে আবার বলল হাসিমুখে—আপনি আশা করি বুঝতে পারছেন?...পেনটা যে কালি দিয়ে ভর্ত্তি ছিল তাকে বিলীয়মান বা ক্ষণস্থায়ী কালি বলতে পারেন। এই কালি তৈরী হয়, স্টার্চ ও জলের দ্রবণে দু-এক ফোঁটা আয়োডিন দিলে। এতে একটা ঘন নীলচে কালো তরল কালি হয়। কিন্তু এই কালি দিয়ে লিখলে সে লেখা চার-পাঁচদিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়।

মিস ম্যার্পলে চাপা হাসি হাসলেন।

অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কালি। বললেন তিনি, ছোটবেলার ওরকম কালি দিয়ে আমরা কত খেলা করেছি। বন্ধু-বান্ধবদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে মজা করেছি।

মিস ম্যার্পল সহাস্য মুখে প্রত্যেকের ওপর চোখ বোলালেন। তারপর মিঃ পেথারিকের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, তবুও মিঃ পেথারিক, এটা একটা সহজ চতুর রহস্য। দারুণভাবে উপস্থিত করেছেন প্রশ্নটা—একজন আইনজ্ঞের মতই!

দি লেডি অর দি টাইগার

ফ্র্যাঙ্ক আর ষ্টকটন (ইংল্যাণ্ড)



বহুকাল আগে এক অর্ধ-সভ্য রাজা ছিল, মানুষটা ছিল বিচিত্র কল্পনাবিলাসী, আর তার কর্তৃত্ব ছিল এতই অপ্রতিরোধী যে খুশিমত সে নিজের অদ্ভুত কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করত। নিজের সঙ্গে নিবৃতে কথা বলা তার স্বভাব ছিল, আর, যখন সে ও তার সত্তা কোন বিষয়ে একমত হত, তক্ষুণি, সেটা, কার্যকরী করা হত। যখন তার, ঘরোয়া ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ মসৃণভাবে এগিয়ে চলে, তখন তার আচরণ হয় নম্র ও অমায়িক কিন্তু যখনই কোথাও সামান্য সঙ্কট দেখা দেয় তখনই সে হয়ে ওঠে আরো নম্র এবং আরো অমায়িক—কারণ, বক্র জিনিসকে ঋজু করতে বা অসমান জমিকে আঘাত করে সমান করতে সে সবচেয়ে বেশী উল্লসিত হত, উন্মুক্ত মল্লভূমিতে পুরুষালী ও পাশবিক শৌর্যের প্রদর্শনীতে আর বহিঃপ্রকাশ ঘটত। পরিবেষ্টিত আসন-শ্রেণী, রহস্যময় কুঠরী ও অদৃশ্য গলিপথের সমন্বয়ে তৈরী এই মল্লভূমি যেন আদর্শ বিচারের প্রতিভূ—সেখানে অপরাধী শাস্তি পায় এবং সৎ ব্যক্তি পুরস্কৃত হয় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সৎ দৈব ঘটনার অনুশাসনে।

যখনই রাজাকে আকৃষ্ট করার মত গুরুত্বপূর্ণ কোন অপরাধে কাউকে অভিযুক্ত করা হত, তখনই দিকে দিকে ঘোষণা করে দেওয়া হত যে এক নির্দিষ্ট দিনে রাজার মল্লভূমিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সমস্ত দর্শক গ্যালোরির আসনে জমায়েত হলে, এবং রাজা তার সভাসদ পরিবৃত হয়ে মল্লভূমির একপ্রান্তে উচ্চ রাজসিংহাসনে উপবেশন করার পর সে একটি শিারা করত, তার ঠিক নিচে একটি দরজা খুলে যেত, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রবেশ করত রঙ্গভমিতে। রাজার সরাসরি বিপরীত দিকে, আবদ্ধভূমির দূরপ্রান্তে, অবস্থিত ছিল দুটি দরজা, পাশাপাশি এবং একে অপরের অবিকল প্রতিরূপ। বিচারাধীন ব্যক্তির কর্তব্য এবং অধিকার ছিল সোজাসুজি এই তরজা অভিমুখে যাওয়া এবং দুটির একটি দরজা খুলে ফেলা। সে তার খুশিমত যে কোন দরজা খুলতে পারে, নিছক নিরপেক্ষ ও নিখাদ দৈব ছাড়া আর কোন রকম উপদেশ বা প্রভাব তার সিদ্ধান্তকে সংক্রমিত করতে পারত না।

একটি দরজা খুললে বেরিয়ে আসত এক ক্ষুধার্ত বাঘ, ভয়ঙ্কর ও হিংস্র, তৎক্ষণাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়ত তার ওপরে, অপারধের শাস্তি হিসেবে তাকে ছিঁড়ে ফেলতো টুকরো টুকরো করে। যে মুহূর্তে অপরাধীর মামলার এইভাবে নিষ্পত্তি হত, তখনই বিষাদের সুরে লৌহ-ঘণ্টা বাজানা হত, মল্লভূমির সীমানায় মোতায়েন করা ভাড়াটে শোককারীর দল সোচ্চার বিলাপ করত, এবং বিপুল জনতা মাথা নীচু করে ভগ্ন হৃদয়ে ধীরে ধীরে

রওনা হত তাদের স্বগৃহ অভিমুখে, এইরকম তরুণ ও সুদর্শন, অথবা বৃদ্ধ ও সম্মানীয়, কোন মানুষের শোচনীয় দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কথা ভেবে তারা যথেষ্ট শোক প্রকাশ করত।

কিন্তু যদি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য দরজা খুলত তাহলে বেড়িয়ে আসত এক রমণী, সুন্দরী প্রজাদের মধ্যে থেকে রাজার নিজের হাতে বেছে দেওয়া, এবং সেই ব্যক্তির বয়েস ও পদমর্যাদার সঙ্গে মানানই। এবং নির্দোষিতার পুরস্কার স্বরূপ সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে মহিলাটির তৎক্ষণাৎ শুভবিবাহ সম্পন্ন হত। তার যে ইতিপূর্বে কোন স্ত্রী কিংবা পরিবার থাকতে পারে, অথবা তার ভালবাসা নিজের পছন্দসই কারো ওপরে অনুগত ভাবে অঙ্গাঙ্গী হতে পারে তাতে কিছু ইতর বিসেষ হত না, এ ধরনের হীনতর কোন ব্যবস্থাকে রাজা তার প্রতিশোধ ও পুরস্কারের মহান পরিকল্পনার পথে কোন রকমেই প্রতিবন্ধক হতে দিত না। মল্লভূমির মধ্যেই সমস্ত কার্যকলাপ তৎক্ষণাৎ ঘটে যেত। রাজার আসনের ঠিক নীচেই একটি দরজা খুলে যেত, সমবেত গায়কবৃন্দ ও স্বর্ণশিঙায় আকাশে-বাতাসে খুশির তরঙ্গ তুলে নৃত্যরত কুমারীর দল জনৈক পুরোহিতকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা যুগলের কাছে, এবং ধুমধামের সঙ্গে দ্রুত বিধিসম্মত ভাবে শুভবিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত তাদের। তারপর পিতলের ঘণ্টায় বেজে উঠত অনাবিল খুশির ধারাবাহিক ঘণ্টাধ্বনি, উপস্থিত জনতা উল্লাসের গুঞ্জন তুলত, আর সেই নির্দোষ মানুষটি তার নব বিবাহিতা বধূকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হত। তার চলার পথে শিশুর দল ছড়িয়ে দিত অজস্র ফুল।

এই দিন সেই রাজার অর্ধ-সভ্য বিচারের পদ্ধতি। এর নিখুঁত নিরপেক্ষ চরিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। অপরাধী জানতে পারত না কোন্ দারজা দিয়ে বেরিয়ে আসবে সুন্দরী মেয়েটি, পরমুহূর্তে সে কোন হিংস্র পশুর খাদ্য হবে না কোন সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করবে সে বিষয়ে কণামাত্র ইঙ্গিত না পেয়েই অভিযুক্ত ব্যক্তি তার পছন্দসই দরজাটি খুলত। কোন কোন সময় বাঘটি এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসত, আর কখনও বা অন্য দরজা দিয়ে। এই বিচারের সিদ্ধান্ত যে শুধুমাত্র নিরপেক্ষ তা নয়, নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে অপরাধী হিসেবে আবিষ্কার করে, তাহলে সেই মুহূর্তেই সে শাস্তি পেয়ে যাচ্ছে, আর যদি সে নিরপরাধ হয়, তাহলে পুরস্কারও পাচ্ছে তৎক্ষণাৎ, তা সেটা তার পছন্দ হোক বা না-ই হোক।

রাজার মল্লভূমিতে এই বিচিত্র বিচারের হাত থেকে কোন নিষ্কৃতি ছিল না।

এই বিধান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ জাতীয় কোন মহা বিচারের সময় জনগণ যখন জমায়েত হত, তখন তারা ঘুণাক্ষরেও জানত না তারা রক্তাক্ত নরহত্যা দেখতে এসেছে, না আনন্দমুখর কোন বিবাহ অনুষ্ঠান। এই অনিশ্চয়তাটুকু ঘটনার প্রতি সকলের এমন এক অদ্ভুত কৌতূহল জাগিয়ে তুলত যা অন্য কোন ভাবে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং এইভাবে জনগণকে খুশি করা হত, সন্তুষ্ট করা হত, এবং দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এই পরিকল্পনাকে অন্যায় পক্ষপাতদুষ্ট বলে নিজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও আনতে পারত না। কারণ, পুরো বিচারের ভারটাই কি অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতে নয়?

এই অর্ধ-সভ্য রাজার এক মেয়ে ছিল, আর বহুবর্ণ কল্পনার মতই ফুটফুটে, এবং একই রকম চূড়ান্ত উদ্ধত। এ সব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে, মেয়েটি ছিল রাজার নয়নের মণি এবং রাজা তাকে অস্বাভাবিক ভালবাসত। তার সভাসদদের মধ্যে ছিল একজন যুবক। ভালবাসার যে সব সনাতনী নায়করা সাধারণ রাজকন্যাদের প্রেমে পড়ে থাকে, আমাদের এই প্রেমিকের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ছিল না। এই রাজকন্যাটি তার প্রেমিকাকে নিয়ে সন্তুষ্টই ছিল, কারণ যে ছিল রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন ও সাহসী। আর মেয়েটি তাকে এত উদ্দামভাবে ভালবাসত যে সেই বন্য ভালবাসা ছিল যেমন উষ্ণ তেমন শক্তিশালী।

বহু মাস ধরে এই ভালবাসা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এগিয়ে চলল। অবশেষে রাজা একদিন এর অস্তিত্ব টের পেল। নিজের কর্তব্য পালনে এক মুহূর্তও ইতস্ততঃ করল না সে। যুবকটিকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিক্ষেপ করা হল, এবং মল্লভূমিতে তার বিচারের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করা হল। এটা অবশ্যই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এবং এই বিচারের অগ্রগতি ও পরিণতি প্রত্যক্ষ করার আগ্রহে রাজা ও প্রজাবৃন্দ একইভাবে অধীর

হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এ ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি, আগে কখনও কেউ রাজকন্যাকে প্রেম নিবেদন করার দুঃসাহস দেখায়নি।

সবচেয়ে হিংস্র ও শক্তিশালী জন্তুদের খোঁজে রাজ্যের সমস্ত বাঘের খাঁচা অনুসন্ধান করে দেখা হল। এইসব হিংস্র বাঘদের মধ্যে সবথেকে সর্বাপেক্ষ ভয়ংকরটিকে বেছে নেওয়া হবে মল্লভূমির বিচারের জন্য। সুযোগ্য বিচারকদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল রাজ্যের সেরা সুন্দরী তরুণীকে খুঁজে বের করার জন্য, যাতে নিয়তি যদি হতভাগ্য যুবককে ভিন্নপথে না ঠেলে দেয় তাহলে সে যেন উপযুক্ত একটি স্ত্রীরত্ন লাভ করতে পারে। অবশ্য, সকলেই জানত, যে যুবককে যে অন্যায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে তা ইতিমধ্যেই সংঘটিত হয়ে গেছে। রাজকুমারীকে সে ভালবেসেছে। সে, রাজকন্যা বা অন্য কেউই এই সত্যকে অস্বীকার করার কথা ভাবেনি। কিন্তু এ ধরনের কোন তথ্য তার মহান-বিচারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, সেটা রাজা ভুলেও প্রশ্রয় দেবে না। কারণ এই বিচার তাকে অসীম আনন্দ দেয়, চরম তুষ্ট করে। ঘটনা যা ই ঘটুক না কেন যুবকটিকে অপসারিত করতেই হবে, এবং রাজকন্যাকে ভালবেসে যুবকটি অন্যায় করেছে কি করেনি, সেটা নির্ধারণ করবে যে ঘটনা প্রবাহ, তা দেখে রাজা স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করতে চায়।

নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হল। নিকট ও দূর-অঞ্চল থেকে বহু লোক এসে জমায়েত হয়েছে, মল্লভূমির চক্রাকার আসনশ্রেণীর প্রতিটি আসন পূর্ণ, আর বহু লোক অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার না পেয়ে বাইরের দেওয়ালের গায়ে স্তূপাকারে ভিড় করে রয়েছে। রাজা তার অমাত্যদের নিয়ে যথাযথ জায়গায় বসে রয়েছে, দরজা দুটির ঠিক বিপরীত দিকে—ভাগ্য নির্ধারণের দুই দরজা, তাদের চেহারা হুবহু একই রকম, এই অবিকল মিল অতি ভয়ঙ্কর। সবাই প্রস্তুত। সঙ্কেত দেওয়া হল।

রাজ-পরিষদবর্গের ঠিক নিচে একটি দরজা উন্মুক্ত হল, এবং রাজকুমারীর প্রেমাস্পদ প্রবেশ করল মল্লভূমিতে। দীর্ঘকায়, অতীব সুদর্শন, হেমকান্তি, তার আবির্ভাবকে সংবর্ধনা জানানো হল প্রশংসা ও সংশয়ের চাপা গুঞ্জন ধ্বনিতে। অর্ধেক দর্শক জানাতই না যে এত রূপবান একতরুণ তাদের মধ্যে বাস করত। রাজকন্যা যে তাকে ভালবাসবে এ আর আশ্চর্য কি! আহা, বেচারা এই অবস্থায় এখানে, কি নিষ্ঠুর ভাগ্য!

মল্লভূমিতে এগিয়ে যাবার পথে প্রথা অনুযায়ী ঘুরে দাঁড়াল যুবক, ঝুঁকে কুর্ণিশ করল রাজাকে। কিন্তু এই রাজপুরুষটির দিকে তার কোন মনোযোগ নেই—তার চোখ অবিচলভাবে নিবদ্ধ পিতার ডান পাশে বসা রাজকুমারীর দিকে।

রাজকুমারীর মধ্যে যদি সে বন্যপ্রকৃতি না থাকত তাহলে সে হয়তো অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকত, কিন্তু এই রকম কৌতূহল উদ্রেককারী একটি ঘটনায় ভার তীব্র ও তপ্ত হৃদয় কি করে রাজকন্যাকে অনুপস্থিত থাকতে দেয়! যে মুহূর্তে হুকুম জারী হয়েছে যে তার প্রেমিক রাজার মল্লভূমিতে উপস্থিত হয়ে নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করবে, সেই মুহূর্ত থেকেই দিন-রাত রাজকুমারী শুধু এই মহা ঘটনার কথা ও তার অনুষঙ্গী অন্যান্য বিষয়ের কথা ভেবে চলেছে। অধিক ক্ষমতা হাতে পাওয়ার ফলে, প্রভাবশালিনী হওয়ার ফলে এবং বিরল চারিত্রিক দৃঢ়তায় রাজকন্যা এমন একটি কাজ করেছে যা এর আগে কেউ পারেনি—দরজার গোপন রহস্য সে জানতে পেরেছে। সে জানে, ঐ রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে কোন্ কক্ষে রয়েছে দরজা খোলা বাঘের খাঁচা, এবং কোন ঘরেই বা অপেক্ষা করছে লাস্যময়ী রূপসী। ভারী দরজা দুটির পিচনে রয়েছে চামড়ার পর্দা। ফলে দরজা খুলতে অগ্রসরবর্তী কোন ব্যক্তির কাছে ঐ ভারী আবরণ ভেদ করে কোন রকম শব্দ বা ইশারা এসে পৌঁছনো সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু সুপ্রচুর স্বর্ণমুদ্রা ও নারীর একাগ্র শক্তি ঐ গোপন রহস্য পৌঁছে দিয়েছে রাজকুমারীর কাছে।

সে যে শুধু জানে কোন্ ঘরে উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে লাজনম্র উজ্জ্বল দীপ্তিময়ী মেয়েটি তা নয়, সে তার পরিচয়ও জনেছে। রাজসভার শ্রেষ্ঠ গৌরবর্ণ সুন্দরীতমা এ তিরুণীকে নির্বাচিত করা হয়েছে অভিযুক্ত তরুণের পুরস্কার হিসেবে—যদি সে উচ্চশ্রেণীর কোন রমণীর প্রণয়কামী হয়েও নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়।

এই পুরস্কারী রূপসীর প্রতি রাজকুমারীর মনোভাব ভয়ঙ্কর ঈর্ষা ও দ্বেষপূর্ণ। বহু সময়েই রাজকন্যা লক্ষ্য করেছে এই মেয়েটি তার প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমজর্জার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, এবং কখনও কখনও তার মনে হয়েছে, এই চকিত কটাক্ষ পুরুষটি বরণ করেছে, এমন কি প্রতি-চাহনিও ফিরিয়ে দিয়েছে উত্তরে। মাঝে-মধ্যে দুজনকে আলাপচারী অবস্থায়ও আবিষ্কার করেছে রাজনন্দিনী। যদিও সে কথোপকথন দু-এক মুহূর্তের, তবুও ঐ সংক্ষিপ্ত সময়ে বহু কথাই হয়তো বলা যায়, হয়তো ওদের সে বাক্যালাপ তুচ্ছ বিষয় নিয়েই, কিন্তু সে কথা জানবে কেমন করে রাজকুমারী? মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু সে রাজকন্যার কামনার পুরুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের দুঃসাহস প্রকাশ করেছে সুতরাং, বর্বর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া বন্য রক্তের ধারার সমস্ত তেজ কেন্দ্রীভূত করে সে ঘৃণা করে নিঃশব্দ দরজার পিছন থরকম্পমান ঐ মেয়েটিকে।

যখন রাজকুমারীর প্রিয়তম ঘুরে তার দিকে তাকাল, তার চোখের মিলন হল, সে দেখল শঙ্কিত মুখের মহাসমুদ্রে রাজকুমারীর মুখমণ্ডল সবার চেয়ে বিবর্ণ ও রক্তহীন, একাত্ম দুই হৃদয়ের পলকে উপলব্ধি করার যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকে, এই ক্ষমতায় সে বুঝল, রাজকুমারী জানে, কোন্ দরজায় পিছনে ওত পেতে বসে আছে হিংস্র বাঘ, আর কোন্ দরজায় পিছনে বা দাঁড়িয়ে রয়েছে অপেক্ষমান রমণী। সে আশা করেছিল রাজকুমারীর এই রহস্য জানবে। রাজকুমারীর স্বভাব সে জানে, এবং সে নিশ্চিত ছিল, যে রহস্য দর্শকের অজানা, এমন কি স্বয়ং রাজারও অগোচর, সেই গোপন রহস্য আয়ত্ত না করা পর্যন্ত রাজকুমারী স্বস্তি পাবে না। যুবকের একমাত্র আশায় সামান্যতম যে নিশ্চয়তা ছিল, তার মূল ভিত্তি ছিল গোপন রহস্য উদ্ঘাটনে রাজকন্যার সফলতা, এবং সে মুহূর্তে সে রাজকন্যার দিকে তাকাল, সে বুঝতে পারল রাজকুমারী সফল হয়েছে, যেমনটি সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত—রাজকুমারী সফল হবেই।

তারপরই তার চকিত সংশয়ী দৃষ্টি নীরবে প্রশ্ন করল : কোন্ দরজা?

রাজকুমারী এত সহজে সে প্রশ্ন বুঝতে পারল যেন যুবক চিৎকার করে তাকে প্রশ্ন করেছে। একটি মুহূর্তও নষ্ট করার সময় নেই। বিদ্যুৎ ঝলকের মত প্রশ্নটি নিক্ষেপ করা হয়েছে, বিদ্যুৎ ঝলকেই তার উত্তর দিতে হবে।

রাজকুমারীর ডান হাত ছিল তার সামনের গদী আঁটা সুদৃশ্য প্রাচীন। সে হাত তুলল, এবং ডানদিকে সংক্ষিপ্ত চকিত ইশারা করল। তার প্রেমিক ছাড়া আর কেউই রাজকুমারীকে লক্ষ্য করেনি। কারণ আর সকলেরই চোখ মল্লভূমিতে দণ্ডায়মান অভিযুক্ত ব্যক্তির দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে।

যুবকটি ঘুরে দাঁড়াল এবং দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপ উন্মুক্ত অংশটুকু অতিক্রম করল।

প্রতিটি হৃৎপিন্ড থমকে দাঁড়াল চলতে চলতে, প্রতিটি শ্বাস রুদ্ধ হল, যুবকটির দিকে চঞ্চলভাবে নিবদ্ধ প্রতিটি চোখ।

বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ না করে যুবকটি ডানদিকের দরজার কাছে এগিয়ে গেল, এবং দরজা খুলল।

এবারে গল্পের মূল কথা হল : দরজা দিয়ে কি বাঘ বেরিয়ে এলো, না সেই রূপসী তরুণী?

এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা যত ভাবি, ততই কঠিন মনে হয় এর উত্তর। মানব মনের এমন এক গভীর সমীক্ষা এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে বহুতর আবেগের জটিল গোলকধাঁধায় সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আরও গভীরভাবে এই প্রশ্নের উত্তর ভাবুন, হে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, মনে রাখবেন, এই প্রশ্নের উত্তর আপনার ওপর নির্ভর করছে না, বরং সেই উষ্ণ-শোণিত অর্ধ সত্য রাজকুমারীর ওপর নির্ভরশীল। হতাশা ও ঈর্ষার সম্মিলিত অগ্নিশিখার অন্তরালে তার হৃদয় হয়ে উঠেছে লোহিত তপ্ত। প্রেমাস্পদকে সে হারিয়েছে, কিন্তু অন্য কে লাভ করবে সেই পুরুষকে?

বহু, বহুবার বিনিদ্র রজনীর নির্জন প্রহরে, দুঃস্বপ্নে, বন্য সন্ত্রাসে চমকিত হয়েছে রাজকন্যা, দু-হাতে মুখ ঢেকেছে—যদি তাঁর প্রেমিক সেই দরজাটা খোলে, যেখানে অপেক্ষা করেছে হিংস্র বাঘের নিষ্ঠুর ধারালো দাঁত!

কিন্তু তার চেয়েও কত বেশিবার রাজকুমারী তাকে অন্য দরজাটা খুলতে দেখেছে। তার বেদনাতুর রোমন্থনে বহুবার সে দাঁতে দাঁত ঘষেছে, চুল ছিঁড়েছে, যখন সে দেখেছে তার প্রেমিক রমণীর দরজাটা খুলে নিজের আনন্দে সৌভাগ্যে চমকে উঠেছে। বহুবার তার মন জ্বলে পুড়ে গেছে যন্ত্রণার আগুনে, যখন সে দেখেছে যুবক ছুটে গিয়ে মিলিত হচ্ছে প্রতীক্ষরতা রূপসীর সঙ্গে, রূপসীর দুগালে লাজনম্রা রক্তাভা, দু-চোখে জয়ের দীপ্তি, পুনর্জীবন লাভের আনন্দে তার প্রেমিকের শরীরের প্রতিটি অণু রোমাঞ্চিত, শোনা যাচ্ছে দর্শকদের উল্লাসধ্বনি, সুখের ঘণ্টার ক্রমাগত বন্যা নিনাদ, সানন্দ অনুগামীদের অগ্রবর্তী হয়ে ঐ তরুণ-তরুণী যুগলের দিকে এগিয়ে চলেছেন রাজপুরোহিত, রাজকন্যার চোখের সামনে ওদের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে অভিষিক্ত করবেন। রাজকন্যা আরো দেখেছে, কুসুমাস্তীর্ণ পথে ওরা দুজন এগিয়ে চলেছে, পিছনে উল্লসিত জনতার খুশিবিহ্বল চিৎকার, সেই চিৎকারে নিশ্চিহ্ন, লুপ্ত হয়ে গেছে রাজকুমারীর হতাশাময় হৃদয়বিদারী আর্তনাদ।

তার চেয়ে মৃত্যুই কি প্রেমিকের পক্ষে শ্রেয় নয়? বরং সে রাজকুমারীর জন্য প্রতীক্ষা করবে পরলোকে।

অথচ ঐ ভয়ঙ্কর শার্দুল, ঐ করুণ মরণ-আর্তনাদ?

সিদ্ধান্ত ইশারায় জানিয়ে দিতে রাজকুমারীর একটি মুহূর্ত মাত্র লেগেছে, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিতে বহু দিন বহু রাত এক প্রচণ্ড যন্ত্রণাময় যুদ্ধ চলেছে রাজকুমারীর মনে, তারপর সে উপনীত হয়েছে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে। সে জানত তাকে জিগ্যেস করা হবে, কি উত্তর তখন সে দেবে তাও সে ঠিক করে নিয়েছে, এবং সামান্যতম দ্বিধা না করে সে ইঙ্গিত করেছে ডানদিকের দরজা।

রাজকুমারীর এই সিদ্ধান্তকে খুব হালকা ভাবে নিলে চলবে না, আর আমিই-একমাত্র ব্যক্তি যে সেই প্রশ্নের উত্তর জানি, এ রকম অযৌক্তিক দাবীও আমি করছি না। সুতরাং, এই দায়িত্ব আমি তুলে দিলাম আপনাদের সবার কাঁধে। দয়া করে বলুন পাঠক-পাঠিকাগণ :

খোলা দরজা দিয়ে কে বেরিয়ে এলো—রমণী, না বাঘ?

অপহৃত ঋণপত্র

আগাথা ক্রিস্টি



'ইদানীং ঋণপত্র চুরির যেন একটা হিড়িক পড়ে গেছে!' একদিন সকালে খবরের কাগজটাকে পাশে নামিয়ে রেখে মন্তব্য করলাম, 'পোয়ারো, এসো, বিশ্লেষণ নামক বিজ্ঞানের জটিলতা ছেড়ে এবার আমরা সরাসরি অপরাধের প্রতি আসক্ত হই।'

'বন্ধুবর হেস্টিংস, তুমি যে ঠিক—কি যেন বলো তোমরা?—"তাড়াতাড়ি ধনী হও" পন্থা অবলম্বন করতে চাইছ, হ্যাঁ?'

'কেন চাইব না! এই শেষ পৃষ্ঠার খবরটা দেখেছ? লন্ডন অ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্ক নিউ-ইয়র্কে প্রায় দশ লক্ষ ডলার মূল্যের লিবার্টি বন্ডস্ পাঠাচ্ছিল, কিন্তু মাঝরাস্তায় "অলিম্পিয়া" নামক যাত্রীবাহী জাহাজ থেকে সেগুলো এক আশ্চর্য উপায়ে উধাও হয়ে যায়।'

'সমুদ্র-অসুস্থতা বাদ না সাধলে আমি সানন্দে এ জাতীয় কোনও বিশাল জাহাজের যাত্রী হয়ে যেতাম।' স্বপ্নাচ্ছন্ন অস্ফুট কণ্ঠে বলল পোয়ারো।

'ঠিকই বলেছ', সোৎসাহে সায় দিলাম, 'কয়েকটা জাহাজকে দেখে তো রাজপ্রাসাদ বলে ভ্রম হয়; আকর্ষণীয় টলটলে সাঁতার-দীঘি, উন্মুক্ত বিস্তৃত বারান্দা, জমজমাট রেস্তোরাঁ, দীঘির কিনারে ছায়াঘন তালগাছের সারি—সত্যি, সমুদ্রে যে আছি বিশ্বাস করাই শক্ত!'

'কিন্তু আমি, সমুদ্রের উপস্থিতি অনুভব করতে আমার বিন্দুমাত্রও সময় লাগে না!' দুঃখিত স্বরে মন্তব্য করল পোয়ারো, 'আর যে সব তুচ্ছ আকর্ষণের কথা তুমি বললে তার আবেদন আমার কাছে সামান্যই; কিন্তু বন্ধু, একবার ভাব তো সেইসব প্রতিভাধর ব্যক্তিদের কথা, যারা ছদ্মবেশে কোনও জাহাজের যাত্রী হয়ে ভ্রমণ করছে! হয়তো এইরকম কোনও ভাসমান রাজপ্রাসাদেই সন্ধান পাওয়া যাবে অপরাধ-জগতের মুষ্টিমেয় অবিস্মরণীয় প্রতিভাশালী শিরোমণিদের!'

আমি হাসলাম, 'ও, তোমার আগ্রহ তাহলে এই দিকে! যে চতুর-চূড়ামণি লিবার্টি বন্ডস্ সুকৌশলে আত্মসাৎ করেছে তুমি তার সঙ্গে সম্মুখ-সমরে নামতে চাও?'

গৃহকর্ত্রী আমাদের আলোচনায় যাতিপাত করলেন।

'একটি অল্পবয়েসি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, মিঃ পোয়ারো। এই যে তার কার্ড।'

কার্ডে ছাপা অক্ষরে লেখা ঃ মিস এস্মি ফারক্যুয়ার।

পোয়ারো অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে টেবিলের নীচে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে কুড়িয়ে নিল পড়ে-থাকা একটা রুটির টুকরো। সেটাকে অতি সন্তর্পণে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে গৃহকর্ত্রীকে ইশারায় জানালো মেয়েটিকে ডেকে দিতে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই যে মেয়েটি ঘরে প্রবেশ করল সে আমার দেখা সুন্দরীশ্রেষ্ঠাদের অন্যতম। বয়েস তার আনুমানিক পঁচিশ; আয়ত গভীর চোখের রঙ বাদামি এবং তার নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব মুগ্ধ করার মতো।

‘দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, মাদমোয়াজেল। এ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, যে আমাকে ছোটখাটো সমস্যায় প্রায়ই সাহায্য করে থাকে।’

‘কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আজ যে সমস্যা নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি সেটা মোটেই “ছোটখাটো” নয়’, আমার দিকে অভিবাদন জানিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে মেয়েটি বলল, ‘আমার ধারণা, ইতিমধ্যেই আপনি হয়তো ব্যাপারটা খবরের কাগজে পড়ে থাকবেন। অলিম্পিয়া থেকে চুরি যাওয়া লিবার্টি বন্ডস্-এর কথাই আমি বলছি।’ পোয়ারোর মুখমণ্ডলে হয়তো ঈষৎ বিস্ময়ের ছায়াপাত ঘটে থাকবে, কারণ মেয়েটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, ‘আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, লন্ডন অ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের মতো এক বিশাল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী। একদিক থেকে ভাবলে কিছুই না, আবার অন্যদিক থেকে ভাবলে অনেক কিছু। আপনি হয়তো জানেন না মঁসিয়ে পোয়ারো, মিঃ ফিলিপ রিজওয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে।’

‘ও—আচ্ছা! যখন ঋণপত্রগুলো চুরি যায়—’

‘তখন সেগুলো ফিলিপের দায়িত্বেই ছিল। অবশ্য এমন নয় যে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে পারে, কারণ ঠিক ওর দোষে ঋণপত্রগুলো চুরি যায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা ওকে যেন পাগল করে তুলেছে। তার ওপর ফিলিপের মামা বরাবরই বলছেন, ঋণপত্রগুলো যে তার কাছে আছে, সে কথা ফিলিপ হয়তো জাহাজে উঠে কোনও সহযাত্রীকে অন্যমনস্কভাবেই বলে থাকবে। সব মিলিয়ে এটা ওর উন্নতির পথে এক ভীষণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

‘মিঃ রিজওয়ের মামার নাম কী?’

‘মিঃ ভ্যাভাসুর, লন্ডন অ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের যুগ্ম সাধারণ পরিচালক।’

‘মিস ফারক্যুয়ার, আপনি বরং সম্পূর্ণ ঘটনাটা আমাকে খুলে বলুন—’

‘তাহলে শুনুন। আপনি বোধহয় জানেন, এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকায় তাদের ঋণের প্রসার ঘটানো এবং সেই কারণেই তারা প্রায় দশ লক্ষ ডলার মূল্যের লিবার্টি বন্ডস্ সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। মিঃ ভ্যাভাসুর এই কাজের জন্যে বেছে নেন তাঁর ভাগ্নে ফিলিপকে। কারণ, প্রথমত, ফিলিপ বহু বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্তব্য পালন করে এসেছে, এবং দ্বিতীয়ত নিউ ইয়র্কে ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সম্পর্কে অন্তরঙ্গভাবে অবহিত ছিল। গত ২৩শে অলিম্পিয়া লিভারপুল থেকে ছাড়ে, এবং সেইদিনই সকালে ফিলিপের হাতে ঋণপত্রগুলো তুলে দেওয়া হয়; তুলে দেন লন্ডন অ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের দুই যুগ্ম সাধারণ পরিচালক—মিঃ ভ্যাভাসুর ও মিঃ শ’। ঋণপত্রগুলো গুণে, প্যাকেটে ভরে, ওর সামনেই সিলমোহর করে দেওয়া হয়। তারপর ও সেটাকে নিজের ট্রাঙ্কে তুলে রেখে তালা দিয়ে দেয়।’

‘সাধারণ তালা লাগানো ট্রাঙ্ক?’

‘না। মিঃ শ’ হাবস কোম্পানির একটা বিশেষ তালা ট্রাঙ্কে লাগিয়ে নেবার জন্যে বার বার করে অনুরোধ করেন। ফিলিপ, আপনাকে তো একটু আগেই বলেছি, প্যাকেটটা রেখেছিল ট্রাঙ্কের একেবারে নীচে। নিউ-ইয়র্কে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টা আগে ট্রাঙ্ক থেকে প্যাকেটটা চুরি যায়। গোটা জাহাজটা তন্ন-তন্ন করে খোঁজা সত্ত্বেও কোনও ফল হয়নি। সুতরাং পরিস্থিতি দেখে এ ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক, ঋণপত্রগুলো সরাসরি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।’

পোয়ারো একটা মুখভঙ্গি করল।

'কিন্তু ঋণপত্রগুলো পুরোপুরি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি, মাদমোয়াজেল, কারণ যতদূর জানি অলিম্পিয়া নিউ ইয়র্কে পৌঁছনোর আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলোকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে বিক্রি করে ফেলা হয়। সুতরাং, নিঃসন্দেহে আমার পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে মিঃ রিজওয়ের সঙ্গে দেখা করা।'

'চেশায়ার চীজ'-এ আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ গ্রহণ করার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করতে যাচ্ছিলাম। কারণ ফিলিপ সেখানে থাকবে। ও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, কিন্তু এখনও জানে না আমি ওর হয়ে আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করছি।'

এই শুভ প্রস্তাবে বিনা দ্বিধায় সম্মত হলাম আমরা, এবং ট্যাক্সি চড়ে রওনা হলাম গন্তব্যস্থল অভিমুখে।

মিঃ রিজওয়ে যথারীতি প্রতীক্ষায় ছিল। দুজন নিছক অপরিচিতের সঙ্গে তার বাগদত্তাকে উপস্থিত হতে দেখে সে একটু অবাকই হল। ফিলিপ রিজওয়ে দীর্ঘকায় কেতাদুরস্ত সুদর্শন যুবক; কপালের দু'পাশে চুলে ঈষৎ রুপোলি আভাস থাকলেও বয়েস তার তিরিশের বেশি নয়।

মিস ফারকুয়ার তার কাছে এগিয়ে গেল, হাত রাখল ফিলিপের হাতে।

'তোমাকে না জিগ্যেস করে কাজ করার জন্যে আমাকে ক্ষমা করো, ফিলিপ।' ও বলল, 'এসো—মঁসিয়ে পোয়ারো, যাঁর কথা তুমি প্রায়ই শুনে থাকবে এবং তাঁর বন্ধু ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

রিজওয়েকে দেখে ভীষণ অবাক হয়েছে বলে মনে হল।

'আপনার কথা না শুনে থাকলে আর কার কথা শুনব, মঁসিয়ে পোয়ারো!' সহাস্যে হাত ঝাঁকিয়ে ফিলিপ রিজওয়ে বলল, 'কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি এস্মি আমার—আমাদের এই সমস্যা নিয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা ভাবছে।'

'আমার ভয় ছিল, জানতে পারলে তুমি হয়তো আমাকে বারণ করতে, ফিলিপ।' নম্রস্বরে বলল মিস ফারকুয়ার।

'ও, আত্মরক্ষার জন্যে তুমি তাহলে চেষ্টা-চরিত্র করতে শুরু করেছ।' মৃদু হেসে মন্তব্য করল রিজওয়ে, 'আশা করি, মঁসিয়ে পোয়ারো এই অসাধারণ রহস্যের ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারবেন; কারণ, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আমার মনের সমস্ত শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।'

বাস্তবিকই, মুখমণ্ডলে শ্রান্তির ছাপ, কোটরগত চোখ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে কী প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যেই না তাকে কাজ করতে হচ্ছে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' আশ্বাসের সুরে বলল পোয়ারো, 'আসুন, এবার খাওয়াদাওয়ায় মনোযোগ দেওয়া যাক। খেতে খেতেই চার মাথা এক করে আমরা চিন্তা করব এ সমস্যার সমাধান কী করে করা যায়। মিঃ রিজওয়ের গল্পটা আমি তাঁর মুখ থেকেই আগোগোড়া শুনতে চাই।'

যখন আমরা রেস্তোরাঁটির কয়েকটি বিশেষ খাদ্যের প্রশস্তিতে আলোচনারত তখন ফিলিপ রিজওয়ে শান্ত স্বরে প্রাক-ঋণপত্র চুরির ঘটনাবলী পোয়ারো বলে যেতে লাগল। মিস ফারকুয়ারের কাহিনির সঙ্গে তার কাহিনির কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া গেল না। কাহিনি শেষ হলে পোয়ারো একটি প্রশ্নের মাধ্যমে কথোপকথনে সক্রিয় অংশ নিল।

'ঠিক কীভাবে আপনি আবিষ্কার করলেন ঋণপত্রগুলো চুরি গেছে, মিঃ রিজওয়ে?'

ফিলিপের হাসিতে বিষণ্ণ তিক্ততা ঝরে পড়ল।

'কষ্ট করে "আবিষ্কার" করার কোনও প্রয়োজন ছিল না, মঁসিয়ে পোয়ারো। কারণ ব্যাপারটা কোনও অন্ধেরও নজর এড়িয়ে যেত না। আমার ট্রাঙ্কটা বাঙ্কের নীচ থেকে অর্ধেক বেরিয়ে ছিল। আর ওটার সারা

শরীর বিভিন্ন ওজনের আঘাতের দাগ। যেন তালাটাকে ভাঙবার জন্যে কারা ওটাকে সজোরে আছাড় মেরেছে।'

'কিন্তু আমার তো ধারণা ছিল ওটা চাবি দিয়েই খোলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তাই। কারণ যারাই তালা ভাঙার চেষ্টা করে থাকুক, তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। এবং অবশেষে তারা হয়তো অন্য কোনও উপায়ে তালাটা খুলতে সক্ষম হয়েছে।'

'আশ্চর্য', বলল পোয়ারো, ওর চোখে ঝিলিক মেরে গেল আমার বহু-চেনা সবুজ আলোর দ্যুতি, 'সত্যিই আশ্চর্য! ওরা গায়ের জোরে তালা ভাঙার চেষ্টা করে এতখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করল—অথচ তারপরই হঠাৎ আবিষ্কার করল চাবিটা সর্বক্ষণ ওদের কাছেই ছিল—কারণ হাবস কোম্পানির তালার নকল চাবি বানানো সম্পূর্ণ অসম্ভব!'

'আর সেই কারণেই চাবি পাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ ওটা দিনরাত—চব্বিশ ঘণ্টা—আমার সঙ্গেই ছিল।'

'আপনি ঠিক বলছেন?'

'এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি; আর তাছাড়া, চাবিটা—অথবা তার নকল—যদি ওদের কাছেই থেকে থাকবে, তাহলে শুধু শুধু ভাঙা-যায়-না এমন একটা তালা ভাঙবার চেষ্টা করে ওরা সময় নষ্ট করবে কেন?'

'হুঁ! এই প্রশ্নটার কথাই আমরা মনে মনে চিন্তা করছি। আমি একরকম ভবিষ্যদ্বাণী করে বলতে পারি, এ সমস্যার সমাধান, যদি তা কোনওদিন আমরা জানতে পারি, পুরোপুরি নির্ভর করবে এই অদ্ভুত ঘটনার ওপর। এর পর যে প্রশ্নটা আপনাকে করব তার আগে একান্ত অনুরোধ, দয়া করে আমার ওপর খেপে উঠবেন না ঃ ট্রাঙ্কটা যে আপনি তালা-খোলা অবস্থায় রেখে আসেননি, সে বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত?'

ফিলিপ রিজওয়ে নির্বাক মুখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইল, এবং পোয়ারো শশব্যস্তে সাফাই গাইতে লাগল, 'মানে, জানেন তো অনেক সময় অন্যমনস্কতাবশত এরকম হয়ে যায়, বিশ্বাস করুন!...সুতরাং ঋণপত্রগুলো চুরি গিয়েছিল ট্রাঙ্ক থেকেই। কিন্তু এরপর সেই চোর ওগুলো নিয়ে কী করল? ওগুলো নিয়ে সে তীরে পৌঁছল কেমন করে?'

'ঠিক বলেছেন!' চেঁচিয়ে উঠল রিজওয়ে, 'ঠিক এই কথাটাই আমিও ভেবেছি! কেমন করে সে শুল্ক-অফিসারদের চোখে ধুলো দিয়ে তীরে পৌঁছল? কারণ, চুরির খবর গোপনে শুল্ক-দপ্তরের কানে তোলা হয়, এবং জাহাজের প্রতিটি যাত্রীকে তারা আগাপাস্তলা অনুসন্ধান করে দেখেন!'

'আশা করি, ঋণপত্রের প্যাকেটটা আয়তনে বেশ বড়ই ছিল?'

'নিশ্চয়ই। ওটাকে জাহাজে লুকিয়ে রাখাও বেশ কষ্টকর হতো—তাছাড়া, আমরা তো জানিই যে ওগুলোকে জাহাজে লুকিয়ে রাখা হয়নি। কারণ অলিম্পিয়া ঘাটে পৌঁছনোর আধ ঘণ্টার মধ্যে ওগুলোকে বিক্রির জন্যে দাখিল করা হয়। এমনকী আমি ঋণপত্রগুলোর নম্বর দিয়ে তার করে কাউকে সাবধান করে দেবার সময়ও পাইনি। একজন দালাল তো শপথ করে বলছে, অলিম্পিয়া পৌঁছনোর আগেই কয়েকটা ঋণপত্র সে কিনেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, ঋণপত্র কখনো তার করে পাঠানো যায় না।'

'হয়তো তার করে নয়, হয়তো কোনও দ্রুতগামী নৌকোর মাধ্যমে ঋণপত্রগুলো অলিম্পিয়া থেকে তীরে এসে পৌঁছেছে?'

'না, তা সম্ভব নয়। কারণ অলিম্পিয়ার আশপাশে সরকারি নৌকো ছাড়া অন্য কোনও জলযান ছিল না; তাছাড়া সেই নৌকোগুলোও আসে ঋণপত্র চুরির খবর পাওয়ার পর সেগুলো অনুসন্ধানের জন্যে। আমি নিজেও জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে নজর রেখেছি যাতে চুরি যাওয়া ঋণপত্রগুলো অলিম্পিয়ার বাইরে না যায়।

বিশ্বাস করুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, এত সব দেখে-শুনে আমি পাগল হয়ে যেতে বসেছি! অনেকে তো বলতে শুরু করেছে এ চুরি নাকি আমারই কাজ!'

'কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী শুল্ক-অফিসাররা তো আপনাকেও সার্চ করেছিল, করেনি?'

'হ্যাঁ, করেছিল।'

ফিলিপ রিজওয়ে বিস্ময়-বিহ্বল মুখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইল।

'আপনি আমার প্রশ্নের অর্থ ধরতে পারেননি দেখছি।' হেঁয়ালি মাখানো হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে বলল পোয়ারো, 'এবার আমাকে ব্যাঙ্কে গিয়ে কিছু খোঁজখবর করতে হবে।'

রিজওয়ে একটা কার্ড বের করে তাতে দু'কলম কী লিখে দিল।

'এটা দেখালেই মামা আপনার সঙ্গে তক্ষুনি দেখা করবে।'

পোয়ারো তাকে ধন্যবাদ জানালো, মিস ফারকুয়্যারের কাছে বিদায় নিল, তারপর আমরা একসঙ্গে রওনা হলাম থ্রেডনিডল্ স্ট্রিট—অর্থাৎ লন্ডন অ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের প্রধান-অফিস অভিমুখে। রিজওয়ের কার্ড দেখাতেই একরাশ টেবিল-চেয়ারের গোলকধাঁধা পেরিয়ে, কর্মব্যস্ত কেরানিদের পাশ কাটিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল দোতলার একটা ছোট অফিসে। সেখানে ব্যাঙ্কের যুগ্ম সাধারণ পরিচালক দুজন আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। মিঃ শ'-এর মুখ দাড়ি-গোঁফ কামানো, পরিচ্ছন্ন; মিঃ ভ্যাভাসুরের গালে অনতিদীর্ঘ সাদা দাড়ি। ব্যাঙ্কের কর্তব্য পালনেই যে তাদের সিংহভাগ কেটে গেছে, সেটা বোঝা যায় তাদের চুলের শুভ্রতা এবং মুখমণ্ডলের রাশভারী অভিব্যক্তি থেকে।

'আশা করি, আপনি একজন সম্পূর্ণ বেসরকারি তদন্ত-প্রতিনিধি?' মিঃ ভ্যাভাসুর বললেন, 'সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা অবশ্য, বুঝতেই পারছেন, পুরো ব্যাপারটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতে তুলে দিয়েছি। এ কেসের দায়িত্ব এখন ইন্সপেক্টর ম্যাকনিলের ওপর। তাঁর কর্মদক্ষতায় আমাদের পুরোপুরি আস্থা আছে।'

'নিশ্চয়ই, সে বিশ্বাস আমারও আছে।' মার্জিত স্বরে বলল পোয়ারো, 'আপনার ভাগ্নের তরফ থেকে শুধু কয়েকটা প্রশ্ন করার যদি অনুমতি দেন তাহলে বাধিত হব। প্রথমে তালাটার কথায় আসি; হাবস কোম্পানি থেকে ওটা আনবার নির্দেশ কে দিয়েছিলেন?'

'আমি নিজে।' জবাব দিলেন মিঃ শ', 'কারণ কোনও কর্মচারীকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করাটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আর চাবির কথা যদি জিগ্যেস করেন, একটা ছিল মিঃ রিজওয়ের কাছে, আর অন্য দুটো রয়েছে যথাক্রমে আমার এবং আমার সহকর্মীর কাছে।'

'তাহলে কোনও কর্মচারীর পক্ষে সে চাবি হাতে পাওয়া সম্ভব ছিল না?'

মিঃ শ' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মিঃ ভ্যাভাসুরের দিকে তাকালেন।

'আশা করি, এ কথা বলা ভুল হবে না, চাবিগুলো গত ২৩ তারিখে যে অবস্থায় সিন্দুকে রাখা হয়েছিল, এখনও সেই অবস্থাতেই রয়েছে।' বললেন মিঃ ভ্যাভাসুর, 'দুর্ভাগ্যবশত আমার সুযোগ্য সহকর্মী দিন পনেরো আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—প্রকৃতপক্ষে ফিলিপ যেদিন রওনা হয় সেই দিনই। এই সবেমাত্র তিনি সুস্থ হয়েছেন।'

'দুঃসহ ব্রংকাইটিস নেহাত খেলার কথা নয়—অন্তত আমার এই বয়েসে।' বিষণ্ণ কণ্ঠে মিঃ শ' বললেন, 'কিন্তু দুঃখের কথা, আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে মিঃ ভ্যাভাসুরকে প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে একাই সমস্ত কাজ সামলাতে হয়েছে, বিশেষ করে এই অতিরিক্ত অপ্রত্যাশিত দুশ্চিন্তা তার দায়িত্বকে আরও শতগুণ বৃদ্ধি করেছে।'

পোয়ারো আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল। মনে হল, সে মামা-ভাগ্নের পারস্পরিক অন্তরঙ্গতার নিখুঁত পরিমাপ করতে চাইছে। মিঃ ভ্যাভাসুরের সমস্ত উত্তরই এল সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথভাবে। তাঁর ভাগ্নে ব্যাঙ্কের একজন

নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী কর্মী, কোনওরকম ধার-দেনা বা আর্থিক কষ্ট তার আছে বলে মিঃ ভ্যাভাসুরের জানা নেই। এ ধরনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে তাকে আগেও বেশ কয়েকবার বাইরে পাঠানো হয়েছে। অবশেষে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের বিদায় দেওয়া হল।

'বড় হতাশ হলাম।' রাস্তায় পা দিয়েই মন্তব্য করল পোয়ারো।

'কেন, আরও কিছু জানবে আশা করেছিলে নাকি? বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুজন তো তোমাকে বলতে কিছু বাকি রাখেননি।'

'না, তাঁদের অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহে আমি হতাশ হইনি, বন্ধু। কোনও ব্যাঙ্ক পরিচালকের চরিত্রে তোমাদের জনপ্রিয় উপন্যাসের ভাষায় "শ্যেনদৃষ্টি এবং ধারালো বুদ্ধিসম্পন্ন কোনও ব্যবসায়ী'কে খুঁজে পাব এ আশা আমি করিনি।" উঁহু—আমি হতাশ হয়েছি বর্তমান রহস্য সম্পর্কে—এর সমাধানটা বড্ড সহজ।'

'হুঁ; তোমারও কি মনে হয় না, সমাধানটা জলের মতো সহজ, শিশুসুলভ সরল?'

'তুমিই জানো, ঋণপত্র কে চুরি করেছে?'

'নিশ্চয়ই জানি।'

'তাহলে তো—মানে আমাদের উচিত—না হলে অপরাধী—'

'নিজেকে বিভ্রান্ত করে উত্তেজিত হয়ো না, হেস্টিংস। আপাতত আমরা কোনও কিছু না করে চুপচাপ থাকব।'

'কিন্তু কেন? কীসের জন্যে অপেক্ষা করছ তুমি?'

'অলিম্পিয়ার জন্যে। মঙ্গলবার নিউ-ইয়র্ক থেকে তার ফিরে আসার কথা।'

'কিন্তু যদি তুমি জেনে থাকো ঋণপত্র কে চুরি করেছে, তাহলে অপেক্ষা করার প্রয়োজনটা কী? অপরাধী এই সুযোগে গা-ঢাকা দিতে পারে।'

'কোথায়? দক্ষিণ-সাগরের কোনও দ্বীপে, যেখানে বিচারের জন্যে অপরাধীকে বিদেশি সরকারের হাতে অর্পণ করা হয় না? না, বন্ধু, না; সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না। আর আমার প্রতীক্ষার কারণ জানতে চাইছ—মানছি, এরকুল পোয়ারোর বুদ্ধিমত্তার কাছে এ রহস্যের কোনও রহস্যই আর রহস্য নেই, কিন্তু অন্যান্যদের সীমিত বোধশক্তির কথা মনে রেখে, যাদের ওপর মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণা সুপ্রচুরভাবে বর্ষিত হয়নি—যেমন, ইন্সপেক্টর ম্যাকনিল—কিছু অনুসন্ধানলব্ধ প্রমাণ আমাকে সংগ্রহ করতে হবে। অন্যান্যদের ক্ষুদ্রতর বোধশক্তির কথা প্রত্যেকেরই বিবেচনা করা উচিত।'

'সত্যি পোয়ারো! বিশ্বাস করো, তোমাকে অন্তত একটিবার ল্যাজে-গোবরে অবস্থায় দেখবার জন্যে আমি ভালোরকম টাকা খরচ করতে রাজি আছি! তোমার এই অহঙ্কার দিন দিন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!'

'শুধু শুধু রাগ কোরো না, হেস্টিংস। সত্যি কথা বলতে কী, সময়ে সময়ে লক্ষ্য করেছি তুমি আমাকে ভীষণ অপছন্দ করো। হায় রে, আমার একমাত্র অপরাধ আমি মহত্ত্বের অপরাধে অপরাধী!'

ছোটখাটো মানুষটা তার বক্তব্যের শেষে এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল যে না হেসে থাকতে পারলাম না।

মঙ্গলবার এল. অ্যান্ড এন.ডবলিউ.রেলওয়ের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় চড়ে আমরা রওনা হলাম লিভারপুল অভিমুখে। পোয়ারো নিছক একরোখাভাবেই ওর সন্দেহের—অথবা নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাকে আলোকিত করতে রাজি হয়নি। আমিও যে পরিস্থিতির সঙ্গে ঠিক তাল মিলিয়ে চলতে পারিনি তা নিয়ে বারংবার বিস্ময় প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করল সে। তর্ক করতে প্রবৃত্তি হল না; নিস্পৃহতার ভানের আড়ালে কৌতূহলকে দমন করে বসে রইলাম।

অ্যাটলান্টিক পারাপারকারী একটা বিশাল যাত্রীবাহী জাহাজ জেটি ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে পৌঁছেই পোয়ারো কর্মব্যস্ত এবং তৎপর হয়ে উঠল। আমাদের কর্মসূচীতে ছিল যথাক্রমে জাহাজের চারজন

তত্ত্ববধায়কের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা, এবং পোয়ারোর জনৈক বন্ধু সম্পর্কে খোঁজখবর করা, যিনি গত ২৩শে অলিম্পিয়ার যাত্রী হয়ে নিউ-ইয়র্ক গিয়েছিলেন।

'একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, চোখে কালো চশমা পরা। পক্ষাঘাতে চলাফেরার শক্তি হারিয়েছেন; কেবিন থেকে খুব কমই বেরোতেন।'

উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে মিল পাওয়া গেল জনৈক মিঃ ভেন্টনরের, যিনি সি ২৪ নম্বরে ছিলেন, ফিলিপ রিজওয়ের ঠিক পাশের কেবিনেই। পোয়ারো যে কীভাবে মিঃ ভেন্টনরের অস্তিত্ব এবং দৈহিক বর্ণনা অনুমান করল তা না বুঝতে পারলেও মনে মনে বেশ উত্তেজনা অনুভব করলাম।

'এবারে বলো দেখি,' লাগাম হারানো স্বরে জানতে চাইলাম, নিউ ইয়র্কে পৌঁছে এই ভদ্রলোকই কি সবার প্রথমে জাহাজ থেকে নেমেছিলেন?'

তত্ত্ববধায়ক মাথা নাড়ল।

'না, স্যর—উনি নেমেছিলেন প্রায় সবার শেষে।'

হতাশ হয়ে পেছিয়ে এলাম। লক্ষ্য করলাম, পোয়ারো আমার দিকে চেয়ে আকর্ণ হাসি হাসছে। সে তত্ত্বাবধায়ককে ধন্যবাদ জানালো, একটা নোট হাত বদল করল, এবং আমরা বিদায় নিলাম।

'সবই ঠিক আছে মানলাম,' উত্তপ্ত স্বরে মন্তব্য করলাম, 'কিন্তু যতই দাঁত বের করে হাসো না কেন, ওই শেষের উত্তরটা তোমার মহামূল্য সিদ্ধান্তকেও নিশ্চয়ই ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে!'

'তুমি ঠিক একই রকম আছ, হেস্টিংস। বরাবরের মতোই আসল সত্যটা এখনও তোমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। ওই শেষ উত্তরটা আমার সিদ্ধান্তকে বরং আরও নিশ্চিত করেছে।'

হতাশায় হাত ছুড়লাম।

'তোমার মতলব তুমিই ভালো জানো। আমি হাল ছেড়ে দিলাম।'

ট্রেনে চড়ে লন্ডনে ফেরার পথে পোয়ারো মিনিট কয়েক ধরে ব্যস্তভাবে কি সব লিখল, তারপর সেটাকে একটা খামে ভরে মুখ বন্ধ করল।

'এটা সুবোধ ইন্সপেক্টর ম্যাকনিলের জন্যে। যাওয়ার পথে এটা আমরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে যাব। তারপর রওনা হব র‍্যাদেভু রেস্তোরাঁ অভিমুখে; সেখানে মিস এস্মি ফারক্যুয়ারকে আমাদের সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দিয়ে আমাদের সম্মানিত করবার জন্যে আমি অনুরোধ করেছি।'

'আর রিজওয়ে?'

'হুঁ, রিজওয়ে কী?' পোয়ারোর চোখের তারায় দুষ্টুমি ঝিলিক মারল।

'তুমি নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ—মানে, সেটা কি যুক্তিসঙ্গত—'

'হেস্টিংস, অসংলগ্ন সংলাপ ক্রমশ তোমার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী, রিজওয়েকে আমি সন্দেহ করেছিলাম। রিজওয়েই যদি ঋণপত্র-চোর হতো—যা হওয়াটা নেহাত অসম্ভব ছিল না—তাহলে এ রহস্য আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠত, সুচারু সুশৃঙ্খল শিল্পময় হতো এর চরিত্র।'

'কিন্তু মিস ফারক্যুয়ারের কাছে বোধহয় ততটা আকর্ষণীয় ঠেকত না।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। সুতরাং, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। এবারে এসো, হেস্টিংস, গোটা সমস্যাটা একবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এর শেষ জানবার জন্যে তুমি কৌতূহলে মরে যাচ্ছ। প্রথমে সিলমোহর করা ঋণপত্রের প্যাকেটটা রিজওয়ের ট্রাঙ্ক থেকে চুরি গেল এবং মিস ফারক্যুয়ারের কথা অনুযায়ী, সরাসরি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এই হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা প্রথমেই নাকচ করব, কারণ বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এটা নিতান্তই কল্পনাবিলাস। তাহলে ভাবা যাক, প্যাকেটটা কোথায় যেতে পারে। প্রত্যেকেই নিশ্চিত একবাক্যে বলছে, ওটা শুল্ক-অফিসারদের চোখে ধুলো দিয়ে তীরে নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল—'

'বলছে; কিন্তু আমরা জানি যে—'

'তুমি হয়তো জানতে পারো, হেস্টিংস। আমি জানি না। আমার মত হল, সবাই যখন বলছে কাজটা অসম্ভব ছিল, ওটা সত্যিই অসম্ভব ছিল। সুতরাং, থেকে যাচ্ছে মাত্র দুটো সম্ভাবনা ঃ প্যাকেটটা জাহাজের কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল—এবং এটাও বড় কঠিন কাজ ছিল—অথবা ওটা ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সমুদ্রে।'

'তুমি বলতে চাও কর্কের সঙ্গে বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়েছিল?'

'না, কর্ক ছাড়াই।'

বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

'তাই যদি হতো, তাহলে ঋণপত্রগুলো আর নিউ ইয়র্কে বিক্রি করা সম্ভব হতো না!'

'তোমার যুক্তিসঙ্গত মনের প্রশংসা না করে পারছি না, হেস্টিংস। ঋণপত্রগুলো নিউ-ইয়র্কে সত্যিই বিক্রি করা হয়েছিল, সুতরাং ওগুলো কখনোই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়নি। এবারে বুঝতে পারছ, এই পরস্পরবিরোধী ঘটনাগুলো কোনদিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে?'

'যেখান থেকে আমরা শুরু করেছি ঠিক সেই দিকেই!'

'উঁহু—কক্ষনো না! প্যাকেটটা যদি জলেই ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে, আর ঋণপত্রগুলো নিউ-ইয়র্কে বিক্রি করা হয়ে থাকে, তাহলে ওই প্যাকেটে কোনওদিনই ঋণপত্রগুলো ছিল না। কোনও প্রমাণ কি আছে যে ওই প্যাকেটে সত্যি সত্যিই ঋণপত্র ছিল? মনে করে দ্যাখো, লন্ডনে প্যাকেটটা হাতে পাওয়ার পর মিঃ রিজওয়ে কখনও সেটা খুলে দেখেননি।

'হ্যাঁ, কিন্তু তাহলে—'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত উঁচিয়ে পোয়ারো বলল, 'আমাকে আগে শেষ করতে দাও। ঋণপত্রগুলো শেষ দেখা গিয়েছিল ২৩ তারিখ সকালে, লন্ডন অ্যান্ড স্কটিশ ব্যাঙ্কের অফিসে। তাদের পুনরাবির্ভাব ঘটল নিউ ইয়র্কে, অলিম্পিয়া পৌঁছবার আধ ঘণ্টা পরে; অবশ্য জনৈক দালালের উক্তি অনুযায়ী, যার কথা কেউই কানে তোলেনি, অলিম্পিয়া পৌঁছবার আগেই নিউ-ইয়র্কে ঋণপত্রগুলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুতরাং, যদি মনে করা যায়, ওগুলো কোনওদিনই অলিম্পিয়াতে ছিল না, তাহলে? অন্য কোনও উপায়ে কি ওগুলো নিউ-ইয়র্কে পৌঁছতে পারে? হ্যাঁ, পারে। কারণ অলিম্পিয়ার সঙ্গে একই দিনে সাদাম্পটন থেকে নিউ-ইয়র্ক অভিমুখে রওনা হয় "জাইগ্যান্টিক" নামক যাত্রিবাহী জাহাজ, এবং অ্যাটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করতে এই জাহাজটা সংক্ষিপ্ততম সময় নেয়। জাইগ্যান্টিকের মাধ্যমে ঋণপত্রগুলো ডাকে পাঠানো হয়ে থাকলে ওগুলো নিউ ইয়র্ক পৌঁছবে অলিম্পিয়া পৌঁছবার একদিন আগেই। সব পরিষ্কার হয়ে পড়ায় রহস্যের কুয়াশা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসতে লাগল। সিলমোহর করা প্যাকেটটা নিছকই একটা নকল মাত্র, এবং আসলের সঙ্গে নকলের অদলবদলটা নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কের অফিসেই হয়ে থাকবে। তখন যে তিনজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের একজনের পক্ষে একটা নকল প্যাকেট তৈরি করে আসলের পরিবর্তে রেখে দেওয়া নিতান্তই বাঁ হাতের কাজ। এবারে ঋণপত্রগুলো ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নিউ ইয়র্কে, অপরাধীর কোনও সহযোগীর কাছে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হল, অলিম্পিয়া ঘাটে পৌঁছনো মাত্রই ওগুলো যেন বিক্রি করে ফেলা হয়। কিন্তু অলিম্পিয়াতে একজনের থাকা প্রয়োজন, যাকে নকল-চুরির নাটক উপযুক্ত সময়ে পরিচালনা করতে হবে।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ রিজওয়ে যদি হঠাৎ প্যাকেটটা খোলে এবং দ্যাখে ওটা একটা নকল প্যাকেট, তাহলে সন্দেহের তির বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাবে লন্ডনে। সুতরাং জাহাজে উপস্থিত থাকা ভদ্রলোকটি, যাঁর ঘর ঠিক রিজওয়ের পাশেই, তাঁর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করলেন। স্থূল, স্পষ্ট ঢঙে ট্রাঙ্কের তালা ভাঙতে চেষ্টা করলেন তিনি, যাতে সকলের নজর এই চুরির চেষ্টার প্রতি আকৃষ্ট হয়; অথচ পরে একটা সদৃশ-চাবি দিয়ে ট্রাঙ্কের তালা

খুলে প্যাকেটটা সমুদ্রে ফেলে দিলেন, নিউ ইয়র্কে পৌঁছে সবার শেষে তীরে নামলেন। স্বাভাবিকভাবেই অপরের দৃষ্টি এড়াতে তাঁর চোখে রয়েছে কালো চশমা, এবং পাছে রিজওয়ের সঙ্গে জাহাজে দেখা হয়ে যায়, তাই তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু, কেবিন ছেড়ে বেরোন না। নিউ ইয়র্কে নেমে লন্ডনগামী প্রথম জাহাজে চড়ে তিনি লন্ডনে ফিরে এলেন।'

'কিন্তু কে—কে এই ভদ্রলোক?'

'এমন একজন, যাঁর কাছে ট্রাঙ্কের দ্বিতীয় চাবি থাকা সম্ভব, যিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ওই বিশেষ তালা লাগানোর, যিনি মোটেই ব্রংকাইটিসে অসুস্থ হননি—অর্থাৎ তোমার সেই "বাচাল" বৃদ্ধ, মিঃ শ'! কখনো কখনো উঁচু-মহলেও অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায়, বন্ধু। ও, এই তো আমরা এসে গেছি! মাদমোয়াজেল, আমি রহস্য-মীমাংসায় সফল হয়েছি। তাহলে অনুমতি করছেন?'

এবং, সহাস্যে, পোয়ারো বিস্মিত মেয়েটির এগিয়ে দেওয়া হাত দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দিল।

মিলিয়ন ডলার বন্ড রবারি

নিঃশ্বাসে নিয়তি

রবার্ট ব্লচ



অসহ্য উত্তপ্ত রাত। ক্রান্তিয় অঞ্চলের পক্ষেও এ উষ্ণতা অপ্রত্যাশিত। একটা গেলাসে জিন ও সোডা ঢালছিলো ভিকেরী, হোটেল-ঘরের দরজায় কারো সতর্ক টোকার শব্দ শুনতে পেলো।

'কে? সারা?' অস্ফুট কণ্ঠে বললো সে।

উত্তরে নিঃশব্দে অথচ ক্ষিপ্ত পায়ে ঘরে পা রাখলো এক আগন্তুক, এবং একই সঙ্গে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলো।

'আমি ফেনার।' বলল আগন্তুক, 'সারার স্বামী!' চেয়ারে বসা ভিকেরীর দিকে তাকিয়ে প্রকট হাসলো সে, 'আমাকে দেখে কি চমকে গেলেন নাকি? সারাও চমকে উঠেছিলো।'

'কিন্তু আপনি—' ভিকেরী চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলো।

'কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই।' ফেনার তাকে বললো, 'যেমন আছেন তেনি বসে থাকুন।' দাঁত বের করে হাসতে হাসতেই জ্যাকেটের পকেট থেকে বেঢপ 'ওয়েবলি'টা বার করলো আগন্তুক এবং ভিকেরীর মধ্যদেশ লক্ষ্য করে
উঁচিয়ে ধরলো।

'অসহায় থিতু নিশানা।' ভিকেরী বলল, 'নাঃ, আপনার এই অখেলোয়াড়ী মনোভাবের ঠিক প্রশংসা করতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, খেলোয়াড়ী মনোভাব সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া তো আপনারই সাজে, বিশেষ করে আমার স্ত্রীকে নিয়ে যে খেলাটা দেখালেন তারপর। বিখ্যাত শ্বেত শিকারী, কি বলেন? পাশাপাশি হোটেলের ঘর আর আনুষঙ্গিক সবকিছু—চমৎকার শিক্ষার- অভিযান।'

ভিকেরী দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'আমার মনে হয় এখন এ অভিযোগকে অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। সুতরাং গুলি করুন এবং নিজের ফাঁসিকাঠের পথটা মোলায়েম করুন।'

'ভালো কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। ফাঁসিতে ঝোলার ইচ্ছে আমার নেই। সুতরাং গুলি আপনাকে আমি করছি না।' পিস্তলটা স্থির লক্ষ্যে অচঞ্চল রেখে জ্যাকেটের পকেট হাতড়ালো সে এবং বার করে আনল একটা ছোট চামড়ার বটুয়া। অলস শান্ত ভঙ্গীতে বটুয়াটা খুলে উজ্জ্বল বিচিত্র রঙের কিলবিল করা একটা বস্তু ভিকেরীর পায়ের কাছে ফেললো। জিনিসটা প্রবালের সরু হারের মতো, কিন্তু জীবন্ত।

যদি ভালো চান তো নড়াচড়া করবেন না।' মৃদু স্বরে বললো ফেনার, 'হ্যাঁ, ওটা একটা ক্রেইট। লোকে বলে 'ক্রেইট' নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক সাপ।'

'এক মিনিট, মিঃ ফেনার, আমার কথাটা শুনুন—'

ছোট প্রবালের হারটা হঠাৎই নিজেকে টান টান করে নিলো। ভিকেরী পিছিয়ে যাওয়ার আগেই গোলাপী বিদ্যুৎ ছোবল মারলো। প্যান্টের পাতলা কাপড় ভেদ করে আবার, আরও একবার তার বিষ দাঁত ভিকেরীর ডান পায়ে বসিয়ে দিলো ক্রেইটটা।

ভিকেরী শ্বাস টেনে চোখ বুজলো। সাপটাকে পায়ে পিষে মারার কোনো চেষ্টাই করলো না সে। হঠাৎই সাপটা ক্লান্তভাবে এলিয়ে পড়লো এবং নিজের শরীর গুটিয়ে কার্পেটের মাঝখানে পড়ে রইলো।

ফেনার ঢোক গিলল, কপাল মুছলো সে বললো, উঠে দাঁড়াল। পিস্তলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। 'এটা রেখে গেলাম,' হয়তো এটা কাজে লাগবে। সবাই বলে, দশ মিনিটেরও কম সময়ে—'

ভিকেরী হঠাৎ সশব্দে হাসল। 'মিঃ ফেনার, আপনি এক নম্বরের বোকা!'

'তার মানে?'

'একটা গেঁইয়া লোক আপনাকে 'ক্রেইট' বলে একটা জল-ঢোঁড়া গছিয়ে দিলো, আর আপনি তার কথা বিশ্বাস করলেন। যেমন একটা বাজে মেয়েছেলের কথায় বিশ্বাস করে বসলেন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার লটরপটর চলছে। ঐ মেয়েটাকে আমি পছন্দ করতাম না বলেই আমার আর সারার নাম জড়িয়ে সে আপনাকে একটা গপ্পো শুনিয়েছে।' ভিকেরী আবার হাসলো, 'জানি, এ কথা বিশ্বাস করতে আপনার সময় লাগবে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আপনার জানা দরকার,তাই বললাম।'

'এই গল্প আমাকে আপনি হজম করতে বলেন?'

'বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি।' ভিকেরী অসহায় ভাবে হাত নাড়লো, 'তবে আপনার এই বিষাক্ত সম্রাটের প্রকৃত চরিত্রটা একবার যাচাই করে যান। আসুন, একটু গলা ভেজানো যাক। আমার স্বাস্থ্যের যে কোনো ক্ষতি হয়নি, হবে না—সেটা স্বচক্ষেই দেখে নিন।'

এবং সত্যিই কোনো ক্ষতি হলো না ভিকেরীর—শুধু ফেনারকে একটু জিন খাওয়ানো ছাড়া। সামান্য কথোপকথনেই ফেনার বুঝলো, ভিকেরীকে সে মিথ্যেই সন্দেহ করেছে। ভিকেরী কার্পেটে পড়ে থাকা ঐ ছোট্ট সাপটার মতই নিষ্পাপ ও নিরীহ।

বিদায় নেবার সময় তার রূঢ় ব্যবহারের জন্য ভিকেরীর কাছে বারবার ক্ষমা চাইলো ফেনার। বললো, 'সারাকে সে প্রথম প্লেনেই লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছে, এবং কাল সকালে সেও লণ্ডন রওনা হবে।'

ভিকেরী তাকে শুভযাত্রা কামনা করে বলল, 'পিস্তলটা তাহলে সঙ্গে নিয়ে যান; আর সাপটাকেও ফেলে যাবেন না। আশা করি, একটা জল-ঢোঁড়ার বাচ্চার জন্য বটুয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না। ওটা স্রেফ পকেটে ভরে নিন। শরীরের উষ্ণতা এবং ছোঁয়া পেয়ে সাপের বাচ্চাটা ভালোই থাকবে—' হাসলো ভিকেরী।

ফেনার পাশের ঘরে রওনা হতেই (যে ঘরে প্রথমে তার স্ত্রী ছিলেন) ভিকেরী জামা-কাপড় ছেড়ে বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগলো। তার মনে বয়ে চললো আন্বিক হিসাবে ঝঞ্ঝা। যথা, সারা লণ্ডন পৌঁছলে ওর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে তার কতোটা সময় লাগবে? ফেনারের বিষয়-সম্পত্তির আর্থিক মূল্যের পরিমাণও যেন কতো টাকা বলেছিলো। আর জ্যাকেটের পকেটের অস্বস্তিকর পরিবেশে জেগে উঠে, কাপড়ের আড়াল ভেদ করে ফেনারের স্থূল দেহে ছোবল মারতে ঐ বিষাক্ত 'ক্রেইট' টার ঠিক কতোটা সময় লাগবে?

তার শেষ প্রশ্নের উত্তরটা এলো সঙ্গে সঙ্গেই।

দেওয়ালের অপর প্রান্তে, পাশের ঘরে, মানুষটার বুকফাটা আর্তচিৎকার ভেসে এলো তার কানে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই, বিষাক্ততায় 'ক্রেইট'-এর জুড়ি নেই, ভেবে খাটের কিনারায় এসে বসলো ভিকেরী, তার

নকল পায়ের চামড়ার ফিতেগুলো ধীরে-সুস্থে খুলতে লাগলো প্লাষ্টিকের পাল্টা নামিয়ে রেখে বিষণ্নভাবে হাসলো সে।

রাতের ট্রেনে একা

রবার্ট ব্লচ



ইয়ার্ডের খালি মালগাড়িটা চলতে শুরু করতেই হ্যানিগান একলাফে তাতে চড়ে বসল।

সন্ধ্যার ধোঁয়াটে অন্ধকার জমাট বাধতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডাটা যেন আগের চেয়েও বেড়েছে। হ্যানিগানের গায়ে তেলচিটে ময়লা একটা জ্যাকেট। তালিমারা প্যাণ্টটা চলন্ত গাড়িতে বেয়ে উঠবার সময় অনেকটা ছিঁড়ে গেছে, হাঁটুটাও ছড়ে গেছে অনেকটা। কিন্তু ওর সে দিকে কোনো খেয়াল নেই। ধপাস করে মালগাড়ির ধাতব মেঝেতে লাফিয়ে পড়তেই ঢং করে শব্দ হলো। মেঝেটে ধুলোয় ভর্তি—অন্ধকার। ওপরেই কুয়াশায় ঢাকা খোলা আকাশ। অবশ্য আকাশটা হ্যানিগান কুয়াশার জন্য দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ও জানে মাথার ওপরে আকাশ থাকে, এবং এখনও রয়েছে। মাঝে মাঝে লাইটপোস্টের সাদা আলো ঝাপসা ভাবে গাড়িতে এসে পড়ছে।

মেঝেতে বসে হ্যানিগান হাঁ করে হাঁফাতে লাগলো। জ্যাকেটের ভাঁজে ভাঁজে অনুভব করলো স্যাঁতস্যাঁতে ঘামের স্রোতে সারা শরীরে শ্রান্তির অবসাদ। এ সবেরই কারণ কিন্তু স্নীকি পীট।

ট্রেন আরও জোরে চলেছে। লাইটপোস্টের ঝাপসা আলোগুলো যেন পরস্পর হাত মিলিয়ে তৈরী করেছে এক বিরাট শেকল।

সব কিছু মিলিয়ে হ্যানিগান ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ করল। ও কি তা হলে ভয় পেয়েছে?

হ্যানিগান সাহস ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় কাঁধ ঝাঁকালো। যত্তো সব। শহর ছাড়ার আগে সামান্য একটু হুইস্কি খাওয়াতে ক্ষতিটা কি হয়েছে? কিন্তু...

ওর দেহটা হঠাৎ কুঁকড়ে গেল। এই শীতে, না অন্য কিছুতে? শির শির করে উঠল দেহের সমস্ত স্নায়ু। ও কেঁপে উঠল থর থর করে।

সত্যকে আর অস্বীকার করার চেষ্টা করল না হ্যানিগান। শহর ছাড়ার আগে জেরির বারে গিয়ে ও প্রাণভরে মদ গিলেছে। আনন্দে? উঁহু। ভয়ে...হ্যাঁ ভয়ে! তাই হ্যানিগান এখন পালাচ্ছে। পালাচ্ছে প্রাণভয়ে।

যে শহরে হ্যানিগান ছিল, তাঁর নাম 'নাইফভিল'। শহরের আসল নামটি কি তা ওর মনে নেই। 'নাইফভিল' হিসেবেই নামটা মনে রাখা হ্যানিগানের পক্ষে সহজ। কারণ স্মীকি পীটের আরেক নাম 'নাইফ'—ছুরি—মৃত্যু। অতএব যে শহরে পীট রয়েছে, তার নাম 'নাইফভিল' ছাড়া আর কি হতে পারে! এ পৃথিবীতে স্নীকি পীট—দি নাইফ-এর মতো নৃশংস খুনে খুব বেশী নেই।

বাইরের আলোর দিক থেকে চোখ সরিয়ে হ্যানিগান ভেতরে নিয়ে এলো ওর দৃষ্টিকে। চোখ পিটপিট করে দেখতে লাগল ঘষা অন্ধকারে ঢাকা কালি কামরাটাকে। একি?

কামরাটা খালি নয়?

হ্যানিগানের মুখোমুখি ধাতব দেওয়ালের গায়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে একটা লোক। ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে আছে হ্যানিগানের দিকে। চোখের মণি দুটো যেন কাচের মার্বেল—একেবারে স্থিরভাবে চেয়ে আছে। হ্যানিগান বুঝলো, লোকটা প্রথম থেকেই ওখানে বসেছিলো। ওকে দেখছিলো। এখন হ্যানিগান ওকে দেখতে লাগলো। বাইরের বিবর্ণ আবছা আলোয় ও যা দেখলো তাতে লোকটা প্রৌঢ়, টাক মাথা, গায়ে ময়লা ছেড়া পোশাক। দেহের কাঠামো দৃঢ়, চোখ দুটো রুই মাছের মতো।

কামরার চারপাশে আর একবার চোখ বোলালো হ্যানিগান। তাল তাল অন্ধকার যেন অন্ধকারের পটভূমিতে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ও ভয়ে ভয়ে সহযাত্রীর দিকে চোখ ফেরালো। ভালো করে দেখলো। না এ—'নাইফ' নয়। পীটের চেহারার সঙ্গে এ লোকটার কোনো মিলই নেই। অবশ্য প্রথম নজরেই হ্যানিগান সেটা বুঝতে পেরেছে, তবু আর একবার যাচাই করে নিলো।

'ওফ, তোমাকে দেখে যা ভয় পেয়েছিলাম!' বিড় বিড় করলো হ্যানিগান। কিন্তু ট্রেনটা হঠাৎ একটা কালভার্টে উঠে পড়ায়, তার গমগম শব্দে সহযাত্রীটি উত্তর চাপা পড়ে গেলো। কিন্তু তার চোখ জোড়া হ্যানিগানের মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল।

'দক্ষিণ দিকে যাচ্ছ বুঝি?'

সহযাত্রী যেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

'আমিও ওদিকেই যাচ্ছি।' জামার হাতা দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো হ্যানিগান। ও যেন স্মীকি পীটের অস্তিত্ব এখানেও অনুভব করছে। পীটের উপস্থিতি হ্যানিগানের সাহসের পলকা প্রাচীর যেন ভেঙে চুরমার করে গুড়িয়ে দেবে। 'ওখানে গিয়ে কি করব এখনও কিছু ঠিক করি নি। শহর ছেড়ে বেরিয়ে তো পড়লাম, তারপর কি হয় না হয় দেখা যাবে।'

'শহর ছেড়ে' কথাটা হ্যানিগানকে আশ্বাস দিলো। কথাটা বলতে পেরে ওর খুব ভালো লাগলো।

ট্রেন শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এবার এসে পড়েছে গ্রামের আওতায়। অন্ধকার...অন্ধকার...অন্ধকার। হ্যানিগানের কাছে নিজের উপস্থিতিও হয়ে উঠলে স্পর্শসাপেক্ষ। কিন্তু ও বুঝলো, ওর সহযাত্রী একই ভাবে একই জায়গায় বসে আছে! কারণ মালগাড়ির ঘটাং-ঘটাং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কানে আসছে ভারী শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ।'

লোকটাকে দেখা গেল কি না দেখা গেলো, তাতে হ্যানিগানের কিছু যায় আসে না। ও যে একজন সঙ্গী পেয়েছে, তাই যথেষ্ট। আর একটি মানুষের নিঃশ্বাস প্রতিমুহূর্তেই ওকে আশ্বাস দিয়ে চলেছে : হ্যানিগান একা নয়—সঙ্গে আছে ওর টেকো সহযাত্রী। তাছাড়া কথা বলেও কিছুটা ভয় তাড়ানো যাবে। ভয়? না, না—হ্যানিগান তো ভয় পায় নি।

'আমি যে জন্যে পালাচ্ছি, তুমিও বোধহয় সেই জন্যেই পালাচ্ছ?' সহযাত্রীর গলায় স্বরটা যেন অদ্ভুত ঠেকলো। অনেকটা যেন স্মীকি পীটের মতো। কিন্তু...

'ও, তুমি তাহলে 'নাইফ'-এর কথা শুনছো?' নিজের মতোই হতভাগ্য, 'নাইফ'-এর ভয়ে ভীত, আরেকজনকে পেয়ে হ্যানিগান ভীষণ খুশি হলো, 'লোকটা একটা পাগল খুনে।'

ওর প্রশ্নের উত্তরে লোকটা ঘাড় নাড়লো। একটা খামারের আলো এক মুহূর্তের জন্য আবছাভাবে কামরায় এসে পড়ায় হ্যানিগান লোকটাকে দেখতে পেল। ও তখনও একইভাবে বসে আছে। এ ব্যাটাও হয়তো আমার মতোই 'নাইফ'-এর ভয়ে একগাদা মাল টেনেছে। ভাবল হ্যানিগান। সে হোক গে, আমার কথাগুলো অন্ততঃ শুনতে তো পাবে।

'বিশ্রী ব্যাপার, বুঝলে ভাই। গত এক সপ্তাহে ঐ হতচ্ছাড়া পীট চার চারটে লোককে খতম করেছে। কাগজ বেরিয়েছে, দেখো নি? পিছন দিক থেকে কেউ তাদের ছুরি মেরেছে। এক ডাক্তার বলেছে, এটা কোনো পাগলের কাজ। আমার সঙ্গীরা সবতো গতকালই শহর ছেড়ে পালিয়েছে। আমি পালাতাম না, কিন্তু —'

হ্যানিগান হঠাৎ থামলো। সহযাত্রী একেবারে নীরব। কিন্তু কানে আসছে ভারী নিঃশ্বাসের স্পষ্ট শব্দ। লোকটা মাল টেনে ঘুমিয়েই পড়লো না কি?

'কি দোস্ত, খুব টেনেছো মনে হচ্ছে?' দাঁত বের করে হাসলো হ্যানিগান! ঠাট্টার সুরে বলে চললো, 'আরে ভায়া আমিও টেনেছি: তবে তোমার মতো আউট হয়ে যাই নি...যাকগে, যা বলছিলাম: আমি কিন্তু পালাতাম না—যদি না আজ বিকেলে 'নাইফ'-এর দেখা পেতাম।'

বাইরের একঝলক আলো কামরায় ঠিকরে পড়তেই হ্যানিগান দেখল, লোকটি যেন ঘাড় নাড়লো। ব্যাটা অবিশ্বাস করছে নাকি হ্যানিগানের কথা?

'মাইরি বলছি! —জেরির বার-টা চেনো তো? ঐ যে বড় রাস্তার ধারে—তা আজ বিকেলে বার থেকে বেড়োতেই হঠাৎ জিং শব্দ তুলে কানের পাশ দিয়ে কি একটা বেরিয়ে গেলো। চমকে ফিরে তাকিয়ে রাস্তায় কাউকে দেখলাম না। কিন্তু সামনে চেয়ে দেখি—দেখি—(হ্যানিগানের গলাটা শুকিয়ে আসছে কেন?) একটা সরু লম্বা চকচকে ছুরি। আমার মাথা থেকে ঠিক তিন ইঞ্চি দূরে একটা কাঠের থামে বিঁধে আছে। ছুরির বাঁটটা থর থর করে কাঁপছে!

'ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার বারে ঢুকে পড়লাম। বোতলের পর বোতল হুইস্কি গিলে চললাম। তারপর সন্ধ্যের অন্ধকারে টুক করে গাড়িতে উঠে পড়েছি—উফ!' হাঁফ ছাড়লো হ্যানিগান, কিন্তু সেই সঙ্গে শিউরে উঠলো। কেন, কে জানে? 'এখন শুধু পালাতে পারলেই বাঁচি।'

এবার অধৈর্য হয়ে হ্যানিমান সামনে ঝুঁকে পড়লো, অন্ধকারকে লক্ষ্য করেই বললো, 'কি হে তুমি বোবা নাকি?' লোকটাকে দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ও। একা একা কতক্ষণই বা কথা বলা যায়! নিঃসঙ্গ বোধটা কি আবার ফিরে আসছে?

হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হ্যানিগান ওর সহযাত্রীর কাছে এগোতে চাইলো। উঁচু নীচু ঢালু জমিতে ট্রেনটা ভীষণ দুলছে। ঘটাং-ঘটাং শব্দের কোনো বিরতি নেই।

'কি হলো, একেবারে চুপ মেরে বসে গেলে যে? সব শুনে তোমার কি মনে হয়?' হ্যানিগান বেশ বুঝলো, প্রশ্নটা ও নিজেকেই করছে? ওর সহযাত্রী কোনো সাড়া দেবে না। এবং সত্যিই কোনো উত্তর এলো না ওর সহযাত্রীর কাছ থেকে।' 'আচ্ছা, তুমিই বলো, এমন পাগল ও আছে, যে বিনা কারণে মানুষ ধরে আর খুন করে।'

সব চুপ। শুধু সেই ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

হ্যানিগান আরো একটু এগোতেই ট্রেনটা একটা ভীষণ ঝাঁকুনি খেলো।

কোথা থেকে একফালি আলো এসে পড়লো কামরায়। হ্যানিগানের সহযাত্রী হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে সামনে গড়িয়ে পড়লো।

হ্যানিগান দেখলো, লোকটার পিঠ ভর্তি জমাট রক্ত, একটা বিশ্রী গর্ত যেন হাঁ করে চেয়ে আছে। বাইরের ঝাপসা আলো রক্তাক্ত ছুরিটার গায়ে পড়ে ঠিকরে পড়ছে। ছুরিটা বিধে আছে ওর সহযাত্রীর পিঠে।

লোকটা মরা। হ্যানিগান শিউরে উঠে পিছিয়ে এলো, এক মুহূর্ত থামলো। 'কিন্তু—কিন্তু এ অসম্ভব! আমি পরিষ্কার শুনেছি ওর নিঃশব্দের শব্দ!' প্রায় চিৎকার করে উঠলো।

হঠাৎ হ্যানিগানের খেয়াল হল, শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটা তখনও ওর কানে আসছে। কিন্তু সামনে থেকে নয়, এবার শব্দটা আসছে হ্যানিগনের ঠিক পেছন থেকে। যেন খুব কাছে...

ট্রেনটা ঝড়ের গতিতে একটা অন্ধকার টানেলে ঢুকে পড়লো। গম্ গম্ শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। অন্ধকারে হ্যানিগানের চোখ অকেজো এবং ট্রেনের বিশ্রী শব্দে ওর কানও অসাড়। সুতরাং এবার আর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটাও শুনতে পেলো না। শুধু অনুভব করলো—ঠিক ওর ঘাড়ের ওপর...একটা উত্তর নিশ্বাস...সেই সঙ্গে হ্যানিগানের কেমন যেন শীত শীত করে উঠলো...

জহ্লাদের জন্ম দিলাম

রবার্ট ব্লচ



প্রত্যেক বড় শহরের ছোট ছোট রাস্তায় এগুলো দেখতে পাবেন, এবং কখনো কখনো ভেবে অবাক লাগবে, এদের মালিকেরা কিভাবে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হয়।

ঢোকবার দরজাটা সাধারণতঃ রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ নীচেই, আর একটা স্বল্পালোকিত জানলায় চিত্রবিচিত্র ছিটের কাজ করা অক্ষরে লেখা : পুরাতন বই। প্রায় সব ক্ষেত্রেই, দরজার ঠিক পাশে দাঁড় করানো একটা র‍্যাকের মুখোমুখি হবেন আপনি, তার মাথায় ঝোলানো সাইনবোর্ডে কাঁচা ছাঁদে লেখা : আপনার পছন্দ—দশ সেন্ট। অনিবার্যভাবে সেই র‍্যাকে আছে অন্ততঃ ছ'টা প্রচলিত বই—'থ্রী উইকস', 'দি গ্রীন হ্যাট', 'হেনেলস বেবিজ, 'ব্ল্যাক অক্সেন', 'ইফ উইন্টার কামস', এবং 'স্পীকিং অফ অপারেশনস'। কে

কেউ কখনো সে বই কেনে না, কানাকড়ি দাম দিয়েও না, এবং দোকানের ভেতরে যে বইগুলো অবশ্যই আপনি দেখতে পাবেন, ফ্যান্টাজিয়াস ম্যালার, দি গোল্ডেন অ্যাস, অথবা টার্শিয়াস অর্গানাম, সেগুলোর নির্ধারিত অত্যধিক মূল্য কেউ কখনো দিতে চেয়েছে বলে মনে হয় না। আপনার হয়তো সন্দেহ হবে যে দোকানের মালিক গ্রন্থপ্রিয় ক্রেতাদের গোপনে অন্য জাতীয় কিছু সরবরাহ করেন—ভূগোলের আগ্রহী ছাত্রেরা হেনরি মিলারের ট্রপিক অফ ক্যানসার এখানে পেতে পারে, এবং সেরকম ঘ্রাণশক্তি থাকলে দি পারফিউমড গার্ডেন-এর ঝাঁঝালো গন্ধও এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে—কিন্তু তাহলেও, বিক্রি যে নিতান্তই কম সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। সুতরাং আপনি ভেবে অবাক হন, আরও একবার, যে এইসব দোকানের মালিকেরা কিভাবে বছরের পর বছর চালিয়ে যায়।

ঠিক এই ধরনের একটি দোকানে জনৈক যুবক এসে উপস্থিত হল, সন্ধ্যের ঠিক মুখেই। তার নাম আবেল তার মধ্যে চোখে পড়ার মতো কিছুই নেই, শুধু রাস্তা থেকে ক্ষিপ্র পায়ে সিঁড়ি নেমে দোকানে ঢোকবার চোরা ভঙ্গীটুকু ছাড়া।

দোকনে ঢুকতেই তার ভুরু কুঁচকে উঠলো, যেন পরিবেশ দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে। যেন প্রতিষ্ঠানের এই সাদামাটা চেহারা তাকে কোনো কারণে দ্বিধা অথবা হতাশায় ফেলেছে। আর যখন দোকানের পেছন দিকের ধুলোভরা কাউণ্টার ছেড়ে দোকানের মালিক সামনে এসে উপস্থিত হলেন তখন তরুণ মিষ্টার আবেলের অভিব্যক্তি যেন বলে উঠল, আমার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।

মালিক নিজেই কোনো বইয়ের এক প্রচলিত সংস্করণ, সমর একটু ময়লা হয়ে গেছেন, তাঁর চেহারা বলছে তিনি বহু ব্যবহৃত, বর্জিত, এবং অবশেষে কোনো তাকে স্থান পেয়েছেন গড়িয়ে চলা বছরের প্রতি খেয়াল না রেখে অমনোযোগে ধুলো সংগ্রহের জন্য। তাঁর শরীরে আকারে ছোটোখাটো ও কুঁজো, এঁদের বেশীরভাগ যেরকমটা হয়ে থাকেন, ইতস্তত গোছা গোছা চুল ও সরু গোঁফের নির্দিষ্ট কোনো রঙ নেই, আর চশমার কাচের পেছনে চোখদুটো ঘোলাটে পুঁতিও হতে পারে।

তাঁর কণ্ঠস্বর, যখন শোনা গেল, এক সুরহীন অস্পষ্ট উচ্চারণ।

'বলুন, কি চাই?'

তরুণ মিষ্টার আবেল ইতস্ততঃ করলো, আবারও তার ভুরু কুঁচকে উঠল, এক মুহূর্তের জন্য সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো—এক কপি 'জুর্গেন' চাইবে, গতানুগতিক উত্তর দেবে, 'না, এমনি দেখছি', নাকি সটান দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু সেই কুঞ্চিত ভুরুর পেছন নিছক বিস্ময় ছাড়াও অন্য কিছু ছিল কয়েক মুহূর্তে ইতস্ততঃময় নীরবতার পর যখন সে কথা বলল সেই অন্য কিছু দৃঢ়সংকল্পে বেজে উঠল তার কণ্ঠস্বরে।

'আমি পড়াশোনা করবার জন্য এখানে এসেছি,' সে বলল, 'একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে, আর সেজন্য কয়েকটা বিশেষ বই আমার দরকার।'

চশমার পেছনে পুঁতি দুটো নড়ে উঠলো এবং মালিক তার মাথা ঝাঁকালেন, 'কি বই?'

'তিনটে,' উত্তর এল, 'প্রথমটা ইনট্রোডাকশন টু মার্ডার'। দ্বিতীয়টা, 'ডেথ অন দি ইনস্টলমেন্ট প্ল্যান'। আর 'দি প্রাইস ইজ রাইট।'

মালিক চোখ তুলে তাকালেন। ঘোলাটে পুঁতির বদলে সেখানে এখন লক্ষ্যভেদী কালো চোখ।

'দুষ্প্রাপ্য বই,' বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'তবে আমি হয়তো আপনাকে আমার নাম কে বলল?'

'এমন একজন, যে বলেছে আপনি এ প্রশ্ন করবেন, এবং উত্তরে আমাকে চুপ করে থাকতে হবে।'

পুস্তক বিক্রেতা সম্মতি জানালেন।

'চলুন, তাহলে, ভেতরে যাওয়াই ভালো। এক মিনিট দাঁড়ান, দোকানটা বন্ধ করে নিই।' তিনি দরজা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়ার পর আলোর সুইচে থাবা বসালেন। অন্ধকার সরুপথ ধরে তাকে অনুসরণ করে যুবকটি এসে উপসিথত হলো দোকানের পেছনে দিকের ঘরে।

ঘরটা আলোয় উজ্জ্বল, আরামপ্রদ এবং নজরে পড়ার মতো সুসজ্জিত।

'বসুন,'' মালিক বললেন, 'তা আপনার নামটা?'

'আবেল। চার্লস আবেল।'

'আবেল নাকি? তাই বলো।' বৃদ্ধ কর্কশ স্বরে হাসলেন, 'তাহলে তুমি আমাকে মিষ্টার কেইন বলে ডাকতে পারো।'

যুবকের কপালের রেখা মিলিয়ে গেলো।

'তাহলে সেই জায়গা,' সে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'আপনিই সেই লোক!' এটাই মিষ্টার কেইন কাঁধ ঝাঁকালেন।

'টাকা সঙ্গে এনেছ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'এই যে। এক হাজার ডলার, ছোট ছোট নোটে।'

টাকাটা নিয়ে সযত্নে গুনলেন মিষ্টার কেইন। তারপর চোখ তুলে তাকিয়ে সম্মতি জানালেন।

'হ্যাঁ, আমিই সেই লোক,' তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'এখন, যে বিষয়ে তুমি পড়াশোনা করে শিখতে এসো সেই কথাই বলি। কাকে তুমি খুন করতে চাও?'

বিয়ের দোকানে তরুন আবেলের প্রথম আবির্ভাবের পর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। প্রতিদিন ঠিক রাত ন'টায় সে দোকানে এসেছে। আলস্যের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ সে ভীষণ আগ্রহী ছাত্র। তাছাড়া, এতো কিছু শেখার রয়েছে।

মিষ্টার কেইনকে উপযুক্ত শিক্ষক হিসেবে পেয়ে সে খুশী হয়েছে। সে কথা সে তাঁকে বলেছে, ভেবেছে, প্রশংসা শুনলে তিনি খুশী হবেন। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি মুখ বিকৃত করলেন। 'জানো, সবাই কি বলে,' তিনি মন্তব্য করলেন, 'যারা নিজে হাতেকলমে করে না। তারা শেখাতে পারে না।'

'মানে আপনি কখনও নিজে হাতে খুন করেন নি?'

মিষ্টার কেইন অস্বস্তির অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুললেন। 'আমার রক্তাতঙ্ক রোগ আছে। নেহাতই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। রক্ত দেখলে আমি এত ভয় পেয়ে যাই যে দোকানে ইঁদুর-ধরা কল পর্যন্ত লাগাতে পারি না। আমার লাভের গুড় ওরা একরকম খুটে খেয়েই শেষ করলো।'

'কিন্তু আপনার দোকানটাতে শুধু লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য। এটাই তো আপনার আসল ব্যবসা, তাই না?'

'হ্যাঁ, মাষ্টারিই আমার পেশা।'

তরুণ মিষ্টার আবেল প্রকট হাসলো। 'হাসির জন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনি এই পেছনের ঘরে বসে বসে নিখুঁত খুনের মতলব ভাঁজছেন, এ কথা ভাবলেই হাসি পায়।'

'এতে হাসির কি আছে, খোকা?' দোকানদার উঠে দাঁড়ালেন। 'এ ধরনের ব্যবসাদারদের যে কি দুরবস্থা তা যদি জানতে তাহলে বুঝতে। একটা লোককে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে।'

'আপনি বললেন, 'এ ধরনের ব্যবসাদারদের। তার মানে আপনি একাই নন? অন্যান্য পুরোনো বইয়ের দোকানদাররাও কি—'

'সে তোমার জেনে কি হবে,' মিষ্টার কেইন চটপট উত্তর দিলেন, 'এখানে প্রশ্ন টশ্ন যা করবার সব আমি করবো। এবং ছোট উত্তরে কাজ হবে না। তুমি এক সপ্তাহ হলো পড়াশোনা করছো, কিন্তু এখনও আমাকে বলো নি কাকে তুমি খুন করতে চাও। এবার আসল কথায় এসো। আমি ব্যস্ত মানুষ, আমার অন্যান্য মক্কেলদেরও তো দেখতে হবে।'

ছেলেটি মাথা নাড়লো। 'বলবো, তবে নিঃসন্দেহ হলে,'' ক্ষমা চাওয়ার সুরে সে বললো। 'মানে নিখুঁত খুন কি ভাবে করতে হয় সেটা যে আপনি আমাকে শেখাতে পারবেন সে বিষয়ে আমাকে আগে নিঃসন্দেহ হতে হবে।'

'নিখুঁত খুন? ওটা কোনো ব্যাপারই নয়,' মিষ্টার কেইন তীব্র স্বরে জবাব দিলেন। 'তোমাকে যে বলেছি, নিজে হাতে আমি কখনও কোনো খুন করিনি, সে কথা সত্যি। কিন্তু খুনের সাক্ষী হয়েছি তা বলতে পারো, বহুবার! আর বিশ্বাস করো, তার প্রতিটাই ছিল নিখুঁত খুন। খুনের পরিসংখ্যানের কোনো খবর তুমি রাখো? একশোটা খুনের মধ্যে পঞ্চান্নটার কোনো কিনারা হয় না। শতকরা পঞ্চান্নটা, একবার ভাবো। প্রত্যেক বছর যে সব খুনের ঘটনা ঘটে তার অর্ধেকের বেশীর কোনো মীমাংসা নেই, বিচার হয় না, এমন কি সন্দেহ কারবার কোনও লোকও পাওয়া যায় না। এটা নেহাৎ ঘটনাচক্র নয়। ওসব ঘটনার বেশীর ভাগ খুনীই অন্যান্য লোকের পরামর্শ পেয়েছিলো। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। যে রকম আমি তোমাকে দিচ্ছি। ব্ল্যাক ডালিয়া মামলার কথা মনে পড়ে, ওয়েষ্ট কোস্টে?'

'ওটা কি আপনার পরিকল্পনা?'

'হ্যাঁ, আমার এক ছাত্রের জন্য।' মিষ্টার কেইন ঠোঁটে হাসলেন, লাজুক গর্বের হাসি। 'যে ছাত্রের সত্যি শেখবার ইচ্ছে আছে, তার সামান্য সহযোগিতা পেলে আমি কদ্দূর কি করতে পারি ওটা তারই একটা উদাহরণ মাত্র।'

তরুণ আবেল একটা সিগারেট ধরালো। 'কি করে জানবো যে আপনি আজে বাজে মিথ্যে বলছেন না? ওই খুনটা আমার কাছে একেবারে অর্থহীন মনে হয়েছে।

মিষ্টার কেইন ঠোঁটে কামড় দিলেন। 'সেটাই আসল কথা', তিনি জেদী সুরে বলে চললেন। 'এক সপ্তা ধরে যা বলেছি তার কিছুই কি তোমার মনে নেই? এসো, সংক্ষেপে আর একবার সেগুলো ঝালিয়ে নেওয়া যাক। খুনের কি কি কারণ থাকে? চটপট বলো।'

'তিনটে, আপনি বলেছেন। প্রথম, প্রয়োজন।'

'যেমন?'

'যেমন ইয়ে, করুণাবশে, টাকা পয়সার ব্যাপার থাকলে, বা যখন কেউ নিজের স্বামী কিম্বা স্ত্রীর কাছ থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের নামে নীতিভ্রষ্ট হওয়ার ভয় পায়।'

'চমৎকার। এবার দ্বিতীয় কারণ?'

'রাগ, ঈর্ষা, শত্রুতা। এ ধরনের ব্যাপার।'

'আর তিন নম্বর?'

'নিছকই খেয়ালবশে, তাই না? নির্ভেজাল আনন্দের জন্য।'

'ভেজাল আনন্দের জন্য,' শুধরে দিলেন মিষ্টার কেইন। 'তিন নম্বরের কোনো স্থান নেই, অন্ততঃ আমার কাছে। মানসিক খুনীদের আমি ছাত্র হিসেবে নিই না। তার একটা কারণ, তারা যে আমার কথা মতো কাজ করবে তার কোনো বিশ্বাস নেই।'

'কিন্তু ব্ল্যাক ডালিয়ায় ব্যাপারটা মনে হয়েছিলো কোন মানসিক খুনীর কাজ।'

'এই তো, এবার মগজ খুলেছে,' মিষ্টার কেইন আশ্বাস দিলেন', হ্যাঁ, তাই মনে হয়েছিল। সেভাবেই ওটার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।'

'পরিকল্পনা?'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, এ শহরের অর্ধেকের বেশী খুনের কোন কিনারা হয় না। কেন? কারণ যে সব সূত্র বেশীর ভাগ খুনীকে ধরিয়ে দেয় সে সব সূত্রের সঙ্গে এই খুনগুলোর উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্ক থাকে না। বছর বিশেক আগে খুনের জটিল, বিশদ পদ্ধতিগুলো ডিটেকটিভ বইগুলোর অস্বাভাবিক চাহিদা ছিলো। সে তো আমার জানবারই কথা, দোকানের সামনের তাকগুলো ওসব বইয়ের ভর্তি। যতো সব উদ্ভট খুনের গল্পো—বিষাক্ত ছুঁচ, জমাট বাঁধা তুষারের ছুরি, তালা বন্ধ ঘরের মারপ্যাঁচ, গলার স্বর টেপরেকর্ডারে তুলে রেখে নকল অ্যালিবাই তৈরী করা। এ সবই হাস্যকর। যদি তুমি সাদামাটা বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করো, আর এমন কোন লোক তোমাকে না দেখে, যে দৌড়ে গিয়ে পুলিশে খবর দেবে বা সাক্ষী দেবে, তাহলে খুন করে পার পাওয়াটা কোন ব্যাপার নয়। অবশ্য, এই শর্তে, যে আঙ্গুলের ছাপ, রক্তের দাগ এবং এ ধরণের ছেলেমানুষ জিনিসগুলো সম্পর্কে তুমি যথেষ্ট সাবধান হবে।

'পুলিশ আজকাল খুনীদের ধরতে পারে না তাদের খুনের পদ্ধতির জন্য। অপরাধীর উদ্দেশ্যই তাদের আসল অপরাধীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর হতভাগ্য সেই শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন ঠিক এই জিনিসটাই ভুলে যায়। প্রয়োজনের কারণে যে সব খুনের জন্ম, সে সব ক্ষেত্রে পুলিশ এমন লোকের খোঁজ করে যে সেই খুনের ফলে লাভবান হয়, কোন উত্তরাধিকারী, বিবাহিত জীবনে অসুখী কোন পুরুষ অথবা স্ত্রী, ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী এইরকম। রাগ অথবা ঈর্ষার ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধরে ফেলা খুবই সহজ, তিনি একটু থামলেন। 'জেনে রেখে, যে সব খুনের মতলবে আমি সাহায্য করেছি তার প্রত্যেকটার পেছনেই একটা সত্যিকারের কারণ ছিল। কিন্তু সে মতলব আমি এমন ভাবে তৈরী করি যে আপাতদৃষ্টিতে খুনের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কথায়, প্রতিটা খুনই কোন মানসিক খুনীর কাজ বলে মনে হয়।'

'ও, এই তাহলে আসল ব্যাপার!'

‘যে লোক তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে সে এ কথা বলেনি?’ মিষ্টার কেইন জানতে চাইলেন। ‘নাকি তার সফল হওয়ার কাহিনীর খুঁটিনাটি তুমি জানো না?’

‘বলেছে,’ তরুণ আবেল স্বীকার করলো। ‘আর খুঁটিনাটি সমস্তই আমি জানি। সে আপনার সম্পর্কে অনেক প্রশংসা করেছে। শুধু তার আসল মানেটা আমি ধরতে পারিনি, প্রথম প্রথম।

‘এখন ধরতে পেরেছো? ভালো! কি আছে, তাহলে এখন তা মন খুলে আমাকে সব বলতে পারো? তোমার আসল মতলবটা কি বলো দেখি?’ মিষ্টার আবেল আর ইতস্ততঃ করলো না।

‘যে লোক আমাকে আপনার কথা বলেছে তাকেই আমি খুন করতে চাই।’ সে বললো।

‘আমারই কোন পুরোনো ছাত্র? কিন্তু, খোকা, সেটা একটু নীতিবিরুদ্ধ কাজ হবে না?’

‘নিশ্চিন্ত থাকুন। তার নাম আপনাকে আমি বলছি না। আপনি কখনও সে নাম জানতে পারবেন না, সুতরাং আপনার বিবেকও শান্ত থাকবে।’

‘তার ওপর তোমার কোনো ব্যক্তিগত রাগ আছে বুঝি?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু তার খুঁটিনাটি জানিয়ে আপনার মনের বোঝা বাড়াতে চাই না। শুধু এটুকু জানলেই আনপার যথেষ্ট হবে, তাকে ঘৃণা করি বলে সে আমাকে একটুও সন্দেহ করে না। সুতরাং ইতিমধ্যেই নিখুঁত পরিবেশ আমরা পেয়ে গেছি, অন্তত আপনার কথা মতো। ওই খুনের সঙ্গে কেউ আমাকে জড়াবে না, কারণ আপাত দৃষ্টিতে আমার কোন উদ্দেশ্য নেই। এখন আপনার কাছে আমার যা দরকার তা হলো খুনের একটা জুৎসই পদ্ধতি। এমন কায়দা যাতে সেই খুনটা কোন মানসিক রোগগ্রস্ত খুনীর কাজ বলে মনে হয়।’

‘হুম-ম।’ মিষ্টার কেইন উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করলেন। ‘শুনে তো সহাজই মনে হচ্ছে, যদি অবশ্য তুমি সত্যি কিথা বলে থাকো।’

‘ঈশ্বর সাক্ষী।’

‘তুমি যে রকম বলেছো—’ মিষ্টার কেইন সামান্য থামলেন। ‘তাতে মনে হয়, সেই লোককে নির্জন কোনো জায়গায় কোণঠাসা করে, গলা টিপে খুন করে সোজা হেঁটে চলে যাওয়াটা তোমার পক্ষে নেহাৎই সহজ হবে। অনেক সময় খুনের সহজ-সরল পদ্ধতিই বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কানা গলিতে কাউকে মাথায় বাড়ি মেরে চম্পট দাও, দেখবে পুলিস ল্যাজে-গোবরে হয়ে গেছে।’

‘কিন্তু স্যার,’ মিষ্টার আবেল হালকা স্বরে বলল, ‘এ পরামর্শের দাম বলতে চান নগদ এক হাজার ডলার —তাও আবার আয়করমুক্ত?’

‘তোমাকে কিছুটা বিষও আমি জোগাড় করে দিতে পারি—’

‘বিষের সঙ্গে মানসিক খুনের কি সম্পর্ক? সত্যি, এতো সব কথাবার্তার পর আমি আরও জমকালো কিছু আশা করেছিলাম।’

‘জমকালো, হুঁ?’ মিষ্টার কেইন থামলেন, তাঁর চোখ উজ্জ্বল হলো। ‘তাহলে তোমার ভালো লাগবে এমন একটা কায়দা শোনো। পুরোনো প্যাঁচ ঠিক কথা, তবে এ ক’বছরে এটা খুব বেশী ব্যবহার হয় নি। আমি ওটার নাম দিয়েছি ‘ডেড লিটার অফিস।’

‘ডেড লেটার অফিস’’?’

‘ডেড লিটার— নিষ্প্রাণ টুকিটাকি জিনিস।’ ছাত্রের দিকে চোখ নামিয়ে হাসলেন তিনি। ‘এ পদ্ধতি কার্যকরী করতে গেলে, মাত্র তিনটে শর্ত পূরণ করা চাই।’

‘কি শর্ত?’

‘প্রথমে, খুনীর পক্ষে শিকারকে লোভ দেখিয়ে কোন নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে তাকে খুন করা সম্ভব। আর, তোমার আপত্তি সত্বেও, আমি মাথায় বাড়ি মেরে বা গলা টিপে খুন করবার কথাই জোর

দিয়ে বলবো। অবশ্য এ কথা ধরে নিচ্ছি যে সাধারণ সাক্ষ্য প্রমাণ ও খুনের অস্ত্র, যদি কিছু ব্যবহার করা হয়, লোপাট করবার জন্য যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হবে। কি মনে হয়, এটুকু পারবে?’

‘খুব সহজেই পারবো।’

‘ভালো। দ্বিতীয় শর্ত হলো যে খুনীর একটা গাড়ি থাকতে হবে।’

‘আমার গাড়ি আছে।’

‘তৃতীয়, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—খুনী যেন কারো নিয়মিত নজরে না থাকে। মানে, তার যেন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে কোন বাধা না থাকে, সে দিন কয়েকের জন্য শহরের বাইরে গেলেও কেউ যেন তার খোঁজ না করে।’

‘আমি একা থাকি, আর কাজ থেকে এক সপ্তা ছুটি নিয়ে এসেছি।’

‘সাবাস! তাহলে মনে হয় একটা নিখুঁত মানসিক-খুনের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। ডেড লিটার অফিস নির্ঘাৎ পুলিসকে ধোঁকা দেবে। ওরা খুনের কায়দা নিয়ে এতো মাথা ঘামাবে যে খুনের উদ্দেশ্যর কথা ওদের মনেও আসবে না।’

‘কিন্তু আমাকে কি করতে হবে?’

‘এখনও বুঝতে পারছো না? তুমি খুব সহজ কায়দায় তোমার লোককে খুন করো, যেমনটা আমি বলেছি। তারপর একটা হাত-দা কিম্বা কসায়ের ছুরি দিয়ে মৃতদেহটা টুকরো টুকরো করো। এ ধরনের ঘটনা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মোটামুটি যে টুকরোগুলো সাধারণতঃ করা হয় সে গুলো হল, পা, ঊরু পর্যন্ত দু টুকরো, গলা থেকে পেটও তাই, হাত, বাহু, আর মাথা। মোট তেরো টুকরো। অমঙ্গলের সংখ্যা, কিন্তু আশা করি অবান্তর কুসংস্কারে তুমি বিশ্বাস করো না।’

‘না। শুধু কৌতূহল হচ্ছে। ওই টুকরোগুলো নিয়ে কি করবো?’

‘কেন, প্যাকেট করে ফেলবে। তেরোটা আলাদা প্যাকেট। বাড়িতে ফ্রীজে যে রকম প্লাস্টিকের বাগ ব্যবহার করা হয় সে রকম কয়েকটা ব্যাগ লাগবে, কিছু মোটা বাদামী কাগজ, আর কসায়েরা যে টোন সুতো ব্যবহার করে সে রকম টোন সুতো। দেখো, টোন সুতো যেন কম না পড়ে। প্যাকেটগুলো একবার তৈরী হয়ে গেলে তুমি শুধু সে গুলোর গায়ে ঠিকানা লিখবে, ডাক-টিকিট লাগবে, আর পার্সেল হিসেবে টুক করে ডাক বাক্সে ফেলে দেবে।’

‘কিন্তু তেরোটা ভারী ভারী প্যাকেট—’

‘সেই জন্যই জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার গাড়ি আছে কিনা, আর হাতে সময় আছে কিনা। এক জায়গা থেকে তুমি ওগুলো পোষ্ট করবে না। গাড়ি নিয়ে তোমাকে ডজনখানেক বিভিন্ন শহরে ঘুরতে হবে। একাট ম্যাপ যোগাড় করে দেখে নিও দিন চারেকের মধ্যে তুমি কদ্দূর ঘুরতে পারবে। মোটামুটি ছন্নছাড়া ভাবে জায়গাগুলো ঠিক করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, যাতে পুলিশ কোনোরকম ধারা অথবা আসল কাজের জায়গা খুঁজে না পায়। এ সব খুঁটিনাটি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেবো। এও আমার কাজেরই একটা অঙ্গ। এ ছাড়া ডাকটিকিট সব আগেভাগেই কিনে রাখবে—আমার মতে একটা তিনসেন্টের পাতা কিনে নিও, কারণ সেগুলোর কথা কেউ খেয়াল রাখবে না।

‘কিন্তু এই পার্সেলগুলো কাদের ঠিকানায় পাঠাবো?’

‘যে শহরে যাবে, তার টেলিফোন বই দেখে খুশীমতো নাম ঠিকানা বেছে নেবে। নয়তো—এ হলো এক নতুন কায়দা—তেরোজন লাশঘরের প্রহরীর কাছে ওগুলো পাঠিয়ে দাও, ভিন্ন ভিন্ন এলাকার তেরোজন প্রহরী। এতে পুলিশ একেবারে ভুল পথে পা দেবে। তারা সেই প্রহরীদের ওপর রাগ আছে এমন লোকের খোঁজ করে বেড়াবে। যাই হোক ওরা ঠিক ধরে নেবে এ কোনো। মানসিক খুনীর কাজ। কাগজওয়ালারা যদি একবার এ খবর পায় এবং গল্পটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করে, তাহলে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে

সমস্ত সূত্র হারিয়ে যাবে ঐ রগরগে রোমাঞ্চকর উত্তেজনার গোলকধাঁধায়। কে এই উন্মাদ দানব? এ জাতীয় ব্যাপার আর কি।' মিষ্টার কেইন মাথা নোয়ালেন। 'শুনে কি রকম মনে হচ্ছে, হুঁ? তোমার পছন্দ অনুযায়ী জমকালো হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ঠিক জানেন কোনো গোলমাল হবে না?'

'দেখেশুনে মতলব ভাঁজলে সে ভয় নেই। আর প্রাথমিক সাবধানতাগুলো তোমাকে অবশ্যই নিতে হবে, যাতে শিকারকে লোভ দেখিয়ে ঠিক জায়গায় টেনে নিয়ে আসতে পারো। তাছাড়া, তোমার—ইয়ে—যন্ত্রপাতিগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোনো ছুরি-কাঁচির দোকান থেকে ওগুলো চুরি করে জোগাড় করা। পরে, শহরের বাইরে কোনা ব্রীজের ওপর থেকে ওগুলো ফেলে দিলেই হলো। কিন্তু এসব খুঁটিনাটি পরে ধাপে ধাপে করা যাবে খন। প্রথমে আঙুলের ছাপ এড়ানোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা কি এখন করবে না ছুটি নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? ও, ভালো কথা, আজ তো শুক্রবার। শনিবার যদি তোমার অফিস ছুটি থেকে থাকে তাহলে এখন ওটা সেরে নেওয়া ভালো। তাতে এই দুদিনের ছুটিতে তুমি অনেকটা সেরে উঠবে।'

'এ সব কি বলছেন আপনি?'

'অ্যাসিড, খোকা। আমার নিজে হাতে তৈরী। আঙুলের সমস্ত দাগ তুলে দেব যাতে তোমার ছাপ পুলিশ না পায়। অবশ্য চামড়াটাও পুড়ে যাবে, কিন্তু উপায় কি। আর আমার কাছে অসাড় করবার কোনো ওষুধও নেই। তবে এই ঘরা মোটামুটি শব্দ রোধী, তুমি একটু আধটু চেঁচালেও কেউ খেয়াল করবে না।'

'অ্যাসিড? চেঁচাবো? আশ্চর্য, আপনি এসব—' তরুণ আবেল কুঁকড়ে গেল। মিস্টার কেইন তাকে উপেক্ষা করে একটা দেওয়াল-আলমারির কাছে এগিয়ে গেলেন, বের করে নিলেন একটা বোতল, একটা বেসিন, এবং একটা বীকার। ওগুলো নিয়ে কি সব করলেন, তারপর ভেসে ওঠা কটু ধোঁয়ার মেঘের আড়াল থেকে তার ছাত্রের দিকে কৃপার দৃষ্টিতে উঁকি মারলেন।

'এসো,' তিনি বিড়বিড় করে বললেন। 'একটু হয়তো লাগবে, কিন্তু কথা দিচ্ছি, বিজয়ী-চেয়ারে বসে মারা যাওয়ার চেয়ে এর যন্ত্রণা অনে—ক কম। রসিকতায় যদি কিছু মনে না করো, বিজয়ী চেয়ারের কাছে গেলে সেটায় আর বসতে ইচ্ছে করবে না...'

মিস্টার আবেল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, দস্তানা পরা হাত নিয়ে বইয়ের দোকানে থেকে চলে যাওয়ার পর এবং একদিন সন্ধ্যায় তার পুনরার্বিভাবের মধ্যে এক সপ্তাহেরও বেশী কেটে গেছে।

রাত তখন অনেক। দোকানের সদর দরজায় বহুক্ষণ কড়া নাড়বার পর মিষ্টার কেইন পা টেনে টেনে উপস্থিত হলেন এবং দরজা খুললেন।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তিনি যুবককে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন পেছনের ঘরে, অবাক চোখে চেয়ে রইলেন তার হাতের থলেটার দিকে, কিন্তু পেছনের ঘরের শান্ত পরিবেশে গিয়ে না বসা পর্যন্ত তিনি কিছু বললেন না।

দোকানদার বৃদ্ধকে কৌতূহল আচ্ছন্ন করলো। 'কি হয়েছিল কি তোমার?'

তিনি জানতে চাইলেন। 'শেষবারের মতো তো নির্দেশ নিতে এলে না। আমি এদিকে চিন্তা করছি—'

তরুণ আবেল হাসলো। 'আপনার চিন্তা করার দরকার ছিল না। যেটুকু আপনার কাছে শিখেছি, সেটুকু আমার কাজের পক্ষে ঢের বেশী। পুরো কাজটা দারুণ ভাবে শেষ হয়েছে।'

'তোমার—তোমার কাজ হয়ে গেছে? কিন্তু কবে? মানে, কাগজে তো কিছু দেখলাম না, কোন উল্লেখ পর্যন্ত—'

'সবকিছু আমি ভেবে দেখেছি। শিকারকে নিছক গলা টিপে খুন করবার ব্যাপারে আপনি প্রথমে যে কথাটা বলেছিলেন, তার যুক্তি আছে। অবশ্য আমার আঙ্গুলে বেশ ব্যথা ছিল, কিন্তু তাতে কোন অসুবিধে হয়নি।

অন্ধকার গলিতে ঘটে যাওয়ায় খুনটাকে কোন সাধারণ ছিনতাই বাজের (তাই তো বলে ওদের) কাজ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কাগজে ওটা পুরো এক প্যারাও জায়গা পায়নি, সুতরাং ওটা যে আপনার চোখ এড়িয়ে যাবে সে আর আশ্চর্য কি। নিন, এই দেখুন।'

খবরের কাগজের একটা কাটিং আবেল এগিয়ে দিল, এবং বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি সেটা পড়লেন। তিনি চোখ তুলে তাকালেন, মাথা নাড়লেন। 'ড্রিসকোল ছোকরা, হুঁ? কিন্তু আমি ভাবছিলাম তুমি হয়তো নামটা আমাকে বলবে না।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না, আসে? সে-ই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলো, আর সে আপনার একজন পুরোনো—ইয়ে—ছাত্র ছিল।'

'হ্যাঁ। একাট হিংসের ঘটনা ছিল। ওর বাগদত্তাকে একটা ছেলে চিনিয়ে নিয়েছিলো। আশ্চর্য বলতে হবে, ছেলেটার প্রতি ওর রাগ ছিলো না। ও মেয়েটাকে খুন করতে চেয়েছিলো। মেয়েটা তখন ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতো, আর সেই জন্য খুনের উদ্দেশ্য চাপা দিতে আমাদের কম হ্যাপা পোয়াতে হয়নি। অবশেষে, ভেবে চিন্তে এমন একটা কায়দা বের করা হলো যাতে খুনটা কোন মানসিক রোগীর কাজ বলে মনে হয়। যদ্দূর মনে পড়ছে, 'ম্যাড বম্বার'' এর কায়দা, তবে এখানে শুধু প্লেনের বদলে বাস। মার-প্যাঁচটা হচ্ছে, বোমাটা মেয়েটার মালপত্রের মধ্যে লুকোনো থাকবে না, তাহলে আসল উদ্দেশ্যটা বেরিয়ে পড়বার ভয় থাকে। ওটা লুকোনো থাকবে একটা সৈনিকের স্যুটকেসে, যে ছুটি কাটিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে। ঠিক সময়ে এরকম একটা লোকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল এবং কাজটাও শেষ হল—সে সব খুঁটিনাটি বলে তোমাকে আর বিরক্ত করবো না। যাকগে, মোটমাট ওতে কাজ হয়েছিলো।

আবেল মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। 'হ্যাঁ, চারজন নিহত, তিনজন আহত হয়েছিল। মেয়েটাও মারা গিয়েছিল।'

'তোমার স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে হয়। এ প্রায় দু'বছর আগেকার ঘটনা।' মিষ্টার কেইন একটু থামলেন। 'নাকি ও তোমাকে বলেছিলো?'

'ও আমাকে কিছুই বলেনি। আমি শুদু আন্দাজ করেছি। কারণ, আমিই ওর সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। যে মেয়েটাকে ও খুন করেছে সে আমার প্রেমিকা ছিল।'

'ও, তাই বলো। তাহলে ওকে যে তুমি শেষ করতে চাইবে তাতে আর আশ্চর্য কি। যাক, তোমার প্রতিশোধ তবে নেওয়া হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'আর, সব ভালো যার শেষ ভালো।'

'কিন্তু শেষ এখনও হয়নি।'

'হয়নি?'

মিষ্টার আবেল তার থলে খুললো।' 'আপনি তো নিজেই বলেছেন, আপনি ঐ ঘটনায় সাহায্যকারী ছিলেন। খুনের পরিকল্পনায় আপনি মদৎ দিয়েছেন। আর সেই জন্যেই—সে একটা বড় ছুরি আর একটা ছোট হাত-দা বের করলো।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, মিষ্টার কেইন কেঁপে উঠলেন। 'এ করে তুমি পার পাবে না।'

'আপনিই তো বলেছেন এ ঘরটা বলতে গেলে শব্দরোধী। কেউই আপনার চিৎকার শুনতে পাবে না, বিশেষ করে যদি প্রথমে আপনাকে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে নিই।' দরজা আড়াল করে দাঁড়ালো আবেল এবং

দা-টা পরীক্ষামূলকভাবে হাওয়ায় ঘোরালো। বেশ পছন্দসই হাওয়া কাটার একটা সুইশ শব্দ হলো।

'কিন্তু দোহাই তোমার, আমার কথা শোনো—আমি মারা যাবো বলে বলছি না, তোমার মাস্টারমশাই হিসেবে বলছি, তোমার চেয়ে অভিজ্ঞতা বেশী বলেই বলছি। যে খুনের কায়দা তোমাকে আমি শিখিয়েছি আমার ক্ষেত্রে তা খাটবে না।'

'কেন খাটবে না? গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানার তো যথেষ্ট সময় আমার আছে। জানেন, আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছি? আমার হাতে দু সপ্তার ছুটি আছে, এক সপ্তাহ নয়।'

'তা হলেও তুমি ধরা পড়ে যাবে। কোথাও কেউ নিশ্চয়ই জানে, তুমি আমার কাছে রোজ রাতে আসতে। আর আমাকে এখান না দেখতে পেলেই—'

'আপনি তো এখানে থেকে কোথাও যাচ্ছেন না। অন্তত বরাবরের জন্যে তো নয়ই। লোকে যদ্দূর জানবে তা হলো আপনি এক সপ্তার ছুটিতে যাচ্ছেন। এখান থেকে উধাও যে হচ্ছে, সে হলো আমি নিজে।'

'কোথায়?'

'এইখানে, এই বইয়ের দোকানে। আপনার মতো রঙ করা চুল, কুঁজো হয়ে চলা, সরু গোঁফ এবং চশমার আড়ালে আমি উধাও হয়ে যাব।'

'তুমি আমার জায়গা নেবে? বরাবরের জন্যে?'

'তাতে অসুবিধেটা কোথায়? আপনার গলার স্বর ও হাতের লেখা পড়ে নকল করে নিতে পারবো। আপনার কায়দা-কানুন থাকতে থাকতে ধরে নেবো। সেই সঙ্গে আপনার নতুন মক্কেলদেরও, কি বলেন। আপনাকে মানতেই হবে, এ রকম পরিকল্পনা যার মাথায় আসে তার মাস্টার হওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। তাছাড়া, এক্ষুনি যেটা করে দেখবো, আপনার চেয়ে একটা সুবিধে আমার বেশী আছে—রক্ত দেখে আমি মোটেই ভয় পাই না।'

'সে ভয় তুমি পাবে না—কারণ তুমি সত্যি একটা মানসিক-খুনী।'

'সব খুনীকেই তাই হতে হয়। আর সব মাস্টারদেরও।'

'কিন্তু—'

হাত দা-টা তাঁর উত্তরকে সংক্ষেপ করে দিলো।

বড়ই দুঃখের কথা যে মিস্টার আবেলের প্রাক্তন শিক্ষক ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ছাত্রের পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপের কাজ দেখে গর্ব অনুভব করতে পারলেন না। যেহেতু পরিকল্পনার একটা অংশ মিষ্টার আবেলের মিষ্টার কেইনে পরিণত হওয়া, সে মিষ্টার কেইনের যাবতীয় আদব-কায়দা রপ্ত করে নিলো, এমনকি নিকৃষ্ট শ্লেষ অলঙ্কার প্রয়োগের রুচিটাও বাদ দিলো না। ডাকে দেবার জন্য তৈরী প্রত্যেক কটা প্যাকেটের ভেতর সে একটা করে বিশেষ বইয়ের মোড়ক ঢুকিয়ে দিলো। তার পছন্দ করা বইগুলোর মধ্যে ছিলো, 'দিঅ্যানাটমি অফ মেলাঙ্কলি, 'দি নেকেড অ্যান্ড দি ডেড', আর 'দি হার্ট অফ দি ম্যাটার'। হাত-পা বিহীন ধড়টুকুর জন্য, স্বাভাবিক ভাবেই, সে বেছে নিল, 'এ ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস'।

এতে যে ঝুঁকি আছে তা সে বেশ বুঝতে পেরেছে, কিন্তু মানসিক খুনীদেরও একটু-আধটু নিরীহ ঠাট্টা করবার অধিকার আছে। বিশেষ করে সে যখন চায়, যেমন নতুন মিষ্টার কেইন চাইছেন, তার বাকী কাজ সযত্নে শান্তভাবে শেষ করতে এবং ফিরে এসে নীরস শিক্ষকতার জীবন নিয়ে বসবাস করতে।

আর সেই ভাবেই, কাজ শেষ হলো। কাজ শেষ করে সে ফিরে এল বিয়ের দোকানে এবং চুলে রঙ মেখে চশমার পেছনে আত্মগোপন করলো। কিন্তু দিনের মধ্যেই জীবিকা-নির্বাহের ধরণ সে রপ্ত করলো। এবং আরও কিছু দিন পরে, নতুন ছাত্র আসতে শুরু করলো। পুরোনো বইয়ের দোকানটা তার ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগল।

প্রত্যেক বড় শহরের ছোট ছোট রাস্তায় এগুলো দেখতে পাবেন, এবং কখনো কখনো ভেবে অবাক লাগবে, এদের মালিকের কি ভাবে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হয়...



উপন্যাস

হাতের মুঠোয় পৃথিবী

জেমস হেডলি চেজ



এক

ওরা চারজন—

তাস খেলার গোল টেবিলটাকে ঘিরে বসে আছে ওরা চারজন।

টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে ‘পোকার’ খেলার প্লাস্টিকের চাকতি। দুটো অ্যাশট্রে। পোড়া সিগারেটের টুকরোয় ঠাসা। এক বোতল হুইস্কি; আর তার পাশে চারটে শূন্য কাচের গেলাস।

ঘরটা আলো-আঁধারিতে ঢাকা। শুধু মাথার ওপরে ঝোলানো একটা শেড দেওয়া আলো টেবিলের একটা বৃত্তাকার অংশকে সবুজ আলোয় আলোকিত করে তুলছে। সিগারেটের সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী সেই সবুজাভ আলোর বৃত্ত ছাড়িয়ে ভেসে চলেছে অন্ধকারের উদ্দেশ্যে।

চারজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দশাসই চেহারার লোকটা তার হাতের চারটে তাস টেবিলে চিৎ করে নামিয়ে রাখল। তারপর চেয়ারে গা এলিয়ে ভাবলেশহীন মুখে অন্য তিনজনের দিকে তাকাল। তার ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা চঞ্চল হয়ে উঠল টেবিলের ওপর। আঙুলের টোকায় সৃষ্টি হল এক বিচিত্র ছন্দোময় শব্দের।

অন্য তিনজন কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসে রইল। তিনজোড়া চোখই টেবিলে পড়ে থাকা চারটে সাহেবের দিকে নিবদ্ধ। অবশেষে বিরক্তিভরে তারা নিজেদের তাসগুলো টেবিলে ছুড়ে ফেলল।

ফ্ল্যাঙ্ক মরগ্যানের চঞ্চল, শীতল চোখের তারা হয়ে উঠল আরও চঞ্চল। পাতলা ঠোঁটে ফুটে উঠল বিজয়ীর হাসি; সে হাসি বুঝি ধূর্ত নেকড়ের হাসির সঙ্গেই তুলনীয়।

‘জিপো, আরও একবার তাহলে আমার কাছে তোমাদের হারতে হল?’ তার বিপরীত দিকে বসে থাকা জিশেপ ম্যানডিনির দিকে তাকিয়ে কৌতুক ভরে প্রশ্ন করল মরগ্যান।

জিশেপ ম্যানডিনির কালো কোঁকড়ানো চুলে রগের কাছে সামান্য পাক ধরেছে। ছোট তীক্ষ্ণ নাক। গায়ের রঙ বাদামি। মরগ্যানের কথায় সে ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি বের করে বিষণ্ণভাবে হাসল। তারপর

অস্বাভাবিক স্থূলকায় শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে তার প্লাস্টিকের চাকতিগুলো ঠেলে দিল মরগ্যানের দিকে, 'আমি আর নেই, ফ্রাঙ্ক। আজ আমার ভাগ্য-টাগ্য সব খরচের খাতায় জমা পড়ে গেছে। শালা, সন্ধে থেকে একটা নওলার বেশি কোনও তাস পেলাম না।'

এডওয়ার্ড ব্লেক মরগ্যানের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিজের চাকতিগুলোর দিকে তাকাল; আলতো করে আঙুল চালাল সাজানো চাকতির স্তূপে। তারপর চারটে চাকতি টোকা মেরে এগিয়ে দিল মরগ্যানের দিকে। তার মুখ ভাবলেশহীন, নির্বিকার।

এডওয়ার্ড ব্লেক লম্বা, সুদর্শন। সূর্যস্নাত দেহের রঙ ঈষৎ বাদামি। তার সৌন্দর্যের আতিশয্য মহিলাদের কাছে আকর্ষণীয় হলেও পুরুষের মনে জাগিয়ে তোলে সতর্কতার সংকেত। ব্লেকের পরনে নিভাঁজ রঙের স্যুট। গাঢ় সবুজ টাইয়ের ওপর আঁকা সোয়ালো পাখির ছবি।

উপস্থিত চারজনের মধ্যে তার বেশবাসই একমাত্র চোখে পড়ার মতো।

চারজনের চতুর্থজন কিটসন—আলেক্স কিটসন। বয়েস বছর তেইশ হবে। শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ চেহারা। কঠিন চৌকো চোয়াল। ভাঙা গালের হনু দুটো সামান্য উঁচু। নাকটা পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধাদের মতোই চ্যাপ্টা। কালো চোখের তারায় সতর্ক ভাব। মোটের ওপর তেইশ বছরের সরলতা তার মুখ থেকে একেবারে মিলিয়ে গেছে।

কিটসনের পরনে একটা বুক-খোলা শার্ট এবং সস্তা দামের মোটা সুতির প্যান্ট। সে তার অবশিষ্ট চাকতিগুলো মরগ্যানের দিকে ঠেলে দিয়ে মুখভঙ্গি করল, 'আমিও আর নেই। ভেবেছিলাম এ দানটা জিতে যাব। শালা, চারটে বিবি পড়েছিল, কিন্তু...' কথা শেষ না করেই মাঝপথে থেমে গেল কিটসন। হঠাৎই তার নজরে পড়ল ব্লেক এবং জিপো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মরগ্যানকে লক্ষ করছে। কিটসন কথা ওদের কানেও ঢুকছে না।

জিপো, ব্লেক এবং কিটসনের এগিয়ে দেওয়া চাকতিগুলোকে মরগ্যান ততক্ষণে তিনটে ভাগে সাজিয়ে ফেলেছে। তার পাতলা ঠোঁটের কোনা থেকে অবহেলাভাবে ঝুলে রয়েছে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ অন্য তিনজন পরিষ্কার শুনতে পেল।

নিজের খুশিমতো চাকতিগুলোকে সাজানো হয়ে গেলে মরগ্যান চোখ তুলে তাকাল। তার সাপের মতো কালো, শীতল চোখজোড়া প্রত্যেকের মুখে খেলে বেড়াতে লাগল।

ব্লেক আর সইতে পারল না। অবৈধভাবে বলে উঠল, ফ্র্যাঙ্ক, তোমার মতলবটা কী খুলে বলো তো? সেই সন্ধে থেকে দেখছি কিছু একটা বলার জন্যে তুমি উসখুস করছ!'

মরগ্যান কোনও জবাব না দিয়ে টেবিলের ওপর টোকা মেরে বাজিয়ে চলল বাজনার ছন্দ। তারপর হঠাৎই একসময় প্রশ্ন করল, 'দু-লাখ ডলার করে পেলে তোমরা নিতে রাজি আছ?'

ওরা তিনজনেই চমকে উঠল। কঠিন হল ওদের মুখভাব। কারণ মরগ্যানকে ওরা চেনে। ওরা নিশ্চিতভাবে জানে, এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে মরগ্যান কখনও ঠাট্টা করছে না—কখনও করেওনি।

আগ্রহে অবিশ্বাসে সামনের দিকে ঝুঁকে এল জিপো। চাপা স্বরে প্রশ্ন করল, 'কী বললে?'

'দু-লাখ ডলার করে প্রত্যেকে।' শেষ শব্দটার ওপর অযথাই জোর দিল মরগ্যান, 'টাকাটা বলতে গেলে সাজানো রয়েছে নাকের ডগায়, কিন্তু কাজটায় প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে।'

ব্লেক নিঃশব্দে পকেট থেকে বের করে আনল এক প্যাকেট সিগারেট। আঙুলের স্বচ্ছন্দ টোকায় একটা সিগারেট বের করে চোখ তুলে তাকাল মরগ্যানের দিকে। নিষ্প্রাণ স্বরে প্রশ্ন করল, 'তার মানে, মোট টাকার পরিমাণ আট লক্ষ ডলার?'

'না, দশ লাখ। এবং সে টাকাটা ভাগ হবে পাঁচ ভাগে ... অর্থাৎ তোমরা যদি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গী হও।'

'পাঁচ-ভাগে!...তা পঞ্চম ব্যক্তিটি কে? তীক্ষ্ণস্বরে জানতে চাইল ব্লেক।

‘সে কথায় আমরা পরে আসছি।’ কথা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মরগ্যান। তার ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল সুপ্ত উত্তেজনায় টলমল। দু-হাতের লোমশ থাবায় সে টেবিলে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল, ‘এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সুযোগ, এড—যদিও কাজটা নেহাত সোজা নয়। কিন্তু ভেবে দ্যাখো ওই দশ লাখ ডলারের কথা; যে টাকা আমরা পরম নিশ্চিন্তে পকেটে রেখে ঘুরতে পারব, যে টাকায় নেই কোনও বিপদের সম্ভাবনা! কারণ দশ ডলারের চেয়ে বড় নোট ওতে নেই। ...তবে একটা বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত থেকো; কাজটা কিন্তু সত্যিই কঠিন।

‘দশ-লক্ষ-ডলার!’ জিপো অবাক বিস্ময়ে তখন মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে, ‘অসম্ভব! গোটা পৃথিবী চষলেও অত টাকা পাওয়া সম্ভব নয়।’

মরগ্যান হাসল; ক্ষুধার্ত হায়েনার হাসি, ‘বললাম তো, এই আমাদের সবচেয়ে বড় দাঁও মারার সুযোগ। দু-লক্ষ ডলার করে পেলে এই পৃথিবী থাকবে আমাদের হাতের মুঠোয়।’

‘ফ্র্যাঙ্ক, তুমি কি রকেট রিসার্চ স্টেশনের সাপ্তাহিক মাইনের কথা বলছ?’ আচমকা প্রশ্ন করল ব্লেক।

মরগ্যান বসল। মুখে বিজ্ঞের হাসি। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ব্লেকের কথায়, ‘তোমার বুদ্ধি আছে ,এড। হ্যাঁ ...আমি ওই টাকার কথাই বলছি। তুমি তো জানো, রকেট রিসার্চ স্টেশনের মাইনের টাকায় দশ ডলারের চেয়ে বড় কোনও নোট থাকে না; অথচ মোট টাকার পরিমাণ দশ লক্ষ ডলার! কেমন, রাজি!

কথা শেষ করে মরগ্যান কিটসনের দিকে তাকাল। কিটসনের দু-চোখের তারায় হতচকিত, শূন্য দৃষ্টি।

‘কী হল, আলেক্স, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে!’

আলেক্স কিটসনের বলিষ্ঠ আঙুল উত্তেজনায় হাওয়া আঁকড়ে ধরল, ‘তুমি কি পাগল হয়েছ, ফ্র্যাঙ্ক! আর যাই করি, এ কাজে আমরা নামছি না। নেহাত বুদ্ধিভ্রংশ না হলে এ ধরনের কথাও কেউ চিন্তা করতে পারে না!’

মরগ্যান হাসল; সে হাসি ছোটদের নির্বুদ্ধিতায় বয়স্ক অভিভাবকের করুণার হাসি। তার চোখ কিটসনের মুখ থেকে পিছলে গেল ব্লেকের চোখে। এ কাজে ব্লেকের যদি সম্মতি থাকে তাহলে বুঝতে হবে কাজটা একেবারে অসম্ভব নয়। কারণ বুদ্ধি-সুদ্ধি বলতে যা কিছু, তা এদের মধ্যে একমাত্র ব্লেকেরই আছে। কিটসন ছেলেটা সাহসী বটে, কিন্তু ঘুঁষি আর গাড়ি ছোটানো ছাড়া ওর মাথায় আর কিছু ঢোকে না। অথচ এ কাজে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বুদ্ধির। সুতরাং মরগ্যান প্রশ্ন করল ব্লেককেই, ‘তুমি কী বলো’ এড? কাজটা করা কি আমাদের পক্ষে অনুচিত হবে?’

মাথা ঝুঁকিয়ে সিগারেট ধরাল ব্লেক। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল মরগ্যানের দিকে, ‘টাকার ওজন যতই হোক না কেন, এ ধরনের কাজে অন্তত আমি হাত দিতাম না, ফ্র্যাঙ্ক। কিন্তু তোমার যদি কোনও প্ল্যান থেকে থাকে, তাহলে আমি সানন্দে শুনতে রাজি আছি।’

এই হচ্ছে এডওয়ার্ড ব্লেক। সমস্ত ঘটনা না জেনে সম্ভব-অসম্ভব কোনওরকম মতামতই প্রকাশ করতে রাজি নয়।

জিপো তার স্থূলকায় শরীরটাকে টান টান করে সোজা হয়ে বসল। কিটসনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল মরগ্যানের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে অনিশ্চয়তার ছায়া। অস্বস্তিভরে সে প্রশ্ন করল, ‘কাজটার মধ্যে গণ্ডগোলটা কোথায়?’

মরগ্যান সে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়েই হাত দুলিয়ে দেখাল কিটসনের দিকে, ‘তুমিই বলো, আলেক্স। তোমারই তো জানার কথা! তুমি কিছুদিন চাকরিও তো করেছিলে ওদের ওখানে—।’

‘হ্যাঁ, করেছিলাম, ‘নিস্পৃহস্বরে বলল কিটসন, ‘সুতরাং আমি জানি—এবং ভালোভাবেই জানি গণ্ডগোলটা কোথায়। মাসের পর মাস প্রত্যেকেই এই রকেট রিসার্চ স্টেশনের টাকাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছে। কেন জানো? কারণ তারা সকলেই সুস্থ মাথার বুদ্ধিমান লোক; আমাদের মতো বোকা আর পাগল নয়।’ কিটসন

আলতো করে একেবারে চোখ বুলিয়ে নিল তিনজন শ্রোতার ওপর । কয়েকজন বয়স্ক লোকের সামনে এভাবে কথা বলতে তার অস্বস্তি লাগছিল; কিন্তু সে নিরুপায়। এই কাজটায় যে কতখানি বিপদের সম্ভবনা, সেটা কিটসন ওদের বেশ ভালো করেই সমঝে দেবে।

'না, আমি ঠাট্টা করছি না । ফ্র্যাঙ্ক জানে, 'ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সির'র প্রতিটি ভাঁজে লুকিয়ে রয়েছে বিপদের অশুভ সংকেত। আমাদের নিয়তির করাল ইঙ্গিত।'

জিপো গালে হাত ঘষল। তারপর ভুরু উঁচিয়ে তাকাল মরগ্যানের দিকে, 'তুমি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কিছু একটা ভেবেছ, ফ্র্যাঙ্ক?'

মরগ্যান জিপোর কথা কানেই তুলল না। স্থিরচোখে চেয়ে রইল কিটসনের দিকে, 'থামলে কেন, আলেক্স? বলে যাও—ওদের জানিয়ে দাও এ কাজে কতটা ঝুঁকি আছে?'

কিটসন নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে মরগ্যানের সামনের থেকে তুলে নিল একটা পোকারের চাকতি। মনোযোগ সহকারে সেটাকে দু-আঙুলে ঘোরাতে লাগল। মুখমণ্ডলে দ্বিধার ছায়া।

'আমি ওই এজেন্সির চাকরি যখন ছেড়ে দিই, সেই সময়ে ওরা একটা নতুন ধরনের ট্রাক আমদানি করে।' হঠাৎই মুখ খুলল কিটসন, 'তার আগে ওরা যে ট্রাকটা ব্যবহার করত, নতুন ট্রাকটার তুলনায় সেটাকে একটা রদ্দি টিনের বাক্স বললেও বেশি বলা হয় না। আর যাতে থাকত সশস্ত্র চারজন রক্ষী। তারা তীক্ষ্ণ নজর রাখত টাকার বাক্সর দিকে।...কিন্তু এই নতুন ট্রাকের মজাটা কী জানো?' মুচকি হাসল কিটসন। সে হাসিতে বুঝি সামান্য ব্যঙ্গের ছোঁয়া, কোনও সশস্ত্র রক্ষীর প্রয়োজন এ ট্রাকে নেই। তার ওপর ওয়েলিং কোম্পানি এই ট্রাকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে এতই নিশ্চিন্ত যে টাকাটাকে আগের মতো ইনসিওর করার কথাও ওরা আর ভাবে না।'

'তাহলে ট্রাকটার কিছু বিশেষত্ব আছে, কী বলো?' মরগ্যান জানতে চাইল।

কিটসন আলগোছে আঙুল চালাল চুলের ফাঁকে। কিছুটা অস্বস্তি হলেও সে মরগ্যানের কাছে প্রমাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কাজটা তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। মরগ্যানের সান্নিধ্যে এতদিন কাটিয়ে কিটসন তাকে বিশ্বাস করতে শিখেছে । পেরেছে মরগ্যানের কথায় ভরসা করতে। কিন্তু তবুও এ কাজে সে মন থেকে মরগ্যানকে সায় দিতে পারছে না।

মরগ্যান, ব্লেক, জিপো, কিটসন—ওরা চারজন জোট বেঁধেছে গত ছ-মাস আগে; এবং এর মধ্যেই ছোটখাটো বেশ কয়েকটা কাজ নির্বিঘ্নে গুছিয়ে নিয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওদের সাহস জুগিয়েছে দলনেতা মরগ্যানের ক্ষুরধার, নিখুঁত পরিকল্পনা। না, দু-লাখ ডলারকে কিটসন কখনই পায়ে ঠেলবে না ...তবে এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ওই টাকা লুট করার কথা চিন্তা করাই একরকম বোকামি। মরগ্যান বলছে বটে কাজটা তেমন কঠিন নয়, কিন্তু কিটসন নিশ্চিত, মরগ্যান ভুল করছে, এতবড় ভুল সে বোধহয় সারা জীবনেও করেনি? টাকার অঙ্ক শুনে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছে ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান। নইলে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এ ধরনের প্রস্তাব কখনই সে করত না।

'কী হল ছোকরা—থামলে কেন?' ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করল মরগ্যান। দু-চোখের তারায় পলকের জন্যে ঝিলিক মারল উপহাসের হাসি।

কিটসন বুক ভরে শ্বাস নিল। মনস্থির করে আবার বলতে শুরু করল, 'দশলাখ ডলার তো দূরের কথা, তুমি ওই ট্রাকের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না, ফ্র্যাঙ্ক।' কিটসনের স্বর কেঁপে উঠল দৃঢ়তায়, 'একটা নতুন ধরনের শঙ্কর ধাতুর চাদর দিয়ে তৈরি ওই ট্রাকটা। বাইরে থেকে সেই ধাতব দেওয়াল কেটে ভেতরে ঢোকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। হয়তো অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করলে সে দেওয়ালকে গলানো যেতে পারে, কিন্তু তাতেও সময় লাগবে কম করে এক সপ্তাহ। দ্বিতীয়ত, ট্রাকটার দরজায় লাগানো আছে, একটা সময়-নির্ভর তালা। ট্রাকে টাকা বোঝাই করার পর ওরা দরজায় তালা দিয়ে দেয়। তুমি তো জানো, এজেন্সি থেকে রিসার্চ

স্টেশনে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা। সুতরাং সেই সময়-নির্ভর তালাকে এমন যান্ত্রিক উপায়ে বন্ধ করা হয়, যাতে চার ঘণ্টার জন্যে সেই তালা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ অকেজো। কেবলমাত্র চার ঘণ্টা পরেই খোলা যাবে সেই অদ্ভুত তালাকে। বুঝতেই পারছ, ড্রাইভারের সুবিধের জন্যেই এক ঘণ্টা সময় বেশি দেওয়া হয়।'

পোকারের চাকতিটা টেবিলে নামিয়ে রাখল কিটসন। চোখ বুলিয়ে নিল উৎকণ্ঠিত ব্লেক ও জিপোর মুখে। অসীম আগ্রহে ওরা দুজনেই ঝুঁকে পড়েছে টেবিলের ওপর। মুখের প্রতিটি পেশি টান-টান। 'এছাড়া ট্রাকের ড্যাশবোর্ডে রয়েছে একটা বিশেষ বোতাম, যার সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে ওই বিশেষ তালার। কোনও বিপদের সামান্যতম আভাস পেলেই ড্রাইভারের কাজ হল ওই বোতামটি টিপে দেওয়া, এবং তাহলেই চিত্তিরি!'

"তার মানে?' মরগ্যান কপট কৌতূহলে জানতে চাইল।

'অর্থাৎ ওই সময়-নির্ভর তালা চিরতরে বন্ধ হয়েই থাকবে। চার ঘণ্টা কেন, চার বছর অপেক্ষা করলেও সে তালা আর খুলবে না। হ্যাঁ, উপায় একটা আছে—তবে সে কাজ কোনও যে সে লোকের নয়। একজন রীতিমতো দক্ষ কারিগরের পক্ষেই সে তালা আবার খোলা সম্ভব!' কিটসন সিগারেট ধরিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল? হাত নেড়ে ব্যাপারটা সকলকে বোঝাতে চাইল, 'শুধু এই নয়, আরও আছে। এতসব বন্দোবস্ত সত্ত্বেও সব সময় ওদের সঙ্গে থাকে একটা শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার। এজেন্সি থেকে ট্রাক বেরোনো মাত্রই ট্রাক ড্রাইভার ও এজেন্সির সঙ্গে চলে ট্রান্সমিটারের মাধ্যম কথাবার্তা। আর সেই যোগাযোগ বন্ধ হয় একেবারে রিসার্চ স্টেশনে ট্রাক পৌঁছনোর পর। কিটসন চোখ না তুলেও বুঝতে পারল মরগ্যান তার দিকে চেয়ে বিদ্রুপের হাসি হাসছে। কিছুটা অপমানিত ও উত্তেজিত হয়ে সে জিপোর দিকে আঙুল উঁচিয়ে ধরল, শোনো জিপো, মনে করো কোনও গর্দভ এই ট্রাকটা লুট করতে চায়। তারপর মনে করো সেই অতিবুদ্ধিমান ব্যক্তিটি রাস্তা আটকে যে করে হোক ট্রাকটাকে থামাল। তারপর?... তখন ড্রাইভার ও রক্ষী এজেন্সির নির্দেশমতো ওদের কর্তব্য করে যাবে। প্রথমেই ড্রাইভার বোতাম টিপে সময়-নির্ভর তালাটার বারোটা বাজিয়ে দেবে, আর একই সঙ্গে ড্রাইভারের সঙ্গী টিপে দেবে আরও একটা বোতাম, যার ফলে ট্রাকের জানলা, দরজা, উইন্ডশিল্ড—সব ঢাকা পড়ে যাবে দুর্ভেদ্য ইস্পাতের চাদরে। অর্থাৎ ট্রাকটা হয়ে দাঁড়াবে একটা অভেদ্য ধাতব বাক্স—যা কোনও মানুষের পক্ষেই খোলা সম্ভব নয়। এরপরও বাকি থাকবে আর একটা বোতাম। ওটা টিপলে ওদের শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার প্রচার করে যাবে এক অদৃশ্য সংকেত, যার কোনও বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই। তখন পুলিশের যে কোনও ওয়্যারলেস ভ্যানই ট্রাকটাকে খুঁজে বের করতে পারবে। মোটের ওপর ড্রাইভার ও তার রক্ষীর কাজ হচ্ছে সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ওই তিনটে বোতাম টিপে নিজেদের জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা—এবং পুলিশের অপেক্ষা করা।' টোকা মেরে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল কিটসন। স্নায়বিক উত্তেজনায় তার কপালে ঘামের ফোঁটা, কাঁপছে হাতের আঙুল, 'সুতরাং বুঝতেই পারছ, এ ধরনের ট্রাক থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। তা টাকার পরিমাণ যাই হোক না কেন, ইলেকট্রিক চেয়ারে যাবার ইচ্ছে আমার নেই, তোমাদের আছে কি না জানি না।'

জিপোর মুখে নেমে এল হতাশার কালো মেঘ। মুখ ব্যাজার করে সে ঘাড় চুলকোতে লাগল। ব্লেক এক প্যাকেট তাস নিয়ে আনমনাভাবেই ভেঁজে চলল; কিন্তু তার স্বচ্ছ চোখের তারা মরগ্যানের চোখে নিবদ্ধ।

'আচ্ছা, ড্রাইভার আর রক্ষীটাকে কোনওরকমে কায়দা করা যায় না?' মরগ্যান প্রশ্ন করল কিটসনকে।

কিটসন জোরালোভাবে হাত নাড়ল, 'কায়দা?! ওদের সঙ্গে? তুমি কি পাগল হয়েছ, ফ্র্যাঙ্ক? কে তোমাকে বলেছে যে ওদের কায়দা করার ব্যাপারটা এতই সহজ?'

মরগ্যানের চোখজোড়া হঠাৎই ঝলসে উঠল কুৎসিত ক্রোধে, 'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি, আলেক্স—জ্ঞান দিতে বলিনি। আমি পাগল হয়েছি কি না সেটা আমি বুঝব। বেশি মুখ না ছুটিয়ে কথার জবাব দাও।'

মরগ্যানকে চটতে দেখে তড়িঘড়ি বলে উঠল ব্লেক, ‘রাগ কোরো না, ফ্র্যাঙ্ক। ছোকরার কোনও দোষ নেই। ও যতটুকু জানে সেইটুকুই বলছে। তাই বলে ওর চিন্তাধারার সঙ্গে যে আমাদের মিল থাকতে হবে, তার কী মানে আছে?’

মরগ্যান সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল, ‘ ঠিক আছে এড, আগে আলেক্সের কথাই তাহলে শেষ হোক।’ তারপর কিটসনের দিকে ফিরে তাকাল মরগ্যান, ‘বল হে ছোকরা, ওই ড্রাইভার আর প্রহরীকে কাবু করতে অসুবিধেটা কোথায়?’

আলেক্স কিটসন ততক্ষণ ঘামতে শুরু করেছে। ঘামের ছোট ছোট ফোঁটাগুলো তার থ্যাবড়া নাকে চকচক করছে।

‘আমি একসময় ওদের সঙ্গে কাজ করেছি।’ কঠিন চোখে মরগ্যানের দিকে চেয়ে বলতে শুরু করল কিটসন, ‘ওদের আমি ভালোমতোই চিনি। ড্রাইভারের নাম ডেভ টমাস, আর বন্দুকবাজ প্রহরীর নাম মাইক ডার্কসন। ওরা দুজনেই রিভলভার চালাতে ওস্তাদ, এবং বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ ওদের চোখের নজর। এ ছাড়া, ওই ট্রাকলুটের যে কোনও পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে পারলেই ওরা প্রত্যেকে পাবে দু-হাজার ডলার করে পুরস্কার। ওরা জানে, কারও পক্ষেই ট্রাকের তালা ভেঙে ওই দশ লাখ ডলার হাতানো সম্ভব নয়; সুতরাং ওরা যে টাকার লোভে আমাদের দলে যোগ দেবে, সেরকম চান্সও কম। মানে টমাস ও মাইক ডার্কসন আমাদের পক্ষে এক শক্ত বাধা। ওদের সঙ্গে মোকাবিলা হলেই তোমরা সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে।’

কিটসনকে বাধা দিয়ে জিপো হঠাৎ বলে উঠল, ‘ওরে বাবা, এত ঝামেলা থাকলে ও টাকায় আমার কোনও প্রয়োজন নেই। মানছি দু লাখ ডলার অ-নে-ক টাকা, কিন্তু সে টাকায় ফুর্তি করার জন্যে যদি বেঁচেই না থাকি, তবে দু-ডলার আর দু-লাখ ডলারে তফাতটা রইল কী?’

জিপোর কথায় হেসে ফেলল মরগ্যান।

জিপোর যথেষ্ট গুণ আছে। কিন্তু সাহস আর বুদ্ধির ব্যাপারে সে আর সকলের চেয়েই পিছিয়ে। তাছাড়া যখন সে বোঝে, জয়ের কোনও সম্ভাবনাই নেই, তখন পরাজয়কে মেনে নিতে সে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু তালা খোলার ব্যাপারে জিপো পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। তার পেশাদার অভিজ্ঞ আঙুলের কাছে পরাজিত না হয়েছে এমন তালা পৃথিবীতে নেই। তবে এ পর্যন্ত যত তালা জিপো খুলছে, সবই নিজের খুশিমতো, ধীরে সুস্থে, ঠান্ডা মাথায়। কখনও তাড়াতাড়ি খোলার জন্যে চাপ দেওয়া হয়নি; সে যেমন ভালো বুঝেছে সেভাবেই খুলেছে। কিন্তু মরগ্যান জানে, এবারের কাজটায় জিপোকে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে কাজ করতে হবে। তাই মরগ্যান চিন্তিত। জিপো কি পারবে সফল হতে? অবশ্য ওকে বলে কয়ে রাজি করাবার ব্যাপারে মরগ্যান একটুও ভাবছে না। কারণ জিপো কখনওই তার কথা ফেলাতে পারবে না। কিন্তু তাতে লাভ হবে কতটুকু? যখন সময় আসবে জিপোর আসল অগ্নিপরীক্ষার, তখন কিছুই যাবে আসবে না। তখন যদি জিপো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তাহলে তাদের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে—মিলিয়ে যাবে করুণ হতাশায়।

চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, জিপো।’ মরগ্যান জিপোর কাঁধে হাত রেখে আশ্বাস দিল, ‘যেদিন থেকে আমরা চারজন এক হয়েছি, তোমাদের সমস্ত দায়িত্ব আমিই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি, তোমাদের জুতসই কাজের সন্ধান দিয়েছি, তোমাদের পরিচালনা করেছি—তাই তো?’

জিপো ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। কিটসন ও ব্লেক অপলকে মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে।

‘কাজগুলো খুব বড় ছিল না বটে, কিন্তু মোটামুটি তোমরা প্রত্যেকেই বেশ কিছু করে টাকা পেয়েছ। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, পুলিশের নজর আমাদের ওপর পড়বেই। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আমরা এইসব ছোটখাটো লুটপাট চালিয়ে যেতে পারি না। তাতে টাকাও আসবে কম, এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ার

চান্সও বেশি। সুতরাং আমার মনে হয়, একচোটে বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে যে যার রাস্তায় কেটে পড়াই ভালো। তাতে ভবিষ্যতে আর বিপদের মুখোমুখি হতে হবে না। দুলক্ষ ডলার নেহাত কম-টাকা নয়। বলতে গেলে, আমরা হব দুনিয়ার সম্রাট। আমি আবারও বলছি, এই কাজটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। এর পেছনে আমাদের প্রচুর মাথা খাটাতে হবে। আলেক্স মোটামুটি তোমাদের সবই বলেছে। ওর কথা মিথ্যে তা আমি বলছি না, কিন্তু একটা ব্যাপার ও একেবারে বাদ দিয়ে গেছে।' মরগ্যান একবার দেখল তিনজনকে। জিপো অস্বস্তিভরে উসখুস করছে। কিটসনের মুখে এখনও সেই একরোখা ছাপ। হয়তো কিছুটা আশঙ্কাও। ব্লেক নির্বিকার। কারণ একমাত্র গ্রহণযোগ্য যুক্তি পেলেই সে মরগ্যানের কথা মানতে রাজি।'

'যা বলেছিলাম আলেক্স এ কথা একবারও বলেনি যে ট্রাকটা গত পাঁচ মাস ধরে প্রতি সপ্তাহেই টাকা আনা-নেওয়া করছে। এবং প্রত্যেকেই ট্রাকটাকে দুর্ভেদ্য বলে মেনে নিয়েছে। যেমন, আমাদের আলেক্স কিটসন। ওর মতো আরও অনেকেরই ধারণা, ওই ট্রাকটাকে লুট করার চিন্তা পাগল হওয়ার পূর্বলক্ষণ। এ ধরনের কোনও বদ্ধমূল ধারণাকে নাছোড়বান্দার মতো আঁকড়ে বসে থাকা মানেই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নিজেকে অরক্ষিত করা। তারপর প্রয়োজন শুধু একটা ক্ষিপ্র রাইট হুক—ব্যস্! চতুর সুযোগসন্ধানী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নির্বোধ মুষ্টিযোদ্ধার শোচনীয় পরাজয়।'

মরগ্যান ইচ্ছে করেই কিটসনকে ঠেস দিয়ে উদাহরণ দিল এই মুষ্টিযুদ্ধের। কারণ জিপোর মতো কিটসনকেও তার নিজের দলে টানা দরকার। সে লক্ষ করল, কিটসনের মুখে চোখে ঝিলিক মারছে কৌতূহল। একরোখা ভাবটা আগের চেয়ে অনেকটা কমে এসেছে। মরগ্যান বুঝল, কিটসনকে রাজি করাতে হলে এই সুবর্ণসুযোগ। সুতরাং এক মুহূর্ত ও সময় নষ্ট না করে সে বলে চলল, 'আলেক্স তোমাদের যা যা বলেছে সবই আমি খবরের কাগজে মাসকয়েক আগে পড়েছি। ওয়েলিং কোম্পানি এই বিশেষ ট্রাকটা নিয়ে প্রচারের লোভটুকু পর্যন্ত সামলাতে পারেনি। অবশ্য নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার এমন সুযোগ কেউই ছাড়ে না। তাছাড়া ওরা ভাবছে, ওদের এই দুর্ভেদ্য ট্রাকের কথা খবরের কাগজে পড়ে অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানই তাদের টাকা পয়সা আনা নেওয়ার ব্যাপারে ওদের সাহায্য নেবে। যাকগে, যা বলছিলাম যেদিন থেকে ওই ট্রাকটার কথা আমি কাগজে পড়েছি, সেদিন থেকেই ওটাকে লুট করার চিন্তা আমার মাথায় ঘুরছে। আমাদের পক্ষে কাজটা মোটেও অসম্ভব নয়। তোমারা যদি সামান্য সাহস এবং দক্ষতা দেখাতে পার, তবে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য ওই ট্রাকটাকে কিভাবে বোকা বানাতে হয় তা এই শর্মা তোমাদের দেখিয়ে দেবে। ভুলে যেও না, তোমাদের সাফল্যের দাম দু-লক্ষ ডলার।

ব্লেক সিগারেটের টুকরোটাকে টেবিলে ঘষে নিভিয়ে ফেলল। এবং পরক্ষণেই অভ্যস্ত হাতে ধরিয়ে ফেলল আর একটি। তার চোখজোড়া মরগ্যানের মুখে স্থির। যেন মরগ্যানের অভিসন্ধি বুঝতে চাইছে।

'অর্থাৎ এই বক্তব্যের সপক্ষে তোমার কোনও জোরালো প্ল্যান আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।' মরগ্যান সিগারেট ধরিয়ে শ্রান্তভাবে ধোঁয়া ছাড়ল। আবছা সবুজাভ ধোঁয়া ভেসে চলল বিপরীত দিকে বসে থাকা জিপোর মুখের দিকে, 'মোটামুটি একটা পরিকল্পনা আমি ছকে রেখেছি। কিন্তু সেটাকে বার-বার যাচাই করে নিখুঁত করতে হবে। তাছাড়া আমার পরিকল্পনাটা নিয়ে ভাববার সময় পাব যথেষ্ট। কারণ এখন থেকে প্রতি সপ্তাহেই ট্রাকটা রকেট রিসার্চ স্টেশনের মাইনের টাকা নিয়ে যাবে। আর এইভাবে যত দিন যাবে, ওরা ততই নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অসাবধানী হয়ে পড়বে। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারলেই কাজ হাসিল!'

আর সহ্য করতে পারল না কিটসন। সামান্য ঝুঁকে পড়ে কর্কশস্বরে বলে উঠল, 'থামো ফ্র্যাঙ্ক! গাঁজায় দম দিয়ে আর উল্টো পালটা বোকো না! একটা বোতাম টিপতে কতটা সময় লাগবে জান? কোনও লোক যদি ঘুমিয়েও থাকে, তাহলে জেগে উঠে বোতাম টিপতে তার ন-সেকেন্ডের বেশি সময় লাগতে পারে না। অর্থাৎ তিনটে বোতাম টিপতে মাত্র ছ-সেকেন্ড—ব্যস! তারপর ট্রাকটা হয়ে দাঁড়াবে একটা ইস্পাতের চৌকা বাক্স,

আমাদের কফিনের শেষ পেরেক! তোমরা কি ধারণা মাত্র ছ-সেকেণ্ডের মধ্যেই ট্রাক থামিয়ে, দরজা খুলে টমাস আর ডার্কসনকে তুমি কাবু করতে পারবে? হুঁ ঃ উর্বর মস্তিষ্ক ছাড়া এ ধরনের দিবাস্বপ্ন দেখা অসম্ভব।'

'তোমার তাই মনে হয় বুঝি?' ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করল মরগ্যান।

'মনে হয়' নয়, আমি নিশ্চিতভাবে জানি বলেই বলছি। ট্রাক থামিয়ে তার দিকে এক পা-এগোনোর আগেই পুরো ট্রাকটা ঢাকা পড়ে যাবে ইস্পাতের চাদরে, সময় নির্ভর তালা হয়ে যাবে ওলট-পালট, ট্রান্সমিটারে শুরু হবে সাহায্য-প্রার্থী অবিরাম বিপদ সংকেত।'

'সত্যি বলছ আলেক্স?' কপট বিস্ময় ভুরু উঁচিয়ে জানতে চাইল মরগ্যান। কিটসনের ইচ্ছে হল সপাটে একখানা ঘুঁষি বসিয়ে দেয় মরগ্যানের নাকে।

'হ্যাঁ—সত্যি।' অতিকষ্টে রাগ চেপে চিৎকার করে উঠল কিটসন, 'তুমি যতই বল না কেন, এই অসম্ভব ব্যাপারকে বিশ্বাস করতে আমি কোনওরকমেই রাজি নই।

'অনেক হয়েছে, আলেক্স। জ্ঞানদানের কাজটা তুমি ভালোই পার দেখছি। তা, এখানে না এসে পাদ্রিগিরি করলেই পারতে।' ব্লেকের ব্যঙ্গের ছুরি যেন কেটে বসল কিটসনের গায়ে, 'আর ফ্র্যাঙ্কের চেয়ে নিজেকে যখন এত বেশি বুদ্ধিমান বলেই মনে করছ, তাহলে আজ থেকে তুমিই দলের ভার গ্রহণ করে আমাদের বাধিত করো!'

অপমানে কিটসনের মুখ লাল হয়ে উঠল। রাগতভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। গম্ভীরভাবে একবার ব্লেককে, আর একবার মরগ্যানকে দেখতে লাগল। অবশেষে সংক্ষিপ্তভাবে সে বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু আমি আবারও বলছি, কাজটা অসম্ভব।'

ব্লেক সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ধরল মরগ্যানের দিকে, 'এবারে ঝেড়ে কাশো ফ্র্যাঙ্ক।'

'গতকাল আমি এজেন্সি থেকে রিসার্চ স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিলাম।' বলতে শুরু করল মরগ্যান, 'গাড়ির মাইলমিটার অনুসারে দুটো জায়গার দূরত্ব ঠিক তিরানব্বই মাইল। তিরানব্বইয়ের মধ্যে সত্তর মাইল বড় রাস্তা, দশ মাইল সাধারণ রাস্তা, দশ মাইল একটা নির্জন কাঁচা সড়ক এবং শেষ তিন মাইল রিসার্চ স্টেশনের নিজস্ব রাস্তা: যে রাস্তা ধরে সোজাসুজি রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছনো যায়। আমি ট্রাকটাকে থামাবার জন্যে একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলাম। সুতরাং প্রথমেই বড় রাস্তা এবং দশ মাইল সাধারণ রাস্তাকে একেবারে বাদ দিতে হয়। কারণ ওই দুটো রাস্তায় লোকজন এবং যানবাহন বেশি। রকেট রিসার্চ স্টেশনের নিজস্ব রাস্তাটায় দিন রাত, সবসময় সশস্ত্র প্রহরা থাকে। সুতরাং হাতে রইল দশ মাইল লম্বা কাঁচা সড়কটুকু।' সিগারেটের ছাই ঝাড়ল মরগ্যান। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখল তিনজনকে। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'সাধারণ রাস্তা থেকে কাঁচা সড়ক ধরে চার মাইলটাক এগিয়ে গেলে পড়বে দশ নম্বর জাতীয় সড়কে যাবার একটা শর্টকাট রাস্তা। এই রাস্তাটাই রিসার্চ স্টেশন হয়ে দশ নম্বর বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। অনেক গাড়িই, যদিও তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, সময় কম লাগে বলে এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে। এই রাস্তাটা কাঁচা সড়কের মতো অতটা খারাপ নয়। কিন্তু রিসার্চ স্টেশনের মাইল দুয়েক আগে রাস্তাটার প্রস্থ প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। পাথর ছাড়াও জায়গাটা ছোট বড় নানান ঝোপে ছেয়ে আছে। অর্থাৎ লুকোনোর করার অথবা কোনও মোটর দুর্ঘটনার পক্ষে জায়গাটা একটা আদর্শ জায়গা।'

ব্লেক সমর্থন জানাল মরগ্যানের কথায়, 'ঠিক বলেছ, ফ্র্যাঙ্ক। একবার ওই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আমি শালা আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম আর কী! মোড় ঘোরবার সময় সামান্য অসর্তক হলেই খেল খতম?...এমন অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে এখানে ওখানে বিপদসূচক রোড-সাইন লাগানো হয়েছে।'

'হ্যাঁ, দেখেছি।' সম্মতি জানাল মরগ্যান, 'আচ্ছা, এবার ট্রাকে বসে থাকা টমাস এবং ডার্কসনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখা যাক।'এখনকার যা আবহাওয়া তাতে ওই বদ্ধ ট্রাকে গরম হবে অসহ্য। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে ওই একই রাস্তা ধরে যাতায়াত করার ফলে ওদের রাস্তার সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে গেছে।

এককথায় বিরক্তি, ক্লান্তি আর একঘেয়েমি ওদের ট্রাকভ্রমণের নিত্যসঙ্গী। মনে করো ওরা এসে পৌঁছল সেই বিপজ্জনক বাঁকের মুখে। এবার মোড় ঘুরেই ওরা দেখতে পাবে এক অভাবনীয় দৃশ্য। একটা গাড়ি পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে রাস্তার ধারে উলটে পড়ে আছে। বলা বাহুল্য গাড়ির অবস্থা শোচনীয়। আর রাস্তার ঠিক মাঝখানে ভেসে যাওয়া রক্তের সমুদ্রে পড়ে আছে একটি সুন্দরী যুবতী। তার সর্বাঙ্গ রক্তে ভেজা। জামাকাপড়ের অবস্থা তথৈবচ।' আচমকা ব্লেকের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে মরগ্যান। চাপা স্বরে হিসহিস করে বলে উঠল, 'এখন একটা কথা আমি জানতে চাই, এড। টমাস ও ডার্কসন এ অবস্থায় কী করবে? ওরা কি মেয়েটাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে, না নেমে দেখবে বেঁচে আছে কি না, বা কতখানি আহত হয়েছে?'

সাদা দাঁতের সারি বের করে শয়তানের হাসি হাসল ব্লেক। তাকাল কিটসনের দিকে, 'কী হে স্বামী জ্ঞানানন্দ, শুনছ তো? উর্বর মস্তিষ্কের দিবাস্বপ্ন—কী বল?'

'বলো, ওরা কী করবে?' মরগ্যানের প্রশ্নে কিটসন নড়েচড়ে বসল। তার রক্তিম মুখে পরাজয়ের ইঙ্গিত।

অগত্যা ব্লেকই উত্তর দিল, 'ওরা নামতে বাধ্য। সম্ভবত একজন নেমে মেয়েটাকে দেখতে যাবে, আর অন্যজন ট্রাকে বসেই ট্রান্সমিটারে সাহায্য চেয়ে পাঠাবে—অর্থাৎ কিটসনের কথা অনুযায়ী সত্যিই যদি ওরা অতটা সাবধানি চরিত্রের লোক হয়।'

মরগ্যান ফিরল কিটসনের দিকে, 'তোমার কী মনে হয়? কী করবে টমাস আর ডার্কসন?'

কিটসন বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। অবশেষে অনিচ্ছাভরে কাঁধ ঝাঁকাল, 'এড ঠিকই বলেছে। টমাস নিজের জায়গাতেই বসে থাকবে, আর ডার্কসন নেমে দেখতে যাবে পড়ে থাকা মেয়েটাকে। রাস্তার মাঝখান থেকে তাকে সরিয়ে ওরা ট্রান্সমিটারে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠাবে। তারপর ট্রাকে উঠে আবার চলতে শুরু করবে রিসার্চ স্টেশনের দিকে।'

'আমারও তাই ধারণা।' বলল মরগ্যান। এ ব্যাপারে জিপোর মতামত নেওয়ার কোনও প্রয়োজন সে অনুভব করল না। কারণ তালা বা সিন্দুক খোলার ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপারে জিপো সাধারণত কোনও মতামত প্রকাশ করে না। আর করলেও মরগ্যানের কাছে সে মতামতের মূল্য সামান্যই। সুতরাং সে বলে চলল, 'তাহলে অবস্থাটা মোটামুটি কী দাঁড়াচ্ছে? টমাস রইল গাড়ির ভেতরে, ডার্কসন রইল রাস্তায়। এবার আমার আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দাও, আলেক্স—'মরগ্যানের চোখ সরাসরি কিটসনের দিকে, 'টমাস কি এক্ষেত্রে ড্যাশবোর্ডের বোতাম টিপে সময় নির্ভর তালাকে অকেজো করে দেবে? নাকি ইস্পাতের আড়ালে ট্রাকটাকে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করবে?'

কিটসন পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল।

'সম্ভবত নয়।' ধীরস্বরে জবাব দিল সে।

মরগ্যান ঘুরে তাকাল ব্লেকের দিকে, 'তোমার কী মনে হয়, এড?'

'কক্ষনও টিপবে না!' দৃঢ়স্বরে বলে উঠল ব্লেক, 'কিটসনের কথা অনুযায়ী অকেজো সময়-নির্ভর তালাকে আবার ঠিক করতে একজন দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন। সুতরাং যতক্ষণ না টমাস বুঝতে পারছে যে ওরা বিপদে পড়েছে, ততক্ষণ সে কিছু করবে না। বরং খোলা জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে চেষ্টা করবে ডার্কসন কী করছে, বা মেয়েটা বেঁচে আছে কি না।'

মরগ্যান মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল, 'যাক, অবশেষে আমরা কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কারণ ট্রাকটাও থামানো গেছে, এবং টমাসও বোতাম টেপেনি। তাহলে আমরা দেখছি, আলেক্সের কথামতো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপারটাকে আমরা সম্পূর্ণ সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছি।' কিটসনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ধরল মরগ্যান, 'তুমি বলেছিলে, সবটাই আমার উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট দিবাস্বপ্ন! তাহলে এখন কী মনে হচ্ছে তোমার?'

‘এতে এত হাসাহাসি করার কী আছে বুঝতে পারছি না!’ রাগতস্বরে বলে উঠল কিটসন, ‘মামলায় তুমি জিতেছ, কিন্তু তাতে হয়েছেটা কী?’

মরগ্যান মুখ তুলে হালকা ধোঁয়া ছাড়ল। তাকে দেখে মনে হল, কিটসনের হতবুদ্ধি অবস্থাটা সে বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে।

‘তার মানে আমার বক্তব্য তুমি মেনে নিচ্ছ?’ হাসল মরগ্যান, ‘যাক, তাহলে ট্রাকটাকেও আমি থামিয়েছি, এবং ডার্কসনকেও গাড়ির বাইরে বের করেছি। আচ্ছা, এবার তোমরা ভাব সেই বিপজ্জনক বাঁকটার কথা। ট্রাকটাকে ঠিক ওই জায়গাতেই আমি থামাতে চাই। তার কারণ অবশ্য একটা আছে। তা হল, ওই জায়গাটা রাস্তার দু-পাশ ছেয়ে আছে ছোট বড় অসংখ্য বুনো ঝোপে। তার আড়ালে দু-তিনজন লোক অনায়াসেই লুকিয়ে থাকতে পারে। এবার ডার্কসন নিশ্চয়ই নেমে এগিয়ে যাবে পড়ে-থাকা মেয়েটার দিকে। এখন কথা হচ্ছে, টমাস কি জানলা বন্ধ করে দেবে? কী মনে হয় তোমার?’ প্রশ্নটা কিটসনকে লক্ষ করেই। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মাথা নাড়ল কিটসন, ‘এই গরমে জানলা বন্ধ করে তিরানব্বই মাইল ওরা পাড়ি দেবে বলে মনে হয় না।’

শুধু ‘মনে হয় না’ নয়, জানলা খোলা রাখতে ওরা বাধ্য। কারণ বাইরের চেয়ে ইস্পাতের তৈরি ট্রাকের ভেতরে গরম হবে আরও বেশি। অতএব ট্রাকটা থামছে রাস্তার ধারের ঝোপগুলোর কাছে, যার আড়ালে দুজনে লোক সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারে, ড্রাইভার উইন্ডশিল্ড দিয়ে তার সঙ্গীর কার্যকলাপ লক্ষ করছে এবং ডার্কসন এগিয়ে চলেছে পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে। ওরা দুজনের কেউই বিপদের আশঙ্কা করছে না; কারণ এই বিপজ্জনক বাঁকের কথা ওরা ভালোভাবেই জানে। জানে, যে গত ছ-মাসে এখানে পাঁচ-পাঁচটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। অতএব এই দুর্ঘটনাটাও ওদের কাছে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ট্রাক থেকে ফুটদশেক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকব আমি। ডার্কসন যেই পড়ে থাকা মেয়েটার ওপর ঝুঁকে পড়বে, আমি ঝোপের আড়াল ছেড়ে ট্রাকের জানলার কাছে গিয়ে ড্রাইভারের রগে একটা রিভলভার চেপে ধরব। এবং ওই একই সময়ে পড়ে থাকা মেয়েটা লাফিয়ে উঠে ডার্কসনের পেটে রিভালভার ঠেসে ধরবে।’ হাত বাড়িয়ে সিগারেটের ছোট টুকরোটা ছাইদানে গুঁজে দিল মরগ্যান, ‘এবার বলো, ডার্কসন এবং টমাস কী করবে? আত্মসমর্পণ করবে, না গুলি-ভরা রিভলভারের সামনেও ওরা বীরত্ব দেখাতে যাবে?’

‘যেতেও পারে, ওদের বিশ্বাস নেই।’ শান্তস্বরে জবাব দিল কিটসন, ‘টমাস এবং ডার্কসন বড় সাংঘাতিক লোক?’

‘হতে পারে সাংঘাতিক, কিন্তু পাগল তো আর নয়। খোলা রিভলভারের সামনে অহেতুক বীরত্ব দেখানোর নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এবং সেটা ওরা ভালোভাবেই জানে।’

কিছুক্ষণ কেটে গেল অখণ্ড জমাট নিস্তব্ধতায়। অবশেষে কাঁপাস্বরে বলে উঠল জিপো, ‘কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, এত সহজে যদি ওরা হার না মানে?’

মরগ্যান চোখ রাখল জিপোর চোখে। শয়তানি জিঘাংসায় পলকের জন্যে চকচক করে উঠল তার কালো চোখের তারা, ‘তাহলে ওদের দুঃখজনক ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমবেদনা জানানো ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই!...যেখানে আমরা প্রত্যেককে দু-লক্ষ ডলার করে টোপে গাঁথছি, সেখানে সামান্য একটু আধটু রক্তপাত কিস্যু নয়!’

আরও কিছুক্ষণ নিটোল নিস্তব্ধতা। অবশেষে জিপোই আমার মুখ খুলল, ‘ফ্র্যাঙ্ক এসব আমার ঠিক ভালো লাগছে না। আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত এ কাজটা হয়তো আমরা পেরে উঠব না।’

মরগ্যান অধৈর্যভাবে হাত নাড়ল, ‘ঘাবড়ে যেও না, জিপো, তোমাকে অকুস্থলে থাকতে হবে না। তোমার জন্যে আমি একটা বিশেষ কাজ ঠিক করে রেখেছি, এবং সে কাজ তোমার সামর্থ্যের বাইরে নয়। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।’

কিটসন ঝুঁকে এল টেবিলের ওপর 'আর আমি? ওসব খুনোখুনির ঝামেলায় জড়াতে আমি একেবারেই রাজি নই, সেটা কিন্তু তোমাকে আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি!'

মরগ্যান ফিরল ব্লেকের দিকে। সে তখন মাথা নিচু করে একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত।

'তোমরা বক্তব্য কী, এড? দু-দুজন বীরপুরুষের কথা তো শুনলাম, এবার তোমারটা শুনি?' কেটে কেটে বলল মরগ্যান।

ব্লেক ঠোঁক বেঁকিয়ে হাসল। জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ছুড়ে দিল অন্ধকারে।

'দুধের খোকাদের কথা ছেড়ে দাও, ফ্র্যাঙ্ক। তবে আমার মনে হচ্ছে টমাস আর ডার্কসন কোনও ঝামেলা করবে না। আর নেহাতই যদি সাহস দেখাতে যায়, তাহলে একটা ট্র্যাজিক নাটকের শেষ দৃশ্যের জন্যে ওদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

ব্লেকের কথায় মরগ্যান খুশি হল, বলল, 'বাস্তবকে অস্বীকার করার মতো নির্বোধ আমি নই, এড। টমাস এবং ডার্কসনের নিয়তি স্বয়ং ভগবানের হাতে, আমরা নিমিত্ত মাত্র। তাহলে তুমি, আমি এবং মেয়েটি—এই তিনজনেই ট্রাক থামানোর ব্যাপারটা সামলাব। জিপো আর কিটসনের জন্যে কোনও হালকা কাজ ঠিক করা যাবে—তবে একটা কথা, সেই সঙ্গে ওদের পাওনা টাকার পরিমাণও কিন্তু কমে যাবে। কারণ আমরাই যখন সমস্ত ঝুঁকি নিচ্ছি, তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের পাওনা কিছু বেশি হওয়া উচিত, তাই না?'

কিটসনের ভুরু কুঞ্চিত হল সংশয়ে। দু-লক্ষ ডলারের ভাবনা এর মধ্যেই তার মনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে।

'তাহলে আমাদের ভাগে কত করে পড়ছে জানতে পারি?

'নিশ্চয়ই।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মরগ্যান, 'এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার পাবে তুমি। আর জিপোর কাজ যেহেতু কলকবজা সংক্রান্ত—' হাত দিয়ে চাবি ঘোরানোর ইশারা করল মরগ্যান, 'তাই সে পাবে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। তোমাদের দুজনের থেকে যে এক লক্ষ ডলার বাঁচবে, সেটা ভাগ হবে আমার আর এডের মধ্যে।'

কিটসন ও জিপোর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল। সবাই নীরব। শেষে কিটসনই উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'কিন্তু ওরা যদি কোনও ঝামেলা বাধায়, তাহলে আমাদের কেউ মারা যেতে পারে, মারা যেতে পারে টমাস অথবা ডার্কসন। নাঃ, কাজটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। এতদিন যে সব কাজ আমরা করে এসেছি, সেগুলো ছোট হলেও তাতে কোনও ঝঞ্ঝাটের ভয় ছিল না। ধরা পড়লে বড়জোর বছর দুয়েক জেল খাটতাম। কিন্তু এবার ধরা পড়লে আমাদের আর নিস্তার নেই, সোজা ইলেকট্রিক চেয়ার! না, এসব খুনোখুনির মধ্যে আমি নেই।'

'আলেক্স ঠিকই বলেছে, ফ্রাঙ্ক,' ভয়ার্তস্বরে বলল জিপো, খুনের দায় বড় দায়! আমি তাতে জড়াতে চাই না।'

মরগ্যান হিংস্রভাবে হাসল, 'ঠিক আছে, তাহলে ভোট হোক। কোনও কাজ নিয়ে মতের ফারাক দেখা দিলে আমরা বরাবরই ভোটের মাধ্যমে তার মীমাংসা করেছি। এক্ষেত্রেও তাই করা যাক।'

'তার আর কোনও প্রয়োজন নেই,' তীক্ষ্ণ বলে উঠল কিটসন, 'এড যদি তোমার পক্ষেও যায় তবু তুমি জিততে পারবে না, ফ্র্যাঙ্ক। কারণ তাহলে ভোটের ফলাফল দাঁড়াবে দুই-দুই। এবং তোমারই তৈরি নিয়ম অনুযায়ী কোনও কাজে ভোটের ফলাফল সমান-সমান হলে সে কাজটা আমরা করি না। আশা করি নিয়মটা তুমি ভুলে যাওনি?'

মরগ্যানের দাঁতের সারি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্ধস্ফুট শব্দে হেসে উঠল সে, 'না, ভুলিনি। কিন্তু তাতে ভোটাভুটি করায় বাধাটা কোথায়? নিয়মমাফিক সব কাজ করাই আমি পছন্দ করি। তারপর নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হবে আমাদের সিদ্ধান্ত, রাজি?'

কিটসন কাঁধ ঝাঁকাল, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে বলেই বলছিলাম...'

মরগ্যান চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। তার সুগঠিত পেশিবহুল দেহের বিশাল ছায়া টেবিলে আচমকা আছড়ে পড়ল।

'ভোটের কাগজগুলো তৈরি করো, জিপো।'

জিপোর বৃত্তাকার মুখে পরিষ্কার হতবুদ্ধি ভাব। একটা নোটবই বের করে তার একটা পাতা ছিঁড়ল সে। তারপর সেটাকে ছুরি দিয়ে সমানভাবে চার-টুকরো করে কাটল। টুকরো কাগজগুলো এগিয়ে দিল টেবিলের ওপর, 'এই নাও—'

মরগ্যান হালকা স্বরে কয়েকটা শব্দ ছুড়ে মারল, 'মাত্র চারটে কাগজ কেন, জিপো?'

জিপো শূন্য চোখ মেলে তাকাল মরগ্যানের দিকে, তাকিয়েই রইল, 'কেন, আমাদের তো বরাবর চারটেই কাগজ লাগে?'

মরগ্যান হাসল নরম করে, 'দশ লক্ষ ডলার হবে পাঁচ ভাগ—মনে আছে? সুতরাং মেয়েটারও ভোট আছে একটা।'

কথা শেষ করে মরগ্যান এগিয়ে গেল দরজার দিকে। এক ঝটকায় দরজা খুলে সে উষ্ণস্বরে কাউকে আহ্বান জানাল, 'ভেতরে এসো জিনি। ওরা ওই কাগজটার ব্যাপারে ভোটাভুটি করতে চায়। সুতরাং বুঝতেই পারছ, তোমার ভোটটা আমার একান্ত প্রয়োজন।

অন্ধকারের ছায়া ছায়া আবর্ত থেকে যেন হাওয়ায় ভর দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল জিনি। চোখ ঝলসানো সবুজ আলোর বৃত্তে মরগ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে ও দেখতে লাগল হতবাক তিনজনকে। তারা অপলকে জিনিরই দিকে তাকিয়ে।

জিনির বয়স খুব বেশি নয়; বাইশ তেইশের মধ্যে। সাধারণের তুলনায় লম্বা একটু বেশিই হবে। মাথার একরাশ তামাটে চুল যত্ন-সহকারে ফিতে দিয়ে বাঁধা। ওর আয়ত ধূসর-সবুজ চোখ সমুদ্রের মতোই গভীর অথচ অভিব্যক্তিহীন,স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে এক অদ্ভুত নেশা। উদ্ধত চিবুকে দৃঢ়তার ভাষা সোচ্চার। সব মিলিয়ে এক জীবন্ত চাবুক।

জিনির পরনে একটা রঙচঙা রেশমি শার্ট, আর কালো স্কার্ট। স্ফীত বক্ষসৌন্দর্যের তুলনায় কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ। সুঠাম নিতম্বের ঢাল গিয়ে মিশেছে আকর্ষণীয়; সুগঠিত দুপায়ের প্রান্তে। রুই মাছের টোপ গেলার মতো বিস্ফারিত চোখে ব্লেক, জিপো এবং কিটসন তখনও জিনির দিকে তাকিয়ে। যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে কোনও ইতালীয় অভিনেত্রীর দেহসৌষ্ঠব।

মরগ্যানের শীতল কালো চোখজোড়া খেলে বেড়াল হতভম্ব তিনজনের মুখে, হেসে উঠল সে। মরগ্যান জানত, জিনির আকস্মিক উপস্থিতি ওদের স্বাভাবিক চিন্তাধারাকে পঙ্গু করে দেবে। সেই আকস্মিক মানসিক সংঘর্ষের পরিণতি দেখার জন্যে মরগ্যান যথেষ্ট কৌতূহলী ছিল, এখন দেখল।

জিপোর ডান হাত যান্ত্রিকভাবে এগিয়ে গেল তার লাল টাইয়ের দিকে। টাইয়ের নটটাকে নেড়েচেড়ে ঠিক করল। আর একই সঙ্গে পুরু ঠোঁটের আবরণ সরিয়ে তার ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি আত্মপ্রকাশ করল। বাঁকা চোখে জিনির দিকে চেয়ে হেসে উঠল জিপো।

ব্লেক এরকম অবস্থার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে ভুরু উঁচিয়ে ঠোঁট কুঁচকে শিস দেওয়ার ভঙ্গি করল। তার বিবর্ণ চোখের তারায় শূন্য দৃষ্টি।

কিটসনের অবস্থা পুরোপুরি আচ্ছন্ন। যেন একটা বিশমনি হাতুড়ি কেউ সপাটে বসিয়ে দিয়েছে তার ব্রহ্মতালুতে। সে যেন নীরবে গুনে চলেছে আসন্ন মৃত্যুর প্রহর।

মরগ্যানের স্বরে ওদের চমক ভাঙল, 'এই হল জিনি গর্ডন।'

এক মুহূর্তের দ্বিধা। পরক্ষণেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ব্লেক, দেখাদেখি জিপোও। কিন্তু কিটসন বসে রইল। তার বলিষ্ঠ হাতের আঙুল উৎকণ্ঠায় মুষ্টিবদ্ধ। চোখের তারা স্বচ্ছ কাচের মতো, মুখের ভাব তখনও হতচকিত, অনিশ্চিত।

'ডান দিক থেকে শুরু করছি।' বলে চলল মরগ্যান, 'এ হল এডওয়ার্ড ব্লেক। আমার অনুপস্থিতিতে দলের ভার থাকে ওরই হাতে।...জিপো ম্যানডিনি, আমাদের কলকবজা বিশারদ প্রতিভাধর—'মরগ্যান হাসল, 'আর সবশেষে আলেক্স কিটসন—গাড়ি চালাতে ওর জুড়ি নেই।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেল কিটসন। এক ঝটকায় সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার ধাক্কায় আরেকটু হলেই উল্টো পড়ছিল টেবিলটা। কিন্তু কিটসন সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপই করল না। সম্মোহিতের দৃষ্টি নিয়ে সে তখনও জিনিরই দিকে তাকিয়ে, হাতের তালু মুষ্টিবদ্ধ।

জিনির চঞ্চল চোখ পলকের জন্যে থামল তিনজনের চোখে। তারপর একটা চেয়ার টেনে সে বসল মরগ্যানের পাশে।

'প্ল্যানটা আমি মোটামুটি ওদের খুলে বলেছি।' জিনির পাশে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল মরগ্যান, 'ওদের দুজনের ধারণা কাজটা নাকি আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের নিয়ম হল,কোনও কাজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতের ফারাক হলে আমরা ভোটের সাহায্যে ব্যাপারটা মেটাই। সুতরাং এক্ষেত্রেও ভোট নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

জিনিস মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল সংশয়ের রেখা, সেই সঙ্গে একটু অবিশ্বাসের হাসি, ' তার মানে? তুমি বলতে চাও, দুলাখ ডলার নিতে রাজি নয় এমন গর্দভও পৃথিবীতে আছে?' জিনির স্বর শীতল, অচঞ্চল।

'না, ঠিক তা নয়,' হাসল মরগ্যান, 'ওদের ধারণা, এ কাজটায় রক্তপাতের আশঙ্কা রয়েছে। তাই...'

জিনি গর্ডন অবাক চোখে তাকাল জিপোর দিকে, তারপর ওর ধূসর-সবুজ চোখের তারা স্থির হল ব্লেকের চোখে; সবশেষে গিয়ে থামল কিটসনের মুখমণ্ডলে। যেন মনে মনে প্রত্যেককে জরিপ করে দেখল, 'ও—তোমার দলের যে এই অবস্থা তা কে জানত?' কথাটা মরগ্যানকে লক্ষ করেই। কিন্তু তার খোঁচা গিয়ে লাগল কিটসনের পৌঁরুষে। সে অস্বস্তিভরে মুখ ফিরিয়ে নিল; অপমানে তার কান দিয়ে যেন ছুটল আগুনের হলকা।

সেটা তো আমিও ভাবছি।' মরগ্যানের হাসি আরও বিস্তৃত হল, 'আমাদের হাতে এই প্রথম একটা বড় কাজের সুযোগ এসেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এমন, জিপো আর কিটসনের কাজটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।'

এবার উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল জিনি, 'হ্যাঁ শুধু সুযোগ নয়—সুবর্ণ সুযোগ। দশ লক্ষ ডলার ছেলেখেলার কথা নয়! তুমি বলছিলে, এ কাজে তোমার দল আমাকে সবরকমের সাহায্য করবে। এবং তাও বিনাস্বার্থে নয়; কিন্তু এখন যা দেখছি, তাতে বুঝতে পারছি এখানে আসাই আমার ভুল হয়েছে। এখন তুমি আবার ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছ কাজটা করবে কি না? হুঁ যত সব ন্যাকামো!'

ওরা তিনজনে চমকে উঠল। মেয়েটার মুখে এমন রুক্ষ, অপমানজনক কথা শুনে মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

মেয়েদের সঙ্গে পশুসুলভ আচরণের ব্যাপারে ব্লেকের যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে। সে আর থাকতে না পেরে বলে উঠল,—'বক্তৃতার পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না, সুন্দরী! এবার দয়া করে একটু চুপ করো দেখি!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জিনি ওর সুন্দর মুখে বরফের কাঠিন্য।

'মনে হয় এখানে এসে আমি ভুল করেছি।' মরগ্যানকে লক্ষ করে বলল, 'আচ্ছা—তাহলে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোক। এই প্ল্যানটা নিয়ে আমি সাহায্য চাইব এমন লোকের কাছে, যাদের শরীরের প্রতিটি

শিরায় বইছে রক্ত। তোমাদের মতো অপদার্থ কাপুরুষদের সঙ্গে কথা বলে আমি খামোখা সময় নষ্ট করতে চাই না।'

কথা শেষ করে দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগোল জিনি।

হাত বাড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরল মরগ্যান—ওকে থামাল।

'উত্তেজিত হয়ো না, জিনি।' হাসল সে, 'এতে ওদের কোনও দোষ নেই। এ ধরনের কাজ একেবারে প্রথম বলে একটু অস্বস্তি বোধ করছে। কিছু সময় দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই জিপো ম্যানডিনি তালা খোলায় এ শহরের সবচেয়ে সেরা কারিগর।' জিপোর পিঠে হাত রাখল মরগ্যান, 'এড বুদ্ধি-বিবেচনায় আমার চেয়ে কিছু কম যায় না। আর আলেক্সের মতো গাড়ি চালাতে জানে এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। তবে রক্তারক্তি ব্যাপারটা ওরা ঠিক পছন্দ করে না।'

'তাই নাকি?' অপলকে তিনজনের মুখে চোখ বুলিয়ে নিল জিনি, 'তাহলে দশ লাখ ডলারের বেলায় ওদের পছন্দ-অপছন্দ যাচ্ছে কোথায়? বুক পকেটে? ... হুঁ, এইসব হরিদাস পালের গোয়াল নিয়ে তুমি দল তৈরি করেছ? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, ফ্র্যাঙ্ক!' জিনির কর্কশ স্বর প্রত্যেকের কানে ঢেলে দিল গরম সীসে, 'এ দু-দশ ডলারের ব্যাপার নয়, পুরো দশ লক্ষ ডলার। সেক্ষেত্রে কার কী হল না হল, অত দেখতে গেলে চলে না, সেটা ওদের ভালো করে বুঝিয়ে দাও।'

মরগ্যানের হাত ছাড়িয়ে আলোর আওতায় এসে দাঁড়াল জিনি। সরাসরি চোখ রাখল কিটসনের চোখে, 'দু-লক্ষ ডলারের চেয়ে আহত হবার ভয়টাই কি তোমার কাছে বেশি হল? উত্তর দাও আমার প্রশ্নের?'

জিনির আগুনঝরা অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল কিটসন। মৃদুস্বরে জবাব দিল, কাজটা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ওয়েলিং কোম্পানিতে আমি কিছুদিন চাকরি করেছিলাম। সুতরাং টমাস এবং ডার্কসনকে আমি ভালোমতোই চিনি। এত সহজে ওরা হার মানবে না।...যেখানে খুনোখুনির সম্ভাবনা আছে, সেখানে আমি নেই।'

'ঠিক আছে, তাহলে তোমাকেও আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল জিনি, 'অতএব তোমার এই হারকিউলিস মার্কা চেহারা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে কেটে পড়তে পার। আমরা কেউ বাধা দেব না।'

কিটসনের মুখে নেমে এল অপমানের কালো ছায়া। উত্তেজিতভাবে সে বলে উঠল, 'মুখ সামলে কথা বলো। আমি বলছি এ কাজটা অসম্ভব। তোমরা মিথ্যে স্বপ্ন দেখছ।

হাওয়ায় তর্জনী নাচিয়ে দরজার দিকে ইশারা করল জিনি, 'দেখছিই তো! নইলে তুমি এখনও এখানে বসে রয়েছ কেমন করে? যাও, বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলে বসে 'দুদু' খাও। তোমাকে আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই।'

চেয়ার ঠেলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কিটসন। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ স্পষ্ট কানে এল। দাঁতে দাঁত চেপে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল জিনির কাছে। ও তখনও একইভাবে সোজা হয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। চোখের দৃষ্টি কিটসনের চোখে নিবদ্ধ।

অবশিষ্ট তিনজন রুদ্ধশ্বাসে ওদের দেখতে লাগল। ব্লেকের চোখে চিন্তার ছায়া। কারণ সে জানে, উত্তেজিত হলে কিটসনের আর মাথার ঠিক থাকে না। জিপো ভুরু কুঁচকে অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে ওদের লক্ষ করছিল। কিন্তু মরগ্যানের মুখের হাসি তখনও মিলিয়ে যায়নি।

কোনও শালা আজ পর্যন্ত এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায়নি।' জিনির মুখোমুখি এসে থামল কিটসন। দু-হাতের আঙুল অস্থির উত্তেজনায় হাওয়া আঁকড়ে ধরছে।

কিটসনের বিশাল চেহারার কাছে জিনি যেন এক ছোট্ট পুতুল। কিন্তু ওর দৃপ্ত চাবুকের মতো ভঙ্গি মনে করিয়ে দেয় কেউটের শীতল চাউনিকে। আর আলেক্স কিটসনের অপমানিত পৌঁরুষ বুঝি আহত বাঘের মতোই ক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

ঘৃণাভরা চোখে কিটসনকে দেখল জিনি। শান্তস্বরে বলে উঠল, 'তুমি যদি আমার কথা বুঝতে না পেরে থাক, তাহলে আবার বলছি। যাও, বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলে বসে 'ডুডু' খাও। তোমাকে আমাদের কো-ন-ও প্রয়োজন নেই।'

এক চাপা গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কিটসনের ডান হাত ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে এল জিনির দিকে—কিন্তু মাঝপথেই সে নিজেকে সামলে নিল, নামিয়ে নিল, তার উদ্যত হাত।

'কী হল, থামলে কেন, মারো।' তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল জিনি, 'তোমার মতো অত প্রাণের ভয় আমার নেই!'

মরগ্যান হঠাৎ হেসে উঠল হো হো করে।

কিটসন মাথা নিচু করেই আপন মনেই কী যেন বিড় বিড় করল। তারপর শ্লথপায়ে এগিয়ে চলল ঘরের দরজার দিকে।

'কিটসন!' মরগ্যানের কর্কশ স্বরে সকলে চমকে উঠল, 'এখানে এসে বসো। ভোট তোমাকে দিতেই হবে। তুমি যদি এই মুহূর্তে দল ছেড়ে চলে যাও, তবে এর পরিণতির জন্যে আমি কিন্তু দায়ী থাকব না!'

কিটসন ইতস্তত করল কিছুক্ষণ তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল টেবিলের কাছে। বসল চেয়ারে। মুখভাব গম্ভীর দ্বিধাগ্রস্ত।

মরগ্যান ঘুরল জিপোর দিকে, 'আর একটা ভোটের কাগজ জিপো—'

নোট বইয়ের পাতা কেটে আর এক টুকরো কাগজ মরগ্যানের দিকে এগিয়ে দিল জিপো।

ব্লেক বেশ কিছুক্ষণ ধরে উসখুস করছিল, এবারে বলে উঠল, 'ভোট দেবার আগে কাজটা সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা আমি জানতে চাই, ফ্র্যাঙ্ক। এই মেয়েটা এ সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল কেমন করে?' জিনির দিকে বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে ইশারা করল ব্লেক।

'গত পাঁচ মাস ধরে আমি শুধু এই ট্রাকটাকে সাফ করার মতলব ভেঁজেছি!' মরগ্যান বলল, কিন্তু অনেক ভেবেও কোনও উপায় খুঁজে পাইনি। হঠাৎ মাস তিনেক আগে জিনি এল আমার কাছে। এবং ট্রাক লুটের একটা সাজানো-গোছানো প্ল্যান ফেলে দিল আমার কোলে। সত্যি বলতে কী এর পুরো কৃতিত্বই জিনির। যে কারণে দশ লাখ ডলারকে ভাগ করা হচ্ছে পাঁচ ভাগে। ও সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাপারটাকে ভেবেছে এবং সেই অনুযায়ী তৈরি করেছে ওর নিখুঁত প্ল্যান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর প্ল্যানে কোনও ফাঁক নেই।'

ব্লেক একবার তাকাল জিনির দিকে। বলল, 'তোমার বাড়ি কোথায়, খুকি... আর এই ট্রাক-লুটের দুর্বুদ্ধিই বা তোমার মাথায় এল কেমন করে?'

মেয়েটি ওর সস্তা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে আনল। সেই সঙ্গে একটা দেশলাই। সিগারেট ধরিয়ে অভিব্যক্তিহীন শীতল দৃষ্টিতে ও তাকাল ব্লেকের দিকে, 'আমার বাড়ির খবর জেনে তোমার কী লাভ হবে তা বুঝতে পারছি না?' দৃঢ়স্বরে বলল জিনি, 'আর ট্রাক লুটের পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞেস করছ?...টাকার প্রয়োজন হঠাৎ খুব বেড়ে ওঠায় প্ল্যানটা হঠাৎই মাথায় গজিয়ে উঠেছে। এবং আমাদের যখন পরস্পরের নামটা অজানা নয়, তখন নাম ধরে ডাকাটাই আমি পছন্দ করি। ওই ন্যাকা-ন্যাকা স্বরে খুকু বলাটা ছাড়ো দেখি!'

ব্লেক দাঁত বের করে হাসল। মেয়েমানুষের তেজ বরাবরই তাকে আকর্ষণ করেছে।

'নিশ্চয়ই, তুমি যখন পছন্দ করো না সেটা কি আমার করা সাজে? কিন্তু একটা কথা—আমাদের দলের খবর তোমাকে কে দিল? আর আমরাই যে এই কাজের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক, সেটাই বা জানলে কেমন করে?'

আঙুল তুলে জিনি দেখাল জিপোর দিকে, 'তার কারণ জিপো। আমি খোঁজ-খবর করে জেনেছিলাম, তালা খোলার ব্যাপারে ওর চেয়ে ওস্তাদ কারিগর এ শহরে আর নেই; এবং এ কাজে আমাদের সব থেকে

প্রয়োজন সেটাই। আর শুনলাম তোমার কথা। তোমার মতো ঠান্ডা রক্তের দুঃসাহসী লোক নাকি খুব কমই আছে। মরগ্যানের আছে বুদ্ধি, সেই সঙ্গে দল পরিচালনার অদ্ভুত ক্ষমতা। তাছাড়া গাড়ি চালানোর কথা ওঠায় কিটসনের নামটাই সব আগে ওদের মনে এসেছে। সুতরাং তোমাদের এখানে না এসে পারি কী করে?'

জিপোর মুখমণ্ডলে অস্বস্তির মেঘ কেটে গিয়ে ফুটে উঠল হাসির রেখা। প্রশংসা শুনতে সে বরাবরই ভালোবাসে; বিশেষত একজন সুন্দরী তরুণীর মুখ থেকে। নাঃ, জিনি মিথ্যে বলেনি—ভাবল জিপো। তার সঙ্গে অন্য কোনও কারিগরের কোনওরকম তুলনাই হয় না। কারণ জিপো ম্যানডিনি তালার লাইনে একমেবাদ্বিতীয়ম!

কিটসনের মুখ থেকে ক্রোধের ইশারা মিলিয়ে গেল। অপ্রতিভভাবে সে চোখ নামিয়ে নিল টেবিলের দিকে। চেয়ে রইল হুইস্কির গ্লাসের বৃত্তাকার ভিজে ছাপটার দিকে।

'ওরা, মানে কারা?' সন্দেহাকুলকণ্ঠে জানতে চাইল ব্লেক।

'বহু জায়গায় আমি উপযুক্ত লোকের খোঁজ করেছি। তারপর জেনেছি তোমাদের নাম। সেক্ষেত্রে বেছে বেছে কারও নাম করা মুশকিল।' ডিনি ব্লেকের এই অর্থহীন অবান্তর প্রশ্নে বিরক্তি হল, 'আমরা শুধু শুধুই সময় নষ্ট করছি । আমি ভেবেছিলাম বুঝি ঠিক লোকের কাছেই এসেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার হয়তো ভুল হলেও হতে পারে। আর তা যদি হয়, তাহলে আমাকে অন্য কোথাও দেখতে হবে!'

জিনির দিকে চোখ রেখে একটি সিগারেট ধরাল ব্লেক 'আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। ওই ট্রাকটাকে থামাতে তোমাকেই যদি রাস্তায় শুয়ে অভিনয় করতে হয়, তাহলে মানতে দ্বিধা নেই, সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজটাই তুমি নিজের জন্যে বেছে নিয়েছ। এটাও কি তোমারই প্ল্যান নাকি?'

'নিশ্চয়ই!'

'আচ্ছা, আবার দেখা যাক তোমাকে কী-কী করতে হবে।... তুমি রাস্তার ঠিক মাঝখানে শুয়ে থাকবে। তোমার কাছে লুকোনো থাকবে একটা রিভলভার। ডার্কসন যেই তোমার কাছে এগিয়ে আসবে, অমনি তুমি রিভলভার চেপে ধরবে ওর তলপেটে—তাই তো?'

জিনি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

'এতে কিন্তু যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। এবং ব্যাপারটা যতটা সহজ ভাবছ, ততটা সহজ নাও হতে পারে।' ব্লেক বলল, 'এক্ষেত্রে দুটো জিনিস ঘটতে পারে। হয় ডার্কসন সরাসরি হাত তুলে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, নয়তো তোমাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে রিভলভারটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে। ডার্কসন সম্বন্ধে আমি যতটুকু শুনেছি অত সহজে হাল ছাড়ার লোক সে নয়। ও হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার রিভলভারটা কেড়ে নিতে চাইবে' তখন?

জিনি শান্তভাবে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

'দশ লক্ষ ডলার নেহাত অল্প নয়—' শীতল, নির্বিকার স্বরে জবাব দিল জিনি গর্ডন, 'অতএব ডার্কসন যদি ভালোয় ভালোয় পোষ না মানে, তবে ওকে গুলি করা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না।'

জিপো পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। জিভটাকে একবার বুলিয়ে নিল শুকনো ঠোঁটের ওপর, অস্বস্তিভরে একবার দেখল মরগ্যানের দিকে, তারপর তাকাল কিটসনের দিকে।

'জিনি ঠিকই বলেছে।' মরগ্যান ওদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল, 'দশ লক্ষ ডলারের জন্যে ওসব সামান্য ব্যাপারে নজর দিলে চলে না। তাছাড়া বাস্তবকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই।'

ব্লেক গভীর দৃষ্টিতে জিনিকে লক্ষ করছিল। না, মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে না। বাপ রে! এ যে দেখছি কেউটের বাচ্চা। ডার্কসন যদি কিছু গড়বড় করার চেষ্টা করে, তবে ওর কপালে অশেষ দুর্গতি আছে দেখছি। অবশ্য মেয়েটার চোখের দিকে তাকালেই সে বুঝতে পারবে মেয়েটা রিভলভার হাতে নিছক মশকরা করছে

না। আর একান্তই যদি বুঝতে না পারে তবে যিশুই ভরসা। অন্তত আমি হলে সে চেষ্টা করতাম না। নড়াচড়া তো দূরের কথা, ওর রিভলভারের সামনে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পেতাম।

'না, তা নয়—আমি শুধু খোলাখুলি ব্যাপারটা জানতে চাইছি।' একটা সিগারেট নিয়ে টেবিলে বার কয়েক ঠুকল ব্লেক, 'এবার তোমার মতলবের বাকিটা শোনা যাক, ফ্র্যাঙ্ক।'

মরগ্যান মাথা নাড়ল, 'উঁহু, ভোট দেওয়ার আগে সে বিষয়ে আর একটা কথাও জানার উপায় নেই। জিনির সঙ্গে আমার সেইরকম শর্তই হয়েছে। তবে ও বলেছে, ট্রাক-লুটের প্ল্যান নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। সবটাই ও দাবার ছকের মতো পরিষ্কার করে সাজিয়ে রেখেছে। আমি তোমাদের এখন যা বললাম সেটা মোটামুটি প্ল্যানের মূল ব্যাপারটা। যদি আমরা জিনিকে সাহায্য করতে রাজি থাকি, তবেই ও বাকি অংশটা আমাদের শোনাবে; তার আগে নয়। আর যদি আমরা রাজি না হই, তবে তো মিটেই গেল। ও তখন অন্য কোনও দলের কাছে যাবে।... আমি তো এই প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু দেখছি না। তোমরা কী বল?'

'কিন্তু সত্যিই কি প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে?' ব্লেক প্রশ্ন করল, 'আমার তো মনে হয় সেটা সম্ভব নয়। এখন পর্যন্ত আমরা শুধু ট্রাকটা থামাতে পেরেছি, আর টমাস আর ডার্কসনকে কব্জা করেছি, তার বেশি কিছু নয়। অবশ্য খানিকক্ষণ আগে এটাকেও আমরা অসম্ভব বলে মনে করছিলাম। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, তোমার কথা যদি সত্যি হয়, মানে ট্রাকটা যদি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে থাকে, তাহলে তো ব্যাপারটা ভীষণ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াবে। যে মুহূর্তে ট্রাকের সঙ্গে ট্রান্সমিটারের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে এজেন্সির লোকেরা পুলিশে খবর দেবে। আর ওরা তো জানেই ট্রাকটাকে কোথাও পাওয়া যাবে। তাছাড়া শুধু পুলিশ নয়, সেনাবাহিনীর লোকেরা পর্যন্ত আমাদের পেছনে লাগবে। মানে শয়ে শয়ে লোক হেলিকপ্টার ও গাড়ি নিয়ে আমাদের খুঁজে বেড়াবে। আর এই সামান্য তিরানব্বই মাইল চক্কর দিয়ে আমাদের খুঁজে বের করতে একটা হেলিকপ্টারের মিনিট কয়েকের বেশি লাগবে না। তুমি তো ভালোভাবেই জানো, ওই রাস্তায় ট্রাক নিয়ে লুকোবার কোনও জায়গাই নেই, যাও আছে, তাও প্রায় পঁচিশ মাইল দুরে। আমি তো বুঝতেই পারছি না, কেমন করে আমরা ট্রাক লুট করে টাকা নিয়ে সরে পড়ব। নাঃ, ওদের চোখে ধুলো দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।'

মরগ্যান কাঁধ ঝাঁকল, 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম।' কিন্তু জিনি বলছে, জিনির দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করল মরগ্যান, 'ও নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোনও দরকার নেই। সমস্ত কিছু ও ছকে রেখেছে।'

ব্লেক তাকাল জিনির দিকে, 'তাই নাকি? এই জটিল সমস্যার উত্তরও তুমি জানো?'

'হ্যাঁ, নির্বিকার শীতলস্বরে বলল জিনি, 'এইটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই জিতেছি। আমি জানি ট্রাকটাকে নিয়ে কিভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে।'

জিনির আশ্বাসভরা দৃঢ়স্বরে কিটসন পর্যন্ত বিচলিত হল। সে এতক্ষণ নির্বিকারভাবে চুপচাপ বসে শুনছিল ওদের কথাবার্তা। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হল নাঃ, কাজটা জিনির পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে!

ব্লেক সামনে হাত ছড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকা, 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমার কথাই আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান কেমন করে করলে তাই ভাবছি।...অবশ্য এখনও দুটো জিনিস আমরা ভেবে দেখিনি। এক নম্বর হল, আমরা ট্রাক থামিয়ে যখন টমাস আর ডার্কসনকে কায়দা করব, তখন যদি অন্য কোনও গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে পড়ে, তাহলে? মানছি, এমনিতে ওই রাস্তা দিয়ে খুব একটা গাড়ি-টাড়ি যায় না, কিন্তু হঠাৎ এসে পড়তে কতক্ষণ। ব্যস, তাহলেই চিত্তির।'

জিনির মুখে নেমে এল বিরক্তির আভাস। ভাবলেশহীন মুখে ও চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।' আঁটোসাঁটো লাল শার্টের নীচে প্রকট হয়ে উঠল ওর উদ্ধত বুক।

'সে নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তুমি তো জানো, দুটো রাস্তা পাশাপাশি গিয়ে দশ নম্বর সড়কে মিশেছে। এখন ট্রাকটা যেই ওর রোজকার রাস্তায় ঢুকবে, অমনি আমরা একটা রোড-সাইন বসিয়ে দেব জোড়া রাস্তার মুখে। তাতে তীরচিহ্ন দিয়ে অন্যান্য গাড়িদের নির্দেশ করা হবে পাশের রাস্তা ব্যবহার করার জন্যে, তাহলেই অন্য আর কোনও গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে আসবে না। অর্থাৎ, ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন নয়, তাই না?'

ব্লেক একগাল হাসল। খুশি উপচে পড়ল ওর চোখমুখে।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, একেবারে জলের মতো সহজ। কিন্তু মেহেবুব, এই সমস্যাটার সমাধান করো দেখি ঃ ধরে নিলাম ট্রাকটা দখল করে আমরা বেশ একটা জুতসই জায়গায় গা ঢাকা দিলাম। কিন্তু তারপর ট্রাকের তালাটা খুলব কী করে? ফুসমন্তরে? কিটসন বলছে, ওটার তালা খোলার চেয়ে যুদ্ধ জয় করা অনেক সহজ। তাছাড়া আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। উঁহু, ব্যাপারটা নেহাত সহজ নয়!'

জিনি মাথা ঝাঁকাল।

'সেটা ওর মাথাব্যথা ও বুঝবে।' জিপোর দিকে ইশারা করে বলে উঠল জিনি, তালার ব্যাপারে ও একজন ওস্তাদ! সুতরাং সে দায়িত্বটা ওরই, আমাদের নয়। আমরা শুধু ট্রাকটা ওর কাছে এনে দেব, তারপর যত সময় লাগে লাগুকা ইচ্ছে হলে এক মাস, চাই কী দু-মাসও জিপোকে দেওয়া হবে।' জিনির ডাগর সবুজ চোখ ঘুরল জিপোর দিকে, 'কী হে,পারবে না এক মাসে ওই ট্রাকের তালাটা খুলে ফেলতে?'

জিপোর অবস্থা তখন দেখে কে! প্রশংসায়-প্রশংসায় সে যেন রঙিন শূন্যে ভাসছে। জিনির প্রশ্নের উত্তরে সাততাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল সে, 'পারব না মানে? এক মাস সময় পেলে আমি নরক্ক দুর্গের সমস্ত দরজা খুলে ফেলতে পারব।'

'তোমাকে একমাস সময়ই দেওয়া হবে।' বলল জিনি, 'এবং তাতেও যদি না হয়, তবে আরও এক মাস। সময় আমাদের ভাবনার কারণ হবে না।'

'ব্যস, এ নিয়ে আর কথা নয়।' মরগ্যান বলল, 'আগেই তো বলেছি, জিনি সব সমস্যার সমাধান করে রেখেছে, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর প্ল্যানে কাজ হবে। এসো, এবার ভোট দেওয়া যাক। তবে আবারও বলছি, একটু-আধটু রক্তপাতের জন্যে প্রত্যেককেই তৈরি থাকতে হবে। অর্থাৎ দু-পক্ষেরই কেউ-না-কেউ আহত হতে পারে, এমনকি মারাও যেতে পারে। যদি টমাস বা ডার্কসনের কেউ মারা যায় তবে, আমরা জড়িয়ে পড়ব খুনের জালে। অথবা যদি সামান্য কোনও ভুলের জন্যে আমরা ধরা পড়ি, তবে নির্ঘাত দশ থেকে বিশ বছরের জেল—সে বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নেই। আর অন্যদিকে রয়েছে সোনালি দুনিয়ার হাতছানি ঃ নগদ দু লাখ ডলার। মোটামুটি আমাদের অবস্থাটা এই।... তোমাদের যদি আর কোনও প্রশ্ন না থাকে, তাহলে এবার ভোট নেবার কাজ শুরু করা যাক।' মরগ্যান থামল। একবার দেখন তিনজনের দিকে। 'তবে একটা কথা মনে রেখো, ভোটের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত আমরা নেব, সেটাই কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমাদের দলের নিয়ম-কানুন তো তোমরা ভালোমতোই জানো, ভোটে যে পরাজিত হবে, তাকে আমাদেরই সঙ্গে কাজ করতে হবে, নয়তো চিরদিনের জন্যে দল ছেড়ে চলে যেতে হবে। তোমাদের তাড়াহুড়ো করার কোনও প্রয়োজন নেই। বেশ ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তেই তোমরা সিদ্ধান্ত নাও। মনে রেখো জমার খাতায় দু-লাখ ডলার, আর খরচের খাতায় দশ-বিশ বছরের জেল—হয়তো বা ইলেকট্রিক চেয়ার! অতএব ইচ্ছে করলে তোমরা আরও কিছুক্ষণ সময় নিতে পার—পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখো ভালো করে।'

কথা শেষ করে মরগ্যান প্রথমে তাকাল ব্লেকের দিকে, সে তখন জিনির দিকে তাকিয়ে—দুচোখে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনের দীপ্তি। জিপোর দিকে ফিরল মরগ্যান। জিপো মাথা নিচু করে, ভুরু কুঁচকে, এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। শূন্য দৃষ্টি টেবিলে নিবদ্ধ।

আলেক্স কিটসন একদৃষ্টে চেয়ে আছে জিনির দিকে। কানে আসছে তার ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ।

'এসো তাহলে ভোট দেওয়া যাক।' ব্লেক আহ্বান জানাল, এবং একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে এক টুকরো কাগজ তুলে নিল।

জিনিও নিঃশব্দে তুলে নিল এক টুকরো কাগজ। বাকি তিন টুকরো কাগজ হাতে তুলে নিল মরগ্যান। একটা এগিয়ে দিল কিটসনের দিকে, আর একটা জিপোর দিকে, তারপর পকেট থেকে একটা কলম বের করে অবশিষ্ট কাগজের টুকরোয় কী যেন লিখতে লাগল। লেখা হয়ে গেলে কাগজটা ভাঁজ করে রাখল টেবিলের মাঝখানে।

জিনি ফ্র্যাঙ্কের কলমটা চেয়ে নিল। লেখা শেষ করে কাগজটা এগিয়ে দিল মরগ্যানের রাখা কাগজের পাশে।

হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত কয়েক কী যে ভাবল জিপো। অবশেষে একটা ভোঁতা পেনসিল বার করে দ্রুত হাতে লিখতে শুরু করল। লেখা হয়ে গেলে কাগজটা ভাঁজ করে টোকা মেরে এগিয়ে দিল অন্য কাগজগুলোর কাছে।

রইল বাকি শুধু কিটসন। দ্বিধাগ্রস্তভাবে সে তখনও তার হাতের কাগজের দিকে তাকিয়ে। জিনি এবং অন্য তিনজন তাকে একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ করছে।

'সময় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাব, আলেক্স। তাড়াহুড়ো করে কিছু করে বসো না।' ঠাট্টার সুরে বলে উঠল মরগ্যান, 'ভাববার জন্যে এখনও গোটা রাতটাই পড়ে আছে!'

কিটসন চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। তারপর চোখ রাখল জিনির মুখে। কয়েক মুহূর্ত ওরা চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে; তারপর হঠাৎ মরগ্যানের কলমটা তুলে নিল কিটসন। হিজিবিজি কী সব লিখে কাগজটা ভাঁজ করল, রাখল অন্য কাগজগুলোর ওপর।

কিছুক্ষণ বরফ-শীতল নিস্তব্ধতা। তারপর একসময় মরগ্যানই হাত বাড়িয়ে দিল কাগজগুলোর দিকে। খুলে দেখল একটা। 'রাজি।'

অনেকটা কাগজ খুলল মরগ্যান।

'রাজি। চমৎকার! এবার দেখা যাক অন্যগুলো কী বলে।'

ক্ষিপ্রহাতে অন্য কাগজগুলো খুলে ফেলল মরগ্যান। পড়ে দেখল, 'রাজি, রাজি এবং রাজি।'

মরগ্যান চোখ বুলিয়ে নিল প্রত্যেকের মুখ। তার মুখে ফুটে উঠল নেকড়ের হিংস্র হাসি, 'তাহলে এই কাজটার ব্যাপারে কারোরই আপত্তি নেই দেখছি। আমিও সেরকমই ভাবছিলাম। দু-লক্ষ ডলারকে পায়ে ঠেলার মতো লোক এই পৃথিবীতে নেই—আমাদের এখানে তো দূরের কথা! কাজটা কঠিন মানছি, কিন্তু টাকাটাও যে নেহাত অল্প নয়-!'

কিটসন চোখ রাখল জিনির চোখে। জিনিও তাকাল তার দিকে, উদ্ধত চিবুকের কঠিন রেখা সামান্য নরম হল। কিটসনের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল জিনি। নীরব অথচ কোমল হাসি।

দুই

পরদিন সকাল। প্রায় আটটা বাজে। ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সির প্রবেশ পথের কাছে এসে থামল একটা ধূলিধূসর বুইক সেঞ্চুরি।

রাস্তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে কালো গাড়িটার একটুও সময় লাগল না।

গাড়ির চালকের আসনে বসেছিল ফ্রাঙ্ক মরগ্যান। মাথায় তেলচিটে ময়লা টুপিটা চোখের ওপর নামানো। পাতলা ঠোঁটে অলসভাবে ঝুলছে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। তার পাশে স্থিরভাবে বসে এড ব্লেক।

এজেন্সির উঁচু কাঠের দরজার দিকে দেখল তারা: দরজার ওপরে কাঁটাতারের বেড়া। ডানদিকের পাল্লার ঘন্টি বাজাবার ঝকঝকে পেতলের বোতাম, এবং তার পাশেই একটা বড় সাদা পেরেক দিয়ে আঁটা। তাতে

লাল রঙের বড় বড় হরফে পরিষ্কার করে লেখা :

দ্য ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সি
আপনার নিরাপত্তা আমাদের নিতে দিন। পৃথিবীর
সবচেয়ে সেরা এবং নিরাপদ ট্রাক পরিবহন ব্যবস্থা।

‘নিজেদের সম্বন্ধে ওরা একটা বিরাট ধারণা করে বসে আছে দেখছি।’ ফলকের লেখা পড়ে বলল, ব্লেক, ‘ঠিক আছে, আর কটা দিন। তারপরেই ওরা দেখবে ওস্তাদের কেরামতি।’

‘বলা যায় না এর উল্টোটাও ঘটতে পারে—’ ব্যঙ্গের হাসি হাসল মরগ্যান।

‘তো পারে, তবে আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, এ কাজটায় আমরা সফল হবই, ‘ব্লেক বলল, ‘মেয়েটা এমন সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান করে রেখেছে যে ভাবলে অবাক হতে হয়, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’ ঠোঁট থেকে সিগারেট আলতো করে তুলে নিল মরগ্যান, ‘ওর প্ল্যানে কোনও খুঁত নেই, কিন্তু সেই অনুযায়ী সবকিছু করতে পারলে হয়। কারণ আমাদের কতকগুলো জটিল ঝামেলার মোকাবিলা করতে হবে। বিশেষ করে জিপোকে নিয়েই আমরা ভাবনা। মেয়েটা বলছে বটে আমাদের হাতে অফুরন্ত সময়, কিন্তু সেটা নিছকই একটা কথার কথা, বড়জোর বলতে পার, ট্রাকের তালা ভাঙবার জন্যে আমরা বেশ কিছুদিন সময় পাব, তার বেশি কিছু নয়। একবার যদি পুলিশ আমাদের খোঁজ শুরু করে, তাহলেই হাতের সময় কমতে থাকবে। তখন যত তাড়াতাড়ি তালা খোলা যায় ততই মঙ্গল। অর্থাৎ জিপোকে মানসিক চাপের মধ্যে কাজ করতে হবে, যা সে আগে কখনও করেনি। বলা যায় না, এতে ওর মনের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যেতে পারে।’

‘জিপোর যাতে সে অবস্থা না হয়, তার দায়িত্ব আমাদের।’ ঠান্ডা স্বরে জবাব দিল ব্লেক, ‘জিপোর জন্যে আমি একটুও চিন্তিত নই।’ ব্লেক আড়চোখে দেখল মরগ্যানের দিকে।’ বিবর্ণ চঞ্চল চোখের তারায় কঠিন দৃষ্টি, ‘বুঝলে ফ্র্যাঙ্ক, ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে টমাস আর ডার্কসনকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। কারণ, যদি ওরা পরে পুলিসের কাছে আমাদের চেহারার বর্ণনা দেয়, তাহলে স-ব গুবলেট হয়ে যাবে।’

মরগ্যান কাঁধ ঝাঁকাল, ‘হুঁ—আমি ও তাই ভাবছি। কিন্তু এ কথা যেন আর কাউকে বোলো না। খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ওরা দুজন এখন থেকেই তটস্থ হয়ে আছে, তার ওপর এ কথা জানতে পারলে ওদের সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে।’

‘কিন্তু জিনির তো সে ভয় নেই।’ ব্লেকের ঠোঁটের কোণে হাসির ছোঁয়া।

‘তা ঠিক।’

‘মেয়েটা কে, ফ্র্যাঙ্ক?’

মরগ্যান ঠোঁট উল্টো কাঁধ ঝাঁকাল, ‘কী করে বলব? যদ্দূর জানি এ শহরে থাকে না। তবে একটা কথা বাজি রেখে বলতে পারি, ও এর আগেও অন্য কোনও দলের হয়ে কাজ করেছে।’

‘আমারও তাই মনে হয়।’ ব্লেক চোখ নামিয়ে হাত ঘড়িতে সময় দেখল, ‘তবে একটা ব্যাপার কী জান? এই ট্রাক-লুটের প্ল্যানটা যে জিনির একার মাথা থেকে বেরিয়েছে আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। ওর বয়েসি একটা কচি মেয়ের মাথায় এ মতলব আসতেই পারে না। আর যেভাবে সমস্ত জটিল সমস্যাগুলো ও সমাধান করেছে, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। যদি শুনি যে এই ট্রাকটার ব্যাপারে অন্য কোনও দলও মাথা ঘামাচ্ছে, তাহলে আমি একটুও অবাক হব না। কারণ, আমার ধারণা, অন্য কোনও দলের কাছ থেকে জিনি এই ট্রাক-লুটের প্ল্যানটা চুরি করেছে। হয়তো বেশি বখরার লোভেই ও সেই দল ছেড়ে আমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছে। অতএব জিনি সম্বন্ধে সর্তক থেকো, ফ্র্যাঙ্ক। পরে হয়তো দেখা যাবে আমাদের মতো অন্য আরেকটা দলও একই দিনে, একই সময়ে ট্রাকটাকে খালি করার মতলব ভাঁজছে—সেটা আমাদের পক্ষে খুব একটা সুবিধের হবে না, বিশেষ করে যদি তারা সে ব্যাপারে আমাদের টেক্কা দেয়।’

‘হুঁ। অস্বস্তিভরে টুপিটাকে মাথার পিছনে ঠেলে দিল মরগ্যান। ভুরু কুঁচকে তাকাল ব্লেকের দিকে, ‘সবই আমি ভেবেছি। কিন্তু তবু আমাদের একটা সুযোগ দিতে হবে আগামী শুক্রবারের আগে কিছুতেই একাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এর পেছনে প্রচুর প্রস্তুতি দরকার।... আচ্ছা, কটা বাজল?’

‘ঠিক সাড়ে আটটা।’

‘তাহলে তো বাস এসে পড়ার সময় হল।’

‘হ্যাঁ।’

সামনের বাসস্টপে অপেক্ষারত লোকগুলোর দিকে তাকাল ওরা। সেদিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইল ব্লেক। অস্ফুটস্বরে বলল, ‘যাই বল ফ্র্যাঙ্ক, জিনির চেহারায় চটক আছে।... ওফ, একখানা জিনিস বটে।’ অন্যমনস্কভাবেই ঠোঁট কামড়াল ব্লেক।’

মরগ্যানের মুখ থেকে নেমে এল বরফের কাঠিন্য। তার কালো সাপ-চোখজোড়া ধীরে ধীরে এসে স্থির হল ব্লেকের চোখে। কর্কশস্বরে সে বলে উঠল, ‘কথা যখন উঠলই তখন একটা কথা ভালো করে জানিয়ে দিই এড। জিনির কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা তোমরা কোরো না। কারণ, ওকে নিয়ে কোনও রকম বাঁদরামি আমি সহ্য করব না। সপ্তা-দুয়েক, কি তারও বেশি ও আমাদের সঙ্গে থাকবে। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই হয়তো ওকে আমাদের পাশে কাটাতে হবে—কিন্তু তাই বলে ওর সম্বন্ধে কোনওরকম ভুল ধারণা তোমাদের মনে গড়ে উঠুক, তা আমি চাই না। সুতরাং প্রথম থেকেই ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। কোনওরকম লক্কাবাজি আমি সহ্য করব না।’

ব্লেক ভুরু উঁচিয়ে তাকাল মরগ্যানের দিকে। তার সুন্দর মুখমণ্ডল ঘৃণায় বিকৃত, ‘তাহলে কি আমি ধরে নেব, জিনিকে তুমি নিজের জন্যে রেখেছ?’

মরগ্যান মাথা নাড়ল, ‘না! আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, এড—জিনির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু লেনদেনের, তাছাড়া কোনও নারীঘটিত ঝঞ্ঝাট নিয়ে আপাতত আমরা মাথা ঘামাতে চাই না—আমাদের সামনে রয়েছে এক বিশাল ঝুঁকি, এক বিরাট কাজের দায়িত্ব। সুতরাং এই রিপুসংক্রান্ত ব্যাপারে নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। যদি কারও মধ্যে সামান্যতম বেচাল দেখি, তাহলে চাবকে ছাল ছাড়িয়ে নেব। জিনিকে নিয়ে তোমার যদি ফষ্টি-নষ্টি করার কোনও মতলব থেকে থাকে, তাহলে এক্ষুনি মতলব ঝেড়ে ফ্যালো। কারণ তার পরিণতি খুব একটা সুখের হবে না।’

মরগ্যানের শীতল নিষ্প্রাণ কালো চোখের তারা যেন ঝিলিক মেরে উঠল। সেদিকে চেয়ে অস্বস্তিভরে হাসতে চেষ্টা করল ব্লেক, ‘আমাকে এসব না বলে কিটসনকে গিয়ে বলো। যদি কিছু করার হয় ও-ই করবে, আমি নয়। কাল রাতে কিরকম করে জিনিকে দেখছিল মনে আছে?’

‘তোমাদের তিনজনের ওপরেই নজর রাখা দরকার।’ সংক্ষিপ্তভাবে বলল মরগ্যান, ‘তুমি কিংবা জিপো—কিটসনের চেয়ে এমন কিছু সাধু নও।’

ব্লেকের চোখে ফুটে উঠল ক্রোধের ঝলক।

‘তোমার মাথা থেকে দেখছি যিশুখ্রিস্টের মতো জ্যোতি বেরোচ্ছে।’

মরগ্যান ক্রুদ্ধভাবে কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাসটাকে আসতে দেখে চুপ করে গেল।

‘ওই যে বাস আসছে। চুপচাপ নজর রাখো!’

দুজনেই ঝুঁকে পড়ল উইন্ডশিল্ডের ওপর। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সামনের রাস্তার দিকে। বাসটা এজেন্সির সামনে এসে থামল। তার থেকে নেমে দাঁড়াল দুজন লোক। একজনের চেহারা খাটো, রোগা, কিন্তু অন্যজন প্রায় ছ-ফুট লম্বা—বৃষস্কন্ধ, শক্তসমর্থ চেহারা। চলাফেলার ভঙ্গি সাপের মতো ক্ষিপ্র অথচ নিশ্চিত। তার পরনে ওয়েলিং আর্মাউ ট্রাক এজেন্সির ইউনিফর্ম। মাথায় লম্বা টুপি—তাতে বসানো চকচকে ইস্পাতের ব্যাজ। কোমরে ঝোলানো পিস্তল। অভ্যাসবশতই বাঁ হাতটা পিস্তলের খাপের ওপর রাখা।

লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার চারপাশে দেখল। তারপর ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে গেল এজেন্সির দরজার কাছে। আঙুল চেপে ধরল ঘণ্টির বোতামে।

'এই নাকি?' ব্লেক প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।' মরগ্যান তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটার আপাদমস্তক লক্ষ করতে ব্যস্ত। অস্বস্তিভরে সে জবাব দিল, হ্যাঁ, এই মাইক ডার্কসন। টমাস হয়তো এর পরের বাসেই এসে পড়বে।'

'শালাকে দেখে তো মনে হচ্ছে এক নম্বরের হারামজাদা।' ডার্কসনকে দেখে ব্লেক ঠিক খুশি হতে পারল না। এক অজানা আশঙ্কায় তার মন দুলে উঠল, 'নাঃ, ব্যাটা যে সাহসী, তা ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

ডার্কসন ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবেই কালো বুইকটাকে দেখছিল। ওর বয়স বছর পঁচিশের বেশি বলে মনে হল না। দেখতে সুশ্রী না হলেও ডার্কসনের মুখে রয়েছে সাহস ও দৃঢ়তার আভাস, এবং সেটা মরগ্যানেনর চোখ এড়াল না।

'ডার্কসনকে খুন করা ছাড়া জিনির আর কোনও উপায় নেই।' ধীরে ধীরে কথাকটা উচ্চারণ করল ব্লেক। হঠাৎ সে যেন মাথা ঘামাতে শুরু করেছে, 'আচ্ছা, জিনি কি ডার্কসনকে একবারও দেখেছে?'

'হ্যাঁ, গতকাল দেখেছে। কিন্তু একবারও মেয়েটা ভয় পায়নি। বার বারই বলেছে, ডার্কসনকে ও ঠিক কবজা করতে পারবে। তারপর জানি না কী করবে।'

এমন সময় খুলে গেল এজেন্সির দরজা। ডার্কসন ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। 'কিটসন দেখছি ঠিকই বলেছে' এ-তো সহজে হার মানবার পাত্র নয়।' শান্তস্বরে বলল ব্লেক, 'প্রথমেই একে শায়েস্তা করতে হবে, ফ্র্যাঙ্ক। তা নইলে, পরে বিপদ হতে পারে।'

'হ্যাঁ, এবং সেই শায়েস্তা করার দায়িত্বটা তোমার।' জিনির ওপর এ দায়িত্ব দেওয়া যাবে না, কারণ ও হয়তো ডার্কসনের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঠিক পেরে উঠবে না।' সামনের দিকে চেয়ে মরগ্যান বলে চলল, ড্রাইভারকে আমিই টিট করব। তোমার কাজ হবে। একটা রাইফেল নিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা। ডার্কসন যেই ট্রাক ছেড়ে বেরোবে তখনি তুমি রাইফেল তাক করবে ওর দিকে। এক মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হবে না। জিনির রিভলভারের সামনে ওর চালচলনের এতটুকু এদিক-ওদিক দেখলেই গুলি করবে। কোনওরকম ইতস্তত করবে না, বুঝেছ?'

ব্লেকের মনে হল তার গলাটা হঠাৎ যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটা তিক্ত স্বাদ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে শুকনো জিভটাকে মুখের চারপাশে বুলিয়ে নিল সে, ঘাড় নাড়ল, নিশ্চয়ই, সেজন্য তুমি ভেবো না। ডার্কসনকে আমি চোখে-চোখে রাখব।'

'ওই যে দ্বিতীয় বাসটা আসছে। সেই সঙ্গে আসছে আমার শিকার—ডেভ টমাস।' দাঁতে দাঁত চেয়ে বলল মরগ্যান।

ওয়েলিং এজেন্সির ট্রাক ড্রাইভার টমাস বেশ লম্বা-চওড়া লোক। মুখভাব এবং চলাফেরায় ডার্কসনের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সেই একই রকম উদ্ধত চিবুক, শীতল-অচঞ্চল চোখ। পাতলা টানা ঠোঁট। কিন্তু টমাসের বয়স একটু বেশিই হবে—তিরিশ বত্রিশের কাছাকাছি। বাস থেকে নেমে সেও এগিয়ে চলল এজেন্সির দরজার দিকে।

টমাসের দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে মুহূর্তের জন্যে অনিশ্চয়তার দোলায় দুলে উঠল মরগ্যানের মন। একদৃষ্টে, সরীসৃপ শীতল চোখে মরগ্যান টমাসকে দেখতে লাগল। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

'এই হল দু-নম্বর হারামজাদা।' বিরক্তিভরে বলে উঠল মরগ্যান, 'নাঃ, লোক বাছাই করার ব্যাপারে ওয়েলিং এজেন্সির তুলনা নেই! কোত্থেকে যে এই লোক দুটোকে জোগাড় করল কে জানে? তবে একটা ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ এড, টমাসকে আমাদের খুনই করতে হবে, তাছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।'

মাথা থেকে টুপি নামিয়ে কপালের ঘাম মুছল এড ব্লেক। তার বুকের স্পন্দন যেন হঠাৎ বেড়ে উঠল।

'আমাদের এই প্ল্যানের একটু এদিক-ওদিক হলেই আমরা কিন্তু জালে আটকা পড়ব ফ্র্যাঙ্ক। সুতরাং আমাদের ভীষণভাবে সাবধান হতে হবে।'

'এ কাজে সাফল্যের পুরস্কার দশ লক্ষ ডলার।' স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে বলে চলল মরগ্যান, 'আর সেই কারণে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একটু আলাদা। এড, আমার বয়েস এখন বিয়াল্লিশ বছর—তার মধ্যে পনেরো বছরই কেটেছে জেলের আবদ্ধ বাতাসে। যে ক-বছর বাইরে ছিলাম, সে কটা-বছরও পুলিসের নজর বাঁচিয়ে লুকিয়ে চলতে হয়েছে। এই করে জীবনের প্রতি আমার ঘেন্না ধরে গেছে। এত দিনে সার যা বুঝেছি, তা হল টাকা। টাকা না থাকলে তোমাকে কেউ পুঁছবেও না। কিন্তু যদি তোমার গাড়ি, বাড়ি, অঢেল টাকা থাকত—লোকে তোমাকে সম্মান করত, এ সমাজে তুমি হয়ে উঠতে একজন কেউকেটা। দু-লক্ষ ডলার আমার নোংরা জীবনে হবে এক পূর্ণচ্ছেদ, বাঁচার মতো করে আমি বাঁচতে পারব। তা যদি না পারি তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কী? অতএব ওই ট্রাকের টাকা হাতানোর ব্যাপারে কোনও বাধাই আমাকে রুখতে পারবে না—টমাস, ডার্কসন তো দূরের কথা! তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। মেনে নিচ্ছি ধরা পড়লে আমাদের ভাগ্যে আছে চরম দণ্ড। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ এড, আমরা এখন ঠিক কী অবস্থায় আছি। আমরা মরলাম কি বাঁচলাম, তাতে কার কী এসে যায়? সূর্য যেমন উঠছিল তেমনি উঠবে, শহরের কর্মব্যস্ত জীবনে এতটুকু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে না। আমরা একেবারে ফালতু। কিন্তু যখন দু-লক্ষ ডলারকে আমরা নিজেদের সঙ্গী করব, তখনই আমাদের রঙিন চোখের তারায় এই দুনিয়ার চেহারাটাই পালটে যাবে। আমরা হয়ে উঠব দশজনের একজন—ব্লেকের মুখের কাছে এগিয়ে এল মরগ্যানের ঘর্মাক্ত লালচে মুখ, 'আর আমি তাই হতে চাই...তুমি চাও না?'

টুপিটা আবার পরে নিল ব্লেক৪। শান্তস্বরে বলল, 'চাই না যে তা নয়। তবে আমি কী ভাবছি জান? আমি ভাবছি কিটসন আর জিপোর কথা। জিনির সামনে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে ওরা তো রাজি হল—ভোটও দিল আমাদের সপক্ষে, কিন্তু পরে কী হবে সেটা কি চিন্তা করে দেখেছ?'

'ও নিয়ে ভাববার কী আছে? রাজি যখন ওরা হয়েছে, তখন কাজটা ওদের করতেই হবে।' মরগ্যানের কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর।

'অবশ্য যদি শেষ পর্যন্ত ওদের মাথার ঠিক থাকে—'

'থাকতেই হবে। না হলে...'

'তোমার কথা যেন সত্যি হয়।' হাওয়ায় হাত নাড়ল ব্লেক, 'তবে বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত হয়তো ওরা...'

মরগ্যানের অচঞ্চল চোখের তারা স্থির হল ব্লেকের চোখে। কর্কশ স্বরে দাঁতে দাঁত চেপে সে উচ্চারণ করল, 'একবার যদি ট্রাকটা আমরা দখল করতে পারি,তবে ওটা আমরা খুলবই-ওদের দুজনের সাহায্য নিয়েই হোক, বা না নিয়েই হোক! এতটা পথ এসে ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান কোনও মতেই হাল ছাড়তে রাজি নয়।'

ব্লেক মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল, 'কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে, ফ্র্যাঙ্ক। এই কাজের প্রাথমিক খরচ হিসেবে অন্তত দু-হাজার ডলার আমাদের দরকার। কাল রাতে আলোচনার সময় আমরা কিন্তু এ কথাটা একবারও ভেবে দেখিনি। টাকাটা জোগাড় হবে কোত্থেকে বলো দেখি?'

'আমাদের একটা ছোট কাজে হাত দিতে হবে—যে কাজে বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে আসল কাজ—দশ লক্ষ ডলার; তার আগেই যদি পুলিশ আমাদের পিছু নেয় তবে এত পরিশ্রম, এত সাবধানতা সব পণ্ড হবে। সেই জন্যেই আমরা যে ছোট কাজটায় হাত দেব, সেটা সহজ, সরল, নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া দরকার। আমি কাল রাত থেকেই এ নিয়ে ভাবছি—'

ব্লেক সিগারেটে এক জোরালো টান দিল, 'দশ নম্বর সড়কের পেট্রল পাম্পটা লুট করলে কেমন হয়? ওই যে ডুকাস যাবার পথে—'

'হ্যাঁ, করা যায়। তবে আমি ভাবছিলাম আরও নির্জন কোনও জায়গার কথা—মানে ঠিক বড় রাস্তার ওপর কোনওরকম ঝামেলা করতে চাইছি না। আচ্ছা এড, ম্যাডক্স স্ট্রিটের ওই কাফেটার কথা তোমার মনে পড়ছে, যেটা সারারাত খোলা থাকে—?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন?'

'আমি ওটার কথাই মনে মনে ভাবছি। রাত্রিবেলা থিয়েটার-সিনেমার শেষে বেশির ভাগ লোকই ওই কাফেটায় যায়; আর পকেট তাদের ভারীই থাকে। ঠিক সেই সময় আমরা যদি ওদের ওপর গিয়ে পড়তে পারি, তাহলে দু-হাজার কেন, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকাই আমাদের হাতে আসবে। তাছাড়া কাজটায় কোনও উটকো ঝামেলার ভয় নেই।'

ব্লেক আমতা-আমতা স্বরে বলল, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, কাজটা কি সত্যিই সহজ? আমার তো মনে হয় না। হঠাৎ যদি কোনও খদ্দের অতিমাত্রায় সাহসী হয়ে ওঠে, তাহলে?'

'তাহলে তো খুব ভালো হয়, আমরা আসল কাজের মহড়া দিতে পারব।' ধূর্ত হাসি হাসল মরগ্যান, 'কারণ তুমি ভালোভাবেই জানো, টমাস ও ডার্কসন—ওরা দুজনেই খোলা রিভলভারের সামনে দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া জিনিকেও একটু পরীক্ষা করা যাবে। মুখে তো খুব লম্বা চওড়া কথা বলছিল, এই কাজের সময় দেখা যাবে ওর কত সাহস।'

'তার মানে মেয়েটা এ কাজেও আমাদের সঙ্গে থাকবে?'

'হ্যাঁ। আর থাকবে কিটসন, ওর ওপরে থাকবে গাড়ির দায়িত্ব। রিভলভার নিয়ে তুমি এবং আমি কাফের লোকগুলোকে সামলাব, জিনির কাজ হবে প্রত্যেকের কাছ থেকে টাকাগুলোর আদায় করা—ব্যস!

ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করল ব্লেক, 'ট্রাকের ব্যাপারটা না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু জিপো কি এই কাজেও কোনও গতর খাটাবে না, ফ্র্যাঙ্ক?'

'শোনো এড, জিপোকে নিয়ে তোমার এই চুকলিপনা বন্ধ করো। এ কাজে জিপোকে আমাদের প্রয়োজন হবে না। কেবলমাত্র এজেন্সির ট্রাকের তালা খুলতে আমরা ওর সাহায্য নেব। কারণ জিপো ছাড়া আর কারও পক্ষে যে ওই তালা খোলা সম্ভব নয়, সেটা তুমি বেশ ভালোভাবেই জানো। সুতরাং এই সব ছোটখাটো ঝামেলায় ওকে না জড়িয়ে আসল কাজের জন্যে রেখে দেওয়াই ভালো। তুমি কী বলো?'

'নিশ্চয়ই। তবে ভাবছি, জিপোর মতো আমিও যদি তালা-বিশারদ হতাম তাহলে বেশ পায়ের ওপর পা তুলে আয়েস করে দিন কাটাতে পারতাম।' কাঁধ ঝাঁকাল ব্লেক, 'যাক গে, এবার বলো ক্যারাভানটা আমরা কোত্থেকে জোগাড় করছি?'

'শুনেছি মার্লোয় একটা দোকান আছে, তারা ক্যারাভ্যান বিক্রি করে। টাকাটা হাতে আসামাত্রই আমি কিটসন আর জিনিকে সেখানে পাঠিয়ে দেব। ওরা গিয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেবে; বলবে হানিমুন কাটানোর জন্যে একটা ক্যারাভান ওদের দরকার।'

ব্লেক হাসল, 'কিটসনের দিকে নজর রেখো, ফ্র্যাঙ্ক। ও যেন এই হানিমুনের ব্যাপারটাকে আবার সত্যি বলে না ভেবে বসে।'

'এক কথা বার বার বলা আমি পছন্দ করি না, এড। 'খিঁচিয়ে উঠল মরগ্যান, 'এমনিতেই আমাদের হাতে সমস্যার অন্ত নেই, তা সত্ত্বেও যদি কেউ জিনির ব্যাপারে কৌতূহল দেখাতে যায় তবে ভুল করবে। তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছিঃ কোনওরকম লক্কাবাজি আমি বরদাস্ত করব না। কিটসন আমাদের চেয়ে বয়েসে ছোট, সুতরাং সদ্য-বিবাহিত স্বামীর ভূমিকায় সে-ই অভিনয় করবে। তবে সেটা কেবলমাত্র অভিনয়, তার বেশি কিছু নয়। আর আলেক্সের মাথায় যদি এই ব্যাপারটা না ঢোকে, তবে সবার আগে ওকে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

‘কিন্তু জিনি?’ ব্লেক প্রশ্ন করল, ‘তুমি কি এ সম্বন্ধে ওকে সাবধান করে দিয়েছ? বলেছ, কিভাবে ওকে সংযত হয়ে চলতে হবে?’

মরগ্যান ধীরে ধীরে গভীরভাবে শ্বাস নিল।

‘আমি জানতাম, একসময় কথাটা উঠবে।’ চাপা হিংস্র স্বরে উত্তর দিল সে, ‘যখনই জিনিকে আমি দেখেছি, তখনই জানি তোমরা তিন ভেড়ুয়া ওর পেছনে লাগবে। সেইজন্যে প্রথম থেকেই আমি বলেছি, কোনওরকম ছেনালিপনা দেখলেই সোজা তাড়িয়ে দেব।’ ঠোঁট বেঁকিয়ে ব্যঙ্গভরে হাসল মরগ্যান, ‘আমার কথায় ও কী বলেছিল জানো?’ ‘ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। আমার শুধু টাকার দরকার। অতএব তোমার পেয়ারের কুত্তাদের তুমি সামলাবে।’ সুতরাং বুঝতেই পারছ, টাকা ছাড়া মেয়েটা আর কিছু বোঝে না! তার মানে জিনির দিক থেকে তোমরা খুব একটা উৎসাহ পাবে না। ওর জীবনে প্রথম এবং শেষ কথা টাকা। কিটসন যদি মেয়েটাকে নিয়ে কোনও গণ্ডগোল বাধাতে চায়, তবে ও নিজেই বিপদে পড়বে। তোমার আর জিপোর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সুতরাং মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দাও।...আশা করি কথাগুলো এবারে তোমার মাথায় ঢুকেছে।

ব্লেক জোরালো গলায় হেসে উঠল, নিশ্চয়ই। আমারও মনে হয় এক্ষেত্রেও সেরকম কিছু ঘটবার কোনও চান্স নেই।’

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মরগ্যান শীতল, সরু পাঁচ আঙুলে আঁকড়ে ধরল ব্লেকের কবজি। চমকে উঠে সে চোখ রাখল মরগ্যানের কালো হায়েনা চোখে।

‘আমি ঠাট্টা করছি না, মিস্টার এডওয়ার্ড ব্লেক।’ নরম স্বরে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল মরগ্যান, ‘আমার ছকে বাঁধা অন্ধকার জীবন থেকে বেরিয়ে আসার এই একমাত্র সুযোগ। এবং সম্ভবত শেষ সুযোগ। তুমি যদি ভেবে থাক একটা বিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে লেপটা-লেপটি করে আমার প্ল্যানে ফাটল ধরাবে, তবে আরও একটা কথা তোমার মনে রাখা দরকার। যদি আমি দেখি, তোমার রিপুসংক্রান্ত দুর্বলতার জন্যে আমাদের এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হতে যাচ্ছ, তবে তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারব। মনে কোরো না, তোমার, জিপোর বা কিটসনের যৌন-তাড়নার জন্যে আমি আমার ভবিষ্যতের গোড়ায় কুড়ুল মারব। আশা করি আমার কথা বুঝতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না?’

ব্লেক প্রাণপণ চেষ্টায় শুকনো মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল, বলল, ‘তোমার হল কী, ফ্র্যাঙ্ক? আমি এমনি ইয়ারকি করছিলাম।’

মরগ্যান সামান্য ঝুঁকে এল ব্লেকের দিকে। তার তামাকের গন্ধভরা নিঃশ্বাস ঝাপটা মারল ব্লেকের মুখে, ‘ইয়ারকিই যেন হয়!’

এক দীর্ঘ উৎকণ্ঠাময় নিস্তব্ধতা। দুজনের স্থির, কঠিন দৃষ্টি পরস্পরের ওপর নিবদ্ধ। অবশেষে পরিস্থিতি হালকা করার উদ্দেশ্যে ব্লেক বলে উঠল, ‘তোমার কি মনে হয় এই গাড়িটা ক্যারাভানটাকে টানতে পারবে?’

‘পারতেই হবে—অবশ্য ক্যারাভানটা যে ভারী হবে না তা আমি বলছি না।’ মরগ্যান সিটে গা এলিয়ে দিল। তার নিকোটিনের তোপে-ভরা আঙুল গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বাজনা বাজিয়ে চলল, ‘তবে রাস্তাও খুব একটা উঁচু-নিচু নয় যে ক্যারাভানকে টেনে নিয়ে যেতে গাড়িটার অসুবিধে হবে। শুধু প্রথম তিরিশ-চল্লিশ মিনিট আমাদের একটু কষ্ট হবে। কারণ ওই সময়ের মধ্যেই অকুস্থল থেকে যতটা দুরে যাওয়া যায় আমাদের সরে পড়তে হবে। তারপর ভাবনার আর কিছু নেই।... শোনো এড, তুমি এই গাড়িটাকে একবার ভালো করে পরীক্ষা করে রেখো। নয়তো রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ যদি খারাপ হয়ে পড়ে তাহলে বিপদের আর কিছু বাকি থাকবে না। একেবারে খুঁটিনাটি সমস্ত পরখ করে দেখবে।’

‘নিশ্চিন্ত থাকো : গাড়ি নিয়ে কোনও গোলমালে আমাদের পড়তে হবে না। কিন্তু জিনির জন্যে একটা গাড়ি যে আমাদের দরকার? সেটা জোগাড় হচ্ছে কী করে?’

‘আসল কাজের দিন-দুয়েক আগে কোনও একটা কার-পার্ক থেকে একটা গাড়ি লোপাট করলেই হবে। তুমি দুটো নকল নাম্বার-প্লেট আগে থাকতেই তৈরি করে রেখো, আর জিপোর কাজ হবে চোরাই গাড়িটার রং-পালটে নতুন রঙ লাগানো। জিনি যখন গাড়িটা চালাবে, তখন যেন ওটা চোরাই গাড়ি বলে কোনও পুলিশের চোখে ধরা না পড়ে।’

হঠাৎ ব্লেক কনুই দিয়ে মরগ্যানের পাঁজরে এক খোঁচা মারল। মরগ্যান চমকে ফিরে তাকাতেই এজেন্সির কাঠের দরজার দিকে ইশারা করল ব্লেক, ‘ওই যে ট্রাকটা আসছে...’

আর্মার্ড ট্রাক এজেন্সির চওড়া কাঠের দরজা হাট করে খুলে গেল। তখনই চোখে পড়ল ট্রাকটা।

মরগ্যান বা ব্লেক আগে কখনও ট্রাকটাকে স্বচক্ষে দেখেনি। ওরা ট্রাকের প্রতিটি অংশের ছবি নিখুঁত করে মনে এঁকে নিল।

ব্লেক ভেবেছিল এই অদ্ভুত যুগান্তকারী জিনিসটা বেশ বড়-সড়ই হবে। কিন্তু ওটার আকৃতি ওকে অবাক করল। চারটে চাকার ওপর বসানো একটা ছোট ইস্পাতের বাক্স—আর তার সামনে ড্রাইভারের কেবিন—ব্যাস! টমাসের হাতজোড়া স্টিয়ারিংয়ের ওপর সহজ অথচ পেশাদারি ভঙ্গিতে আলতো করে রাখা; চোখের সতর্ক দৃষ্টি সামনের রাস্তার ওপর। টমাসের পাশেই টান-টান হয়ে বসে আছে মাইক ডার্কসন।

ট্রাকটা আস্তে আস্তে নেমে এল রাস্তায়। মরগ্যানও তার গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল। রাস্তাটায় এমনিতেই হাজারও গাড়ির জটলা। মরগ্যান অনেক চেষ্টায় চলন্ত ট্রাকটার কাছাকাছি এগিয়ে গেল—মাঝখানে শুধু দুটো গাড়ির ব্যবধান।

‘আমি ভেবেছিলাম ট্রাকটা অনেক বড় হবে।’ কথা বলতে বলতে ব্লেক উঁচু হয়ে সামনের লিংকন গাড়িটার বাধা কাটিয়ে ট্রাকটাকে দেখতে চেষ্টা করল, ‘দেখে তো জিনিসটাকে খুব একটা শক্ত-পোক্ত বলে মনে হচ্ছে না।’

‘তাই নাকি? তোমার মতো অনেকেই ট্রাকটার এই ছোট আকার দেখে ভুল করে।’ হাসল মরগ্যান।

রাস্তা একটু ফাঁকা হতেই অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় লিংকন গাড়িটার পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল মরগ্যান। এবারে ট্রাকের পিছনটা পরিষ্কার দেখতে পেল, কারণ মরগ্যানের বুইক আর ওয়েলিং এজেন্সির ট্রাকের মধ্যে এখন ব্যবধান শুধু একটা হুড-খোলা স্পোর্টস কার।

ট্রাকের পিছনের দরজায় ছাপা হরফে লে খাঃ

দ্য ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক সার্ভিস
—আবিষ্কারের জগতে এক নতুন আলোড়ন—
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে নিরাপদ
ট্রাক আপনার সামনে উপস্থিত।
মূল্যবান জিনিসপত্র পরিবহনের দায়িত্ব
আমাদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

ব্লেকের শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে এল। মসৃণ দ্রুতগতিতে ছুটে-চলা ট্রাকটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। দূর থেকে মনে হল যেন একটা নিরেট ইস্পাতের বাক্স চার চাকার ওপর গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। ব্লেকের মনে হল, এই ছোট্ট ইস্পাতের বাক্সটা শুধু তার ভবিষ্যৎ নয়, তার জীবনের বিরুদ্ধেও এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ।

‘ডানদিকে দ্যাখো।’ বলে উঠল মরগ্যান।

ব্লেকের বিবর্ণ চোখ চকিতে ফিরে তাকাল ডানপাশে।

একজন মোটর বাইক পুলিশ গাড়ির ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে অপসৃয়মান ট্রাকের দিকে।

'এবার কেটে পড়াই ভালো।' মরগ্যান বলল, 'এই শালা এখন থেকে শহরের শেষ পর্যন্ত ট্রাকটার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকবে। আর আমরা যদি এখুনি ওই ট্রাকের পিছু না ছাড়ি, তবে মোটরবাইকওয়ালা সন্দেহ করবে।'

'গাড়ি ঘুরিয়ে পাশের একটি রাস্তায় ঢুকে পড়ল মরগ্যান?

শেষবারের মতো ব্লেকের চোখে পড়ল ওয়েলিং এজেন্সির ট্রাকটা—তার পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে সেই মোটর বাইক পুলিশ অফিসার। দৃষ্টিপথ থেকে ট্রাকের দৃশ্য সরে যেতেই অনেকটা নিশ্চিন্তবোধ করল সে; তার শ্বাস-প্রশ্বাস আবার সহজ হয়ে এল।

সামনে একটা গাড়ি রাখার জায়গা খালি দেখে বুইকটা সেখানে থামাল মরগ্যান, 'যাক, ট্রাকটা তাহলে তোমার দেখা রইল...'

'তা রইল; কিন্তু তাতে সুবিধে কিছু হল বলে তো মনে হয় না। শুধু একটা ইস্পাতের বাক্স—ব্যস! ওহ-হো, তুমি সময়টা লক্ষ করেছিলে তো, কখন ট্রাকটা এজেন্সি ছেড়ে বেরোল?'

'হ্যাঁ। ঠিক আটটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিট।' মরগ্যান একটা সিগারেট ধরাল, 'এখন থেকে মোটামুটি তিন ঘণ্টা ট্রাকটা সেই বিপজ্জনক বাঁকের কাছে পৌঁছবে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, জিপো আর কিটসন এই গরমে ঝোপের পেছনে বসে গলদঘর্ম হয়ে ট্রাকটার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ, ফ্র্যাঙ্ক, কাজটা যে বড় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—তবে একেবারে সোজা নয়। এর জন্যে আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হব।'

'যদি ভাগ্য সহায় থাকে, তাহলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। ভালো কথা—এখন একবার সেই কাফেটায় গিয়ে চোখ বুলিয়ে আসতে হবে। কারণ ওটা লুট করার পর আমরা কোন রাস্তা দিয়ে পালাব সেটা আগে থাকতেই দেখে রাখা দরকার।...শোনো এড, এই ছোট কাজটায় আমাদের কোনও রকম—কোনও রকম ভুল করলে চলবে না; এর ওপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

'শুধু এটা কেন, আসল কাজেও আমাদের কোনও গলতি হবে না।' আধবোজা চোখে মরগ্যানকে দেখল ব্লেক, 'এখন থেকে আর কোনও ভুল নয়।'

মরগ্যান মাথা নাড়ল, তারপর গাড়ি ছুটিয়ে দিল সামনের রাস্তা ধরে...।

সাড়ে এগারোটার কিছু পরে কিটসন আর জিপো পৌঁছল সেই বিপজ্জনক বাঁকের কাছে। রিসার্চ স্টেশন থেকে বাঁকের দূরত্ব মাইল দুয়েক হবে। কিটসন গাড়ি থামাতেই জিপো নেমে পড়ল। ঝরঝরে লিংকনটা চালিয়ে নিয়ে কিটসন চলল আশ্রয়ের খোঁজে। কিছুদূর গিয়ে একরাশ বুনো ঝোপের আড়ালে জিপোর গাড়িটা লুকিয়ে ফেলল সে। তারপর ধীরে ধীরে আবার পা-বাড়াল বাঁকের দিকে—যেখানে দাঁড়িয়ে জিপো তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সূর্যের প্রখর রোদের তাপ কিটসনের কাছে অসহ্য বলে মনে হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে সে ঘামাতে শুরু করল।

কিটসনের পরনে বুক-খোলা গাঢ় নীল রঙের শার্ট, আঁটোসাঁটো কালো প্যান্ট। এতক্ষণ গাড়িতে বসে থাকার পর হাত-পা ছড়ানোর সুযোগ পেয়ে তার ভালোই লাগল। স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে সে এগিয়ে চলল ধুলোভরা রাস্তা ধরে।

বাঁকটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল কিটসন। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে জায়গাটাকে কৌতূহলভরে দেখতে লাগল।

রাস্তাটা সোজা এসে এই জায়গায় হঠাৎ খানিকটা সরু হয়ে গেছে। রাস্তার দু-ধারে পড়ে রয়েছে দুটো বিশাল পাথর, সম্ভবত দু-পাশের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে এসেছে রাস্তায়। পাথরগুলো ঘন ঝোপঝাড়ে ঢাকা—অর্থাৎ গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করার পক্ষে চমৎকার জায়গা।

কিটসনের হঠাৎ খেয়াল হল, জিপোর যেখানে অপেক্ষা করার কথা সেখানে সে নেই। কিন্তু একটা হালকা অস্বস্তিকর অনুভূতি তাকে জানিয়ে দিল জিপো আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে—লক্ষ করছে কিটসনকে।

কিটসন খুশিই হল। জিপোর মতো কোনও স্থূলকায় লোকও যে এত নিখুঁতভাবে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে, তা না দেখলে সে বিশ্বাস করতে পারত না। তার হারানো আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এল।

প্রথম থেকেই এই কাজটায় কিটসনের আপত্তি ছিল। কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্ক ওর সমস্ত সাহসকে শুষে নিচ্ছিল। বারবারই ওর মনে হয়েছে, টমাস অথবা ডার্কসন কিছু একটা গণ্ডগোল না বাঁধিয়ে ছাড়বে না।

বক্সিং ছাড়বার পর থেকে গত ছ-মাস ধরে কিটসন রয়েছে মরগ্যানের কাছে। কিটসনের শেষ লড়াই ছিল একজন বেঁটে-খাটো অনামী মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু এমনই অদ্ভুত অবাক ব্যাপার, সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই ক্ষিপ্র, খর্বকায় ব্যক্তিটি কিটসনের মতো সা-জোয়ানকে রিংয়ের ভেতর একেবারে তুলোধনা করে ছাড়ল।

ড্রেসিংরুমে ফেরার পর কিটসনের ম্যানেজার দুটো দশ ডলারের নোট তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। তারপর মুচকি হেসে, 'বিদায়, মিঃ হারকিউলিস' বলে বিদায় নিয়েছিল। এবং প্রায় একই সঙ্গে ড্রেসিংরুমে উপস্থিত হয়েছিল ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান।

ভীষণভাবে আহত কিটসনকে পোশাক পরতে সাহায্য করেছে মরগ্যান। তারপর ওকে হাত ধরে নিয়ে গেছে নিজের গাড়িতে। গাড়ি করে কিটসনকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে সে।

'তাহলে রিংয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শেষ, কী বলো?' বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে থাকা অবসন্ন কিটসনকে লক্ষ করে প্রশ্ন করেছে মরগ্যান। সে কিটসনের শোবার ঘরে একটা ভাঙা চেয়ারে বসেছিল। কিটসন জবাব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। বিষণ্ণভাবে হেসে মাথা নেড়েছে।

'তাতে কী হয়েছে?' মরগ্যানের স্বরে আশ্বাসের সুর, 'তুমি আর আমি দুজনে এখন থেকে একসঙ্গে কাজ করতে পারি। তোমার গাড়ি চালানো আমি দেখেছি: ওরকম গাড়ি চালাতে খুব কম লোকই পারে। আমি জনাকয়েক লোক নিয়ে একটা ছোট দল করতে চাই। এমন লোক, যারা দ্রুত অথচ নিখুঁতভাবে যে কোনও কাজ হাসিল করতে পারবে, আর সেই সঙ্গে বেশ কিছু টাকাও রোজগার করতে পারবে। তোমার কী মত?'

সেই তেইশ বছর বয়েসেই কিটসন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে, তার উচ্চাশার কৃষ্ণচূড়া আলোর অভাবে শুকিয়ে গেছে। ওর বড় সাধ ছিল নাম করবে, বক্সিংয়ে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হবে, কিন্তু সে সবই এখন দুঃস্বপ্নের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, অন্য সব ব্যর্থ মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো সেও আজ আশ্রয় নিয়েছে পথপার্শ্বের আবর্জনায়। বিবর্ণ ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গ জীবন এবং পকেটের কুড়ি ডলারের কথা ভেবে তার কান্না পেল। কিন্তু তবুও তার ইতস্তত ভাব মরগ্যানের চোখ এড়াল না।

মরগ্যানের কুখ্যাতির কথা কিটসনের অজানা ছিল না। মরগ্যান যে পনেরো বছর জেলও খেটেছে, সেকথাও সে জানত। তাই সে ইতস্তত করছিল। মরগ্যানের দলে যোগ দেওয়া মানে যে অন্ধকার জগতে চিরনির্বাসন সেটা বুঝতে তার দেরি হল না। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর যে অনিশ্চিত, নিঃসঙ্গ জীবন। কিটসন একা একা কী করে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবে। কী করে গড়ে তুলবে তার বিবর্ণ ভবিষ্যৎ? সুতরাং নিরুপায় এবং মরিয়া হয়েই মরগ্যানের দলে যোগ দিয়েছিল। পরাজিত মুষ্টিযোদ্ধা আলেক্স কিটসন।

এ পযন্ত যে পাঁচটা কাজ সে মরগ্যানের দলের হয়ে করেছে, তা থেকে তার আর্থিক উন্নতি নেহাত কম হয়নি। অবশ্য সে কাজগুলোয় তেমন একটা ঝুঁকি ছিল না; তার ওপর মরগ্যানের সরল অথচ নিখুঁত প্ল্যান সে কাজগুলোকে করে তুলেছিল আরও সহজ। কিটসন জানত, ধরা পড়লে প্রথম অপরাধ হিসেবে তার শাস্তি হবে অত্যন্ত হালকা : বড়জোর তিন থেকে ছ-মাসের জেল।

এ কাজগুলো যে চূড়ান্ত কাজের মহড়া, সেটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি কিটসনের ছিল। কারণ মরগ্যান সম্পর্কে যতটুকু সে জেনেছে,তাতে মনে হয় না, তার মতো লোক এইসব ছোটখাটো কাজ করেই সন্তুষ্ট থাকবে। আজ হোক-কাল হোক, মরগ্যান একটা বড় কাজে হাত দেবেই; এবং ধরা পড়লে তখন শাস্তির পরিমাণও হবে বিশাল—হয়তো বিশ বছরের কারাদণ্ডও হতে পারে। কিটসনের কেন যেন মনে হয়েছে সেই চূড়ান্ত নিয়তি তাকেও রেহাই দেবে না।

উচ্চাশার শেষ ধাপে পৌঁছবার জন্যে সে যখন প্রাণপণে মুষ্টিযুদ্ধ অভ্যাস করছে, তখনই হঠাৎ ওয়েলিং এজেন্সির ড্রাইভারের চাকরিটা কিটসন পেয়ে যায়। কিন্তু হলে কী হবে, সে চাকরি তার কপালে টিকল মাত্র দশদিন। কারণ এজেন্সির নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে কিটসন পাল্লা দিতে পারেনি। রোজ সময়মতো কাজে আসা তো দূরের কথা, ট্রাক চালাতে গিয়েও তেমন দক্ষতার পরিচয় সে দিতে পারেনি। রিভলভার ছোঁড়া অভ্যাস করার সময় তার এলোমেলো লক্ষ্যভেদ শিক্ষকের বিরক্তিকর কারণ হয়েছে। সুতরাং অনিবার্যভাবেই এজেন্সির ফোরম্যান একদিন কিটসনকে ডেকে তার হিসেব-পত্তর চুকিয়ে দিল এবং উপদেশ দিল রাস্তা দেখতে। সেইখানেই কিটসনের এজেন্সি-অধ্যায়-এর ইতি।

কিন্তু এজেন্সি সম্পর্কে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে কিটসনের কাছে ওই দশদিনই ছিল যথেষ্ট। এ কাজে হাত দেওয়া মানে যে শঙ্খচূড়ের লেজে পা দেওয়া, সে বিষয়ে তার মনে কোনও সন্দেহ নেই। মরগ্যানের আত্মবিশ্বাস এবং স্পর্ধার কথা ভেবে কিটসনের অবাক লাগল। যেন মুখোমুখি মুষ্টিযুদ্ধে সে জর্জ ফোরম্যানকে চ্যালেঞ্জ করতে চলেছে। সেই লড়াইয়ে কিটসনের জয়লাভের সম্ভাবনা যতটুকু, এই কাজেও মরগ্যানের সাফল্যের সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই—তার বেশি নয়।

কিটসন জানে,টমাস ও ডার্কসন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হার স্বীকার করবে না, বরং রিভলভার চালাবার চেষ্টা করবে—হয়তো কেউ মারাও পড়বে। আর তারপর যদি কিটসন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, তাহলে বিশ বছরের জেল, নয়তো সোজা ইলেকট্রিক চেয়ার।

কিটসন ঠিক করেছিল, এ কাজে হাত দেওয়ার চেয়ে সে দল ছেড়েই চলে যাবে। চলেও হয়তো যেত, যদি না এর মধ্যে জিনি এসে উপস্থিত হতো।

জিনির মতো করে কোনও মেয়ে আজ পর্যন্ত কিটসনের সঙ্গে কথা বলেনি, এমন অদ্ভুতভাবে কোনওদিন তাকায়নি। মেয়েটার এই বিশেষত্বই কিটসনকে মুগ্ধ করেছে। এমন কী প্রথম সাক্ষাতের নেশাটুকুও সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তার চোখের সামনে ভাসছে জিনির একরাশ তামাটে চুলের জলছবি, ও সাগর-সবুজ চঞ্চল চোখজোড়া...

অর্থাৎ জিনির জন্যে, কেবলমাত্র জিনির জন্যেই সে এই কাজে মরগ্যানকে সমর্থন করছে। কিটসন জানে, এই দুঃসাহসের পরিণতি তেমন মধুর হবে না; হয়তো চরম পরিণতির মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে—কিন্তু তবুও সে পিছিয়ে আসতে পারছে না। পারছে না জিনির উপহাসের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে।

চারদিকে চেয়ে আরও একবার জিপোকে খুঁজল কিটসন, কিন্তু কোথাও ওকে দেখতে পেল না।'

'ঠিক আছে, জিপো—এবার বেরিয়ে এসো।' কিটসন উঁচু গলায় ডেকে উঠল।

একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল জিপো। কিটসনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল।

'কিরকম লুকিয়েছি বলো? এক্কেবারে হাপিস!' তুড়ি বাজিয়ে এক অদ্ভুত ইশারা করল জিপো।

কিটসন এগিয়ে গেল জিপোর কাছে।

'লুকোবার একটা জায়গা বটে!' উবু হয়ে জিপোর পাশে বসে জায়গাটা দেখতে লাগল সে। তারপর একপলক হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওরা এসে পড়বে—যদি অবশ্য রাস্তায় কোথাও না থামে।'

জিপো চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল মাটির ওপর। ওপরের অবতল নীল আকাশের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল।

‘নীল আকাশের দিকে তাকালেই আমার দেশের কথা মনে পড়ে, আলেক্স। মনে পড়ে সেখানকার আকাশ যেন এর চেয়েও সুন্দর এর চেয়েও নীল।’

‘কিটসন তাকাল জিপোর দিকে। জিপোকে তার ভালো লাগে। এই সাদাসিধে লোকটার সহানুভূতি ভরা মন সবাইকে কাছে টানে। না, জিপোর স্বভাব মোটেই ব্লেকের মতো নয়। ব্লেকের মুখে সবসময় মাগী চরানোর গল্প। তাছাড়া কথায়-কথায় হাত চলে। আর যে সব রসিকতা সে করে, তা সবসময়েই প্র্যাকটিক্যাল জোক।

এমনিতে এডের সাহস আছে, বুদ্ধি আছে—কিন্তু তার বন্ধুত্ব কিটসন কেন, আরও অনেকেরই কাম্য নয়। অথচ জিপো একেবারে আলাদা। কারও বিপদে সাহায্য করার জন্যে সে সর্বদা এগিয়ে আসে। নিজের পকেটের শেষ ডলারটা পর্যন্ত ধার দিতে সে দ্বিধা করে না। কিন্তু ব্লেকের কাছ থেকে কোনও সাহায্য নেওয়া মানে বঁড়শি গেলা।

‘কোথায় দেশ তোমার জিপো?’ কিটসন উপুড় হয়ে শুয়েছিল। অতি সন্তর্পণে মাথা উঁচিয়ে সে সামনের রাস্তার দিকে দেখল।

‘ফিসোলে। ইটালির ফ্লোরেন্সের কাছাকাছি।’ মুখে গভীর চিন্তার ভাব ফুটিয়ে জিপো বলল, ‘তুমি কোনওদিন ইটালিতে গেছ, আলেক্স?’

‘উঁ—হুঁ—’

‘যাওনি? গেলে বুঝতে পারতে পৃথিবীতে তার চেয়ে সুন্দর দেশ আর নেই।’ জিপোর বুক ঠেলে বেরিয়ে এল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস, ‘আর বিশ বছর হল আমি দেশের মুখ দেখিনি। বি-শ-ব-ছ-র! এই টাকাটা পেলে কী করব জানো? সোজা দেশে ফিরে যাব। প্রথমেই জাহাজের ফার্স্ট ক্লাসের একটা টিকিট কাটব। ইটালি পৌঁছে একটা চোখ ঝলসানো গাড়ি কিনব। সেটা চালিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হব বাড়িতে—মার কাছে। আমাকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে যাবে।...তারপর একটা বাগানবাড়ি কিনব পাহাড়ের ওপরে। যেখান থেকে পুরো ফ্লোরেন্স শহরটাকে দেখা যাবে। ... আলেক্স, আমার বাবা মারা গেছে প্রায় বারো বছর হল, কিন্তু মা আজও আমার ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ভাবছি, ফিরে গিয়ে একটা বিয়ে-টিয়ে করে ফেলব। ছেলে-মেয়ে নিয়ে কাটিয়ে দেব বাকি জীবনটা।...টাকা থাকলে সবই হয়। ফ্র্যাঙ্ক ঠিক বলেছেঃ হাতের মুঠোয় পৃথিবী! সত্যিই তো ইচ্ছে করলে দশ লাখ ডলার দিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে কিনে ফেলতে পারি।’

যদি না পুলিশের গুলিতে মারা যাও—ভাবল কিটসন। যদি না জাহাজে ওঠার আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়।

জিপো খুশিভরা চোখে তাকাল কিটসনের দিকে। হাতের ওপর মাথা রেখে প্রশ্ন করল, ‘তোমার টাকা নিয়ে কী করবে ভাবছ? কিভাবে খরচ করবে কিছু ঠিক করেছ?’

জিপোর কথা শুনে কিটসনের মনে হল সে যেন কোনও অপরিণতিবুদ্ধি কিশোরের সঙ্গে কথা বলছে।

‘আমার মনে হয় টাকাটা হাতে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। সাত-তাড়াতাড়ি এতসব পরিকল্পনা করার কোনও মানে হয় না। বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত হয়তো আমরা হেরে গেলাম—তখন সমস্ত স্বপ্ন এক ঝাপটায় মিলিয়ে যাবে।’

জিপো একটু যেন অস্বস্তিবোধ করল, ‘একটা কথা কী জান আলেক্স? জীবনে স্বপ্ন দেখাটাই সবচেয়ে সুন্দর জিনিস। জানি, সে স্বপ্ন হয়তো কোনওদিন বাস্তবে রূপ নেবে না। কিন্তু তবুও স্বপ্ন দেখার এক অদ্ভুত আনন্দ আছে। আমি সবসময় আসন্ন ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ভাবতে ভালোবাসি। এ আমার বহু বছরের স্বভাব। স্বীকার

করছি, আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে, কিন্তু এবারের কথা আলাদা। দু-লক্ষ ডলার!...এত টাকা কিভাবে খরচ করব ভেবে পাচ্ছি না!'

কিটসন কাঁধ ঝাঁকল, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আসল কথাটা কী জানো? টাকাটাই এখন আমরা হাতে পাইনি।' কথা শেষ করে হাসল কিটসন।

'আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুমি প্রথমেই একটা গাড়ি কিনবে।' জিপো শুকনো মাটি মুঠো করে তুলে হাত মেলে ধরল। তার মোটাসোটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ল ধুলোর ঝরনা। সেদিকে তাকিয়ে সে বলল, 'বলো আলেক্স, ঠিক বলছি কি না? আমি জানি, তুমি গাড়ি চালাতে ভালোবাস। তোমার মতো গাড়ি চালাতে আমি কাউকে দেখিনি। সুতরাং প্রথমেই তোমার একটা স্পোর্টস কার কেনা উচিত। তারপর খুঁজে পেতে নিজের জন্যে একটা সুন্দরী বউ জোগাড় করো—তারপর বাকি জীবনটা সুখে কাটিয়ে দাও। মাথা দুলিয়ে হাসল জিপো, 'আচ্ছা, জিনিকে তোমার কেমন লাগে বলো তো? দারুণ দেখতে, না? একটা কথা শুনে রাখো আলেক্স—ইটালির মতো জায়গাতেও জিনির মতো সুন্দরী খুব কমই আছে। তবে মেয়েটা আমার তুলনায় বড্ড বাচ্চা; তা না হলে ওকে নিয়ে আমি ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতাম।...তোমার সঙ্গে জিনিকে কিন্তু দারুণ মানাবে আলেক্স। ওর রুক্ষ ব্যবহারকে তেমন আমল দিও না। ও সবই ওপর-ওপর। তুমি যদি ওর হৃদয়ে পৌঁছতে পার, তবে দেখবে ওর ভেতরটা আর সব মেয়ের মতোই সুন্দর নরম। আমার তো মনে হয়, তোমাকে ও কিছুতেই ফেরাতে পারবে না ।'

কিটসন চুপচাপ শুনল। উন্মুক্ত ঘাড়ে অনুভব করল উত্তপ্ত সূর্যের পরোক্ষ স্পর্শ। জিপো ছাড়া যদি অন্য কেউ তাকে এ ধরনের কথা বলত,তাহলে সে মোটেই আমল দিত না। কিন্তু জিপো একেবারে তার মনের কথা বলছে। কথাগুলো ভেবে কিটসনের অবাক লাগল। কে জানে, হয়তো জিপোর কথাই ঠিক।

জিনিকে বুঝতে কিটসন হয়তো ভুল করেছে। হয়তো... কিন্তু যখনই জিনির ঠান্ডা সবুজ চোখজোড়া চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তখনই কিটসনের মনে দ্বিধার ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। সত্যিই কি জিনি তার আহ্বানে সাড়া দেবে?

'আলেক্স, আমার একটা কথার খোলাখুলি জবাব দাও তো? 'সূর্যের আলো সরাসরি মুখে এসে পড়ায় চোখ বুজল জিপো, 'তুমি সত্যি-সত্যি কি ভাবছ জিনির কথা?—জানো, তোমার জন্যে মাঝে মাঝে আমার চিন্তা হয়। এই কথায় তোমার হয়তো হাসি পাবে, কিন্তু আমি ঠাট্টা করছি না, আলেক্স। কাল রাতে ফ্র্যাঙ্কের কথায় যখন মনে মনে রাজি হলাম, তখনও আমি তোমার কথা ভেবেছি। আমি জানতাম, আমার মতো তোমারও এ কাজে অন্তরের সায় নেই। তুমি এ কাজটা চাওনি,তাই না? আমিও চাইনি। কিন্তু পর মুহূর্তেই তুমি হঠাৎ মনস্থির করে বসলে, তুমি রাজি। কেন? আমাকে সোজাসুজি জবাব দাও।'

হাতের উলটোপিঠ দিয়ে কিটসন কপালের ঘাম মুছল, 'আগে বলো তোমার রাজি হওয়ায় কারণ কী?'

'মেয়েটার কথায় কী যেন একটা আছে।'মৃদু স্বরে উত্তর দিল জিপো, 'ও যখন ঘরে ঢুকল, তখন ওকে দেখে অবাক হলাম। ওর কথা বলার জোরালো ভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস আমাকে অবাক করল। আমি যেন নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেলাম। ফ্র্যাঙ্কের কাছে যখন কাজটা সম্পর্কে শুনেছি, তখন একেবারেই রাজি হইনি। সমস্ত প্ল্যানটাকে কেমন খেলো আর অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু জিনি এসে সব ওলট-পালট করে দিল। মনে হল মেয়েটার প্ল্যান নেহাত পলকা নয়। তার ওপর দু-লক্ষ ডলারের হাতছানি আমাকে পাগল করে তুলল। এতদিনকার বাড়ি-গাড়ির স্বপ্ন—সব যেন এসে ভিড় জমালো ব্রেনের কোষে কোষে! আমাকে দামি স্যুট পরে, চোখ-ঝলসানো গাড়ি থেকে নামতে দেখে মায়ের অবিশ্বাস-ভরা খুশি-খুশি মুখটা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম। কী জানি কী হয়ে গেল, রাজি হয়ে গেলাম।'

'হুঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। মেয়েটার মধ্যে কী যেন একটা আছে।' কিটসনের স্বরে অস্বস্তির সুর, 'তাই তোমার মতো আমিও রাজি হয়ে গেলাম।'

সে যে জিনির ঘৃণার মুখোমুখি দাঁড়াতে না পেরে মরগ্যানের সপক্ষে ভোট দিয়েছে, সে-কথা কিটসন মরে গেলেও স্বীকার করতে পারবে না। জিপোর মতো সে অত আশাবাদী নয়। বারবারই তার মনে হয়েছে, এ কাজে হাত দিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ভালো করেনি—এবং এই প্রথম যে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হবে, সে বিষয় কিটসন মোটামুটি নিশ্চিত। শুধু তার দুঃখ হচ্ছে জিপোর জন্যে। গো-বেচারা লোকটা এখন থেকেই খোয়াব দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু কিটসন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, নিয়তি তার সূক্ষ্ম জাল অতি সন্তর্পণে তাদের চারিদিকে গুটিয়ে আনছে।

'আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে কি না আমাদের রাজি করিয়ে ছাড়ল? এখন মনে হচ্ছে...' আচমকা থেমে গেল জিপো। মাথা তুলে ক্ষুদে-ক্ষুদে কালো চোখ সতর্কভাবে মেলে ধরল। চকিতে দেখল চারপাশের ঝোপঝাড়ের দিকে।

কিটসন অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'কী, ব্যাপার?'

'কিসের যেন একটা শব্দ হল না?' জিপোর কান খাড়া করে স্থিরভাবে বলে, 'যেন কিছু একটা চলে বেড়াচ্ছে? সাপ নয়তো, আলেক্স?'

'সাপ? তো কী হয়েছে? সাপ আমাদের ধারে কাছেও ঘেঁষবে না।' জিপোর বিবর্ণ ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল কিটসন। সে চাইছিল জিনি সম্পর্কিত কথাবার্তা চালিয়ে যেতে। জিনিই এখন তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

'বলা যায় না, এসব জায়গায় সাপের উপদ্রব থাকতে পারে, আলেক্স।' জিপোর জলহস্তী চেহারা ভয়ে কাঠ। শুকনো গলায় ও বলে চলল, 'আর এমনিতেই সাপকে আমি খুব ভয় পাই। আমার যেন মনে হল ও-পাশ দিয়ে কী একটা চলে গেল।'

মুখভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে কিটসন ঘুরে তাকাল জিপোর নির্দেশিত জায়গার দিকে। কিন্তু কিছুই তার চোখে পড়ল না।

'আলেক্স, আমার ছোট ভাই সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল। আমি এইমাত্র যেভাবে শুয়েছিলাম সেও ঠিক এইভাবেই শুয়েছিল। আর কোত্থেকে হঠাৎ একটা সাপ এসে ছোবল মারল ওর মুখে। ওকে কোলে করে বাড়ি পৌঁছবার আগেই ও মারা গেল। দশ বছরের মাখন-নরম বাচ্চা ছেলেটা দেখতে দেখতে নীল হয়ে গেল—ওর চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল অমানুষিক যন্ত্রণার ছাপ। এই সাপটা...'

কিটসনের রুক্ষ স্বরে চুপ করে গেল জিপো।

"ভগবানের দোহাই, জিপো। দয়া করে তোমার বকবকানি বন্ধ করো। কে তোমার ছোট ভাইয়ের কথা শুনতে চেয়েছে? মানলাম সে সাপের কামড়ে মারা গেছে, কিন্তু সাপের কামড়ে কি কেউ মারা যায় না?'

জিপো মুখ তুলে তাকাল কিটসনের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা।

'তোমার ভাই যদি এইভাবে সাপের ছোবলে মারা যেত, তাহলে তুমি আর এ ধরনের কথা বলতে না, আলেক্স। আমার ছোট ভাইয়ের সেই করুণ মৃত্যুর কথা আমি কি কোনওদিন ভুলতে পারব? তারপর থেকেই কেন জানি না, সাপ দেখলেই আমার ভীষণ ভয় করে।'

'কোথায় মেয়েটাকে নিয়ে দিব্যি কথা বলছিলাম, আর মাঝখান থেকে তুমি এই সাপের ব্যাপারটা টেনে আনলে!' অধৈর্য সুরে বলে উঠল কিটসন।

'না, আমার মনে হল যেন কিসের একটা শব্দ শুনলাম ; তাই।'

'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে—মেনে নিলাম তুমি একটা অদ্ভুত শব্দ শুনেছে। কিন্তু তাই বলে ধরে নিলে ওটা সাপের চলাফেলার শব্দ? তোমার এই কল্পনার বলিহারি যাই—হুঁঃ!'

জিপো একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বহুদূরে চলন্ত ধুলোর মেঘ চোখে পড়ায় চুপ করে গেল। হাত বাড়িয়ে কিটসনের কাঁধে হাত রাখল। আঙুল দেখাল ধুলোর কুণ্ডলীর দিকে।

‘ওরাই আসছে বলে মনে হচ্ছে না।’

কিটসন একচোখে চেয়ে রইল সুদূরপ্রসারী আঁকাবাঁকা রাস্তার দিকে। একটা জমাট আতঙ্কের পিণ্ড তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চাইল।

সহজাত অনুভূতিবশেই মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে। হাত বাড়িয়ে জিপোকে নিচু হতে বলল। জিপো শুনতে পেল তার চাপা উত্তেজিত ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, ‘লুকিয়ে পড়ো! ওরাই আসছে!’

পাথরের মতো নিশ্চলভাবে পড়ে থেকে ওরা লক্ষ করতে লাগল দ্রুত এগিয়ে আসা ট্রাকটাকে।

সামনের একটা বাঁকে ট্রাকটা মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার হাজির হল ওদের অপলক চোখের সামনে। ওরা লক্ষ করল, এবারে ট্রাকটার গতি যেন কিছুটা কমে গেছে। সম্ভবত বিপজ্জনক বাঁকের কাছে পৌঁছে ওরা কোনওরকম দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ট্রাকটা ওদের অতিক্রম করার সময় কিটসন হাতঘড়িতে সময় দেখল।

হাওয়ায় ঝাপটা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ট্রাকটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় পলকের জন্যে ওরা দেখতে পেল টমাস এবং ডার্কসনকে।

চলন্ত ট্রাকের ছবিটা মনের পরদায় খোদাই করে জিপো উঠে বসল।

ট্রাকটা একটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই ওরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ধুলোর মেঘ থেকে চোখ সরিয়ে অস্বস্তিভরা চোখে তাকাল পরস্পরের দিকে।

‘একটা ট্রাক বটে!’ জিপো গাল চুলকোতে লাগল, ‘কিন্তু লোক দুটোকে দেখেছ? যেন শয়তানের চ্যালা!’

চলন্ত ট্রাকে বসে থাকা টমাস ও ডার্কসনকে কিটসন বেশ ভালোভাবেই দেখতে পেয়েছে। মোটামুটি ভালোভাবেই সে ওদের দুজনকে চেনে। তাই মরগ্যানকে বারবার সে সাবধান করে দিয়েছে। এখন ওদের দেখার পর কিটসনের সেই পুরোনো ভয়টা আবার ফিরে এল। উইন্ডশিল্ডের ও-পিঠে বেজির চোখ নিয়ে বসে-থাকা টমাস ও ডার্কসনের ছবি তার মনে টেনে দিল এক আতঙ্কের পরদা। কিটসনের মনে পড়ল, আর কিছুদিনের মধ্যেই ওদের সামনে তাকে মুখোমুখি চ্যালেঞ্জে দাঁড়াতে হবে। কেউ যেন একমুঠো বরফ-কুচি ছড়িয়ে দিল তার মস্তিস্কে।

‘তুমি এ জন্যে ভেবে ভয় পাচ্ছ, জিপো? সহজ হওয়ার চেষ্টা করল কিটসন, ‘তোমাকে তো আর ওদের সামনে আসতে হচ্ছে না! আর তাছাড়া, আমরাই কি কম নাকি? ওরা যদি শয়তানের চ্যালা হয় তবে আমরাও অনুবিসের অনুচর।’

জিপো অস্বস্তিভরে মাথা নাড়ল, ‘ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে না ভেবে আমি সত্যিই হালকা বোধ করছি। ওরা নেহাত সহজ লোক নয়!’

কিটসন পকেট থেকে একটা নোটবই বের করল। তাতে ট্রাকের বিপজ্জনক বাঁক অতিক্রম করার সময়টা টুকে নিল।

‘তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। মরগ্যান আর ব্লেকই ওদের সামলাবে।’ বিরক্তিভরে জবাব দিল কিটসন।

‘কিন্তু জিনি? ওর কথাটা একবার ভেবে দেখেছ? ওইটুকু একটা মেয়ে, সে বলে কি না দরকার পড়লে গুলি চালাবে! আমার তো বিশ্বাসই হতে চায় না! তোমার কি মনে হয় ও সত্যি-সত্যিই তাই করবে?

কিটসন বারবার এই কথাটাই ভাবছিল। ভাবছিল, জিনি সত্যিই কি তা পারবে। সে যেন দেখতে পেল জিনির অতলান্ত সবুজ চোখ, উৎকণ্ঠাময় অভিব্যক্তি।

ঠোঁট উলটে জিপোর কথায় জবাব দিল কিটসন, ‘কী জানি?’ যাকগে, এবার চলো।’ হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল সে। চোখ চেয়ে রাস্তাটা একবার এদিক-ওদিক দেখে নিল, কিন্তু জিপো, ট্রাকটাকে তুমি খুলতে পারবে তো?’

‘ফ্র্যাঙ্ক তো বলেছে ট্রাকটা খুলতে আমাকে তিন-চার সপ্তাহ সময় দেবে। তাহলে তো ভাবনার কোনও কারণ নেই। যন্ত্রপাতি আর সময় ঠিক মতো পেলে আমি খুলতে পারব না এমন তালা আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। অতএব ফ্র্যাঙ্ক যদি আমাকে তিন-চার সপ্তাহ সময় দিতে পারে তবে নির্ভাবনায় থাকো। ওই শালার ট্রাক আমি খুলবই! আমারও নাম জিপো ম্যানডিনি!’

‘ফ্র্যাঙ্কও সেই কথাই বলছিল; কিন্তু মনে করো যদি কিছু একটা গোলমাল হয়ে যায়। যদি তোমাকে তাড়াহুড়োর মধ্যে ট্রাকের তালা ভাঙতে বলা হয় তাহলে কি তুমি পারবে, জিপো?’

জিপোর ভরাট মুখে পলকের জন্যে কেঁপে উঠল অস্বস্তির ছায়া, ‘এ কথা কেন বলছ, আলেক্স? ফ্র্যাঙ্ক তো আমাকে কথা দিয়েছে তিন-চার সপ্তাহ সময় দেবে। তাহলে আর ভয় কী? এতদিন ধরে তা দেখছি ফ্র্যাঙ্কের কথার কোনও নড়চড় হয়নি! তোমার তালা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলেও বেশ বুঝতে পারছ এই ট্রাকটা খোলা ছেলেখেলার কথা নয়। ধীরে, অথচ নিখুঁতভাবে এই তালা খুলতে হবে—আর তার জন্যে সময় চাই। সুতরাং তাড়াহুড়ো করে সম্ভব নয়।’

‘তুমি এখানে অপেক্ষা করো,আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি।’ কিটসন এগিয়ে চলল গাড়ির সন্ধানে।

জিপো চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইল কিটসনের দিকে। কিন্তু মনে মনে ভেবে চলল জিনির কথা, ওর প্রতিটি ভাব-ভঙ্গি, কিটসনের সঙ্গে ওর কথা বলার ধরন। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করল জিপো!

এই কাজটা নিয়ে এত আলোচনার কী আছে? ভাবল সে অনুভব করল সূর্যের অসহ্য উত্তাপ। ফ্র্যাঙ্ক যখন ওদের আশ্বাস দিয়েছে, তখন কোনও ভয় নেই। তার ওপর ওই পুঁচকে মেয়েটা যেন ধরেই নিয়েছে দু-লক্ষ ডলার ওর হাতের মুঠোয়। তাছাড়া, এ কাজে জিপোর ভূমিকা খুব একটা বিপজ্জনক নয়! তাকে শুধু ট্রাকের তালাটা খুলতে হবে। আর ফ্র্যাঙ্ক যখন বলেইছে, ওকে তিন-চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে, তখন আর চিন্তার কী আছে? তালা এবং বিভিন্ন ধাতু সম্বন্ধে যাদের একটু অভিজ্ঞতা আছে, তারা ওই সময়ে যে কোনও তালাই খুলে ফেলতে পারবে—তা সে যত শক্তই হোক!

ওয়েলিং আর্মার্ড ট্রাক নিঃশব্দে এগিয়ে গেল রিসার্চ স্টেশনের দিকে। তার চালক অথবা রক্ষী, কেউই জানতে পারল না চারজোড়া অনুসন্ধানী চোখ তাদের দৈনন্দিন কর্মপন্থাকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখছে। সাদা ধুলোর কুণ্ডলীকে পিছনে ফেলে ওরা এগিয়ে চলল...

তিন

রাত আটটায় মরগ্যান একটা আলোচনা সভা ডেকেছিল লু স্ট্রাইগারের জুয়ার আড্ডায়। কিন্তু ব্লেক পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই—সাতটা পঁয়তাল্লিশ। কারণ অবশ্য তেমন কিছু নয়; নেহাত তার ঘড়িটা বেয়াড়া সময় দিচ্ছেল বলেই।

বার-এর লোকজনের ভিড় ঠেলে ব্লেক এগিয়ে চলল। ঘরের বন্ধ আবহাওয়া ভারী হয়েছে সিগারেটের ধোঁয়ায়। অনেক পরিশ্রমের পর সে দেখতে পেল স্ট্রাইগারকে। লালমুখো, মোটা লোকটা জুয়ার বোর্ডের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে।

‘কেউ ভেতরে গেছে নাকি, লু?’ ব্লেক প্রশ্ন করল।

‘উঁহু। দরজা খোলাই আছে। স্বচ্ছন্দে যেতে পার!’

‘আচ্ছা, আমাকে একটা স্কচ খাওয়াও দেখি!’

স্ট্রাইগারের এগিয়ে দেওয়া গেলাসটাকে দু-চুমুকে শেষ করে নামিয়ে রাখল ব্লেক। আনমনাভাবেই এগিয়ে গেল কোনার একটা টেবিলের দিকে। টুপিটাকে পিছন দিক থেকে সামান্য ঠেলে বসে পড়ল সে। টাইয়ের নটটাকে সামান্য আলগা করে গা-এলিয়ে দিল চেয়ারে।

অস্বাচ্ছন্দ্য আর ভাবপ্রবণতা ব্লেকের মন থেকে একমুহূর্তের জন্যও নিষ্কৃতি পায়নি। বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্কের ওই রেস্তোরাঁ লুটের ব্যাপারটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে—জিনির চিন্তা তো আছেই!

অন্য তিনজনের মতো ব্লেকের জীবন অতটা জটিল ছিল না; বরং সুখ সুবিধা ছিল প্রচুর। ব্লেকের বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর ইচ্ছে ছিল একমাত্র ছেলেকে ভালোভাবে মানুষ করবেন, লেখাপড়া শিখিয়ে ডাক্তার করবেন। কিন্তু এত সুখে থেকেও পড়াশোনার ব্যাপারটা ব্লেকের কাছে বড় একঘেয়ে মনে হল। তাই মেডিকেল কলেজে বছর-দুয়েক কাটানোর পরই সে পড়াশোনার অধ্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ টেনে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হল।পরে অনেক কষ্টে একটা চাকরি জোগাড় করল; কমিশনে গাড়ি কেনা-বেচার কাজ; এবং একইসঙ্গে সে আবিষ্কার করল নারী-সঙ্গ তার কাছে হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। সুতরাং অনিবার্যভাবেই আয়ের চেয়ে বিভিন্ন পথে ব্যয়ের পরিমাণই হতে লাগল বেশি। অবশেষে একদিন সে বুঝতে পারল পর্বতপ্রমাণ ঋণের বোঝায় তার শিরদাঁড়া নুয়ে পড়েছে। তখনই ব্লেক হাত লাগল কোম্পানির সিন্দুকে। সিন্দুক থেকে চার হাজার ডলার সরিয়ে সে চম্পট দিল। তার মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাল যে পুলিশের চোখে সে সাফল্যের সঙ্গেই ধুলো দিতে পেরেছে। তাই গোয়েন্দা-পুলিশের জালে জড়িয়ে পড়ার মুহূর্তেই পরিস্থিতির আকস্মিকতায় ব্লেক একেবারে বোকা বনে গেল। তখন পর্যন্ত চার হাজার থেকে সে খরচ করেছে মাত্র দুশো ডলার। এরপর যথারীতি সে দোষী সাব্যস্ত হল, এবং শাস্তি পেল ছ-মাসের কারাদণ্ড। তখন ব্লেকের বয়েস মাত্র বাইশ বছর। পরে আর যে ব্লেক জেল খাটেনি, তা নয়। আরও দুবার তাকে যথাক্রমে তিন এবং চার বছরের জন্যে জেলে যেতে হয়েছে। ক্রমে-ক্রমে ব্লেকের মনে জেল সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ঘৃণা এবং আতঙ্ক গড়ে উঠেছে।

শেষ বার, যখন সে চার বছরের শাস্তি ভোগ করেছে, তার দেখা হয় মরগ্যানের সঙ্গে—ওই জেলেই। মরগ্যান তখন তার পনেরো বছর সশ্রম কারাদণ্ডের শেষ বছরটা কোনওরকমে কাটাচ্ছে। কিন্তু পনেরো বছর জেলের কথা শুনেই ব্লেকের শিরদাঁড়া কেঁপে উঠেছে—বুকে বয়ে গেছে হিমেল স্রোত।

ওরা জেল থেকে ছাড়া পেল একই সঙ্গে। ছাড়া পাওয়ার পর মিলেমিশে দল বাঁধার প্রস্তাবটা মরগ্যানই রাখল ব্লেকের কাছে। অরাজি হওয়ার কোনও যুক্তি খুঁজে না পেয়ে ব্লেক রাজি হল।

ব্লেকের রাজি হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল গোলমেলে লাইনে মরগ্যানের খ্যাতি। জেলে থাকতে অনেকেরই মুখেই সে শুনেছে আজ হোক কাল হোক, মরগ্যান একটা মোটা দাঁও মারবেই। এবং তারপর সে একজন কেউকেটা হয়ে বসবে। সুতরাং ব্লেক মরগ্যানের প্রস্তাবে রাজি হতে দ্বিধা করেনি।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে জীবনের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে ব্লেকের চোখের সামনে ধরা পড়েছে শুধুই হতাশা এবং ব্যর্থতার ইতিহাস। ভবিষ্যতের বিবর্ণ রূপ ও তার অজানা ছিল না। তাই জীবনের প্রথম এবং শেষ জুয়ার সে বাজি ধরেছে। ভবিষ্যতের রং বদলের চরম চেষ্টা না করে সে হার মানতে রাজি নয়। তার মনে হয়েছিল মরগ্যানই তাকে নিয়ে যাবে ঐশ্বর্যের রাজপথে। যে পথে কানাগলির আকারহীন বীভৎস প্রবেশের অধিকার নেই।

ঘরের কোণায় একা একা বসে বসে স্বপ্নের জাল বুনে চলল ব্লেক। ভাবতে লাগল তার অংশের দু-লাখ ডলারের কথা। দু-লক্ষ ডলার! অত টাকা নিয়ে কী করবে সে? দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে? ব্লেকের মন স্বপ্নের পাখায় ভর করে উড়ে চলল! ওর চোখের সামনের রঙিন পরদায় ভেসে উঠল দেশ-বিদেশের সুন্দরী তরুণীদের ছবি, যাদের সুখ-সঙ্গের জন্যে সে পাগল। বেশ কিছুদিন মৌজ করার পর সে যাবে মন্টি কার্লোয়। সেখানে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে আরও কিছু টাকা তাকে হাতাতে হবে। তারপর...

এমন সময় সমস্ত দিবাস্বপ্নের জাল ছিঁড়ে ব্লেকের সামনে উপস্থিত হল জিনি গর্ডন। ভেসে বেড়ানো ধোঁয়ার পুঞ্জ ভেদ করে ও এগিয়ে এল। উদ্ধত চিবুক, চোখের ভাষায় তাচ্ছিল্য। বার-এর অন্যান্য মধু-পিয়াসীর দল জিনিকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, চোখ টেপাটেপি করতে লাগল। লুক স্ট্রাইগার তার জুয়ার আড্ডায় নারী সংক্রান্ত কোনওরকম আঠালো ব্যাপার পছন্দ করে না। নইলে বার-এ ঢোকার পর জিনির কী অবস্থা হতো বলা মুশকিল।

ওফ্ একটা জিনিস বটে—ভাবল ব্লেক। তার চোখজোড়া অদূরে দাঁড়ানো জিনির শরীরে আটকানো। গোপন আলোচনার জন্যে লু স্ট্রাইগারের কয়েকটা বিশেষ ঘর আছে। সেগুলো সে মোটা টাকায় খদ্দেরদের ভাড়া দেয়। বার থেকে বেরিয়ে দু-তিন ধাপ সিঁড়ি নামলেই ঘরগুলো চোখে পড়ে। ব্লেক লক্ষ করল জিনি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত।

জিনির পরনে আঁটোসাঁটো কালো নাইলনের কালো স্ল্যাক্স, আর শ্যাওলা সবুজ শার্ট—গলার কাছটা সামান্য খোলা।

কিন্তু মেয়েটাকে বশ করা বড় কঠিন। আপন মনেই বলে উঠল ব্লেক। কোথায় থাকে, কী করে, কে জানে। তবে ওর সঙ্গ লাভে ব্লেকের বিন্দুমাত্রও অনীহা নেই। এখন একটু-আধটু মিষ্টি কথা বলে ওকে হাতে রাখা দরকার। পরে এই ট্রাক-ফাকের ঝামেলা মিটে গেলে জিনিকে নিয়ে একটু ফুর্তি করা যাবে। মেয়েটার মধ্যে প্রাণ আছে, আনন্দ আছে—আর চেহারা তো আছেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ব্লেক। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। ঘরগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে জিনিকে ধরে ফেলল সে।

‘এই যে, জিনি—আমরা দুজনেই তাহলে প্রথমে পৌঁছলাম, কী বলো?’ তারপর কয়েক মুহূর্ত ব্লেকের চোখ খেলে বেড়াল জিনির আঁটোসাঁটো স্ল্যাক্সের ওপর, ‘ওফ্, এটা পরে তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে!’

জিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্লেকের আপাদমস্তক দেখল। সাগর-সবুজ-চোখ অভিব্যক্তিহীন নিস্পৃহ।

‘তাই নাকি?’ নিরুত্তাপ স্বরে উত্তর দিল জিনি। তারপর দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিল ঘরের আলোটা।

আলো জ্বেলে ও এগিয়ে গেল গোল টেবিলের কাছে। চেয়ারে বসে হাতব্যাগটা খুলল। চিরুনি আর আয়না বের করে অবাধ্য একমাথা তাম্রাভ চুলের বন্যাকে আয়ত্তে আনতে চাইল।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব্লেকও বসল জিনির মুখোমুখি। প্রশংসাভরা চোখে অপলকে সে চেয়ে রইল জিনির তরঙ্গায়িত যৌবনের দিকে।

‘শুনেছ তো, আজ রাতেই আমরা ছোট কাজটা সারছি।’ হাসল ব্লেক, ‘ভয় পেলে নাকি?’

আয়না আর চিরুনি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল জিনি। বের করল এক প্যাকেট সিগারেট।

‘ভয়? এতে ভয় পাওয়ার কী আছে?’ নিস্পৃহ স্বরে ও পালটা প্রশ্ন করল।

‘তা অবশ্য ঠিক—অন্তত তোমার বেলায়!’ জিনির দিকে চোখ রেখে ব্লেক বলল, ‘তুমি ভয় পেয়েছ বললেও আমি বিশ্বাস করতে পারব না।’

ব্লেক ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। লাইটার জ্বালিয়ে ধরল জিনির ঠোঁটের সামনে।

কয়েকটি নিটোল মুহূর্ত কেটে গেল নীরবতায়। জিনি স্থিরচোখে চেয়ে রইল লাইটারের কম্পমান নীল শিখার দিকে। তারপর মাথা নামিয়ে সিগারেটের অগ্রভাগ স্পর্শ করাল লাইটারের আগুনে। ওর উষ্ণ, নরম রক্তিম ঠোঁট কুঞ্চিত হল রহস্যময় হাসিতে—কিন্তু সে পলকের জন্যে। এই দুর্জ্ঞেয় হাসির অর্থ ব্লেকের কাছেও রয়ে গেল অস্পষ্ট।

‘হঠাৎ হাসবার কী হল?’ তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ব্লেক।

জিনির চোখজোড়া আবার এসে থামল জ্বলন্ত লাইটারের ওপর। তাকাল ব্লেকও। এবং সবিস্ময়ে সে লক্ষ করল, তার হাত থরথর করে কাঁপছে। এক ঝটকায় লাইটার নিভিয়ে দিল ব্লেক, চেয়ারে টান-টান হয়ে বসল, হাসল কষ্টকৃত হাসি।

‘ঠিকই ধরেছ, জিনি, আমি ভয় পাচ্ছি। কিন্তু কেন জান?” টেবিলে আড়াআড়ি হাত রেখে, তার ওপর ভর দিয়ে সামান্য ঝুঁকে এল ব্লেক, ‘আমার ভয় হচ্ছে, আজ রাতের ছোট কাজটায় কোনওরকম গোলমাল বাঁধিয়ে আসল কাজটাকে আমরা না কেঁচিয়ে ফেলি! তার ওপর এই রেস্তোরাঁ লুটের মতলবটা আমার ঠিক পছন্দসই

নয়। ফ্র্যাঙ্ককে বহুবার আমি বারণ করেছি। এর চেয়ে ডুকাসের ওই পেট্রোলপাম্পটা কায়দা করা আমাদের পক্ষে অনেক সোজা এবং নিরাপদ ছিল—কিন্তু কে শোনে কার কথা। তাছাড়া ভেবে দেখো, এই রেস্তোরাঁর ব্যাপারটায় কোনও খদ্দের হঠাৎ বেশি সাহসী হয়ে উঠতে পারে—তখন? বুঝতেই পারছ, সে ক্ষেত্রে আমাদের গুলি চালানো ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। আর সেই গুলিতে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে আসল কাজে হাত দেবার আগেই পুলিশ আমাদের পেছনে লাগবে।'

ব্লেকের চোখে চোখ রেখে জিনি নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, 'তাহলে কেউ যাতে সাহস দেখাতে না যায়, সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে।'

'কাজে করার চেয়ে রেখে জিনি নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, 'তাহলে কেউ যাতে সাহস দেখাতে না যায়, সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে।'

'কাজে করার চেয়ে মুখে বলা অনেক সোজা।'

ভুরু উঁচিয়ে অবাক চোখে তাকাল জিনি, 'তাই নাকি? ঠ্যাঙানির কাছে ক্ষ্যাপা কুকুরও পোষ মানে; তেমনি রিভলভারের সামনে বীরত্ব দেখাতে গেলে তার ফল যে ভালো হয় না, সেটা বেশ ভালো করে প্রত্যেকের সমঝে দিতে হবে। তাহলেই আর গোলমালের কোনও ভয় থাকবে না।'

ব্লেকের ভুরু কুঁচকে উঠল সংশয়ে, 'তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, জিনি।...আচ্ছা, এর আগে কি কখনও কোনও দলের হয়ে তুমি কাজ করেছ?'

জিনির সবুজ চোখে নেমে এল ঘন মেঘের ছায়া।

'তাহলে আমাকে বোঝবার চেষ্টা কোরো না।' সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিল ও।

ব্লেক অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, 'ঠিক আছে। তুমি যদি নিজেকে পরদার আড়ালেই রাখতে চাও, রাখো—আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো, আজ রাতে সবচেয়ে কঠিন কাজটা পড়েছে তোমারই ওপর। অর্থাৎ রেস্তোরাঁর খদ্দেরদের কাছ থেকে তাদের মানিব্যাগগুলো তোমাকেই জোগাড় করতে হবে। সেই সময়ে কেউ হয়তো তোমাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং সাবধান থেকো।

ব্লেক মনে মনে জিনিকেও তার অবস্থার অংশীদার করতে চাইল। কিন্তু সে অবাক হল জিনির জবাব শুনে।

'আমার রিভলভারের সামনে সে চেষ্টা কেউ করবে বলে তো মনে হয় না।' নির্বিকার অভিব্যক্তিহীন মুখে বলল ও।

এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকুল জিপো ও কিটসন।

ব্লেকের সঙ্গে জিনিকে ঘরের মধ্যে আবিষ্কার করে ভীষণ অবাক হল কিটসন। তার মনের চাপা ক্রোধ প্রতিফলিত হল রক্তিম মুখমণ্ডলে।

'এই যে, জামাইবাবু এসে গেছেন দেখছি।' ঠাট্টার সুরে বলে উঠল ব্লেক। তারপর বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল, 'এ ব্যথা কী যে ব্যথা, বোঝে কী আন জনে...'

জিপো আর হাসি চাপতে পারল না। সশব্দে হেসে উঠল সে। তার কালো চোখের তারা নেচে উঠল উপচে পড়া খুশিতে। ব্লেকের রসালো টিপ্পনিতে সে দোষের কিছু দেখল না। কিন্তু কিটসনের মুখমণ্ডল হয়ে উঠল ফ্যাকাসে। উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'থামো।' তোমার এই ছাগল-মার্কা রসিকতা পকেটে পুরে রাখো।'

ব্লেক গান বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। মুখে ফুটে উঠল তাচ্ছিল্যের হাসি, 'চটছ কেন, আলেক্স? ফ্র্যাঙ্কই তো বলল, তুমি আর ও... ...' আঙুল তুলে নির্বিকারভাবে বসে থাকা জিনির দিকে দেখাল ব্লেক, 'নব-বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী সাজতে যাচ্ছ, ক্যারাভানে চড়ে যাচ্ছ হানিমুন কাটাতে।'

'আমি তোমাকে থামতে বলেছি, এড।' দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল কিটসন।

'আরে, এতে তোমার আপত্তিটা কিসের? হালকা সুরে জানতে চাইল ব্লেক, 'কেন, তুমি কি জিনির সঙ্গে হানিমুন কাটাতে রাজি নও। এমনিতেই ট্রাক-লুটের ব্যাপারে তোমার ভূমিকাটা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার ওপর জিনির মতো একটা চামর যন্তরকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালানোর চেয়ে মজা আর কী হতে পারে? অবশ্য সে সময়টুকু তোমাকে কাজে লাগাতে হবে, মানে...'

গুটিকয়েক পা ফেলে চকিতে ব্লেকের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল কিটসন। বিদ্যুৎচমকের মতো ঝলসে উঠল তার ডান হাত। আধমনি হাতুড়ির মতো সপাটে আছড়ে পড়ল ব্লেকের চোয়ালে।

গোটা ঘরটা যেন কেঁপে উঠল প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে। চেয়ারসুদ্ধ মেঝেতে উলটে পড়ল ব্লেক ডিগবাজি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর চোখ তুলে ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকাল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে।

'ওঠ শালা ভেড়ুয়ার বাচ্চা। তোর সবকটা দাঁতই আমি উপড়ে নেব।!' কিটসনের বিশাল শরীর রাগে কাঁপছে। 'এই আলেক্স—শোনো—' জিপো ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কিটসনের হাতের এক ঝটকায় সে ছিটকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দেওয়ালে।

ব্লেক বারকয়েক মাথা ঝাঁকিয়ে ঘৃণাভরা চোখে দেখল কিটসনকে, 'বহুদিন ধরে শুধু এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষাই করছিলাম। শালা, এবার তোর বক্সিং করার শখ চিরকালের জন্যে ঘুচিয়ে দেব!'

ব্লেক সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ঘরে এসে ঢুকল মরগ্যান।

তাকে দেখে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল জিপো, 'ওদের আটকাও, ফ্র্যাঙ্ক! ওরা এক্ষুনি একটা মারপিট বাঁধাবে!'

মরগ্যান দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে থামল দুজনের মাঝখানে। কিটসনের দিকে পিছন ফিরে ব্লেকের মুখোমুখি দাঁড়াল সে, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' কৃত্রিম নম্রস্বরে তিরস্কার করল মরগ্যান। তার সরীসৃপ কালো চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

ব্লেক ইতস্তত করল, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। কোটটাকে টেনেটুনে ঠিক করল, আঙুল চালাল অবিন্যস্ত চুলের ফাঁকে। একটা চেয়ার হ্যাঁচকা মেরে টেনে নিয়ে তাতে বসল। মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে চোখ রেখে আহত চোয়ালে হাত বেলাতে লাগল সে।

মরগ্যান এবার ফিরল কিটসনের দিকে, 'দলের মধ্যে কোনওরকম গোলমাল করবার চেষ্টা কোরো না, আলেক্স, তাহলে তুমি নিজেই গোলমালে পড়বে। এই শেষ এই নিয়ে আর দ্বিতীয় দিন তোমাকে আমি সাবাধান করব না। নাও—বোসো!'

জিনি এবং ব্লেকের থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা চেয়ার দিয়ে বসে পড়ল কিটসন।

জিপো তখনও অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। টেবিলের কাছে এসে জিনির পাশে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ আমতা আমতা করল, 'তোমার পাশে বসলে কোনও আপত্তি আছে?'

জিনি মাথা নাড়ল, 'উঁহু—স্বচ্ছন্দে বসতে পার।'

বিব্রত হয়ে কপট হাসি হাসল জিপো। বসল জিনির পাশে।

মরগ্যান ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। ঠোঁটের কোনায় অলস ভঙ্গিতে ঝুলছে একটা জ্বলন্ত সিগারেট; মাথার টুপি চোখের ওপর টেনে নামানো।

'শোনো তাহলে—' বলতে শুরু করল মরগ্যান, 'আজ রাত ঠিক বারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় আমরা সেই রেস্তোরাঁটা লুট করছি; অর্থাৎ যখন কাফে থাকবে খদ্দেরদের ভিড়ে জমজমাট—এবং অন্য কেউ যে হঠাৎ এসে পড়ে আমাদের কাজ পণ্ড করে দেবে সে সম্ভাবনাও কম। স্বাভাবিকভাবে গাড়ির সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে কিটসনের ওপর!' মরগ্যান থামল, এক পলক দেখল কিটসনকে, 'তুমি তো জানো রেস্তোরাঁটা কোথায়! সুতরাং পালাবার পথ খুঁজে নিতে তোমার কোনওরকম অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে আমাদের জন্যে তুমি রাস্তার অপেক্ষা করবে। যদি শেষ পর্যন্ত কাজটা পণ্ড হয়ে যায় তাহলে

তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি ছোটাতে হবে—আর কোনও গাড়ি যদি আমাদের পিছু নেয় তবে তাকে ঝেড়ে ফেলার ভার আমি তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম—কী বলো?'

গুম হয়ে বসেছিল কিটসন। মরগ্যানেরে কথায় সে শুধু মাথা হেলাল।

'জিনি, তুমি, এড আর আমি—' পায়চারি করতে করতেই বসে চলল মরগ্যান, 'এই তিনজন রেস্তোরাঁয় ঢুকব। লু আমাকে একটা মেশিনগান ধার দেবে বলেছে। তাছাড়া তোমার আর এডের হাতে রিভলভার থাকবে। আমার পেছনে পেছনে তুমি ভেতরে ঢুকবে। আমরা ঢুকলেই এড দরজার পরদা ফেলে দেবে—খোলা রিভলভার হাতে দরজাটা পাহারা দেবে। 'আমি সোজা গিয়ে দাঁড়াব বার-এর ওপর যাতে মেশিনগান দিয়ে গোটা ঘরটাকেই কবজা করতেই পারি। আশা করি মেশিনগান দেখে কেউ আর বিশেষ চেঁচামেচি করবে না। যাকগে, এইভাবে লোকগুলোর চুপ করানোর পর শুরু হবে তোমার কাজ। অর্থাৎ প্রত্যেকের মানিব্যাগগুলো তোমাকে সংগ্রহ করতে হবে। ক্যাশ টাকা ছাড়া আর কিছু আমরা চাই না। কিন্তু এড, সেই সময় যদি কেউ কাফেতে ঢোকবার চেষ্টা করে, তবে তাকে বাধা দেওয়ার দায়িত্ব তোমার। ঠিকমতো যদি আমরা সব কাজ করতে পারি, তাহলে মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় লাগবে না। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর।' জিনির দিকে আঙুল দেখাল মরগ্যান, 'কাজ করার সময় তোমাকে ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে—কারণ মানিব্যাগ তোলার সময় হয়তো কোনও মাতাল আচমকা তোমার রিভলভার কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে। আর নেহাত প্রয়োজন না পড়লে আমরা বন্দুক ব্যবহার করতে চাই না।'

জিপোর কালো চোখ অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। এ কাজে তার কোনও ভূমিকা নেই ভেবে তার আশ্বস্ত লাগল।

কিটসন একদৃষ্টে টেবিলের দিকে তাকিয়ে নখ খুঁটতে লাগল। গাড়ির দায়িত্ব দেওয়ার জন্যে ফ্র্যাঙ্ককে সে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। ওঃ কাফেতে সটান ঢুকে চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোককে সামাল দেওয়া নেহাত চাট্টিখানি কথা নয়! তার নিজের অতখানি সাহস আছে কি না সে বিষয়ে কিটসনের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ব্লেক ভেতরে ভেতরে তখনও কিটসনের ওপর রাগে জ্বলছে। কিন্তু মরগ্যানের কথায় তার মন থেকে কিটসনের চিন্তা একেবারে উবে গেল। একটা অদ্ভুত শীতল অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার পাকস্থলীটা যেন কুঁকড়ে যেতে চাইল।

'ঠিক আছে', বলল ব্লেক, 'তুমি যদি এ ভাবেই কাজটা করবে বলে ঠিক করে থাক তবে আমার আর কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, এর চেয়ে একটা সহজ কাজ নিলেই আমরা ভালো করতাম—এ কাজটা আমার একেবারেই মনপসন্দ নয়।'

মরগ্যান পায়চারি থামিয়ে থমকে দাঁড়াল, 'আমি তা জানি এড। কিন্তু এ-কাজের আগে এটা মোটামুটিভাবে আমাদের একটা পরীক্ষা। এই কাজ থেকেই আমি বুঝতে পারব, আসল কাজের সময় তোমরা মাথা ঠান্ডা রেখে এগোতে পারবে কি না। সেই জন্যে এই কাঠে লুটের প্ল্যানটা আমার মাথায় এসেছে—' মরগ্যান টেবিলের কাছে এগিয়ে এল, সরাসরি চোখ রাখল জিনির চোখে, 'এটা তোমারও পরীক্ষা জিনি। প্রথম থেকেই তুমি বড় বেশি কথা বলেছ, এবং আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করেছি। এখন আমি দেখতে চাই তোমার কথার মধ্যে সত্যের পরিমাণ কতটুকু। সেইজন্যেই এ কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তোমার—সবচেয়ে কঠিন কাজটাই আমি তোমার জন্যে রেখেছি।'

জিনির স্থির চোখকে মোকাবিলা করল মরগ্যানের দৃষ্টি।

'নিশ্চিন্ত থাকো, ফ্র্যাঙ্ক। কাজটাকে তুমি যতটা কঠিন ভাবছ ততটা কঠিন নয়। আমি ঠিক পারব।' থামল জিনি।

মরগ্যান হাসল, 'সময় এলেই সেটা বোঝা যাবে। ঠিক আছে, এবার বাকিটা তোমরা শুনে নাও। কিটসন, তুমি জিপোর গাড়িটা নিয়ে ঠিক বারোটা দশ মিনিটে কাফের সামনে হাজির থাকবে। তোমার ঘড়িটা ঠিক

আছে তো? কটা বাজে দেখো তো?'

'আটটা কুড়ি।' হাতঘড়ি দেখে জবাব দিল কিটসন।

'আর আমার ঘড়িতে আটটা বেজে তেইশ মিনিট।' নিজের ঘড়ি দেখে সময় বলল মরগ্যান,

'লু-র কাছ থেকে তুমি মেশিনগানটা নেবে। সেটাকে রাখবে গাড়ির পেছনের সিটে। তারপর কাফেতে তুমি একাই যাবে। আমি আর এড হেঁটেই যাব। কাফেতে ঢোকার সময় আমি পেছনের সিট থেকে মেশিনগান তুলে নেব।' মরগ্যান ফিরল জিনির দিকে, 'তুমি ম্যাডক্স স্ট্রিট ধরে আসবে। কাফের কাছে ঠিক বারোটা দশেই পৌঁছবে—যেন দেরি না হয়। সময়ের ব্যাপারে আমাদের ভুল করলে চলবে না। তোমার কাছে ঘড়ি আছে তো?'

জিনি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল;

'ঠিক আছে। তা হলে আলেক্স, যাবার সময় লু-র কাছ থেকে তুমি মেশিনগানটা নিয়ে যেও। জিপো, তুমিও ওর সঙ্গে যাও। দেখো তোমার সাধের পক্ষীরাজ আবার ইঞ্জিন বিগড়ে না বসে থাকে। বারোটা বেজে দশ মিনিটে আবার আমাদের দেখা হবে, কেমন?'

কিটসন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল! অস্বস্তিভরা চোখে তাকাল মরগ্যানের দিকে; তারপর দেখল জিনিকে। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে সে এগিয়ে চলল দরজার দিকে; জিপো তাকে অনুসরণ করল।

ওরা চলে যেতেই মরগ্যান বলল, 'তুমি ঠিক আছ তো?' সে প্রশ্ন করল জিনিকে।

ভুরু উঁচিয়ে তাকাল জিনি, 'কেন, ঠিক না থাকার কোনও কারণ ঘটেছে নাকি?'

'দেখো, আমার সামনে বেশি বড় বড় কথা বোলো না।' তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল মরগ্যান, 'এ ধরনের কাজ আমি বহু করেছি, কিন্তু তবুও আমি যে একেবারেই ভয় পাই না তা নয়। আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরো না, জিনি। আমি জানতে চেয়েছি—তুমি ঠিক আছ কি না? এখনও ভেবে দেখো, এ কাজটা তুমি পারবে তো!'

জিনি হাত বাড়িয়ে ধরল মরগ্যানের দিকে। ওর আঙুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। একটা সূক্ষ্ম রেখায় স্থিরভাবে এঁকেবেঁকে উঠছে সিগারেটের ধোঁয়া। জিনির আঙুলের সিগারেট নিথর, নিষ্কম্প।

'আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, ভয় পেয়েছি?' শান্তস্বরে জানতে চাইল জিনি। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

মরগ্যান ও ব্লেক চোখ তুলে তাকাল জিনির দিকে।

'বারোটা দশে আমাদের দেখা হবে।' মরগ্যানের চোখে চোখ রেখে বলল জিনি। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁটে চলল দরজার দিকে। স্বাভাবিকভাবেই ওর নারীসুলভ বিশেষত্ব ব্লেকের চোখ এড়াল না। বাইরে বেরিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল জিনি।

'মেয়েটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়।' ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল ব্লেক।

'কে জানে।' মৃদুস্বরে উত্তর দিল মরগ্যান, 'অনেক সাহসী লোককেই বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আমি ভেঙে পড়তে দেখেছি। আসল কাজের সময়েই আমরা জিনির সত্যিকারের পরিচয় পাব।' মরগ্যান উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা—তাহলে এবার ওঠা যাক।'

রাত ঠিক বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় মরগ্যান এবং ব্লেক এসে উপস্থিত হল ম্যাডক্স স্ট্রিটের মোড়ে। রাস্তা পার হয়ে একটা অন্ধকার দোকানঘরের সামনে ওরা থমকে দাঁড়াল। চোখের শ্বাপদ দৃষ্টি প্যালেস অল-নাইট কাফের দিকে।

পরদা-ঢাকা জানলার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে উজ্জ্বল আলোর রেখা। কাচের দরজার ওপারে অবস্থিত বার-এর একাংশ ওদের নজরে পড়ল।

আধ-খাওয়া সিগারেটের টুকরোটা টোকা মেরে রাস্তায় ছুঁড়ে দিল মরগ্যান, 'ওই যে কাফে।'

'আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এ কাজের হাত থেকে রেহাই পেয়ে জিপো মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।' বন্ধ হাতের মুঠোয় ঘামের তৈলাক্ত অনুভূতি এবং হৃৎপিণ্ডের অসংলগ্ন, ক্লান্ত পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ব্লেক বলে উঠল।

'এবং জিপোকে এ কাজ থেকে বাদ দিতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।' বলল মরগ্যান। কিন্তু বুকের ঢিপঢিপ শব্দ উৎকটভাবে তার কানে বাজল। ঠোঁট দুটোতে শুকনো জিভ বুলিয়ে সে সহজ হতে চাইল, 'কিটসন গাড়ি নিয়ে হাজির হওয়ামাত্রই আমরা রাস্তা পার হয়ে কাফেতে ঢুকছি।'

'হু, কথা বলতে বলতেই প্যান্টের পিছনের পকেটে হাত ঢোকাল ব্লেক। অনুভব করল .৩৮ রিভলবারের শীতল স্পর্শ। এমন সময় সে লক্ষ করল, জিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে কাফের দিকে। ওর পরনের পোশাকের কোনও পরিবর্তন হয়নি—সেই কালো স্ল্যাক্স আর শ্যাওলা সবুজ শার্ট। কিন্তু ওর তামা-রঙ চুলের ঢল একটা সবুজ স্কার্ফের আবরণে ঢাকা। রাস্তার স্বল্প আলোয় ওর মুখের যতটুকু ব্লেকের নজরে পড়ল, তাতে তার মনে হল জিনির সৌন্দর্যকে অনেকাংশ ম্লান করে দিয়েছে ওর মাথার সবুজ স্কার্ফ; যার আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে জিনির রেশমি চুল।

'ওই যে, জিনি এসে গেছে।' মরগ্যানকে লক্ষ করে বলে উঠল ব্লেক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিপোর ঝরঝরে লিংকন গাড়িটা এসে থামল কাফের দরজার সামনে।

'চলো, এবার যাওয়া যাক।' ব্লেকের আস্তিন ধরে টান মারল মরগ্যান। তারপর দ্রুত লম্বা পা ফেলে রাস্তা পার হতে লাগল।

কাফের সামনের রাস্তাটা একেবারে নির্জন—নিঃশব্দ। ওদের কানে এল কাফের জ্যুক-বক্স থেকে ভেসে আসা ওয়ালস্ সংগীতের হালকা সুর।

মরগ্যান গিয়ে থামল লিংকনের পাশে। চারপাশে একনজর দেখে হাত বাড়িয়ে পিছনের সিট থেকে তুলে নিল মেশিনগানটা।

'ঠিক সময়ের জন্যে প্রস্তুত থেকো আলেক্স।' গাড়ির চালকের আসনে বসে থাকা কিটসনের দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো ছুড়ে মারল মরগ্যান, পালাবার সময় এক সেকেন্ড সময়ও আমি নষ্ট করতে চাই না।'

কিটসন একটা অস্ফুট শব্দ করে সায় জানাল। ওর হাতে শক্তভাবে আঁকড়ে রইল স্টিয়ারিং হুইলটা।

ব্লেক ইতিমধ্যে একটা রুমাল বের করে মুখের নিম্নাংশ ঢেকে ফেলেছে। রুমালের গিঁট বাঁধতে গিয়ে সে টের পেল উৎকণ্ঠা উত্তেজনায় তার হাত অস্থির হয়ে উঠেছে।

জিনি তখন মুখ ঢাকার পালা সেরে কাফের দরজার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। হাতে ধরা .৩৮ পুলিশ স্পেশালটা ওর শরীরের পাশে সমান্তরাল ভাবে ঝুলছে।

মরগ্যান মুখোশ ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন অনুভব করল না। এ লাইনে এতদিন থেকে তার যা যৎসামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে সে ভালোভাবেই জানে কাফের কোনও খদ্দেরই পুলিশের কাছে তাদের চেহারার সঠিক বর্ণনা দিয়ে উঠতে পারবে না। কারণ এই আতঙ্কের মুহূর্তে ওদের চিন্তাক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

'এসো ভেতরে ঢোকা যায়।' দ্রুত গভীর শ্বাস টেনে বলল মরগ্যান। তারপর এগিয়ে গেল জিনির কাছে, 'তুমি দরজাটা খুলেই পাশে সরে দাঁড়াবে।'

'জানি।' জিনির শীতল, নির্বিকার উত্তর মরগ্যানকে অবাক করল। সে তাকাল জিনির দিকে। নিষ্পলক চোখে মেয়েটা তারই চোখে তাকিয়ে।

'হুঁ, মেয়েটার নার্ভের প্রশংসা করতে হয়। ভাবল মরগ্যান। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম বুঝি... অবিশ্বাস্য! এইটুকু একটা কচি মেয়ের পক্ষে এতখানি ঠান্ডা মাথায় কাজ করা কখনই সম্ভব নয়? অথচ...

জিনি দরজার খুলে তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। মরগ্যান ওর পাশ কাটিয়ে ঢুকল ভেতরে। বার-এর কলগুঞ্জন এবং উত্তপ্ত আবহাওয়া যেন চোখেমুখে এসে ঝাপটা মারল।

জিনি মরগ্যানকে অনুসরণ করতেই ব্লেক এগিয়ে গেল দরজার কাছে। মুখে বাঁধা রুমাল ঘামে ভিজে উঠেছে। ঘেমে উঠেছে হাতের রিভলভারও। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। পরদা টেনে দিল কাচের ওপর।

বার কাউন্টারে দুজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়েছিল। বাইরের ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকতেই তারা ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে দেখল। প্রথমে তাদরে নজর পড়ল মরগ্যানের মুখের দিকে—তারপর তার হাতের মেশিনগানটার দিকে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্যের আকস্মিকতায় তাদের চোখজোড়া গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল; মুখের রং মিলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠল একটা ফ্যাকাসে ভাব। তখনই ওরা দেখতে পেল রুমালে ঢাকা জিনিকে।

মরগ্যান চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান আপনারা।' তার হাতের মেশিনগান আদেশের ভঙ্গিতে আন্দোলিত হল।

ঘরের কলকুঞ্জন নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গুর আসবারের মতো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। মরগ্যানের তীক্ষ্নস্বর রেশমি কাপড়ে ছুরির ঝলকের মতো কেটে বসল সেই জমাট নিস্তব্ধতার ওপর।

বুড়ো লোক দুটো পিছোতে গিয়ে একজন আরেকজনের ঘাড়ের ওপর উলটে পড়ল।

বার কাউন্টারে এত হাতের ওপর ভয় দিয়ে মরগ্যান শূন্যে লাফিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই তাকে দেখা গেল পা-ফাঁক করে, দুহাতে মেশিনগান আঁকড়ে কাউন্টারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে।

এলোপাথাড়ি লাথি চালিয়ে মরগ্যান কাউন্টারের ওপর সাজানো বোতলগুলো চারিদিকে ছিটকে ফেলল। কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দের সঙ্গে ভেসে এল কোনও তরুণীর ভয়ার্ত চিৎকার। কাফের চেয়ারে বসে থাকা প্রতিটি লোক চমকে উঠে দাঁড়াল। শুরু হল পরস্পরের মধ্যে চাপা গুঞ্জন।

'খবরদার!' গর্জে উঠল মরগ্যান। সেই সঙ্গে নেচে উঠল তা হাতের মেশিনগান, কেউ নিজেদের জায়গা ছেড়ে নড়বেন না; চুপচাপ বসে পড়ুন। আপনারা চুপ থাকলে আমার মেশিনগানও চুপ থাকবে। কারও একটু বেচাল দেখলেই একেবারে সীসের বস্তা করে ছাড়ব!'

বুকের খাঁচায় আবদ্ধ হৎপিণ্ডের আকুল দাপাদাপি ব্লেকের কানে যেন দামামার মতো বাজতে লাগল। ঘামের বন্যায় তার দৃষ্টি হয়ে এল অবরুদ্ধ। নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টায় এক হ্যাঁচকায় রুমালটা খুলে ফেলল ব্লেক।' বুক ভরে শ্বাস নিল। জনাকীর্ণ কাফের চারপাশে চোখ বুলিয়ে রিভলভারটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সে। কিন্তু অবাধ্য হাতের কাঁপুনি সে বাঁধনকে শিথিল করে দিতে চাইল। ব্লেক তখন মনে মনে প্রার্থনা করছে, যেন ওদের কোনও বিপদের মুখোমুখি না পড়তে হয়।

একটা বুড়ি ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল। দুজন লোক চেয়ার ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করতেই তাদের সঙ্গিনীরা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। ঘরের সকলেই যেন নিটোল পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে।

গলার স্বর উঁচু পরদায় তুলে বলে উঠল মরগ্যান, 'ভালো করে কান দিয়ে শুনুন আমাদের শুধু ক্যাশ টাকা চাই! অতএব চটপট আপনাদের মানিব্যাগগুলো বের করে টেবিলে রাখুন। চটপট—তাড়াতাড়ি করুন!'

বেশির ভাগ লোকই তাদের ব্যাক পকেট হাতড়াতে লাগল। একই সঙ্গে জিনিও তৈরি হল ওর দায়িত্ব পালনের জন্যে। মরগ্যানের দেওয়া ক্যাম্বিসের থলেটা স্ল্যাক্সের পকেট থেকে বের করল ও। তারপর বাঁ হাতের থলেটা ঝুলিয়ে, ডানহাতের .৩৮ নাচিয়ে এগিয়ে চলল টেবিলের সারির মধ্যে দিয়ে। প্রত্যেক টেবিলের কাছে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে ও তুলে নিতে লাগল পড়ে থাকা মানিব্যাগগুলো, এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলোকে ঢুকিয়ে রাখতে লাগল বাঁ হাতের থলেতে।

দরজার কাছে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে ব্লেক ওকে লক্ষ করতে লাগল। ধীরে অথচ অত্যন্ত সাবধানে জিনি এগিয়ে চলল। যেন ভঙ্গুর বরফের চাদরে পা রেখে ও হেঁটে চলেছে। কিন্তু ওর চলার মধ্যে দ্বিধার ছায়া সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য। যান্ত্রিকভাবে কাজ করে চলল জিনি।

মরগ্যান আবার হিংস্রভাবে চিৎকার করে উঠল, 'চটপট করুন! মানিব্যাগ বের করতে ফালতু সময় নষ্ট করবেন না। বলা যায় না, আমার আঙুলের চাপে মেশিনগান থেকে হয়তো... কিন্তু তা আমি চাই না। সুতরাং মানিব্যাগগুলো চটপট মেয়েটার হাতে তুলে দিন!'

এতক্ষণে ব্লেক কিছুটা স্বস্তি বোধ করল।

মরগ্যান আর জিনিই বলতে গেলে কাজটা হাসিল করল—ভাবল সে। ওঃ সাহস আছে বটে ওদের।

মরগ্যানের স্বরের কাঠিন্য ও শীতলতা সারা ঘরে ছড়িয়ে দিল হিমেল আতঙ্ক। তার দাঁড়াবার দৃপ্তভঙ্গি, সেই সঙ্গে শক্ত মুঠোয় ধরা কালো চকচকে মেশিনগানটা যেন শিয়রে দাঁড়ানো মৃত্যুদূতের প্রতিমূর্তি।'

ওর যান্ত্রিক পরিক্রমার মধ্যে হঠাৎই একটা টেবিলের সামনে থমকাল জিনি। টেবিলে বসেছিল একজন সুন্দরী তরুণী; পরনে দামি লোমের কোট। তার পাশে বসা স্থূলকায় চেহারার একটি লোক, চোয়ালের রেখা কঠিন, চোখের দৃষ্টি ক্রূর। টেবিলের ওপর কোনও মানিব্যাগের চিহ্নমাত্র নেই।

জিনি তাকাল লোকটার দিকে। ওদের চোখাচোখি হল। লোকটার ধূসর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'ব্যাগটা চটপট বের করে দিন, স্যার। শুধু শুধু সময় নষ্ট করবেন না। নরম স্বরে বলল জিনি।

'দুঃখিত। আমার কাছে কোনও ব্যাগ নেই। তাছাড়া তোমার মতো কোনও বাজারের মাগীকে দেবার জন্যে আমি টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি না।' নির্বিকারভাবে জবাব দিল লোকটা।

ব্লেক ঘামতে শুরু করল। সে যেন বিপদের গন্ধ পেল। বিচলিত হয়ে সে তাকাল মরগ্যানের দিকে। সে একইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। স্থির তার হাতের মেশিনগানও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মরগ্যান তখন লক্ষ করছে জিনিকে। ঠোঁট সরে গিয়ে তার দাঁতের সারি আংশিক উন্মুক্ত—সারা মুখে নেকড়ের হিংস্রতার ছাপ।

'ব্যাগটা বের করে দাও।' জিনির স্বর উঁচু পরদায় উঠল।

'শালা কুত্তির বাচ্চা! আমার কাছে কোনও ব্যাগ নেই!' জিনির দিকে চোখ রেখে উত্তর দিল লোকটা।

লোকটার সঙ্গিনীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। আতঙ্কে তার চোখজোড়া বুজে এল। ধীরে ধীরে সে ঢলে পড়ল লোকটার গায়ে। কিন্তু লোকটা অধৈর্যভাবে মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

এবার রিভলভার উঁচিয়ে ধরল জিনি, 'চটপট বের করে ফ্যাল মোটা, নইলে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেব!'

জিনির কর্কশ ধমকানিতে এতটুকু চমকাল না লোকটা। তার মুখের পেশি কঠিন হল, দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, আমার কাছে কোনও ব্যাগ নেই!! বেরো এখান থেকে!'

মরগ্যান মেশিনগানের নল ঘুরিয়ে লোকটার দিকে লক্ষ করল। কিন্তু সে জানত এ প্রচেষ্টা নিরর্থক। কারণ লোকটা এবং মরগ্যানের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিনি। মরগ্যান যে এ অবস্থায় গুলি চালাতে পারে না, সেটা লোকটাও বেশ বুঝতে পারল।

সুতরাং এই অবস্থাকে সামলানোর দায়িত্ব পুরোপুরি জিনির। তাই মরগ্যান তীক্ষ্ণতে ওদের লক্ষ করতে লাগল। সে জানত এটাই জিনির চরম পরীক্ষা। এই স্নায়বিক চাপের মুহূর্তে ও কি ভেঙে পড়বে?

মরগ্যান তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

জিনি লোকটার দিকে চেয়ে হাসলঃ সে হাসির ঝলকানি রুমালের আড়ালে পলকের জন্যে আবির্ভূত হয়েই মিলিয়ে গেল। তার ক্ষণস্থায়ী রেশ ফুটে উঠল জিনির সবুজ চোখে। পরমুহূর্তে সাপের ছোবলের মতো ওর পিস্তলসুদ্ধ হাত আছড়ে পড়ল লোকটার মুখে। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে লোকটা বাধা দেওয়ার কোনও সুযোগই পেল না। .৩৮-এর নলটা আড়াআড়িভাবে আঘাত করল তার নাকে এবং গালে।

গাল ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। মুখে দু-হাত চাপা দিয়ে পিছন দিকে হেলে পড়ল লোকটা। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অস্ফুট আর্তনাদ।

টেবিলের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল জিনি; রিভলবার ঘুরিয়ে দ্বিতীয় বার আঘাত হানল। এবার .৩৮-এর নলটা সরাসরি গিয়ে বাধা পেল লোকটার ব্রহ্মতালুতে। লোকটা অবসন্নের মতো আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে।

পাশের মেয়েটা বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

'সাবধান নিজের জায়গা ছেড়ে এতটুকু নড়ার চেষ্টা করলে কাউকেই আমি রেহাই দেব না।' মরগ্যানের চিৎকারে সকলে আবার ফিরে তাকাল তার দিকে। সারা ঘরে ভেসে বেড়াতে লাগল জমাট আতঙ্কের আবহাওয়া, এমন কী ব্লেক পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যে শিউরে উঠল মরগ্যানের হাড়-কাঁপানো চিৎকার।

জিনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে-থাকা লোকটার কাছে এগিয়ে গেল। কলার ধরে টেনে তাকে সোজা করল। তারপর ভেতরের পকেট হাতড়ে বের করে আনল লোকটার মানিব্যাগটা। ব্যাগটা থলেতে ভরে তাকে সজোরে এক ধাক্কা মারল। লোকটা আবার আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

এতেই যথেষ্ট কাজ হল।

কোনও যাদুমন্ত্রবলে একের পর এক মানিব্যাগ আবির্ভূত হতে লাগল টেবিলে। জিনি শুধু চটপট সেগুলোকে থলেতে ভরে ফেলতে লাগল।

সাফল্যের উল্লাসে ব্লেক দরজার দিকে আর নজর রাখেনি। তাই দরজা খুলে একজন দোহারা চেহারার বলিষ্ঠ লোক যখন হঠাৎ তার সামনে এসে হাজির হল, তখন সে একেবারে বোবা হয়ে গেল।

নির্বোধের মতো শূন্য দৃষ্টিতে সে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। বিশাল চেহারার আগন্তুক প্রথমে তাকাল ব্লেকের মুখের দিকে। তার পরেই চোখে পড়ল ব্লেকের হাতের আলগা মুঠোয় ধরা রিভলভারের ওপর। বিদ্যুৎগতিতে আগন্তুকের বলিষ্ঠ হাতে কাটারির মতো নেমে এল ব্লেকের কবজির ওপর; রিভলভারটা সঙ্গে সঙ্গে ব্লেকের হাতছাড়া হয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে, গড়াতে গড়াতে গিয়ে থামল বার-কাউন্টারের সামনে। আগন্তুকের ক্ষিপ্রতায় হতভম্ব ব্লেক তখনও একইভাবে দাঁড়িয়ে।

লোকটা ব্লেককে লক্ষ করে ঘুঁষি তুলতেই মরগ্যান মেশিনগান তাক করল তার দিকে, চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার! মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও! নইলে...'

লোকটা ফিরে তাকাল মরগ্যানের দিকে। তার হাতের মেশিনগানটার ওপর চোখ পড়তেই লোকটার সাহস কর্পূরের মতো উবে গেল। ব্লেকের কাছ থেকে পিছিয়ে গিয়ে সে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল।

জিনি একটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে একজন বেঁটে-খাটো বলিষ্ঠ লোকের কাছ থেকে মানিব্যাগটা নিচ্ছিল। লোকটা মরগ্যানের মেশিনগানটা অন্য দিকে ফেরাতে দেখেই জিনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জিনি ব্যাগটা থলেতে ভরতে যাচ্ছিল, এমন সময় বেঁটে লোকটার দুটো হাত আঁকড়ে ধরল ওর হাতের রিভলভারটা—মরিয়া হয়ে রিভলভারটা কেড়ে নিতে চাইল। শুরু হল ধস্তাধস্তি।

জিনিও শক্ত হাতে ধরে রইল .৩৮-এর বাঁট। এক পলক দেখল লোকটার ভয়ার্ত, চঞ্চল চোখের দিকে। তারপর ধস্তাধস্তির মধ্যেই ট্রিগার টিপল। একটা বিকট শব্দ করে গর্জে উঠল রিভলভারটা। কাফের সমস্ত জানলা ঝন্‌ঝন্ করে কেঁপে উঠল। লোকটা তড়িৎস্পৃষ্টের মতো এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিল। গুলিটা তার জামার আস্তিন ছিঁড়ে, হাত ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। জিনি রিভলভার নাচিয়ে দু-পা পিছিয়ে এল। লোকটা তখন বাঁ-হাতে তার আহত ডান হাত চেপে ধরেছে।

'জলদি করো, জিনি। আমাদের হাতে আর সময় নেই!' মরগ্যান কর্কশস্বরে চিৎকার করে বলল।

শান্তভাবে নির্বিকার মুখে জিনি কাজ করে চলল! চলাফেরায় নেই কোনও ব্যস্ততার ছাপ। কাফের প্রতিটি লোক নিশ্চলভাবে যার-যার জায়গায় বসে। তাদের ফ্যাকাসে, বিবর্ণ মুখে আতঙ্কের মুখোশ যেন পেরেক

ঠুকে বসানো। নিঃশব্দে ওরা লক্ষ করছে জিনির প্রতিটি কার্যকলাপ।

বাইরের গাড়িতে অপেক্ষারত কিটসনের কানে এল গুলির কান-ফাটানো শব্দ। চমকে উঠল কিটসন। তবে কি...? অসাধারণ সংযম এবং প্রচেষ্টায় সে গিয়ারের কাছ থেকে তার শঙ্কাতুর হাতকে সরিয়ে আনল।

স্থির হয়ে বসে রইল কিটসন। দুহাতের থাবা আঁকড়ে ধরেছে হুইলটাকে। তার সারা মুখ ঘামে চকচক করছে, উৎকণ্ঠার শিকার হয়ে কাঁপছে তার উত্তাল হৃৎপিণ্ড : ধক্...ধক্ ধক্...।

হঠাৎই অবসান হল তার আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার। কিটসনের কানে এল দৌড়ে আসা ভারী পায়ের শব্দ। একটু পরেই খুলে গেল লিংকনের পিছনের দরজা। দুদ্দাড় করে কারা যেন ঢুকে পড়ল গাড়িতে। লিংকনটা সামান্য দুলে উঠল। একটা উতপ্ত ঘামে ভেজা দেহ কিটসনের শরীরে এসে আঘাত করতেই সে পাশ ফিরে তাকাল। ব্লেক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনের সিটে—তার পাশে। যান্ত্রিকভাবে কিটসনের হাত এগিয়ে গেল গিয়ারের দিকে। এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে সচল হল গাড়িটা।

'শিগগির, আলেক্স!' পিছনের সিট থেকে কিটসনের কানের কাছে মুখ এনে গলা ফাটিয়ে বলে উঠল মরগ্যান, 'যত জোরে পার গাড়ি ছোটাও!'

দাঁত দাঁত চেপে কিটসন গাড়ি ছুটিয়ে দিল তীরবেগে? চাকার কাতর আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ঘোরাল কিটসন। সরু একটা গলি পার হয়েই বড় রাস্তায় পড়ল।

সহজাত দক্ষতার সঙ্গে সে বড় রাস্তা নিমেষে পার হয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল আর একটা গলিতে। গাড়ির গতি এবার সামান্য কমিয়ে, হেডলাইটের সংকেত দিয়ে সে একের পর এক চৌরাস্তা পার হয়ে চলল।

মরগ্যান ঘুরে বসে পিছনের জানলা দিয়ে দেখতে লাগল কেউ তাদের অনুসরণ করছ কি না। এমনিভাবে আধ মাইলটা যাওয়ার পর হঠাৎ সে বলে উঠল, 'যাক, বাঁচা গেছে। কেউ আমাদের পিছু নেয়নি। তাহলে চলো, জিপোর ওখানেই যাওয়া যাক।'

সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দম আটকানো আবহাওয়া ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে এল।

'ওঃ একটা সময় গেল বটে!' হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে বলে উঠল ব্লেক, 'মেশিনগানটা না থাকলে আজ ভীষণ বিপদে পড়তে হত। আর যখন ওই হারামজাদাটা জিনির হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, তখন...'

'কী হয়েছিল?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল কিটসন, 'গুলি চালানোর শব্দ শুনতে পেলাম! কেউ কি আহত হয়েছে নাকি?

'উঁহু! একটা লোক জিনির রিভলভার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল—এমন সময় ধস্তাধস্তির রিভলভার থেকে গুলি বেরিয়ে যায়। অবশ্য তাতে সেরকম একটা কেউ আহত হয়নি; তবে লোকটা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আবার অন্য আর একটা লোক আচমকা এসে হাজির হয়ে আমার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে ফেলে দিল। তারপর তাকে সামলাতে অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয়েছে।'

জিনি মরগ্যানের ঠিক পাশেই বসেছিল। মরগ্যান অনুভব করল, ওর শরীর কাঁপছে। চোখ ফিরিয়ে ওকে দেখল মরগ্যান। রাস্তার আলোয় তার চোখে পড়ল জিনির মুখ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, যেন এক প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে।

ওর হাঁটুর ওপর হাত রাখল মরগ্যান, তোমার কাজে আমি খুশি হয়েছি জিনি। সত্যিই তোমার সাহস আছে। বিশেষ করে ওই মোটা লোকটাকে যেভাবে শায়েস্তা করলে। ওঃ, আমি তো ভাবতেই পারিনি...'

পা সরিয়ে নিল জিনি।

'দয়া করে চুপ করো ফ্র্যাঙ্ক।' মরগ্যানকে অবাক করে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে শুরু করল মেয়েটা।

সামনের সিটে বসা কিটসন অথবা ব্লেক কিছুই টের পেল না। মরগ্যান জিনিকে একা থাকতে দিয়ে সরে বসল।

জিপোর কারখানার কাছাকাছি এসে পড়াতে খুব সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে লাগল কিটসন। মুখ না ফিরিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'মোট কত টাকা হাতালে?'

'মন্দ নয়। কম করে গোটা পঞ্চাশেক মানিব্যাগ তো হবেই, তাছাড়া কাফের ক্যাশবক্সও প্রায় ঠাসা ছিল।' কথা শেষ করে মরগ্যান একটা সিগারেট ধরাল। নিজের অকম্পিত হাতের দিকে তাকিয়ে সে গর্ব অনুভব করল।

মরগ্যান তখনও বেশ শুনতে পাচ্ছে ব্লেকের হাঁপানোর শব্দ। কাফেতে ঢোকার পর সে প্রায় সর্বক্ষণই ব্লেকের ওপর নজর রেখেছে। এবং তার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ জন্মেছে যে ব্লেক সংশয়ের মুহূর্তে আচমকা ভেঙে পড়তে পারে। মরগ্যানের কাছে এ এক নতুন দুশ্চিন্তা। এতদিন ধরে ব্লেকের সাহস ও দৃঢ়তা সম্পর্কে তার গভীর আস্থা ছিল। কিন্তু আজ সেভাবে নির্জীবের মতো সে ওই জোয়ান লোকটার মোকাবিলা করল, তাতে সে ভরসা মরগ্যানের উবে গেছে। নাঃ, এখন থেকে ব্লেকের ওপরেও তাকে কড়া নজর রাখতে হবে।

এমন কি কিটসনও আজ মুহূর্তের জন্যে তার বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। কথা ছিল ওরা গাড়িতে উঠে বসলেই সে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। মরগ্যান যদি ওর কানের কাছে চিৎকার না করত, তা হলে হয়তো কিটসন অত জোরে গাড়ি ছোটাতে পারত না। অর্থাৎ কাফে থেকে কেউ না কেউ বেরিয়ে এসে পলায়নরত গাড়িটাকে দেখতে পেত, এবং পুলিশের কাছে গাড়িটার একটি বর্ণনাও দিয়ে ফেলত।

নাঃ, বড় কাজের আগে প্রত্যেককে ঠিকমতো প্রস্তুত করতে হবে।তবে জিনির জন্যে তার কোনও চিন্তা নেই। ওর আজকের কাজের ধরন মরগ্যানকে ভীষণ খুশি করেছে। বলতে গেলে দলের মধ্যে জিনির মূল্যই তার কাছে সবচেয়ে বেশি।

মরগ্যান আবার দেখল জিনির দিকে। ও এখন কান্না থামিয়ে সোজা হয়ে বসেছে। ওর ঘষা কাচের চোখে রাস্তার আলোগুলো প্রতিফলিত হয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। কাঠখোদাই অভিব্যক্তিহীন মুখে ও বাইরের দিকে তাকিয়ে।

মরগ্যান তার সিগারেটটা এগিয়ে দিল ওর দিকে।

'নাও, ধরো।' সংক্ষিপ্তভাবে সে বলল।

জিনি নিঃশব্দে সিগারেটটা ধরাতেই গাড়িটা উঁচু-নিচু কাঁচা রাস্তায় পড়ল। কিটসন বুঝল জিপোর কারখানার আর খুব বেশি দেরি নেই।

কারখানা বলতে একটা বড় টিনের একচালা; তার পাশে কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি একটা বড় টিনের চালা দেওয়া জায়গাটাই জিপোর কর্মস্থল। সাধারণত ছোটখাটো ওয়েলডিং, লোহার দরজা তৈরি বা তালা-চাবিসংক্রান্ত টুকটাক কাজ করেই জিপোর সময় কাটে। এবং এই কাজের অজুহাত দেখিয়েই সে গোটা কতক অ্যাসিটিলিন গ্যাসের সিলিন্ডার তার কারখানায় রাখবার অনুমতি পেয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দু-একটা হাইড্রোজেন সিলিন্ডার রাখতেও সে ভোলেনি। কারণ সিন্দুক খোলার কাজে হাইড্রোজেন গ্যাস নিতান্তই অপরিহার্য। কারখানা থেকে জিপোর যা লাভ হয়, তাতে তার পেট চলা তো দূরের কথা, ঘর-ভাড়াই মেটে না।

লিংকনের হেড লাইটের আলো কারখানার দরজায় পড়তেই জিপো বেরিয়ে এল। সম্ভবত সে ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। তাড়াহুড়ো করে দরজা খুলতে গিয়ে বার কয়েক হোঁচট খেল জিপো। অবশেষে পাল্লা দুটোকে হাট করে খুলে গাড়ি ঢোকার রাস্তা করল। তাকে দেখে মনে হল, সে ভীষণ ভয় পেয়েছে।

দরজা বন্ধ করে দ্রুতপায়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল জিপো, উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার? সব ঠিক আছে তো?'

‘হ্যাঁ, কিছু ভেব না।’ উত্তর দিল মরগ্যান, ‘এখন বোতল আর গেলাস বের করো দেখি! আলেক্স, তুমি চটপট এই নাম্বার প্লেট দুটো পালটে ফেল।’ লিংকনের দিকে নির্দেশ করল মরগ্যান। ‘আর রেডিয়েটরের জলটা পালটে ঠান্ডা জল ভরে দাও। বলা যায় না কখন পুলিশ এসে আবার এখানে হানা দেয়। কী হল জিপো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঝটপট গেলাস নিয়ে এসো।’ ব্লেক অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করছিল, তাকে ডাকল মরগ্যান, ‘এড তুমি কিটসনকে একটু সাহায্য করো?’

মরগ্যান এবার এগিয়ে গেল জিনির কাছে, হাসল, ‘কেমন আছ এখন?’

জিনির মুখভাব কঠিন হল। ওর গায়ের চামড়া হয়ে উঠেছে ঈষৎ নীলাভ, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর। বিরক্তিভরা স্বরে জবাব দিল ও, ‘আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।’

‘এ কাজটার মতো আসল কাজের বেলায় যদি ওতরাতে পার, তবেই বুঝব।’

‘ওঃ, তখন থেকে খালি এক কথা। আমি কি কচি খুকি নাকি?’ অসহিষ্ণু স্বরে কথাগুলো বলে মুখ ফিরিয়ে নিল জিনি। এগিয়ে গিয়ে বসল যন্ত্রপাতি রাখার টেবিলের ওপর। উদ্দেশ্যহীনভাবে আঙুল দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করে চলল।

মরগ্যান ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকাল। এমন সময় এক বোতল হুইস্কি এবং পাঁচটা গেলাস নিয়ে হাজির হল জিপো। গেলাসে হুইস্কি ঢেলে সে নিয়ে গেল জিনির কাছে। একটা গেলাস বাড়িয়ে ধরল, ‘নাও খেয়ে নাও। ধকল তো কিছু কম গেল না।’

জিনি গেলাসে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়েই মুখ কোঁচকাল। ওর মুখের বিবর্ণ ভাবটা কেটে গিয়ে ফিরে এল আগের সেই লাবণ্য।

‘কাজটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম, ততটা নয়। আরেকটু হলেই আমার হয়েছিল!’

জিনির কথায় পিঠে বলে উঠল মরগ্যান, ‘কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন আর ও নিয়ে ভাবছ কেন?’ এক চুমুকে বাকি হুইস্কিটা গলায় ঢেলে বলে চলল সে, ‘তাছাড়া, সবার চেয়ে তোমার কাজই ভালো হয়েছে। যাকগে, এবার দেখা যাক কিরকম আমদানি হল।’

মরগ্যান এগিয়ে গিয়ে থলেটা উপুড় করে দিল টেবিলের ওপর। জিনি তাকে সাহায্য করতে লাগল। জিপো, কিটসন এবং ব্লেক তখন একমনে গাড়িটাকে নিয়ে পড়েছে।

‘এই ব্যাগটা সেই মোটা লোকটার।’ একটা কালো রঙের ছক-কাটা মানিব্যাগ তুলে নিয়ে বলল জিনি, ‘যাকে রিভলভার দিয়ে মেরেছিলাম।’

জিনি ব্যাগ হাতড়ে বের করে আনল দশ দশটা একশো ডলারের নোট। সেগুলো বিছিয়ে দিল টেবিলের ওপর।

হুঁ—লোকটাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। হাজার ডলারের মায়ায় যে কোনও লোকই তোমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করত।’

গাড়িটার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ওরা তিনজন এসে দাঁড়াল টেবিলের কাছে। চুপচাপ দেখতে লাগল মরগ্যান আর জিনির কার্যকলাপ। মিনিটখানেক পরে সমস্ত টাকা টেবিলে স্তূপীকৃত হওয়ার পর মরগ্যান আয়েস করে বসল একটা বাক্সের ওপর; গুনতে শুরু করল লুটের পরিমাণ।

চারজনের চারজোড়া উৎকণ্ঠিত চোখ স্থিরভাবে লক্ষ করে চলল।

শেষ টাকাটা গোনা হয়ে গেলে মরগ্যান মুখ তুলে তাকাল, ‘দু-হাজার ন-শো পঁচাত্তর ডলার। যাক, তাহলে আমাদের মূলধন জোগাড় হয়ে গেল। সুতরাং এবার আমরা স্বচ্ছন্দে এগোতে পারি।’

‘ফ্র্যাঙ্ক, সত্যিই কি জিনি একটা লোককে মেরেছে?’ চোখ গোল গোল করে প্রশ্ন করল জিপো।

‘হ্যাঁ, প্রয়োজন ছিল তাই মেরেছে।’ ডলারের নোটগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল মরগ্যান, ‘লোকটাকে ও যেভাবে শায়েস্তা করেছে দেখার মতো।’ তুমি আমি বোধ হয় ওর চেয়ে ভালোভাবে পারতাম

না।'

জিনি গম্ভীর মুখে ঘুড়ে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল গাড়ির দিকে।

ওরা চারজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

'ওকে দিয়ে কাজ হবে।' শান্তস্বরে বলল মরগ্যান, 'আর তোমরাও যদি ওর মতো কাজ করে দেখাতে পার, তাহলে আর চিন্তা নেই। ধরে নাও দশ লাখ ডলার আমরা পেয়ে গেছি।'

ওর কথা শেষ করে মরগ্যান সরাসরি তাকাল ব্লেকের দিকে। ব্লেক সে চাউনির মোকাবিলা করতে বার কয়েক ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের দেশলাইয়ের খোঁজে এ পকেট সে পকেট অসহায়ের মতো হাতড়াতে লাগল। অনুভব করল মরগ্যানের ঝিলিক মারা চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

'আমার কথা শুনতে পেয়েছ, এড?'

ব্লেক কোনওরকমে আগুন ধরাল তার সিগারেটে, 'নিশ্চয়ই।'

পরিস্থিতির সন্দেহজনক ইঙ্গিত জিপোর চোখ এড়াল না। সে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার, ফ্র্যাঙ্ক? কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি?'

'তেমন কিছু নয়... একটা লোক হঠাৎই এডের কাছ থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়েছিল। অল্পের জন্যে আমরা সে যাত্রায় রেহাই পেয়েছি। নইলে কী হতো বলা যায় না!'

ব্লেক থমথমে মুখ কাঁধ ঝাঁকাল, 'লোকটার জন্যে আমি ঠিক তৈরি ছিলাম না। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে তারও ঠিক একই অবস্থা হতো।'

মরগ্যান যে খুব একটা মিথ্যে বলছে না, সেটা কিটসন বেশ বুঝতে পারল। কাফের ভেতর থেকে ভেসে আসা বন্দুকের শব্দটাই তার সমস্ত কিছু ওলট-পালট করে দিয়েছিল। সে ভেবেছিল, কাফের কোনও লোককে ওরা বুঝি খুন করেছে। আর এই খুনের দায়ে জড়াবার আশঙ্কাটাই তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে একেবারে স্থবির করে দিয়েছিল।

'জিনি...'

মরগ্যানের ডাকে ফিরে তাকাল জিনি। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ওদের কাছে।

'শোনো, এইবার আমরা বড় কাজের প্রস্তুতি শুরু করব' বলতে শুরু করল মরগ্যান, 'তুমি আর কিটসন কাল মার্লোয় যাবে ক্যারাভ্যানটা কিনে আনতে। কী মাপের কিনতে হবে সেটা জিপোই তোমাদের বলে দেবে।' মরগ্যান এবার বসল টেবিলে। তার সিগারেটের ধোঁয়া সাপের মতো এঁকে বেঁকে উড়ে চলেছে শূন্যের দিকে। ধোঁয়ার আড়ালে মরগ্যানের চোখ ঝাপসা দেখাচ্ছে।

'ক্যারাভানটা দামটা যত কম রাখতে পার ততই ভালো। কারণ এই তিন হাজার ডলারের প্রতিটি সেন্ট আমাদের কাছ এক-এক ফোঁটা রক্তের চেয়েও দামি। অবশ্য সেটা তোমাকে নতুন করে বলার দরকার নেই।' মরগ্যান চোখ ফেরাল কিটসনের দিকে, 'ক্যারাভান কিনতে গিয়ে তোমাকে কী বলতে হবে মনে আছে তো? বলবে যে, তুমি আর জিনি সম্প্রতি বিয়ে করেছ; হানিমুন কাটানোর জন্যে একটা ক্যারাভান তোমাদের দরকার। এতে সন্দেহ করার কিছু থাকবে না; কারণ আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিয়ের পর হরদম ক্যারাভান কিনছে। তবে একটা বিষয় লক্ষ রেখো যে লোকটা তোমাদের ক্যারাভান বেচবে, সে যেন তোমাদের আর শনাক্ত করতে না পারে!'

কিটসন সন্দেহের চোখে তাকাল ব্লেকের দিকে। কিন্তু ঠাট্টা করার মতো মেজাজে ব্লেক ছিল না, কারণ কাফে লুটের ব্যাপারটায় সে খুব একটা কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। তাই নিজের ওপর একরাশ বিরক্তি নিয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

'ওঃ—এই ভ্যাবাগঙ্গারাম মার্কা ভাবটা মুখ থেকে তাড়াও দেখি।' কিটসনকে ধমকে উঠল মরগ্যান, 'তোমার চাল চলনে মনে হচ্ছে না জিনিকে নিয়ে তুমি হানিমুন কাটাতে যাচ্ছ। নাঃ ক্যারাভান কিনতে গেলে

দোকানদার তোমাকে নির্ঘাত সন্দেহ করে বসবে।'

জিপো মনে মনে হাসল, বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়, ফ্র্যাঙ্ক? ধরো—আলেক্সের জায়গায় আমিই না হয় গেলাম ক্যারাভান কিনতে? প্রথমত স্নেহ ভালোবাসার ব্যাপারটা আমার সহজাত, তাছাড়া জিনির সঙ্গে আমাকে মানাবে দারুণ!'

জিপোর কথায় জিনি পর্যন্ত হেসে ফেলল।

'জিনির সঙ্গে তোমার বয়েসের তফাতটা বড্ড বেশি, জিপো। তাছাড়া, তোমার এই প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা দোকানদারের স্মৃতিশক্তিকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে,' হেসে জবাব দিল মরগ্যান, 'সুতরাং কিটসন ছাড়া আমাদের গতি নেই।'

টেবিলের ওপর থেকে টাকার গোছা তুলে নিয়ে তা থেকে দু-হাজার ডলার কিটসনকে গুনে দিল মরগ্যান।

'দরাদরি করে দামটা একটু কম সম করার চেষ্টা কোরো। কাল সকাল এগারোটায় আমি বুইক আর ক্যারাভান টানার শেকল তোমার ওখানে পৌঁছে দেব।' মরগ্যান তাকাল জিপোর দিকে, 'তুমি লিংকটনকে নিয়ে আমাকে ফলো করবে। কারণ বুইকটা কিটসনের ওখানে ছেড়ে দিয়ে তোমার গাড়িতেই আমাকে ফিরতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

'আচ্ছা, এবার তাহলে ওঠা যাক। লু-কে ওর মেশিনগানটা এখনই ফেরত দিতে হবে। এড, তুমি আমার সঙ্গে চলো।' মরগ্যান এবার দেখল জিনি ও কিটসনের দিকে, 'তোমরা দুজনে বাসে করেই রওনা দাও। কারণ আমাদের চারজনকে একসঙ্গে যত কম দেখা যায় ততই ভালো।'

বাকি টাকাটা মরগ্যান ব্যাক-পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর জিনিকে লক্ষ করে বলল, 'তোমরা কোথায় দেখা করবে সেটা নিজেরাই ঠিক করে নিও। তবে কাল বিকেলের মধ্যেই ক্যারাভ্যানসুদ্ধ তোমাদের এখানে ফিরে আসতে হবে।' ব্লেকের দিকে মাথা ঝাঁকাল মরগ্যান, 'চলে এসো এড।'

ওরা চলো গেলে জিনি মাথা থেকে সবুজ স্কার্ফটা খুলে ফেলল। আড়ষ্ট চুলের গোছাকে আঙুলের আলতো আঁচড়ে স্বচ্ছন্দ করে তুলল।

বিব্রতভাবে ওকে দেখতে লাগল কিটসন; জিনির সৌন্দর্য সম্পর্কে সে আবার সচেতন হয়ে উঠল, টেবিলে হেলান দিয়ে অপ্রতিভভাবে নখ খুঁটতে লাগল।

'আর এক গেলাস হবে নাকি?' জিগ্যেস করল জিপো।

জিনি মাথা নাড়ল 'উহুঁ—ধন্যবাদ।' তারপর ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ঠোঁট রাখল, তাকাল কিটসনের দিকে।

কিটসন পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করে জ্বালাল। জ্বলন্ত কাঠিটা কাঁপা হাতে এগিয়ে ধরল জিনির মুখের কাছে। আগুনের শিখাকে স্থির করতে জিনি দু-হাতে আঁকড়ে ধরল কিটসনের চঞ্চল হাত। মুখ নামিয়ে সিগারেটের অগ্রভাগ ডুবিয়ে দিল আগুনের আওতায়। কিটসনের শিরা-উপশিরায় উষ্ণ রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়ল।'

'আচ্ছা, তাহলে চলি—' জিপোর দিকে কথা কটা ছুড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোল জিনি।

'পরে আবার দেখা হবে।' কিটসনকে লক্ষ করে চোখ টিপল জিপো। কিটসন তাতে কোনওরকম ভ্রুক্ষেপ না করে জিনিকে অনুসরণ করল।

বাইরে বেরেতেই রাতের উত্তপ্ত হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল ওদের শরীরে। পাশাপাশি পা-ফেলে ওরা এগিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে।

বাস-স্টপে পৌঁছে জিনি হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তুমি থাক কোথায়?'

'লেনেক্স স্ট্রিট।' উত্তর দিল কিটসন।

ঠিক আছে, কাল এগারোটার সময় আমি লেনেক্স স্ট্রিটের মোড়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'যদি বলো, তাহলে গাড়ি নিয়ে আমিও যাব তোমার ওখানে—'

'না, তার কোনও প্রয়োজন নেই।'

কিটসন আড়চোখে দেখতে লাগল পাশে দাঁড়ানো জিনিকে। একসময় হঠাৎ বলে উঠল, 'সেদিন রাতে—আমি কখনওই তোমার গায়ে হাত তুলতাম না। হঠাৎ কেন যে অমন রেগে উঠলাম, কে জানে!... আমি দুঃখিত।'

জিনি হাসল, 'আমি তো ভাবছিলাম, 'তুমি বোধ হয় আমাকে মেরেই বসলে, খুব ভয় করছিল আমার।'

কিটসন লজ্জা পেল, 'না, না—শুধু শুধু তুমি ভয় পেয়েছিলে। এমনিতেই আমার চেয়ে ছোট কারোর গায়ে আমি হাত তুলি না। তার ওপর তুমি তো মেয়ে।'

'তা ঠিক, তবে পরে ভেবে দেখলাম, তোমার হাতের ওই চড়টা খেলে আমার উপযুক্ত শিক্ষা হতো। বলতে গেলে আমিই তো সাধ করে গাল বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।' সিগারেটের ছোট টুকরোটা টোকা মেরে ফেলে দিল জিনি। দু-একটা ফুলকি ছড়িয়ে সেটা গিয়ে পড়ল রাস্তায়। 'কিন্তু ব্লেকের গায়ে হাত তোলাটা তোমার কি উচিত হয়েছে?'

কিটসন গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, ব্যাটা বড্ড বেশি বেড়ে উঠেছিল, তাই একটু দাওয়াই দিলাম। তাছাড়া, ও-ই তো গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাল। সেই প্রথম দিন থেকে... মাঝপথে থেমে গেল কিটসন।

তা হোক, তবুও ওর গায়ে হাত তুলে তুমি ভালো করোনি। এখন থেকে ব্লেকের ওপর সব-সময় তোমাকে নজর রাখতে হবে। কারণ, সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ও ভুলবে না।'

কিটসন কাঁধ ঝাঁকাল, ব্লেককে অমি ভয় করি না।'

'আমারও তাই ধারণা। বছর খানেক আগে তোমার একটা লড়াই আমি দেখেছিলাম। ওই যে যে লড়াইয়ে জ্যাকি ল্যাজার্ডকে একেবারে ময়দার বস্তা করে ছাড়লে—মনে পড়ছে? ওঃ, দারুণ জমেছিল লড়াইটা!'

কিটসন তাকাল জিনির দিকে। ওর বলিষ্ঠ মুখে ফুটে উঠল উজ্জ্বল হাসি। সত্যিই দারুণ জমেছিল, সেই লড়াইটা। জ্যাকি ল্যাজার্ডকে সে যে হারাতে পেরেছিল, তা নেহাতই ভাগ্যের জোরে। ন-টা রক্তাক্ত, ক্লান্ত রাউন্ডের ল্যাজার্ডকে কিটসন কাত করেছিল। ভাগ্য সহায় থাকলে সে লড়াইয়ে ল্যাজার্ডও জিততে পারত।

'জ্যাকি খুব ভালো লড়িয়ে ছিল!'

'তুমিও নেহাত খারাপ ছিলে না। তা হঠাৎ বক্সিং-টক্সিং ছেড়ে দিলে যে?'

এই প্রশ্নে কিটসন ভীষণ বিব্রত বোধ করল। কোনওরকমে একটা মনগড়া জবাব দিয়ে দিল, 'শেষ লড়াইয়ের পর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমার চোখের ক্ষমতা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে—কাছের জিনিস খুব ভালো দেখতে পাচ্ছি না।' মাথার কোঁকড়ানো চুলে আঙুল চালাল কিটসন, 'ব্যাপার-স্যাপার দেখে তো খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি গেলাম ডাক্তারের কাছে। তিনি বললেন বক্সিং ছেড়ে দিতে। আমার কিন্তু সেরকম ইচ্ছে একেবারেই ছিল না। একেই চ্যাম্পিয়ন হবার খুব সাধ ছিল, তাছাড়া প্রচুর সম্ভাবনাও ছিল... ...কিন্তু, ডাক্তারের মতামতকে তো আর অবহেলা করতে পারি না? তাই...'

কিটসনের ম্যানেজার উপস্থিত থাকলে তার বক্তব্য হয়তো একেবারেই অন্যরকম হতো।

কিটসন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল জিনির দিকে! বুঝতে চাইল, বক্সিং ছাড়ার গল্পটা সম্পর্কে ওর মনে কোনওরকম সন্দেহ আছে কি না। কিন্তু জিনির ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখে কোনওরকম অভিব্যক্তির আভাস সে দেখতে পেল না।

দীর্ঘস্থায়ী নীরবতার পর সে প্রশ্ন করল, 'তুমি হঠাৎ ফ্রাঙ্কের দলে এসে ভিড়লে কেন?'

'তাছাড়া কার কাছেই বা যেতাম—' উত্তর দিল জিনি। তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়েই বলে উঠল, ওই যে—বাস আসছে।'

বাস থামল, ওরা উঠে পড়ল। পাশাপাশি একটা আসনে বসল দু'জনে। কিটসন দুটো টিকিট কাটল। তারপর নীরবে চেয়ে রইল কাচের জানলায় প্রতিফলিত জিনির মুখের দিকে। বাসের কোনও আসনই খালি নেই। কিছু কিছু কৌতূহলী লোক মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে জিনিকে। কিটসন কেমন অস্বস্তি অনুভব করল।

বাস চাপা গর্জন তুলে এগিয়ে চলল শহরের দিকে। রেল রোড স্টেশনের সামনে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল জিনি, 'আমি এখানেই নামব।'

কিটসন উঠে দাঁড়িয়ে ওকে যাওয়র রাস্তা করে দিল। জিনির শরীরের আলতো স্পর্শে মুহূর্তের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল কিটসন। বাস থামতেই নেমে পড়ল জিনি।

বাস আবার চলতে শুরু করতেই কিটসন জানলার ঠান্ডা কাচে মুখ চেপে ধরল তাকাল বাইরের অন্ধকারের দিকে। জিনিকে এক পলক দেখার আশায় তার উৎসুক চোখের দৃষ্টি বৃথাই মাথা খুড়ল অন্ধকারের নরম পরদায়।'

চার

পরদিন সকাল এগোরোটায় কিটসনকে দেখা গেল মরগ্যানের বুইক নিয়ে ছুটে চলেছে মার্লো অভিমুখে। দশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে টানা ষাট মাইলের রাস্তা মার্লো। কিটসনের হাতে বুইক যেন উড়ে চলল শহরতলি ছাড়িয়ে।

কিটসনের পাশে বসে জিনি গর্ডন। কিন্তু এ জিনির সঙ্গে বুঝি আগের জিনির কোনও মিলই নেই। রঙিন আঁটোসাঁটো ফ্রকটা পরে জিনিকে মনে হচ্ছে কোনও উচ্ছল কিশোরী। ওর সুন্দর সতেজ মুখে অবাধ খুশির রাজত্ব: যেন নববিবাহিত কোনও বধূ মধুচন্দ্রিমার আসন্ন সুখস্বপ্নে বিভোর! ওর চোখের ইশারায় উদ্দাম চঞ্চলতা, মুখের ভাব হয়ে উঠেছে কোমল, আর সেই সঙ্গে তোতাপাখির মতো অনর্গল কথা বলে চলেছে।

জিনির এই অভাবনীয় আকস্মিক পরিবর্তনে কিটসন একেবারে হতবাক। নিজেকে এক সদ্যবিবাহিত যুবকের ভূমিকায় খাপ খাওয়াতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তবে এখন কিটসনকে দেখলে মনে হবে, কোনও মধ্যবিত্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে চলেছে মধুচন্দ্রিমা যাপনের উদ্দেশ্যে। এবং ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার ভয়ে সে বেশ চিন্তিত।

সকালবেলা মরগ্যান তার বুইক এবং ক্যারাভ্যান টানার শেকল বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে; এবং কথামতো জিপোও মরগ্যানকে অনুসরণ করে লিংকন নিয়ে যথাসময়ে হাজির হয়েছে। তারপর জিনি ও কিটসন যখন মরগ্যানের বুইকে চড়ে রওনা দিল, তখন কোনও এক অজ্ঞাত কারণে জিপো হঠাৎই ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ল।

দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া বুইকের দিকে তাকিয়ে সে মরগ্যানকে লক্ষ করে বলে উঠল, 'ওদের দুটিকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে, তাই না?' আসলে জিনিকে আমরা যতটা কঠিন ভাবি ততটা ও নয়। ওর চেহারার মতো কোনও মেয়ে ভালোবাসা ছাড়া থাকতে পারে না...ওদের দেখাচ্ছিলও ঠিক নতুন বিয়ে করা বর-বউয়ের মতো, তাই না ফ্র্যাঙ্ক?'

'তুমি তো দেখছি বুড়ি বিধবার মতো উল্টোপাল্টা ভাবতে শুরু করেছ, অ্যাঁ? তোমার হল কী জিপো? হঠাৎ কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

জিপো দুপাশে হাত ছড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকাল, 'ঠিক আছে আমার না হয় মাথা খারাপ হয়েছে, প্রলাপ বকছি—কিন্তু বলতে পার ফ্র্যাঙ্ক, ভালোবাসা ছাড়া এই দুনিয়ার সুখটা কোথায়?'

'ও হো—এসব রাখো এখন!' প্রায় ধমকে উঠল মরগ্যান, 'আমাদের অনেক কাজ পড়ে রয়েছে...শুধু শুধু সময় নষ্ট কোরো না; চলো, এডের ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে চলো।

জিপোর এই ধরনের মেয়েলি ভাবপ্রবণতা খুব একটা ভালো কথা নয়, ভাবল মরগ্যান। তাদের সামনে রয়েছে দুরূহ, দুঃসাহসিক কাজ। সুতরাং, সে ক্ষেত্রে ভাবাবেগের পিছনে নষ্ট করার মতো সময় তাদের নেই।

নদীর খুব কাছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের তৈরি একটা বিশাল বাড়ি। এই বাড়িতেই একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে এড ব্লেক।

লিফটে করে পাঁচতলায় পৌঁছল মরগ্যান। নির্জন বারান্দায় জুতোর মস্ মস্ শব্দ তুলে সে এগিয়ে চলল ব্লেকের ঘরের দিকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অধৈর্যভাবে কলিংবেলের বোতাম টিপে ধরল মরগ্যান।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল। এড ব্লেক দরজায় দাঁড়িয়ে।

ব্লেকের পরনে কালো পাজামা, শার্ট। তার বুকের কাছটায় সাদা সুতোয়
লেখা ঃ এ, বি—অর্থাৎ এড ব্লেক। এডের মাথার চুল উসকো খুসকো, চোখের পাতা ভারী, দৃষ্টি আংশিক আচ্ছন্ন।

'আরে কী ব্যাপার?! তোমারা এত সকাল-সকাল?' মরগ্যানকে লক্ষ করে বলল সে, 'কটা বাজে এখন?'

মরগ্যান সামনে এগিয়ে গেল। ব্লেককে ঠেলে নিয়ে ঢুকল বসবার ঘরে। ঘরটা ছোট হলেও আধুনিক ভাবে সাজানো-গোছানো। কিন্তু ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা জিন এবং হুইস্কির খালি বোতল ঘরের চেহারা পালটে দিয়েছে।

সিগারেটের ধোঁয়া আর সেন্টের গন্ধে ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। মরগ্যান সেটা টের পেতেই নাক কোঁচকাল, 'ওঃ ঘর তো নয়, যেন বেশ্যাবাড়িতে এসে ঢুকেছি! একটা জানলা খুলে রাখলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

'তা কেন?' বলে এগিয়ে গিয়ে একটা জানলা ধাক্কা দিয়ে খুলে দিল ব্লেক। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে সে সময় দেখলঃ এগারোটা কুড়ি। 'তোমরা দেখছি অনেক আগেই এসে পড়েছ!...তা কিটসন কি রওনা হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, ওরা অনেকক্ষণ বেরিয়ে পড়েছে।' মরগ্যান চোখ ফেরাল শোবার ঘরের দরজার দিকে। প্রশ্ন করল, 'শোবার ঘরে কে আছে?'

ব্লেক চতুর হাসি হাসল, 'ওর জন্যে ভেব না—মেয়েটি এখন ঘুমে অচেতন।'

মরগ্যান ঝটিতি আঁকড়ে ধরল ব্লেকের জামা। এক হ্যাঁচকায় তাকে সামনে টেনে আনল, 'শোনো এড, আমাদের সামনে এক বিরাট কাজের দায়িত্ব। তাছাড়া, কাল রাতে তুমি খুব একটা ভালো ফল দেখাতে পারনি। মনে রেখো, আসল কাজের সময় তোমাকে ওর চেয়ে বেশি সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে; নইলে তোমার সাহায্য আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। যদ্দিন পর্যন্ত না আমরা ওই ট্রাকের ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করছি, তদ্দিন মদ খাওয়া আর মাগী চরানো ছাড়ো। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে!'

ব্লেক ঝটকা মেরে নিজেকে সরিয়ে নিল, ওর মুখের রেখা হয়ে উঠল কঠিন।

'মুখ সামলে কথা বলো, ফ্র্যাঙ্ক।'

'তাই নাকি?' যদি মিষ্টি কথায় চিঁড়ে না ভেজে, তবে অন্য রাস্তা নিতে হবে দেখছি...। মিঃ এডওয়ার্ড ব্লেক, আমার কথা তোমার মগজে ঢুকলে ভালো, নইলে গলা ধাক্কা দিয়ে দল থেকে মেরে তাড়াব এ-কথা মনে রেখো। ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান কারও চোখ রাঙানিকে ভয় করে না।'

মরগ্যানের স্থির, উজ্জ্বল কালো চোখের সংকেত ব্লেকের সমস্ত সত্তাকে যেন বরফ করে দিল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে—তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

'থাকলেই ভালো।'

ব্লেক একটু সরে দাঁড়াল, বলল, 'খবরের কাগজে গত রাতের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু লিখেছে নাকি?'

'সাধারণত যা লেখে তাই। কাফেতে প্রত্যেকে এত ভয় পেয়েছিল যে পুলিশের কাছে আমাদের চেহারার কোনও সঠিক বর্ণনাই দিতে পারেনি। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে নিয়ে শত মাথা ঘামালেও পুলিশ আমাদের খোঁজ পাবে না। আচ্ছা, এবার কাজের কথায় আসা যাক। তুমি এখন সোজা চলে যাও জিপোর ওখানে, ওকে কাজে সাহায্য করো গিয়ে। আমাকে একটু ডুকাসে যেতে হবে।'

ঠিক আছে, 'যাচ্ছি' গজগজ করতে করতে জবাব দিল ব্লেক। আজ যে তার কাজ করার মেজাজ নেই, সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল তার মুখভাবে।

'নাও চটপট করো। ফালতু দেরি কোরো না।' খেঁকিয়ে উঠল মরগ্যান, 'আমি চললাম, আর্নির সঙ্গে দেখা করতে।' ওর কাছে একটা অটোমেটিক রাইফেল আছে; সেটা ও বেচতে চায়। দেখি, যদি দরে পোষায় তাহলে কিনে নেব।'

'আমি তৈরি হয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ছি।' তড়িঘড়ি বলে উঠল ব্লেক।

মরগ্যান চলে যেতেই ব্লেক চাপা স্বরে একটা অশ্রাব্য খিস্তি করল, তারপর এগিয়ে গেল শোবার ঘরের দিকে। আধো আঁধারিতে ডুবে থাকা ঘরের পরিবেশ তার কাছে এই মুহূর্তে বিরক্তিকর মনে হল। বিছানার কাছাকাছি একটা জানলা খুলে দিতেই রোদের উষ্ণ ঝলক এসে পড়ল বিছানার ওপর শুয়ে থাকা মেয়েটির মুখে।

'ওঃ-হো... এডি, জানলাটা বন্ধ করে দাও।' প্রতিবাদ ও বিরক্তির সুরে বলে উঠল মেয়েটি, বিছানায় উঠে বসে পিট-পিট করে তাকাল ব্লেকের দিকে।' মেয়েটির গায়ের রং ঘোর বাদামি, মাথায় কালো চুলের গুচ্ছ কপালের ওপর নেমে এসেছে। আয়ত চোখের তারা ঘন নীল। পরনে হলদে রাত্রিবাস। তার ফিকে আচ্ছাদনের আড়ালে ওর সুঠাম তনুর ইঙ্গিত।

'চটপট লম্বা দাও সোনা, এক্ষুনি আমাকে কাজে বেরোতে হবে।' রাত্রিবাস ছেড়ে পোশাক পরতে পরতে বলল ব্লেক, 'নাও পা-দুটোকে একটু কাজে লাগাও।'

'কিন্তু এড, আমার ভী-ষ-ণ ক্লান্ত লাগছে। তোমার কাজ থাকলে তুমি যাও না, আমি না হয় একটু ঘুমিয়েই নিলাম। কী, আপত্তি আছে?'

'পুরোপুরি। তোমাকে এখানে একা থাকতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এসো জলদি উঠে পড়ো।'

মেয়েটা বিরক্তসূচক শব্দ করে গায়ের চাদরটা ছুড়ে ফেলল পায়ের কাছে। তারপর ঘুম চোখে টলতে টলতে নেমে দাঁড়াল মেঝেতে। হাত টান-টান করে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল ও। শ্লথ পায়ে এগোল বাথরুমের দিকে।

'কিন্তু হঠাৎ এত তাড়াহুড়ো কেন এডি?' ঘন কালো চুলে আলতোভাবে আঙুল চালাতে চালাতে প্রশ্ন করল মেয়েটা, 'তোমাকে কে ডাকতে এসেছিল?'

ব্লেক তখন ইলেকট্রিক রেজার দিয়ে একমনে দাড়ি কামাচ্ছে। উষ্ণ স্বরে বলে উঠল, 'জামাকাপড় পরে যত তাড়াতাড়ি পার কেটে পড়ো সোনা। কতবার বলব আমাকে এক্ষুনি কাজে বেরোতে হবে?'

রাত্রিবাস ছেড়ে জলের ঝাঁঝরির নীচে দাঁড়াল মেয়েটা। কল খুলে দিল।

'মাঝে মাঝে ভাবি, সব জেনেশুনেও কেন বার বার তোমার কাছে ফিরে আসি।' জলের একঘেয়ে ঝির-ঝির শব্দকে ছাপিয়ে বাথরুম থেকে ভেসে এল মেয়েটার কণ্ঠস্বর, 'সেই বহু প্রচলিত ছকে বাঁধা রাস্তায় তোমার নাটক শুরু; যন্ত্র-সংগীতের হালকা সুর, নরম আবছা আলো, কানের কাছে ফিসফিস করে কত কথা...তারপর হঠাৎ জামাকাপড় পরে রাস্তা দেখো। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার কী ছিরি! অথচ, এডি, তুমিই আবার আমার স্বপ্নের রাজপুত্র! হৃদয়ের নায়ক।'

ব্লেক বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'ছেনালি রাখো, গ্লোরি! যা করছ জলদি করো। ফালতু সময় নষ্ট কোরো না।'

দাড়ি কামানো হয়ে গেলে ব্লেক চলল রান্নাঘরের দিকে কফি তৈরি করতে। তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, মুখ শুকিয়ে কাঠ—যেন কেউ একমুঠো তুলো গুঁজে দিয়েছে। কাল রাতে অত মদ না গিললেই পারতাম—ভাবল ব্লেক। কিন্তু না গিলেও কোনও উপায় ছিল না। কারণ গত রাতের ব্যর্থতা তার আত্মবিশ্বাসকে দলে পিষে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।...না গ্লোরিকে কাল রাতে না ডাকলেই ভালো করত। মরগ্যান যে ব্যাপার-স্যাপার দেখে খুব একটা খুশি হয়নি, তা সে ভালোই বুঝতে পারল।

একটা কাপে কফি ঢালল ব্লেক। অ্যাসপ্রোর শিশি বের করে তিনটে ট্যাবলেট খেয়ে নিল। সেই সময় অস্বস্তির সঙ্গে সে লক্ষ করল, তার হাত কাঁপছে। ব্লেক কফির কাপে শেষে চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রান্নাঘরে এসে ঢুকল গ্লোরি ডসন। পোশাক থেকে শুরু করে সাজসজ্জা—সবই ওর সম্পূর্ণ।

'উম-ম...কফি।' আমার জন্যে এক কাপ ঢালো, এডি।' আবদারের সুরে বলল গ্লোরি।

'উঁহু—এখন সময় নেই। যাবার সময় পথে কোনও রেস্তোরাঁ থেকে অনায়াসেই কফি খেয়ে নিতে পারবে। চলো—এবার যাওয়া যাক।'

'এক মিনিট, এডি।' গ্লোরির স্বরের তীক্ষ্ণতায় চমকে ওর দিকে ফিরে তাকাল ব্লেক, 'একটু আগে তোমার কাছে মরগ্যান এসেছিল, তাই না? কী যেন বলছিল সে... কী সব বিরাট কাজের দায়িত্ব... ব্যাপার কী, এড? খারাপ কিছু নয়তো?'

ব্লেক চমকে উঠল। কয়েক মুহূর্ত সে অবাক চোখে চেয়ে রইল গ্লোরির দিকে। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না, গ্লোরি। নিজের চরকায় তেল দাও। এ ব্যাপারে দ্বিতীয়বার কৌতূহল দেখাতে গেলে ফল ভালো হবে না।'

'এডি, লক্ষ্মীটি আমার কথা শোনো।' গ্লোরি আঁকড়ে ধরল ব্লেকের হাত, 'মরগ্যান সংঘাতিক লোক। তার সম্বন্ধে নানা কথাই আমার কানে এসেছে। সারাটা জীবন সে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে কাটিয়েছে। মানুষ খুন ছাড়া হেন কাজ নেই যা মরগ্যান করেনি। তবে যেভাবে সে এগোচ্ছে, তাতে খুনটা খুব বেশিদিন বাকি থাকবে বলে আমার মনে হয় না। এডি, আমার এই একটা কথা রাখো; মরগ্যানের সঙ্গ তুমি ছেড়ে দাও। নইলে শুধু-শুধু তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনবে—।'

গত তিনমাস ধরে ব্লেকের একমাত্র নৈশসঙ্গিনী এই গ্লোরি ডসন। ওকে যে ব্লেকের তেমন একটা অপছন্দ তা নয়। তাছাড়া গ্লোরিই প্রথম—এবং সম্ভবত শেষ মানুষ যে ব্লেকের মঙ্গল কামনা করে, ওর ভালোমন্দের জন্যে চিন্তা করে, নিছক ব্লেককে ভালোবাসে বলেই, অন্য কোনও কারণে নয়। কিন্তু তবুও গ্লোরির এই গায়ে পড়ে উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারটা ব্লেকের একেবারেই পছন্দ হল না। সে খেঁকিয়ে উঠল, 'যাক, আর লম্বা-চওড়া উপদেশ দিতে হবে না। আমার ভালোমন্দ আমিই বুঝব। নাও, চলো—।'

গ্লোরি নিরুপায় হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল, 'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। অনুরোধ করা ছাড়া আর কী-ই বা আমি করতে পারি? কিন্তু আবারও বলছি এডি, মরগ্যান মোটেই ভালো লোক নয়। ওর দলে যোগ দিলে তুমি নিজেরই বিপদ ডেকে আনবে।'

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা—এবার থামো দেখি।' অধৈর্য হয়ে গ্লোরিকে বাধা দিল ব্লেক, 'দোহাই তোমার এবারে চলো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'আজ রাতে কি তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'না। এ কটা দিন আমি কাজে ব্যস্ত থাকব। কাজ মিটে গেলে তোমাকে ডেকে পাঠাব। হয়তো সামনের সপ্তাহেই সব চুকে বুকে যাবে—তবে তার আগে নয়।'

মেয়েটি তাকাল ব্লেকের চোখে। মুখের ভাবে সংশয় ও সন্দেহ, 'তুমি আর মরগ্যান মিলে কোনও বদ মতলব আঁটছ না তো? ওঃ এডি ভগবানের দোহাই...'

গ্লোরির হাত ধরে চেপে ধরল ব্লেক। টানতে টানতে ওকে নিয়ে এল ফ্ল্যাটের বাইরে। চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল ফ্ল্যাটের দরজা। চাবিটা পকেটে ভরে সে বলল, 'তুমি একটু থামবে? বার বার এক কথা বলা আমি পছন্দ করি না। ভেব না, তুমি না হলে আমার চলবে না! এই বাজারে ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। কথাটা মনে রেখো।'

'ঠিক আছে এডি। তোমার ভালোর জন্যেই আমি তোমাকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাতে যদি তুমি বিরক্ত হও, তাহলে...'

'হ্যাঁ, আমি বিরক্তই হচ্ছি।' প্রায় ভেংচে উঠল ব্লেক। তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল, 'এখন দয়া করে একটু থামবে?'

সদর দরজায় পৌঁছে গ্লোরি বলল, 'তোমার জন্যে আমি কিন্তু অপেক্ষা করে থাকব। বেশিদিন দেরি করো না লক্ষ্মীটি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা!—' অধৈর্যভাবে হাত নেড়ে নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল ব্লেক। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল বাসস্টপের অভিমুখে।

বাসে বসে ব্লেকের মনে হল জিনির কথা। চোখ-মুখে সোনালি রোদের উষ্ণতা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে, জিনি ও গ্লোরির মধ্যে বিশাল পার্থক্যটা তার কাছে ধরা পড়ল! জিনির চেহারা এবং সাহসের কথা ভেবে সে আরও একবার অবাক হল। ওকে পাশে নিয়ে পথ চলার স্বপ্ন দেখল ব্লেক। এই মুহূর্তে গ্লোরিকে তার ঘৃণা করতে ইচ্ছে হল।

কিটসনের অবস্থাটা মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করল ব্লেক। জিনির পাশে একা বসে নব-বিবাহিত স্বামী হিসেবে কেমন অভিনয় করছে সে, সেটা দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করল তার। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ঘুষি খাওয়া, থ্যাবড়ামুখো ছোঁরাটাকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। নিছক কৌতূহলভরেই ব্লেক জানতে চাইল কিটসনের অবস্থাটা।

আনমনাভাবে আহত চোয়ালে হাত বোলাল ব্লেক। যন্ত্রণার অনুভব তাকে মনে করিয়ে দিল গত রাতে কিটসনের সঙ্গে তার মারামারির কথা। ব্লেকের চোখজোড়া প্রতিহিংসার জ্বালায় জ্বলে উঠল, দৃষ্টি হয়ে উঠল ক্রূর। না এই অপমানের কথা কোনও দিনই সে ভুলবে না। এর শোধ এডওয়ার্ড ব্লেক তুলবেই তুলবে, আর সেদিন কিটসনকে দুঃখ করতে হবে তার ভুলের জন্যে।

জিপোর কারখানার কাছে বাস যখন থামল, তখনও ব্লেক জিনির ভাবনায় মগ্ন। কারখানায় যাওয়ার উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে পথ চলতে চলতে সে ভাবল কিটসনের কথা জিনির পাশে বসে সে কী নিয়ে কথা বলছে মেয়েটার সঙ্গে?

জিনির সঙ্গে কথাবার্তা খুব কমই বলছিল কিটসন। ষাট মাইল রাস্তা এইভাবে চুপচাপ ওর পাশে বসে পাড়ি দিতে হবে ভেবে সে হতাশ হল। সাধারণত মেয়েদের সামনে কিটসন একেবারেই চুপচাপ থাকে না। বরং প্রগল্‌ভতার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবেই হাজির হয় ওদের কাছে। কিন্তু জিনির পাশে বসে নিজের এই অভাবনীয় পরিবর্তনে কিটসন নিজেও অবাক হল। সম্ভবত জিনির তেজস্ক্রিয় ব্যক্তিত্বের কাছে হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়েছে—তাই তার জিভ আড়ষ্ট। অথচ জিনির মতো করে আর কোনও মেয়ের সঙ্গ সে কোনওদিন কামনা করেনি।

জিনি কিন্তু একনাগাড়ে বকবক করেই চলেছে। হঠাৎ হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে কিটসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। বেশিরভাগ প্রশ্ন কিটসনের মুষ্টিযোদ্ধার অধ্যায় সংক্রান্ত। বিভিন্ন মুষ্টিযোদ্ধা সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামত, এবং তাঁদের সম্ভাবনাময় জীবনে হঠাৎ ইতি পড়ার কারণ—এই সব জানতে চেয়ে ও কিটসনকে ভীষণ বিব্রত করে তুলল! কিটসন বারকয়েক ইতস্তত করে বুদ্ধিদৃপ্ত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

চোখেজোড়া গভীর একাগ্রতায় সামনের রাস্তার দিকে নিবদ্ধ। পরবর্তী তিন-চার মাইল হয়তো কেটে গেল অখণ্ড নীরবতায়। তারপর আবার হয়তো শুরু হল জিনির অস্বস্তিকত প্রশ্নবাণের পালা।

একসময় জিনি আচমকা বলে উঠল, 'দু-লাখ ডলার পেলে সেটা নিয়ে কী করবে ভাবছ?'

কিটসনের মুখের দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে ও পায়ের ওপর পা-তুলে বসল। এক ভগ্নমুহূর্তে দেখা গেল জিনির সুঠাম উরু। নিখুঁত ভঙ্গিমায় অবাধ্য স্কার্টকে আবার যথাস্থানে স্থাপন করল ও ব্যাপারটা কিটসনের চোখ এড়াল না। মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দিগভ্রান্ত বুইকের স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার আয়ত্তে আনল সে।

'এখনও তো টাকা পাইনি। সুতরাং এত আগে থেকে স্বপ্ন দেখার কোনও মনে হয় না।'

'তার মানে আমাদের এই প্রাপ্তিযোগ সম্পর্কে তোমার মনে এখনও সন্দেহ আছে?' একটু অবাক হল জিনি।

সে ইতস্তত করল, রাস্তার দিকে নজর রেখে ধীর স্বরে জবাব দিল, 'যদি সত্যিই আমরা টাকাটা পাই, তবে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করব। কারণ টমাস আর ডার্কসনের সঙ্গে আমি কাজ করেছি, আমি ওদের ভালো করেই চিনি। ওরা আমাদের সহজে রেহাই দেবে না।'

'সেটা পুরোপুরি আমাদের ওপর নির্ভর করছে।' শান্তস্বরে বলল জিনি, 'টমাস ও ডার্কসনকে যদি ঠিকভাবে সমঝে দেওয়া যায় যে আমরা নেহাত ছেলেখেলা করতে আসিনি, তাহলে ওরা আর বাধা দেবে বলে মনে হয় না।...তাছাড়া, ওদের জন্যে আমি এতটুকু চিন্তিত নই। প্ল্যানমাফিক কাজ হলে আর কোনও ভয় নেই। টাকা আমরা পাবই—অন্তত আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত।'

'বললাম তো সে ক্ষেত্রে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।' কিটসন একই কথার পুনরাবৃত্তি করল, 'আমাদের প্ল্যানটা যে খারাপ তা আমি বলছি না। বিশেষ করে একটা গোটা ট্রাককে একটা ক্যারাভ্যানের মধ্যে লুকিয়ে ফেলার বুদ্ধিটা তো এক কথায় অপূর্ব! কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে তাহলেই আমরা ট্রাকটার তালাটা খুলে ফেলতে পারব! আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক, যেভাবেই হোক ট্রাকটা আমরা খুললাম এবং যার-যার টাকা ভাগ করে নিলাম। তারপর? দু-লাখ ডলার নেহাত চাট্টিখানি ব্যাপার নয়? অত টাকা তুমি ব্যাঙ্কে রাখতে পারবে না, কারণ পুলিশ সারাক্ষণ তক্কে তক্কে থাকবে। সুতরাং ওই এক বস্তা ক্যাশ টাকা নিয়ে আমরা করব কী?'

'কেন? টাকাটা একটা সেফটি ভল্টে রেখে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! তাতে তো আর পুলিশের ভয় নেই।'

'নেই যে তা বলি কেমন করে? গত বছর সেই ব্যাঙ্ক লুটের ব্যাপারটা তোমার মনে আছে? তারাও ঠিক তোমার কথামতো লুটের টাকা সেফ ডিপোজিট ভল্টে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু পুলিশ তো আর ঘাস খায় না। ওরা শহরের প্রতিটি ভল্ট একে একে খুলে দেখতে লাগল, এবং শেষ পর্যন্ত ঠিক খুঁজে পেল ব্যাঙ্ক লুটের সমস্ত টাকা।' কিটসনের আঙুল চেপে ধরল স্টিয়ারিং হুইলের ওপর। চোখের দৃষ্টি স্থির।

'তাই যদি হয়, তবে টাকাটা নিয়ে সোজা চলে যাব ন্যু-ইয়র্ক অথবা সানফ্রানসিসকোয়—অথবা তার চেয়েও আরও দূরে, ছোট্ট কোনও শহরে। সেখানে তো পুলিশ আর আমাদের খোঁজ পাবে না। তা ছাড়া পুলিশের পক্ষে গোটা আমেরিকার প্রতিটা ভল্ট খুলে দেখা তো সম্ভব নয়।'

'সে না হয় হল; কিন্তু অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো; দু-লক্ষ ডলার সঙ্গে নিয়ে তোমাকে দেশান্তরী হতে হবে। অর্থাৎ টাকাটা সঙ্গে করে বইতে গেলে একটা বড় সুটকেস ভর্তি হয়ে যাবে। মনে কর সুটকেস নিয়ে ট্রেনে ওঠার পর পুলিশ হঠাৎ ট্রেনের তল্লাশি নিতে শুরু করল, তখন? কারণ ট্রাক লুটের পর পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে দশ লক্ষ ডলার উদ্ধার করতে। সুতরাং...'

'ওঃ তুমি দেখছি ভীষণ ভীতু!" জিনির কথায় সহানুভূতির আভাস পেয়ে কিটসন অবাক হল, 'অতই যদি ভয় তাহলে এ কাজের পক্ষে ভোট দিলে কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে কিটসনের বিন্দুমাত্রও ছিল ন। তাই আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানতে চাইল সে, 'যাকগে ওসব কথা বাদ দাও। ফ্র্যাঙ্ক আমার কথা শুনলে হয়তো বলে বসত, প্রলাপ বকছি। তাছাড়া আমার মনে হয় একাজে আমরা সফল হব।' অস্বস্তিকর চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে জিনিকে আশ্বাস দিল কিটসন, 'এবার তুমি বলো তোমার টাকা নিয়ে তুমি কী করবে?'

সিটের গায়ে হেলান দিয়ে বসল জিনি। ওর উদ্ধত চিবুক এগিয়ে এল সামনের দিকে। উইন্ডশিল্ডের গায়ে জিনির সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতিটি প্রতিবিম্ব কিটসনকে আরও একবার মুগ্ধ করল।

'ও, সে সব অনেক আগে থেকেই আমার ঠিক করা আছে। অবশ্য তোমার তা ভালো নাও লাগতে পারে। টাকা থাকলে মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে, যা খুশি!...গত বছর আমার বাবা মারা গেছেন। যদি বাবার কিছু টাকা থাকত, তাহলে বোধহয় তিনি আজ বেঁচে থাকতেন। বাবা মারা যাওয়ার সময় আমি কাজ করতাম একটা সিনেমা হলে, অতি সাধারণ চাকরি। সুতরাং দামি ওষুধ-পত্রের সংস্থান করা সম্ভব ছিল না। বাবা মারা যাওয়ার পর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, টাকার অভাবের জন্যে এ পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে আমি রাজি নই। বাবার মতো শুয়ে থেকে নির্জীবের মতো হার মেনে নিতে আমি রাজি নই। তাই অনেক মাথা খাটিয়ে এই ট্রাক-লোপাটের প্ল্যানটা আবিষ্কার করলাম।'

জিনির অভাবিত অপ্রত্যাশিত এই আত্ম-উন্মোচনে কিটসন বিচলিত হল। এই ট্রাক-লোপাটের ব্যাপারে জিনির মন যে স্থির প্রতিজ্ঞ, তা জানতে পেরে সে যেন স্বস্তিবোধ করল। কিটসন বুঝল, জিনি ক্রমশই তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

'কিন্তু এই ট্রাক ও দশ লাখ ডলারের খবর তুমি পেলে কেমন করে?' সে প্রশ্ন করল।

কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল জিনি।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর কিটসন চোখ ফেরাল ওর দিকে। দেখল, ওর মুখে ফিরে এসেছে আগের সেই বরফ-কঠিন নির্বিকার অভিব্যক্তি। কিটসন হঠাৎ যেন দমে গেল। সাত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ভেব না আমি তোমার হাঁড়ির খবর জানতে চাইছি! এমনি কৌতূহল হল, তাই জিজ্ঞেস করলাম। যাক গে, কিছু মনে কোরো না—কোনও ভুল হয়ে থাকলে মাপ চাইছি।'

জিনি তাকাল কিটসনের চোখে। ওর সমুদ্র-সবুজ চোখে শূন্য দৃষ্টি। তারপর ঝুঁকে পড়ে ও অন করল রেডিওর সুইচ। কিছুক্ষণ নবগুলো নাড়াচাড়া করার পর রেডিওতে ভেসে এল আধুনিক যন্ত্র-সংগীতের সুর। সিটে গা এলিয়ে বাজনার তালে তালে পা নাচাতে লাগল জিনি।

কিটসন বুঝল, তাদের আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানার এ এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। নিজের ওপর মনে মনে বিরক্ত হল সে; অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল কিটসন।

মিনিট কুড়ি পর ক্যারাভ্যান-মার্ট-এর সামনে এসে থামল কিটসনের বুইক। দোকানের নাম 'দ্য কোয়ালিটি কার অ্যান্ড ক্যারাভ্যান সেন্টার।' মার্লো থেকে মাইলখানেক দূরে বড় রাস্তার ওপরেই অবস্থিত দোকানটা।

কিটসনের চোখে পড়ল একটা সবুজ-সাদা রঙের কাঠের ঘর—সম্ভবত অফিসঘর। তার পাশেই বিরাট গ্যারেজ—পুরোনো গাড়ি, লরি, ক্যারাভ্যান সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড় করানো। ওদের গাড়ি দোকানের কাছে থামতেই অফিস ঘর থেকে পড়িমড়ি করে দৌড়ে এল এক অল্পবয়সি যুবক। তাকে দেখেই কিটসনের বিরক্তি আরও বেড়ে গেল। যে ধরনের ছেলেদের সে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে, লোকটা দুর্ভাগ্যবশত সেই দলের। তার মুখশ্রী সাধারণের চেয়ে সুন্দর, গায়ের রঙ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল, গভীর নীল চোখের তারা সজীব, প্রাণবন্ত। লোকটার পরনে সাদা গরম স্যুট, একটা ঘিয়ে রঙের শার্ট এবং একটা রক্ত-লাল টাই। ডান হাতের শক্ত কবজিতে একটা দামি ওমেগা ঘড়ি সোনার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো।

লোকটা কিটসনের গাড়ির কাছে উদগ্রীব হয়ে এগিয়ে এল। একটা মোটা দাঁও মারার প্রত্যাশায় তার মুখে চোখে আশার আলো জ্বলজ্বল করছে।

গাড়ির দরজার কাছে পৌঁছে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর চট করে এগিয়ে গেল ওপাশের দরজার দিকে—যে দিকে জিনি বসে আছে। লোকটা দরজা খুলে ধরতে জিনি গাড়ি ছেড়ে নামল। তার একগাল হাসি ভরা প্রিয়জনসুলভ অভ্যর্থনার বহর দেখে কিটসনের মুষ্টিবদ্ধ হাত নিশপিশ করতে লাগল আক্রোশে।

'ক্যারাভ্যান সেন্টারে এসেছেন বলে ধন্যবাদ ম্যাডাম।' মাথা ঝুঁকিয়ে লোকটা নাটকীয় ঢঙে বলে উঠল, 'এখানে এসে ভালোই করেছেন।

আপনাদের একটা ক্যারাভ্যান চাই, এই তো? আমাদের চেয়ে ভালো ক্যারাভ্যান এ চত্বরে কোত্থাও পাবেন না! আসুন—দেখবেন আসুন—'

কিটসন ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। লোকটার কথায় সে মুখ দিয়ে হুম করে একটা অস্পষ্ট শব্দ করল। লোকটার গায়ে পড়া স্বভাব দেখে তার অস্বস্তি হল।

'আমার নাম হ্যারি কার্টার।' নিজের পরিচয় দিল লোকটা। বুইকের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে কিটসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে—কাঁধ ঝাঁকাল।

'আপনি ঠিকই ধরেছেন মিঃ কার্টার, আমরা একটা জুতসই ক্যারাভ্যানের খোঁজ করছি—তাই না, আলেক্স?' জিনির স্বর কিশোরীর মতো খুশি খুশি শোনাল।

হ্যারি কার্টার জিনির হাসির প্রত্যুত্তরে আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসল, 'তাহলে বলতে হবে, আপনারা ঠিক উপযুক্ত জায়গাতেই এসেছেন। আপনাদের জীবনে এ এক স্মরণীয় অধ্যায়—এর গুরুত্ব আপনাদের কাছে অনেকখানি,... কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকুন, ক্যারাভ্যান নিয়ে আপনাদের এতটুকু অসুবিধেয় পড়তে হবে না। যেটা পছন্দ হয় সেটা বেছে নিন—সব রকম ক্যারাভ্যান আমাদের দোকানে রয়েছে। আপনাদের কিরকম চাই, সেটা খালি আমাদের বলুন।'

কার্টারের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে কিটসন গম্ভীরভাবে বলে উঠল, 'একটু কম দামের মধ্যে চাই।'

'দাম নিয়ে বিন্দুমাত্রও ভাববেন না,' তড়িঘড়ি কিটসনকে বাধা দিল কার্টার। কিন্তু তার চোখ-জোড়া জিনির সুঠাম পায়ের দিকে, 'কম দামের ক্যারাভ্যানও এখানে অনেক আছে। আসুন না, ঘুরে ফিরে দেখবেন। যেটা আপনাদের পছন্দ হয় বলুন, দামের জন্যে ভাববেন না।'

কার্টারকে অনুসরণ করে ওরা এগিয়ে গেল দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারাভ্যানগুলোর দিকে।

মনমতো ক্যারাভ্যানটাকে খুঁজে পেতে কিটসনের বেশ কিছু সময় লাগল। কারণ জিপোর নির্দেশমতো ক্যারাভ্যানটা কম করে ষোলোফুট লম্বা হওয়া দরকার, এবং তাতে অতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জাম না থাকাই বাঞ্চনীয়। কিটসন বেশ কিছুটা ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারাভ্যানটাকে হঠাৎই লক্ষ করল। সে থমকে দাঁড়াল ওটা পরীক্ষা করে দেখার আশায়।

ক্যারাভ্যানটা সাদা রঙের, কিন্তু ছাদের রং আকাশ-নীল। দু-পাশে এবং সামনে পিছনে দুটো করে জানলা।

'এটায় কাজ চলতে পারে।' জিনিকে লক্ষ করে বলল কিটসন। জিনি প্রত্যুত্তরে সংক্ষিপ্ত মাথা দোলাল। 'মিঃ কার্টার, এটার মাপ কত?'

'কোনটা? এই সাদাটা?' কার্টার যেন অবাক হল, 'আমার মনে হয় আপনাদের পক্ষে তেমন জুতসই হবে না, মিঃ...' কার্টার চোখ রাখল কিটসনের চোখে, 'আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানি না, মিঃ...'

'হ্যারিসন।' কিটসনের মুখে কোনওরকম ভাব পরিবর্তন হল না, 'মাপ কত ক্যারাভ্যানটার?'

'সাড়ে ষোলো বাই ন-ফুট। সত্যি বলতে কী মিঃ হ্যারিসন, এই ক্যারাভ্যানটা আসলে শিকার-টিকার করার জন্যে তৈরি—এবং সেই কারণেই বেশ শক্তপোক্ত। তাছাড়া ভেতরে সেরকম কোনও সুব্যবস্থাও নেই—বুঝতেই তো পারছেন। আপনার স্ত্রী সম্ভবত এটা একেবারেই পছন্দ করবেন না, তাই না মিসেস হ্যারিসন?' কার্টারের চোখজোড়া আবার গিয়ে থমকাল জিনির সুগঠিত পায়ের ওপর, 'অবশ্য এটার মতো

অন্য ক্যারাভ্যানও আছে—তাতে সবরকম বন্দোবস্তই করা রয়েছে—দেখবেন আসুন, একেবারে 'এ' ক্লাস জিনিস।'

কিটসন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল ক্যারাভ্যানটার চাকা, স্বয়ংক্রিয় ব্রেক... বুঝল ক্যারাভ্যানটার ওজন বইবার ক্ষমতা। তাছাড়া জিপো বার বার বলে দিয়েছিল স্বয়ংক্রিয় ব্রেকের কথা। নাঃ, এ জিনিসই তাদের চাই।

'আমার স্বামী দেবতা হাতের কাজে ওস্তাদ।' ঠাট্টার সুরে বলে উঠল জিনি, 'আমাদের আসল মতলবটা তাহলে আপনাদের খুলেই বলি, মিঃ কার্টার।' কার্টারের নীল চোখে কপট কৌতূহল। আমরা ঠিক করেছি, একটা ক্যারাভ্যান কিনে সেটাকে নিজের মনমতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেব। এর ভেতরটা একবার দেখতে পারি?'

কার্টার কিছুটা দমে গেলেও চটপট জবাব দিল, 'ও নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে এটা দেখা হয়ে গেলে আরও একটা ক্যারাভ্যান আপনাদের কষ্ট করে দেখতে হবে। তাহলেই বুঝবেন আমি 'এ' ক্লাস বলতে কী বোঝাতে চাইছি। এটা নিছকই একটা বাক্স বুঝলেন কি না?'

কার্টার ক্যারাভ্যানের দরজা খুলতেই জিনি ও কিটসন ভেতরে উঁকি মারল।

সেই মুহূর্তেই কিটসন তার ধারণা সম্পর্কে নিশ্চিত হল। ক্যারাভ্যানের ভেতরে দু-একটা হালকা শেলফ, র‍্যাকে দিয়ে সাজানো। এগুলোকে মিনিট কয়েকের চেষ্টাতেই খুলে সাফ করে দেওয়া যায়। কিটসন এবার ঢুকল ক্যারাভ্যানের ভেতর। নাঃ, মেঝেটা ভীষণ মজবুত; তাছাড়া দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও কিটসনের মাথার ওপর প্রায় ইঞ্চিকয়েক জায়গা রয়েছে।

এরপর হ্যারি কার্টারের অনুরোধে দ্বিতীয় ক্যারাভ্যানটাও ওরা দেখল, এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল, প্রথমটাই ভালো।

নীল-সাদা ক্যারাভ্যানটা দিকে পা চালাতে চালাতে কিটসন জানাল, 'মিঃ কার্টার, প্রথমটাই আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে। কত দাম পড়বে ওটার?'

ক্যারাভ্যানটার পাশে দাঁড়িয়ে ওটার ওপর চোখ বোলাতে লাগল কার্টার। বোধহয় মনে মনে কিটসনের পকেটের জোর আন্দাজ করতে চাইল।

'এই ক্যারাভ্যানটা বেশ মজবুত, মানে টেঁকসই, বুঝলেন মিঃ হ্যারিসন।' কার্টার তার গৌরচন্দ্রিকা শুরু করল, 'বহু বছর পর্যন্ত এটা আপনাদের কাজে আসবে। না, এটা নিয়ে আপনারা ঠকবেন না। এটার নতুন দাম হচ্ছে তিন হাজার আটশো ডলার। তবে এটা তো আর নতুন নয়, তাই দামটা না হয় কিছু কমানো যাবে। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, এর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই, মানে, যারা এটা নতুন কিনেছিল তারা পুরো ছ'মাসও জিনিসটা ব্যবহার করেনি। আর আপনাদের জিনিসটা যখন পছন্দ হয়েছে, মানে হানিমুনের ব্যাপার—তখন আর বেশি দাম বলি কী করে, বলুন? নিন, মাত্র আড়াই হাজারেই ক্যারাভ্যানটা আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি। একেবারে জলের দর মশাই, এক্কেবারে জলের দর!'

'উঁহু, অত দাম তো আমরা দিতে পারব না।' কিটসন কিছু বলার আগেই জিনি বলে বসল। 'তাহলে মনে হচ্ছে এটা আর আমরা নিতে পারলাম না, মিঃ কার্টার। চলো আলেক্স, অন্য কোথাও যাওয়া যাক।'

কার্টার বিজ্ঞের হাসি হাসল, 'আমি এমন কিছু বেশি দাম বলিনি, মিসেস হ্যারিসন। এ এলাকায় আর কোথাও আপনি ক্যারাভ্যান পাবেন না। সেই এক পাবেন সেন্ট লরেন্সে গেলে—তবে সেখানে জিগ্যেস করলে বুঝতে পারবেন আমাদের চেয়ে সেখানে দাম কত বেশি! যদি আপনাদের এটার দাম বেশি মনে হয়, তাহলে আসুন, একটু কম দামের মধ্যে অন্য ক্যারাভ্যান আপনাদের দেখাই। ওই তো ওটা দেখছেন—ওটার দাম মাত্র পনেরোশো ডলার—ওটা অবশ্য তেমন মজবুত নয়, কিন্তু শৌখিনভাবে সাজানো।'

‘আঠারোশো ডলার পর্যন্ত আমি উঠতে পারি, মিঃ কার্টার।’ কিটসন নির্বিকারভাবে বলল, ‘তার বেশি দেওয়া আমাদের ক্ষমতার বাইরে।’

অনুকম্পার হাসি কার্টারের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল, ‘আপনার শর্তে রাজি হতে পারলে খুশি হতাম, মিঃ হ্যারিসন, কিন্তু আমি নিরুপায়। বিশ্বাস করুন আঠারোশো ডলার একদম পোষায় না। জিনিসটা আপনার পছন্দ হয়েছে বলেই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে খারাপ লাগছে—ঠিক আছে, নিন, পুরোপুরি তেইশশো ডলারই দেবেন। এর চেয়ে কম করতে বলবেন না।’

কিটসনের মেজাজ ক্রমশ তিরিক্ষে হয়ে উঠতে লাগল। কার্টারকে কলার ধরে দুটো ঝাপ্পড় দেবার ইচ্ছেকে সে অতিকষ্টে দমিয়ে রাখল।

কার্টারের মোলায়েম, ভদ্র কথাবার্তা, তার সুন্দর ব্যবহার, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ কিটসনকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল। কারণ জীবনে যে সফলতার স্বপ্ন সে দেখেছিল তার চেহারা অনেকটা কার্টারের মতো। ব্যর্থতা ও হতাশা মিশে কিটসন অনুভব করল এক অদ্ভুত জ্বালা।

‘কিন্তু অত টাকা দিয়ে ক্যারাভ্যান কেনার ক্ষমতা আমাদের নেই, মিঃ কার্টার।’ জিনি বলে উঠল। ওর সবুজ চোখে এক বিশেষ মাদকতার দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল কার্টারের চোখে। কিটসনের চোখজোড়ায় খেলে গেল ক্রোধের বিদ্যুৎ। জিনির এই মোহিনী ভঙ্গিমায় যেন ঝরে পড়ছে যেন আবেদন, আর কার্টার সেটা ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো চোখ দিয়ে চাটছে। এমন করে ও তো কোনওদিন কিটসনকে দেখিনি! ‘ওটাকে দু-হাজারই করুন না। বিশ্বাস করুন ওর চেয়ে বেশি টাকা আমাদের সঙ্গে নেই!’

কার্টার চিন্তিতভাবে গোঁফে হাত বোলাল। অসীম কৌতূহলভরে জিনির দেহের প্রতিটি বাঁক জরিপ করল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে সে কাঁধ ঝাঁকাল, ‘আপনার অনুরোধকে আগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই, মিসেস হ্যারিসন। অন্য কেউ হলে এ প্রস্তাবে আমি কখনই রাজি হতাম না। সত্যি কথা বলতে কী, দু-হাজারে ক্যারাভ্যানটা বেচলে আমার অন্ততপক্ষে একশো ডলার লোকসান যাবে—কিন্তু টাকাটাই তো বড় কথা নয়। ঠিক আছে, এটাকে আপনাদের বিয়ের উপহার বলেই ধরে নিন; আপনাদের জন্যে ওটার দাম আমি দু-হাজারেই নামিয়ে দিলাম।

বুঝলেন মিসেস হ্যারিসন, সম্পর্কটাই আসল, টাকা-পয়সার কোনও দামই সেখানে নেই।’

কিটসনের ফরসা মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। উত্তেজনায় তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হল।

‘শুনুন, মশায়...’ কিটসনের উত্তেজিত স্বরকে বাধা দিল জিনি, ‘ধন্যবাদ, মিঃ কার্টার, আপনার সহযোগিতার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। দু-হাজারে আমরা রাজি।’ জিনির মনকেড়ে নেওয়া, ইঙ্গিতময় হাসি নিছক ব্যর্থ হল না।

কান এঁটো করা হাসি হেসে কার্টারের দৃষ্টি জিনির দিকে তীক্ষ্ণ হল, ‘এতে আর ধন্যবাদের কী আছে মিসেস হ্যারিসন। নেহাত আপনি বললেন, ‘তাই খাতির করলাম। আমার লোকেদের বলে দিচ্ছি ক্যারাভ্যানটা আপনার গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেবে। আসুন, অফিসে বসে লেনদেনটা সেরে ফেলা যাক।’ এবার কিটসনের দিকে ফিরল কার্টার—মুখে অনুগ্রহের হাসি, ‘আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন মিঃ হ্যারিসন। দরাদরির ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর জুড়ি নেই—আমার মতো ব্যবসাদারকে পর্যন্ত তিনি রাজি করিয়ে ফেললেন! সত্যি এমন স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা।’

অফিসে এসে ওদের লেনদের সম্পূর্ণ হল। কার্টার যেন ছল-ছুতোয় দেরি করতে চাইল। বিলটা দু-আঙুলে ধরে সে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে জিনির দিকে তাকাল, ‘হানিমুন কাটাতে কোথায় যাচ্ছেন, মিসেস হ্যারিসন? প্যারিসে?’

‘উহুঁ! আমার স্বামী মাছ ধরতে খুব ভালোবাসেন। তাই ভাবছি কোনও পাহাড়ি এলাকাতেই যাব। তারপর কী হয় পরে দেখা যাবে।’

কিটসন হাত বাড়িয়ে কার্টারের হাত থেকে বিলটা ছিনিয়ে নিল। কার্টারের লোলুপ দৃষ্টি সে একেবারেই সহ্য করতে পারছে না; অথচ জিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার।

'চলো, এবার ওঠা যাক। ওদিকে আবার একগাদা কাজ পড়ে রয়েছে।' জিনিকে লক্ষ করে কিটসন বলে উঠল।

কার্টার কৃপার হাসি হাসল, উঠে দাঁড়াল, 'আপনাদের শুভ মধুচন্দ্রিমা কামনা করি। পরে যদি কোনওদিন এই ক্যারাভ্যানটা পালটে নতুন কিছু কেনার ইচ্ছে হয়, লজ্জা করবেন না—সোজা আমার কাছে চলে আসবেন।' কথা শেষ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে জিনির সঙ্গে হাত ঝাঁকাল কার্টার।

কিটসন বিরক্ত হয়ে পকেটে হাত ভরে রাখল। কার্টারের সঙ্গে হাত ঝাঁকাতে তার গা রি-রি করছিল। নিজেকে সংযত করে সে এগিয়ে চলল—দরজার দিকে।

ক্যারাভানটা ততক্ষণে বুইকের পিছনে লাগানো হয়ে গেছে। কার্টার জিনির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল, পিছনে কিটসন।

জিনিকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার ভঙ্গি দেখে কার্টারের ওপর কিটসনের রাগ যেন দপ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সে নিজেকে সামলে নিল। কার্টার তার পিঠে এক সশব্দ চড় মেরে আসন্ন মধুচন্দ্রিমা সম্পর্কে শুভেচ্ছা জানাল।

ক্যারাভ্যান মার্ট ছেড়ে ওদের গাড়ি ছুটে চলতেই জিনি বলল, 'যাক জিনিসটা বেশ সস্তায় পাওয়া গেছে—মরগ্যান খুশিই হবে।'

কিটসন চাপা স্বরে ফেটে পড়ল, 'ওই হতভাগাকে কষে ধোলাই দেওয়া উচিত ছিল। ব্যাটা যেভাবে তোমার দিকে তাকাচ্ছিল...'

জিনি চট করে মুখ ফিরিয়ে তাকাল কিটসনের দিকে; ওর সবুজ চোখে বিরক্তি এবং ঘৃণা।

'তার মানে?'

'না, ওই কার্টারের কথা বলছি। ব্যাটা যে রকম জুলজুল করে তোমাকে দেখছিল, ইচ্ছে করছিল ওর নাকে একখানা বসিয়ে দিই!'

'কে আমার দিকে কিভাবে তাকাল, তাতে তোমার কী?' জিনির স্বর বরফ শীতল, 'আমি তোমার বিয়ে করা বউ নই; তবে মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছ কেন?'

কিটসনের মুখে কেউ যেন সজোরে চড় মারল। অপমানে তার মুখ হয়ে উঠল রক্তিম। শক্ত মুঠোয় স্টিয়ারিং চেপে ধরে একমনে গাড়ি ছুটিয়ে চলল।

জিপোর কাখানায় পৌঁছনো পর্যন্ত সে একেবারের জন্যেও মুখ খুলল না।

সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আসল কাজের জন্যে ক্যারাভ্যানটাকে তৈরি করে ফেলল জিপো, ব্লেক ও কিটসন।

ওই এগারো দিন ধরে জিপোর কাছ ছেড়ে নড়েনি ব্লেক। এমনকী জিপোর নোংরা আস্তানাতেই সে রাত কাটিয়েছে। ব্লেকের এতটা কর্মঅন্ত-প্রাণ হওয়ার একটা বিশেষ কারণ আছে। সে জানে, মরগ্যান তার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাই প্রাণপণ পরিশ্রম করে সে মরগ্যানকে দেখাতে চাইছে, এ কাজ সম্পর্কে তার উৎসাহ কম নয়; এবং তার ওই ব্যর্থতা সাময়িক, সেটাও মরগ্যানকে বুঝিয়ে দিতে সে বদ্ধপরিকর।

জিপোর কাছে শুয়ে রাত-কাটানো যে কী দুঃসহ ব্যাপার সেটা একদিনে ব্লেক বেশ বুঝতে পেরেছে। আসল কথা হল, জিপোর মতো নোংরামি ও কষ্টসহ্য করার ক্ষমতা তার একেবারেই নেই। ইটালিতে চাষ-বাসের কাজ করত বলে জিপো সবরকম অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। তাই বিভিন্ন অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ওর নির্লিপ্ততায় ব্লেক অবাক হয়েছে—সেইসঙ্গে হয়েছে বিরক্তও।

কিটসন প্রতিদিন সকালে ঘড়ি ধরে আটটার সময় কারখানায় আসে, আর রাত বারোটায় ফিরে যায় ঘরে। ওরা তিনজন সারাদিন ধরে ক্যারাভ্যানটার পিছনে লেগে থাকে। ওটা যাতে ট্রাকটাকে বইতে পারে, সেজন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করে চলে।

এই ক্যারাভ্যানটা নিয়ে কাজ করার সময়েই ব্লেক এবং কিটসন উপলব্ধি করল জিপোর কর্মদক্ষতা। ওর বুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্য না পেলে কাজ যে এতটুকু এগোত না, সেটা ওরা দুজনে বেশ বুঝতে পারল।

ব্লেক এমনিতে জিপোকে বিশেষ পাত্তা দিত না। কিন্তু এই কাজের সময় সে আবিষ্কার করল যন্ত্র-সংক্রান্ত ব্যাপারে জিপোর তুলনায় তারা নিতান্তই এক-একটি গর্দভ। জিপোর সাহায্য ছাড়া যে এই ট্রাক-লুট করার কথা ভাবা যায় না, সেটা ব্লেকের মগজে ঢুকল। সেইসঙ্গে ঈর্ষা এবং বিরক্তি তাতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু কিটসন এই সরল সাদাসিধে ইটালিয়ানের কাজ দেখে ভীষণ খুশি হল। মনে-মনে জিপোকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করল সে। তার মনে হল, জীবনে এই প্রথম সে একটা কাজ শিখছে। তাছাড়া জিপোর একাগ্রতা ও ধৈর্য তাকে মুগ্ধ করল।

মঙ্গলবার রাতে ক্যারাভ্যানের কাজ শেষ হল, এবং সেই রাতেই জিপোর কারখানায় মরগ্যান এক আলোচনা সভার আহ্বান জানাল।

গত এগারো দিন ধরে জিনি একেবারে বেপাত্তা। ও মরগ্যানের কাছে একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে বলেছিল, যদি পরিকল্পনার কোনও পরিবর্তন হয় তবে ওকে যেন ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ও কোথায় থাকে—কী করে, সে সম্পর্কে কারোরই কোনও ধারণা নেই—এমন কী মরগ্যানও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

জিপোর সঙ্গে কিটসন কাজে ব্যস্ত থাকলেও কিটসন সর্বদাই জিনির কথা ভেবেছে। সে যে নিজের অজান্তেই জিনিকে ভালোবেসে ফেলেছে, সেটা কিটসন আর অস্বীকার করতে চাইল না। অবশ্য এ ভালোবাসা যে নিতান্তই হাস্যকর ও অর্থহীন, সে বিষয়ে কিটসনের মনে কোনওরকম ভুল ধারণা নেই। যেমন সে জানে, ওয়েলিং কোম্পানির ট্রাক-লুটের পরিকল্পনা তাদের টেনে নিয়ে যাবে অসাফল্য ও একরাশ বিপর্যয়ের মধ্যে।

কিন্তু জিনির প্রতি তার আকর্ষণ এতই উদ্দাম যে তাকে রোধ করা কিটসনের অসাধ্য। অসংখ্য বীজানুর মতো সেই অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতিটি শিরা উপশিরায়—মিশে গেছে রক্তের সঙ্গে।

এ কদিন মরগ্যান ক্যারাভ্যান নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি। সে কেবল এজেন্সি থেকে রকেট রিসার্চ স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তাটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বারবার ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছে। ম্যাপের পর ম্যাপ এঁকে শুধু চিন্তা করেছে মরগ্যান। কোন পথ দিয়ে ঠিক কখন পালালে সুবিধে হবে, সেই মতলব ভেঁজেছে বসে-বসে। আর পরিকল্পনাটার আগাপাস্তলা যাচাই করেছে প্রতিটি মুহূর্তে।

মরগ্যানের চিন্তাধারা কখনওই খাপছাড়া ভাবে এগোয়ে না। সে জানে, ট্রাকটাকে দখলে আনবার পর পালাবার ব্যাপারটাই হয়ে উঠবে প্রধান। অর্থাৎ পুলিশ কোনওরকম খবর পাওয়ার আগে অকুস্থল থেকে ক্যারাভ্যানের দুরত্ব যতই বাড়ানো যায় ততই নিশ্চিন্ত। সুতরাং অনিবার্যভাবেই সারা শহরতলির ভৌগোলিক বিবরণ নিয়ে তাকে প্রাণপণ মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

রাত প্রায় আটটার সময় জিপোর কারখানায় এসে পৌঁছল মরগ্যান। এ কাজের সফলতা সম্পর্কে সে বর্তমানে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। শুধু দু-একটা ছোটখাটো ব্যাপারের জন্যে তাকে একটু চিন্তায় পড়তে হচ্ছে—অবশ্য সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আর যদি দুর্ঘটনা ঘটেই যায়, তবে তাকে রোধ করার ক্ষমতা মরগ্যান কেন, পৃথিবীর কারোরই নেই।

মাসের মধ্যে এই প্রথম বর্ষার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। বৃষ্টির ফোঁটা একঘেয়েভাবে ঝরে চলেছে। সেইসঙ্গে নাকে ভেসে আসছে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ।

বাঁধানো রাস্তা থেকে যেন অনুভূত হচ্ছে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস—বহুদিন প্রতীক্ষার পর সে যেন আজ প্রাণভরে তেষ্টা মেটাচ্ছে বর্ষার শীতল জলে। মরগ্যানের এই আবহাওয়া ভালো লাগল।

অদূরে জিপোর কারখানা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে। সমস্ত জানলা দরজা সযত্নে বন্ধ থাকায় ভেতরের আলোর আভাস বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। পুরো এলাকাটা যেন জনশূন্য এক পরিত্যক্ত স্থান।

বুইকের দরজা খুলে বাইরে পা রাখল মরগ্যান। হেডলাইট নেভাতে যাবে, শুনতে পেল কারও পায়ের শব্দ। কেউ যেন দৌড়ে আসছে তারই দিকে। অন্ধকারের দিকে অনুসন্ধানী চোখ মেলে ধরল মরগ্যান। নিষ্কম্প হাত যান্ত্রিকভাবে আঁকড়ে ধরল .৩৮-এর কঠিন বাঁট।

অন্ধকারের এলাকা থেকে আলোর বৃত্তে আবির্ভূত হল জিনি গর্ডন। ওর পরনে একটা নীল বর্ষাতি। জলে ভেজা থাকায় চকচক করছে। ওর মাথায় একটা নীল টুপি। তার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে তামা রঙ চুলের গুচ্ছ।

'বহুদিন পর বৃষ্টির মুখ দেখা গেল', বলল মরগ্যান, 'তোমার ঠিকানা জানা থাকলে আসার পথে তোমাকে তুলে নিতাম—'

'তাতে কী হয়েছে।' সংক্ষিপ্ত স্বরে জবাব দিল জিনি।

মরগ্যান এগিয়ে গেল ওর কাছে, মুখোমুখি দাঁড়াল। বৃষ্টির ছাঁটতে আড়াল করে আচমকা প্রশ্ন করল, 'তুমি থাক কোথায়, জিনি?'

জিনি থমকে দাঁড়াল। বৃষ্টির বেগকে উপেক্ষা করে চোখ রাখল মরগ্যানের চোখে, 'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

মরগ্যান তার থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল মেয়েটার হাত। সামনের দিকে সামান্য টেনে আনল ওকে, 'আমার সঙ্গে কথা বলার সময় সমঝে কথা বলবে খুকি। তোমার ব্যবহার, চালচলন প্রথম থেকেই আমার কাছে একটু ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকেছে। আমি এখনও জানি না, তুমি কে, তোমার আসল পরিচয় কী, কোথায় থাক, কী করে এই ট্রাক-লুট করার দুর্বুদ্ধি তোমার মাথায় এল—মানে, বলতে গেলে তুমি আমাদের কাছে এক রহস্যময়ী। তবে তোমার ইচ্ছে আমার অজানা নয়। তুমি ভাবছ, যদি ওই ট্রাক-লুটের ব্যাপারটা আমরা কেঁচিয়ে ফেলি তাহলে তুমি ভোল-চাল পালটে টুপ করে হাপিস হয়ে যাবে। জিনি গর্ডন নামে যে কেউ ছিল, সেটা পুলিশ ধরতেই পারবেন না, প্রমাণ করা তো দূরের কথা।'

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল জিনি, 'সেটা করা কি খুব অন্যায় হবে?' মরগ্যানের পাশ কাটিয়ে ও এগিয়ে গেল কারখানার দরজার কাছে। অধৈর্যভাবে টোকা মারল বারকয়েক।

কয়েক মুহূর্তে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মরগ্যান; তার অভিব্যক্তিহীন কালো চোখে সংশয় ফুটল। কিটসন কারখানার দরজার খুলে দিতেই সে জিনির পাশে গিয়ে দাঁড়াল, ওরা একই সঙ্গে কারখানায় ঢুকল।

'এই যে আলেক্স, এদিকের খরব কী?' বর্ষাতির জল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল মরগ্যান।

'এদিকের কাজ সব শেষ।' মরগ্যানের প্রশ্নের উত্তর দিলেও কিটসনের চোখ কিন্তু জিনির দিকে। জিনি ওর ভিজে বর্ষাতিটা ছুড়ে রাখল টেবিলের ওপর। ওর পরনে একটা ধুসর কোট, স্কার্ট আর সবুজ ব্লাউজ। এই পোশাকে ওকে সামনে দেখে কিটসনের বুকে যেন ধাক্কা লাগল। সে আরও একবার আবিষ্কার করল জিনির আগুন ঝরানো রূপের অনিবার্য প্রভাব। আশান্বিত উৎসুক চোখে সে জিনির দিকে চেয়ে রইল।

কিটসনের দিকে এক পলক ফিরে দেখল জিনি, কিন্তু তাকে তেমন আমল দিল না। বর্ষাতির পকেট হাতড়ে ও একটা বাদামি কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করল। সেটা হাতে দিয়ে ক্যারাভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জিপোর কাছে গিয়ে হাজির হল ও বলল, 'এই যে পরদাগুলো নিয়ে এসেছি।'

মরগ্যান জিপোর দিকে এগিয়ে এল, 'কী খরব?' মরগ্যানের দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে স্বভাবসিদ্ধ একগাল হাসি হেসে জিপো তাকে অভ্যর্থনা জানাল। তার গোলাকার ভারী মুখমণ্ডলে আত্মপ্রসাদের ছাপ স্পষ্ট।

'কাজ সব শেষ—আর কাজ দেখলে তুমি খুশি হবে ফ্র্যাঙ্ক।' পরদার প্যাকেটটা খুলতে লাগল জিপো, 'দাঁড়াও, পরদাগুলো আগে লাগিয়ে দিই, তারপর দেখো শালার ক্যারাভ্যানের চেহারা—একেবারে যন্তর।'

একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে ছায়ার আওতা থেকে বেরিয়ে এল এড ব্লেক। জিনিকে দেখে তার দৃষ্টি ওর শরীরে বাঁধা পড়ল—কিটসনের অবস্থাও তথৈবচ।

ব্লেক এই এগারো দিন বলতে গেলে কোনও মেয়ের মুখ দেখেনি। তাই আজ জিনিকে সামনে পেয়ে ওর মনের সেই পুরোনো ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে উঠল। কিটসনকে জিনির দিকে মোহগ্রস্তভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ব্লেক ভীষণ মজা পেল। থ্যাবড়ামুখো ছোঁড়াটা ভাবছে কী? ও কি সত্যিই-সত্যিই মনে করে যে জিনিকে ও কবজা করতে পারবে? হুঁ', বামন হয়ে চাঁদ ধরার শখ।

'কী ব্যাপার, কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন?' জিনির সামনে এগিয়ে গেল ব্লেক, 'একেবারে এগারো দিন নিপাত্তা। তা, এই লুকোচুরির কারণটা জানতে পারি?'

জিনি হাসল—ব্যাপারটা কিটসনের কাছে নিঃসন্দেহ অপ্রত্যাশিত। ব্লেকও ভেবেছিল জিনির সামান্য এক চিলতে হাসির জন্যে তাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। কিন্তু তার হাসির উত্তরে জিনির সহজ মিষ্টি হাসি ব্লেককে খুশি করল।

জিনি হালকা স্বরে জবাব দিল, 'ছিলাম কাছাকাছিই, তবে লুকোচুরি মোটেই খেলছিলাম না!'

'তাহলে মাঝে মাঝে এখানে এলেই পারতে?' ব্লেক তার সিগারেট কেস এগিয়ে দিল ওর দিকে, 'আমরা কাজে বেশ একটু নতুন করে উৎসাহ পেতাম।'

জিনি সিগারেট ঠোঁটে রাখল। ব্লেক লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল ওর সিগারেটটা।

'আসতে আমার আপত্তি ছিল না, তবে ওই যে উৎসাহ টুৎসাহ কী সব বললে, ওতে আমার একটু আপত্তি আছে।'

ওদের কথোপকথন চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিল কিটসন। আর সেইসঙ্গে বুকের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছিল। ওদের সহজ, ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা কিটসনের মনে বিরক্তি জাগিয়ে তুলল। সে জানত, জিনির সঙ্গে কোনওদিন এ ধরনের কথাবার্তা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এবং ব্লেকের কথাবার্তায় ওকে খুশি হতে দেখে সে আরও দুঃখ পেল।

'তাহলে অন্তত একটিবার এসে দেখা করে যেতে পারতে। আমি এখানে চুপচাপ একা একা দিনের পর দিন কাজ করে চলেছি...ওঃ। ভেবে দেখো, দশ-দশটা রাত আমাকে জিপোর মতো জলহস্তীর সঙ্গে কাটাতে হয়েছে...বাপরে বাপ!'

জিনি সশব্দে হেসে উঠল। 'ভালোই হয়েছে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে মাঝে মধ্যে একট আধটু পরিবর্তন দরকার।' কথা শেষ করে জিনি ক্যারাভ্যানের দিকে পা-বাড়াল। মরগ্যান তখন ক্যারাভ্যানের চারিদিকে ঘুরে ফিরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ওটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

পরদাগুলো ক্যারাভ্যানের জানলায় লাগিয়ে জিপো গলদঘর্ম অবস্থায় বেরিয়ে এল, 'এসো ফ্র্যাঙ্ক—ভেতরটা দেখবে এসো।'

মরগ্যান একইভাবে ক্যারাভ্যানের দিকে চেয়ে রইল, 'দরজাটার কী করছ, জিপো?'

জিপো হাসল—আকর্ণবিস্তৃত গর্বের হাসি। তারপর কিটসনকে চেঁচিয়ে ডাকল, 'আলেক্স, এদিকে এসো একবার—ফ্র্যাঙ্ককে কলকবজা নেড়ে দরজার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও দেখি!'

কিটসন জিপোর নির্দেশমতো ক্যারাভ্যানের সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়াল। মরগ্যান ও জিপো পিছন দিকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল।

দরজাটা বার দুয়েক নেড়েচেড়ে দেখল মরগ্যান। তার কাছে ওটা বেশ মজবুত বলেই মনে হল।

‘কী হে, কী রকম বুঝছ?’ সাফল্যের উত্তেজনায় জিপোর স্বর আগ্রহে ফেটে পড়ছে।

‘দেখে তো মন্দ লাগছে না।’

‘আসল কাজটা এখুনি দেখতে পাবে। আলেক্স, যন্তর চালু করো।’ কিটসনকে লক্ষ করে হাঁক দিল জিপো।

কিটসন একটা হাতলে চাপ দিতেই ক্যারাভ্যানের পিছনটা একটা বাক্সের ঢাকনা মতো ওপরে উঠে গেল। এবং একই সঙ্গে ক্যারাভ্যানের মেঝের কিছুটা অংশ বাইরে বেরিয়ে এল; অনেকটা পাটাতনের মতো। সেটা মাটিতে ঠেকতেই, ক্যারাভ্যান থেকে কারখানার মেঝে পর্যন্ত তৈরি হল একটা ঢালু মজবুত রাস্তা।

‘দেখেছ এবার আসল কায়দাটা? তুমি যেমনটি বলেছিলে ঠিক তেমনটি হয়েছে!’ হাতে হাত ঘষতে ঘষতে মরগ্যানকে লক্ষ করে বলল, জিপো, ‘পেছনের ঢাকনা আর ক্যারভ্যানের মেঝে দুটোকে একসঙ্গে কাজ করাতে গিয়ে কি কম অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে? শেষে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জিনিসটাকে দাঁড় করিয়েছি। ওই ঢালু পাটাতনটা যাতে ট্রাকের ওজন বইতে পারে তার জন্যে ইস্পাতের পাত দিয়ে এটাকে পুরোটা মুড়তে হয়েছে—বুঝলে ফ্র্যাঙ্ক, পরিশ্রম নেহাত কম করিনি।’

ব্লেক ও জিনি ক্যারাভ্যানের কাছে এগিয়ে আসতেই মরগ্যান জিপোর কথায় ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল, ‘নাঃ তোমার ক্ষমতা আছে—সত্যিই একটা যন্তর তৈরি করছে! তবে এই কলকবজার ব্যাপারটা আরও বার কয়েক চালাও দেখি?’

মরগ্যানকে সন্তুষ্ট করতে কিটসনকে কম করে বার দশেক হাতল টিপতে হল। অবশেষে ক্ষান্ত দিল মরগ্যান, ‘হুঁ, ভালোই হয়েছে কায়দাটা।’ বলতে বলতে ঢালু পাটাতন বেয়ে ক্যারাভ্যানের ভেতর ঢুকল সে।

জিপো চটপট মরগ্যানকে অনুসরণ করল। পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ক্যারাভ্যানের ভেতরে যেসব পরিবর্তন সে করেছে সেগুলো ফ্র্যাঙ্ককে দেখাতে লাগল, যেন পাড়া-প্রতিবেশীকে ডেকে এনে নিজের বাড়ি দেখাচ্ছে!

‘হাইড্রোজেন আর অ্যাসিটিলিনের সিলিন্ডারগুলোকে রাখবার জন্যে ওপর দিকে এই কাঠের র‍্যাক গুলোকে লাগিয়েছি। যন্ত্রপাতি রাখবার জন্যে তৈরি করেছি ওই কাবার্ডটা। আর দুধারে যে কাঠের টাকা তাক রয়েছে, সেগুলো আমরা মালপত্র রাখবার জন্যে ব্যবহার করব। মেঝেটাকে তো যথাসম্ভব মজবুত করেছি, অতএব চট করে ভেঙে পড়ার কোনও ভয় নেই।’

মরগ্যান ধীরেসুস্থে ক্যারাভ্যানের প্রতিটি অংশ যাচাই করে দেখতে লাগল। বিশেষ করে সে নজর দিল ক্যারাভ্যানের মেঝের দিকে। তারপর ক্যারাভ্যান থেকে নেমে চিৎ হয়ে শুয়ে ওটার তলায় ঢুকল মরগ্যান। টর্চ লাইট জ্বেলে জিপোর কথার সত্যতা পরীক্ষা করতে লাগল। ক্যারাভ্যানের মেঝের তলায় আড়াআড়িভাবে বল্টু দিয়ে আটকানো ইস্পাতের চওড়া পাতগুলো তার চোখে এড়াল না।

জিপো উৎকণ্ঠিতভাবে মরগ্যানকে লক্ষ করতে লাগল।

অবশেষে একসময় মরগ্যান বেরিয়ে এল ক্যারাভ্যানের নীচ থেকে। হাত দুটোকে ঝেড়ে পকেটে রাখল সে। উত্তেজনায় ভরা চক্‌চকে চোখজোড়া জিপোর দিকে রেখে সন্তুষ্ট স্বরে বলল মরগ্যান, ‘সাবাস জিপো! আমার কথার এতটুকু নড়চড় হয়নি দেখছি! কিন্তু ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানে ঢোকানোর পর বুইকটা কি ঠিকমতো টানতে পারবে?’

‘কেন পারবে না? আমি বলছি না যে ওর ওজন খুব কম হবে, তবে যদি আমাদের পাহাড়ি রাস্তায় না উঠতে হয়, তাহলে ওই ট্রাকসমেত ক্যারাভ্যানটা তোমার বুইক অতি সহজেই টেনে নিয়ে যাবে।’

‘হুঁ—পাহাড়ের দিকে না এগোলে আর চিন্তার কোনও কারণ নেই। তবে...’ মরগ্যান মাঝপথে থমকাল, চোয়ালে হাত বোলাল কিছুক্ষণ, ‘সমস্ত কিছুই তোমার ওপর নির্ভর করছে, জিপো—কত তাড়াতাড়ি তুমি ট্রাকের তালা খুলতে পার তার ওপর। যদি তোমার সময় খুব বেশি লাগে, তাহলে হয়তো বাধ্য হয়ে

আমাদের ছুটতে হবে পাহাড়ি এলাকায়—নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু তা আমি চাই না। কারণ পাহাড়ি এলাকার রাস্তাগুলো একেই বিপজ্জনক, তার ওপর অসম্ভব খাড়া। আমার মনে হয় বুইকটা অত ওজন পেছনে নিয়ে ওই খাড়া পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে পারবে না।'

মুহূর্তে জিপোর মুখে নেমে এল অস্বস্তির ছায়া।

'কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, তুমি বলেছিলে ট্রাকের তালা খোলার জন্যে আমি অফুরন্ত সময় পাব?' ঘেমে-ওঠা হাতদুটো প্যান্টে ঘষে নিয়ে বলল সে, 'নাকি ট্রাকের তালা ফুসমন্তরে পাঁচ মিনিট খুলে যাবে বলে মনে করছ?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?' মরগ্যান জিপোকে আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করল। জিনি, কিটসন, ব্লেক চমকে ফিরে তাকাল জিপোর দিকে। 'তোমাকে আমি বলছি না যে ট্রাকটা পাঁচ মিনিটেই তোমাকে খুলতে হবে। হয়তো দু-তিন সপ্তাহ সময় পাবে তুমি—তবে তার পরে আমাদের পাহাড়ে গিয়ে লুকোতে হতে পারে।'

জিপো নড়েচড়ে দাঁড়াল, ওর ছোট-ছোট চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত।

'কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক, তুমি বলেছিলে আমাকে এক মাস সময় দেওয়া হবে তালা খোলার জন্যে ; আর এখন তুমি দু-তিন হপ্তার গীত গাইছ? ওয়েলিং কোম্পানির ট্রাকটা আমি দেখেছি, ওর তালা খোলা নেহাত ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। তাড়াহুড়ো করে ওই তালা খোলা অসম্ভব।'

ট্রাক উধাও হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক-শো লোক যে তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে, তা ভেবে মরগ্যান অবাক হল। তার ওপর রয়েছে মিলিটারি হেলিকপ্টার—প্রতিটি রাস্তা ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে। দ্রুতগামী পুলিশের দল মোটর বাইকে চড়ে প্রত্যেকটা গাড়ি পরীক্ষা করে দেখবে। যদি সত্যিই তাদের দু-লক্ষ ডলার করে পেতে হয়, তবে জিপোকে একটু তাড়াহুড়ো করতেই হবে—তাছাড়া উপায় নেই।

মরগ্যান জানে আগে থাকতে এসব কথা জিপোকে জানালে সে ভয় পেয়ে যাবে—হয়তো একেবারে বেঁকে বসবে। তার চেয়ে বরং ট্রাকটা আগে ক্যারাভ্যানে চড়ুক, তখন জিপোকে তাড়াহুড়ো করার জন্যে চাপ দেওয়া যাবে। তখন আর ও রাজি না হয়ে পারবে না।

'আমারও তাই মনে হয়—তাড়াহুড়ো করে ওই তালা খোলা যাবে না।' মরগ্যান জিপোর কথায় সমর্থন জানাল, 'দেখা যাক, যদি ভাগ্যের জোর থাকে, তবে হয়তো এক মাস সময় পেলেও পেতে পারি। কে বলতে পারে, হয়তো প্রথম চেষ্টাতেই তুমি ট্রাকের তালা খুলে ফেলবে।'

মরগ্যানের হালকা সুর জিপোর কোনও ভাবান্তর ঘটল না। গম্ভীরভাবে সে-বলল, 'ওদের ট্রাকটা খুব মজবুত, ওটা খুলতে গেলে কম সময় হবে না।'

মরগ্যান একটা সিগারেট ধরাল, 'তাহলে আসল কাজের জন্যে আমরা প্রস্তুত?'

তার মুখোমুখি দাঁড়ানো তিনজনের চোয়াল কঠিন হল—মুখে ফুটে উঠল একটা বিচলিত ভাব।

জিনি ক্যারাভ্যানের গায়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল—ওর চোখজোড়া হঠাৎই সতর্ক হয়ে উঠল।

'আজ মঙ্গলবার। সুতরাং ফাইনাল রেডি হওয়ার জন্যে আমরা পুরো তিনটি দিন হাতে পাচ্ছি ;...মানে আসল কাজের জন্যে শুক্রবারটাকেই আমি বেছে নিয়েছি। কারও কোনও আপত্তি আছে?'

শ্বাসনালীটি কুঁকড়ে গিয়ে কিটসনের যেন দমবন্ধ হয়ে এল। গত এগারো দিন ধরে ক্যারাভ্যানের কাজে সে এতই ব্যস্ত ছিল যে আসল কাজের কথা তার মনেও ছিল না। দিব্যি মনের আনন্দে প্রাণ ঢেলে পরিশ্রম করছে—একমুহূর্তের জন্যেও তার মনে হয়নি, এ সবই আসল কাজের প্রস্তুতি।

মরগ্যানের কথার সঙ্গে-সঙ্গে কিটসন যেন আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল পার্থিব জগতে। আতঙ্কে তার হাত-পা পলকের জন্যে স্থবির হয়ে পড়ল।

ব্লেক অনুভব করলে তার শিরদাঁড়ায় কোনও সরীসৃপের শীতল পিচ্ছিল উপস্থিতি। কিন্তু এই অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। কারণ সে জানে, কপালের জোর থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই সে

মস্ত বড়লোক হয়ে উঠবে। দু-লক্ষ ডলার থাকবে তার হাতের-মুঠোয়। উত্তেজনায় ব্লেকের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হল।

জিপোর অস্বস্তির সম্পূর্ণ অন্য কারণ। ট্রাক খোলার সময়-সম্পর্কিত ওই ভাসা ভাসা ধারণাটাই তার মনের জোরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ট্রাক লুট করার ব্যাপারে সে জড়িত থাকছে না—অতএব সেদিক থেকে সে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নয়। কিন্তু মরগ্যান তার হাতযশ সম্পর্কে এক বিরাট ভ্রান্ত ধারণা করে বসে থাকবে, তা সে চায় না। বলা যায় না, হয়তো ওই ট্রাকের তালা জিপোর পক্ষে খোলাই সম্ভব হবে না! সুতরাং আগে থাকতে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ফ্র্যাঙ্ক তখন বিপদে পড়বে।

'ঠিক আছে, শুক্রবারই ঝঞ্ঝাট মিটে যাক।' জোরালো স্বরে জবাব দিল ব্লেক! সে চাইল, তার একাগ্রতা দেখে মরগ্যান খুশি হোক।

'আমি রাজি।' জিনি বলল।

মরগ্যান তাকাল কিটসন ও জিপোর দিকে।

ওরা দুজনেই কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। কিন্তু কিটসন যেই বুঝল জিনি একদৃষ্টে তাকে লক্ষ করছে, অমনি ভাঙা গলায় জবাব দিল, 'শুক্রবারই হোক, ক্ষতি কী?'

জিপো তার বিশাল কাঁধ নাচিয়ে বলে উঠল, 'আমার কোনও আপত্তি নেই।'

পাঁচ

মরগ্যান এগিয়ে গিয়ে বসল যন্ত্রপাতি রাখার টেবিলে।

'তাহলে এই যদি আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়, তবে অসম্পূর্ণ কাজগুলো এবারে সেরে ফেলা যাক।' চারজনের মুখের ওপর একে একে চোখ বুলিয়ে নিল মরগ্যান।

ওরা চারজন কারখানার এখানে সেখানে পড়ে থাকা কয়েকটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে একমনে শুনতে লাগল মরগ্যানের কথা। উৎকণ্ঠাময় নিথর আবহাওয়া আরও জমাট বাঁধল!

'জিনির ব্যবহারের জন্যে আমাদের আরও একটা গাড়ি দরকার।' বলে চলল মরগ্যান, 'খোলামেলা, টু-সিটার স্পোর্টস-কার হলেই ভালো হয়।' এই গাড়িটা জোগাড় করার দায়িত্ব আমি কিটসন ও ব্লেকের ওপরেই ছেড়ে দিলাম।' ওদের দিকে ফিরল মরগ্যান, 'গাড়িটা তোমারা কায়দা করামাত্রই সোজা নিয়ে আসবে এই কারখানায়। জিপো গাড়িটার রঙ নম্বর, সব পালটে দেবে—কেউ ধরতেই পারবে না। এই গাড়িটাকে আমরা বিপজ্জনক বাঁকের মুখে উলটে দেব। ওই বাঁকটার কাছাকাছি রাস্তার ধারে একটা বড়সড় গাড্ডা আছে। ফুট দশেক লম্বা দুটো শাবল দিয়ে আমরা গাড়িটাকে ওই গর্তে উলটে দেব। তোমার ওপরে শাবল দুটো জোগাড় করার ভার রইল জিপো।'

'ঠিক আছে।... আর ফ্র্যাঙ্ক, ওই রোড-সাইন দুটো আমি তৈরি করে ফেলেছি।'

'দেখি, কোথায়?'

জিপো উঠে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই রোড-সাইন দুটো নিয়ে এল। মরগ্যান দেখে খুশিই হল—সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়ল, 'ভালোই হয়েছে। এবার তাহলে পুরো প্ল্যানটা আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। তোমরা কেউ একজন কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখতে শুরু করো। কারণ কাকে ঠিক কী কী করতে হবে, সে সম্বন্ধে পরে যেন কোনওরকম সংশয় সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। জিনি, তুমিই লিখতে শুরু করো, কেমন?'

'আমাকে একটা কাগজে আর পেনসিল দাও আমি লিখে নিচ্ছি।'

জিপো ওর ঘরের দিকে পা চালাল কাগজ আর পেন্সিল আনতে।

জিপো কারখানার বাইরে যেতেই ব্লেক বলে উঠল, 'জিপো মনে হয় ভয় পেয়েছে, ফ্র্যাঙ্ক। আমার তো ওকে নিয়ে রীতিমতো চিন্তা হচ্ছে।'

মরগ্যানের মুখে নেমে এল কঠিনতার ছায়া।

'জিপোকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই। ট্রাক দখলে আনার আগে পর্যন্ত ওর সঙ্গে আমরা নরম ব্যবহার করব, কিন্তু তারপরও যদি দেখি ও বেগড়বাঁই করছে, তাহলে ওকে চাপ দিয়ে কাজ আদায় করতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই। সুতরাং জিপোকে নিয়ে ভয় পাওয়ার মানে হয় না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ—এইভাবেই ওকে দিয়ে কাজ করাতে হবে।'

মরগ্যান চোখ ফেরাল কিটসনের দিকে।

'এবার বলো, আলেক্স... কীরকম লাগছে তোমার? কীভাবে টাকাটা খরচ করবে সে নিয়ে কিছু ভেবেছ?'

'এখনও টাকাটা আমার হাতে আসেনি।' ধীর স্বরে জবাব দিল কিটসন 'ওটা হাতে পাওয়ার পর মতলব ভাঁজার ঢের সময় পাওয়া যাবে।'

মরগ্যান কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে দেখল কিটসনকে, তারপর ফিরল জিনির দিকে, 'কেমন লাগছে, জিনি?'

জিনির গভীর সবুজ চোখে ভাবলেশহীনতার পরশ, কেন, 'খারাপ কী?'

এমন সময় একটা প্যাড ও পেনসিল নিয়ে জিপো ফিরে এল। ও দুটো সে তুলে দিল জিনির হাতে।

'প্ল্যানটার আগাপাস্তালা আমি আবার বলছি।' মরগ্যান শুরু করল, 'কেউ যদি কোনও জায়গায় বুঝতে না পার, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে, কোনওরকম দ্বিধা করবে না। কারণ প্রত্যেকেরই নিখুঁতভাবে জানা দরকার কাকে কী করতে হবে। সুতরাং প্রশ্ন করতে ইতস্তত করবে না।' মরগ্যান থামল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'শুক্রবার সকাল আটটায় আমরা এখানে এসে জমায়েত হচ্ছি। কিটসন ও জিনির থাকবে সেইরকম পোশাক, যে পোশাকে নতুন বর-বউ ছুটি কাটাতে যায়। বুইকটা চালাবে কিটসন; আর স্পোর্টস কারটা চালাবে জিনি। আমরা থাকব বুইকের লাগোয়া এই ক্যারাভ্যানটার ভেতরে—সম্পূর্ণ অদৃশ্য। জিনি গাড়ি নিয়ে সোজা যাবে ওয়েলিং এজেন্সির কাছে। সেখানে ও ট্রাকটার জন্যে অপেক্ষা করবে। এদিকে কিটসন বুইক নিয়ে আর ক্যারাভ্যান নিয়ে সোজা পড়বে সেই কাঁচা সড়কের মুখে। সেইখানে একটা রোডসাইন সমেত জিপোকে আমরা নামিয়ে দেব।' মরগ্যান হঠাৎ জিনির দিকে আঙুল দেখাল, 'এইখানে লিখে রাখো, রোড-সাইন দুটো জায়গামতো লাগানোর জন্যে আমাদের দুটো ভারী হাতুড়ি দরকার।' মরগ্যান তারপর ফিরল জিপোর দিকে, কাঁচা সড়কের মুখে আমরা তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি। সেখানে লুকোবার জন্যে প্রচুর ঝোপঝাড় রয়েছে—সুতরাং তোমার কোনওরকম অসুবিধে হবে না। তোমার কাজ হচ্ছে ট্রাকটার জন্যে অপেক্ষা করা। যেই ওটা কাঁচা সড়কে ঢুকে পড়বে, অমনি তুমি রোড-সাইনটা রাস্তার মুখে লাগিয়ে দেবে—যাতে অন্য গাড়ি আর সেই রাস্তায় না ঢোকে। বুঝতেই পারছ, এইভাবে ট্রাকটাকে আমরা একলা পাচ্ছি।... আচ্ছা—এবার কাজ হয়ে গেলে তুমি কাঁচা সড়ক ধরে হাঁটতে শুরু করবে; যাতে আসল কাজের সময় তোমাকে আমরা তুলে নিতে পারি—বুঝেছ?'

উত্তেজিতভাবে মাথা ঝাঁকাল জিপো, 'হ্যাঁ—'

'এরপর কিটসন গাড়ি থামাচ্ছে বিপজ্জনক বাঁকের কাছে। সেখানে এড আর আমি ক্যারাভ্যান থেকে নেমে পড়ব—তারপর আশপাশের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে আমরা ট্রাকের আসার অপেক্ষায় থাকব। কিটসন কিন্তু গাড়ি চালিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করবে।' কিটসনের দিকে ফিরে মরগ্যান বলে চলল, 'ক্যারাভ্যানটা কোনও জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে রেখে তুমি শুধু বুইকটাকে নিয়ে কাঁচা সড়কের অন্য মুখটায় পৌঁছবে। সেখানে দ্বিতীয় রোড-সাইনটা লাগিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবে। ক্যারভ্যানটা আবার বুইকের পেছনে জুড়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে যেদিক থেকে ট্রাকটা আসবার কথা, অর্থাৎ আমাদের দিকে মুখ করে রাখবে। তারপর সিগন্যালের জন্যে চুপচাপ অপেক্ষা করবে।রাস্তা বেশ চওড়া আছে, ক্যারাভ্যানসুদ্ধু গাড়ি ঘোরাতে তোমার কনেও অসুবিধেই হবে না। তারপর সিগন্যাল পেলেই তুমি গাড়ি ছুটিয়ে আবার আমাদের কাছে এসে হাজির হবে। গাড়িটাকে আগের মতো গোল করে ঘুরিয়ে যেদিক থেকে ট্রাকটা আসবার কথা, অর্থাৎ

আমাদের দিকে মুখ করে রাখবে। তারপর সিগন্যালের জন্য চুপচাপ অপেক্ষা করবে। রাস্তা বেশ চড়া আছে, ক্যারাভ্যানসুদ্ধু গাড়ি ঘোড়াতে তোমার কোনও আসুবিধেই হবে না। তারপর সিগনাল পেলেই তুমি গাড়ি ছুটিয়ে আবার আমাদের কাছে এসে হাজির হবে। গাড়িটাকে আগের মতো গোল করে ঘুরিয়ে ক্যারাভানের পেছনটা সামনের দিকে মুখ করে রাখবে। রাস্তার মাটি যথেষ্ট শক্ত, সুতরাং গাড়ি ঘোরানোর সময় ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবে একটা কথা—সিগন্যাল শোনার পর তুমি আর ক্যারাভ্যানের পেছনটা সামনের দিকে মুখ করে রাখবে। রাস্তার মাটি যথেষ্ট শক্ত, সুতরাং গাড়ি ঘোরানোর সময় ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবে একটা কথা—সিগন্যাল শোনার পর তুমি আর এক মুহূর্তও দেরি করবে না—বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি ছোটাবে। এ ব্যাপারে যেন কোনওরকম ভুলচুক না হয়।'

'কিন্তু সিগন্যালটা কী, সেটা তো বললে না? কী করে বুঝব কখন গাড়ি ছোটাতে হবে?' কিটসন প্রশ্ন করল।

মরগ্যান সিগারেটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে একদৃষ্টে তার জ্বলন্ত প্রান্তটা লক্ষ করতে লাগল। চিন্তায় তার ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত হল, 'হুঁ—আমার মনে হয় রাইফেল বা রিভলভারের শব্দ অতি সহজেই তুমি শুনতে পাবে। যদি সে ধরনের গুলি-গোলার ব্যাপার না ঘটে, তবে আমি বাঁশি বাজিয়ে তোমাকে সিগন্যাল পাঠাব। বাঁশির একটানা সিগন্যাল শোনামাত্রই তুমি তোমার কাজ শুরু করবে, কেমন?'

কিটসনের মুখ আচমকা গম্ভীর হল, 'তোমার কী ধারণা যে রিভলভার বা রাইফেল ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে?'

মরগ্যান কাঁধ ঝাঁকাল, 'কী জানি! আগে থাকতে কিছুই বলা সম্ভব নয়; তবে আমার ধারণা, সেরকম ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে।'

ব্লেকের দিকে একপলক দেখে আবার কিটসনকে লক্ষ করে বলল সে, 'সে যাই হোক, মোট কথা—বাঁশির শব্দ শুনলেই তুমি চলে আসবে।' জিপোর দিকে ফিরে তাকল মরগ্যান, 'তোমার কাজটা খুবই সহজ মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবে, তোমার শেষের কাজটুকু হয়ে দাঁড়াবে সবচেয়ে কঠিন—কথাটা মনে রেখো।'

জিপো অস্বস্তিভরে ঘাড় নাড়ল। তবে কোনওরকম মারপিটের মধ্যে তাকে জড়াতে হবে না দেখে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাছাড়া এটা তো নিতান্তই স্বাভাবিক, সে যখন মরগ্যানের প্রধান কারিগর, তখন যন্ত্রপাতির কাজ ছেড়ে সে কেন যাবে সাধারণ হাতাহাতির মধ্যে! তার কাজ হচ্ছে ট্রাকের তালা খোলা, ব্যাস!

কিটসনকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল মরগ্যান, 'তোমাকে কী করতে হবে এখন বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ!'

নিজেকে খুনের দায়ে-জড়ানোর ভয় থেকে বাঁচাতে পেরে কিটসন আশ্বস্ত হল।

'এবার তাহলে জিনির কথায় আসা যাক।' মরগ্যান ঘুরে তাকাল জিনির দিকে। ও অভিব্যক্তিহীন মুখে একমনে তার কথা শুনছিল, ভুরু উঁচিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ও তাকাল মরগ্যানের দিকে। ট্রাকটা বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তুমি গাড়ি নিয়ে এজেন্সির দরজার কাছে অপেক্ষা করবে। 'ট্রাকটা রাস্তায় নেমে চলতে শুরু করলেই তুমি ওটাকে সাবধানে ফলো করবে। ড্রাইভার যেন কোনওমতেই তোমাকে দেখতে না পায়, সেদিকে লক্ষ রাখবে। ট্রাকটা যখন মাঝারি রাস্তায় পড়বে, তখন তুমি হাজির হবে ওটার ঠিক পেছনে। ঘন-ঘন হর্ন বাজাতে শুরু করবে। তোমাকে যাবার রাস্তা দেবার জন্যে ট্রাকটা তখন একপাশে সরে যাবে। এরপর তোমাকে ড্রাইভারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবেঃ অর্থাৎ ট্রাক ড্রাইভার যেন তোমাকে মনে রাখে। অতএব যখন ট্রাকের পাশ কাটাবে, তখন খুব জোরে হর্ন বাজাবে, চাই কী ড্রাইভারের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু-চার বার হাতও নাড়বে; তারপর তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দেবে। আমি চাই, ওই ড্রাইভার যেন মনে করে তোমার

ভীষণ তাড়া রয়েছে। তুমি যদি ঠিকমতো ট্রাকের পাশ কাটাতে পার, তবে সামনে তখনও মাইলখানেক সোজা রাস্তা পাবে। যে গাড়িটা তোমাকে এনে দেব, সেটা ঘণ্টায় কম করে একশো মাইল দৌড়বে—সুতরাং তুমি যত জোরে পার গাড়ি ছুটিয়ে যাবে। যাতে টমাস এবং ডার্কসন পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করে, ''মেয়েটা একটা দুর্ঘটনা না করে বসে!'' আশা করি আমার মতলবটা তুমি ধরতে পেরেছ?'

জিনি সম্মতি জানাল।

'কাঁচা সড়কের কাছে বাঁক ঘুরতেই ওরা আর তোমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু তাই বলে তুমি গাড়ির গতি কমাবে না। দুর্ঘটনার কোনও ভয় নেই। কারণ মুখোমুখি আসা কোনও গাড়ির দেখা তুমি পাবে না। অর্থাৎ কিটসন ততক্ষণে কাঁচা সড়কের অন্য প্রান্তে 'প্রবেশ নিষেধ' রোড-সাইন লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবুও তুমি সাবধান থাকবে, যাতে কোনও বিপদ না হয়। আমরা শাবল নিয়ে তোমার জন্যে বিপজ্জনক বাঁকের মুখেই অপেক্ষা করব। এড আর আমি গাড়িটাকে উলটে ফেলে দেব রাস্তার ধারের গর্তে। ট্রাকটা এসে পৌঁছবার আগে দৃশ্যসজ্জার জন্যে আমরা মোটামুটি মিনিট পনেরো সময় পাব। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে, কত জোরে তুমি গাড়ি চালাতে পারবে তার ওপর। দুর্ঘটনার দৃশ্যটাকে বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তব করে তোলার জন্যে তোমার গাড়িতে আমরা আগুন ধরিয়ে দেব। পেট্রল-ট্যাঙ্কে ডোবানোর জন্যে একটা লম্বা, ছেঁড়া কাপড় আমাদের দরকার পড়বে—আগুন ধরানোর জন্যে ওটাকেই পলতে হিসেবে ব্যবহার করা হবে। কাগজে কাপড়ের টুকরোটার কথা লিখে নাও—পরে ভুলে না যাই।' মরগ্যান চোখ ফেরাল কিটসনের দিকে, 'তুমি যাবে ডুকাসের একটা মাংসের দোকানে। সেখান থেকে বোতল দুয়েক শুয়োরের রক্ত নিয়ে আসবে। রক্ত কেনার কারণ হিসেবে বলে দিও তোমার বাগানের কাজে লাগবে। জিনি, তুমি সঙ্গে করে একপ্রস্থ পোশাক নিয়ে যেও। কারণ তোমার পরনের পোশাক রক্তে একেবারে ভর্তি করে দেওয়া হবে। আমরা চাই ট্রাক থামিয়ে টমাল ও ডার্কসন মনে করুক তুমি অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছ। তোমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে ওরা ট্রাক ছেড়ে নামতে আর দেরি করবে না।' একটু হেসে প্রশ্ন করল মরগ্যান, 'কোনও প্রশ্ন আছে।'

জিনি মাথা নাড়ল, 'না। এখনও পর্যন্ত সবই ঠিক আছে।'

'আচ্ছা, তাহলে রক্ত-সমুদ্রের মাঝে অচেতন হয়ে তুমি পড়ে রয়েছ—গাড়িটা রাস্তার ধারে দাউ দাউ করে জ্বলছে। এড আর আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে—এডের হাতে অটোমেটিক রাইফেল। ট্রাকটা এসে এই দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখে থামল।' মরগ্যান সিগারেটটা টেবিলে ঘষে নিভিয়ে ফেলল, 'এইখানে আমাদের কিছুটা আন্দাজের ওপর চলতে হবে। আর এর পরের কাজগুলো অবস্থা বুঝে করতে হবে। কারণ জিনিকে পড়ে থাকতে দেখে টমাস ও ডার্কসন ঠিক কী করবে বলা মুশকিল। তবে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে জিনির ওপর দিয়ে ওরা ট্রাক চালিয়ে যাবে না; সুতরাং ওরা থামবে। তারপর হয়তো দুজনেই নেমে পড়বে ট্রাক থেকে—অবস্থাটা ভালো করে বুঝতে চাইবে। অবশ্য আমার তা মনে হয় না। আমার ধারণা প্রহরীটা এগিয়ে যাবে জিনির দিকে, আর ড্রাইভার ট্রাকেই বসে থাকবে।তাহলে ডার্কসন যেই জিনির ফুট খানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে, অমনি ট্রাকের পেছন দিক থেকে আমি এগিয়ে আসব। এড তখন তার লুকোবার জায়গা থেকে ডার্কসনকে লক্ষ করে রাইফেল তাক করে রাখবে। ডার্কসন যেই জিনির ওপর ঝুঁকে পড়বে, আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হব ট্রাকের জানলার কাছে—ড্রাইভারের মুখে রিভলভার ঠেসে ধরব। এবং একই সঙ্গে ডার্কসনের পেটে বন্দুক চেপে ধরবে জিনি।'

ওরা চারজন একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মরগ্যানের দিকে।

'এরপর ঠিক কী ঘটবে, সে সম্বন্ধে আমার ধারণাও তোমাদেরই মতো।' মরগ্যান বলে চলল, 'হয় টমাস ও ডার্কসন আত্মসমর্পণ করবে, নয় তো গোলমাল বাধাতে চাইবে। সুতরাং আমাদের সব রকম পরিস্থিতির জন্যেই তৈরি থাকতে হবে। ডার্কসনের কোনওরকম বেচাল দেখলেই এড ওকে গুলি করবে। টমাসের

ক্ষেত্রে আমাকেও ওই একই পথ নিতে হবে। মানে, পুরো ব্যাপারটাই একটা চান্সের ওপর নির্ভর করছে। আমরা আগে থাকতে কোনওরকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। তবে যাই ঘটুক না কেন, টমাসকে আমি বোতাম টেপবার সময় দিচ্ছি না। তোমরা প্রত্যেকে যদি মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে পার তবে বিপদের কোনও কারণ নেই।' মরগ্যান তাকাল ব্লেকের দিকে, 'যদি একান্তই তোমাকে রাইফেল ব্যবহার করতে হয়, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। কারণ ডার্কসন খুব বেশি হলে তোমার থেকে মাত্র বিশ ফুট দূরে থাকবে; আর তোমার হাতে থাকবে অটোমেটিক রাইফেল—তা দিয়ে একশো গজ দূরের একটা মানুষকেও মেরে ফেলা যায়। তবু মনে রাখবে, রাইফেল যেন একবারের বেশি ব্যবহার করতে না হয়: স্থির এবং নিশ্চিত লক্ষ্যে গুলি করবে।'

'সে বিষয়ে আমার কোনও ভুল হবে না।' মরগ্যানের দৃষ্টির মুখোমুখি তাকাতে পারল না ব্লেক।

'আচ্ছা, তাহলে টমাস, ডার্কসনকে কুপোকাত করে আমি বাঁশিতে ফুঁ দেব। তুমি আমাদের থেকে শ'পাঁচেক গজ দূরে থাকবে।' কিটসনের দিকে ফিরে বলল মরগ্যান, 'বাঁশির শব্দের জন্যে একমনে কান পেতে অপেক্ষা করবে। সিগন্যাল শোনামাত্রই ঝড়ের গতিতে গাড়ি নিয়ে ছুটে আসবে।'

কিটসন ঘাড় নাড়ল। ইতিমধ্যেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তার ভাঙা নাকের জন্যে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পরিষ্কার কানে আসছে।

'এরপর আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। কিটসন গাড়ি ঘুরিয়ে ক্যারাভ্যানটাকে ট্রাকের সামনের দিকে মুখ করে রাখবে। আমি ট্রাকটা চালিয়ে ঢালু পাটাতন বেয়ে ক্যারাভ্যান ঢুকিয়ে দেব। জিনি, তুমি ওই সময়ের মধ্যে তোমার পোশাক চটপট পালটে নেবে। এড শাবল দুটো এবং রাইফেলটা নিয়ে ক্যারাভ্যানে ঢুকিয়ে রাখবে, তারপর ট্রাকে আমার পাশে এসে বসবে। আর জিনি ও কিটসন বসবে বুইকে পাশাপাশি। কিটসন আবার গাড়ি ঘুরিয়ে যেদিক থেকে ট্রাকটা এসেছে সেদিকে ছুটবে। জিপো ততক্ষণে রাস্তার ধারে আমাদের দিকে হেঁটে আসছে। অতএব খুব সহজেই আমরা ওকে ক্যারাভ্যান খুলে ট্রাকের ভেতরে তুলে নেব। তাহলে কিটসন আর জিনি রইল বুইকে, আর আমরা তিনজন রইলাম ক্যারাভ্যানের ভেতরে দাঁড়ানো ট্রাকের মধ্যে সম্পূর্ণ আড়ালে। এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বড় রাস্তার দিকে ছুটব। অবশ্য তার মানে এই নয় যে কিটসনকে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাতে হবে। ভাগ্য সহায় থাকলে আমরা মিনিট পনেরোর মধ্যে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ব। ওই সময়ের মধ্যে এজেন্সি জানতে পারবে তাদের ট্রাক মাঝ রাস্তায় গায়েব হয়ে গেছে। হয়তো প্রথমে ওরা ভাববে ট্রান্সমিটার কোনও অজানা কারণে খারাপ হয়ে গেছে; তাই হয়তো খোঁজ করবে রিসার্চ স্টেশনে। আমার ধারণা, এই ট্রাক উধাও হওয়ার ব্যাপার নিয়ে হট্টগোল বাধাতে সময় লাগবে মোটামুটি আধ ঘণ্টা। বড় রাস্তায় পড়ে কিটসন তিরিশ মাইলের বেশি জোরে গাড়ি ছোটাবে না। আর ওই সময়ে রাস্তায় গাড়ি-টাড়ির ভিড়ও থাকবে প্রচুর, সুতরাং এই ক্যারাভ্যানটার কথা কারও মনে আসবে না—বিশেষ করে যখন লোকে দেখবে নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রী ছুটি কাটাতে চলেছে। এ পর্যন্ত কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

'কিন্তু ড্রাইভার আর রক্ষীর কী হবে? ওদের কি আমরা ওই বাঁকের কাছেই রেখে আসব?' হাতে হাত ঘষে প্রশ্ন করল কিটসন।

বিব্রতভাবে মাথার চুলে হাত দিল মরগ্যান, 'ও নিয়ে শুধু শুধু তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। এড আর আমি ওদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করব।'

কিটসন ঘামতে শুরু করল। টমাস ও ডার্কসনকে নৃশংসভাবে খুন করা হবে, সে বিষয়ে তার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইল না।

'কিন্তু ওরা তো ক্যারাভ্যানটাকে দেখবে। এমন কী আমাদের চেহারার বর্ণনাও দেবে পুলিশের কাছে—বলবে ট্রাকটা আমরা ক্যারাভ্যানে লুকিযে রেখেছি।' ভাঙা গলায় বলে উঠল কিটসন। কারণ টমাস ও

ডার্কসনের ব্যবস্থার ব্যাপারটা সে খোলাখুলি মরগ্যানের মুখ থেকে শুনতে চায়।

বিরক্ত হয়ে জবাব দিল মরগ্যান, 'সেটা যাতে না হয় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে, তাই না? অতএব তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। আমি আর এড ওদিকে খেয়াল রাখব, হয়েছে?'

কিটসন তাকাল জিনির দিকে। ওর নির্বিকার মুখভাব তার মনের আতঙ্ককে আরও বাড়িয়ে তুলল। তার মনে নিঃশব্দ চিৎকারে কে যেন বলে উঠল, 'সাবধান আলেক্স, ভালো চাও তো এখনও এসব ছেড়ে চলে এসো! কিটসন বুঝল, এই ট্রাক লুটের চূড়ান্ত পরিণতি মৃত্যু। এর শেষ অধ্যায় রক্তিম অধ্যায়। একজন অন্ধও এটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। কারণ টমাস ও ডার্কসনকে জীবিত অবস্থায় ছেড়ে আসার সাহস তাদের নেই।...হঠাৎ কিটসনের চমক ভাঙল মরগ্যানের কণ্ঠস্বরে।'

মরগ্যান তখন বলছে, 'তোমাদের যদি কোনও প্রশ্ন না থাকে, তাহলে আমি আবার শুরু করছি।'

জিপো কাঁপা স্বরে বাধা দিল তাকে, 'দাঁড়াও ফ্র্যাঙ্ক। ব্যাপারটা যেন আমার কাছে কেমন কেমন ঠেকছে। আমি তোমার কাছে সোজাসুজি জানতে চাই টমাস, ডার্কসনের কী ব্যবস্থা করবে তোমরা? কী করে তোমরা নিশ্চিত হবে যে ওরা পুলিশের কাছে মুখ খুলবে না?'

মরগ্যানের চোখে নেমে এল আকস্মিক বিবর্ণ ছায়া, চোয়ালের রেখা হল কঠিন।

'তোমাকে কি জিনিসটা ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিকে হবে? দাঁতে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল সে, 'কী করে লোকের মুখ বন্ধ করতে হয় তা তুমি জানো না, ন্যাকা—? শোনো জিপো, তুমি আর আলেক্স সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় এ কাজের সপক্ষে ভোট দিয়েছ। তার আগে আমি তোমাদের বার বারই সাবধান করে দিয়েছিলাম—বলেছিলাম এ কাজে প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে। চাই কি গরম চেয়ার পর্যন্তও ব্যাপার গড়াতে পারে। অনেক ভেবেচিন্তেই তোমরা এ কাজে সম্মত হয়ে আমার পক্ষে ভোট দিয়েছিলে। অতএব কী পন্থায় টমাস বা ডার্কসনের মুখ বন্ধ করর, সে নিয়ে এখন আর ন্যাকামি কোরো না! তুমিও যেমন জানো, তেমনি আমিও জানি কিভাবে মানুষের মুখ বন্ধ রাখতে হয়। কিন্তু তোমাকে আমি সে কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি না? বরং আমি আর এড যেচে সে ঝুঁকি নিচ্ছি। সুতরাং তুমি যদি এখন দলছুট হবার মতলবে থাক, তো ভীষণ ভুল করবে! আমরা সবাই একসঙ্গে জলে নেমেছি, ডুবলে সবাই একসঙ্গে ডুবব। তোমার আর কিটসনের হঠাৎ ধর্মোভাব জেগেছে বলে কাজ ভেস্তে দেবে, অত বোকা আমি নই। বুঝেছো?'

জিপো বার কয়েক ঢোক গিলল। মরগ্যানের কালো চোখে ভেসে ওঠা নৃশংতার পরশ তার শিরদাঁড়া যেন বরফে ডুবিয়ে দিয়েছে। সেই মুহূর্তে হঠাৎই তার মনে হল, দ্বিতীয়বার কোনওরকম প্রতিবাদ করলে মরগ্যান তাকে কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

'ঠিক আছে, তুমি যা বলবে তাই হবে, ফ্র্যাঙ্ক।' মৃদুস্বরে উত্তর দিল জিপো।

'আলবাত তাই হবে!' মরগ্যান এক ঝটকায় ঘুরে তাকাল কিটসনের দিকে—স্থির চোখে চেয়ে রইল, 'তুমি কী বলো?'

কিটসন মরগ্যানকে ততটা ভয় না করলেও জিনিকে আরও বেশি ভয় করে। কারণ সে জানে, এই চরম মুহূর্তে পরাজয় স্বীকার করলে সে জিনির কাছে হয়ে দাঁড়াবে উপহাস্যাস্পদ! তাছাড়া একটা মেয়ের কাছে সাহসের পরীক্ষায় কিছুতেই সে হার স্বীকার করতে পারবে না।

'আমি একটা প্রশ্ন করেছি তার জন্যেও কি আবার জবাবদিহি করতে হবে নাকি?' মরগ্যানের চোখে চোখ রেখে উত্তর দিল কিটসন।

'আশা করি তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়ে গেছ?' শান্ত স্বরে বলল সে, 'যদি আর সময় নষ্ট করতে না চাও, তাহলে আমি বলতে শুরু করি?'

'বলো।' কিটসনের মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে।

'বড় রাস্তায় পড়ে আমরা সোজা ছুটব ফন হ্রদের দিকে। কারণ, সেখানে একটা ক্যারাভ্যানের ঘাঁটি রয়েছে; আমরা সেখানেই রাখব আমাদের ক্যারাভ্যানটা। দুশো ক্যারাভ্যানের মধ্যে ওটাকে খুঁজে বার করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়—সন্দেহ করা তো দূরের কথা! দুপুরের মধ্যেই আমরা ফন হ্রদে পৌঁছে যাব। সেখানে হ্রদের চারদিকে অসংখ্য ছোট ছোট ঘর রয়েছে—কিটসন সেরকম একটা ঘর ভাড়া করবে।' মরগ্যানের কর্কশ স্বরে চাপা ক্রোধের আভাস এখনও উপস্থিত। সে দেখল কিটসনকে, 'ভাড়া নেওয়া ঘরটার কাছে তুমি ক্যারাভ্যানটা রাখবে। এবং তুমি আর জিনি নতুন বিয়ে করা বর-বউ-এর অভিনয় করবে। সাঁতার কাটাবে, মাছ ধরবে, ঘুরে বেড়াবে অর্থাৎ চুটিয়ে আনন্দ করবে। অন্যান্য লোকেরা যেন বুঝতে পারে তুমি হানিমুন কাটাতে এখানে এসেছ এবং তোমার নিজেদের মধ্যেই সারাক্ষণ থাকতে চাও। তুমি যখন এই ধরনের পরিবেশ তৈরি করছ, তখন আমি, জিপো আর এড ট্রাকটাকে নিয়ে পড়ব—'

'আশ্চর্য ফ্র্যাঙ্ক।' উত্তেজিত স্বরে ব্লেক চেঁচিয়ে উঠল, 'কিটসন শালা দেখছি দিব্যি আরামের কাজ নিয়েছে। খালি ফুর্তি আর ফুর্তি!'

কিটসন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। উত্তেজিত রক্তিম মুখে সে হাত মুঠো করে এগিয়ে এল—রাগে চোখজোড়ার যেন আগুন জ্বলছে।

'থামো।' রুক্ষস্বরে খেঁকিয়ে উঠল মরগ্যান। কিটসন থমকে দাঁড়াল মরগ্যানের রুষ্ট আদেশে।' 'শোনো এড, তোমাকে আবারও বলছি, আমরা এই কাজটা দল বেঁধে করছি। কিটসনের কাজ গাড়ি চালানো আর একটু অভিনয় করা—এ দুটো সে আমাদের চেয়ে ভালোই পারে। অতএব তুমি কথায় কথায় ওকে নিয়ে ঠাট্টা, রসিকতা করা ছাড়ো! নয়তো শেষে আমরাও বিপদে পড়ব। তোমাদের নিজেদের মধ্যে এই খেয়োখেয়ি দেখতে দেখতে আমার ঘেন্না ধরে গেল। এক জিনিই যা চুপচাপ থাকে। যদি আমাদের সত্যিই এ কাজটা মতলব মাফিক হাসিল করতে হয়, তাহলে এই ছেলেমানুষিগুলো পকেটে পুরে রাখো। এ কথা আমি আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করব না—সেটা বুঝে চুপচাপ থেকো!"

ব্লেক কাঁধ ঝাঁকাল, 'আচ্ছা, আচ্ছা—ঠিক আছে। ওঃ, একটা সামান্য মন্তব্য করলেও দেখছি বিপদ!'

মরগ্যান একচোখে তাকিয়ে রইল ব্লেকের দিকে—ব্লেক চোখ সরিয়ে নিল একসময়। তখন সে আবার বলতে শুরু করল, ক্যারাভ্যান ফন হ্রদে গিয়ে থামামাত্রই জিপো ওর কাজ শুরু করবে। অবশ্য ক্যারাভ্যানের ভেতর ওই অল্প জায়গায় আর ভ্যাপসা গরমে ট্রাকের তালা খোলার কাজটা নেহাত সহজ হবে না, কিন্তু আমরা নিরুপায় জিপো, ওটুকু কষ্ট তোমাকে করতেই হবে। আমি আর এড থাকব ট্রাকের ভেতরে—তোমারই সুবিধের জন্যে। যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয় তাহলে ডাকামাত্রই আমরা হাজির হব। আমাদের তিনজনকে একটু বেশিই কষ্ট সহ্য করতে হবে কারণ অন্ধকার নেমে আসার আগে আমরা ক্যারাভ্যান ছেড়ে বেরোতে পারছি না। রাত হলেই আমরা ক্যারাভ্যান ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকব, আবার সকাল হওয়ামাত্রই সকলের অলক্ষ্যে আবার ক্যারাভ্যানে ফিরে আসব। কেউ যাতে আমাদের দেখতে না পায়, সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। জিপো যদি মনে করে তালা খোলার কাজ খুব অল্প সময়ে হবে না, তাহলে আমাদের হয়তো ফন হ্রদ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে—সম্ভবত পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে। কিন্তু সেটা এড়াতে পারলেই আমি খুশি হব। কারণ পাহাড়ি রাস্তায় বুইকের পক্ষে বোধ হয় ক্যারাভ্যানটাকে টেনে তোলা সম্ভব হবে না...তার ওপর গাড়ি যদি বিগড়ে যায়, তাহলেই তো চিত্তিরি!' মরগ্যান তাকাল জিপোর দিকে, 'কোনও প্রশ্ন আছে?'

'তাহলে তুমি বলতে চাও ট্রাকের ভেতর বসেই ক্যারাভ্যানের ওপর কাজ চালাতে হবে?' জিপো প্রশ্ন করল, 'তাহলে তো অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করা মুশকিল হয়ে পড়বে। প্রথমত ক্যারাভ্যানের পরদার ভেতর দিয়ে কেউ সেই আগুন দেখে ফেলতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, ক্যারাভ্যানে আগুন লেগে যাওয়ার চান্সও যথেষ্ট!'

'হয়তো তোমাকে এই অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে নাও হতে পারে। সময় নির্ভর তালাটা যে ওই সময়ের মধ্যে খুলে যাবে না, তাই বা কে বলতে পারে? অথবা কম্বিনেশনের নম্বরটাও হয়তো অতি সহজেই তুমি বের করে ফেললে, তখন?'

জিপোর মুখমণ্ডল থেকে যেন অস্বস্তির কালো ছায়াটা মিলিয়ে গেল। মরগ্যানের কথার সমর্থনে সে ঘাড় নাড়ল।

মরগ্যান টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল। হাত-পা ছড়িয়ে শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সজীব করতে চাইল, 'তাহলে এই হল মোটামুটি আমাদের প্ল্যান। এতে কোনওরকম সম্ভাবনাকেই আমরা বাদ দিইনি, কিন্তু তবুও এটা নিখুঁত নয় : কোনওদিন কোনও প্ল্যান নিখুঁত হয় না। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত—ট্রাকটাকে লোকচক্ষুর আড়ালে আমরা অতি সহজেই দিনের পর দিন লুকিয়ে রাখতে পারব! ক্যারাভ্যানের সমুদ্রে কোনও একটা বিশেষ ক্যারাভ্যানের ভেতর ট্রাকটার থাকার কথা কেউ কোনওদিন ধরাণাতেও আনতে পারবে না। আমাদের প্ল্যানের এটাই হল সবচেয়ে মার-কাটারি অংশ!' উৎফুল্ল মুখে মরগ্যান তাকাল জিনির দিকে, 'জিনি, এর জন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী। তোমার এই মতলবটা এককথায় অপূর্ব!'

'যার যার কাজ সে সে ঠিকমতো করলেই আমাদের কাজ চোখ বুজে হাসিল হবে।' জিনির অকম্পিত কণ্ঠস্বরে নেই কোনও উচ্ছলতার আভাস।

'আমারও তাই মনে হয়।' মরগ্যান এবার ঘড়ি দেখল, বলল, 'এড তুমি আর কিটসন জিপোর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো—গাড়ি রাখবার জায়গাগুলো একবার চক্কর দিয়ে এসো। একটা স্পোর্টর্স-কার আমার আজ রাতেই চাই। গাড়িটা পেলেই জিপো এখানে নিয়ে আসবে। জিপো ওটার রং পালটে নতুন রং-করে দেবে। যাও, বেরিয়ে পড়ো।'

একটু বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল কিটসন। বলাবাহুল্য ব্লেকের সঙ্গই তার যত বিরক্তির কারণ। কিন্তু তবু সে রাজি হল। মাথা নিচু করে গম্ভীর মুখে এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

শিস দিতে দিতে ব্লেক ওকে অনুসরণ করল। জিনিকে পাশ কাটাবার সময় অর্থবহভাবে চোখ টিপল সে। জিনি শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল; কিন্তু ব্লেক একটু হেসে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ওকে লক্ষ করে আরও একবার চোখ মারল—তারপর বেরিয়ে গেল কারখানা ছেড়ে।

কয়েক মুহূর্ত পরে ওরা শুনতে পেল লিংকনে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ। একটু পরেই সে ইঞ্জিনেরে শব্দ দূর থেকে আরও দূরে মিলিয়ে গেল।

'জিনি, তোমাকে যা করতে হবে তা হল খাবারের ব্যবস্থা।' জিনিকে লক্ষ করে মরগ্যান বলে উঠল, গোটা দুয়েক বাক্স কিনে তাতে টিনে ভরা খাবার কিনে নিও।' পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে ওর হাতে দিল সে, 'যা যা দরকার মনে করে, বুঝে শুনে কিনে রেখো—আর হ্যাঁ, দু-বোতল স্কচ কিনতে ভুলো না যেন! যাও, তোমার আর কোনও কাজ নেই। শুক্রবার সকালে আবার আমাদের দেখা হবে—ঠিক আটটার সময় কেমন?'

'ঠিক আটটার সময়।' প্যাড থেকে লেখা পৃষ্ঠা-দুটো ছিঁড়ে ও তুলে দিল মরগ্যানের হাতে! সে কাগজদুটোকে এক পলক দেখে পকেটে রাখল।

'বাইরে তো এখনও বৃষ্টি হচ্ছে! বলো তো তোমাকে আমার গাড়িতে পৌঁছে দিই?' উত্তর কী হবে তা জেনেশুনেই প্রশ্নটা করল মরগ্যান।

প্লাস্টিকের বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে নিল জিনি, মাথা নাড়ল, 'না, তার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি বাসেই যেতে পারব।' হঠাৎই ও চোখ রাখল মরগ্যানের চোখে, 'তোমার ধারণা এ কাজে আমরা জিতবই, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তোমারও তো ওই একই বিশ্বাস?'

'হুঁ'—কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ও মাথা নাড়ল, 'আচ্ছা, তাহলে চলি' জিপো ও মরগ্যানের দিকে পর্যায়ক্রমে ঘাড় হেলিয়ে বিদায় নিল জিনি। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল খোলা দরজার দিকে।

জিপো কিন্তু ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছে। শুধু দু-লক্ষ ডলারের লোভ এবং মরগ্যানের নীরব শাসানি তার মুখ বন্ধ করে রেখেছে। এখন এই ট্রাক লুটের কাজটাকে সে রীতিমতো ভয় করতে শুরু করেছে। যদি তাদের কোথাও ভুল হয়ে যায়? যদি সে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে? ওঃ ভগবান! তার মা শুনলে কী ভাববে?

মরগ্যান জিপোর কাঁধে আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাত রাখল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, জিপো। আর মাত্র এক সপ্তাহ—তার পরেই তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে! দু-লক্ষ ডলারের জন্যে এর চেয়ে রিরাট ঝুঁকি নেওয়া যায়, তাই না? যাকগে, কাল সকালে আমি আবার আসব। ক্যারাভ্যানের ওপর তোমার কাজ দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। যাও, একটু গলা ভিজিয়ে নাও—এত মুষড়ে পড়ার কী আছে?... আচ্ছা, তাহলে চলি।' জিপোর পিঠে বারদুয়েক মৃদু চাপড় মেরে মরগ্যান চলে গেল। জিপো তখনও একই ভাবে বসে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় চিন্তামগ্ন।

গমন্ট সিনেমার কাছাকাছি বিশাল গাড়ি রাখার জায়গা লক্ষ করে গাড়ি চালাতে চালাতে নিজের মনের ভেতর এক সুপ্ত দ্বন্দ্বের আভাস পেল কিটসন। এই বিপজ্জনক কাজে সাফল্যলাভের কোনও আশাই সে করছে না; বরং মাঝখান থেকে ও খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়তে চলেছে। এ কাজ থেকে পিছিয়ে আসতে সে পারত, যদি না মরগ্যান আজ তার ভূমিকা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করত। জিনি ও সে করবে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়। তাদের একসঙ্গে থাকতে হবে, ঘুরতে হবে... তারা সাঁতার কাটবে, মাছ ধরবে—আনন্দে কাটিয়ে দেবে কয়েকটা দিন। আর জিনি অভিনয়ের ব্যাপারে বাস্তবঘেঁষা, তাতে মনে হয় না কিটসনকে ওই কটা দিন ও এড়িয়ে চলবে। তাছাড়া জিনি নিখুঁত অভিনয় করতে ভালোবাসে।

সুতরাং জিনির একান্ত সঙ্গলাভের এই সহজ সুযোগ তার মন থেকে বিপর্যয়ের আশংকাকে একেবারে মুছে দিল। নাঃ, জিনির কাছাকাছি আসার এই সুযোগ সে ছাড়তে পারবে না—মরে গেলেও না।

লিংকনে কিটসনের পাশাপাশি বসে ব্লেক আড়চোখে তাকে লক্ষ করছিল, হঠাৎই বলে উঠল, শোনো আলেক্স, তোমাকে আগে থাকতেই জানিয়ে রাখা ভালো—জিনিকে নিয়ে যেন বেশি স্বপ্ন দেখো না! ওর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ বোঝাপড়া হয়ে গেছে। এই কাজের ঝামেলা মিটে গেলে আমরা দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব—ঘুরে আসব প্যারিস, লন্ডন—নানান দেশ। ভাবলাম, তোমার যদি কোনও মতলব ছকা থাকে—তাই আগে থাকতেই বলে রাখলাম।'

আরেকটু হলেই একটা ট্রাকের গায়ে ধাক্কা মারছিল কিটসন। চৌমাথায় লাল আলোর সিগন্যাল দেখে সে গাড়ি থামাল। তার মনে হল, কেউ যেন একটা বিরাশি সিক্কার ঘুষি তার পাঁজরে বসিয়ে দিয়েছে। সে আগুনঝরা চোখে ফিরে তাকাল ব্লেকের দিকে। চাপা স্বরে গর্জে উঠল, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ! তোমার মতো একটা গাড়োলের সঙ্গে জিনি কখনও কোথাও যাবে না। অতএব, ফালতু তাপ্পি দিয়ে লাভ নেই!'

কিটসনের জান্তব ক্রোধে ব্লেক খুশিই হল। তার টোপ ফেলা সফল হয়েছে জেনে সে গলা ছেড়ে হেসে উঠল, 'তাই নাকি? তাহলে ওইখানেই তুমি ভুলটা করেছ! জ্ঞান দানের অভ্যেসটা তোমার সাধারণ বুদ্ধিকে পর্যন্ত ভোঁতা করে দিয়েছে। জিনির আমার সঙ্গে না যাওয়ার কোনও কারণ নেই, আছে কি? আমি তবু কিছু লেখাপড়া জানি, তোমার তো ক অক্ষর গো-মাংস! আর...তাছাড়া ও পেটেন্ট নাক নিয়ে তুমি জিনির সঙ্গে প্যারিসে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখ—হুঁঃ!'

ব্লেকের তাচ্ছিল্যের হাসি কিটসনের কানে ঢেলে দিল সীসে। উত্তেজিত হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'থামো বলছি! নইলে এক—'

‘তোমার জায়গায় আমি হলে মোটেও সে চেষ্টা করতাম না।’ ব্লেকের জিভে হঠাৎই জেগে উঠল ক্ষুরের ধার, ‘সেইদিন আচমকা ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় আমি ঠিক প্রস্তুত হতে পারিনি। কিন্তু আলেক্স, সে চেষ্টা এখন কোরো না—একটি ঘুষিতে তোমার দাঁত কটা উপড়ে ফেলে দেব।’

কিটসন বিদ্যুৎগতিতে পাশ ফিরল... কিন্তু সেই মুহূর্তেই পিছন থেকে ভেসে এল অধৈর্য হর্নের শব্দ। সামনে চেয়ে সে দেখল লাল আলো সবুজে পালটে গেছে। কিটসন যেন সম্বিত ফিরে পেল। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শোনা গেল তার চাপা গজরানির শব্দ—লিংকন আবার চলতে শুরু করল।

‘হ্যাঁ—যা বলছিলাম’ কিটসনকে রাগাতে পেরে খুশি হল ব্লেক, ‘জিনির সঙ্গে এই সেদিন গল্প করছিলাম, তা কথায় কথায় প্যারিসের কথা উঠল। তুমি তো জানো, আমি বছর দুয়েক আগে প্যারিসে গিয়েছিলাম। সুতরাং ওখানকার সমস্ত কিছু আমার নখদর্পণে। জিনি হঠাৎ বলে উঠল, ওর প্যারিসে যাবার খুব শখ; তখন...’

‘দয়া করে একটু চুপ করবে!’ কিটসন বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, ‘নইলে গাড়ি থামিয়ে তোমাকে চুপ করাতে হবে দেখছি!’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে’—পৃষ্ঠপোষকতার সুরে বলে উঠল ব্লেক, ‘তোমাকে শুধু মনে করিয়ে দিতে চাইছি, যে জিনির ওপর প্রথম দাবিটা আমার। তুমি তো আবার ওর স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করছ, সুতরাং তখন যদি এ কথাটা ভুলে যাও তাহলে গণ্ডগোলের আশঙ্কা আছে।’

ভেবেচিন্তে উপযুক্ত একটা জবাব দেওয়ার আগেই কিটসন এসে উপস্থিত হল এক বিরাট গাড়ি রাখবার জায়গার কাছে। হঠাৎই সে যেন মুষড়ে পড়ল। জিনির মতো মেয়ের পক্ষে ব্লেকের মতো বদমাইস লোকের ফাঁদে পা-দেওয়া সহজ। তার ওপর ব্লেক হয়তো প্যারিসের ব্যাপারটা বানিয়ে বলছে না। এই আকস্মিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়ে কিটসন যেন হোঁচট খেল।

ব্লেকের সঙ্গে মুখোমুখি দ্বৈরথে নিজের জয় সম্পর্কেও তেমন স্থির নিশ্চিত নয় কিটসন। প্রথমত ব্লেক তার চেয়ে ওজনে চোদ্দো পাউন্ড বেশি এবং তার স্বাস্থ্য খারাপ নয়। একবার এক ঘরোয়া মারপিটের সময় ব্লেকের লড়াই দেখেছিল কিটসন। ওর লড়াইয়ের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি কিটসনকে অবাক করেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর জন্যে যে কোনও কুটিল উপায় অবলম্বন করতে সে দ্বিধা করে না। তাছাড়া তার নৃশংস, নিষ্ঠুর লড়াইয়ের পদ্ধতি তো আছেই!

গাড়ি রাখার জায়গার কাছে থেমে ওরা দেখল,গাড়ি পাহারা দেওয়ার কোনও লোকই সেখানে নেই। লম্বা-লম্বা দুটো সারিতে গাড়িগুলো পর পর দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ব্লেক, ‘তুমি ও পাশের সারিটা দেখতে থাকো; আমি এ-পাশেরটা দেখছি। যদি পছন্দমতো মালের সন্ধান পাও, শিস দিয়ে জানাবে।’

ওরা দুজনে আলাদাভাবে এগিয়ে চলল গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে। কিটসনের চোখ গাড়ির ওপর নিবদ্ধ হলেও মনে তখন বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা।

ব্লেকের কথা আগাগোড়া মিথ্যে ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলেও কোথায় যেন একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করতে লাগল কিটসনের। সত্যিই কি জিনি তাহলে ব্লেকের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে? তবু ভালো, যে সে অন্তত দুটো কী তিনটে দিন ওর সঙ্গে একান্তে কাটাতে পারবে এবং তখন সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। জিনি যে বড় কঠিন ঠাঁই সে বিষয়ে তার মনে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে হাল ছাড়তে সে রাজি নয়। মাঝে মাঝে জিনির নির্বিকার, অচঞ্চল অভিব্যক্তি তাকে সন্দেহগ্রস্ত করে তুলেছে। জিনির মন জয় করা আদৌ কোনও পুরুষের পক্ষে কি সম্ভব?

একটা এম জি স্পোর্টর্স-কারের সামনে এসে থমকাল কিটসন! একটা ক্যাডিলাক এবং একটা জাগুয়ারের ফাঁকে গাড়িটা দাঁড় করানো।

প্রথম দেখাতেই কিটসন বুঝল এইরকম একটা গাড়িই তাদের প্রয়োজন। আড়চোখে এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে সতর্কভাবে সে এগিয়ে গেল গাড়িটার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে দেখতে লাগল ওটাকে।

কিটসনের সঙ্গে একটা ছোট টর্চ ছিল। সেটা জ্বালিয়ে সে ভালো করে পরীক্ষা করল গাড়িটা। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পাওয়া গেল গাড়ির চাবিটা। সুতরাং শিস দিয়ে সে ইশারা করে ব্লেককে ডাকল। ব্লেক অন্য সারির গাড়িগুলো জরিপ করে দেখছিল, কিটসনের ডাকে ফিরে এল তার কাছে।

'মনে হচ্ছে এই গাড়িটায় কাজ হবে।' বলল কিটসন, 'এই যে গাড়ির চাবি।'

ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গাড়িটাকে কয়েক মুহূর্ত দেখল, ঘাড় নাড়ল, 'হুঁ চলবে। তা তুমি দেখছি দিনকে দিন সেয়ানা হয়ে উঠছ, ব্যাপারটা কী?' বিদ্রুপের হাসি হেসে ঠাট্টা করল ব্লেক, 'যাও—তাহলে গাড়িটা জিপোর কারখানায় পৌঁছে দাও। কারণ প্রথমত তুমি গাড়ি চালানোর দিগ্‌গজ, তার ওপর খুব একটা ভারী কাজের দায়িত্ব তোমার ওপর পড়েনি। সুতরাং এই যৎকিঞ্চিৎ ঝুঁকির কাজটুকু তোমায় করতেই হবে, তার পরে না হয় জিনির সঙ্গে ঢলাঢলি কোরো।'

কথাটা কিটসনের সহ্যশক্তির সীমা ছাড়িয়ে গেল। কোনওরকম ভালোমন্দ না ভেবেই সে বিদুৎগতিতে ঘুষি চালাল ব্লেকের মুখ লক্ষ করে।

ব্লেক বোধ হয় এই ধরনের কিছুই প্রত্যাশা করছিল, এবং সেই কারণেই সে আগে থেকেই এর জন্যে প্রস্তুত ছিল। পলকের মধ্যে সে মাথা হেলাল বাঁ-দিকে। কিটসনের ঘুষি লক্ষ্যহীন অবস্থায় তার কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে কিটসন ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্লেকের ডানহাতি জোরালো ঘুষি আছড়ে পড়ল আলেক্সের তলপেটে। ব্লেক ইচ্ছে করেই সমস্ত ক্ষমতা খরচ করল এই ঘুষির পিছনে—কিছুটা প্রতিহিংসাবশত, কিছুটা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। সংঘর্ষের আকস্মিকতার কিটসন মুহূর্তের জন্যে পঙ্গু হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ব্যথা লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে বসে পড়ল।

বহুদিন মুষ্টিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় কিটসন কিছুটা ধীরগতি হয়ে পড়েছে, শরীরের পেশি হয়ে পড়েছে শ্লথ। তাই ধাক্কাটা সামলে উঠতে তার সময় লাগল।

ব্লেক নৃশংস হাসিতে মুখ ভরিয়ে কয়েক পা-পিছিয়ে দাঁড়াল, 'এক মাঘে শীত যায় না, চাঁদু। তাই আজ সুদে-আসলে তোমার সেদিনকার বেইজ্জতি ওয়াপস করে দিলাম। এরপর আর বেশি পাঁয়তারা করার চেষ্টা কোরো না, তাহলে নিজেই বিপদে পড়বে। যাও, চটপট গাড়িটা নিয়ে কেটে পড়ো। কারখানায় জিপো তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

কথাটা শেষ করেই লিংকনের দিকে পা-চালাল ব্লেক। কিটসন তখনও একইভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট ফুসফুসে হাওয়া টানার চেষ্টা করছে।

ব্লেকের জোরালো ঘুষির আঘাত কিটসনকে আরও কয়েক মুহূর্ত আচ্ছন্ন করে রাখল। অবশেষে সে কোনওরকমে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। শ্লথ, টলায়মান পদক্ষেপে সে এম জি স্পোর্টস-কারে গিয়ে উঠল। পরাজয়ের গ্লানি তার সারা শরীরে ছড়িয়ে দিয়েছে একটা বিজাতীয় রাগ। ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি রাখার জায়গা ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়ল কিটসন।

আজ সে বলতে গেলে গাল বাড়িয়ে ব্লেকের হাতে চড় খেয়েছে নিজেকে বিরক্তিভরে ধিক্কার দিল কিটসন, তবে পরের বার আর ব্লেককে সে সুয়োগ দিচ্ছে না। লড়াই করার শখ একেবারে চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দেবে।

এ গলি, ও গলি করে জিপোর কারখানা অভিমুখে গাড়ি ছুটিয়ে চলল কিটসন।

ব্লেক ও তার মধ্যে এক চরম যুদ্ধ যে আসন্ন, সেটা কিটসন বেশ বুঝতে পারল। দিনের পর দিন ব্লেক তাকে উপহাস করে এসেছে—কিন্তু কিটসন কোনও জবাব দেয়নি। আর এখন যদি যে মনে করে থাকে, জিনিকে কিটসনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে, তবে ব্লেক একটা মারাত্মক ভুল করবে। কারণ

আজকের মতো সেদিন কিটসন আর অপ্রস্তুত থাকবে না। অবশ্য ব্লেকের ডানহাতি ঘুষির জন্যে তাকে সতর্ক হতে হবে—এবং সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ লড়াইয়ের ব্যাপারে ব্লেক নেহাত আনকোরা খিলাড়ি নয়। তারা দুজনেই পরস্পরকে আচমকা ঘুষিতে অবাক করেছে—একবার কিটসন, আর আজ ব্লেক। কিন্তু সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না। কারণ আজ থেকে তারা পরস্পরের জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে।

কিটসন যখন এলোমেলো ভাবনাকে সঙ্গী করে জিপোর কারখানার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন দলপতি ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান তার বুইক নিয়ে ফিরে চলেছে নিজের ডেরায়।

মরগ্যানের মনে ভেসে চলেছে চিন্তার কুয়াশা আসন্ন কাজের ভাবনায় সে মগ্ন। এই কাজটাকে সে অন্য তিনজনের চেয়েও গভীরভাবে নিয়েছে—যেন এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তার জীবন-মরণের প্রশ্ন। অবশ্য কথাটা মিথ্যে নয়। তাই মরগ্যান তাদের পরিকল্পনাকে বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখছে। বড় রাস্তায় গাড়ির সমুদ্রে গা-ভাসিয়ে সে ভাবল—এই আমার জীবনের শেষ কাজ।

বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গেছে। কিন্তু রাস্তায় এখনও জলের আস্তরণ। তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে আলোর ইশারা। বুইকের হেডলাইটের আলো ভিজে রাস্তাকে যেন আয়না করে তুলেছে। সর্তক হাতে গাড়ি ছুটিয়ে চলল মরগ্যান।

ওই দশ লাখ ডলার হাতে পাওয়ামাত্রই তারা পাঁচজন যার যার ভাগের টাকা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরবে। নিজের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা মরগ্যান আগেই করে রেখেছে। এই মুহূর্তেই তার পকেটে রয়েছে মেক্সিকো যাওয়ার টিকিট। এই টিকিটের বিশেষত্ব হল, যে কোনও দিন, যে কোনও সময়, যে কোনও প্লেনে মরগ্যান মেক্সিকো যেতে পারবে। সেজন্যে টাকা কিছু বেশি লেগেছে বইকি! মেক্সিকোয় এক আধা-গ্রাম, আধা-শহরে সে একটা ভল্ট ভাড়া করে রেখেছে। তাতেই সে রাখবে তার লুটের টাকা। তারপর শুরু হবে অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষা। যখন মরগ্যান বুঝবে ট্রাক লুটের চাঞ্চল্য কমে এসেছে, তখন সে দু-লাখ ডলার দিয়ে ধীরে ধীরে বন্ড কিনতে শুরু করবে। সমস্ত টাকাটা যখন তমসুকে পরিণত হবে, তখন তাকে আর দেখে কে? এই পৃথিবীটাকে শুধু সে-যে হাতের মুঠোয় পাবে তা নয়, পৃথিবী তখন থাকবে তার পায়ের তলায়।

অবশ্য মরগ্যানের মনে এমন কোনও ভুল ধারণা নেই যে এ কাজে সে নিশ্চিতভাবে সফল হবে। কারণ সে ভালোভাবেই জানে, এতে সাফল্য ও অসাফল্যের সম্ভাবনা সমান সমান—অর্থাৎ পঞ্চাশ, পঞ্চাশ। কারণ এ ক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষ নেহাত দুর্বল নয়। বরং তাদের চেয়ে অ-নে-ক বেশি শক্তিশালী। পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনির লোকেরা পুরো শহরটা গোরু-খোঁজা করে ছাড়বে। ট্রাকটা পুনরুদ্ধারের জন্যে তারা যে কোনও পথকেই অবলম্বন করবে। প্রয়োজন হলে নৃশংস রাস্তা নিতেও ছাড়বে না। ব্লেক, জিপো বা কিটসনের ওপর তার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নেই। যতক্ষণ সে তাদের পরিচালনা করছে ততক্ষণ ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিন্তু যেই মরগ্যান তাদের মাঝ থেকে সরে পড়বে অমনি তারা দিশেহারা হয়ে নির্বোধের মতো ধরা পড়বে। শুধু এই কথা ভেবে মরগ্যানের দুঃখ হল, যে দশ লাখ ডলারের জন্যে এত বুদ্ধি খরচ করে সে কাজে নামতে চলছে, সেখানে সে পাচ্ছে মাত্র দু-লাখ ডলার। তার দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তত ছ-লাখ ডলার পুলিশ উদ্ধার করবেই—যদি রক্ষা পায় তো জিনিই পাবে।

জিনির কথায় তার চিন্তাধারা ভিন্ন পথে বাঁক নিল। মেয়েটা তার সঙ্গে এক হয়ে মাথা খাটাচ্ছে ঠিক, কিন্তু একই সঙ্গে ও মরগ্যানের ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ট্রাকটাকে ফাঁদে ফেলা থেকে শুরু করে লুট পর্যন্ত যে মতলব জিনি তার কাছে দাখিল করেছে, তা এককথায় অপূর্ব। কিন্তু জিনির মাথা থেকেই যে সে মতলব বেরিয়েছে, সেটা মরগ্যান কিছুতেই মানতে রাজি নয়। তাহলে কেউ কি আছে জিনির পিছনে? নাকি কাউকে বৈঠকি চাল দিচ্ছে মেয়েটা?

কিন্তু অবান্তর ভেবে সে চিন্তাকে মরগ্যান মন থেকে সরিয়ে রাখল। কারণ সাজানো গোছানো, পরিপাটি করা মতলবটা জিনিই তার হাতে তুলে দিয়েছে। এবং তাতে মরগ্যান যে লাভবান হয়নি তা নয়। তাছাড়া

এই কাজের সবচেয়ে কঠিন অংশের দায়িত্ব নিয়েছে জিনি নিজে। সুতরাং ওকে সন্দেহ করে লাভ কী?

চিন্তিত মুখে কাঁধ ঝাঁকাল মরগ্যান। জিনিকে মন থেকে সরিয়ে সে আরও একবার পরিকল্পনার ছকে মন দিল...

ছয়

শুক্রবার ভোর ছটায় ঘুম ভাঙল জিপোর। গত রাতে সে ভালোমতো ঘুমোতে পারেনি। সম্ভবত অসহ্য মানসিক উৎকণ্ঠাই এই অনিদ্রার কারণ। বিছানা ছেড়ে খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। দূরে ধূসর পাহাড়ের অন্তরাল থেকে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছে ভোরের সূর্য।

আর ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই সেই কাজ শুরু হবে—যা নিয়ে এ কদিন তারা সর্বক্ষণ মাথা ঘামিয়েছে, আলোচনা করেছে—যতক্ষণ না চিন্তার ভারে মস্তিষ্ক হয়ে পড়েছে আচ্ছন্ন। আজ থেকে শুরু হবে পৃথিবীর চতুরতম এবং কঠিনতম তালার সঙ্গে জিপোর বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জিপো কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল। যদি সে পরাজিত হয়, তাহলে? মরগ্যানের ক্রোধোন্মত্ত রূপের কথা মনে পড়ায় সে শিউরে উঠল।

উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলীকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে এগিয়ে গেল একটা টিনের গামলার দিকে। গামলা থেকে ঠান্ডা জল নিয়ে, আঁজলা ভরে চোখে মুখে ছিটিয়ে নিল। তারপর দাড়ি কামাতে গিয়েই সে বুঝল তার হাত বাঁশ পাতার মতো থরথর করে কাঁপছে। গালে দু-এক জায়গায় রক্তও বেরিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল জিপো। ট্রাকের সময়-নির্ভর তালা খোলার সময় তাকে ভীষণ সতর্ক হতে হবে। কম্বিনেশন চক্রটাকে ঘোরাতে হবে এক চুল, এক চুল করে। কারণ কখন যে নম্বর মিলবে কেউ বলতে পারে না। সেই সময় যদি এভাবে তার হাত কাঁপতে থাকে, তাহলে তো বিপদের কিছু বাকি থাকবে না!

নিজের কাঁপা হাতের দিকে চেয়ে গভীর শ্বাস টানল জিপো। নাঃ, এই উৎকণ্ঠা, উত্তেজনাকে যে করে হোক রুখতেই হবে! বারবার সে তার অচঞ্চল, স্থির দক্ষ হাতের জন্যে গর্ব অনুভব করেছে। কিন্তু আজ তার শিল্পীসুলভ আঙুল, আস্থা এবং আশ্বাসময় হাত—সব কি ম্যালেরিয়ার শিকার হয়েছে? আসল কাজের এত আগে থেকেই সে যদি সাহস হারিয়ে ফেলে তবে তার পরাজয় সুনিশ্চিত!

চোখ ফিরিয়ে জিপো তাকাল দেওয়ালে ঝোলানো কাঠের ক্রুশটার দিকে। এই সুন্দর কাজ করা জিনিসটা তাকে তার মা দিয়েছিল দেশ ছাড়ার সময়ে। হঠাৎই তার প্রার্থনা করার ইচ্ছে জাগল। তার মনে হল, এই মুহূর্তে তার প্রর্থানা করা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু হাঁটু গেড়ে ক্রুশের নীচে বসে, বুকে ক্রশচিহ্ন এঁকে যখন যে প্রার্থনার জন্যে প্রস্তুত হল, তখন সবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করল, প্রার্থনার একটি শব্দও তার মনে নেই। জিপো উপলব্ধি করল, এ কাজে ঈশ্বরের সাহায্য চাইবার ক্ষমতা তার নেই। অসংলগ্ন, অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে একই কথা বলে চলল জিপো, 'ক্ষমা করো...আমাকে ক্ষমা করো...'

শহরতলি এলাকার একটি ছোট ঘরে কফি গরম করছিল কিটসন। এইমাত্র সে বিছানা ছেড়ে উঠেছে। একটা শীতল আতঙ্কের নাগপাশ যেন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

গত রাতে উসখুশ করেই তার সময় কেটেছে। চিন্তায় চিন্তায় ক্লান্ত মস্তিষ্ক একটি মুহূর্তের জন্যেও রেহাই পায়নি। এখন সে স্পষ্ট বুঝেছে, পিছিয়ে আসার সময় আর নেই। ঠিক আটটার সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী একের পর এক কাজ শুরু হবে নিয়তির লিখন স্পষ্ট অক্ষরে আঁকা হয়ে গেছে তার চিন্তাকুল ললাটে। সম্মোহিত শিকারের মতোই সে এগিয়ে চলেছে ক্ষুর্ধাত অজগরের অন্ধকার মুখ-গহ্বরে। শুধু যদি জিনি না থাকত, তাহলে কিটসন কিছুতেই এ কাজে সায় দিত না। এতক্ষণে মালপত্তর কাঁধে করে সে চলে যেত দূরে, বহুদূরে—যেখানে মরগ্যানরা তার খোঁজ পাবে না। কিন্তু...

সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে, এ কাজে তারা বিফল হবেই হবে। কিন্তু জিনির আকর্ষণ, এবং ওর প্রতি তার একাগ্র, অবুঝ ভালোবাসার নেশা কিটসনকে এ কাজে রাজি হতে বাধ্য করেছে।

কফি তৈরি করে কাপে ঢালল কিটসন। কিন্তু চুমুক দিতে গিয়েই কফির গন্ধে তার গা গুলিয়ে উঠল। কাপটাকে ঝাটিতি সে উপুড় করে ধরল বেসিনের ওপর।

অন্য এক রাস্তায় অন্য এক ঘরে জানলার কাছে বসেছিল মরগ্যান। তার ঠোঁটের কোণ থেকে অলস ভঙ্গিতে ঝুলছে একটা সিগারেট। চোখের দৃষ্টি বাইরের রক্তিম আকাশে নিবদ্ধ। গত রাতের চরম প্রস্তুতিগুলোর কথাই তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে।

যে কোনও যুদ্ধেই সেনাপতির ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান। তাই আক্রমণ পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ সে কষ্টিপাথরে ঘষে-ঘষে যাচাই করে দেখেছে, কোথাও কোনও গলদ আছে কি না। এখন নিয়তিকে মেনে নিতে মরগ্যান প্রস্তুত—তাতে যদি পরাজয় আসে, তবুও তার দুঃখ নেই। কারণ সে জানে, তার তরফ থেকে কোনওরকম ভুলের সুযোগ সে রাখেনি। তার পরিকল্পনাকে এর চেয়ে নিখুঁত করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

এখন সাফল্য অসাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করছে প্রত্যেকের নিজের নিজের দক্ষতার ওপর। জিনি যদি হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়, যদি ব্লেক ঠিকমতো গুলি চালাতে না পারে, কিটসন যদি বিপদে পড়ে তার গাড়ি ও ক্যারাভ্যান নিয়ে, অথবা যদি জিপো তালা খুলতে সক্ষম না হয়...একগাদা 'যদি'র মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার কিছু করার নেই। মরগ্যান কিন্তু একবারও ভাবল না নিজের পারদর্শিতার কথা। কারণ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সে স্থিরনিশ্চিত। মাথা নিচু করে, স্থির অনড় হাতের দিকে চেয়ে চোখ রাখল মরগ্যান। নিজের স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় সে সন্তুষ্ট হল। না, কোনওরকম ভুলকে সে নিজে অন্তত প্রশ্রয় দেবে না।

শহরের অন্য প্রান্তে, নিজের ফ্ল্যাটে ব্লেক তখনও বিছানায় শুয়ে। চিৎ হয়ে শুয়ে সে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে দেওয়াল বেয়ে এগিয়ে চলা একটুকরো রোদের দিকে। সে জানে, যখন ওই আলোর টুকরোটা ঘরের ছাদ স্পর্শ করবে তখনই হবে তার বিছানা ছাড়ার সময়।

কাল রাতে তার ভীষণ ইচ্ছে করছিল গ্লোরিকে ডেকে পাঠাতে; কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে জেনে সে ইচ্ছে ব্লেক ত্যাগ করেছে। তার দরকারি জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে। অন্যান্য মালপত্র সে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়ে তালা এঁটে দিয়েছে। গ্লোরি এসেই বুঝতে পারত, তার পেয়ারের এডি শহর ছেড়ে লম্বা দেওয়ার মতলবে আছে। এবং সে নিয়ে ও নানান রকম প্রশ্ন করত। শেষে হয়তো একটা কাণ্ডই বাঁধিয়ে বসত। তাই গত-রাতে ব্লেককে একাই ঘুমোতে হয়েছে। এবং অনভ্যাসের ফলে যথারীতি তার ঘুম আসেনি; রাতটাকেও অস্বাভাবিক দীর্ঘ মনে হয়েছে।

একফালি রোদের শম্বুকগতিকে লক্ষ করতে করতে সে ভাবল, আচ্ছা ডার্কসনকে খুন করার পর তার কেমন লাগবে? কারণ অপরাধজীবনে সেটাই হবে তার চরম পদক্ষেপ। এর আগে কোনওদিন সে কাউকে খুন করেনি। বরাবরই লুটপাটের মতলবগুলো এমন কায়দায় ফেঁদেছে, যাতে কেউ হতাহত না হয়। কিন্তু আজকের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা।

না, ডার্কসনের খুন হওয়াটাকে ব্লেক তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। কারণ যা বাস্তব, তাকে স্বীকার করতেই হবে। কাজে সাফল্যের প্রয়োজনে ডার্কসনের মৃত্যুর প্রয়োজন আছে। তাকে না মারলে গোটা পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে। কিন্তু তবুও ব্লেকের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্যঃ সে আস্তে আস্তে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাকিয়ে রইল নিহত—ডার্কসনের দিকে—তার কপালের লাল ফুটোটার দিকে। যদিও সে জানে, কাউকে খুন করতে তার হাত কাঁপবে না, তবুও ব্লেক যেন শিউরে উঠল। জেলে থাকতে অনেক রকম খুনির সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে। তারা বেশ গর্বের সঙ্গে নিজেদের পাপের কাহিনি বললেও ব্লেক লক্ষ করেছে একটা অস্বস্তি-আতঙ্কের ছায়া তাদের চোখের তারায় ক্রমাগত ঢেউ তুলেছে। ব্লেক স্পষ্ট বুঝেছে, ওরা নিজেদের আর সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাবতে পারে না। কোথায় যেন ওদের ঘিরে গড়ে উঠেছে এক অদৃশ্য কাচের দেওয়াল। তাদের চোখের যে অভিব্যক্তি, তা একেবারেই আলাদা। অন্য কোনও

লোকের চোখে ব্লেক সে দৃষ্টি দেখেনি। এই কি তাহলে খুনির চোখ? ডার্কসনকে খুন করার পর তার চোখেও কি ফুটে উঠবে এই একই দৃষ্টি? তাকেও তাহলে বন্দি হতে হবে কাচের খাঁচায়? আমৃত্যু তাকে আতঙ্কের শিকার হয়েই কাটাতে হবে?

না, এ ঘটনার পর ব্লেক আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না। দরজায় কড়া নাড়ার আকস্মিক শব্দে তাকে চমকে উঠতে হবে, কোনও পুলিশি পোশাক তার মনে তুলবে শঙ্কার তুমুল আলোড়ন, রাতের ঘুম হয়ে পড়বে দুঃস্বপ্ন কণ্টকিত। ভবিষ্যতের হাতের পুতুল হয়েই তাকে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

রোদের টুকরোটা ঘরের ছাদ স্পর্শ করতেই গায়ের চাদরটা ছুড়ে ফেলে বিছানায় উঠে বসল ব্লেক।

খাট থেকে নেমে সে এগিয়ে গেল অদূরে রাখা একটা স্কচের বোতলের দিকে—বোতলে তখনও কিছুটা তরল অবশিষ্ট আছে। বোতল উপুড় করে গলায় ঢালল ব্লেক। একটা তীব্র জ্বালার অনুভূতি নেমে এল তার কণ্ঠনালী দিয়ে।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ব্লেক। অবশেষে যখন স্কচের হালকা আমেজটা সে টের পেল, তখন এগিয়ে গেল কলঘরের দিকে। ঝাঁঝরিটা খুলে দিয়ে তার ঝরনার নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল এড ব্লেক।

শহরের আরেক প্রান্তে, ওপর তলার একটা অপরিষ্কার ছোট ঘরে কাজে ব্যস্ত জিনি গর্ডন। নিজের সমস্ত জিনিসপত্র গোছগোছ করে ও তখন স্যুটকেসের ঢাকনা বন্ধ করছে। একবার হাতঘড়ির দিকে চোখ রাখল ও সাতটা বাজতে কুড়ি।

জিপোর কারখানার রওনা হওয়ার জন্যে ওর হাতে এখনও আধঘণ্টার ওপর সময় আছে—ভাবল জিনি; তারপর এগিয়ে এসে বসল জানলার কাছে। দেখতে লাগল বাইরের নোংরা, অপরিসর রাস্তা—তার দু-ধারের জঞ্জাল। এ সবই ওর বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক, সুতরাং নোংরা হলেও কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে।

ভাগ্য যদি ওদের সহায় থাকে, তবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই এই দুঃখ কষ্টের জীবনকে সে অতীতের পরিসীমায় সীমাবদ্ধ রাখতে পারবে। পারবে নতুন করে জীবনের পথে পা বাড়াতে। তখন ওর কাছে থাকবে অজস্র টাকা, ও যেতে পারবে ওর স্বপ্ন-নগরী ন্যু-ইয়র্কে, কিনবে দামি দামি সব পোশাক, প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া নিয়ে রানির হালে থাকবে ওর এতদিনকার দেখা স্বপ্ন, বাস্তবে রূপ নেবে।

যদি ভাগ্য ওদের সহায় থাকে...

কিন্তু মরগ্যানের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে জিনির। এবং মরগ্যানের ধারণাও অনেকটা তারই মতো। মরগ্যানের একটা কথা ওর ভীষণ ভালো লেগেছেঃ হাতের মুঠোয় পৃথিবী। এই তিনটে শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জিনির স্বপ্নের আসল রূপ। ওর ইচ্ছেকে এর চেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা বোধহয় কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। আর সে ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে চাই প্রচুর টাকা।

নাঃ, ট্রাক লুট করা যদি কারও পক্ষে সম্ভব হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে লোক মরগ্যান। কিন্তু ওই তিনজন...

জিনির মুখে নেমে এল সংশয়ের ছায়া।

কাজের মূল চাবিকাঠিই নির্ভর করছে জিপোর ওপর। আর সে যেভাবেই অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তাতে মাঝে মাঝে জিনির ভয় হয়। জিপো পারবে তো ওই ট্রাকের তালাটা খুলতে? কিন্তু এখন জিপোর জন্যে মরগ্যানের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই।

ব্লেককে নিয়েও জিনির ভাবনা কম নয়। তার চোখের দৃষ্টি ওর মোটেই ভালো লাগেনি। আর যেভাবে সর্বক্ষণ ছোঁক ছোঁক করে! নাঃ, ফন হ্রদে গিয়ে জিনিকে সতর্ক থাকতে হবে—কোনওমতেই যেন ওই লোকটার সঙ্গে তাকে একা থাকতে না হয়।

কিটসনের কথা মনে পড়তেই জিনির মসৃণ কপালে ভাঁজ পড়ল। ছেলেটা তার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। জিনির যুক্তিনির্ভর, আঙ্কিক মনের শীতলতা বুঝি কমে এল কিটসনের চিন্তার উষ্ণতায়? মালো

যাওয়ার পথে তাকে খুশি করার জন্যে ছেলেটার আপ্রাণ প্রয়াসের কথা মনে পড়ে ওর মুখে ফুটে উঠল এক টুকরো মিষ্টি হাসি।

জিনির হাতে টাকা আসামাত্রই নেকড়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর। চাইবে টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে। নাঃ, এ বিষয়ে জিনি একেবারে নিশ্চিত। তাই ও ভাবছে, কাজের শেষে কিটসনের সঙ্গে যোগ দিলে কেমন হয়। ওদের দুজনের মিলিয়ে মোট টাকা হবে চার লাখ ডলার। তাছাড়া কিটসনের স্বভাব ভালোই, এবং অনায়াসেই জিনি ওর ওপর নির্ভর করতে পারে। তাহলে সবদিক দিয়েই ও নিশ্চিন্ত হতে পারবে। নইলে লোকে সন্দেহ করবে, একটা বিশ বছরের ছুঁড়ি এত টাকা পেল কোত্থেকে! সাধারণত কোনও সঙ্গীহীন মেয়েকে সব মানুষই সন্দেহের চোখে দেখে।"

নাঃ, ব্যাপারটা নিয়ে জিনিকে আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে।

মরগ্যানই এসে পৌঁছল সবার আগে।

জিপোর কারখানার সামনে সে যখন বুইক থামাল তখন গাড়ির ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে আটটা বাজতে দশ মিনিট।

গত রাতে সে, ব্লেক ও জিপো—তিনজন মিলে বুইক গাড়িটার ওপর প্রচুর খেটেছে! বার বার পরখ করে দেখেছে কতটা ধকল গাড়িটা সইতে পারে। কাজের শেষে মরগ্যান গাড়িটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তার ফ্ল্যাটে—চালিয়ে দেখেছে গাড়িটার অবস্থা।

কারখানায় ঢুকেই মরগ্যানের চোখে পড়ল, জিপো ক্যারাভ্যানের কাবার্ডে রাখা যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

প্রায় একই সঙ্গে সে লক্ষ করল, জিপোর মুখমণ্ডল বিবর্ণ, শ্বাস-প্রশ্বাস হাঁপানি রুগির মতো যন্ত্রণাক্লিষ্ট। ওর যন্ত্রপাতি ধরা হাত দুটো অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে কাঁপছে।

প্রথম প্রথম তো, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে—ভাবল মরগ্যান। তা যদি না হয়, তাহলে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর।

জিপো তো জিপো, এই মুহূর্তে মরগ্যান নিজেও কি সুস্থির থাকতে পারছে! পরিকল্পনার প্রথম পর্বে পৌঁছে সে নিজে খুব টেনশানে পড়েছে জিভ শুকনো, বিস্বাদ। সুতরাং জিপো যে একটু বিচলিত হয়ে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে!

কিন্তু এই অনিশ্চিত ভাবটা জিপোর কাটিয়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন; নইলে এই সামান্য দুর্বলতা থেকেই রূপ নেবে বিরাট ফাটল—সেটা কিছুতেই হতে দেবে না। মরগ্যান।

'এই যে, জিপো—ঠিক আছ তো?' এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল সে।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক আছি।' মরগ্যানের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে জবাব দিল জিপো, 'মনে হচ্ছে, আজ আর বৃষ্টি হবে না। হুঁঃ, প্যাচপেচে বর্ষার চেয়ে রোদ্দুর অনেক ভালো।'

এমন সময় একটা স্যুটকেস ও একটা পিকনিক বাস্কেট নিয়ে জিনি এসে ঢুকল কারখানায়। ওকে দেখে মরগ্যানের মনে হল, গত রাতে ওর ভালো ঘুম হয়নি। ওর চোখের কোলে কালি, রঙ মাখা মুখমণ্ডলের আনাচে-কানাচে বিবর্ণতার আভাস।

'কী খবর? ভয় করছে নাকি?' জিনির কাছে গিয়ে থমকাল মরগ্যান। হালকা সুরে জানতে চাইল।

ও তাকাল মরগ্যানের চোখে—সাগর-সবুজ চোখ শীতল, অভিব্যক্তিহীন।

'তোমার মতোই—তার বেশি নয়।'

হাসল মরগ্যান, 'তাহলে তো ভয় করছে বলতে হয়। কারণ আমিও যে একেবারে নিশ্চিত তা নয়।'

এবার কারখানায় উপস্থিত হল কিটসন—তার পিছনেই ব্লেক।

ব্লেককে দেখেই মরগ্যানের হঠাৎ সন্দেহ হল ও নেশা করেছে। ব্লেকের মুখে লালচে আভা, চলাফেরার মধ্যে কেমন আলস্য, অবসাদ। অস্বস্তির বিদ্যুৎ এই প্রথম ঝলসে উঠল মরগ্যানের মনে।

কিটসনকে কিছুটা নার্ভাস মনে হলেও জিপো বা ব্লেকের তুলনায় আজ সে নিজের ওপর অনেক বেশি আস্থাশীল। এই ব্যাপারটাই মরগ্যানকে অবাক করল।

আটটা বাজতে ঠিক দু-মিনিট বাকি। সুতরাং, শুধু শুধু আর সময় নষ্ট করতে চাইল না মরগ্যান। কারণ এতে অযথাই তাদের স্নায়ুর ওপর চাপ পড়বে।

'ঠিক আছে, তাহলে এবার বেরোনোর জন্যে রেডি হও।' সংক্ষিপ্তভাবে বলল সে, 'তোমরা তিনজন ক্যারাভ্যানটা বের করো বাইরে। আর জিনি, তুমি এম জিটা নিয়ে সোজা চলে যাও এজেন্সিতে।'

জিনিকে অনুসরণ করে ছোট এম জি গাড়িটার দিকে এগোল মরগ্যান। জিনি উঠে বসল চালকের আসনে। মরগ্যান ঝুঁকে দাঁড়াল ওর ওপর। জিনির অচঞ্চল, নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ওর প্রশংসাই করল সে।

'তুমি তো জানোই কী করতে হবে। দেখো, যেন কোনও ভুল না হয়। গুড লাক!'

কিটসন চটপট পা-চালিয়ে এগিয়ে এল জিনির কাছে, 'গাড়ি চালাবার সময় সাবধানে থেকো, এম জিটা দারুণ জোরে ছোটে। গুড় লাক।'

কিটসনের চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ল জিনি, 'ধন্যবাদ। তুমিও সাবধানে থেকো।' ক্লাচ টিপে, গিয়ার দিয়ে এম জিটা কারখানায় বাইরে নিয়ে চলল ও।

মিনিট পাঁচেক পরে ক্যারাভ্যানটাকে সঙ্গী করে বুইকটা আস্তে আস্তে জিপোর কারখানা ছেড়ে বেরোল।

মরগ্যান ও ব্লেক ক্যারাভ্যানের মেঝেতে বসে—আর গাড়ির চালক কিটসন। বাইরে এসে জিপো কারখানার দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর তালার ওপরে ঝুলিয়ে দিল একটা কাঠের ফলক। তাতে লেখা; গরমের ছুটিতে কারখানা বন্ধ থাকবে।

জিপোর কেন জানি না মনে হল, তার এই সাধের জীর্ণ কারখানাকে সে আর কোনওদিনই দেখতে পাবে না। এই কারখানার থেকে তার লাভ খুব একটা হয় না ঠিকই, কিন্তু পনেরো বছর এটাকে সুখ-দুঃখের সঙ্গী করার ফলে আজ কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। ক্যারাভ্যানে ওঠার সময় জিপোর দৃঢ়তার প্রতিরোধ ভেঙে তার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল। একজন ভাবপ্রবণ ইটালিয়ানের মতোই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'কী হল আবার তোমার, ন্যাকামো?' ব্লেক নিষ্ঠুর স্বরে খেঁকিয়ে উঠল। তার স্নায়ুতন্ত্র যেন পাক খেয়ে উঠল, 'হঠাৎ ছিঁচকাঁদুনির কী হল?'

'থামো এড।' দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠল মরগ্যান। সরে গিয়ে জিপোর জন্যে জায়গা করে দিল। তার বিপজ্জনক সাপ চোখের শীতল দৃষ্টি ব্লেকের মুখে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিল—সে মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। মরগ্যান জিপোর পাঁজরে হালকাভাবে খোঁচা মারল, 'জিপো, তুমি কারখানার জন্যে কাঁদছ? ভুলে যাচ্ছ কেন, এর থেকে অনেক ভালো ভালো জিনিস তোমার হাতে আসবে ঃ নিজের বাংলো, জমিজমা, গাড়ি—কত কী? ভেবে দেখো তো, সব মেয়েরা তোমার চারদিকে কেমন ভিড় করবে! তোমার পকেট থাকবে দু-লাখ ডলারে ঠাসা।'

জিপো ঘাড় নাড়ল, বিষণ্ণমুখে ফুটিয়ে তুলল কষ্টকৃত হাসির রেখা।

'তাই যেন হয়। কিন্তু সত্যি সত্যি আমরা পারব তো, ফ্র্যাঙ্ক?'

'নিশ্চয়ই। সে সব ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। প্রত্যেকটা কাজের বেলাতেই তোমরা আমার নির্দেশ মেনে চলেছ—তাতে কোনও বিপদ হয়েছে কি?'

ওরা তিনজন যখন কাঁচা সড়কের মুখে পৌঁছল, তখন প্রত্যেকেই একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে, মেজাজ হয়ে উঠেছে তিরিক্ষি।

কিটসন মোটামুটি জোরেই গাড়ি চালাচ্ছিল, এবং ক্যারাভ্যানের ভেতর ওরা তিনজনই একই সঙ্গে এপাশ ওপাশ ভীষণভাবে ঝাঁকানি খেতে লাগল। ক্যারাভ্যানের চাকায় কোনওরকম স্প্রিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় দোলানির পরিমাণও হয়ে উঠল সাংঘাতিক।

রাস্তার মুখেই একটা রোড-সাইন ও একটা হাতুড়ি দিয়ে জিপোকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। একা একা নামতে জিপোর ইচ্ছে করছিল না ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী বিপজ্জনক বাঁক-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাকে কোনওরকম দায়িত্ব নিতে হবে না ভেবে সে স্বস্তি পেল।

'শালা, একেবারে অপদার্থ!' ক্যারাভ্যানটাকে নিয়ে বুইকটা রাস্তায় ঢুকে পড়তেই চাপা স্বরে খিঁচিয়ে উঠল ব্লেক, 'যদি ওই ট্রাকের তালা হারামজাদাটা না ভাঙতে পারে, তবে আমিও ওকে ভেঙে তক্তা করব।'

মরগ্যান উঠে দাঁড়িয়ে ক্যারাভ্যানের ছাদ থেকে অটোমেটিক রাইফেলটা হ্যাঁচকা মেরে নামিয়ে নিল। ওটাকে ঠেসে দিল ব্লেকের হাতে।

'জিপোর চিন্তা ছেড়ে এবার এদিকে মন দাও।' মরগ্যানের স্বর যেন বরফে ডোবানো, 'তোমার কাজটুকু ঠিকমতো করবার চেষ্টা করো। রাইফেলের নিশানা যেন ঠিক থাকে!'

ব্লেক রাইফেলটা কাঁপা হাতে আঁকড়ে ধরল, 'আমার একটু গলা ভেজাতে ইচ্ছে করছে, ফ্র্যাঙ্ক। দেখো, জিনির বাস্কেটে বোধ হয় স্কচের বোতল আছে!'

'ওসব পরে হবে, এড। প্রথমে তোমার কাজটুকু তুমি ঠিকমতো করো, তারপর বোতলের কথা ভাবা যাবে।'

আস্তে আস্তে গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে এল...একসময় থামল ক্যারাভ্যানটা। কিটসনই খুলল পিছনের দরজাটা।

ওরা এসে দাঁড়িয়েছে বিপজ্জনক বাঁকের কাছে।

ব্লেক ও মরগ্যান রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। ব্লেকের হাতে রাইফেল, মরগ্যানের হাতে .৪৫। কয়েক সেকেন্ড ওরা থমকে রইল, নিঃশ্বাস নিল বুক ভরে। ভোরের ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তাপ অনুভব করল ওরা।

মরগ্যান কিটসনকে লক্ষ করে বলল, 'তোমার কাজ তুমি জানো, অতএব বাঁশির সিগন্যালের জন্যে রেডি থেকো, আসতে যেন একমুহূর্তও দেরি না হয়।'

কিসটন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। প্রথমে তাকাল ব্লেকের দিকে, তারপর মরগ্যানের দিকে, 'গুড লাক।'

'শালা এমনভাবে বলছে যেন ভাগ্য টাগ্যের ব্যাপারটা ওর দরকার নেই।' মরগ্যানের দিকে ফিরে বিদ্রূপ-মাখানো স্বরে বলে উঠল ব্লেক, 'তোমারও বেশ খানিকটা ভাগ্যের দরকার, আলেক্স! শুধু শুধুই আমাদের জন্যে তুমি দুঃখ করছ।'

কিটসন কাঁধ ঝাঁকাল, গিয়ার দিয়ে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলল। হঠাৎই মরগ্যানের মনে পড়ল, ক্যারাভ্যান থেকে শাবল দুটো নামাতে ওরা ভুলে গেছে।

'এই! এই আলেক্স—থামো!' হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে উঠল মরগ্যান।

কিটসন গাড়ি থামিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল, 'কী হল?'

'প্রত্যেকটা জিনিসই কি আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে, এড? গাধার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? যাও শাবল দুটো নামিয়ে নাও গাড়ি থেকে।।'

কিসটন গাড়ি থেকে নেমে ক্যারাভ্যানের দরজাটা খুলল, শাবল দুটো তুলে দিল ব্লেকের হাতে। মরগ্যানের চোখজোড়া রাগে জ্বলছে। সে হাত নেড়ে বিদায় জানাল কিটসনকে। বুইক ও ক্যারাভ্যানটা চলতে শুরু

করতেই মরগ্যান রাস্তার ধার বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ব্লেক তাকে অনুসরণ করল।

এই জায়গাটা মরগ্যান এতবার, এতভাবে ঘুরে দেখেছে যে এর প্রতিটি ঝোপঝাড়ের অবস্থান তার নখদর্পণে। ব্লেকের হাত থেকে একটা শাবল নিয়ে ওকে লুকেবার জায়গাটা দেখিয়ে দিল মরগ্যান। ব্লেকের থেকে গজ ছয়েক দূরে সে তার লুকোবার জায়গা বেছে নিল।

ওরা দুজনেই উপুড় হয়ে রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে প্রতীক্ষায় রইল।

নাঃ, লুকোবার জায়গাটা ভালোই হয়েছে—ভাবল ব্লেক। রাইফেলটা কাঁধে ঠেকিয়ে রাস্তার দিকে তাক করল সে। না, রাইফেল-নিশানার পথে কোনওরকম বাধাই পড়ছে না; তাছাড়া রাস্তা থেকেও কারও পক্ষে তাকে দেখে ফেলা সম্ভব নয়। ব্লেকের অস্বস্তি কমে এল অনেকটা... কিন্তু এক চুমুক স্কচের অভাবে তার শুকনো ফুসফুসটা আনচান করতে লাগল। ফ্ল্যাট ছাড়ার আগে যে তিন গেলাস স্কচ সে গিলছে, তার আমেজটা এখন যাই যাই করছে। বেলা খুব বেশি না হলেও সুর্যের তাপ প্রচণ্ড। শরীরের সর্বত্র ঘামের উপস্থিতি অনুভব করে শুকনো জিভটা একবার ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিল সে।

'কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?' মরগ্যান ঝোপের আড়াল থেকেই প্রশ্ন করল।

'নাঃ, দারুণ আছি।' রাইফেলের মাছিটা ঠিক করতে করতে বলে উঠল ব্লেক। তারপর রাইফেলটা নামিয়ে রাখল পাশে। রুমাল বের করে ঘর্মাক্ত হাত দুটো মুছল।

মরগ্যান টাই খুলে জামার বোতাম খুলল। তাকাল হাতঘড়ির দিকে। এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। টমাস যদি রোজকার মতোই জোরে ট্রাক চালায়, তবে সাড়ে এগারোটা নাগাদ এই বাঁকের কাছে ওদের পৌঁছে যাওয়া উচিত। তাহলে জিনি বোধ হয় মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে পড়বে—মরগ্যান ভাবল।

হাতে এখনও সময় আছে দেখে মরগ্যান একটা সিগারেট ধরাল।

ব্লেকও এই সুযোগ হাতছাড়া করল না—সেও সিগারেট ধরাল। একবার সে চোখ রাখল রাইফেলের ওপর রাখা তার বাঁ-হাতের ওপর—তার হাত কাঁপছে। শত চেষ্টাতেও ব্লেক ওটাকে স্থির রাখতে পারছে না। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে মুখভঙ্গি করল সে। বুকের ভেতর শোনা যাচ্ছে উত্তাল হৃৎপিণ্ডের উন্মত্ততা। এই দুঃসহ প্রতীক্ষা ব্লেকের স্নায়ুর ওপর যেন জেঁকে বসল।

পাঁচ মিনিট অখণ্ড নীরবতার পর আচমকা মরগ্যান মাথা তুলল, যেন কিছু শোনবার চেষ্টা করল।

'মনে হচ্ছে একটা গাড়ি আসছে।'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গেল ব্লেক। সঙ্গে সঙ্গেই চাপা স্বরে ধমকে উঠল মরগ্যান, 'বসে পড়ো, বোকা কোথাকার! এটা জিনির গাড়ি নয়—লুকিয়ে পড়ো শিগগির!'

তাড়াহুড়ো করে ব্লেক আমার বসে পড়ল—ঝোপের আড়াল থেকে দেখার চেষ্টা করল।

আধ মাইলটাক দূরে ওদের নজরে পড়ল সাদা ধুলোর মেঘ উড়িয়ে একটা গাড়ি ছুটে আসছে। আরও কাছে আসতেই ওরা দেখল গাড়িটা একটা সৈন্যবাহিনীর ট্রাক। ড্রাইভারের পাশে বসে তিনজন সৈনিক। ট্রাকটা একটুও না থেমে ওদের সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

'ও আজকের ডাক গেল।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মরগ্যান, 'আজ ওদের অন্য দিনের চেয়ে কিছুটা দেরি হয়ে গেছে।'

ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ এগিয়ে চলল। এগারোটা কুড়ির সময় মরগ্যান এই প্রথম দুশ্চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠল। তাহলে কি জিনি কোনও দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে? নাকি ভয় পেয়ে তাদের দল ছেড়েই পালাল মেয়েটা?

ব্লেক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'ওফ, আর পারছি না। এতক্ষণ ধরে করছে কী মেয়েটা?'

'বোধহয় গাড়ি-টাড়ির ভিড়ে রাস্তায় আটকে পড়েছে।' চিন্তাকুটিল মুখে জবাব দিল মরগ্যান।

'টমাস যদি জিনিকে আগে যেতে না দেয়, তাহলে?' উৎকণ্ঠায় উঠে বসলে ব্লেক, 'ওই শালারা যদি ট্রাক নিয়ে মেয়েটার আগে চলে আসে, তখন আমরা কী করব?'

'কিছুই করব না। কাল আবার নতুন করে চেষ্টা করব।'

'কিন্তু জিনিকে যদি ওরা কাল একই সময় আবার দেখতে পায়, তাহলে নির্ঘাত সন্দেহ করে বসবে। তখন পুরো প্ল্যানটা ভেস্তে যাবে।'

'থামো, যত সব আজগুবি চিন্তা' ব্লেককে ধমকে উঠল মরগ্যান, 'সে সব ভাববার জন্যে যথেষ্ট সময়...'

দূরাগত কোনও গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে মাঝপথেই থমকে গেল মরগ্যান।

'এইবার ও আসছে!'

কয়েক সেকেন্ড পরেই ওরা দেখতে পেল বিদ্যুৎগতিতে ধেয়ে-আসা এম জি গাড়িটাকে। তখনও তার দূরত্ব বাঁকের কাছ থেকে প্রায় এক মাইল।

'ও দেখি পাগলের মতো গাড়ি ছোটাচ্ছে!' অস্ফুটস্বরে বলে উঠল ব্লেক। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াল ঝোপের আড়াল থেকে, 'দেখো, কী সাংঘাতিক জোরে ছুটে আসছে।'

মরগ্যানও তখন উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে। আগ্রহভরে দেখছে রাস্তার দিকে।

'হয়তো ট্রাকটা ওর গাড়ির থেকে খুব বেশি দূরে নেই। শিগগির এসো। শাবল দুটো চটপট তুলে নাও!'

পকেট থেকে এক ফালি বড় ন্যাকড়া বের করে রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়াল মরগ্যান। ন্যাকড়াটা পাকিয়ে দড়ির মতো করে, বাঁ-পকেট থেকে বের করল একটা বেনজিনের শিশি।

বিপজ্জনক বাঁকের কাছাকাছি আসতেই গাড়ির গতিবেগ কমে এল—পর মুহূর্তেই বাঁক ঘুরেই গাড়িটা হাজির হল মরগ্যানের দৃষ্টির আওতায়। হাত নেড়ে সে জিনিকে উপযুক্ত জায়গায় গাড়িটা থামাতে নির্দেশ দিল। গাড়িটাকে এক ঝটকায় রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে থামাল জিনি।

ওর মুখ আতঙ্কে বিবর্ণ, চোখের দৃষ্টিতে ক্রোধ ও উত্তেজনায় ছোঁয়া। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল জিনি।

'ওঃ, ওরা কিছুতেই আমাকেই আগে যেতে দিচ্ছিল না! শেষে অতিকষ্টে পাশ কাটিয়ে এসেছি। আরেকটু হলেই রাস্তা থেকে ছিটকে যাচ্ছিলাম নালার মধ্যে! শিগগির করো!' জিনির মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, কাগজের মতো ফ্যাকাসে। স্বর উটকণ্ঠায় অস্থির; ওরা ঠিক আমার পিছন পেছনেই আসছে!'

গাড়ির যন্ত্রপাতি রাখার বাক্স থেকে ছোঁ-মেরে একটা রিভলভার বের করে আনল জিনি। তারপর গাড়ির মেঝে থেকে শুয়োরের রক্ত-ভরা বোতলটা তুলে নিল।

'কোন জায়গায় আমাকে শুতে হবে?'

মরগ্যান আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দিল জায়গাটা।

বোতলের ঢাকনা খুলে জিনি যখন রাস্তায় রক্ত ঢালছে, মরগ্যান ও ব্লেক তখন তড়িঘড়ি জিনির গাড়িটাকে শাবলের চাড় দিয়ে ওলটাতে ব্যস্ত!

ওদের দুজনের একত্রিত শক্তির প্রচেষ্টায় মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ির একপাশ শূন্যে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিকট শব্দ করে নালার মধ্যে আছড়ে পড়ল গাড়িটা।

'যাও, শাবল দুটোকে নিয়ে লুকিয়ে পড়ো!' ব্লেককে লক্ষ করে কথা কটা ছুড়ে দিয়েই মরগ্যান পেট্রোল ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শাবল দুটোকে নিয়ে ব্লেক একছুটে ফিরে গেল নিজের জায়গায়—লুকিয়ে পড়ল। ওদিকে জিনি রক্ত ঢেলে চলেছে ওর হাতে, গায়ে, জামায়—ঘেন্নায় মুখ বিকৃত।

মরগ্যান ন্যাকড়ায় দড়িটার ওপর বেনজিন ঢেলে দিল। শিশিটা ঝোপের আড়ালে ছুঁড়ে দিয়ে ভেজা দড়ির একমাথা ঢুকিয়ে দিল পেট্রোল ট্যাঙ্কের ভেতরে। অন্য মাথাটা পড়ে রইল রাস্তার ওপর।

'ওই যে, ওরা আসছে! ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।' ব্লেক চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি ফ্র্যাঙ্ক!'

মরগ্যান এক ঝটকায় ফিরে দেখল জিনির দিকে।

এক গ্যালন রক্তের সমুদ্রে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে জিনি। ও মুখ তুলে তাকাল ফ্র্যাঙ্কের দিকে... বর্ণহীন মুখে উৎকণ্ঠায় ভরা বিস্ফারিত সবুজ চোখজোড়া বেমানান লাগছে!

'রিভলভার নিয়েছ তো?' মরগ্যান জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।'

'ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমরা তো আছি।'

ক্ষিপ্রহাতে দেশলাই জ্বালাতেই আচমকা দ্বিধায় পড়ল মরগ্যান। ওলটানো গাড়িটা জিনির বড় বেশি কাছে রয়েছে না? যদি সে এখুনি গাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেয় তাহলে জিনির গায়ে আঁচ লাগবে না তো! কিন্তু সে সব চিন্তা করার সময় আর তখন ছিল না।

'জলদি করো, ফ্র্যাঙ্ক!' আতঙ্ক ঝিমঝিম স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ব্লেক।

জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা ন্যাকড়ার একপ্রান্তে স্পর্শ করাল মরগ্যান। পরমুহূর্তেই তীরবেগে জিনিকে অতিক্রম করে ঝোপের আড়াল লক্ষ করে ছুটল।

আগুনের শিখা বেনজিন ভেজা ন্যাকড়া বেয়ে পলকের মধ্যে প্রবেশ করল গাড়ির পেট্রোল ট্যাঙ্কে। এক কান-ফাটানো বিস্ফোরণ! গরম হাওয়ার হলকা এসে ঝাপটা মারল মরগ্যানের মুখে যেন তার শ্বাসরোধ করে দিতে চাইল।

ঘন কালো ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান রক্তিম শিখা আবহাওয়াকে আচ্ছন্ন করে তুলল। বাঁকের সামনের রাস্তাটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেল ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায়।

'জিনি নির্ঘাত পুড়ে মরবে।' হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে চেঁচিয়ে বলল ব্লেক। কারণ এত দূর থেকেও আগুনের অসহ্য উত্তাপ সে অনুভব করতে পারছে।

মরগ্যান জানে, এখন আর কিছু করার সময় নেই। জিনির কথা না ভেবে সে সামনের রাস্তার দিকে চোখ রাখল। দেখল, ওয়েলিং এজেন্সির ট্রাকটা সামনের বাঁকে মোড় নিয়ে এগিয়ে আসছে অকুস্থলে।

'ওরা এসে পড়েছে!'

এক ঝটকায় রাইফেল তুলে নিয়ে বাঁটটাকে কাঁধে চেপে ধরল ব্লেক। আপ্রাণ চেষ্টা করল নিশানা স্থির রাখতে, কিন্তু সামনের পটভূমি ওর চোখের সামনে স্তরে-স্তরে কাঁপতে লাগল।

আগুনের উত্তাল শিখা এখন অনেকটা কমে এসেছে—ধোঁয়াও কেটে গেছে অনেকটা। গাড়িটা তখনও ভীষণভাবে জ্বলছে—আবহাওয়ার উত্তাপে যেন চামড়া ঝলসে যাচ্ছে। রাস্তার মাঝখানে স্থির পাথরের মতো পড়ে রয়েছে জিনি।

ব্লেকের মনে হল, এর চেয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনার বাস্তব চিন্তা কারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

নিশ্চলভাবে পড়ে থাকা মেয়েটা, ওর জামা-কাপড়ের রক্ত, জ্বলন্ত গাড়িটা—সব মিলিয়ে যেন চূড়ান্ত দুর্ঘটনার এক বিশ্বাসযোগ্য নিখুঁত ছবি রূপ নিয়েছে। জিনিকে দেখে বোঝা শক্ত, ও বেঁচে আছে কি মরে গেছে।

ইস, গাড়িটাকে আর একটু দূরে রাখলেই ভালো হতো। আপসোসের ধিক্কারে মনে মনে ফেটে পড়ল মরগ্যান।

সে যেখানে লুকিয়ে আছে, সেখানেই তাপের প্রচণ্ডতা অসহ্য। তার ওপর জিনি রয়েছে মরগ্যানের চেয়ে জ্বলন্ত গাড়িটার অন্তত কুড়ি ফুট কাছে। ওর জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না মরগ্যান। সত্যিই যদি...? কিন্তু জিনির নিথর হয়ে পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে ওর যন্ত্রণার কোনওরকম আভাসই বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ট্রাকটা এসে ঢুকল বিপজ্জনক বাঁকের মুখে।

মরগ্যানের সর্পিল আঙুল চেপে বসল .৪৫-এর বাঁটের ওপর। সে এখানে থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ড্রাইভার ও রক্ষীকে। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা জ্বলন্ত গাড়িটাকে ও রক্তাক্ত জিনিকে দেখেই ওদের মুখে ভাবান্তর ঘটল। ব্রেক কষে গাড়ি থামাল ট্রাক-ড্রাইভার টমাস। জিনির থেকে প্রায় ফুট পনেরো দূরে থমকে দাঁড়াল কালান্তক ট্রাকটা।

এরপর ওরা কী করবে? মরগ্যানের মনে প্রশ্নের ঝড় বইল। ওরা কি গাড়ি ছেড়ে নামবে? নাকি...? এখন সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে এই মুহূর্তটার ওপর: মরগ্যানের মতলব, আশা-ভরসা, সবকিছুই তুলাদণ্ডে দুলছে এই একটা মুহূর্তকে আশ্রয় করে।

ডার্কসন তখন সামনে ঝুঁকে পড়ে ব্যাপারটা ভালোভাবে দেখতে চেষ্টা করছে। আর টমাস ট্রাকের গিয়ারকে ঠেলে দিল নিউট্রালে।

মরগ্যান দেখল, ট্রাকের দু-ধারের জানলাই খোলা। যাক, এখনও পর্যন্ত সবকিছুই তার মতলব মাফিকই ঘটছে।

ট্রাক ড্রাইভার ও রক্ষী উইণ্ডশিল্ডের ভেতর দিয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে চাইল। এই মুহূর্ত কয়েকের বিরতিকে মরগ্যানের মনে হল কয়েক মিনিট। সে যখন অধৈর্য হয়ে পড়েছে, তখন ডার্কসন টমাসকে কী যেন বলল। জবাবে টমাল ঘাড় নাড়ল।

ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করল মরগ্যান। সামনের এই নৃশংস দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখেও ওরা বরফের মতো ঠান্ডা মাথায় বসে বসে ভাবছে ওদের কর্তব্য। ওদের এই অবিচলিত মনোভাবে প্রমাদ গুনল মরগ্যান।

সে দেখল, টমাস হাত বাড়িয়ে একটা ছোট রিসিভার তুলে দিল।

সর্বনাশ! ভাবল মরগ্যান। ও কি নির্দেশ চেয়ে এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে?

হঠাৎই আড়াল থেকে রিভলভার দিয়ে ওদের দুজনের দিকে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছে হল মরগ্যানের টমাসকে বাধা দিতে হলে এখুনি একটা কিছু করা দরকার। সে যদি আগে থেকে এটা ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করত, তাহলে ব্লেককে সে কখনই রাস্তার এ-পাশে রাখত না। কারণ ব্লেক আর সে রাস্তার দু-পাশে থাকলে এই মুহূর্তেই তারা টমাস ও ডার্কসনকে আক্রমণ করতে পারত। কিন্তু ওদের দুজনের সামনে একা-একা ঝুঁকি নেওয়া নেহাতই অপরিণামদর্শিতা।

জিনির ভাবনাকে কল্পনা দিয়েই স্পর্শ করার চেষ্টা করল মরগ্যান।ধীরে ধীরে আগুনের আঁচে পুড়ছে মেয়েটা। ও কি বুঝতে পারছে না, ওর কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে এসে দাঁড়িয়েছে ট্রাকটা। শুয়ে শুয়ে ও নিশ্চয়ই ডার্কসনের আগমনের প্রতীক্ষা করছে।

এই সংকটময় মুহূর্তেও মরগ্যান জিনির সাহসের প্রশংসা না করে পারল না। ওই অবস্থায় একরাশ উৎকণ্ঠিত অনুভূতি নিয়ে অন্ধ হয়ে পড়ে থাকা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। মরগ্যান দেখল, টমাসের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে ডার্কসন তাতে কথা বলছে। তার গলার স্বর আংশিক মরগ্যানের কানে এলেও তার পক্ষে বক্তব্য অনুমান করা সম্ভব হল না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তাদের পালাবার সময় ধীরে ধীরে কমে আসছে—ভাবল মরগ্যান। যেই ট্রাকটা রাস্তা থেকে হাপিস হবে, সঙ্গে সঙ্গেই এজেন্সি সর্তকবাণী ছড়িয়ে দেবে বেতার তরঙ্গে।

কথা শেষ করে যন্ত্রটা নামিয়ে রাখল ডার্কসন। টমাসকে কী যেন বলে দরজা খুলে ট্রাকের বাইরে নামল সে।

টমাস একইভাবে ট্রাকের ভেতর বসে উইন্ডশিল্ডের মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করতে লাগল।

মরগ্যান যেখানে লুকিয়ে সেখান থেকে আর ব্লেককে দেখা যাচ্ছে না। ব্লেক কী করছে ভেবে সে অবাক হল।

জিনির দিকে এগিয়ে যাওয়া ডার্কসনকে নিশানা করে রাইফেল তুলে ধরল ব্লেক। কিন্তু তার হাত অস্বাভাবিকভাবে থরথর করে কাঁপতে লাগল। চাপা স্বরে একটা খিস্তি দিয়ে সে হাত স্থির করার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনও ফল হল না। আতঙ্কের হিমেল হাওয়া ঝাপটা মারল ব্লেকের ফুসফুসে।

রক্ষীটি ততক্ষণে জিনির দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে। ব্লেক জানে, এবার যে কোনও মুহূর্তে মরগ্যান রিভলবার নিয়ে তার ঝোপের আড়াল ছাড়বে।

ব্লেকের রাইফেলের নিশানা অনিশ্চিতভাবে কাঁপতে লাগল: একবার ডার্কসনের ওপর, পর মূহূর্তেই তার বাইরে।

ঝোপঝাড়ের খসখস শব্দে চোখ ফেরাতেই সে দেখল মরগ্যান রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছে। এবং সেইখানেই চরম ভুল করল ব্লেক। ডার্কসনের দিক থেকে নজর সরিয়ে সে তাকাল মরগ্যানের দিকে।

মরগ্যান তখন .৪৫ বাগিয়ে ধরে বেড়ালের মতো নিঃশব্দ, ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে চলেছে ট্রাকের জানলার দিকে।

ওদিকে ডার্কসন জিনির শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে কিন্তু তখনও ওকে স্পর্শ করেনি। হয়তো তার মনের কোণায় ক্ষীণ সন্দেহ ছিল যে এই দুর্ঘটনার ব্যাপারটায় কোথাও একটা গোঁজামিল আছে। হয়তো তার সামান্য সন্দেহ হল যে কেউ তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। হঠাৎই মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল ডার্কসন।

মরগ্যান ইতিমধ্যে ট্রাকের জানলায় উঠে পড়েছে। ওর হাতের রিভলভার বিচলিত, হতবুদ্ধি টমাসের মাথা লক্ষ করে স্থির।

আচমকা উঠে বসল জিনি।

ডার্কসন বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ঘুরে দাঁড়াল। ওর ডান হাত কাটারির মতো আছড়ে পড়ল জিনির রিভলবার-ধৃত হাতে! ব্যাপার-স্যাপার বুঝে ওঠার আগেই জিনির হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। প্রায় একই সঙ্গে ডার্কসনের বাঁ হাতের প্রচণ্ড আঘাতে মুখ থুবড়ে উলটে পড়ল ও। ডান হাতের এক আপাত অদৃশ্য আন্দোলনে কোমরের খাপ থেকে রিভলভার বের করে আনল ডার্কসন। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্র গতিতে চোখের পলক ফেলার আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের ট্রিগার টিপল ব্লেক! মরগ্যানের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ট্রিগারে চাপ দেওয়ার বদলে হ্যাঁচকা টান মারল সে। ঝাঁকুনির ফলে রাইফেলের নল হয়ে পড়ল ঈষৎ ঊর্ধ্বমুখী এবং একই মুহূর্তে হল তার বিস্ফোরণ। সুতরাং কোনওরকম ক্ষতি না করেই ডার্কসনের মাথার অনেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

ব্লেকের গুলি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকের মধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকা টমাস পাশে ঝাঁপ দিল। ওর হাত ছোবল মারল ড্যাশবোর্ডের বোতাম তিনটের দিকে।

মরগ্যান সরাসরি ওর মুখ টিপ করে গুলি করল!

একই সঙ্গে ডার্কসন মরগ্যানের দিকে তাক করে গুলি চালাল। সেই মুহূর্তে জিনি আঘাত করল ডার্কসন রিভলভার ধরা হাতে। ডার্কসনের লক্ষ সামান্য বিচলিত হলেও বিফলে গেল না। কারণ তার হাতের আঘাতে আচ্ছন্ন জিনির শক্তি তখন নিঃশেষিত।

মরগ্যান তার পাঁজরে অনুভব করল এক বিরাট ধাক্কা, পরমুহূর্তেই বুক খাক করে দেওয়া এক জ্বলন্ত যন্ত্রণা। গুলির আচমকা সংঘর্ষে সে পড়ে গেল রাস্তায়, কিন্তু খুব সহজেই নিজেকে সামলে নিয়ে স্থির লক্ষ্যে গুলি করল ডার্কসনকে। জিনি তখন কোনও রকম ডার্কসনের রিভলভার ধরা হাত আঁকড়ে ঝুলছে।

অনিবার্যভাবে মরগ্যানের গুলি সরলরেখায় গিয়ে আঘাত করল প্রহরীর কপালে, এবং মুহূর্তে মৃত ডার্কসনের নিষ্প্রাণ দেহটা জিনিকে নিয়ে আছড়ে পড়ল রাস্তায়।

যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে ট্রাকের গা-ধরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ল মরগ্যান। উঠেই দেখল, আহত, অবসন্ন টমাসের ডান হাত অতিকষ্টে ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে এগিয়ে চলেছে একটা বোতামের দিকে। মরগ্যান কিছু একটা করে ওঠার আগেই টমাসের অনুসন্ধানী আঙুল খুঁজে পেল বোতামটা, এবং বোতামে চাপ দিল।

মুহূর্তে ইস্পাতের চাদরে ঢাকা পড়ে গেল গোটা ট্রাকটা। কেউ ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রাকটা পরিণত হল একটা নিশ্ছিদ্র ইস্পাতের বাক্সে।

একটা মুখখিস্তি করে টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল মরগ্যান। আক্রোশ হতাশায় .৪৫-এর বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল ইস্পাতের পরদায়। সংঘর্ষের ধাতব শব্দ মরগ্যানকে ব্যঙ্গ করে যেন হেসে উঠল। হাঁপাতে হাঁপাতে চারপাশে তাকাল সে। এমন সময় ট্রাকের ভেতরে শোনা গেল গুরুভার কিছু পতনের শব্দ—সেই সঙ্গে একটা চাপা-অস্ফুট আর্তনাদ। সম্ভবত নিজের আসন থেকে ট্রাকের মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে টমাস।

ঝোপের আড়াল ছেড়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল ব্লেক। দু-হাতে অটোমেটিক রাইফেলটা সে খামচে ধরে আছে—মুখে একরাশ অন্ধকার এসে ভিড় করেছে।

মরগ্যান পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল তার দিকে। মরগ্যানের চোখে চোখ পড়তেই অজানা আতঙ্কে থমকে দাঁড়াল ব্লেক—যেন জমাট পাথরের মূর্তি।

'শালা কুত্তির বাচ্চা!' হিংস্র স্বরে খেঁকিয়ে উঠল মরগ্যান, 'তোকে আমি খুন করে ফেলব।'

রাইফেল ফেলে দিয়ে দু-হাত শূন্যে রেখে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বোঝাতে চাইল ব্লেক। প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ফ্র্যাঙ্ক, বিশ্বাস করো, আমি ওকে মারতে চেয়েছি, কিন্তু মাছিটা গোলমাল থাকায় ফসকে গেছে, তারপর তো ট্রিগারটাই বিগড়ে গেল!'

হঠাৎ মরগ্যান অনুভব করল অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোটের বোতাম খুলে ফেলতেই চোখে পড়ল রক্তাক্ত জামাটা। ক্ষতস্থান ঘিরে এক বিশাল চক্রাকার দাগ তৈরি হয়েছে জামার ওপর।

বেতালা পা-ফেলে দৌড়ে এল জিনি। জ্বলন্ত গাড়ির আঁচে ওর মুখ টকটক করছে। বাদামি চুলের কয়েক গুচ্ছ পুড়ে গিয়ে জড়িয়ে গেছে।

'খুব বেশি লেগেছে?' চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করল জিনি।

'ও কিছু নয়!' তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেও মরগ্যানের মাথা ঝিমিঝিম করতে লাগল, একটা শীতার্ত অনুভূতি তাকে আঁকড়ে ধরল। পকেট থেকে বাঁশিটা বের করে জিনির প্রসারিত হাতে গুঁজে দিল সে, 'শিগগির ডাকো কিটসনকে!'

জিনি বাঁশিতে ফুঁ দিল : লম্বা একটানা কর্কশ সুরে বাজাল বাঁশিটা। কয়েক মুহূর্ত থেমে একই সুরের পুনরাবৃত্তি করল ও।

'টমাস? টমাসের কী হল?' মরগ্যান ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করল জিনি। ও পরিষ্কার শুনতে পেল মরগ্যানের হালকা, কষ্টকৃত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

'টমাসকে আমি শেষ করে দিয়েছি। একটা বোতাম ও টিপেছে বটে, কিন্তু অন্য দুটোর নাগাল পায়নি—তার আগেই ওর গড়িয়ে পড়ার শব্দ আমার কানে এসেছে।'

ব্লেক ইতিমধ্যে মরগ্যানের কাছে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু হতবুদ্ধি হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎই যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে সে বলে উঠল, 'ফ্র্যাঙ্ক! তোমার বুক থেকে রক্ত পড়ছে!'

'সরে যা আমার সামনে থেকে—শালা, ভেড়ুয়া কোথাকার।' দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল মরগ্যান, তোর জন্যেই আমাদের সমস্ত মতলব ফেঁসে গেল। এখন আমরা ডুবতে বসেছি।'

‘না।’ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল জিনি, ‘এখনও একটা উপায় আছে। এদিকে এসো, ফ্র্যাঙ্ক, বসো। আগে তোমার রক্তটা বন্ধ করি!’

মরগ্যান বসতেই জিনি টান মেরে খুলে ফেলল তার কোট ও শার্ট।

ব্লেক একইভাবে দাঁড়িয়ে শূন্য চোখে চেয়ে রইল—যেন ঘটনাগুলোর আকস্মিকতায় তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

মরগ্যান বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? যাও, যা হোক কিছু একটা করো।’

জিনি প্রথমে মরগ্যানের ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখল—প্রায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটা চেরা দাগ। অল্পের জন্যে গুলি পাঁজর ভেদ করে যায়নি। চটপট স্কার্ট তুলে পেটিকোটের সেলাই বরাবর লম্বা এক ফালি কাপড় ছিঁড়ে নিল জিনি। তারপর মরগ্যানের শার্টটা নিয়ে রক্ত-ভেজা অংশটা ছিড়ে বাদ দিল। বাকি কাপড়টা ভাঁজ করে একটা নরম প্যাডের মতো করে মরগ্যানের ক্ষতস্থানে চাপা দিল, সেটাকে কাপড়ের ফালিটা দিয়ে শক্ত করে বাঁধল।

‘যাক, এতেই মোটামুটি কাজ হবে। তবে ফন হ্রদে পৌঁছনো মাত্রই এটার উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে হবে। কেমন লাগছে এখন?’

মরগ্যান আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কোটটা গায়ে দিতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল, ‘আমি ঠিক আছি। কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করা বন্ধ করো।’ চোখ তুলে ট্রাকের দিকে তাকাল মরগ্যান, ‘আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। এখন আর ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানে ঢোকানো সম্ভব নয়—এদিকে সময়ও চলে যাচ্ছে। চলো পালাতে হলে আর দেরি করা ঠিক হবে না—শিগগির!’

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যারাভ্যান ও বুইক নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হল কিটসন। ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে ওদের কাছাকাছি এসে থমকাল সে। বিবর্ণ, উৎকণ্ঠা ভরা মুখে বুইক থেকে নামল কিটসন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার তাকাল ট্রাকের দিকে, তারপর মরগ্যানের দিকে।

একটা ঝোপের পিছনে ডার্কসনের মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেলে ব্লেক ফিরে এল।

‘কী হয়েছে?’ উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করল কিটসন, ‘যেন গুলির শব্দ শুনলাম।’

‘সর্বনাশ হয়ে গেছে!’ মরগ্যান জবাব দিল, ‘এক্ষুনি আমাদের পালাতে হবে।’

‘দাঁড়াও।’ ওদের বাধা দিয়ে বলে উঠল জিনি, ‘এখনও একটা উপায় আছে। বুইকটা চেষ্টা করলে ট্রাকটাকে ঠেলে ক্যারাভ্যানে তুলতে পারে। আমার মনে হয় তা অসম্ভব নয়। আমরা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। দশ লাখ ডলারের ট্রাকটাকে বিনা চেষ্টায় হাতছাড়া করতে আমি রাজি নই।’

মরগ্যান চোখ কুঁচকে তাকাল জিনির দিকে, ‘হুঁ তাইতো... শালা, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই পারা যাবে।’ কিটসনের দিকে ফিরে তাকাল সে, ‘আলেক্স, চটপট ক্যারাভ্যানটাকে বুইকের ল্যাজ থেকে ছাড়িয়ে নাও।’

ঘটনাবলির সম্পর্কে অন্ধকারে থাকলেও মরগ্যানের স্বরের তীক্ষ্ণতা কিটসনের কান এড়াল না। হতভম্ব হয়ে সে ছুটে গেল ক্যারাভ্যানের দিকে। বুইক থেকে ওটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল শেকল খুলে।

ব্লেককে লক্ষ করে গর্জে উঠল মরগ্যান, ‘যাও, ওকে সাহায্য করো! জিনি বুইকটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল ট্রাক ছাড়িয়ে তারপর ব্যাক গিয়ার দিয়ে গাড়িটাকে আস্তে আস্তে পিছিয়ে এনে স্পর্শ করল ট্রাকের গায়ে। অর্থাৎ বুইকের পিছনের বাম্পার ও ট্রাকের পিছনের বাম্পার পরস্পরকে স্পর্শ করে রইল।

কিটসন ও ব্লেক ক্যারাভ্যানটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল ট্রাকের সামনের দিকে।

‘এক কাজ করো এড, ক্যারাভ্যানের চাকার সামনে কয়েকটা আধলা ইঁট বসিয়ে দাও, যাতে ওটা নড়তে না পারে।’ মরগ্যান নির্দেশ দিল, ‘আর শাবল দুটো বের করে আনো। ও দুটো দিয়ে ক্যারাভ্যানের সামনেটা ঠেকা দাও—যাতে ট্রাকটা ফেলে তোলার সময় ওটা উলটে না যায়!’

ঝড়ের বেগে কাজ করে চলল কিটসন। মুহূর্তের মধ্যে কতকগুলো বড়-বড় পাথরের টুকরো তুলে ক্যারাভ্যানের চাকা ও রাস্তার ফাঁকে গুঁজে দিল সে। ওদিকে শাবল দুটো দিয়ে ব্লেক ক্যারাভ্যানের সামনেটায় জোরালো ঠেকা দিয়েছে—যাতে ওটা উল্টে না যায়।

'ঠিক আছে।' জিনির দিকে হাতের ইশারা করল মরগ্যান।

কিটসন ট্রাকের সামনের দিকে এসে দাঁড়াতেই মরগ্যান ক্যারাভ্যানের পিছনের দরজা খুলে দিল।

'সাবধান! ধীরে ধীরে জোর বাড়বে।' জিনিকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। বুইকের ইঞ্জিন চালু করে ট্রাকটাকে ঠেলতে শুরু করল জিনি। ট্রাকের হ্যান্ড ব্রেক দেওয়া থাকলেও বুইকের ক্রমবর্ধমান চাপে নড়তে শুরু করল ট্রাকটা।

কিটসন ও ব্লেক ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানের পাটাতন বেয়ে ঠিকমতো তোলার জন্যে ওটার সামনের চাকা জোড়ায় মুহুর্মুহু লাথি মেরে ট্রাকের গতিপথ ঠিক রাখল। ধীরে ধীরে ট্রাকটা ঢুকে পড়ল ক্যারাভ্যানে। ওটাকে শেষ বারের মতো ধাক্কা দেওয়ার জন্যে বুইকটা ঠেলতে ঠেলতে উঠে গেল ক্যারাভ্যানের পাটাতনে।

'থামো' মরগ্যান ডেকে বলল জিনিকে, 'কাজ হয়ে গেছে। এড, শিগগির শাবল দুটো আর রাইফেলটা গুছিয়ে নাও। কিটসন, চটপট বুইকের সঙ্গে ক্যারাভ্যানটাকে জুড়ে দাও। জলদি। আমাদের হাতে নষ্ট করার মতো একমুহূর্তে সময় নেই।'

জিনি বুইকটা ঘুরিয়ে চালিয়ে নিয়ে এল ক্যারাভ্যানের সামনের দিকে, তারপর গাড়িটা পিছিয়ে ক্যারাভ্যানের কাছ ঘেঁষে থামতেই কিটসন দুটোকে আবার শেকল দিয়ে আগের মতো জুড়ে দিল।

জিনি চালকের আসন থেকে সরে বসতেই কিটসন বুইকে উঠে বসল, স্টিয়ারিং ধরল। গাড়ি ও ক্যারাভ্যানকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে যেদিক থেকে জিপোর আসার কথা সেদিকে মুখ করে দাঁড়াল।

মরগ্যান ও ব্লেক লাফিয়ে ঢুকল ক্যারাভ্যানের ভেতরে।

কিন্তু ট্রাকটা যে এতটা জায়গা নিয়ে নেবে সেটা ওরা ভাবতেই পারেনি। কারণ ট্রাক ও ক্যারাভ্যানের মাঝে পাশের দিকে দেড় ফুট এবং পিছনে মাত্র ফুট দুয়েক জায়গা রয়েছে। বিস্ময় ও সংশয় ওদের মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে তুলতে চাইল।

আগে থেকেই ঠিক ছিল মরগ্যান ও ব্লেক ট্রাকের সামনে ড্রাইভারের কেবিনে বসবে। কিন্তু ঘটনাচক্র বাধ্য করেছে পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে। সুতরাং বাধ্য হয়েই ওদের চলতে হবে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ও ট্রাকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক এবং অনিশ্চয়তায় ভরা প্রচণ্ড ঝুঁকি। কিন্তু ওরা নিরুপায়। কিটসন যদি দ্রুতবেগে কোনও বাঁক নেয় তাহলে ট্রাকটা ছিটকে সরে আসতে পারে ক্যারাভ্যানের দেওয়ালের দিকে, হয়তো, থেঁতলে দেবে ওদের দেহকে।

ক্যারাভ্যানে উঠেই মরগ্যান বলল, 'সাবধান। যে কোনও মুহূর্তেই ট্রাকটা সরে আসতে পারে। তাহলে...'

কিটসন গাড়ি ছেড়ে উঠে এসেছে ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করতে। ও মরগ্যানের কথায় ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক আছে, আমি সেদিকে লক্ষ রাখব—'

'এক কাজ করলে হতো না?' ইতস্তত করে বলেই ফেলল ব্লেক, 'ট্রাকের চাকাগুলোকে পাথরের টুকরো দিয়ে আটকে দিলে কেমন হয়?'

'না, না—ওসবের কোনও সময় নেই।' খেঁকিয়ে উঠল মরগ্যান, 'দোহাই তোমার, ভেতরে ঢুকে এসো। কিটসন, গাড়ি ছেড়ে দাও জলদি।'

হাতলে চাপ দিয়ে ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করে কিটসন ছুটে গিয়ে বসল বুইকের চালকের আসনে।

জিনি ততক্ষণ ওর রক্তমাথা স্কার্ট, ব্লাউজ খুলে ফেলে নতুন একটা ধুসর পোশাক পরে নিয়েছে।

কিটসন আড়চোখে ওকে দেখল, জিনির মুখমণ্ডলে মৃতের ছায়া। গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছোটাল কিটসন। অনুভব করল, ট্রাকসুদ্ধ ক্যারাভ্যানটা টানতে গিয়ে বুইকের ক্ষমতা কমে আসতে চাইছে।

ব্লাউজ পরে স্কার্টের চেন টেনে বন্ধ করতেই জিনিকে শুধোল কিটসন, 'কী হয়েছিল?'

শঙ্কিতস্বরে পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে কিটসনকে জানাল ও।

'তার মানে ট্রাকের ভেতরে একটা লোক মরে পড়ে রয়েছে?' ভীষণ ভয় পেল কিটসন।

'যদি সে মরে না থাকে, তাহলে এতক্ষণে বেতারে সংকেত পাঠিয়ে আমাদের বিপদে ফেলত। মরগ্যান তো বলেছে যে ও টমাসকে একেবারেই শেষ করে দিয়েছে! কী জানি।'

'তাহলে একটা মড়াকে সঙ্গে বয়ে আমরা ক্যারাভ্যানের ঘাঁটিতে যাচ্ছি?'

'ওঃ, তুমি থামবে?' ভাঙা উত্তেজিত স্বরে ওকে বাধা দিল জিনি। তারপর পাশ ফিরে মুখ ঢুকল দু-হাতে।

ওদিকে ক্যারাভ্যানের ভেতরে শান্তভাবে তার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যান। নিরাপত্তার প্রয়োজনে পা-দুটো ঠেসে ধরেছে ট্রাকের পিছনের চাকায় তার মনের ভেতরে বয়ে চলেছে অশান্ত ঢেউ...

যাক, শেষ পর্যন্ত তাহলে কাজটা হল। এখন বাকি কাজটা ঠিকমতো সারতে পারলেই হয়। এর জন্যে দু-দুজন লোককে আমি খুন করেছি। অবশ্য সেটা তাদের নিয়তি। নাঃ, টমাস, ডার্কসনের সাহস আছে। বিশেষ করে ড্রাইভারটার। কারণ সে জানত যে আমার রিভলভারের সামনে সামান্যতম বেচাল মানেই মৃত্যু। কিন্তু তবুও সে বোতাম টেপার চেষ্টা করেছে। নাঃ, আমি হলে অন্তত সে চেষ্টা করতাম না। অথচ টমাস তাই করেছে—এবং আংশিকভাবে সফলও হয়েছে। এই ইস্পাতের চাদর নিয়ে এখন আমাদের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে। তাছাড়া টমাসের দেহটাও পড়ে আছে ট্রাকের ভেতর। বাইরের পাটাতন ভেঙে ওর দেহটা আমাদের বের করতে হবে। মনে হয় টমাস মারাই গেছে। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে? হয়তো জ্ঞান ফিরে এলে ও বেতারে সংকেত পাঠাতে চেষ্টা করবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দেবে!

মজবুত ইস্পাতের ট্রাকটার দিকে চোখ রাখল মরগ্যান। ভাবল, সামান্য ইস্পাত-প্রাচীরের ওপিঠেই রয়েছে তার এতদিনের স্বপ্ন—দশ লক্ষ ডলার। তার হাতের এত কাছে স্বর্ণমৃগের মাদকতাময়, নেশা-ধরানো, উপস্থিতি মরগ্যানকে ভুলিয়ে দিল তার বুকের ক্রমবর্ধমান, অসহ্য যন্ত্রণার কথা। সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে।

মরগ্যানের চোখের আড়ালে, ট্রাকের অন্য দিকে নিচু হয়ে বসে আছে ব্লেক। ওর চোখ দুটো ট্রাকের গায়ে আঠার মতো আটকে আছে—লক্ষ করছে ট্রাকের প্রতিটি সূক্ষ্ম আন্দোলন। অধীর সংশয়ে তার চোখ-মুখে দুঃস্বপ্নের ছায়া—এই বুঝি ছিটকে এল তার দিকে।

এখন ব্লেক তার সাহস ফিরে পেয়েছে—কিন্তু দু-দুবারের ব্যর্থতার গ্লানি সে যেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

ট্রাকটাকে ওরা হাতিয়েছে অথচ পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্লেককে কোনও খুন করতে হয়নি। ব্লেক স্বস্তির শ্বাস নিল। ওঃ, একটুর জন্যে সে তার অপরাধ জীবনের চরম অপরাধ থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রথম থেকে এই খুন করার ভাবনাটা তার সমস্ত সাহস শুষে নিয়েছে। কিন্তু এখন যে কোনও পরিস্থিতির জন্যেই সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এমনিতে ভীরু বা কাপুরুষ সে নয়; অথচ ব্লেক জানে এ ঘটনার পর মরগ্যান তাকে আর একটি মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং ব্লেককে ফ্র্যাঙ্কের ওপর নজর রাখতে হবে। ব্লেক নিজের দু-লাখ টাকা অত সস্তায় ছাড়তে রাজি নয়।

মাইল ছয়েক গাড়ি ছোটাবার পর কিটসন দেখল জিপো দ্রুতপায়ে রাস্তা ধরে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

কিটসন গাড়ি থামাতেই সে ছুটে এল বুইকের কাছে।

'কী হল? সব ঠিক আছে তো?' গোল গোল চোখ করে প্রশ্ন করল জিপো, 'কোনও গোলমাল হয়নি?'

'না, সব ঠিক আছে। যাও, ক্যারাভ্যানের ভেতর ঢুকে পড়ো।'

হাতল ঘুরিয়ে বুইক থেকে নেমে ক্যারাভ্যানের দরজার দিকে এগিয়ে গেল কিটসন। জিপোকে ডাকল ‘এসো এদিকে।’

জিপো ক্যারাভ্যানের ভেতর উঁকি মারতেই তার চোখ পড়ল মরগ্যানের ওপর।

‘সব ঠিক আছে তো, ফ্র্যাঙ্ক?’ মরগ্যান যন্ত্রণায় ঠোঁট টিপে বসে—মুখে ধূসর পাণ্ডুর প্রলেপ। জিপোর কথায় কোনওরকমে অস্ফুট স্বরে সে বলে উঠল, ‘হ্যাঁ...এখন চলো! এসো, চটপট ভেতরে ঢুকে পড়ো জিপো।’

হঠাৎই থমকে দাঁড়াল জিপো। স্থির অবাক চোখে সে বলে উঠল, ‘তুমি এখানে কী করছ, ফ্র্যাঙ্ক? তোমার তো ট্রাকের ভেতর বসার কথা?’

‘ভেতরে এসো।’ গর্জে উঠল মরগ্যান ‘নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই।’

‘না! আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল জিপো। বিস্ফারিত চোখে চাইল কয়েক পা পিছিয়ে যেতে যেতে, ‘ওভাবে আমি ক্যারাভ্যানে চড়তে পারব না। ট্রাকটা যদি সামান্য নড়ে তাহলেই তোমরা মাছির মতো থেঁতলে মারা যাবে!’

মরগ্যান তার কাঁধে ঝোলানো খাপ থেকে বের করে আনল .৪৫টা। রিভলভার বের করার সময় তার কোট খানিকটা সরে গেল। জিপোর চোখে পড়ল, মরগ্যানের বুকে আড়াতাড়িভাবে বাঁধা রক্তে-ভেজা পট্টিটা।

‘এসো ভেতরে!’ রিভলবার উঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠল মরগ্যান।

কিটসন জিপোকে ধরে এক ধাক্কা মারল। জিপো ছিটকে গিয়ে পড়ল ক্যারাভ্যানের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে কিটসন দৌড়ে গেল সামনের দিকে। হাতলে চাপ দিতেই বন্ধ হয়ে গেল ক্যারাভ্যানের দরজা।

তারপর চালকের আসনে বসে গাড়ি চালু করল সে।

গাড়ি এবং ক্যারাভ্যান হাওয়ার বেগে ছুটে চলল প্রধান সড়কের দিকে।

সাত

নিজেকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিপো। ক্যারাভ্যানের অসম দোলানির সঙ্গে-সঙ্গে ওর বৃত্তাকার চোখে কেঁপে কেঁপে উঠছে উলঙ্গ আতঙ্কের ছায়া। ওর শরীর থেকে মাত্র ইঞ্চিকয়েক দূরেই একটি ছন্দে দুলছে ট্রাকের ইস্পাত আবরণ।

ব্লেক ট্রাক ছেড়ে এখন আশ্রয় নিয়েছে পিছনের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করছে, ট্রাকের একপাশে নির্লিপ্তভাবে অপেক্ষারত মরগ্যান ও জিপোকে।

বুইকের প্রচণ্ড গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে ছুটে চলা ক্যারাভ্যানের ভেতর ভারসাম্য বজায় রাখতে ওরা তিনজন আপ্রাণ চেষ্টায় কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে। ক্রমাগত ঝাঁকুনি আর দোলানির সঙ্গে সঙ্গে দুলছে ওদের শরীর তিনটে।

‘তাহলে একটা লোক এখনও এই ট্রাকের ভেতরে রয়েছে?’ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল জিপো।

‘হ্যাঁ, রয়েছে—কিন্তু ভয়ের কোনও কারণ নেই, লোকটা মারা গেছে। যাকগে, শোনো জিপো, তোমাকে এই ইস্পাতের চাদরটা যে করেই হোক খুলতে হবে কারণ টমাস যে বেতার সংকেত চালু করেনি, সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার।’

কাজের শুরু থেকে এই প্রথম একটা প্রস্তাবের মতো প্রস্তাব করল ব্লেক, ‘আচ্ছা, বেতার সংকেত পাঠানোর যন্ত্র তো ট্রাকের ব্যাটারিতেই চলে! তা-এক কাজ করলে হয় না? ট্রাকের তলায় ঢুকে ব্যাটারির তার দুটো যদি কেটে দিই?’

‘ঠিক বলেছ।’ মরগ্যান যেন হাতে চাঁদ পেল, ‘জিপো, তুমি তাহলে চটপট ট্রাকের নীচে ঢুকে পড়ো; ব্যাটারির তার দুটো কেটে দাও। তাড়াতাড়ি করো?’

জিপোর মুখ গম্ভীর হল, 'ট্রাকের নীচে কাজ করা সম্ভব নয়, ফ্র্যাঙ্ক। যে কোনও মুহূর্তে ট্রাকটা দুলে উঠতে পারে—তাহলে আমাকে চাপা পড়তে হবে ভারী ট্রাকটার তলায়।'

'আশা করি আমার কথা তোমার কানে গেছে।' হায়েনার স্বরে গর্জে উঠল মরগ্যান, 'জলদি কাজ শুরু করো!'

আপন মনেই গজগজ করতে করতে যন্ত্রপাতি রাখার বাক্সের ঢাকনা খুলল জিপো। একটা স্ক্রু ড্রাইভার এবং একটা তার কাটার কাঁচি বের করে নিল বাক্স থেকে।

মরগ্যান তার পাশের জানলার পরদা সরিয়ে সতর্কভাবে বাইরে উঁকি মারল। ওরা এখন মাঝারি রাস্তায় এসে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গাড়ির গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে কিটসন। ক্যারাভ্যানটা বিপজ্জনকভাবে এপাশ-ওপাশ দুলছে। রাস্তায় যদি কোনও মোটরবাইক পুলিশ উপস্থিত থাকত তাহলে সে নির্ঘাত মোটরবাইক নিয়ে ওদের তাড়া করত। কিন্তু কিটসনকে আস্তে চালানোর জন্যে অনুরোধ করারও কোনও উপায় নেই। থাকলে মরগ্যান তাকে সাবধান করে দিত। সুতরাং প্রধান সড়কে পৌঁছে বুইকের গতিবেগ যে কমাতে হবে, সে ব্যাপারেও কিটসনের বিচারবুদ্ধির ওপরেই তাদের নির্ভর করতে হবে।

জিপো তখন মেঝেতে উপুর হয়ে ট্রাকের নীচে ঢোকবার চেষ্টা করছে। প্রথমত স্বল্পপরিসরের জন্যে সে অসুবিধেয় পড়েছে—তার ওপর মস্তিষ্কে চেপে বসা ভয়টা তো আছেই। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর সে ট্রাকের তলায় নিজের শরীরটাকে প্রবেশ করাল, তখন মরগ্যান একটা টর্চ এগিয়ে দিল ওর হাতে।

চিৎ হয়ে ট্রাকের ইঞ্জিনের তলায় পৌঁছতেই পাটতনের গায়ে একটা বিশ্রী লাল দাগ চোখে পড়ল। ওর মুখ থেকে ইঞ্চি কয়েক ওপরেই স্যাঁতসেঁতে ভিজে দাগটা যে রক্তের দাগ, সেটা ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই কয়েকটা আঠালো উত্তপ্ত রক্তের ফোঁটা এসে পড়ল জিপোর মুখের ওপর।

শিউরে উঠে মুখ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল সে। ট্রাকের মেঝের ওপিঠেই পড়ে থাকা টমাসের রক্তাক্ত দেহের সান্নিধ্য তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল।

কাঁপা হাতে অন্ধের মতো মরিয়া হয়ে সে খুঁজতে লাগল ব্যাটারির তার দুটো। শত চেষ্টাতেও অসহ্য কাঁপুনিকে সে থামাতে পারল না—চুপচাপ ঘামতে লাগল জিপো। মরগ্যান এখন হাঁটু গেড়ে ট্রাকের নীচে মাথা এনে জিপোর কার্যকলাপ লক্ষ করছে। তা যদি না হতো, তাহলে সেই মুহূর্তেই জিপো বেরিয়ে আসত ট্রাকের তলা থেকে—সাফ বলে দিত ব্যাটারির তার সে কেটে দিয়েছে। কিন্তু মরগ্যানের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। তাই সে চেষ্টা আর করল না।

অবশেষে একটা তারের সন্ধান পেল জিপো, কিন্তু সেটা আবার নাগালের অনেক বাইরে। তাই হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে উঠল, 'আমি হাত পাচ্ছি না, ফ্র্যাঙ্ক। আমাদের ওপর থেকে চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

'ওপর থেকে দেখবে কোন দিক দিয়ে? সব বন্ধ। ঠিক আছে, এক মিনিট অপেক্ষা করো।' মরগ্যান এগিয়ে গেল যন্ত্রপাতি রাখার বাক্সের দিকে। ধাতু কাটার একটা লম্বা হাতলওলা কাঁচি বের করে আনল।

'এই নাও,এটা দিয়ে কাটো!' কাঁচিটা ট্রাকের তলায় ঠেলে দিয়ে সে বলল।

কাঁচিটাকে জুতমতো বাগিয়ে ধরতে জিপোকে টর্চটা নামিয়ে রাখতে হল! কিন্তু কিছুক্ষণ পরিশ্রমের পর যখন সে কাঁচিটাকে উঁচিয়ে ধরল, তখন তারের খুঁটটাকে সে আর দেখতে পেল না।

'এখানে একটু আলো ফেলার ব্যবস্থা করো, ফ্র্যাঙ্ক!' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে উঠল জিপো।

'যাও, নীচে ঢুকে আলোটা ধরো।' একপাশে সরে গিয়ে ব্লেককে বলল মরগ্যান। আঙুল তুলে ইশারা করল ট্রাকের নীচে ঢুকতে।

অতি সহজেই ট্রাকের নীচে ঢুকে পড়ল ব্লেক। টর্চটা উঁচিয়ে ধরতেই তার চোখে পড়ল ট্রাকের পাটাতনের রক্তে-ভেজা অংশটা—সেই সঙ্গে চোখে পড়ল জিপোর ভয়ার্ত মুখে কাঁচা রক্তের ফোঁটা।

জিপো ব্যাটারির তারটা কাটল।

‘হয়ে গেছে। এবার আমাকে বেরোতে দাও।’

ব্লেক হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎই একটা অস্ফুট শব্দে তার হাত-পা যেন বরফ হয়ে এল, ঘাড়ের ওপর শজারুর মতো দাঁড়িয়ে উঠল চুলগুলো।

ট্রাকের পাটাতনের ওপিঠ থেকে ভেসে এল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস, সেই সঙ্গে এক অস্ফুট গোঙানি—যেন কোনও অশরীরীর হাত তাকে স্পর্শ করতে আসছে।

জিপো উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল, ‘সরে যাও-যেতে দাও আমাকে! সরে যাও!’ পায়ের এলোপাথাড়ি ধাক্কায় ব্লেককে সরাতে চাইল সে। অন্ধ আতঙ্কে তার হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে বুকের খাঁচায়।

খেঁকিয়ে উঠে ওর পাঁজরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল ব্লেক, ‘থাম, শালা!’ জিপোর দম বন্ধ হয়ে এল আচমকা আঘাতে। বুকে হেঁটে আস্তে আস্তে ট্রাকের তলা তলা থেকে বেরিয়ে এল ব্লেক। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোট ঝাড়তে লাগল।

ব্লেকের ছাই-রঙা মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল মরগ্যান।’ কী হয়েছে?’ জানতে চাইল সে।

এমন সময় পাগলের মতো চেঁচাতে-চেঁচাতে ট্রাকের নীচ থেকে পড়িমড়ি করে বেরিয়ে এল জিপো। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ট্রাকের গায়ে লেগে ওর জামাটা আড়াআড়িভাবে অনেকটা ফেঁসে গেল। জিপোর মুখে রক্তশূন্যতার রাজত্ব, আঠালো রক্তের ফোঁটাগুলো হাতের ঘষা লেগে ওর গালে গলায় বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

‘ও-ও বেঁচে আছে!’ কোনওরকমে উচ্চারণ করল সে। গলা দিয়ে যেন স্বরই বেরোতে চায় না, ‘আমি স্পষ্ট শুনেছি! ও নড়ছে ট্রাকের ভেতরে!’

মরগ্যানের মুখভাব কঠিন হল!

‘তাহলেও টমাস এখন আর ট্রান্সমিটার ব্যবহার করতে পারছে না, তালাও বিকল করতে পারছে না। কারণ আমার মনে হয়, ওই তালা বা ট্রান্সমিটার চালু করার বোতামগুলো ট্রাকের ব্যাটারিতেই চলে। আপাতত ব্যাটারিই যখন অকেজো, তখন আর ভয় কী? যাকগে, এসো জিপো, এই ইস্পাতের চাদরটা এবার ভাঙা যাক। তা না হলে টমাসকে শেষ করা যাবে না!’

‘না, না-আমি নয়!’ শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল জিপো, ‘টমাসের কাছে রিভলভার আছে; আছে না? ইস্পাতের ঢাকনা ভাঙলেই ও আমাকে গুলি করবে!’

মরগ্যান দোনামনা হয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। জানলা দিয়ে আবার বাইরে চোখ রাখল সে। প্রধান সড়ক ও মাঝারি রাস্তার চৌমাথায় এসে পৌঁছেছে ওদের গাড়ি। কিটসন বুইকের গতি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে লাগল ...একসময় একেবারে থেমে গেল। মরগ্যান দেখল, তাদের সামনে প্রধান সড়কের ওপর দ্রুতগামী গাড়ির আধিক্য। রাস্তা আর আগের মতো নির্জন নয়।

যদি টমাস এখন রিভলভার চালিয়ে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করে, তাহলে রাস্তার লোকে নির্ঘাত সেই শব্দ শুনতে পাবে—এবং ওরা বিপদে পড়বে।

না, এ সমস্যার উত্তর মরগ্যানের জানা নেই।

ব্লেক বলল, ‘কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক, ফ্র্যাঙ্ক। এই বড় রাস্তায় সব সময়েই পুলিশ টহল মারে। যদি গুলির শব্দ হয়, তাহলে ওরা শুনতে পাবে...’

‘হ্যাঁ—অপেক্ষা করতে হবে।’

জিপো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ক্যারাভ্যানের মেঝেতে উবু হয়ে বসল। ওর স্নায়ুর কাঁপুনি তখনও পুরোপুরি থামেনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের রক্ত মুছল সে। ঘেন্নায় তার গা-গুলিয়ে উঠেছে।

মরগ্যান এগিয়ে গেল ট্রাকের সামনের দিকে। ইস্পাত আবরণীর ওপর কান চেপে ধরে শুনতে চাইল শব্দ। কিন্তু কিছুই কানে এল না। কয়েক মুহূর্ত একইভাবে একাগ্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল মরগ্যান, তারপর

তাকাল ব্লেকের দিকে।

'উঁহু—কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না?' তোমরা কী ঠিক শুনেছ?

'হ্যাঁ—টমাসের নড়াচড়ার শব্দও পরিষ্কার শুনেছি।'

'জিপো!' ঘুরে দাঁড়াল মরগ্যান, 'শুধু শুধু বসে থেকো না। উঠে একটু ট্রাকের তালাটা নেড়েচেড়ে দেখো। যত তাড়াতাড়ি তুমি কাজ শুরু করবে, তত তাড়াতাড়িই টাকাটা আমাদের হাতে আসবে।'

জিপো উঠে দাঁড়াল; মরগ্যানের পাশ কাটিয়ে এগোল ট্রাকের পিছন দিক লক্ষ করে।

বুইক ততক্ষণে আবার চলতে শুরু করেছে। পরদা সরিয়ে মরগ্যান দেখল অন্যান্য দ্রুতগামী গাড়িগুলো একের পর এক তাদের বুইক ও ক্যারাভ্যানকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। কিটসন গাড়ির গতি ঘণ্টায় তিরিশ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে দেখে মরগ্যান স্বস্তি অনুভব করল। সমতল পিচ ঢালা রাস্তা ধরে মসৃণ গতিতে বুইক ও ক্যারাভ্যান নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে।

ট্রাকের পিছনটা পরীক্ষা করেই জিপো হতাশ হয়ে পড়ল। সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই : ট্রাকের তালা খোলা যার তার কর্ম নয়। পিছনের দরজাটা এত নিখুঁতভাবে আঁটা যে কারও পক্ষে সেটাকে চাড় দিয়ে ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়। দরজার ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা গোলাকার চাকতি—সাধারণ সিন্দুকে যে ধরনের চাকতি থাকে অনেকটা সেইরকম। চাকতির পাশেই একটা ছোট্ট জানলা—গুলি প্রতিরোধকারী কাচে ঢাকা। সেখানে চোখ রাখতেই একটা সংখ্যা জিপোর নজরে পড়ল। সে জানে—বাইরে চাকতি ঘোরালেই ওই সংখ্যার পরিবর্তন ঘটবে—আসবে নতুন সংখ্যা। দরজা খুলতে গেলে কম্বিনেশন সংখ্যাটা তার জানা দরকার;—অর্থাৎ সেটা জানতে গেলে অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হবে সুদক্ষ,নিশ্চিত, অচঞ্চল হাতের কাজ—এবং সেই সঙ্গে একাগ্র, ঘনীভূত শ্রবণ ক্ষমতার।

'কী রকম মনে হচ্ছে?' ট্রাকের পিছন দিকে এগিয়ে এল মরগ্যান। জিপোর পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল।

'তালাটা যে মজবুত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক ঠিক কম্বিনেশন বের করতে গেলে প্রচুর সময় দরকার।'

'দরজা ভাঙার কোনও পথ আছে?'

'উঁহু—তা সম্ভব নয়। দেখেছ, কী জিনিস দিয়ে তৈরি? অত সহজে এ জিনিস ভাঙার নয়। হয়তো প্রচুর সময় পেলে দরজা কেটে খোলা সম্ভব।'

'তুমি বরং কম্বিনেশন নম্বরটা চেষ্টা করে দেখো—যদি বের করতে পার। ক্যারাভ্যানের ছাউনিতে পৌঁছতে এখনও কম করে চল্লিশ মিনিট লাগবে; শুধু শুধু এ সময়টা বসে বসে নষ্ট করবে কেন? এখন থেকেই কাজ শুরু করে দাও।'

জিপো অবাক চোখে মরগ্যানের দিকে চেয়ে রইল—যেন মরগ্যানের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সে সন্দিহান।

'এখন? এখন কী করে হবে? এই গোলমাল, গাড়ির দোলানির মধ্যে কাজ করা সম্ভব নয়।' জিপোর স্বরে আকুতি ঝরে পড়ল! মরগ্যানকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইল সে, 'তুমি বুঝতে পারছ না, ফ্র্যাঙ্ক চাকতি ঘোরানোর সময় আমাকে একমনে কান খাড়া করে শুনতে হবে। কিন্তু এই গাড়ি ঘোড়ার গোলমালের মধ্যে তা কি সম্ভব—তুমিই বলো?'

মরগ্যান হাতের একটা অধৈর্য ভঙ্গি করে কী একটা বলতে যাচ্ছিল—নিজেকে সামলে নিল। তার বুকের যন্ত্রণাটা ক্রমশই বাড়ছে, সেই সঙ্গে আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ছে মরগ্যান। সে জানে, এখন জিপোকে চাপ দিলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। তাই জিপোর ভাবনাকে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে সে ভাবতে লাগল আহত টমাসের কথা—সত্যিই কি লোকটা বেঁচে আছে? নাঃ... একের পর এক দুর্ঘটনা পরিস্থিতিকে

ক্রমশ জটিল করে তুলছে। আস্তে আস্তে বসে পড়ল মরগ্যান। বলা যায় না, কাজটাকে সে প্রথমে যতটা কঠিন মনে করেছিল, হয়তো কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে কাজটা তার চেয়েও বেশি জটিল।

আচমকা উন্মাদের মতো ইস্পাতের প্রাচীরে ঘুষি মেরে চলল মরগ্যান, চেঁচিয়ে উঠল অসহায়ভাবে, 'এর মধ্যে রয়েছে দশ লক্ষ ডলার! ভেবে দেখো একবার! ঠিক এই দেওয়ালের ও পিঠেই আছে কুবেরের সম্পদ! দশ লাখ ডলার! যে করে হোক টাকাটা আমরা নেবই! তার জন্যে জাহান্নমে যেতেও আমি প্রস্তুত!'

ওদিকে কিটসন তখন বুইককে নির্দেশিত আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, অন্যান্য গাড়ির গতিপথ বাঁচিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে সে গাড়ি চালাচ্ছে—জিনির দিকে নজর দেওয়ার সময় তার ছিল না : কিন্তু প্রধান সড়কে পৌঁছেই সে দেখল, তার সামনে নির্জন রাস্তা। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ির গতিপথ ঠিক করে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

জিনি সিটের গায়ে গা-এলিয়ে বসে ছিল। ওর চোখের দৃষ্টি বাইরে রাস্তার দিকে। ওদের অতিক্রম করে ছুটে চলা দ্রুতগামী গাড়িগুলোকে ও আনমনা হয়েই লক্ষ করছিল। মুখের বিবর্ণতা এখনও পুরোপুরি কাটেনি; শরীরের কাঁপুনিকে গোপন করলেও হাত দুটোকে আড়াল করেছে হাঁটুর ফাঁকে।

কিটসন ভাবছিল ট্রাকের ভেতরে পড়ে থাকা লোকটার কথা। ট্রাকের প্রতিরোধ ভেঙে ওই লোকটার দেহকে টেনে হিঁচড়ে বার করবার কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠল। একটা মিশ্র অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল তার শরীরে। কিন্তু লোকটা কি বেতারে সাহায্য চেয়ে সংকেত পাঠিয়েছে?... হয়তো ওরা এখন সরাসরি এগিয়ে চলেছে পুলিশের পাতা-ফাঁদে ধরা দিতে!

'টমাস যদি ইতিমধ্যে বেতারে খবর পাঠিয়ে থাকে, তাহলে'—মনের দুশ্চিন্তাকে মুখে প্রকাশ করতে পেরে অনেকটা হালকা বোধ করল কিটসন,—'তাহলে হয়তো আমরা পুলিশের জালে ধরা দিতেই চলেছি।'

জিনি কাঁধ ঝাঁকাল। ঠোঁট উলটে জবাব দিল, 'কিন্তু আমাদের কী করবার আছে বলো?'

'কিছুই নেই।' সহজভাবে কথাটা বললেও একটা অস্বস্তির কাঁটা কিটসনের মনে খচখচ করতে লাগল, 'যাকগে, ক্যারাভ্যানে চড়তে হয়নি দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। নইলে গাড়ি চড়ার মজাটা টের পেতাম! ওর ভেতরে ওদের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'শুনতে পাচ্ছ?' আচমকা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল জিনি।

কিটসনের হৃৎপিণ্ড আচমকা এক ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়ল—-কাঁপতে লাগল থরথর করে! না, শব্দটা ও স্পষ্টই শুনতে পেয়েছে—দ্রুতবেগে ধেয়ে আসা পুলিশের সাইরেনের কান-ফাটানো আর্তনাদ ওদের দিকেই আসছে।

সমস্ত গাড়িই তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে ধীরগামী যানবাহনের জন্যে নির্দিষ্ট পথের দিকে এগিয়ে চলল। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল পলক ফেলতেই ।

সাইরেনের একটানা আর্তনাদ এবার আরও জোরে শোনা গেল। তারপরেই কিটসনের চোখে পড়ল দ্রুতবেগে এগিয়ে আসা পুলিশের গাড়িটার ওপর। তার পিছন পিছন সার বেঁধে ছুটে আসছে চার-চারটে মোটর বাইক চড়া দ্রুতগামী পুলিশ, এবং তাদের পিছনে আরও দুটো পুলিশের গাড়ি। ঘণ্টায় আশি মাইলেরও বেশি বেগে গাড়িগুলো তাদের অতিক্রম করে ছুটে গেল মাঝারি সড়কের দিকে।

জিনি ও কিটসন, পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করল।

ভাঙা গলায় বলল কিটসন, 'একটুর জন্যে আমরা ওই রাস্তাটা পার হয়ে এসেছি। আর সামান্য দেরি করলেই পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হতো।'

জিনি ঘাড় নেড়ে তার বক্তব্যকে সমর্থন করল।

ওরা এগিয়ে চলল। আরও মাইলখানেক যাওয়ার পর ওরা হঠাৎই লক্ষ করল, ওদের সামনের গাড়িগুলো ক্রমশ গতিবেগ কমিয়ে আনছে। আরও দূরে নজর চালাতেই ওরা দেখল গাড়ির এক লম্বা সারি ধীরে ধীরে

নিজেদের গতি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে।

‘সামনের রাস্তা বন্ধ। নিশ্চয়ই পুলিশ রাস্তা আটকেছে।’ কিটসন অনুভব করল হৃৎপিণ্ডের অশান্ত, উত্তেজিত স্পন্দন, ‘তাহলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি নেই দেখছি!’

‘চুপচাপ বসো; এখন সাহস হারালে চলবে না।’ জিনি ভরসা দিল তাকে। ওদের বুইকের সামনে গাড়িগুলো আস্তে আস্তে একেবারে থেমে গেল।

বহু সময় অপেক্ষা করার পর গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করল। ঘর্মাক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল কিটসন। দূরে রাস্তার অবরোধটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে দু-দুটো পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের ফাঁক দিয়ে ঠিক একটি একটি করে গাড়ি শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলেছে। গাড়ি দুটোর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে ছজন পুলিশ অফিসার। প্রতিটি গাড়ি থামতেই ওদের মধ্যে একজন অফিসার ঝুঁকে পড়ছে গাড়ির ভেতর, চালকের সঙ্গে দু-একটা কথা বলেই তাকে এগোতে নির্দেশ করছে।

‘সবকিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও আমিই ওদের সঙ্গে কথা বলব।’ জিনি বলল।

ওর সাহস দেখে অবাক হয়ে কিটসন ফিরে তাকাল জিনির দিকে। ক্যারাভ্যানের ভেতর ওরা তিনজন কী ভাবছে, সেটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করল সে। কারণ ওরা এই রাস্তা অবরোধের ব্যাপারটা দেখতেই পাবে না। সুতরাং বুইকের এই শম্বুকগতির কারণ অনুমান করতে গিয়ে ওরা বার বার ব্যর্থ হবে, সেই সঙ্গে হয়ে পড়বে সংশয়াচ্ছন্ন। ক্যারাভ্যানের ভেতরে তাকে যেতে হয়নি দেখে আরও একবার স্বস্তি পেল কিটসন। মনে মনে প্রার্থনা করল, ক্যারাভ্যানের ভেতরে ওরা যেন কোনওরকম গোলমাল বাঁধিয়ে না বসে।

দশ মিনিট ব্যাপী স্নায়ু ছেঁড়া উৎকণ্ঠার পর ওরা এসে পৌঁছল অবরোধের সামনে। নির্বিকার মুখে, নিছক উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্কার্টটাকে হাঁটুর ওপরে তুলে ধরল জিনি। পায়ের ওপর পা-তুলে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে এল জিনির দিকে। প্রথমে ওর মুখে ... তারপর ওর নগ্ন হাঁটুর দিকে চোখ রাখল সে। তার রোদে-পোড়া তামাটে মুখে ফুটে উঠল প্রশংসার হাসি। কিটসনের দিকে সে তাকাবারই প্রয়োজন মনে করল না।

‘কোত্থেকে আসছেন আপনারা জানতে পারি?’ বুইকের গায়ে হেলান দিয়ে, সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে জিনির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল সে।

‘ডুকাস থেকে।’ বলল জিনি, ‘আমরা হানিমুন কাটাতে বেরিয়েছি। তা ব্যাপার কী, অফিসার? এত হই চই কিসের জন্যে?’

‘আপনারা কি ওয়েলিং কোম্পানির একটা ট্রাককে রাস্তায় দেখেছেন?’প্রশ্ন করল অফিসার, ‘ট্রাকটাকে দেখলে ভোলার কথা নয়; কারণ ওটার গায়ে বড় বড় হরফে ওয়েলিং কোম্পানির নাম লেখা আছে।’

‘কই, না তো! কোনও ট্রাকই আমাদের চোখে পড়েনি, তাই না আলেক্স?’ কিটসনের দিকে ফিরে সমর্থন খুঁজল জিনি।

কিটসন মাথা নাড়ল। তার হৃৎপিণ্ডের আছাড়ি-পিছাড়ি এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছল যে সে শব্দ অফিসারের কানে যাওয়ার আশঙ্কায় কিটসন নির্বাক হয়ে পড়ল।

‘কেন, আপনারা ট্রাকটা হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি?’ হাস্য-তরল কণ্ঠে জানতে চাইল জিনি। বিনা কারণেই খুশি খুশি হয়ে হেসে উঠল।

জিনির হাঁটু থেকে চোখ না সরিয়েই অফিসারটি হাসল।

‘যাকগে, ছেড়ে দিন ওসব কথা। এবার আপনারা যেতে পারেন। আপনাদের হানিমুন শুভ হোক।’ কিটসনের দিকে চেয়ে চোখ টিপল অফিসার, ‘শুভ হওয়া সম্পর্কে আমার অন্তত কোনও সন্দেহই নেই,

মশায়—জানি না আপনার আছে কি না! আচ্ছা, এবার তাহলে এগোন।'

গাড়ি নিয়ে সামনে এগোল কিটসন। একটু পরেই ওরা পুলিশের অবরোধ পার হয়ে ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়ল।

'ওফ্,খুব জোর বেঁচে গেছি!' হাঁফ ছাড়ল কিটসন। শক্ত মুঠোয় সে আঁকড়ে ধরল বুইকের স্টিয়ারিং, লোকটাকে তুমি দারুণ ঘোল খাইয়েছ, জিনি।'

স্কার্ট ঠিক করে হাঁটু ঢাকল জিনি, অধৈর্যভাবে কাঁধ ঝাঁকাল।' এসব লোককে বোকা বানানো খুব সহজ। দেখবার মতো কিছু একটা পেলেই হল; কাজ-টাজ ভুলে শুধু সেদিকে চেয়ে থাকবে।' কথা বলতে বলতে হাতব্যাগ খুলে এক প্যাকেট সিগারেট বের করল ও। কিটসনের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'চলবে নাকি?'

'দাও একটা।'

'ঠোঁট চেপে সিগারেট ধরাল জিনি। তারপর সেটা তুলে দিল কিটসনের ঠোঁটে। সিগারেটের শেষ প্রান্তে জিনির লিপস্টিকের হালকা আস্তরণ কিটসনের চোখে পড়ল। এ সিগারেটে জিনির নরম ঠোঁটের ছোঁয়া আছে জেনে সে এক অদ্ভুত সুখ অনুভব করল। আমেজ ভরে এক গভীর টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল।

নিজের জন্যে আর একটা সিগারেট ধরাল জিনি।

পরবর্তী দশ মাইল ওরা দুজনেই চুপচাপ। একসময় জিনিই নীরবতা ভাঙল, 'সামনের চৌ-মাথায় ডানদিকে ঘুরবে। সেই রাস্তাটাই ফন হ্রদের রাস্তা।'

কিটসন মাথা হেলাল। সামনের রাস্তায় নজর রাখতেই আকাশের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সে দেখল, একটা হোভার প্লেন তাদের লক্ষ করে উড়ে আসছে। রাস্তা থেকে বড়জোর শ-তিনেক ফুট ওপর দিয়ে উড়ে আসছে প্লেনটা।

'ওই দেখো!'

হাওয়ায় চড়া শিসের ঝাঁপটা তুলে হোভার প্লেনটা বুইক ও ক্যারাভ্যানের ঠিক ওপর দিয়েই বেরিয়ে গেল।

'হুঁ, তাহলে দেখছি কাজ শুরু করতে খুব একটা দেরি করেনি!' বলল জিনি। তারপর চোখ রাখল হাতঘড়ির দিকে। বারোটা বেজে দশ মিনিট। অথচ সেই পঁয়তাল্লিশ মিনিট জিনির কাছে ঠেকল পঁয়তাল্লিশ বছর?

ক্যারাভ্যানের ভেতরে মরগ্যান, জিপো ও ব্লেক—তিনজনেই শুনল হোভার প্লেনের বাতাস কেটে, শিস তুলে বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত জিপো হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ল মেঝেতে, ওর শরীর কুঁকড়ে গেল আতঙ্কে । শব্দ শোনামাত্রই সে বুঝেছে প্লেনটা তাদেরই খোঁজ করছে।

পুলিশি অবরোধের কাছে পৌঁছনোমাত্রই ওরা তিনজন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল মেঝেতে। মরগ্যান দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বের করে এনেছিল ওর .৪৫। যদি কেউ ক্যারাভ্যানে ঢোকবার সামান্য চেষ্টাও করে, তবে তাকেই প্রথম মরতে হবে মরগ্যানের গুলিতে। বিনা যুদ্ধে ধরা দিতে সে রাজি নয়।

বুইক আবার যখন তার গতি ফিরে পেল, তখন ওরা তিনজনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। উৎকণ্ঠার পাষাণ ভার নেমে গেল ওদের বুক থেকে।

মরগ্যান কোট খুলে ক্ষতস্থানটা একবার দেখল। জিনির বেঁধে দেওয়া ব্যান্ডেজটা রক্তে-ভিজে লাল হয়ে উঠেছে; সেইসঙ্গে ক্ষতস্থান থেকে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেছে।

মরগ্যানের সুনজরে আসার দুশ্চিন্তায় ব্লেক প্রথম থেকেই উদ্বিগ্ন ছিল। এখন সুযোগ পেয়েই সে উঠে দাঁড়াল। জিপোকে ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল ক্যারাভ্যানের তাকে রাখা ফার্স্ট এইড বক্সটার দিকে। বাক্সটা সর্বদা হাতের কাছে রাখার জন্যে শুরু থেকেই পীড়াপীড়ি করেছে মরগ্যান।

'দাঁড়াও ফ্র্যাঙ্ক, আমি এখুনি ব্যান্ডেজটা ঠিক করে দিচ্ছি।' বাক্সটা খুলতে খুলতে ব্যস্ত-স্বরে ব্লেক বলল।

মরগ্যানের মাথা তখন ঝিমঝিম করছে। একটা নিকষ-কালো পরদা যেন ঘিরে ফেলতে চাইছে তার চেতনাকে। রক্তপাতের পরিমাণ দেখে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে মরগ্যান। ব্লেকের কথায় কোনওরকমে মাথা হেলাল। তারপর ক্যারাভ্যানের দেওয়ালে হেলান দিয়ে আরও আয়েশ করে বসতে চেষ্টা করল।

জিপো অস্বস্তি ও আশঙ্কা ভরা চোখে দেখতে লাগল মরগ্যানকে। ভাবল : ফ্র্যাঙ্ক যদি এই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে আমরা কী করব? যে কোনও জটিল পরিস্থিতিতেই মাথা ঠান্ডা রেখে সমাধান খুঁজে বের করার ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই। সুতরাং ফ্র্যাঙ্ক মারা গেলে আমরা গিয়ে পড়ব অথৈ জলে।

মরগ্যানের সামনে ঝুঁকে বসে চিকিৎসার কাজ শুরু করল ব্লেক। মিনিট কয়েক পরে নতুন একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে রক্ত বন্ধ করতে সক্ষম হল সে।

'এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।' হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল ব্লেক, 'এক গেলাস চলবে নাকি?'

'চলুক, ক্ষতি কী?' তিক্তস্বরে বলে উঠল মরগ্যান, 'এখন তো মজা লোটবার সময়। অতএব খোলো বোতল...!'

তিনটে গেলাসে বেশ খানিকটা করে নির্জলা হুইস্কি ঢেলে জিপো ও মরগ্যানের দুটো এগিয়ে দিল ব্লেক।

যার-যার গেলাসে সবেমাত্র চুমুক দিয়েছে, এমন সময় হঠাৎই ওরা অনুভব করল ওদের বুইক বড় রাস্তা ছেড়ে আচমকা বাঁক নিল। পরমুহূর্তেই অসমতল রাস্তার প্রতিক্রিয়ায় ক্যারাভ্যানটা প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল।

ওরা তিনজন চটপট নিজেদের গেলাস শেষ করে ফেলল। মরগ্যান দাঁতে দাঁত চেপে ক্যারাভ্যানের অনিশ্চিত দোলনি ও বুকের জমাট, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা সহ্য করে চলল। ক্যারাভ্যানের সঙ্গে সঙ্গে একই ছন্দে দুলতে লাগল তার অসহায় দেহটা!

মিনিটখানেক পরে বুইকের গতি ক্রমশ কমে এল। একসময় একেবারে থেমে গেল গাড়িটা।

কিছুক্ষণ পর খুলে গেল ক্যারাভ্যানের পিছনের দরজা। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে জিনি ও কিটসন।

'কোনও রকম অসুবিধে হয়নি তো?' চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করল কিটসন। মরগ্যানের মুখের বিবর্ণ পাণ্ডুর প্রলেপ তার মনে জাগিয়ে তুলল দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

মরগ্যান কিটসনকে অতিক্রম করে চোখ রাখল বাইরের পরিবেশে। ওরা এখন রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়েছে এক ফার বনের শীতল ছায়াঘন রাজত্বে। তিরিশ ফুট দূরে মৃত অজগরের আঁকাবাঁকা শরীর নিয়ে শুয়ে আছে নির্জন রাস্তাটা। পাহাড়কে পাকে-পাকে জড়িয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ফন হ্রদের দিকে। এখান থেকে ফন হ্রদের দূরত্ব খুব বেশি হলে ছ-মাইল।

মাথার ওপর শোনা যাচ্ছে কোনও উড়োজাহাজের বিরক্তিকর গর্জন। এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা ওই শব্দ শুনেই বুঝতে পারল মরগ্যান।

'টমাস এখনও বেঁচে আছে!' ট্রাকের দিকে লক্ষ্য করে আঙুল ঝাঁকাল মরগ্যান, 'ওকে যে করে হোক একেবারে শেষ করতে হবে।' কিটসন মনে মনে টমাসের অবস্থাটা কল্পনা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল, 'এই জায়গাটা বেশ নির্জন-সুতরাং টমাসকে খতম করার পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ।' হিংস্র ব্যঙ্গে বিকৃত হল মরগ্যানের মুখ, 'ক্যারাভ্যান বন্ধ করে তোমরা সরে পড়ো। তুমি বরং বুইকের একটা চাকা খুলে এমন ভান করো, যেন লোকে মনে করে তোমাদের গাড়ির চাকা ফেঁসে গেছে। যদি কোনও গাড়ি-টাড়ি আসতে দেখো, ক্যারাভ্যানের গায়ে টোকা মেরে আমাদের সাবধান করে দেবে। জিনি,তুমি রাস্তার ধারে গিয়ে বোসো। সঙ্গে খাবারের বাক্সটা নিয়ে যাও। ওখানে গিয়ে এমন ভাব করবে, যেন তুমি পিকনিকে এসেছ, সময় হওয়াতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছ তোমাদের দুজনের জন্যে। যাও, চটপট কাজে লেগে পড়ো।'

নির্বিকার মুখে খাবারের বাক্সটা জিনির হাতে তুলে দিল ব্লেক।

কিটসন এতক্ষণে যেন প্রতিবাদ করার শক্তি ফিরে পেল, 'টমাসকে নিয়ে কী করবে তোমরা? খুন করবে ওকে?'

মরগ্যানের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল নিষ্ঠুর বাঁকা হাসি।

'নয়তো কি জামাই আদর করব? ক্যারাভ্যান বন্ধ করে যা বলছি তাই করো।'

'থামো!' তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠল জিপো, 'আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। টমাসকে খুন করার মধ্যে আমি নেই। আমার কাজ ট্রাকের তালা খোলা—তাই খুলব, ব্যস! অন্য কিছুর মধ্যে আমি নাক গলাতে রাজি নই...'

'চুপ করো!' খিঁচিয়ে উঠল মরগ্যান। .৪৫ পলকে উঠে এল তার হাতে, শাসাতে লাগল ভয়ার্ত জিপোকে, 'ইস্পাতের চাদরটা তোমাকেই খুলতে হবে, জিপো! ভালো চাও তো-যা বলছি তাই করো! নইলে তোমার ওই ভুঁড়িকে সীসে দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেব।'

মরগ্যানের মুখের নৃশংস কুটিল অভিব্যক্তি জিপোর ফুসফুসে যেন বরফ ছড়িয়ে দিল। দু-হাত সামনে ছড়িয়ে ককিয়ে উঠল জিপো, 'আমাকে ছেড়ে দাও, ফ্র্যাঙ্ক। আমাকে এখান থেকে বেরোতে দাও।'

মরগ্যান ফিরে তাকাল কিটসনের দিকে, 'আমার কথা তোমার কানে যায়নি? ক্যারাভ্যান বন্ধ করে বুইকের চাকা খুলতে শুরু করো!'

কিটসন ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করে ফিরে চলল। মানসিক উত্তেজনা ওর স্নায়ুমণ্ডলীকে অস্থির করে তুলছে, মুখের রং-কাগজের মতো সাদা। বুইকের পিছনের ঢাকনা তুলে ও একটা স্ক্রু-জ্যাক বের করে আনল। আসন্ন নৃশংস অধ্যায়ের কথা ভেবে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল। কিটসন জ্যাক নিয়ে এগিয়ে গেল বুইকের সামনের চাকার দিকে। জ্যাক ঘুরিয়ে গাড়িটাকে মাটি থেকে তুলতে লাগল সে...

মরগ্যান নির্লিপ্ত শীতল স্বরে তখন জিপোকে সাবধান করে দিচ্ছে, 'শোনো জিপো, এখন থেকে তুমি তোমার টাকার অংশ উপার্জন করার চেষ্টা করো! এ পর্যন্ত তো শুধু হাওয়ায় গা-লাগিয়ে ঘুরেছ। কিন্তু এখন আর ওটি হচ্ছে না। সুতরাং এবার কঠিন কাজের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নাও। ইস্পাতের এই হতচ্ছাড়া ঢাকনাটা তোমাকে খুলতেই হবে!'

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে জিপো এগিয়ে এল ইস্পাত আবরণীর কাছে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওটার দিকে।

ব্লেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিপোকে লক্ষ করতে লাগল। একবার সে দেখছে জিপোর দিকে, আবার মরগ্যানের দিকে...আবার জিপোর দিকে। চোখের ভাষায় অস্বস্তির ইঙ্গিত।

জিপো দেখল, ইস্পাতের চাদরটা তেমন মজবুত নয়; ট্রাকের দরজার মতো এটার পিছনে তেমন যত্ন নেয়নি ওয়েলিং এজেন্সি।

দু-পলক দেখে মরগ্যানও সেটা বুঝতে পারল।

'যাও, ছোট শাবল আর হাতুড়িটা নিয়ে এসো! এটাকে ভেঙে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না।'

জিপোর সারা শরীর কুঁকড়ে গেল। ইস্পাতের ঢাকনা ভাঙার পরের মুহূর্তটার কথা মনে পড়ল ওর। কর্কশ স্বরে সে বলে উঠল, 'টমাস ভেতরে বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমাকে দেখামাত্রই ও সরাসরি গুলি করবে, এক সেকেন্ডও দেরি করবে না।'

মরগ্যান খেঁকিয়ে উঠে জবাব দিল, 'যা বলছি, চটপট করো!'

যন্ত্রপাতি রাখার বাক্স খুলে হাতুড়ি নিল জিপো। তারপর থেকে একটা ছোট শাবল নিয়ে এগিয়ে এল। ওর হাত এত বিশ্রীভাবে কাঁপছে, মনে হচ্ছে এখুনি বোধ হয় শাবল আর হাতুড়িটা ওর হাত থেকে খসে পড়বে।

'শিগগির করো! জলদি!' অধৈর্য স্বরে চেঁচিয়ে উঠল মরগ্যান, 'এত ভয় পাওয়ার কী আছে তা-তো বুঝতে পারছি না!'

‘টমাস যদি আমাকে গুলি করে তাহলে ট্রাক খুলবে কে?’ উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল জিপো; অস্ত্র হিসেবে মরগ্যানের নাকের ডগায় ছুড়ে মারল ওর তুরুপের তাস। কাজ হল।

ক্রোধে, বিরক্তিতে গভীর নিঃশ্বাস নিল মরগ্যান, ‘দাও, ও দুটো আমার হাতেই দাও!...শালা, ভিতুর ডিম ‘হিংস্রভাবে দাঁত বের করল সে, ‘দাঁড়াও, তোমাকে আর তোমার ওই নদের চাঁদ ইয়ারকে আমি শায়েস্তা করছি। তোমরা দুজন যদি মনে করে থাক,পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকলেই দু-লাখ ডলার করে পাওয়া যাবে, তবে ভীষণ ভুল করবে!’

সেই মুহূর্তে যদি জিপোকে এই ভয়াবহ পরিবেশ থেকে মুক্তি দিয়ে পৌঁছে দেওয়া হত ওর শান্ত নির্জন কারখানায়, তাহলে খুশি মনেই ও নিজের টাকার অংশ ছেড়ে দিয়ে ফিরে যেত ওর অভাব-অনটনের সংসারে —সুখের সংসারে।

হাতুড়ি আর শাবলটা জিপোর হাত থেকে হ্যাঁচকা মেরে কেড়ে নিল মরগ্যান। শাবলটাকে ইস্পাতের ঢাকনা ও জানলার জোড়ের মুখে ঠেকিয়ে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করল। শাবলটা ইস্পাতের চাদরকে সামান্য ঠেলে ঢুকে গেল ভেতরে। ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা-মেরে শাবলটা যখন ভেতরে ইঞ্চি ছয়েক ঢুকে গেল, তখন থামল মরগ্যান। হাতুড়ি ফেলে ব্লেকের দিকে ঘুরে তাকাল।

‘জিপোর মতো তুমিও কি ভয়ে কেলিয়ে পড়লে?’

কাঁধের খাপ থেকে .৩৮ রিভলভারটা হাতে নিয়ে মরগ্যানের কাছে সরে এল ব্লেক, ‘তুমি রেডি হলেই আমি রেডি।’ নির্বিকার কঠিন মুখে জবাব দিল সে। চোখজোড়ায় দৃঢ় সিদ্ধান্তের সুনিশ্চিত আভাস।

মরগ্যান দাঁত বের করে বাঁকাভাবে হাসল, ‘কী ব্যাপার, তুমি কি এখন নিজের দু-লাখ ডলারকে বাঁচাতে চাইছ?’

‘বাজে কথা ছাড়ো, ফ্র্যাঙ্ক; কাজ শুরু করো। টমাসের মোকাবিলা করার জন্যে আমি রেডি।’

মরগ্যান শাবলের প্রান্তে সবলে চাপ দিতে যাবে, ভেসে এল পরপর তিন বার ক্যারাভ্যানের গায়ে টোকা দেওয়ায় শব্দ। মুহূর্তে মরগ্যান যেন জমে পাথর হয়ে গেল।

‘সাবধান! কেউ আসছে!’ চাপা স্বরে বলে উঠল সে।

জানলার কাছে সরে গিয়ে পরদা সরিয়ে উঁকি মারল ব্লেক।

জিনি ঠিক রাস্তার ধারেই গুছিয়ে বসেছিল; ওর কাছ থেকে গজ কয়েক দূরেই এসে দাঁড়িয়েছে একটা গাড়ি, তার পিছনে একটা ক্যারাভ্যান। সম্ভবত, তাদের মতোই আরও কেউ ক্যারাভ্যান নিয়ে চলেছে ফন হ্রদের দিকে।

একজন রোদে-পোড়া লালমুখো মধ্যবয়স্ক লোক খুশি খুশি মুখে নেমে এল গাড়ি থেকে। তার সঙ্গিনী একজন সুশ্রী মহিলা ও একটি বছর দশ-বারোর বাচ্চা ছেলে। ওরা গাড়িতে বসেই বুইক ও ক্যারাভ্যানকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগল। ব্লেকের কানে এল মধ্যবয়স্ক লোকটার হেঁড়ে গলা, ‘কী ব্যাপার? চাকা বিগড়েছে মনে হচ্ছে?’ জিনিকে লক্ষ করে বলল সে, ‘বলেন তো সাহায্য করি—’

জিনি তার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল, ‘না, না—তার কোনও দরকার। আমার স্বামী একাই পারবেন। ধন্যবাদ;’

‘আপনারা কী ফন হ্রদের দিকেই যাচ্ছেন?’ জানতে চাইল লোকটা!

‘হ্যাঁ।’

‘আমরাও সেখানেই যাচ্ছি; গত গ্রীষ্মের ছুটিতেও গিয়েছিলাম। আপনারা আর কোনওদিন ওখানে গেছেন নাকি?’

‘উহুঁ।’ মাথা নাড়ল জিনি।

‘দেখবেন, খুব ভালো লাগবে জায়গাটা। এক কথায় চমৎকার! তার ওপর সুব্যবস্থা তো আছেই! ওহ্ হো,আমার নামটাই আপনাকে বলা হয়নি—’ লজ্জায় জিভ কাটল লোকটা! যেন ভীষণ একটা অপরাধ করে ফেলেছে, ‘আমার নাম ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড। ওই যে গাড়িতে বসে আছে—আমার স্ত্রী—মিলি, আর ওঁর পাশেই আমার ছেলে। আপনাদের ছেলেমেয়েদের দেখছি না?’

ব্র্যাডফোর্ডের কথায় জিনি খোলা হাসিতে ফেটে পড়ল। ওর হাসির স্বাভাবিকতা ব্লেককেও অবাক করল। সত্যি, মেয়েটা অভিনয় জানে বটে!

জিনির হাসিতে ব্র্যাডফোর্ড অপ্রস্তুতে পড়তেই ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ‘না, এখনও পর্যন্ত নেই। আমরা হানিমুন কাটাতে ফন হ্রদে যাচ্ছি।’

এবার ব্র্যাডফোর্ডের হাসবার পালা। সে নিজের উরুতে এক প্রচণ্ড চাপড় কষিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। হাসির দমকে তার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল।

‘ও—দারুণ দিয়েছেন! আরে শুনছ, মিলি! ওরা কোথায় হানিমুন কাটাতে যাচ্ছে, আর আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করছি ওদের ছেলেমেয়ে আছে কি না! হোঃ-হোঃ-হোঃ...।’

‘তোমার সব সময়েই ওই রকম।’ গাড়ি থেকে বলে উঠলেন মহিলাটি। স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় তিনি যে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন, সেটা তার কোঁচকানো ভুরু দেখলেই বোঝা যায়, ‘চলে এসো, ফ্রেড—তুমি শুধু শুধু ওকে বিরক্ত করছ।’

ব্র্যাডফোর্ড সরলভাবে একগাল হাসল, ‘হ্যাঁ—ঠিক বলছ। আমার ও তাই মনে হয়...আচ্ছা, তাহলে চলি মিসেস...এই দেখুন কাণ্ড, আপনার নামটা তো একেবারেই জানা হয়নি!’

‘হ্যারিসন। আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।’

তাতে কী হয়েছে। হয়তো ফন হ্রদে গিয়েই আমাদের আবার দেখা হবে, তখনই এই বকেয়া আলাপের পালাটা সেরে নেওয়া যাবে। আর নিতান্তই যদি দেখা না হয়, তাহলে আপনাদের শুভ মধুচন্দ্রিমা কামনা করি।’

‘ধন্যবাদ!’

ব্র্যাডফোর্ড পায়ে পায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল পাহাড়ি রাস্তা ধরে।

মরগ্যান ও ব্লেক অস্বস্তিভরা চোখে তাকাল পরস্পরের দিকে।

‘এখন যদি টমাস রিভলবার চালাতে শুরু করে তাহলে ওরা গুলির শব্দ শুনতে পাবে।’ ব্লেক চিন্তিতভাবে বলে উঠল।

‘পেলে পাক।’ মরিয়া হয়ে বলল মরগ্যান, ‘এই বনে কেউ শিকার করে না? ওরা ভাববে কোনও শিকারী শিকারের পিছনে ছুটছে।’ শাবলটা শক্ত হাতে চেপে ধরল সে, ‘এসো, কাজ শুরু করা যাক।’

এমন সময় জানলা দিয়ে ডেকে উঠল কিটসন, ‘কী ব্যাপার, কী ব্যাপার, কী হচ্ছে ভেতরে?’

মরগ্যান চাড় দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, তুমি যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলেই আমাদের সাবধান করে দেবে। আমরা আর দেরি করতে পারছি না!’

কিটসন শিউরে উঠে কয়েক পা-পিছিয়ে গেল। ওর সারা শরীর যেন হঠাৎ গুলিয়ে উঠল।

মরগ্যান ক্যারাভ্যানের জানলাগুলো বন্ধ করে দিল, ব্লেকের দিকে ফিরে ঘাড় নাড়ল, ‘এসো এড—তাহলে শুরু করা যাক।’

‘চলো।’

মরগ্যান শাবলটা ধরে নীচের দিকে এক হ্যাঁচকা মারতেই জিপো ভয়ে মুখ ঢাকল দু-হাতে।

ওয়েলিং এজেন্সির ট্রাক চালক ডেভ টমাস পড়ে ছিল ট্রাকের মেঝেতে। চৌচির, রক্তাক্ত চোয়ালের যন্ত্রণা এখন সমস্ত অনুভূতিকে অসাড় করে দিয়েছে। শুধু অপরাজিতের একরোখা সাহসকে সম্বল করে সে কোনওরকমে বেঁচে আছে।

মরগ্যানের রিভলভারের গুলি তার মুখের নিম্নাংশকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। যাওয়ার পথে টমাসের চোয়ালের হাড় চুরমার করে, জিভকে দু-ফালি করে সরাসরি বেরিয়ে গেছে গুলিটা।

এই আকস্মিক আঘাত ও যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া টমাসের মস্তিস্কের দীর্ঘ সময়ের জন্যে আচ্ছন্ন রেখেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই তার জ্ঞান ফিরেছে। সঙ্গে সঙ্গেই টমাস অনুভব করেছে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে সে ভীষণ দুর্বল পড়েছে।

চেতন ও অচেতন জগতের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ভাবতে চেষ্টা করল টমাস। চালকহীন ট্রাকটা কী করে ছুটে চলেছে, ভেবে সে অবাক হল।

আয়ু যে ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে, সেটা বুঝতে দেরি হল না তার। কারণ এইভাবে এক নাগাড়ে রক্তপাত হওয়ার পরে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা যে অত্যন্ত ক্ষীণ তা টমাস জানে। তবে মরতে সে ভয় পায় না। এখন যদি কোনও বিচিত্র মন্ত্রবলে সে বেঁচেও ওঠে, তবুও খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। কারণ একটা ফাটা চৌচির চোয়াল নিয়ে ও আধখানা জিভ নিয়ে লোকসমাজে কী করে মুখ দেখাবে সে? তাছাড়া বোবা হয়ে বাকি জীবনটা কাটানোর যন্ত্রণা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

এবার টমাসের মনোযোগ আকৃষ্ট হল ট্রাকের এপাশ-ওপাশ টলমল দোলানির দিকে। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে সিদ্ধান্ত নিল, ট্রাকটাকে কোনও গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নাঃ, মতলবটা মন্দ নয়, কিন্তু এরা কি পারবে শেষ রক্ষা করতে? আপাতত তার কর্তব্য হল পুলিশকে সিগন্যাল পাঠানো, পুলিশকে জানানো ট্রাকের অবস্থিতির কথা। যেখানেই ওটা লুকোনো থাকুক না কেন, পুলিশ ঠিক খুঁজে বের করবেই।

টমাসের মনে হল, বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে এখুনি তার কাজটা করা উচিত। কিন্তু বেতার যন্ত্রটা ঠিক তার পিছনে-ওপর দিকে। অর্থাৎ ওটার নাগাল পেতে হলে তাকে একপাশে হাত বাড়াতে হবে ওপরে।

এতক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকার ফলে যন্ত্রণার অনুভূতিটা ক্রমশ ফিকে হয়ে এসেছিল, কিন্তু পাশ ফেরামাত্রই আবার নতুন করে শুরু হবে অসহ্য যন্ত্রণা।

সুতরাং চোখ বুজে একইভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল টমাস। ভাবতে লাগল নেকড়ের হিংস্রতায় ভরা মুখটার কথা, সাপ কালো, শীতল চোখ জোড়ার কথা—সেই লোকটার কথা, যে তাকে গুলি করেছে। লোকটার পরিচয় ভেবে অবাক হল টমাস। আর ওই মেয়েটা, যে স্পোর্টস কারটা চালাচ্ছিল সেও নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে। ওদের পুরো মতলবটা প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে ওই দুর্ঘটনার দৃশ্যটা। কিন্তু তবুও ডার্কসন কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি। ও সরাসরি বেতারে খবর দিয়েছিল এজেন্সিতে, জানতে চেয়েছিল তাদের কর্তব্য। তা না হলে এজেন্সি তাদের কর্মদক্ষতা ও বিচারবুদ্ধির ওপর সন্দিহান হয়ে পড়ত। মোটের ওপর, এজেন্সির নির্দেশ পেয়েই তারা ওই দুর্ঘটনার তদন্ত করতে এগিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তাতে পরিণতির খুব একটা অদল-বদল কিছু হয়নি।

কিন্তু ওই ফুলের মতো কচি মেয়েটা কী করে এই নৃশংস ভয়ঙ্কর কাজে জড়িয়ে পড়ল! তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে ভাবল টমাস।

মেয়েটার কথায় টমাসের মনে পড়ল ক্যারির কথা—তার তেরো বছরের ছোট্ট মেয়েটার কথা।

ক্যারির মাথার চুল অনেকটা ওই মেয়েটার মতোই, তামাটে। কিন্তু ওর মতো ক্যারি অতটা সুন্দরী নয়। অবশ্য ক্যারির বয়েস এখনও অনেক কম—বড় হলেও যে আরও সুন্দরী হবে না সেকথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সেটা নেহাতই ভাগ্যের ব্যাপার।

ক্যারি তাকে খুব শ্রদ্ধা করে, বলে, ওর বাবার মতো সাহসী লোক আর নেই। নইলে দশ লক্ষ ডলার ভর্তি একটা ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

টমাস ভাবল : ক্যারি যদি আমাকে এই অবস্থায় এখানে পড়ে থাকতে দেখত; তাহলে আমাকে ঘিরে ওর কাচের আবরণে ঢাকা সমস্ত স্বপ্নই ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। সামান্য একটু ব্যথার ভয়ে, আমি পাশ ফিরে বেতারে খবর পাঠাতে পারছি না দেখলে লজ্জায় ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত।

ট্রাকের টাকা রক্ষা করার জন্যে টমাস যদি জীবনও দিয়ে দেয়, তবুও ক্যারি এতটুকু দুঃখ পাবে না। বরং বন্ধুদের বলবে তার বাবা কিভাবে বীরের মতো প্রাণ দিয়েছে। না, ওর কাছে ছোট হতে টমাস পারবে না।

এখন ট্রাক বাঁচাতে তার করণীয় কাজ দুটো: প্রথমত, বেতারে বিপদ সংকেত ছড়িয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, বোতাম টিপে সময়-নির্ভর তালাকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অকেজো করে দেওয়া।

তালাকে অকেজো করার বোতামটা রয়েছে স্টিয়ারিং হুইলের ঠিক পাশে। ওটার নাগাল পেতে হলে টমাসকে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে পড়তে হবে। কিন্তু সেই সামান্য নড়াচড়ায় তার ভাঙা চোয়ালের যে কী হাল হবে, সেকথা ভেবে সে ঘামতে লাগল।

ক্যারি ট্রাক রক্ষা করার ব্যাপারে টমাসকে সমর্থন করলেও, হ্যারিয়েট—তার স্ত্রী যে করবে না, সেটা টমাস ভালোই জানে। হ্যারিয়েট বুঝবে টমাসের বর্তমান অবস্থাটা, কিন্তু ক্যারি যে ছোট, ক্যারি যে অবুঝ! এজেন্সিও চাইবে টমাস আগে ট্রাক রক্ষা করুক, পরে তার শরীর নিয়ে ভাববে, কিন্তু তার অবস্থাটা ওরা কেউ বুঝতে চাইবে না। তবে সে যদি মরিয়া হয়ে ট্রাক বাঁচানোর চেষ্টা করে, তবে এজেন্সি হয়তো তার কাজে খুশি হয়ে হ্যারিয়েট ও ক্যারির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে। অবশ্য সে বিষয়ে টমাস পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। কিন্তু তার অকর্মণ্যতার ফলে যদি এই লুটেরার দল ট্রাকের তালা ভেঙে সমস্ত টাকা হাতিয়ে নেয়, তবে এজেন্সি মনে করবে ট্রাক রক্ষা করার যথাযথ চেষ্টা টমাস করেনি, এবং তার ফলে হ্যারিয়েটকে বাকি জীবনটা কষ্ট করেই কাটাতে হবে। হয়তো পেনসনের কোনও টাকাই ওরা তার স্ত্রীকে দেবে না!

সে ভাবল: অতএব, নাও এবার একটু সাহসী হও। বেতার সংকেত পাঠানোই যখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তখন সেটাই প্রথমে চালু করার চেষ্টা করো। শুধু তো পাশ ফিরে হাত উঁচু করে চাবিটা টিপে দেওয়া, ব্যস! বোতামটা ঠিক তোমার মাথার ওপরেই। সুতরাং অসুবিধের কিছু নেই: ওটা চালু করে দাও, তার দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুলিশের গাড়িতে ছেয়ে যাবে গোটা এলাকাটা। তখন লোকের চোখে তুমি হয়ে থাকবে সাহসিকতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। একবার চেষ্টা করেই দেখো না, সামান্য একটু কষ্ট—এই তো?

কিন্তু সাহস করে প্রস্তুত হতে হতেই টমাসের লেগে গেল মিনিট পাঁচেক। অবশেষে সে যখন পাশ ফিরতে চেষ্টা করল, সঙ্গে-সঙ্গেই যন্ত্রণার তীব্র ছুরি কেটে বসল তার হৃৎপিণ্ডে। সে মুহূর্তে আবার জ্ঞান হারাল টমাস। স্থির হয়ে পড়ে রইল তার অসাড় দেহটা। হাতুড়ি পেটার অপ্রত্যাশিত বিকট শব্দে টমাসের ঘুম ভাঙল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলল সে। তার চোখের সামনেই ড্রাইভারের জানলার ওপর ইস্পাতের ধাতব আবরণ। তার চোখে পড়ল, জানলা ও ইস্পাতের পাতের ফাঁক দিয়ে এসে পড়া এক চিলতে মধ্যাহ্নের আলো। দৃষ্টি ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসতেই সে দেখল, একটা শাবল আংশিক ঢুকে রয়েছে ইস্পাত আবরণী ও জানলার ফাঁকে।

তাহলে ওরা আমাকে শেষ করতে আসছে। ভাবল টমাস। যাক, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু যদি একটা সুযোগও আমি পাই, তাহলে আমার সঙ্গে ওদের একজনকেও স্বর্গের সিঁড়িতে পা-রাখতে হবে। আমার পক্ষে এ অবস্থায় এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মাইকের মৃত্যুর প্রতিশোধ যদি আমি না নিই, তাহলে সে আমার সম্বন্ধে ভাববে কী! ওদের জনা দুয়েককে শেষ করতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু যে অবস্থায় আমি পড়ে আছি, তাতে একজনকে খতম করতে পারলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

দুর্বল হাতে সে নিজের রিভলভার বের করার চেষ্টা করল। মরগ্যান গুলি করার সময় রিভলভার ব্যবহারের সুযোগ টমাস পায়নি। তাই এবারে সে আগে থেকেই প্রস্তুত হতে চায়।

টমাসের রিভলভার .৪৫ অটোমটিক কোল্ট। সুতরাং স্বভাবতই একটু ভারী। কিন্তু খাপ থেকে রিভলভারটা হাতে নিতেই তার মনে হল যেন অসহ্য-ভারে হাত ভেঙে পড়তে চাইছে। আরেকটু হলেই পড়েও যাচ্ছিল বন্দুকটা। অতিকষ্টে হাত নামিয়ে সে ওটাকে নামিয়ে আনল তার ডান পাশে। বন্দুকের নলটা তাক করে রইল ট্রাকের জানলার দিকে। যে জানলায় দেখা যাচ্ছে শাবলের আংশিক অগ্রভাগ।

ঠিক আছে শালা, এসো এবার! ভাবল টামাস, আমার একদিন কি তোমার একদিন! এমন চমকে দেব, জীবনভর ইয়াদ রাখবে! আর বেশিক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। তাড়াতাড়ি করো! মরবার আগে জীবনের শেষ যুদ্ধে আমি জিততে চাই।

এমন সময় তার কানে এল কারও চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, ‘সাবধান! কেউ আসছে!’

এরপর দীর্ঘ নীরবতা। টমাস অনুভব করল, আচ্ছন্ন অনুভূতি ক্রমশ তার মস্তিষ্ককে স্থবির করে দিতে চাইছে। একমাত্র মনের জোরকে সম্বল করে লড়ে চলল সে। কোনওরকমে জাগিয়ে রাখল তার মনের চেতনা।

আপন মনেই উচ্চারণ করল টমাস, ‘তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি! এ অবস্থা আমি আর সইতে পারছি না!’

হঠাৎই টমাস শুনতে পেল কারও উত্তেজিত স্বর, ‘এখন যদি টমাস রিভলভার চালাতে শুরু করে তাহলে ওরা গুলির শব্দ শুনতে পাবে।’

আরেকজন বলে উঠল, ‘পেলে পাক। এই জঙ্গলে কেউ কি শিকার করে না? ওরা ভাববে কোনও শিকারী শিকারের পেছনে ছুটছে। এসো, কাজ শুরু করা যাক।’

টমাসের হাতে কোল্ট রিভলভার ক্রমশ ভারী ঠেকছে। সে বুঝল, আর বেশিক্ষণ জানলা লক্ষ করে তাকিয়ে থাকা সম্ভব হবে না। ওরা ট্রাকের সাইড-ডোর না খোলা পর্যন্ত তাকে এইভাবে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর দরজা খুললেই টমাস সরাসরি গুলি চালাবে। তখন আর সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

তার কানে এল শাবলে চাড় দেওয়ার ধাতব শব্দ। টমাস প্রতীক্ষায় রইল। যন্ত্রণায় তার শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝি রুদ্ধ হয়ে আসবে। কিন্তু কোণঠাসা হিংস্র, চিতার মতো সে একাগ্রভাবে অপেক্ষা করে চলল।

‘আরেকটা শাবল নিয়ে এসো।’ কারও স্বর শোনা গেল, আমাকে সাহায্য করো।’

আর একটা শাবলের অগ্রভাগ জানলার ফাঁকে অবির্ভূত হল। বেশ কিছুক্ষণ ঠুকঠাক শব্দের পর সড়াৎ করে ওপরে উঠে গেল ইস্পাতের চাদর। না, দুটো শাবলে কাজ হয়েছে। ভাবল টমাস। চার চোখের দৃষ্টি আবদ্ধ হল ট্রাকের খোলা জানলায়।

মরগ্যান আর ব্লেক দুজনেই সরে দাঁড়াল জানলার কাছ থেকে। দরজার দুপাশে ওরা কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কোনওরকম শব্দই ওদের কানে এল না। ওরা তাকাল পরস্পরের দিকে—মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

‘শালা চালাকি করছে না তো?’ হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল ব্লেক।

‘হতে পারে।’

দরজার কাছ থেকে নিজের দেহকে যথাসম্ভব সরিয়ে রেখে জানলা দিয়ে ভেতরে হাত গলিয়ে দিল মরগ্যান। হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে চলল দরজার খোলার হাতলটা।

টমাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগল মরগ্যানের কার্যকলাপ। তার চোখ আধবোজা; তর্জনী চেপে বসেছে রিভলভারের ট্রিগারে; সাফল্যের অনিশ্চয়তায় তার মন সামান্য শঙ্কিত।

অবশেষে দরজাটা খুলে ফেলল মরগ্যান। দরজার পাল্লাটা ঘুরে গিয়ে থামল ব্লেকের সামনে। সুতরাং ইচ্ছে করলেও ব্লেকের পক্ষে ট্রাকের ভেতরে নজর চালানো সম্ভব হল না। একদিকে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল,অন্যদিকে ট্রাক, এবং সামনে ট্রাকের খোলা দরজার পাল্লা-একরকম বন্দিই হয়ে পড়ল ব্লেক।

মরগ্যান ট্রাকের ভেতর চোখ রাখল। বিদ্যুৎগতিতে ভেতরে উঁকি মেরেই বাইরে বের করে আনল শরীরটাকে।

সেই কয়েক মুহূর্তে সে দেখল, একটা লোক বিশ্রস্তভাবে ট্রাকের মেঝেতে পড়ে রয়েছে, চোখ তার বোজা, মুখের রং ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে।

মরগ্যানের শ্বাস-প্রশ্বাস দাঁতের ফাঁক দিয়ে শোনা গেল। ব্লেকের দিকে ফিরে চাপা স্বরে সে বলল, 'কোনও ভয় নেই; ও মারা গেছে।'

টমাস মনে মনে ভাবল: পুরোপুরি নয়, বন্ধু। একটু পরেই তুমি সেটা জানতে পারবে। যমের দুয়ারে এক পা-বাড়িয়ে আছি ঠিকই, কিন্তু ভেতরে এখনও ঢুকিনি।

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে রিভলভার ধরা হাতটা ঈষৎ উঁচিয়ে ধরল টমাস। বন্দুকের হিমালয়প্রমাণ ভারে সে যেন নুয়ে পড়বে। ঠিক সেই মুহূর্তে আস্তে আস্তে, সতর্ক ভঙ্গিতে ট্রাকের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল মরগ্যান।

মরগ্যানের বন্দুকটা টমাসের দিকে নিশানা করা; কিন্তু সেটা নিছকই অতিরিক্ত সাবধানতাবশে। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস টমাস মৃত। ওই রকম একটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মুখ নিয়ে, আর মৃতের মতো রক্তহীন, পাণ্ডুর শরীর নিয়ে কারও পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

'ওকে এখান থেকে বের করে বাইরে কবর দেওয়া যাক, কী বলো?' ব্লেকের দিকে ফিরে তাকাল মরগ্যান। ব্লেক তখন কৌতূহলভরে জানলা নিয়ে ভেতরে ঝুঁকে পড়ে টমাসকে দেখছে। কিন্তু খোলা দরজার পাল্লাটা তার সামনে অবরোধের সৃষ্টি করায় ট্রাকের ভেতরে সে ঢুকতে পারছে না।

এমন সময় টমাস চোখ খুলে তাকাল।

'সাবধান!' প্রচণ্ড চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার বের করতে চেষ্টা করল ব্লেক। কিন্তু দরজাটা তার শরীরে চেপে বসায় সে অসুবিধেয় পড়ল।

মরগ্যান ওকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই টমাস ট্রিগার টিপল।

দুটো বন্দুকের শব্দ ঠিক এক মুহূর্তে বিস্ফোরিত হল—যেন একটা গুলিরই শব্দ। মরগ্যানের রিভলভার নিক্ষিপ্ত গুলিটা বিঁধল গিয়ে টমাসের গলায়—সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল সে।

কিন্তু টমাসও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তার গুলি সোজা গিয়ে আঘাত করেছে মরগ্যানের পেটে। হাঁটু ভেঙে ট্রাকের ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মরগ্যান। তার দেহ গিয়ে পড়ল টমাসের কোলে।

ভাঙা কর্কশ গলায় এক তীব্র আর্তনাদ করে উঠল জিপো।

এক দীর্ঘ মুহূর্ত ধরে স্থির হয়ে রইল ব্লেক। তারপর চটকা ভাঙতেই ট্রাকের দরজাটা ঠেসে ধরল মরগ্যানের বেরিয়া থাকা পায়ে। কোনওরকমে একপাশ হয়ে ক্যারাভ্যানের দেওয়াল ও ট্রাকের দরজার ফাঁক দিয়ে এদিকে এসে দাঁড়াল সে।

ঘষা কাচের মতো স্বচ্ছ, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকাল মরগ্যান, 'শেষ পর্যন্ত আমি হেরে গেলাম এড।' বিড়বিড় করে বলতে চেষ্টা করল সে। তার স্বর এতই অস্পষ্ট যে ব্লেকের বুঝতে বেশ কষ্ট হল, 'তবে টাকাটা তোমাদের কাজে আসবে। তোমাদের প্রত্যেকেরই কাজে লাগবে এই দশ লাখ ডলার...গুড লাক...।'

ব্লেক সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎই তার খেয়াল হল, সে এক অদ্ভুত চিন্তা করে চলেছে, যদি শেষ পর্যন্ত ট্রাকের তালা ভাঙতে পারে, তাহলে দু-লাখ ডলারের জায়গায় তারা প্রত্যেকে আড়াই লাখ করে পাবে। কারণ পাঁচের জায়গায় তাদের অংশীদারের সংখ্যা এই মুহূর্ত থেকে চারজন!

আট

একটা শোবার ঘর, একটা বসবার ঘর, একটা ছোট রান্নাঘর, এবং তার চেয়েও ছোট একটা স্নানঘর—এ নিয়েই গোটা কেবিনটা।

শোবার ঘরে দুটো বিছানা—আধুনিকভাবে সাজানো-গোছানো, তাছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তো আছেই। বসবার ঘরটাও চেয়ার, সোফা ইত্যাদিতে ছিমছামভাবে সাজানো। অর্থাৎ সামান্য কষ্ট সহ্য করলে চারজনের শোবার পক্ষে কোনওরকম অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

হ্রদের একপান্তে অবস্থিত এই কেবিনটা; এবং অন্যান্য কেবিনগুলোর থেকে একেবারেই বিছিন্ন। কেবিন ভাড়া দেওয়ার জন্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি বেশ সবজান্তার হাসি ফুটিয়ে জিনিকে বলেছে, এই কেবিনটা বিশেষভাবে মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যই তৈরি। নেহাত ওদের ভাগ্য ভালো, তাই খালি পেয়েছে। কারণ এই কেবিনে আগে যারা ছিল, তারা গতকাল রাতেই ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

কর্মচারীটির নাম হ্যাডফিল্ড। জিনি আর কিটসন যখন এখানে এসে পৌঁছল, তখন সে সোজা বুইকে, ওদের পাশে এসে বসেছে। রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেছে ওদের ঈপ্সিত কেবিনের দিকে।

মাঝে মাঝে অবাক চোখে কিটসনের দিকে দেখছিল হ্যাডফিল্ড। ভাবছিল, ভদ্রলোককে কেমন যেন উত্তেজিত দেখাচ্ছে, সেই তখন থেকে প্রায় চুপচাপ বসে রয়েছেন—ব্যাপার কী? কে জানে, হয়তো আসন্ন ফুলশয্যার রাতের কথা ভেবে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এরকম সুন্দরী বউয়ের সঙ্গে একান্ত সহবাসে বিব্রত বোধ করার কোনও কারণ খুঁজে পেল না হ্যাডফিল্ড।

মেয়েটাও যেন কেমন বিচলিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য সেটা স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যেক সুন্দরী মেয়েই মধুচন্দ্রিমার নামে কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আবেগভরে ভাবল হ্যাডফিল্ড। জিনিকে সহজ করার অনেক চেষ্টাই করল সে। ওদের দেখিয়ে দিল কোথায় ক্যারাভ্যান রাখতে হবে, কোথায় হ্রদে বেড়ানোর জন্যে নৌকা ভাড়া পাওয়া যাবে—কেবিনটা তো দেখিয়ে দিলই। আরও বলল, কেউ কখনও তাদের বিরক্ত করবে না। মোটের ওপর নিজেদের খুশিমতো তারা দিন কাটাতে পারবে।

'এখানকার লোকেরা বেশ মিশুকে মিসেস হ্যারিসন।' দরজা খুলে কেবিনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওদের দেখাল হ্যাডফিল্ড। জিনিকে যেন আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল, 'তারা সবসময়েই আপনাদের সুখ-সুবিধের দিকে নজর রাখবে, গল্প-সল্প করবে... তবে আমার মনে হয়, আপনার বোধ হয় নির্জনতাই বেশি পছন্দ করবেন—অন্তত প্রথম কয়েকদিন, কী বলেন?' কিটসনের দিকে ফিরে চোখ টিপল হ্যাডফিল্ড। কিন্তু কিটসন নির্লিপ্তভাবে অপলকে তার দিকে চেয়ে রইল। হ্যাডফিল্ড বলে চলল, 'যাকগে ও নিয়ে ভাববেন না, কেউই আপনাদের বিরক্ত করবে না।'

একমাত্র অন্ধকারের প্রতীক্ষা করা ছাড়া ওদের চারজনের আর কোনও উপায় ছিল না। এবং ঘটনাবহুল সারাদিনে ওই প্রতীক্ষার সময়টুকুই তাদের কাছে অসহ্য এবং ক্লান্তিকর বলে মনে হয়েছে। জিনি কেবিনে পৌঁছেই সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে: সটান শুয়ে পড়েছে বিছানায়। সারাদিনের পরিশ্রমে অল্পক্ষণের মধ্যেই ও গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে। কিটসন বাইরে বসে পাহারায় থেকেছে। একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করেছে, আর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ক্যারাভ্যানের ওপর। ব্লেক ও জিপোকে নিরুপায় হয়েই ক্যারাভ্যানের ভেতর থাকতে হয়েছে। সেখানে ওদের সঙ্গী হয়েছে টমাস ও মরগ্যানের মৃতদেহ, না সময়টা খুবই খারাপ কেটেছে ওদের।

অন্ধকার নেমে আসার পর জিপো বা ব্লেক আর দেরি করেনি। চলে এসেছে কেবিনের ভেতর।

পরিশ্রান্ত জিপোর অবস্থা তখন ব্লেকের চেয়েও খারাপ। সে এসেই ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে দু-হাতে মুখ ঢাকল। চার চোয়ালের পাশ বরাবর একটা লম্বা কাটা দাগ। ব্লেকের আঘাতের ফলেই ওই ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ফন হ্রদে আসার পথে জিপো হঠাৎ ক্যারাভ্যানের দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা

করেছিল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সে ক্যারাভ্যানের ধাতব দেওয়ালে পাগলের মতো মাথা খুঁড়ছে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো একরোখাভাবে ব্লেকের সঙ্গে সমানে যুঝে গেছে। কোনও বাধা শোনেনি।

অবশেষে ব্লেক তার চোয়ালে লক্ষ করে সজোরে ঘুষি মেরেছে। এছাড়া জিপোকে সামলানোর কোনও উপায় ছিল না। তারপর যখন তার জ্ঞান ফিরছে, সে চুপচাপ অবসন্নভাবে বসে থেকেছে ক্যারাভ্যানের মেঝেয়। আটটি ঘণ্টা ওদের কাটাতে হয়েছে ক্যারাভ্যানের ভেতরে—অন্ধকারের প্রতীক্ষায়। মাছির দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ওরা শক্ত করে এঁটে দিয়েছে ক্যারাভ্যানের জানলাগুলো। তারপর বসে বসে সময় গুনছে। না, এ অভিজ্ঞতার কথা ওরা সহজে ভুলবে না।

মরগ্যান ও টমাসের মৃতদেহ নিয়ে ব্লেক আর কিটসন গেছে অন্ধকার ঘন জঙ্গলের ভেতরে। ওদের করব দেওয়ার জন্যে খুঁজে বের করছে উপযুক্ত জায়গা। জিপোর নানান যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল একটা বেলচা—সুতরাং জায়গা খুঁজে বের করার পর ওরা পালা করে মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে—বলা বাহুল্য ওই বেলচা দিয়েই।

বিষণ্ণ চাঁদের মরা আলোয় ব্লেক ও কিটসন চুপচাপ, নিঃশব্দে কাজ করে চলল। কিন্তু দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠাকে সঙ্গী করে সর্বদাই ওদের সতর্ক থাকতে হল। কারণ অদূরেই খোলা হ্রদের নীল জলে নৈশবিহারে ব্যস্ত দম্পতিদের কথোপকথন নৌকো থেকেই স্পষ্ট কানে আসছে। তাছাড়া হ্রদের পাড়ে পায়চারিরত অতিথিদেরও তারা দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎই ওরা কাজ থামিয়ে মাথা নিচু করে লুকিয়ে পড়ল—বুকের ধুকপুক শব্দ আচমকা বেড়ে উঠল। ব্লেক ও কিটসনের ঠিক পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল একজোড়া তরুণ-তরুণী। এই স্বপ্নিল আঁধারে ওরা জঙ্গলের নির্জনতাকেই বেছে নিয়েছে। ওরা চলে যেতেই আবার কাজ শুরু করল কিটসন। ব্লেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল...।

ওদের কাজ যখন শেষ হল, তখন মাঝরাত। ওপরের মাটি সমান করে তার ওপর ভাঙা ডালপালা ও শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিল ব্লেক। যখন বুঝল, সন্দেহ করার মতো কিছুই নজরে পড়ছে না, তখন ওরা শ্রান্ত দেহে ফিরে চলল কেবিনের দিকে।

.৩৮ রিভলভারটা কোলের ওপর রেখে একটা আরাম কেদারায় গা-এলিয়ে অপেক্ষা করছিল জিনি। আর লক্ষ রাখছিল সোফার ওপর ঘুমন্ত জিপোর দিকে।

কেবিনে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল ব্লেক। তারপর এগিয়ে এসে বসল একটা চেয়ারে।

কিটসনও বিনা বাক্যব্যয়ে আর একটা চেয়ার বেছে দিল। তার মুখের রং ঠান্ডা চর্বির মতো ফ্যাকাসে—রক্তহীন। তার গালের একটা পেশি থেকে থেকেই কেঁপে উঠছে। মুখে ঘামের ফোঁটা চকচক করছে।

'কোনও গোলমাল করেনি তো?' জিনিকে প্রশ্ন করল ব্লেক।

জিনির মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, চোখের নীচে কালি! দেখে মনে হচ্ছে, ওর বয়সে যেন অনেক বেড়ে গেছে, শরীরের জৌলুসও কমে এসেছে অনেকটা। কিন্তু উত্তর দেওয়ার সময় ওর স্বর এতটুকু কাঁপল না। বরাবরের মতোই নির্বিকার শীতল স্বর, 'না,... তবে বারবারই বলছিল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি যাব—।'

'ট্রাকের তালা খোলার পর বাড়ি কেন, ও নরকে গেলেও আমার কোনও আপত্তি নেই।' কঠিন স্বরে বলে উঠল ব্লেক।

ওদের কথাবার্তার শব্দে জিপো পাশ ফিরে হঠাৎই চোখ খুলল। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে চারপাশে দেখল। তারপর ওদের তিনজনের দিকে চোখ পড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল সোফার ওপর। জিপোর হাত কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়, মুখের মাংসপেশি সংকুচিত হল।

'এড, আমাকে তোমারা ছেড়ে দাও...' শব্দগুলো যেন ছিটকে পড়ল জিপোর মুখ থেকে, আমারে ভাগের টাকা আমি চাই না, ওটা তোমরাই নিয়ে নিও। আমি এতক্ষণ ধরে শুধু এই কথাই ভাবছি! ওই হতচ্ছাড়া ট্রাকের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না। তাই বলছি, আমার প্রাপ্য দু-লাখ ডলার নিয়ে আমাকে

তোমরা রেহাই দাও। ফ্র্যাঙ্ক যদি এত করে না বলত, তাহলে এ কাজে আমি হাতও দিতাম না। ও আমাকে একরকম জোর করেই রাজি করিয়েছিল। তোমাদের যদি এখনও রাজা হবার সাধ থাকে তো লেগে থাকো—আমি ওর মধ্যে নেই। আমি সোজা আমার কারখানায় ফিরে যাচ্ছি।'

ব্লেক কিছুক্ষণ ধরে জিপোর আপাদমস্তক জরিপ করল, 'কিন্তু আমার তা মনে হয় না, জিপো।' শান্তস্বরে সে বলল।

জিপো হাঁটুতে হাত ঘষল। ওর থলথলে মুখমণ্ডল ঘামে চকচক করছে। ঈষৎ আশঙ্কার ইঙ্গিত।

'শোনো—এড, একটু ভালো করে ভেবে দেখো। আমার অংশের সমস্ত টাকাই আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। দু-লাখ ডলার নেহাত কম কথা নয়। কিন্তু তার বদলে আমি শুধু বাড়ি যেতে চাইছি।'

একইভাবে শান্তি, নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দল ব্লেক, 'উঁহু—আমার ধারণা, সেরকম ছেলেমানুষি তুমি করবে না।'

জিপো এবার কিটসনের দিকে ফিরল, আবেদন জানাল করুণ সুরে, 'আলেক্স, তুমি তো জানো এ কাজটা কিরকম বিপজ্জনক! আমরা কেউ প্রথমে রাজি হইনি, মনে আছে? কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক আমাদের একথা সেকথা বলে রাজি করিয়েছিল। চলো, আমরা চলে যাই। এড আর জিনিই ট্রাকের সমস্ত টাকা ভাগ করে নিক। ও টাকায় আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি আর আমি দুজনে একসঙ্গে কাজ করব, আমাদের কোনও অসুবিধেই হবে না। তুমি আমার সঙ্গে কারখানায় কাজ করবে। আমাদের দিন সচ্ছলভাবেই কেটে যাবে... বিশ্বাস করো আলেক্স, বাকি জীবনটা আমরা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারব।'

'ন্যাকামো ছাড়ো, জিপো!' ব্লেক নরম স্বরে বলল, 'তুমি এখানেই থাকছ, এবং ট্রাকের তালা খুলছ—এই আমার শেষ কথা।'

জিপো পাগলের মতো মাথা নাড়িয়ে চলল, 'না, না—এড, আমাকে যেতেই হবে! এই কাজের শেষ দেখার মতো সাহস আমার নেই; তবে কী করে ট্রাকের তালা খুলতে হয় সে আমি তোমাদের বলে দিয়ে যাব। তখন তুমি আর জিনি সহজেই ওই ট্রাকের তালা খুলে ফেলতে পারবে, কিন্তু আমাকে আর থাকতে বলো না। আমাদের ভাগের পাঁচ লাখ ডলার তোমরা এমনিতেই পেয়ে যাচ্ছ, কারণ আমার টাকাটা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি: আর আলেক্স ওর অংশটা জিনিকে দিয়ে যাবে। আমাদের তুমি ছেড়ে দাও, এড। আমরা চলে যাচ্ছি...।'

ব্লেক ফিরে তাকাল কিটসনের দিকে, 'তুমিও কি চলে যেতে চাও?

মরগ্যানের আকস্মিক ভয়ঙ্কর মৃত্যুতে কিটসন সাময়িকভাবে স্থবির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে ফিরে পাচ্ছে তার হারানো সাহস। রাত্রির অন্ধকারে দু-দুটো মৃতদেহকে কবর দেওয়ার দুঃস্বপ্নের প্রভাবকে সে ক্রমশ কাটিয়ে উঠেছে। এবং এই আকস্মিক উৎকণ্ঠাময় ঘটনাগুলো কিটসনকে দুর্বল করার পরিবর্তে যেন বেপরোয়া করে তুলেছে। সে বেশ বুঝতে পারছে, এখন তারা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখান থেকে ফেরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একমুখী রাস্তা ধরে তারা এগিয়ে চলেছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এখন কিটসনের নিজের প্রাণ ছাড়া আর কিছু হারাবার নেই, কিন্তু লাভের দিকে রয়েছে আড়াই লাখ ডলার, সোনালি ভবিষ্যৎ আর জিনির সঙ্গ। না, সে এখন চাক বা না চাক, ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন এখন অবান্তর।

'নাঃ' ব্লেকের চোখে-চোখ রেখে নিষ্কম্প জবাব দিল কিটসন।

'শোনো, আলেক্স—তুমি কী বলছ, তা তুমি নিজেই জানো না।' মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল জিপো, 'তুমি এদের সঙ্গে এই বিপদের মধ্যে থেকে কী করবে? তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে—আমার কারখানায়। মনে কোরো না এ কাজ করে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত বিপদে তোমরা পড়বেই! তার চেয়ে এখনই সংস্রব ত্যাগ করা ভালো। আলেক্স, তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে—।'

'না জিপো, তা হয় না।' জিনির দিকে আড়চোখে তাকাল কিটসন। জিপো গভীরভাবে সশব্দে শ্বাস নিল, 'তাহলে আমি চললাম। কিন্তু মনে রেখো, এখানে থেকে তোমার ভালো কোনওদিনই হবে না। তিন তিনটে লোক এই ট্রাকের কারণেই মারা গেছে, তাদের রক্তের দাম কোনওদিনই তোমরা শুধতে পারবে না—পারবে? ফ্র্যাঙ্ক বলেছিল, 'পৃথিবীটাকে ধরবে এই হাতের মুঠোয়। হুঁ... ওর অন্তিম পরিণতির কথা তোমাদের কি দ্বিতীয়বার মনে করিয়ে দিতে হবে? একরাশ ভিজে মাটির নীচে স্যাঁতস্যাঁতে একটা গর্তে ও নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে। ওর রাজা হবার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। এখনও কি তুমি বুঝতে পারছ না, আলেক্স? তোমরা কেউ কি বুঝতে পারছ না, যে এসবের শেষ কোনওদিনই ভালো হয় না, হতে পারে না?' হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে উঠল জিপো, 'ঠিক আছে, তাহলে আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও—আমি চললাম।'

ব্লেক চট করে হাত বাড়িয়ে জিনির কোলে পড়ে থাকা .৩৮ টা তুলে দিল। নিষ্ঠুরভাবে উঁচিয়ে ধরল জিপোর বুক লক্ষ করে।

'ট্রাকটা তোমাকে খুলতেই হবে, জিপো। নইলে ফ্র্যাঙ্কের পাশে তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।'

ব্লেকের শান্ত স্বরে চরম, শীতল সুর জিপোর কান এড়াল না। সে বুঝল, ব্লেক ঠাট্টা করছে না।

এক দীর্ঘ মুহূর্ত ধরে জিপো একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল, স্থির চোখে চেয়ে রইল .৩৮ এর কালো নলটার দিকে। তারপর নিরাশ হয়ে হতাশার একটি ভঙ্গি করে ধপ করে বসে পড়ল।

'আচ্ছা তাহলে তাই হোক।' জিপোর মুখে অপ্রসন্নতার স্পষ্ট ছায়া, 'তুমি আমাকে গায়ের জোরে আটকাতে চাইছ, কিন্তু এতে কিছু লাভ হবে না। কারণ আমি জানি, এ কাজের শেষ পরিণতি মোটেই ভালো হবে না—হতে পারে না।'

বন্দুকটা নামিয়ে রাখল ব্লেক।

'তোমার বকবকানি শেষ হয়েছে।' বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল সে।

'আমার আর কিছু বলার নেই।' জিপো মাথা ঝুঁকিয়ে বসল, 'কিন্তু আমি তোমাকে বার বার সাবধান করে দিয়েছি, এড; সেটা মনে রেখো। এ কাজের শেষ পরিণতি কখনওই ভালো হতে পারে না।'

'ঠিক আছে।' অন্য দুজনের দিকে চোখ রাখল ব্লেক, 'তাহলে জিপো যখন রাজি হয়েছে, এবারে আমরা আলোচনায় বসতে পারি। এখন আমরা মোট চারজন। তার মানে আমরা প্রত্যেকে যা পেতাম তার চেয়ে এখনও আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার বেশি পাব। কারণ ফ্র্যাঙ্কের ভাগের টাকাটা আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছি। আর পরিকল্পনা যা ছিল সেই মাফিকই কাজ চলবে। কিটসন—তুমি আর জিনি নতুন বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রী মতোই অভিনয় চালিয়ে যাও। আমি আর জিপো ক্যারাভ্যানের ভেতরে ট্রাক নিয়ে লড়ে যাব। টাকাটা হাতে আসামাত্রই আমরা চারজন চারদিকে কেটে পড়ব রাজি?'

ওরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

'ঠিক আছে, তাহলে এই কথাই রইল।' ব্লেক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তালা থেকে চাবিটা বের করে পকেটে রাখল, 'আচ্ছা আমি তাহলে শুতে চললাম। আজকের মতো যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে।' ব্লেক এগিয়ে গেল জিপোর কাছে। পেটে খোঁচা মারল, 'ওঠো মোটুরাম—চেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়ো। সোফাটা আমাকে ছেড়ে দাও। আমার মনে হয় সোফাতে শোবার অধিকার বর্তমানে একমাত্র আমারই আছে।'

জিপো উঠে শ্লথ পায়ে একটা চেয়ারের দিকে এগিয়ে চলল। ব্লেক বসে পড়ল সোফার ওপর। নিচু হয়ে পা থেকে জুতো খুলতে খুলতে কিটসনকে লক্ষ করে সে বলে উঠল, 'পাশের ঘরে তোমার জন্যে খাট পাতা আছে, আলেক্স। যাও গিয়ে শুয়ে পড়ো—স্বামীর কর্তব্য পালনে মন দাও।'

ব্লেকের টোপ গেলবার মতো মনের অবস্থা কিটসনের ছিল না। সে পরিশ্রান্তভাবে একটা চেয়ারে গা-এলিয়ে দিল—হাই তুলে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল জিনি। ওরা শুনতে পেল দরজায় চাবি দেওয়ার শব্দ।'

'তোমার দুর্ভাগ্য, আলেক্স!' ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল ব্লেক। হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল, 'মনে হচ্ছে, তোমার মতো স্বামীকে জিনির ঠিক পছন্দ হয়নি।'

'ও—তুমি থামবে!' বিরক্তিভরে ধমকে উঠল কিটসন।

পরদিন সকাল সাতটার কিছু পরেই জিনির ঘুম ভাঙল। বসবার ঘরে এসে ও জানলার পরদাগুলো সরিয়ে দিল। বাইরের আলো এসে ঘরে ঢুকতেই ওরা তিনজন জেগে উঠল।

একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে পলকের মধ্যে উঠে বসল ব্লেক, রিভলভারের খোঁজে পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

কিটসনের ঘুমের আমেজ তখনও কাটেনি। সে মাথা তুলে পিটপিট করে তাকাল জিনির দিকে। ও তখন নির্বিকারভাবে এগিয়ে চলেছে রান্নাঘরের দরজা লক্ষ করে।

জিপো শরীরের ম্যাজম্যাজে ভাবটা কাটাতে আড়মোড়া ভাঙল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আহত চোয়ালে হাত বোলাতে লাগল। একটা অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

জিনি রান্নাঘর থেকে ডেকে বলল, 'তোমরা তাড়াতাড়ি ক্যারাভ্যানে যাবার তোড়জোড় করো, এর মধ্যেই কিন্তু হ্রদের ধারে লোকজন ভিড় করতে শুরু করেছে।'

ব্লেক একটা দুর্বোধ্য শব্দ করে পা-বাড়াল কলঘরের দিকে। মিনিট দশেক পরে সে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে বেরিয়ে এল। জিপোকে লক্ষ করে বলল, 'যাও স্নান সেরে নাও। তোমার গা-থেকে মোষের মতো বোটকা গন্ধ বেরচ্ছে।'

জিপো থমথমে মুখে ব্লেককে একবার দেখল, তারপর এগিয়ে গেল কলঘরের দিকে।

জিপো স্নান সেরে সোজা ঘরে ঢুকতেই সে দেখল, একটা ট্রেতে প্রাতরাশ সাজিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে এসেছে জিনি।

'এগুলো নিয়ে ক্যারাভ্যানের ভেতরেই তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও।' ট্রে-টা ব্লেকের হাতে ধরিয়ে দিল জিনি।

ব্লেক এক-পলকে দেখল ট্রের মধ্যে কফি, ডিম সেদ্ধ কমলালেবুর রস ও স্যান্ডউইচের দিকে। তার চোখে নেমে এল কুৎসিত ঝলকানি। ট্রে-টা জিনির হাত থেকে নিল সে, শোনো সুন্দরী, এখন থেকে তোমরা আমার কথামতো চলবে। কারণ এ দলের পরিচালনার ভার এখন আমার!'

জিনির চোখে খেলা করল তাচ্ছিল্যের কৌতুক।

'পরিচালনার ভার? তার মানে?...এ দলের পরিচালনার দায়িত্ব কারোরই নেই—মরগ্যানেরও ছিল না। আমরা শুধু প্ল্যান মাফিক কাজ করে যাব। প্রথম থেকেই ঠিক ছিল, তুমি আর জিপো কেবলমাত্র রাত্রিবেলাতেই কেবিনে আসবে। এবং সারাটা দিন তোমাদের ক্যারাভ্যানের ভেতরই লুকিয়ে থাকতে হবে। এখন যদি তুমি তোমার মত বদলে থাকো, তো সে কথা বলো।'

'আচ্ছা—খুব কথা শিখেছ দেখছি!' ব্যঙ্গভরে বলে উঠল ব্লেক, 'তার মানে ক্যারাভ্যানে বসেই আমাদের খানাপিনা সারতে হচ্ছে? ব্যাপার কী, তোমাদের দাম্পত্য জীবনযাত্রায় অসুবিধে ঘটাচ্ছি বলেই কি আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছ?

জিনি কোনও জাবাব না দিয়েই ঘুরে দাঁড়াল, ফিরে চলল রান্নাঘরের দিকে।

'এড, সব সময়ে জিনির পেছনে লাগাটা আমি পছন্দ করি না।' উঠে দাঁড়াল কিটসন।

'থামো! আর সাফাই গাইতে হবে না!' খিঁচিয়ে উঠল ব্লেক, 'যাও, বাইরে গিয়ে দেখো, আশেপাশে লোকজন আছে কি না। না থাকলে ক্যারাভ্যানের দরজাটা চটপট খুলে দেবে।'

সামান্য ইতস্তত করে বাইরের রোদ্দুরে গিয়ে দাঁড়াল কিটসন। তাকাল চারপাশে। না, কেউই তাকে লক্ষ করছে না। তখন সে ডাকল ব্লেককে, আর সঙ্গে সঙ্গেই খুলে দিল ক্যারাভ্যানের পিছনটা।

ব্লেক আর জিপো ক্ষিপ্রগতিতে ঢুকে পড়ল ক্যারাভ্যানের ভেতরে।

'যাও, এবার মৌজ করো গিয়ে।' ব্লেকের চোখ চকচক করে উঠল, 'সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তুমি ছাড়বে বলে তো মনে হয় না।'

কিটসন হাতলে চাপ দিয়ে সশব্দে বন্ধ করে দিল ক্যারাভ্যানের দরজা। ব্লেক ও জিপো বন্দি হল ক্যারাভ্যানের ভেতরে। কাজ শেষ হলে কিটসন ফিরে এল কেবিনে।

জিনি তখন আরও কয়েকটা স্যান্ডউইচ তৈরি করছে।

কিটসন এসে সোজা গিয়ে ঢুকল কলঘরে। স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে নতুন পোশাক পরে সে বেরিয়ে এল।

বসবার ঘরে এসেই সে দেখল, জিনি টেবিলের ওপর ডিম সেদ্ধ ও স্যান্ডউইচ সাজিয়ে রাখছে।

'ও—চমৎকার হয়েছে।' নাক দিয়ে গভীর শ্বাস টানল কিটসন, 'কিন্তু কার জন্যে তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার—না আমার?'

'সকালে আমার কিছু খাওয়ার অভ্যেস নেই।' সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিল জিনি। এক কাপ কফি ঢেলে গিয়ে বসল অদূরেই একটা আরাম কেদারায়। কিটসনের দিকে আংশিকভাবে পিছন ফিরে।

কিটসন টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। এমনিতেই সে বেশ ক্ষুধার্ত ছিল, তার ওপর স্যান্ডউইচের লোভনীয় সুবাস তাকে যেন পাগল করে তুলল। চটপট খেতে শুরু করল সে। মনে মনে জিনির রান্নার প্রচুর তারিফও করল।

'ভাবছি, খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে একটু বেরব।' প্রস্তাবের সুরে বলল কিটসন, নৌকো করে হ্রদটা একটা চক্কর দেওয়া যাবে—কী বলো?'

'হুঁ।'

জিনির সংক্ষিপ্ত উত্তরে হতাশ হল কিটসন।

'ক্যারাভ্যানে ওদের দুজনের খুব কষ্ট হবে।' জিনির সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিটসন, 'বাইরে তেমন ছায়া-টায়াও নেই। দুপুরের মধ্যেই ক্যারাভ্যানের ভেতরটা উনুনের মতো গরম হয়ে পড়বে।'

'সে ওরা বুঝবে।' নির্লিপ্ত স্বরে উত্তর দিল জিনি।

'হ্যাঁ—তা ঠিক।...আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়? জিপো ট্রাকের তালা খুলতে পারবে?'

হাতের একটা অধৈর্য ভঙ্গি করল জিনি, 'সে আমি কী করে জানব?'

'না—মানে, বলছিলাম শেষ পর্যন্ত জিপো যদি সেটা পেরে না ওঠে তাহলে আমরা কী করব?'

'সে কথা আমাকে জিগ্যেস করছে কেন? নিজে যদি বুঝতে না পার তবে ব্লেককে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।'

আচমকা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল জিনি। কফির কাপ হাতে তুলে দিয়ে চলে গেল রান্নঘরে।

কিটসন অনুভব করল, অসহ্য উত্তাপ যেন তার মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎই তার খাওয়ার ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে গেল। বিকৃত মুখে কয়েক চুমুকে কাপের কফিটা শেষ করল সে। কাপ-প্লেটগুলো হাতে তুলে নিয়ে এগোল রান্নঘরের দিকে।

রান্নাঘরের টেবিলে এঁটো বাসনগুলো নামিয়ে রাখল কিটসন, 'শোনো, জিনি, আমি কিন্তু তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি। তবে ভেবে দেখো, আমাদের একসঙ্গে অন্যান্য লোকেদের সামনে একটু ঘোরাফেরা করা দরকার। কারণ ওদের বোঝাতে হবে, আমরা হানিমুনে এসেছি। আমাদের আসল সম্পর্কটাকে কয়েকদিনের জন্যে ভুলে থাকা যায় না? বুঝতেই পারছ, শুধু...' খেই হারিয়ে আচমকা থেমে গেল কিটসন।

'দোহাই তোমার। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। দয়া করে পাশের ঘরে যাও।' জিনি কিটসনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। ওর গলার স্বর শেষ দিকটায় কেমন কেঁপে গেল।

জিনির কথা বলার সুরে দুঃখ পেল কিটসন। সে ঘুরে এসে দাঁড়াল জিনির মুখোমুখি। তখনই তার নজরে পড়ল জিনির বাহ্যিক পরিবর্তনটা। ওর মুখটা কেমন লম্বাটে, চোয়াড়ে দেখাচ্ছে। সজীবতার রেশটুকু মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠেছে গ্রীষ্মের আকাশের বিবর্ণতা। নাঃ, মেয়েটা নিজেকে যতটা সমর্থ মনে করে ততটা নয়—ভাবল কিটসন। গত দিনের বীভৎস ঘটনাগুলো ওর মনে ভীষণভাবে আঘাত করেছে। যেমন করেছে কিটসনের মনকে।

'ঠিক আছে আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।' বসবার ঘরে এসে বসল কিটসন। মাথার কালো চুলে আলতো করে আঙুল চালাল।

দীর্ঘ এক নীরব মুহূর্তের পর জিনির কান্না শুনতে পেল কিটসন। কিন্তু সে বসেই রইল। এ কাজের হতাশ পরিণতির ইঙ্গিতেই যেন বয়ে এল সেই হালকা, অস্ফুট কান্নার সুর। শেষ পর্যন্ত জিনিও তাহলে কাঁদছে? কিটসন বুঝল, তাদের সাফল্যের আশা এখন সুদূর পরাহত।

কিটসন নীরবে ধূমপান করে চলল। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে গেল অস্বস্তিকর প্রতীক্ষায়। হঠাৎ একসময় রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল জিনি। কিটসন ভালো করে ওকে দেখবার আগেই ও সোজা গিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে।

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। অবশেষে শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল জিনি।

'চলো, যাওয়া যাক।' সংক্ষিপ্তভাবে বলল ও।

কিটসন মুখ ফিরিয়ে তাকাল জিনির দিকে।

জিনির সাজসজ্জায় কোথাও কোনও খুঁত নেই, শুধু ওর সবুজ চোখের অস্বাভাবিক দ্যুতি এবং দাঁড়াবার সংযত ভঙ্গি জানিয়ে দিচ্ছে ওর অস্থির মানসিক অবস্থার কথা।

কিটসন উঠে দাঁড়াল।

'একটা খবরের কাগজ পেলে মন্দ হতো না।' ইচ্ছে করেই জিনির দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখল কিটসন।

'হ্যাঁ, মনে হয় বাইরেই পাওয়া যাবে।'

বসবার ঘর অতিক্রম করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল জিনি। ওর পরনে একটা হালকা সোয়েটার এবং শ্যাওলা-সবুজ স্ল্যাক্স। এই পোশাকে ওর নিখুঁত কমনীয় দেহ-সৌন্দর্য যেন ফুটে বেরচ্ছে। আজ এই মুহূর্তে জিনিকে আরও ভালো লাগল কিটসনের।

সে ওকে অনুসরণ করে বাইরে এল।

কেবিনের বাইরে পা-রাখতেই সূর্যের প্রখর তাপ ওদের শরীরে আছড়ে পড়ল। ওরা একবার তাকাল রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারাভ্যানটার দিকে। মনে মনে অনুমান করার চেষ্টা করল ক্যারাভ্যানের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ।

সামনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে হ্যাডফিল্ডের অফিসের দিকে। তার অফিসের পাশেই আছে একটা মুদিখানার দোকান। জঙ্গলের ছায়াঘেরা অঞ্চল পার হয়ে ওরা যখন কাঠের অফিসে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন জিনি একহাতে আঁকড়ে ধরল কিটসনের হাত। ওর ঠান্ডা স্পর্শে কিটসনের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে এল এক অদ্ভুত যন্ত্রণায় অনুভূতি। সে চমকে ঘুরে তাকাল জিনির দিকে।

জিনি বিষণ্ণভাবে হাসতে চেষ্টা করল, 'আমার ব্যবহারের জন্যে কিছু মনে করো না। মাঝে মাঝে আমার অমনি হয়। এখন বেশ আছি।'

'না না—ঠিক আছে। সত্যিই তো, কাল সারাটাদিন ধরে কম ধকল গেছে!' জিনির নরম হাতে চাপ দিল কিটসন।

এমন সময় হ্যাডফিল্ড বেরিয়ে এল তার অফিস থেকে। ওদের দেখেই আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে মুখ ভরিয়ে কাছে এগিয়ে এল, 'এই যে মিঃ হ্যারিসন,' কিটসনের দিকে হাত বাড়িয়ে ধরল হ্যাডফিল্ড, 'কেমন লাগছে জায়গাটা, বলুন...আমি বেশ বুঝতে পারছি মশায়, আপনি দারুণ সুখে রয়েছেন। হুঁ-হুঁ—আপনি না বলতেই কিরকম ধরে ফেলেছি দেখলেন? আরে মশায়, আপনার মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, জায়গাটা আপনার খুব ভালো লেগেছে। আর, তাছাড়া—মিসেস হ্যারিসনের মতো সুন্দরী স্ত্রী পেলে আপনি কেন, যে কোনও স্বামীই সারাটা জীবন সুখে কাটিয়ে দেবে—কী বলেন মিসেস হ্যারিসন?'

'আপনাকে ধন্যবাদ, মিঃ হ্যাডফিল্ড।' হাসতে-হাসতেই বলল জিনি, 'এত প্রশংসাও করতে পারেন আপনি!...যাকগে, আমরা কিন্তু খবরের কাগজের খোঁজে এসেছিলাম। আছে নাকি?'

'খবরের কাগজ?' হ্যাডফিল্ডের ঘন ভুরুজোড়া ঊর্ধ্বমুখী হল, 'বলেন কী মিসেস? আজ পর্যন্ত কোনও খদ্দেরকে আমি খবরের কাগজের খোঁজ করতে শুনিনি? কারণ হানিমুন কাটাতে এসে কেউ বাইরের খবরে নজর দেয় না। তবে খবরের কাগজ যে নেই তা নয়, আছে। আর আজকের সবচেয়ে জোর খবর ওই ট্রাক লুটের ব্যাপারটা।' হ্যাডফিল্ডের খুশি খুশি মুখে ফুটে উঠল দোঁতা হাসি, 'আপনাকে চুপি চুপি বলে রাখছি মিঃ হ্যারিসন, আমি কিন্তু লোকগুলোকে তারিফ না করে পারছি না। একেবারে নিঃশব্দে দশ লাখ ডলার নিয়ে চম্পট! একবার ভেবে দেখুন তো! দশ লক্ষ ডলার! আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, টাকাটা নিয়ে ওরা কোথায় গেল, কী করল তা কেউই আন্দাজ করতে পারছে না। মানে গোটা ট্রাকটা একেবারে বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নাঃ, সাহস আছে লোকগুলোর।' মাথার টুপিটা পিছন দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে হাসল হ্যাডফিল্ড, 'এরকম ঘটনা আমার জীবনে এই প্রথম শুনছি। খবরের কাগজে যখন ব্যাপারটা পড়লাম, তখন ভাবছিলাম, কী পরিমাণ বুদ্ধি আর সাহস থাকলে ওই ট্রাককে হাওয়া করা যায়। একেবারে উবে গেল? অতবড় একটা ট্রাক, তার ওপর পুলিশ আর সৈন্যবাহিনীর লোকেরা এখনও একশো মাইল জায়গা জুড়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে চলেছে, তবু তার কোনও সন্ধান নেই? আশ্চর্য!"

খবরের কাগজ আনতে অফিসের দিকে পা-বাড়াল হ্যাডফিল্ড।

জিনি ও কিটসন অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল পরস্পরের দিকে।

কিছুক্ষণ পরেই চার চারটে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ওদের সামনে এসে হাজির হল হ্যাডফিল্ড।

'ভাবলাম, আপনারা হয়তো সবক'টাই দেখতে চাইবেন, তাই নিয়ে এলাম। তবে সাচ্চা খবর যদি পেতে চান, তাহলে পাবেন হোরাল্ড-এ।'

'না, আমি সবকটা কাগজই নেব।' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল কিটসন 'মানে—খবরগুলো একটু যাচাই করে দেখব আর কি।'

বিনাবিলম্বে হ্যাডফিল্ডকে কাগজের দাম মিটিয়ে দিল সে।

'আপনাদের কোনওরকম অসুবিধে হচ্ছে না তো মিসেস হ্যারিসন?' হ্যাডফিল্ড তাকাল জিনির শরীরের বিশেষ অংশের দিকে, 'কিছু করার থাকলে বলুন, আমি এখুনি—'

'না, তার কোনও প্রয়োজন নেই, মিঃ হ্যাডফিল্ড।' হ্যাডফিল্ডকে বাধা দিল জিনি, 'আমাদের কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।'

কথা শেষ করে জিনি গিয়ে ঢুকল সামনের মুদি দোকানের দিকে, আর কিটসন কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার জোরদার খবরগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগল।

প্রতিটি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে ট্রাক লুটের খবর। সেই সঙ্গে ট্রাকটার ছবিও ছাপা হয়েছে। এমন কি ডার্কসন ও টমাসের ছবিও বাদ যায়নি। সৈন্যবাহিনীর তরফ থেকে ট্রাক উদ্ধারের সম্পর্কিত খবরের জন্যে এক হাজার ডলার পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।

পুলিশের তরফ থেকে ট্রাকের ড্রাইভার ডেভ টমাসকে লুটেরাদের একজন বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য টমাসের নিরুদ্দেশ হওয়াটাই এই সন্দেহের একমাত্র কারণ।

কিটসন একমনের কাগজ পড়ছিল, বুকের দ্রিম দ্রিম শব্দ ক্রমশ বেড়েই চলেছে—হঠাৎ ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ডের ডাকে তার চমক ভাঙল। গতকাল এই ভদ্রলোকই তাকে চাকা পালটানোর কাজে সাহায্য করতে চেয়েছিল। সম্ভবত সেও তার খবরের কাগজ সংগ্রহ করতে এ সময়ে হ্যাডফিল্ডের অফিসের দিকে এসেছে।

'এই যে—মিঃ হ্যারিসন, কেমন লাগছে এখানে? সুন্দর জায়গা তাই না?... তা খবরের কাগজ এর মধ্যেই পেয়ে গেছেন দেখছি?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র পেলাম।'

'আপনি নিশ্চয়ই ট্রাক লুটের খবরটা পড়ছিলেন? আজ সকালেই আমি রেডিওতে পুরো ঘটনাটা শুনলাম। ওরা সন্দেহ করছে, ট্রাকটাকে নিশ্চয়ই আশেপাশের কোনও জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই সার্চ-টিম বের করা হচ্ছে ট্রাকের খোঁজে। হেলিকপ্টারে করে প্রতিটি রাস্তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে—কিন্তু কোথায় কী? ট্রাকের কোনও পাত্তাই নেই!'

'হুঁ।' কাগজগুলো ভাঁজ করে ফেলল কিটসন।

'কিন্তু আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না, মিঃ হ্যারিসন, যে এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে কী করে ওরা ট্রাকটাকে লুকিয়ে রেখেছে? আমার কিন্তু সন্দেহ হয় ওই ড্রাইভারটাকে—ব্যাটা নিশ্চয়ই ওদের লোক। আপনার কী মনে হয়?'

'হতে পারে।' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল কিটসন।

কিন্তু রক্ষীটার কী দশা হল দেখুন তো! কী নাম যেন লোকটার? ...ওঃ, হ্যাঁ, ডার্কসন,... আমার মতে ওয়েলিং কোম্পানির তরফ থেকে ওর পরিবারকে নিয়মিত সাহায্য করা উচিত।'

হ্যাডফিল্ড এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ব্র্যাডফোর্ডের কথাগুলো গিলছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'পুলিশের ধারণা ওই গাড়ি দুর্ঘটনার ব্যাপারটা নাকি পুরোপুরি সাজানো। তার মানে, লুটেরাদের দলে একটা সোমত্ত মেয়েও আছে। ডার্কসন মারা যাবার আগে বেতারে ওই দুর্ঘটনার কথা এজেন্সিকে জানিয়েছিল। তাই পুলিশ টমাসের ব্যক্তিগত জীবন আতিপাতি করে খুঁজে দেখছে, যদি কোনও নারীঘটিত ব্যাপারের আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য ওর স্ত্রী জানিয়েছে, টমাস সেরকম চরিত্রের লোকই নয়—কে জানে শেষ পর্যন্ত কী হবে!'

'নাঃ, ওই পুরস্কারের টাকাটা পেলে নেহাত মন্দ হয় না।' ব্র্যাডফোর্ড তার মনের ইচ্ছে খুলে জানাল, 'আমার ছোট ছেলেটা তো ভীষণ লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। বলছে, ও নাকি জঙ্গলের ভেতর টহল মেরে ট্রাকটাকে খুঁজে বার করবে।' হাসল সে, 'যাক, তবু কদিনের জন্যে ওর বায়নাক্কার হাত থেকে একটু রেহাই পাওয়া যাবে। যা-দুরন্ত ছেলে মশাই কী বলব! ওর মাকে একেবারে অস্থির করে ছাড়ে।'

হ্যাডফিল্ড মাথা নাড়ল, 'উঁহু—ট্রাকটা এখানকার জঙ্গলে লুকিয়ে রাখার মতো বোকামি ওরা করবে না। কারণ সময়ে অসময়ে, সব সময়েই এই জঙ্গল দিয়ে লোকজন চলাফেরা করে। আমার মনে হয় ট্রাকটাকে ওরা অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। হয়তো এখান থেকে আরও ওপরে, ফক্সউডেই লুকিয়ে রেখেছে।। ওই রাস্তায় লোকজনের চলাচলও অনেক কম, আর বড় রাস্তা থেকে জায়গাটা অনেক দূরেও বটে।'

'কিন্তু খবরদার। ভুলেও আমার ছেলেকে এ সংবাদ দেবেন না, মশাই! শেষ পর্যন্ত পাহাড় বেয়ে সে হয়তো ফক্সউড পর্যন্তই ছুটবে। কী যে ভূত চেপেছে মাথায়...'

জিনিসপত্র ভর্তি একটা প্যাকেট নিয়ে মুদিখানার দোকান থেকে বেরিয়ে এল জিনি।

'সুপ্রভাত, মিসেস হ্যারিসন।' টুপি খুলে জিনিকে অভিবাদন জানাল ব্র্যাডফোর্ড, 'পথে আর কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

‘না।’ হাসল জিনি। জিনিসপত্রের প্যাকেটটা কিটসনের হাতে দিয়ে অন্তরঙ্গভাবে তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। আঁকড়ে ধরল কিটসনের বাহু। ভুরু উঁচিয়ে প্রশ্ন করল, ‘হ্রদে বেড়াবার জন্যে নৌকো পাওয়া যাবে, মিঃ হ্যাডফিল্ড?’

‘নিশ্চয়ই; কেন নয়। এই তো বেড়াবার সময়। একটু পরেই রোদের তাপ অসহ্য হয়ে উঠবে। আপনি তো জানেন কোথায় নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়, সেখানে চলে যান, জো আপনাকে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে।’

‘আচ্ছা, তাহলে চলি।’

‘দরকার মনে করলেই চলে আসবেন, মিসেস হ্যরিসন।’ আমন্ত্রণ জানাল ব্র্যাডফোর্ড, ‘কুড়ি নম্বর কেবিনেই আমরা আছি। আপনাদের ঘর থেকে বড় জোর সিকি মাইল দূর হবে। মিলি খুব খুশি হবে আপনাদের দেখলে।’

হ্যাডফিল্ড কনুইয়ের খোঁচা মারল ব্র্যাডফোর্ডকে, ‘আরে মশাই, আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কোথায় ওনারা এসেছেন হানিমুনে আর আপনি বলছেন কি না আপনার ঘরে গিয়ে সময় নষ্ট করতে?’

হেসে কিটসনের হাত ধরে এগিয়ে গেল জিনি। কিটসনের কাঁধে মাথা রেখে রাস্তা ধরে হেঁটে চলল।

ব্র্যাডফোর্ড ও হ্যাডফিল্ড একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওদের গমন পথের দিকে। সম্ভবত কিছুটা ঈর্ষাও বোধ করল কিটসনের সৌভাগ্যে। নাঃ, জিনির মতো সুন্দরী-স্ত্রী পেলে হ্যাডফিল্ড এই মুহূর্তেই কিটসনের সঙ্গে জায়গা বদল করতে রাজি।

ব্র্যাডফোর্ড ও হ্যাডফিল্ড পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল।

ঘরে পৌঁছে জিনিসপত্রের প্যাকেট রান্নাঘরে নামিয়ে রাখল জিনি। কিটসন অতি সন্তর্পণে বাইরে ক্যারাভ্যানের পাশে এসে দাঁড়াল। যখন দেখল কেউ তাকে লক্ষ করছে না, তখন আস্তে আস্তে টোকা মারল জানলায়।

ঘর্মাক্ত রক্তিম মুখে জানলা খুলে ধরল ব্লেক, ‘কী চাই?’ দাঁত খিঁচিয়ে উঠল সে, ‘ওঃ, ভেতরে যা গরম! তার ওপর হতচ্ছাড়া মাছিগুলোর জ্বালায় একটু স্থির হয়ে কাজ করার জো নেই! তা—কী চাই তোমার?’

‘তোমাদের জন্যে খবরের কাজ নিয়ে এসেছি।’ কাগজগুলো জানলা দিয়ে ভেতরে গুঁজে দিল কিটসন, ‘আর কিছু দরকার থাকলে বলো।’

‘না, কিছু দরকার নেই। যাও কাটো।’ কথা শেষ করেই সশব্দে জানলা বন্ধ করে দিল ব্লেক।

সে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল ট্রাকের পিছন দিকে—দরজার কাছে। কেবিন থেকে নিয়ে আসা একটা টুলে বসে জিপো তখন একমনে কাজ করে চলেছে। তার দক্ষ আঙুল নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে কম্বিনেশন চাকতির ওপর ট্রাকের দরজার গায়ে কান পেতে সে ঈপ্সিত শব্দের প্রতীক্ষা করছে।

ক্যারাভ্যানের ভেতরে অসহ্য গরম। ব্লেক বাধ্য হয়েই খুলে ফেলেছে তার কোট, জামা—সব। তার লোমশ বুক ঘামে সপসপ করছে। কয়েক সেকেন্ড সে লক্ষ করল জিপোকে তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল ক্যারাভ্যানের মেঝেতে, কাগজ পড়তে শুরু করল।

প্রায় আধঘণ্টা পর কাগজপত্তর একপাশে ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল ব্লেক। জিপোর কাজ দেখতে লাগল।

চোখ বুজে, একাগ্র মুখে, পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে জিপো। কান খাড়া করে সে এক মনে শুনে চলেছে। অতি সন্তর্পণে সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলেছে কম্বিনেশন চাকতি।

‘সেই তখন থেকে কী শুরু করেছ?’ বিরক্তিতে ফেটে পড়ল ব্লেক, ‘তুমি কি মনে করছ, টানা দশ দিন ধরে শুধু এই করে যাবে?’

চমকে উঠে চোখ খুলল জিপো। রাগত কণ্ঠে বলল, ‘থামো! কানের কাছে এমনি বকবক করলে কী করে কাজ করব বলতে পার?’

‘আমি আর এই বন্ধ ক্যারাভ্যানে থাকতে পারছি না। একটু হাওয়া না পেলে আমি মারা যাব।’ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখের ঘাম মুছল ব্লেক, ‘আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না, জানালার পরদাটাকে ক্যারাভ্যানের গায়ে সেঁটে, যদি জানলাটাকে খুলে দিই? তাহলে হাওয়াও আসবে অথচ মাছিও ঢুকতে পারবে না—’

‘যা করবার তুমি করো। যদি আমাকে দিয়ে ট্রাকের তালা খোলাতে চাও, তাহলে আর বিরক্ত কোরো না।’

ব্লেক আগুনঝরা চোখে তাকাল জিপোর দিকে। তারপর যন্ত্রপাতি রাখার তাকের কাছে এগিয়ে গেল। সেখান থেকে একটা হাতুড়ি আর কিছু পেরেক বের করে সে পরদাটাকে ক্যারাভ্যানের দেওয়ালে গেঁথে দিল। হাত-বাড়িয়ে খুলে দিল জানলার পাল্লা।

পরদার ফাঁক দিয়ে ব্লেকের চোখে পড়ল অদূরে বিশাল হ্রদ। পরমুহূর্তেই সে দেখতে পেল জিনি ও কিটসন একটা নৌকোয় উঠছে; কিটসন বলিষ্ঠ হাতে বৈঠা চালিয়ে নৌকো নিয়ে এগিয়ে চলল আর তখনই ঈর্ষার অন্ধ ক্রোধ আছড়ে পড়ল ব্লেকের মনের গহনে।

‘শালা, খুব ফুর্তি লুটছে।’ চাপা আক্রোশে ফেটে পড়ল ব্লেক, ‘ওর জায়গায় আজ আমারই থাকা উচিত ছিল। ওই যে শালা জিনিকে নিয়ে মৌজ করছে...’

জিপো গলা বাড়িয়ে ট্রাকের পাশ দিয়ে তাকাল। কর্কশ স্বরে বলে উঠল, ‘তুমি কি দয়া করে একটু চুপ করবে!’ এভাবে বিরক্ত করলে কাজ করব কী করে?’

‘আচ্ছা, আচ্ছা বাবা—ঠিক আছে।’ খেঁকিয়ে উঠল ব্লেক, ‘ষাঁড়ের মতো আর চেঁচিয়ো না!’

যন্ত্রণাক্লিষ্ট আঙুলগুলোকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়ার ইচ্ছায় প্যান্টের গায়ে হাত ঘষতে লাগল জিপো; স্থির চোখে চেয়ে রইল কম্বিনেশন চাকতিটার দিকে।

এতক্ষণ ধরে শুধু তার পরিশ্রমই সার হয়েছে কম্বিনেশনের একটা নম্বরও সে মেলাতে পারেনি। হয়তো এইভাবে দিনের পর দিন তাকে এই কম্বিনেশনের চাকতি নিয়েই পড়ে থাকতে হবে—শেষ পর্যন্ত ক্লান্তি ও হতাশার শিকার হয়ে পড়বে জিপো। হয়তো কোনওদিনই এই ট্রাকের তালা সে খুলতে পারবে না।

‘নাঃ, এবারে একটু বিশ্রাম নেওয় দরকার। হাতের আঙুলগুলোয় যেন খিল ধরে গেছে।’

এগিয়ে এসে খোলা জানলার সামনে দাঁড়াল জিপো। বাইরের বাতাসের স্পর্শ পেয়ে বুকভরে শ্বাস নিল সে। বায়ু চলাচলের ফলে ক্যারাভ্যানের ভেতরটা এখন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

‘ওই তালাটাকে অন্য কোনওভাবে তাড়াতাড়ি খোলা যায় না?’ জানতে চাইল ব্লেক, কিন্তু তার চোখজোড়া হ্রদে ভাসমান বিশেষ নৌকোটার ওপর নিবদ্ধ। কিটসনের বলিষ্ঠ হাতের চালনায় জল কেটে নৌকোটা দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে।

‘ফ্র্যাঙ্ককে তো আমি আগেই বলেছিলাম, তালা খোলার কাজটা নেহাত সহজ হবে না। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমি নাও পেরে উঠতে পারি।’

‘তাই নাকি?’ জিপোর চোখে-চোখ রাখল ব্লেক, ‘তবে আমার মনে হয়, তালাটা খুললেই তুমি ভালো করবে, জিপো! আমার কথা তোমার কানে ঢুকেছে? তালা তোমাকে খুলতেই হবে!’

ব্লেকের চোখের করাল দৃষ্টির সামনে যেন কুঁকড়ে গেল জিপো। কোনওরকমে বিড়বিড় করে সে জবাব দিল, ‘আমি তো আর ম্যাজিক জানি না—!’ হয়তো এ তালা পৃথিবীর কারও পক্ষেই খোলা সম্ভব নয়।’

‘অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে ম্যাজিক তোমাকে দেখাতেই হবে, জিপো।’ হিংস্র স্বরে বলে উঠল ব্লেক, ‘যাও। কাজ শুরু করো। যত বেশি সময় কাজ করবে তত তাড়াতাড়িই খুলবে ট্রাকটা তালাটা... যাও।’

জিপো আবার ফিরে গেল ট্রাকের দরজার কাছে। বসে পড়ে কান চেপে ধরল দরজার গায়ে। তারপর সেই আগের মতো আবার ঘোরাতে শুরু করল কম্বিনেশন চাকতি প্রথম নম্বরটা মেলানোর আশায়।

সন্ধ্যার আগেই জিপো পুরোপুরি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। টুলে বসে ট্রাকের দরজায় হেলান দিয়ে সে চুপচাপ বসে রইল। তালা খোলার আর কোনও চেষ্টাই করল না।

জিপোর উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে ব্লেক তাকে আর বিরক্ত করল না। কিন্তু ট্রাকের তালার ব্যাপারে ভেতরে ভেতরে সে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

এই গরমে একটানা বারো ঘণ্টা কাজ করে গেছে জিপো। মাঝখানে শুধু বিশ্রাম পেয়েছে মাত্র এক ঘণ্টা। এখনও পর্যন্ত সে কেবল একটা নম্বর মেলাতে সক্ষম হয়েছে। তার অনুমান, কম করে আরও পাঁচ পাঁচটা নম্বর তাকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তবু ভালো যে বারো ঘণ্টা পরিশ্রম একেবারে বৃথা যায়নি। এবং সেই কারণেই জিপোর সাফল্য সম্পর্কে ব্লেক হয়ে উঠেছে আরও আশাবাদী। হয়তো আগামীকালই আরও দুটো নম্বর জিপো খুঁজে পাবে। হয়তো এ সপ্তাহেই খুলে যাবে ট্রাকের তালা।

অন্ধকার একটু ঘন হয়ে আসতেই কিটসন ক্যারাভ্যানের দরজা খুলে দিল। ওরা ক্ষিপ্রগতিতে ঢুকে গেল কেবিনের ভেতরে।

জিনি ওদের খাবার ব্যবস্থা করেই রেখেছিল, সুতরাং দেরি না করে খেতে বসল ওরা। গোগ্রাসে খেতে শুরু করল। মাঝে মধ্যে গম্ভীরভাবে কিটসনকে দেখছিল ব্লেক। কিটসনের মুখ সারাদিনের উত্তাপে তামাটে হয়ে উঠেছে। তার মানে জিনিকে নিয়ে সারাটা দিনই বাইরে বাইরে কাটিয়েছে। মুহূর্তের জন্য ঈর্ষা ও ক্রোধের তরঙ্গ ছুঁয়ে গেল ব্লেকের মনকে।

জিপো একমনে খেয়ে চলল। খাওয়া শেষে ওর মুখমণ্ডল থেকে মিলিয়ে গেল ক্লান্তি ও হতাশার ছাপ। সে আবার আগের মতোই সুস্থ, সতেজ হয়ে উঠল।

খাওয়া শেষ করে একটা আরাম কেদারায় গা-এলিয়ে দিল ব্লেক। একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ ফেরাল অবশিষ্ট তিনজনের দিকে, ‘শোনো, আজ কিছু না হলেও সামান্য এগোনো গেছে। একটা কম্বিনেশন নম্বর মেলাতে পেরেছে জিপো। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন থেকে রাতেও ক্যারাভ্যানের পাহারায় থাকা দরকার। কারণ, কেউ অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে ক্যারাভ্যানের জানলা দিয়ে উঁকি মারুক, বা দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করুক তা আমরা চাই না। কিটসন, এই রাতে পাহারা দেবার দায়িত্বটা তোমাকেই নিতে হবে। সারাদিন তোমার কোনও কাজই থাকে না, সুতরাং আশা করি রাতে এই সামান্য কষ্টটুকু তুমি সইতে পারবে।’

কিটসন কাঁধ ঝাঁকাল; বোঝাতে চাইল, এ আর বেশি কথা কী।

সে উপলব্ধি করল, ব্লেকের কথায় যুক্তি আছে। রাতে কোনও চোর-ছ্যাঁচোড়ের মাথায় ক্যারাভ্যান লুট করার মতলব গজিয়ে ওঠাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর সত্যিই যদি কেউ সে মতলব করে, তাহলে তাদের সমস্ত পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে।

‘ঠিক আছে।’ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল কিটসন, ‘আমি তাহলে ক্যারাভ্যানেই যাচ্ছি।’

কিটসন বিনা প্রতিবাদে তার কথা মেনে নেওয়ায় ভীষণ অবাক হল ব্লেক। সে চেয়ে রইল প্রস্থানরত কিটসনের দিকে। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা আবার টেনে বন্ধ করে দিল কিটসন। আজ সকালটা তার ভালোই কেটেছে। বাইরের লোকের সামনে অভিনয় হলেও সে অন্তরঙ্গভাবে জিনিকে কাছে পেয়েছে। তার মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশাও শেষ পর্যন্ত জন্মাতে শুরু করেছে : জিনি কি তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে?

কিন্তু সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কিটসন পায়নি। একেক সময় জিনির চোখে চেয়ে তার মনে হয়েছে এর সবটাই বুঝি অভিনয়—তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তবুও হাল ছাড়েনি কিটসন। এখন তার একমাত্র নেশা জিনি গর্ডন।

কিটসন বেরিয়ে যেতেই ব্লেক ফিরে তাকাল জিনির দিকে, ‘আজ আমি আর জিপো বিছানায় শোব; তুমি সোফায় শোবে। কারণ সারাদিন ধরে আমরা কম পরিশ্রম করিনি—সুতরাং আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। তোমার এতে আপত্তি আছে নাকি?’

নির্লিপ্তভাবে কাঁধ ঝাঁকাল জিনি, ‘না—আপত্তি থাকবে কেন?’

ব্লেক অচঞ্চল চোখে চেয়ে রইল, 'অবশ্য জিপো যদি সোফায় শুতে চায়, তবে—'

'ধন্যবাদ—তার কোনও প্রয়োজন হবে না; আমি সোফাতেই শুতে পারব।' সংক্ষিপ্ত স্বরে বাধা দিল জিনি। ব্লেকের ইঙ্গিত ধরতে তার অসুবিধে হয়নি।

ব্লেক হাসল, 'তোমার যা ইচ্ছে।' উঠে দাঁড়াল সে। ঘরের তাকে রাখা তাসের একটা প্যাকেট নামিয়ে নিয়ে এল। চেয়ারে বসে তাস ভাঁজতে শুরু করল, 'কী এক হাত হবে নাকি?'

'না, আমি এখন একটু বাইরে হাঁটতে যাব। ফিরে এসে এ ঘরটা যেন খালি পাই।'

ঘরের থমথমে পরিবেশ জিপোর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। একমনে সে শুনতে লাগল ওদের কথাবার্তা।

'নিশ্চয়ই খালি পাবে।' ব্লেক তখনও হাসছে, 'এই জিপো, চলো আমরা শোবার ঘরে গিয়ে তাস খেলি। বিছানায় বসেই তাস পাতা যাবে—।'

জিপো উঠে গেল শোবার ঘরে।

'যাক, তোমার ঘর তাহলে খালি করে দিলাম, জিনি। কিন্তু আলেক্সের সঙ্গে দিনটা কী রকম কাটল বলো, শুনি। শেষ পর্যন্ত কি ওর গলায় ঝুলেই পড়লে?'

জিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, দু-চোখে নগ্ন ঘৃণা, 'আমার সঙ্গে ফ্র্যাঙ্কের কি সেই কথাই ছিল?' শান্ত স্বরে পালটা প্রশ্ন করল ও।

'না, তা নয়, কিন্তু বলা তো যায় না, তোমার কোমল হৃদয়ের মধ্যে কখন কী ঘটে যায়। অবশ্য কিটসনকে পছন্দ করার মতো মেয়ে এই আমেরিকাতে খুব কমই আছে। তবে সে যে তোমাকে মন প্রাণ সঁপে দিয়ে বসে আছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই।'

জিনি উঠে এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে।

ব্লেকের চোখ ওকে অনুসরণ করল, 'আমরা দুজনে জুটি বাঁধলে কেমন হয়, সুন্দরী? ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখলে হয় না?' দরজা খুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জিনি।

'তোমার মাথার ঠিক নেই।' কথাটা বলেই ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাইরের অন্ধকার পরিবেশে। একবার পিছন ফিরে তাকাবার প্রয়োজনও অনুভব করল না। যাওয়ার আগে সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজাটা।

দু-চোখে শীতল, কুৎসিত দ্যুতি নিয়ে ইতস্তত করল ব্লেক। একবার মনে হল, এখুনি ছুটে যায় জিনির পিছনে, তার সঙ্গে ওই ভাবে কথা বলার পরিণতি যে ভালো নয়, সেটা ভালো করে ওকে সমঝে দেয়—কিন্তু... কিন্তু কিটসন তাহলে বেরিয়ে আসবে ক্যারাভ্যান থেকে; আর কিটসনের সঙ্গে চরম বোঝাপড়ার জন্যে ঠিক এই মুহূর্তে সে প্রস্তুত নয়।

সুতরাং নিজেকে সংযত করে উঠে দাঁড়াল ব্লেক। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে এল শোবার ঘরে।

জিপো বিছানার ওপরেই বসে ছিল। সে যে খুব একটা স্বস্তি বোধ করছে না, সেটা তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

ব্লেককে দেখেই সে বলে উঠল, 'এড, তুমি মেয়েটাকে ছেড়ে দাও। একেই আমাদের হাতে সমস্যার অন্ত নেই, তার ওপর আবার এই মেয়ের ঝামেলা!'

'ওঃ থামো দেখি!' খিঁচিয়ে উঠল ব্লেক। তারপর বিছানায় বসে তাস বাঁটতে শুরু করল।

রাত এগারোটা নাগাদ ওরা জিনির ফিরে আসার শব্দ পেল। মিনিট কয়েক পরেই ওদের কানে এল কলঘরে জল পড়ার শব্দ—সম্ভবত জিনি স্নান করছে।

সিগারেটের টুকরোটা ঘষে নিভিয়ে তাসগুলো প্যাকেটে ভরে ফেলল ব্লেক, 'এসো জিপো, এবার শুয়ে পড়া যাক, কাল অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমরা ক্যারাভ্যানে ঢুকে পড়ব।'

জিপো একেই ভীষণ ক্লান্ত ছিল, সুতরাং আলো নিভিয়ে দেওয়ার মিনিট দশেক পরেই সে নাক ডাকতে শুরু করল।

অন্ধকারে চোখ মেলে কান খাড়া করে শুয়ে রইল ব্লেক। বসবার ঘরে জিনির নড়াচড়ার শব্দ সে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। মিনিট কয়েক পরেই পাশের ঘর থেকে আলো নেভানোর শব্দ পেল সে।

নারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে সরাসরি পদ্ধতিতেই ব্লেকের বিশ্বাস, তার মতে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা সময়ের অপব্যবহারেরই নামান্তর। সুতরাং—

সুতরাং গায়ের চাদর ছুড়ে ফেলে উঠে বসল ব্লেক। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে এগিয়ে চলল ঘরের দরজার দিকে। একমুহূর্তে থমকে সে ফিরে তাকাল নিদ্রামগ্ন জিপোর দিকে। তারপর আশ্বস্ত হয়ে দরজার হাতল ঘোরাতে শুরু করল। অতি সন্তপর্ণে দরজা খুলে বসবার ঘরে পা-রাখল ব্লেক। আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিল শোবার ঘরের দরজা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠল ঘরের আলো। জিনি উঠে বসল সোফায়। ওর পরনের ফিকে নীল রাত্রিবাস ব্লেকের কামনাকে করে তুলল দুর্দম। সে একগাল হাসিতে মুখ ভরিয়ে এগিয়ে গেল জিনির দিকে... সোফার কাছে গিয়ে থামল ব্লেক। চোখ নামিয়ে তাকাল জিনির তেইশ বসন্তের যৌবনের দিকে।

‘ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করি। দেখি—সরে বোসো একটু।’ হাতের একটা ভঙ্গি করে সোফায় জিনির পাশে বসতে গেল ব্লেক।

জিনি স্থির ভাবে বসে রইল; ওর সাগর-সবুজ চোখ ভাবলেশহীন, নিষ্পলক।

‘বেরিয়ে যাও।’ চাপা স্বরে আদেশ দিল জিনি।

‘ওহ-হো—তুমি দেখছি এখনও আমার ওপর রাগ করে আছ?’ সোফার হাতলে বসে পড়ল ব্লেক, ‘কিন্তু জানো, তোমার জন্যে আমি কত কী ভেবে রেখেছি? লক্ষ্মীটি, জিনি, একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো। নিজেদের ভাগের টাকা পেয়ে গেলে আমরা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াব। আমি তোমাকে নিয়ে যাব লন্ডনে, প্যারিসে। তুমি কি আমার সঙ্গী হতে রাজি নও?’

‘আমি তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলেছি।’ জিনি আবার বলল। ওর মুখের নির্লিপ্ত, শান্ত ভাব ব্লেকের উত্তেজনাকে আরও অধৈর্য করে তুলল।

‘না, তেমন করে না বললে তুমি শুনবে না দেখছি...’ ব্লেক হাত বাড়িয়ে জিনিকে জড়িয়ে ধরল। ওকে কাছে টানতে যেতেই সে অনুভব করল, তার বুকে কোনও ধাতব বস্তুর কঠিন পরশ।

চোখ নামাতে তার হৃৎপিণ্ডর গতি পলকের জন্যে স্তব্ধ হয়েই উন্মাদের মতো ছুটতে শুরু করল। তার বুকে একটা .৩৮ চেপে ধরেছে জিনি।

‘আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে নাও।’ ইস্পাত শীতল স্বরে আদেশ করল জিনি। ব্লেক ভয় পেল। ‘খুব ধীরে ধীরে হাত সরাবে—নয়তো একেবারেই ঝাঁঝরা করে দেব।’

অতি সাবধানে, ধীরে ধীরে জিনির শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিল ব্লেক। আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে কাঠ। কেন যেন তার মনে হল, এতটুকু বেচাল দেখলেই জিনি সত্যি সত্যি তাকে নৃশংসভাবে খুন করবে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে হাত তুলে ধরল ব্লেক, চোখের দৃষ্টি .৩৮ এর শীতল নলের ওপর।

‘এবার উঠে দাঁড়াও। আস্তে, আস্তে—হাত দুটো মাথা থেকে নামাবে না।’

ধীরে-ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল ব্লেক। পায়ে-পায়ে পিছোতে শুরু করল।

‘বেরও ঘর থেকে!’ রিভালভারটা সোজাসুজি ব্লেকের বুক লক্ষ করে উঁচিয়ে ধরল জিনি, ‘যদি দ্বিতীয় দিন এরকম সুযোগ নেবার চেষ্টা করো, তাহলে তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারব। এবারে নিজের ঘরে কেটে পড়ো, দরজার বাইরে আর এসো না।’

ব্লেক গভীরভাবে শ্বাস নিল, 'আচ্ছা, সুন্দরী। তোমাকে আমি দেখে নেব। এখন থেকে সাবধান থেকো। এডওয়ার্ড ব্লেক কখনও অপমানের বদলা নিতে ছাড়ে না।'

'থাক, থাক—অনেক হয়েছে।' জিনি ব্যঙ্গভরে বলে উঠল, এখন রাস্তা দেখুন, শ্রীমান। এরপর থেকে প্রস্তুত হয়ে অভিসারে আসবেন।'

শোবার ঘরে ফিরে এসে ব্লেক দরজা বন্ধ করে দিল। রাগে অপমানে তার সর্বশরীর কাঁপছে।

জিনি যদি এরপরও ভেবে থাকে যে ওর ভাগের দু-লাখ ডলার ওকে দেওয়া হবে, তাহলে ভীষণ ভুল করবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ব্লেক।

জিনিকে সে উচিত শিক্ষা দেবে। তাকে বন্দুক দেখানোর পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর, সেটা সে ওকে হাড়ে-হাড়ে সমঝে দেবে।

কিটসনকেও ব্লেক ছাড়বে না। জিনি আর ওই মাথামোটা কিটসনকে সে এমন দাওয়াই দেবে, যা ওরা কোনওদিনই ভুলবে না।

হঠাৎই অন্ধকারের মধ্যে হিংস্রভাবে দাঁত বের করে হেসে উঠল ব্লেক।

আড়াই লাখ ডলারের চেয়ে সাড়ে সাত লাখ ডলারের আবেদন যে কোনও মানুষের কাছেই অনেক বেশি—ব্লেকের কাছে তো গোটা সাম্রাজ্য।

টাকাটা নিয়ে সে কিভাবে খরচ করবে, সেটা শুয়ে-শুয়ে বহুক্ষণ ধরে ভাবল ব্লেক।

হঠাৎ একসময় আরও একটা অদ্ভুত চিন্তা ব্লেকের মাথায় এসে জমাট বাঁধল। জিপোকেও যদি সে সরিয়ে দেয়, তাহলে কেমন হয়? তখন পুরো টাকাটাই সে একা ভোগ করবে—কোনও অংশীদারই থাকবে না।

সাড়ে সাত লাখের চেয়ে পুরোপুরি দশ লাখ অনেক বেশি। ফ্র্যাঙ্ক বলেছিল পৃথিবীকে সে রাখবে হাতের মুঠোয়।

'হুঁঃ...দশ লাখ ডলার থাকলে এই পৃথিবীটাকে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচতে পারে ব্লেক। সে সহজেই হতে পারে এই পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট।

নয়

পরবর্তী দুটো দিন একই ভাবে কেটে গেল। প্রতিদিন খুব ভোরে ব্লেক আর জিপো চলে যায় ক্যারাভ্যানে, আর কিটসন ফিরে আসে কেবিনে। ঘণ্টাকয়েক বিশ্রামের পর সে আর জিনি বেরিয়ে পড়ে কেবিনের বাইরে—তাদের দৈনন্দিন অভিনয় পর্বকে বাস্তবানুগ করে তুলতে তারা হাতে-হাত রেখে ঘুরে বেড়ায় হ্রদের ধারে, নৌকো করে ভেসে বেড়ায় হ্রদের নীল জলে, অথবা সাঁতারে হয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

জিপো সারাটা দিন লেগে থাকে ট্রাকের দরজার পিছনে। আর সেই সময়টা খবরের কাগজ পড়েই কাটিয়ে দেয় ব্লেক।

দৈনন্দিন খবরগুলো ব্লেকের মনে রীতিমতো আশার উদ্রেক করল। কারণ পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর লোকেরা উধাও ট্রাকটাকে খুঁজতে দিশাহারা হয়ে পড়েছে। অবশ্য তারা এখনও অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হয়নি, কিন্তু কাগজওলাদের কাছে পুলিশের বক্তব্যে হতাশার সুরটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, ট্রাকটাকে অন্য কোনও গাড়িতে উঠিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু অতবড় জিনিসটা কী করে যে বেমালুম অদৃশ্য হল সেটা তারা এখনও ভেবে পাচ্ছে না। তাদের ধারণা, ইতিমধ্যেই ট্রাকটাকে আমেরিকার বাইরে পাচার করে ফেলা হয়েছে। প্রায় পাঁচশো মাইল জায়গা জুড়ে তারা তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালাচ্ছে এবং পুরস্কারের অঙ্ক বাড়িয়ে করা হয়েছে পাঁচ হাজার ডলার।

দুশো সৈনিক ও পুলিশ মিলে ফক্স উডকে চিরুনির মতো আঁচড়ে দেখেছে, উধাও ট্রাকের কোনও হদিশ পাওয়া যায় কি না। তাছাড়া রাস্তায়-রাস্তায় শ্যেনচক্ষু মেলে টহল দিচ্ছে উড়ন্ত হেলিকপ্টার।

সৈন্যবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, আজ হোক কাল হোক, ট্রাক তারা খুঁজে বের করবেই। কারণ ট্রাকটা যেভাবে অদৃশ্য হয়েছে, এবং এখনও পর্যন্ত হয়ে আছে, তা বাস্তবে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী যে হারে পরিশ্রম করে চলেছে, সেই একইভাবে পরিশ্রম করে চলেছে ব্লেক ও জিপো—ক্যারাভ্যানের ভেতরে, লোকচক্ষুর আড়ালে।

গত দু-দিন ধরে জিপোর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

সারাদিন সে ক্যারাভ্যানের বদ্ধ আবহাওয়ায়, অসহ্য গরমের মধ্যে ধৈর্য ধরে কাজ করে গেছে। টুলে বসে ঘর্মাক্ত দেহে একমনে কান পেতে থেকেছে। মাঝে মাঝে বিরক্তিভরে ট্রাকের তালাকে অভিসম্পাত করেছে জিপো। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। দ্বিতীয় কম্বিনেশন নম্বরটা তার অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

খবরের কাগজ পড়া আর জিপোর কার্যকলাপ লক্ষ করা ছাড়া ব্লেকের আর কোনও কাজ ছিল না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই যতই সময় গেছে, সে ততই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ক্যারাভ্যানের প্রচণ্ড গরম, তালা খোলার সমস্যা—ইত্যাদি চিন্তায় ব্লেকের স্নায়ুমণ্ডলী একেই ভারাক্রান্ত, তার ওপর জিনি ও কিটসনের কথা মনে হতেই সে অন্ধ ক্রোধে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কোথায় এখানে তারা গলদঘর্ম হয়ে পরিশ্রম করে চলেছে, আর কিটসন কি না জিনিকে নিয়ে ঘুরে ফিরে মজা লুটছে।

কিটসন যতই নির্বোধ হোক না কেন, একদিনের একান্ত অবসরে জিনির মনের ওপর মোটামুটি একটা ছাপ সে রাখতে পেরেছে বলেই ব্লেকের ধারণা। কারণ পুরো তিন-তিনটে দিন হাতে পেয়ে কোনও মানুষই এমন সুযোগ হাতছাড়া করবে না। ব্লেক নিজে যদি মাত্র বারো ঘণ্টাও সময় পেত, তাহলে ওই সময়ের মধ্যেই জিনি তার কাছে আত্মসমর্পণ করত। সুতরাং বিরক্তি ও মানসিক অস্বস্তির মধ্যেও জিনি-কিটসনের ভাবনা তার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলল।

তৃতীয় দিন সন্ধে ছটা নাগাদ জিপো ভেঙে পড়ল। অপরাহ্নের সূর্য তখন সুদুর পর্বতশ্রেণির আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছে। বেলাশেষের রক্তিম আভা প্রতিফলিত হয়েছে হ্রদের স্বচ্ছ জলে। ঠিক সেই সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদ হয়ে পড়ল জিপো।

গত তিনদিন ধরে এই অসহনীয় পরিবেশে জিপো একটানা কাজ করে গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে উপলব্ধি করল, সে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় কম্বিনেশন নম্বরটা সে মেলাতে পারেনি। কম্বিনেশন চাকতিটা সে একচুল-একচুল করে পুরোটা ঘুরিয়েছে, কিন্তু তবুও দ্বিতীয় নম্বরটা মেলেনি। কারণ জিপোর তীক্ষ্ণ কানে নম্বর মেলানোর অস্ফুট ধাতব শব্দটা ধরা পড়েনি। অর্থাৎ চাকতিটাকে সে প্রয়োজনমতো সতর্ক হাতে ঘোরাতে পারেনি। যার ফলে দ্বিতীয় নম্বরের বিশেষ জায়গাটা সে বরাবরই পার হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে দক্ষ হাতজোড়া জিপোর গর্বের বস্তু ছিল, তারা কম্বিনেশন চাকতিকে তেমন সূক্ষ্মভাবে ঘোরাতে পারেনি।

'না, এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।' হঠাৎই চিৎকার করে উঠেছে জিপো। ট্রাকের দরজার গায়ে অবসন্নভাবে গা-এলিয়ে দিয়েছে। 'এ তালা খোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এড! এভাবে বেগার খেটে কোনও লাভ নেই। বিশ বছর ধরে চেষ্টা করলেও এই ট্রাকের দরজা আমি খুলতে পারবও না! আমাকে ছেড়ে দাও, এড। আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

জিপোর কণ্ঠস্বরে অপ্রকৃতিস্থতার আভাস ব্লেককে চঞ্চল করে তুলল। চট করে উঠে দাঁড়াল সে, রিভলভার হাতে এগিয়ে এল জিপোর কাছে।

'থামো!' রিভলভারের নলটা জিপোর পাঁজরে চেপে ধরে খিঁচিয়ে উঠল ব্লেক, 'যদি এই ট্রাকের তালা তুমি না খোলো, তাহলে তোমাকে আমি খুন করব!'

জিপো অসহায়ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার স্থুল দেহ কান্নার দমকে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

‘তাই করো! খুন করো আমাকে। তুমি কি ভেবেছ মরতে আমি ভয় পাই?’ ভাঙা কর্কশ স্বরে জিপো চিৎকার করে উঠল, ‘কিন্তু এই শালার ট্রাকের তালা তুমি আমাকে খুলতে বোলো না! তার চেয়ে মেরেই ফেলো আমাকে! আমি আর পারছি না!’

রিভলভারের নল দিয়ে নৃশংসভাবে জিপোকে আঘাত করল ব্লেক—সরাসরি মুখের ওপর। জিপো ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তার গাল কেটে দরদর করে রক্ত বেরোতে লাগল। সেই রক্তের ধারা গলা বেয়ে নেমে এল তার বুকের ওপর। ট্রাকের পাশেই অবসন্নভাবে পড়ে রইল সে চোখ দুটো যন্ত্রণায় বোজা।

‘মেরে ফেলো! শেষ করে দাও আমাকে। আমি এসব আর সইতে পারছি না?’ জিপো হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল। তার রক্তাক্ত মুখ বীভৎস হয়ে উঠেছে।

‘থাম বলছি শাল কুত্তির বাচ্চা। নয়তো গলা টিপে তোকে শেষ করে দেব?’ মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল ব্লেক। জিপোর অবস্থা দেখে সে তখন চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সত্যিই যদি জিপো শাসনের বাইরে চলে যায়, তাহলে তাদের সমস্ত পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে। তাছাড়া এই চেঁচামেচির শব্দ বাইরের লোকের কানেও তো যেতে পারে।

‘আমি আবারও বলছি এড, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। এ তালা আমি খুলতে পারব না।’ কান্নাভেজা স্বরে আকুতি জানাল জিপো। তারপর দু-হাতে মুখ ঢাকল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যারাভ্যানের দরজায় কে যেন টোকা মারল একবার... দু-বার। ব্লেকের হৃৎপিণ্ড যেন হোঁচট খেল। কে এল এই অসময়ে?

জিনি আর কিটসনকে সে দেখেছে বুইক নিয়ে শহরের দিকে যেতে—সম্ভবত কিছু কেনাকাটা করতে। না, বর্তমান আগন্তুক যে ওদের দুজনের কেউ নয়, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। তাহলে...?

জিপো আবার তার গোঙানি শুরু করতেই ব্লেক তার হাত চেপে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল, হিংস্র ফিসফিস স্বরে ধমকে উঠল, ‘চুপ করো। ক্যারাভ্যানের দরজায় কেউ এসেছে!’

জিপোর সারা শরীর আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল সে।

ওরা দুজন নিশ্চল; শুধু কান খাড়া করে পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষায় রইল।

আবার শোনা গেলে দরজায় টোকা মারার শব্দ।

হাতের ইশারায় জিপোকে তার জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বলল ব্লেক। তারপর রিভলভারটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল পরদা-ঢাকা জানলার দিকে। একপাশে দাঁড়িয়ে অতি সন্তর্পণে পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল সে।

ক্যারাভ্যানের দরজায় দাঁড়িয়ে একটা বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে। ক্যারাভ্যানটার দিকে সংশয়াপন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাঝেমাঝেই সে টোকা মেরে চলেছে। তার হাতে একটা খেলনা পিস্তল, দরজার দিকে তাক করা।

ব্লেক চুপচাপ ছেলেটাকে লক্ষ করতে লাগল। তার ঠোঁটজোড়া নৃশংস হাসিতে সরে এসেছে দাঁতের ওপর থেকে। চোখে ক্রূর দৃষ্টি।

ছেলেটার পরনে সুতির প্যান্ট, আর সাদা লাল ডোরাকাটা একটা জামা। পায়ে জুতো বা চটি কিছুই নেই। মাথায় অবহেলাভরে বসানো একটা ভাঙাচোরা শোলার টুপি। কৌতূহলভরা স্থির চোখে ছেলেটা তাকিয়ে আছে ক্যারাভ্যানের দরজার দিকে। তার সূর্যস্নাত মুখে কেমন একটা হতবুদ্ধি ভাব।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছেলেটা অবাক চোখে ক্যারাভ্যানটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর যেন মনস্থির করে দরজার আরও কাছে এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে জানলার চৌকাঠ চেপে ধরল সে। হাতের চাপে নিজের শরীরটাকে জানলা পর্যন্ত তুলতে চেষ্টা করল—সম্ভবত জানলা দিয়ে ক্যারাভ্যানের ভেতরটা দেখবার আশায়।

ব্লেকের মুখের ভয়ার্ত, হিংস্র ভাব জিপোর চোখ এড়াল না। কিছু একটা বিপদের আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল। ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে ব্লেকের কাছে এগিয়ে এল সে। ছেলেটাকে দেখেই জিপো যেন আঁতকে উঠল।

তার হাত সজোরে আঁকড়ে ধরল ব্লেকের রিভলভার ধরা হাতের কবজি।

'না! একটা বাচ্চাকে তুমি গুলি করতে যাচ্ছ? তুমি কি পাগল হয়েছ, এড?' জিপো তীব্রস্বরে ফিসফিস করে বলল।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনিতে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল ব্লেক। কিন্তু যখন সে দেখল, ছেলেটা শত চেষ্টাতেও জানলা পর্যন্ত উঠতে পারছে না, তখন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ছেলেটা জানলার চৌকাঠ ছেড়ে মাটিতে নেমে পড়ল। আবার অবাক চোখে তাকাল ক্যারাভ্যানের দিকে। চোখে মুখে হতাশা।

কয়েক মুহূর্ত ক্যারাভ্যানের দিকে তাকিয়ে থেকে সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে হ্রদের কিনারা ধরে হাঁটতে শুরু করল। বারকয়েক চিন্তিত ভাবে মাথা নেড়ে এগিয়ে চলল ছেলেটা।

'তোমার কি মনে হয় ও আমাদের কথা শুনতে পেয়েছে?' উদগ্রীব স্বরে জানতে চাইল ব্লেক।

'কী জানি!' ছেলেটার আকস্মিক উপস্থিতির মানসিক সংঘাতে জিপোর বিচার বিবেচনা হঠাৎই আবার ফিরে এসেছে।

'ওঃ, আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।' হাতের উলটোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল ব্লেক, 'জিপো তুমি এখানে এসে বসো; একটু বিশ্রাম নাও, আমি বরং তালাটা খোলবার চেষ্টা করি।'

'তুমি খুলবে তালা?' অবিশ্বাস-বিরক্তিতে জিপো মুখ বিকৃত করল, 'খবরদার বলছি, ওই তালায় তুমি হাত দেবে না। কাজের কাজ তো কিছুই পারবে না, উলটে যে নম্বরটা মিলিয়েছি সেটাকেও নষ্ট করে দেবে।'

ব্লেক ক্ষিপ্রগতিতে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল জিপোর জামা। এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে রাগে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমিও খুলবে না, আমাকেও খুলতে দেবে না, তাহলে তালাটা খুলবে কে?'

'তুমি কি এখনও বুঝতে পারছে না, এড? এ তালা আমরা কোনওদিনই খুলতে পারব না। গত তিনদিন ধরে আমি এই তালাটার পেছনে লেগে থেকেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করেছি। কিন্তু তাতে লাভ কী হল? শুধু একটা নম্বর মিলল, আর বাকিগুলো যেমনকে তেমনই রয়ে গেল, অথচ এই তালাটায় কম করে ছ-টা নম্বর আছে। অর্থাৎ পাঁচ-পাঁচটা নম্বর এখনও আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। মেনে নিলাম, হয়তো সপ্তাহের চেষ্টার পর-একটা নম্বর আমি মেলাতে পারলাম—অবশ্য পারবই যে তেমন কোনও কথা আমি দিতে পারছি না। যদি খুঁজে পাই, তবে তখনও বাকি থাকবে চারটে সংখ্যা। ততদিনে আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব, এড!' এই প্রচণ্ড গরমে কারও পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। আমার পক্ষে তো নয়ই। অতএব, আমাকে বিদায় দাও। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে; আর নয়। শত টাকা দিলেও এ কাজ আমার পোষাবে না, বুঝেছো? এই অমানুষিক পরিশ্রমের মূল্য কখনও টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না—যাবে না!'

'আঃ থামো তুমি!' ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠল ব্লেক, 'কী সব বকছ আবোল-তাবোল!'

কিন্তু ব্লেকের আত্মবিশ্বাসও টলে উঠল জিপোর কথায়। সে বুঝল, জিপোর কথায় যুক্তি আছে। ক্যারাভ্যানের ভেতরে এই উত্তপ্ত পরিবেশে তিন-চার সপ্তাহ কাটানোর কথা চিন্তা করতেই শিউরে উঠল ব্লেক।

জিপো হতাশভাবে বসে পড়ল টুলে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে হাত চাপা দিয়ে, নিরাশ চোখে চেয়ে রইল কম্বিনেশন চাকতিটার দিকে।

'দরজাটা কেটে ফেলা যায় না? জানতে চাইল ব্লেক।

'এই ক্যারাভ্যানে বসে? অসম্ভব। লোকেরা বাইরে থেকে অ্যাসিটিলিন টর্চের আলো দেখতে পাবে। তাছাড়া কিরকম গরম হবে একবার ভেবে দেখো তো। আর তার ওপর ক্যারাভ্যানে আগুন লাগবার ভয় তো রয়েছেই!'

‘আচ্ছা, ক্যারাভ্যানটাকে যদি পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাওয়া যায়? ফ্র্যাঙ্ক বলেছিল, প্রয়োজন হলে ক্যারাভ্যানটাকে আমরা পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাব। এখন আমারও মনে হচ্ছে, ও ছাড়া আর উপায় নেই। সেখানে তুমি ক্যারাভ্যানের দরজা খোলা রেখেই বেশ নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে। কোনও অসুবিধে হবে না কী বলো?’

রক্ত বন্ধ করার আশায় রুমাল বের করে গালের ক্ষতস্থান চেপে ধরল জিপো, ‘আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর নয়। এবারে আমি বাড়ি ফিরতে চাই। এই হতচ্ছাড়া তালা খোলা কারোর কম্মো নয়? এ তালাকে কেউই শায়েস্তা করতে পারবে না!’

‘ঠিক আছে, ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক।’ ব্লেকের গলায় হঠাৎই ফুটে উঠল শ্লেষের সুর, ‘কিন্তু তোমার সাহস গেল কোথায়? এই ট্রাকের ভেতরে রয়েছে দশ লক্ষ ডলার! দশ লাখ ডলার! একবার ভালো করে ভেবে দেখো, জিপো!’

‘ঢের ভেবে দেখেছি। দশ লাখ কেন, দশ কোটি হলেও আমি এর মধ্যে নেই।’ জিপোর গলা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল, ‘তোমাকে তো বার বার একই কথা বলছি। তুমি কি বাংলাও বোঝ না?’

ব্লেক বসে পড়ল ক্যারাভ্যানের মেঝেতে, ‘থামো, অনেক হয়েছে। আগে ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলে দেখি।’

ওদিকে জিনি আর কিটসন পনেরো মাইল দুরের শহরে সারা বিকেল ধরে কেনাকাটা করে ফিরে আসছে বুইক চালিয়ে। ওরা জানেও না ক্যারাভ্যানে ঘটে যাওয়া নাটকের কথা।

স্থানীয় দোকান থেকে খাবার জিনিসপত্র কেনাকাটায় যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা জিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিল। কারণ দোকানদার খাবারের পরিমাণ দেখেই আন্দাজ করতে পারবে এ খাবার স্বামী-স্ত্রীর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। তখনই প্রশ্ন উঠবে অতিরিক্ত লোক সম্পর্কে। অর্থাৎ ব্লেক ও জিপোর উপস্থিতি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাই ওরা ঠিক করেছিল, রোজকার কেনাকাটা ওরা শহরে গিয়েই নিশ্চিন্তে সেরে আসবে।

গত দুদিন ধরে কিটসন ও জিনি পরস্পরকে সঙ্গদান করেছে। এসেছে পরস্পরের মনের কাছাকাছি।

নিজের অংশের টাকা পাওয়ার পর ও কিটসনের সঙ্গিনী হবে কি না, এ নিয়ে বেশ দ্বিধায় পড়ে গেছে জিনি। ও জানে, কিটসন ওকে ভালোবাসে। এবং ক্রমে ক্রমে জিনিও আবিষ্কার করেছে, কিটসনকে ও ভালোবেসে ফেলেছে। কারণ ব্লেকের মতো কিটসনের ব্যবহার অভদ্র বা রুক্ষ নয়। বরং কিটসনের সান্নিধ্য ওকে নিরাপত্তার ইঙ্গিত এনে দেয়।

ওরা গাড়ি ছুটিয়ে চলেছে বড় রাস্তা ধরে—ফন হ্রদ অভিমুখে। থেকে থেকেই আড়চোখে কিটসনকে দেখছে জিনি। না, ভাঙা নাক বাদ দিয়ে কিটসনকে সুদর্শনই বলা চলে—ভাবল ও। হঠাৎই ওর ভীষণ ইচ্ছে হল আলেক্সকে সব কথা খুলে বলে—যে কথা বারবারই জানতে চেয়েছে সে, কিন্তু জবাব পায়নি।

‘আলেক্স...’

কিটসন এক পলক দেখল জিনির দিকে; তারপর আবার চোখ রাখল সামনের রাস্তায়। জিনি পাশে থাকলে সে খুবই সতর্কভাবে গাড়ি চালায়।

‘কী ব্যাপার? কিছু বলবে?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ—’ ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল জিনি। কাঁধের ওপর বিশ্রস্তভাবে পড়ে থাকা চুলের গোছা হাত দিয়ে সরিয়ে নিল স্বস্থানে, ‘একদিন তুমি জানতে চেয়েছিলে কী করে ট্রাক বা তার টাকার খবর আমি পেলাম তাইতো?’

‘হ্যাঁ।’

‘তুমি কি এখনও জানতে চাও, আলেক্স?’

কিটসন অবাক হল। আমতা আমতা করে জবাব দিল সে, 'না মানে আমার এমনিই মনে হয়েছিল। তাছাড়া তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার নাক গলানো উচিত হয়নি।...কিন্তু এখন আবার তোমার সে কথা মনে হল কেন?'

'তুমি আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছ, আলেক্স। তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে আমার কাছে অসহ্য ও বিরক্তিকর হয়ে উঠত। কিন্তু তোমার মার্জিত, ভদ্র ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই আমার সব কথা আমি তোমাকে খুলে বলতে চাই।...আলেক্স, এর আগে আমি অন্য কোনও দলের হয়ে কখনও কাজ করিনি—'

কিটসন মাথা নাড়াল, 'আমি তো কখনও তা ভাবিনি।'

'তুমি ভাবনি, কিন্তু মরগ্যান ভাবত। সে ভাবত, আমি অন্য কোনও দলের কাছ থেকে ট্রাক লুটের এই মতলবটা চুরি করে বেশি বখরার লোভে তোমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছি: সে মুখে কখনও প্রকাশ না করলেও আমি জানতাম মরগ্যান মনে মনে কী ভাবছে।'

অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসল কিটসন। কারণ সে জানে, জিনির ধারণা বর্ণে-বর্ণে সত্যি। সত্যিই মরগ্যান তাই ভাবত।

'কী জানি। হতে পারে। তবে আমি কখনও ভাবিনি, তুমি আগে অন্য কোনও দলের হয়ে কাজ করেছ।'

'আমি ওই ট্রাক এবং দশ লক্ষ ডলারের কথা জানতে পারি আমার বাবার কাছ থেকে। আমার বাবা ছিলেন রিসার্চ স্টেশনের প্রহরী।' শান্ত স্বরে বলল জিনি।

'তাই নাকি!' চকিতে জিনির দিকে দেখল কিটসন, 'তবে তো সবই তোমার জানা থাকার কথা।'

'মনে কোরো না, আমি নিজেকে সতী সাধ্বী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি।' গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিল জিনি। চোখের দৃষ্টি সামনের রাস্তায় স্থির। 'আমার মায়ের স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভালো ছিল না। তার কিছু কিছু দোষ আমি যে পাইনি তা নয়।আমার বয়েস যখন দশ বছর, তখন মা বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। মা সর্বদাই আমাকে বলত, টাকা ছাড়া এই দুনিয়া ফাঁকা। দিন-রাত সব সময় মায়ের মুখে কেবলই টাকার কথা শুনেছি। আমার বাবা ছিল ভালো লোক; কিন্তু হলে কী হবে, তার আয় ছিল খুব সামান্য। বাবা কোনওদিন আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার টাকার লোভ ক্রমশ বেড়ে চলল। যত বড় হতে লাগলাম, মনের সেই অদম্য লোভ ক্রমশ ততই বিরাট আকার ধারণ করতে লাগল। আমার মনে বয়ে যেত চিন্তার ঝড়—শুধুই ঐশ্বর্য কামনায়। ভালো জামাকাপড় কাকে বলে জানতাম না। ন-মাসে ছ-মাসে মাত্র একবার সিনেমা দেখার সুযোগ পেতাম। বেশির ভাগ সময়ই আমার কেটে যেত বিভিন্ন মনোহারি দোকানের শো-কেসের দিকে তাকিয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম দামি দামি জিনিসগুলো—সেগুলো চিরকালই থেকে যাবে আমার নাগালের বাইরে; আর ঈর্ষা করতাম সেই লোকগুলোকে, যারা গোছা গোছা ডলারের নোট বের করে কিনে নিয়ে যেত শৌখিন প্রসাধনের জিনিসগুলো। আমার বাবা প্রায়ই বলত এই দশ ডলারের কথা। যতই শুনতাম ততই স্বপ্ন দেখতাম ওই দশ লক্ষ ডলারের। এমন সময় এল ওই নতুন ট্রাকটা। তখন এজেন্সি টাকাটাকে বিমা করবার প্রয়োজনও মনে করল না। বাবা বলত, নতুন ট্রাকের ওপর এত ভরসা করা ভালো নয়; কারণ ওই ট্রাকটাকে লুট করা এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। আমি আর বাবা প্রায়ই ট্রাক লুটের ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতাম। ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢুকিয়ে চম্পট দেবার মতলবটা বাবারই। কিন্তু তা বলে ভেব না, বাবা সত্যি সত্যিই ট্রাক লুটের মতলবে ছিল। নেহাত সময় কাটানোর জন্যেই আমরা ও নিয়ে আলোচনা করতাম। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে গভীরভাবে ভাবতাম ট্রাকটা লুট করার কথা। এবং ক্রমে ক্রমে ওই সর্বনাশা চিন্তা আমার মস্তিষ্ককে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল।'

কিটসন গাড়ির গতি অনেক কমিয়ে এনেছে। একমনে সে শুনছে জিনির কথা। দূরে পাহাড়ের মাথায় গোলাকার রক্তাক্ত সূর্য যেন শেষবারের মতো খুশির আবির ছড়িয়ে দিচ্ছে ওদের মনে। একসময় পাহাড়ের

আড়ালে আশ্রয় নিল বেলাশেষের ক্লান্ত সূর্য।

'আমার বাবা অত্যন্ত রুগ্ন ছিল।' হাঁটুর ওপর আঙুল চালাতে-চালাতে বলে চলল জিনি, 'চাকরি থেকে অবসর নিতে তখনও তার বছর দুয়েক বাকি ছিল। ওই অসুস্থ শরীর নিয়েও কাজ করে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না কোম্পানি তাকে ছুটি দিল কয়েক মাসের। কিন্তু নির্ধারিত ছুটির পরও ভালো হল না বাবার শরীর। কোম্পানি দিনকয়েক অপেক্ষা করে বাবাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিল; এবং একই সঙ্গে বাবার পেনসন পাওয়ার আশাও শূন্যে মিলিয়ে গেল। আমি কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলাম, আমাদের অবস্থাটা; কিন্তু সে আমার কথায় কোনও কানই দিল না। আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল, যেন আমি কোনও রাস্তার ভিখিরি। সুতরাং বাবা যখন মারা গেল, তখন স্থির করলাম, এ অবিচারের প্রতিশোধ আমি নেবই। তাই মনে মনে এক ঢিলে দু-পাখি মারার মতলব করলাম : বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে, আর সেইসঙ্গে আমিও হয়ে উঠব টাকার কুমির। সমস্ত প্ল্যানটাই আমার ছকে রাখা ছিল, কিন্তু সাহায্যের অভাবে অপেক্ষায় রইলাম। একদিন রাতে একটা কাফেতে বসে আছি, কানে এল দুজন লোকের কথাবার্তা। ওরা মরগ্যান সম্পর্কে কথা বলছিল। তাদের কথা শুনে বুঝলাম, মরগ্যানের মতো লোকের সাহায্যই আমার দরকার। সুতরাং তার কাছেই গেলাম। এই হল আমার কাহিনি। ট্রাক লুটের প্ল্যানটা বাবার মাথাতেই এসেছিল, কিন্তু ওটাকে কাজে লাগাবার কথা স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবেনি।'

'তোমার বাবার কথা শুনে দুঃখ পেলাম, জিনি।'

'হ্যাঁ—পাওয়ারই কথা।' কিটসন দেখল উত্তেজনায় জিনির হাত মুষ্টিবদ্ধ, 'আলেক্স, এতসব ঝঞ্ঝাট বাধানোর জন্যে আমি দুঃখিত। আমি জানি, আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, খারাপ মেয়ে; অর্থ-লালসায় আমার নারীসুলভ কোমলতা পর্যন্ত আচ্ছন্ন। এতসব জেনেশুনেও আমি তোমাদের এ কাজে নামতে বাধ্য করেছি। কিন্তু কখনও ভাবিনি অবস্থা এত খারাপের দিকে যাবে, এত জটিল হয়ে উঠবে। একটা লোককে খুন করার কথা বলা কত সহজ। আমরা সিনেমায় যখন নৃশংস হত্যার দৃশ্য দেখি, তখন সেটা আমাদের মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করে না। কিন্তু সত্যি-সত্যি যখন চোখের সামনে কোনও লোককে খুন করা হয়...।'

'শোনো, জিনি, কিটসনের স্বরে ফুটে উঠল আগ্রহের সুর, 'তুমি আর আমি এ কাজ ছেড়ে দেব। কী, রাজি? আমরা চলে যাব মেক্সিকোয়। এখনও বাঁচবার সময় আছে, জিনি। একবার ভেবে দেখো—।'

জিনি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মাথা নাড়ল, 'না এখন আর তা হয় না। টমাস ও ডার্কসনকে খুন করার আগে আমাদের এ কথা ভাবা উচিত ছিল। ভাবা উচিত ছিল মরগ্যান মারা যাবার আগে। এখন এর শেষ দেখা ছাড়া আমার উপায় নেই, আলেক্স। কিন্তু ইচ্ছে হলে তুমি ছেড়ে দিতে পার। তুমি ছেড়ে দিলে আমি অন্তত খুব খুশি হব। আমার জন্যে তুমি ভেব না। আমার মনে হয়, দশ লাখ ডলার পাওয়ার আশা এখনও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। তাছাড়া, আমি এখন চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি। এর চেয়ে বেশি ক্ষতি আর আমার কী-বা হবে? কিন্তু তুমি ছেড়ে দাও, আলেক্স। তোমার এর মধ্যে আসাই উচিত হয়নি।' জিনি তাকাল কিটসনের দিকে, 'কিন্তু কেন তুমি এলে, আলেক্স? তুমি তো এ কাজে মন থেকে সায় দাওনি,আমি জানি। তুমি কেন আমাদের হয়ে ভোট দিলে, আলেক্স?'

কিটসন কাঁধ ঝাঁকাল, 'একমাত্র তোমার জন্যে। যে মুহূর্ত থেকে তোমাকে দেখেছি, আমি আমার মন প্রাণ সব হারিয়ে বসে আছি।'

'আমি দুঃখিত, আলেক্স। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'আচ্ছা জিনি, টাকাটা পাওয়ার পর আমরা পরস্পরের সঙ্গী হলে কেমন হয়?' সামনের ছুটে আসা পিচ ঢালা পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কিটসন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, জিনি। তোমার আগে কাউকে কোনওদিন এমন করে ভালো লাগেনি।'

‘কী জানি...হয়তো তাই। টাকাটা পাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব, আলেক্স। যে কোনওরকম জটিলতাকে আমি ভীষণ ভয় করি। তুমি যদি আমাকে ব্যাপারটা ভাববার জন্যে কয়েকদিন সময় দাও, তাহলে খুব ভালো হয়।’

আরেকটু হলেই বুইকটা রাস্তার ধারের পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা মারছিল! কিটসনের আকস্মিক অফুরন্ত আনন্দ, বিস্ময় যেন আর বাঁধ মানতে চাইছে না।

‘তার মানে,—তার মানে তুমি...।’

‘হ্যাঁ আলেক্স—’ কিটসনের হাতে হাত বোলাল জিনি, আমাকে একটু ভাববার সময় দাও।’

ক্যারাভ্যানের ঘাঁটিতে ওরা যখন ফিরে এল, তখন সন্ধের অন্ধকার নেমে এসেছে।

কিটসন কিনে আনা জিনিসপত্রগুলো রান্নাঘরে গুছিয়ে রাখল। তারপর চলল ক্যারাভ্যানের দিকে। খুশিতে তার মনে আর ধরে না। জিনি যে তার প্রস্তাবে সম্মত হবে তা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি।

হ্রদের কাছটা এখন একেবারে নির্জন। সুতরাং ব্লেক ও জিপোকে বাইরে আনায় কোনও ভয় নেই।

ক্যারাভ্যান থেকে ওরা দুজন যখন বেরুল, কিটসন বুঝল, কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

কারণ জিপো শ্লথ, অবসন্ন পায়ে মাথা নিচু করে এগিয়ে চলেছে কেবিনের দিকে। তার ডান গালে একটা লম্বা ক্ষত, তার থেকে এখনও অল্প-অল্প রক্ত বেরচ্ছে।

কিটসন এ সবের কারণ জানতে চাইলে, জিপো কোনও জবাব দিল না। সোজা কেবিনে ঢুকে একটা আরাম-কেদারায় ধপ করে বসে পড়ল।

ব্লেক বিবর্ণ মুখে সোফার দিকে বসল। তার চোখে এক কুৎসিত দ্যুতি। হাত বাড়িয়ে হুইস্কির বোতল আর একটা গেলাস তুলে নিল সে। কিছুটা নির্জলা তরল সে এক চুমুকে শেষ করে দিল। গা-এলিয়ে দিল সোফায়।

‘একটা বাচ্চা ছেলে আমাদের ক্যারাভ্যানের চারপাশে ঘুরঘুর করছিল।’ কিটসনকে লক্ষ করে বলল ব্লেক, কিটনস তখন কেবিনের দরজা বন্ধ করে তাতে তালা এঁটে দিচ্ছে, ছোঁড়াটা দরজা বেয়ে উঠে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করছিল।’

আবহাওয়ার অস্বস্তির আভাস পেয়ে প্রশ্ন করল জিনি, ‘কিন্তু ট্রাকের তালার কী হল?’

ব্লেক হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, ‘কিছুই হয়নি।’ জিনির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলে চলল সে, ‘দ্বিতীয় কম্বিনেশন নম্বরটা মেলার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া জিপোও আর প্রকৃতিস্থ নেই।’

‘প্রকৃতিস্থ? তীক্ষ্নস্বরে চিৎকার করে উঠল জিপো, ‘আমি এই মুহূর্তেই এ সব ছেড়েছুড়ে চলে যাচ্ছি। এ তালা খোলা আমার কর্ম নয়। আমার কথা তোমার কানে ঢুকেছে? আমি এর মধ্যে নেই।’

জিনি শান্ত স্বরে জবাব দিল, ‘এখন আর তা হয় না, জিপো।...কিন্তু ব্যাপারটা কী খুলে বলো তো?’

‘ব্যাপার?’ চেয়ারের হাতলে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিল জিপো, ‘এই প্রচণ্ড গরমে ওই বদ্ধ ক্যারাভ্যানের ভেতরে কাজ করা কারও সাধ্য নয়। সে যে কী অসহ্য গরম তা তুমি বুঝতে পারবে না। গত তিনদিন ধরে একটানা আমি তালার পেছনে লেগে থেকেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। সুতরাং এর ভেতরে আমি আর নেই।’

‘তুমি ফ্র্যাঙ্ককে বলেছিলে তালাটা খুলতে প্রায় মাসখানেক লাগবে। কিন্তু এখন মাত্র তিনদিনের চেষ্টার পরই তুমি হাল ছেড়ে দিতে চাও?’

‘যাকগে, ওকে আর ঘাঁটিয়ো না।’ জিনিকে লক্ষ করে বলল ব্লেক, ‘সকাল থেকে এই এক কথা নিয়ে বকর বকর করে আমি হন্যে হয়ে গেছি। তবে ক্যারাভ্যানের ভেতরটা বীভৎস গরম—ওই গরমে কাজ করা যায় না। আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত হয়তো ফ্র্যাঙ্কের কথামতো আমাদের পাহাড়ের দিকে যেতে হতে পারে। ওই নির্জন জায়গায় ক্যারাভ্যানের পেছনটা খোলা রেখেই আমরা কাজ করতে পারব। নইলে এভাবে ওই বদ্ধ জায়গায় কারও পক্ষেই কাজ করা সম্ভব নয়—অন্তত আমাদের পক্ষে তো নয়ই।’

‘কিন্তু পাহাড়ের ওপরে ওঠাতে বিপদের সম্ভাবনাও প্রচুর,’ জিনিকে যেন একটু চিন্তিত দেখাল, ‘এখানে কয়েকশো ক্যারাভ্যানের মধ্যে অতি সহজেই আমরা গা-ঢাকা দিতে পারি, কিন্তু ওই নির্জন পাহাড়ি এলাকায় কেউ যদি আমাদের সন্ধান পায় তবে সন্দেহ করতে বাধ্য।’

‘কিন্তু সে ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া আর তো উপায় দেখছি না।’ ব্লেক অধৈর্য স্বরে বলে উঠল। ‘জিপো যদি একান্তই ওই তালা খুলতে না পারে, তাহলে বাধ্য হয়েই আমাদের হয়তো অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে হবে—এবং সেটা এই ফন হ্রদ এলাকায় বসে করা সম্ভব নয়।’

‘পুলিশ এখনও প্রতিটি রাস্তায় টহল দিচ্ছে।’ অস্বস্তিভরে বলল কিটসন, ‘রাস্তায় তারা আমাদের বাধা দিতে পারে, এড। তাছাড়া আরই একটা অসুবিধে আছে, আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না, বুইকটা অতো ভারী ক্যারাভ্যানটাকে পেছনে নিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে পারবে কি না। ওই রাস্তায় আমি আগেও গেছি। রাস্তাট ঢালু তো আছেই, তার ওপর এবড়ো-খেবড়ো—কিছুদিন আগে রাস্তাটার কিছু অংশ ঝড়ে ভেঙে গেছে বলে শুনেছি।’

‘আমাদের দ্বিতীয় কোনও পথ নেই, আলেক্স। এ ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। আগামীকাল দুপুরে যদি আমরা রওনা দিই, তাহলে সন্ধে নাগাদ আমরা পাহাড়ি রাস্তায় পৌঁছে যাব। কিন্তু আমাদের একটা তাঁবু আর কিছু খাবারের প্রয়োজন। অর্থাৎ জিপো ট্রাকের তালা না খোলা পর্যন্ত আমাদের বেশ কষ্ট করেই দিন কাটাতে হবে।’

‘আমি থাকছি না, এড।’ ভয়ঙ্কর স্বরে চেঁছিয়ে উঠল জিপো, ‘আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।’

ব্লেক কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় শোনা গেল দরজায় কারও টোকা মারার শব্দ।

কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠাময় নিস্তব্ধতা। তারপর রিভলভার উঁচিয়ে ধরে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল ব্লেক।

জিপো বিবর্ণ মুখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, দেখতে চেষ্টা করল দরজার দিকে।

জিনি চাপা উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস করে উঠল, ‘লুকিয়ে পড়ো। যাও, শিগগির তোমরা শোবার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো।’

ব্লেক জিপোর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে দাঁড় করাল তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেল শোবার ঘরে। কিটসন দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেলে কেবিনের দরজার দিকে। খুলে দিল দরজা।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড।

‘এই যে, মিঃ হ্যারিসন, অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে মাপ চাইছি। মিসেস হ্যারিসন কোথায়? রান্নাঘরে বুঝি?’

‘হ্যাঁ।’ দরজাটা পুরোপুরি আগলে দাঁড়াল কিটসন, ‘কিন্তু ব্যাপার কী বলুন তো?’

‘সামান্যই। চলুন, ভেতরে গিয়ে বসি, বেশিক্ষণ আপনাকে আটাকাব না।’

কিটসনকে ইতস্তত করতে দেখে জিনি দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল দরজার কাছে, মিঃ ব্র্যাডফোর্ডকে অভ্যর্থনা জানাল জিনি।

ব্র্যাডফোর্ড এসে ঢুকল বসবার ঘরে। তাকে দেখে একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল।

‘বলুন কী খাবেন? হুইস্কি না জিন?’ কিটসন ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্ন করল।

‘ধন্যবাদ। এখনই ঠিক ভালো লাগছে না।’ ব্র্যাডফোর্ড বসল একটা চেয়ারে। হাঁটুতে হাত ঘষতে লাগল একমনে। ‘শুধু শুধু আপনাদের দেরি করাব না, মিঃ হ্যারিসন। আমার ছেলে বিকেলের দিকে হ্রদের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিল।’ ব্র্যাডফোর্ড সরাসরি চোখ রাখল কিনসনের চোখে, ‘ও বলছে, আপনাদের ক্যারাভ্যানের ভেতরে নাকি দুজন লোক ছিল।’

কিটসনের হৃৎপিণ্ড আচমকা লাফিয়ে উঠল গলার কাছে। সে বিহ্বল চোখে তাকাল জিনির দিকে। ব্র্যাডফোর্ডের কথার কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

শান্তস্বরে জবাব দিল জিনি, হাসল ব্র্যাডফোর্ডের দিকে চেয়ে, ‘তারা আমাদের পরিচিত লোক, মিঃ ব্র্যাডফোর্ড। আমরা তাদের বলেছিলাম, ছুটি কাটানোর জন্যে আমাদের ক্যারাভ্যানটা তাদের দিনকয়েকের জন্যে ব্যবহার করতে দেব। হয়তো আমরা যখন বাইরে ছিলাম তখন তারা এসেছিল ক্যারাভ্যানটা ঘুরেফিরে দেখতে।’

ব্র্যাডফোর্ডের মুখ থেকে সংশয়ের ছায়াটা মিলিয়ে গেল, ‘আরে আমিও তো তাই বলছিলাম, কিন্তু কে শোনে কার কথা? ও ঘুরিয়ে ফিরিয়েই কেবলই বলছে, লোক দুটো নাকি চিৎকার করে বিশ্রীভাবে ঝগড়া করছিল। বাচ্চা ছেলে তো, তাই একটুতেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ও ভেবেছে ওরা বোধ হয় কোনও ডাকাত-টাকাত হবে।’

জিনি হাসল, ‘না, ডাকাত-টাকাত না হলেও ওই লোক দুজনের স্বভাবচরিত্র তেমন ভালো নয়। অন্তত আমি তো ওদের একটুও বিশ্বাস করি না। দিন-রাতই কেবল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে!...কিন্তু তা হলে কী হবে, বেড়াতে যাবার সময় দুজনেই হরিহর আত্মা!’

‘কিন্তু আমার ছেলে ওদের দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম, ব্যাপারটা আপনাদের জানিয়েই যাই। বলা যায় না, কী থেকে কী হয়ে যায়; জানেন, এই ফন হ্রদের মতো জায়গাতেও বেশ কয়েকবার ডাকাতি হয়ে গেছে। অবশ্য ওরা যখন আপনাদের পরিচিত লোক বলছেন, তখন আর...’

‘চিন্তার কিছু নেই।’ ব্র্যাডফোর্ডের কথার খেই ধরে দিল জিনি, ‘তবু আপনি এসে ব্যাপারটা জানিয়ে ভালোই করেছেন। কিন্তু আপনি কি একেবারে শুধু মুখেই ফিরে যাবেন?’

‘না, না, ওর জন্যে ব্যস্ত হবেন না। পরে একদিন হবেখন।’ নাকে বার দুয়েক হাত ঘষে ভুরু কোঁচকাল ব্র্যাডফোর্ড, ‘যাক, আর আপনাদের সময় নষ্ট করব না, মিসেস হ্যারিসন, এখন চলি। বাচ্চা ছেলে তো, তাই সবকিছুতেই রহস্যের গন্ধ পায়। এই যে কাগজে ট্রাক লোপাটের যে খবর দিয়েছে, সেটা পড়ে আমার ছেলে কী ভাবছে জানেন? বলছে, ট্রাকটা কোথায় লুকোনো আছে তা ধরে ফেলেছে। ট্রাকটাকে নাকি লুটেরার দল একটা বড়সড় ক্যারাভ্যানে লুকিয়ে রেখেছে...বুঝুন কাণ্ড! হাঃ, হাঃ।’

ব্র্যাডফোর্ডের হালকা কথাগুলোর কিটসনের কানের কাছে যেন বাজ পড়ল। আচমকা মুষ্টিবদ্ধ হল তার হাত। চটপট পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে টান-টান হয়ে দাঁড়াল।

জিনির নির্বিকার মুখে নেমে এল কাঠিন্যের সামান্য আভাস। নিষ্প্রাণ স্বরে ও বলে উঠল, ‘ক্যারভ্যানের ভেতরে? এ ধারণা তার কেমন করে হল?’

সাধে কি আর বলি এঁচোড় পাকা ছেলে! হাসতে-হাসতেই জবাব দিল ব্র্যাডফোর্ড, ‘আমার মনে হয়, এখানে এসে এই ক্যারাভ্যানের ছয়লাপ দেখে আমার সুপুত্তুরের মাথায় বুদ্ধি গজিয়েছে।...কিন্তু একটা কথা কী জানেন, ওর ধারণাটা খুব একটা অযৌক্তিক নয়। ও বলছে, এই ক্যারাভ্যানগুলো খুঁজে দেখার কথা পুলিশ ভেবেও দেখবে না। না দেখাটা খুব একটা আশ্চর্য নয়, কী বলেন।’

‘হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা। তবে মিঃ ব্র্যাডফোর্ড, আপনার ছেলের কল্পনাশক্তির তুলনা নেই!’

‘তা সত্যি বলেছেন। ও কেবলই আমাকে বলছে, পুলিশের কাছে গিয়ে এই সন্দেহের কথা জানাতে। ও ভাবছে, ট্রাকটাকে যদি কোনও ক্যারাভ্যানের ভেতরে লুকোনো অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে পুরস্কারের টাকাটা সেই পাবে। কাগজে দেখেছেন, পুরস্কারের টাকাটা বাড়িয়ে পাঁচ হাজার করে দেওয়া হয়েছে? নাঃ, টাকার পরিমাণটা নেহাত কম নয়।’

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর জিনি মুখ খুলল, ‘পুরস্কারের টাকাটা পুলিশ ওকে দেবে বলে তো মনে হয় না। আপনার কি মনে হয়? শেষে বাচ্চা ছেলে বলে ঠকাবে না তো?’ জিনির হাসিতে ঈষৎ যান্ত্রিক ছোঁয়া।’

হ্যাঁ—-তা বলতে পারেন।’ ইতস্তত করে বলল ব্র্যাডফোর্ড, ‘আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না পুলিশে খবর দেওয়া উচিত হবে কি না। তবে আপনাকে বলে রাখছি, মিসেস হ্যারিসন, ছোঁড়াটা কিছু না কিছুর

সন্ধান পেয়েছেই। অবশ্য পুলিশ এসব কথাকে বিশেষ পাত্তা দেবে বলে মনে হয় না।'

'আপনারও তো একটা ক্যারাভ্যান আছে, মিঃ ব্র্যাডফোর্ড, তাই না?' তাহলে পুলিশ যদি ট্রাক লুটের ব্যাপারে আপনাকেই সন্দেহ করে বসে, তবে আমি কিন্তু অবাক হব না। শেষে হয়তো আপনার ক্যারাভ্যান নিয়েই ওরা টানাটানি করবে।... জানেন, একবার বাবারও অমনি হয়েছিল। তিনি কতকগুলো মুক্তো খুঁজে পেয়ে থানায় জমা দিতে গিয়েছিলেন; ভেবেছিলেন কিছু পুরস্কার টুরস্কার পাওয়া যাবে, কিন্তু উল্টো পুলিশ তাঁকেই গ্রেপ্তার করল। তারপর মাসখানেক ধরে কোর্ট-কাছারি, টানা-হ্যাঁচড়ার পর তিনি ছাড়া পান। তারপর থেকে বাবা ভুলেও কোনওদিন পুরস্কারের কথা উচ্চারণ করেননি।'

ব্র্যাডফোর্ডের চোখ বিস্ফারিত হল বিস্ময়ে, 'বলেন কী? আমি তো এদিকটা একেবারেই ভাবিনি। না ম্যাডাম, আমি আর ওর মধ্যে নেই। ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। শখ করে জেলে যাওয়ার সাধ আমার নেই।'

ব্র্যাডফোর্ড চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

'এই বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা', মিঃ ব্র্যাডফোর্ডের দিকে চেয়ে হাসল জিনি, 'কারণ কালই আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'তাই নাকি কেন, ফন হ্রদ বুঝি আপনাদের ভালো লাগল না? আমার কিন্তু বেশ লাগে জায়গাটা—কেমন খোলামেলা, সুন্দর—'

'না, জায়গাটা আমাদের ভালোই লেগেছে, তবে আরও অনেক জায়গায় তো বেড়াবার কথা আছে, তাই। এবারে আমরা যাব স্ট্যাগ হ্রদের দিকে, তারপর ডিয়ার হ্রদে বেড়াতে যাব।'

'তাহলে তো আপনাদের বিরাট প্ল্যান রয়েছে দেখছি! যাক, আপনাদের দিনগুলো সুখে কাটুক সেই কামনাই করি।' জিনির সঙ্গে হাত ঝাঁকাল ব্র্যাডফোর্ড। দরজায় দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বলল ওর সঙ্গে। কিটসন তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছে। মনে মনে চাইছে, ব্র্যাডফোর্ড এখুনি চলে যাক। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়।

অবশেষে, মিনিট দশেক পর হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেল ব্র্যাডফোর্ড। চাঁদের আলোয় আলোকিত বাঁধানো রাস্তা ধরে সে এগিয়ে চলল তার কেবিনের দিকে।

দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে দিল জিনি, 'তাহলে আর দ্বিতীয় কোনও চিন্তার অবকাশ নেই। চলে আমাদের যেতেই হবে।'

'হ্যাঁ—তাছাড়া উপায় নেই।' কিটসন চিন্তিত মুখে জবাব দিল, 'কিন্তু ব্র্যাডফোর্ডের তুমি দারুণ বোকা বানিয়েছ! সত্যি, তোমার তুলনা নেই।'

'থাক্, থাক্—অনেক হয়েছে। শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এড ব্লেক, 'অত বেশি উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন নেই, আলেক্স। ওই ব্র্যাডফোর্ডের ব্যাটাই আমাদরে সমস্ত পরিকল্পনাটা ওলট-পালট করে দিল। ও বোধ হয় আমাদের গলা শুনতে পেয়েছিল।'

জিপো এগিয়ে এল শোবার ঘরের দরজায়, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

'তাহলে কালই আমরা রওনা দিচ্ছি।' ব্লেক বলে চলল, নইলে ওই ছোঁড়াটা আবার কিছু গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসতে পারে।' সে ফিরে তাকাল কিটসনের দিকে, 'আলেক্স, তুমি বরং ক্যারাভ্যানে গিয়ে থাকো। বলা যায় না, ওই হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটা হয়তো রাতের অন্ধকারে ফিরে আসতে পারে—হয়তো ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করবে।'

কিটসন সম্মতি জানিয়ে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

জিপো নিলিপ্ত স্বরে বলে উঠল, 'আগামীকাল আমি বাড়ি যাচ্ছি। বুঝেছ? অনেক সহ্য করেছি... আর নয়। আমি এখন শুতে চললাম।'

শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল জিপো।

‘কালই শালাকে টিট করব।’ ব্লেকের চোখের তারায় ঝলসে উঠল কুৎসিত ক্রোধ, ‘তখন থেকে ওর বকবকানি শুনে আমি একেবারে হদ্দ হয়ে গেছি।’

জিনি ফিরে গেল রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরি করতে।

ব্লেক এসে দাঁড়াল দরজার কাছে, হেলান দিয়ে দাঁড়াল, ‘ব্র্যাডফোর্ডকে তুমি বেশ কায়দা করেই বোকা বানিয়েছ, জিনি—তোমার বুদ্ধি আছে।...কিন্তু আমার প্রস্তাব সম্পর্কে তুমি কি কিছু ভেবে দেখেছ? তোমার এবং আমার মধ্যে বেশ মিল আছে। সুতরাং আপত্তির কী আছে তা-তো বুঝতে পারছি না।—কী বলো, রাজি?’

দুটো স্টেক ফ্রাইং প্যানে ছেড়ে দিল জিনি।

‘তুমি যদি পৃথিবীর শেষ জীবিত পুরুষ হও, তবুও তোমার সম্পর্কে আমি বিন্দুমাত্রও কৌতূহলী হব না!’ ব্লেকের দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল জিনি।

‘আচ্ছা—সময় এলেই দেখা যাবে—’

হাসতে হাসতে আরাম-কেদারায় গিয়ে বসল ব্লেক, তার হাসির অন্তরালে বুঝি কোনও গোপন রসিকতার ইঙ্গিত।

পরদিন খুব ভোরে কিটসন গাড়ি নিয়ে গেল শহরের দিকে। জিনি রইল ক্যারাভ্যানের পাহারায়; ব্লেক ও জিপো তখন কেবিনে।

এতে ঝুঁকি আছে জেনেও ব্লেক কেবিনেই থেকেছে। কারণ ক্যারাভ্যানের ভেতরে ওই স্বল্প পরিসরে জিপোর গোঁয়ার্তুমির মোকাবিলা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

জিপোর মানসিক অবস্থা এতই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শেষ পর্যন্ত কিটসন ও ব্লেক বাধ্য হয়েছে তাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখতে। এমন কি মুখে কাপড় গুঁজে দিতেও ভোলেনি।

জিপোকে বিছানার সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে দাঁড়িয়েছে ব্লেক। মুখে এক নৃশংস অভিব্যক্তি। কিটসনের দিকে ফিরে হাত নেড়ে ইশারা করেছে সে, ‘তুমি যাও। ওকে আমি দেখছি। কী করে ওর মত বদলাতে হয়, সেটা ওকে হাড়ে হাড়ে সমঝে দেব। তুমি ফিরে এসেই হয়তো শুনবে, জিপো আমাদের সঙ্গে পাহাড়ি এলাকায় যেতে এক পায়ে খাড়া।’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে কিটসনকে চলে যেতে হয়েছে। জিপোকে ওইভাবে ব্লেকের কাছে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হল। কিন্তু কিটসন জানে জিপোর সাহায্য ছাড়া ওই ট্রাকের তালা খোলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর জিপো সাময়িকভাবে বেহেড হয়ে পড়ায়, ওকে সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছে ব্লেক। কিটসন যেন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল।

শহরে গিয়ে একটা বড়সড় তাঁবু কিনল কিটসন, এবং সেই সঙ্গে নিল প্রচুর খাবার। কারণ অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ওরা বুঝেছে পাহাড়ি অঞ্চলে পৌঁছনোর পর শহরে গিয়ে রোজকার কেনাকাটা সেরে ফিরে আসা তাদের পক্ষে অসম্ভব, এবং একই সঙ্গে বিপজ্জনক। অতএব যদ্দিন না জিপো ট্রাকের তালা খুলছে, তদ্দিন তাদের অপেক্ষা করতে হবে ওই পাহাড়ি অঞ্চলেই। সেই বুঝে পর্যাপ্ত খাবার সঙ্গে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে কিটসন।

কেনাকাটা সেরে কেবিনে ফিরে এল কিটসন। বুইকের পিছনটা জিনিসপত্রে ঠাসা। সে গাড়ি থেকে নামতেই জিনি এগিয়ে এল তার কাছে।

‘কোনও গণ্ডগোলো হয়নি তো?’ কিটসন প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল জিনি, ‘না। কিন্তু তুমি ফিরে আসতে আমি খুশি হয়েছি। তখন থেকে কেবলই ভাবছি ওই ছেলেটার কথা। আমার মনে হয়, যত তাড়াতাড়ি আমরা এখান থেকে সরে পড়তে পারি ততই ভালো।’

ওরা দুজনে একসঙ্গে এসে ঢুকল কেবিনে।

একটা আরাম কেদারায় বসে রয়েছে জিপো। মুখ শুকনো ঘাসের মতো বিবর্ণ, কোটরাগত চোখের কোলে কালি। ওদের ঢুকতে দেখেও একইভাবে মাথা নিচু করে বসে রইল সে।

ব্লেক উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারি করছে—হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

'সব ঠিকমতো হয়েছে।' কিটসনকে লক্ষ করে প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ—জিনিসপত্র সবই কিনেছি।'

কিটসন তাকাল জিপোর দিকে তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চোখ রাখল ব্লেকের চোখে।

'জিপোর মত বদলেছে।' গম্ভীরভাবে ব্লেক জবাব দিল কিটসনের নীরব প্রশ্নের, 'ওর সঙ্গে আমার খোলাখুলি কথা হয়েছে। ট্রাকের তালা খুলতে ও রাজি।'

'তোমরা আমাকে দিয়ে গায়ের জোরে কাজ করিয়ে নিতে চাইছ।' কাঁপা স্বরে ব্লেকের কথার প্রতিবাদ করল জিপো, 'এর ফল কখনওই ভালো হবে না। আমি এ কথা তোমাদের আগেও বলেছি—এখন বলছি।' হঠাৎই কিটসনের দিকে মুখে তুলে তাকাল জিপো, 'তুমি আমার বন্ধু ছিলে আলেক্স। হুঁঃ—বন্ধুই বটে। তুমি আর আমার কাছে এসো না। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের এখানেই শেষ।'

'কী হয়েছে? ব্যাপার কী, এড?' ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্লেককে লক্ষ করে বলে উঠল কিটসন।

'ওর সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করতে হয়েছে। ও আমাদের ট্রাকের তালা খোলায় সাহায্য না করলে যে ভীষণ বিপদে পড়বে সেটা ওকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছি।'

'এড বলেছে ট্রাকের তালা না খুললে ও আমার হাত ভেঙে ফেলবে।' চাপা গলায় অনিশ্চিত সুরে কিটসনকে বোঝাতে চাইল জিপো, 'হাত ছাড়া কোনও মানুষ কি কখনও বাঁচতে পারে?'

কিটসন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ব্লেক মাথা নেড়ে ইশারা করতেই সে চুপ করে গেল।

'চলো, যাওয়া যাক। দেখো তো, বাইরে কেউ আছে কি না।'

জিনি ও কিটসন কেবিনের বাইরে এসে দাঁড়াল।

সামনের হ্রদে যথারীতি ভাসমান নৌকোর ইতস্তত আনাগোনা। তবে খুব একটা কাছাকাছি কেউই নেই।

কিটসন ক্যারাভ্যানটা বুইকের সঙ্গে জুড়ে চালিয়ে নিয়ে এল কেবিনের দরজার সামনে। গাড়ি ঘুরিয়ে ক্যারাভ্যানের পিছনের দরজা রাখল কেবিনের মুখোমুখি।

'এড, তোমরা প্রস্তুত?'

ব্লেক জিপোকে সঙ্গে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে এল।

কিটসন হাতলে চাপ দিয়ে ক্যারাভ্যানের দরজা খুলতেই জিপো আর ব্লেক চটপট ঢুকে পড়ল ভেতরে। কিটসন আবার বন্ধ করে দিল ক্যারভ্যানের দরজা। পুরো কাজটা করতে সেকেন্ড কয়েকের বেশি লাগল না।

'আমি এখানেই আছি, তুমি অফিসে গিয়ে বরং হিসেব-পত্তর চুকিয়ে এসো।' পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে জিনির হাতে তুলে নিল কিটসন।

ক্যারাভ্যানের গায়ে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। তারপর জিনির ফেরবার অপেক্ষায় রইল। কিটসনের প্রতিটি স্নায়ু এখন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ভাবনায় উত্তেজিত। এবার তারা গিয়ে পড়বে সম্পূর্ণ খোলা জায়গায়—যেখানে নেই সহস্র ক্যারাভ্যানের আড়াল। এ যেন যেচে বিপদকে ঘরে টেনে আনা। কিন্তু ট্রাকের তালা খুলতে গেলে এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও তাদের হাতে নেই।

'এই যেন শুনুন!'

কিটসন চমকে উঠল। পলকে ঘুরে দাঁড়াল।

একটা বাচ্চা ছেলে তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে। পরনে সুতির প্যান্ট, লাল সাদা ডোরাকাটা জামা। মাথায় একটা শোলার টুপি। সম্ভবত ক্যারাভ্যানের পাশ ঘুরেই তার সামনে এসে হাজির হয়েছে ছেলেটা।

'কী ব্যাপার—'

ছেলেটা ঘাড় কাত করে কিটসনকে দেখতে লাগল।

'আমার বাবা আপনাকে চেনে। আমি ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড জুনিয়র।'

'তাই নাকি!' কিটসন স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল।

ছেলেটা ভুরু কুঁচকে তাকাল কিটসনের দিকে, তারপর চোখ ফেরাল ক্যারাভ্যানে।

'এটা আপনার?' ক্যারাভ্যানের দিকে আঙুল ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল ছেলেটা।

'হ্যাঁ।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ক্যারাভ্যানটাকে পরখ করল ছেলেটা। করতে লাগল। এতক্ষণ ধরে কী করছে ও! সে মনে প্রাণে চাইল, জিনি যেন এখুনি ফিরে আসে, তাহলে তারা এই মুহূর্তে ফন হ্রদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে।

ছেলেটা এবার উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ল মাটিতে। ঘাড় কাত করে দেখতে চেষ্টা করল ক্যারাভ্যানের তলাটা।

'ওরে বাপ। আপনাদের ক্যারাভ্যানের তলাটা দেখছি লোহার চাদরে মোড়া!' কিটসনের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে, এত লোহা দিয়েছেন কেন? শুধু শুধু এটার ওজন বাড়ছে, তাই না?'

'কী জানি, জানি না। যখন এটা কিনেছি তখন এই রকমই ছিল।' অস্বস্তিভরে চোয়ালে হাত বোলাল কিটসন।

'বাবা বলছিল, গতকাল আপনাদের দুজন বন্ধু এর মধ্যে ছিল; সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওদের মধ্যে একটা গোলমাল আছে।'

'না তো—'

ছেলেটা কিটসনের আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করল। কিটসন লক্ষ করল, ছেলেটার চোখের দৃষ্টি আশ্চর্যরকম সপ্রতিভ।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে কিছু একটা হয়েছিল, নয়তো ওরকমভাবে ঝগড়া করছিল কেন?'

'ওরা সব সময়েই ওরকম ঝগড়া করে—ও কিছু নয়।'

ছেলেটা কয়েক পা পিছিয়ে ক্যারাভ্যানটাকে ভালো করে দেখতে লাগল।

'এর ভেতরটা আমাকে একবার দেখতে দেবেন?'

'ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।' কিটসনের স্বর ঈষৎ উত্তপ্ত, 'কারণ চাবিটা আমার স্ত্রীর কাছে।'

ছেলেটা যেন অবাক হল।

'আমার বাবা কিন্তু মাকে কখখনো চাবি রাখতে দেয় না। মা সব সময় চাবি হারিয়ে ফেলে।'

'আমার স্ত্রী চাবি-টাবি খুব সাবধানে রাখে। কখনও হারায় না।'

ছেলেটা আবার উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। সবুজ ঘাসগুলো দু-হাতে টেনে ছিঁড়তে লাগল। ঘাসের শিষগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল।

'আপনার বন্ধুরা কি এখনও এর ভেতরেই আছে?'

'না।'

'তাহলে কোথা আছে?'

'বাড়িতে।'

'বাড়ি কোথায়?'

'সেন্ট লরেন্স—'

'তারা তাহলে একসঙ্গেই থাকে?'

'হ্যাঁ।'

‘কিন্তু ওরা যেরকম বিশ্রীভাবে ঝগড়া করছিল, আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।’

ছেলেটা মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে নিল। তারপর সেটাকে ঘাস দিয়ে ভর্তি করতে লাগল।

‘ওদের একজন আর একজনকে কিছু করতে পা পারার জন্যে গালাগাল দিচ্ছিল। কী করতে বলছিল আপনি জানেন?’

‘উঁহু—’ কিটসন নতুন করে আর একটা সিগারেট ধরাল।

‘ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল, এখুনি বোধ হয় একটা মারপিট বাঁধিয়ে বসবে।’

‘ওদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওদের বন্ধুত্ব অনেক দিনের—অত সহজে ভাঙবার নয়।’

টুপিটা ঘাসে ভর্তি হয়ে গেলে ছেলেটা সামনে মাথা ঝাঁকাল। টুপিতে মাথা ঢুকিয়ে সেটা চেপে মাথায় ঢুকিয়ে দিল।

‘এতে আমার মাথা ঠান্ডা থাকে।’ কিটসনকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে সে ব্যাখ্যা করল, ‘এটা আমারই আবিষ্কার। এই আবিষ্কার থেকে বেশ কিছু টাকা রোজগার করা যেতে পারে।’

‘হুঁ।’ কিটসন নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিল, ‘শোনো খোকা, তুমি এবারে বাড়ি যাও। তোমার বাবা হয়তো তোমাকে খুঁজে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।’

‘না, আমি বাবাকে বলেই এসেছি। বলেছি, আমি চুরি যাওয়া ট্রাকটাকে খুঁজতে বেরোচ্ছি—ওই যে, যেটা প্রচুর টাকাসুদ্ধ উধাও হয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাবা আমার খোঁজ করবে না। আপনি কাগজে ওই ট্রাক লুটের খবরটা পড়েছেন?’

‘হ্যাঁ, পড়েছি।’

‘জানেন, আমি কী ভাবছি?’

‘হ্যাঁ—তোমার বাবা আমাকে বলেছে।’

ছেলেটো ভুরু কুঁচকে তাকাল, ‘বাবার বলা উচিত হয়নি। এইভাবে যদি শহরসুদ্ধ লোককে বলে বেড়ায় তাহলে পুরস্কারের টাকাটা আমি পাব কী করে?’

হঠাৎ কিটসনের নজর পড়ল, সামনের রাস্তা ধরে জিনি দ্রুতপায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

‘যে করেই হোক পুরস্কারের টাকাটা আমার চাই।’ ছোট ব্র্যাডফোর্ড বলে চলল, ‘পাঁচ হাজার ডলার। টাকাটা পেলে কী করব জানেন?’

কিটসন মাথা নাড়ল, ‘না তো—’

‘বাবাকে আমি ওর একটা পয়সাও দিচ্ছি না—আমি আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছি।’

জিনি এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।

‘এই যে ব্র্যাডফোর্ড জুনিয়র।’ কিটসন জিনিকে বলল।

‘কেমন আছ?’ হেসে প্রশ্ন করল জিনি।

‘আপনার কাছে কি ক্যারব্যানের চাবিটা আছে?’ ছেলেটা পালটা প্রশ্ন করল, ‘ইনি আমাকে বলেছেন ভেতরটা দেখতে দেবেন।’ কিটসনের দিকে আঙুল দেখাল সে।

জিনি ও কিটসন পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করল।

‘আমি দুঃখিত!’ ছোট ব্র্যাডফোর্ডকে লক্ষ করে বলল জিনি, ‘চাবিটা আমি স্যুটকেসে ভরে ফেলেছি। এখন বের করা খুব মুশকিল।’

‘আপনি নিশ্চয়ই চাবিটা হারিয়ে ফেলেছেন।’ অবজ্ঞার সুরে সে বলে উঠল, ‘ঠিক আছে, আমি তাহলে চলি। বাবা বলছিল, আপনারা নাকি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন!’

‘হ্যাঁ।’

‘এখুনি?’

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, বিদায়।' হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটা। তারপর রাস্তা ধরে হেঁটে চলল। হাত দুটো প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। বেসুরোভাবে শিস দিতে দিতে সে এগিয়ে চলল।

'তোমার কি মনে হয়...' কথা শেষ না করেই থেমে গেল কিটসন, 'ঠিক আছে, চলো। আর দেরি না করে রওনা হওয়া যাক।'

ওরা উঠে বসল বুইকে।

ওদের গাড়ি ছেড়ে দিতেই ঝোপের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ছোট ব্র্যাডফোর্ড। সম্ভবত রাস্তার মোড় ঘুরেই জঙ্গলের মধ্যে সে আবার ফিরে এসেছে। অপসৃয়মান বুইক ও ক্যারাভ্যানের দিকে তাকিয়ে সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে একটা ময়লা নোটবই বের করল সে। একটুকরো পেনসিল দিয়ে বুইকের লাইসেন্স নম্বরটা লিখে নিল নোট বইয়ের পাতায়।

দশ

ছটি রাস্তায় ভাগ করা চওড়া বড় সড়কটা এমনিতেই গাড়ির ভিড়ে জমজমাট, তার ওপর বেশ কয়েকটা গাড়ি তাদের পিছনে একটা করে ক্যারাভ্যান টেনে নিয়ে চলেছে।

থেকে থেকেই উড়ন্ত হোভার প্লেন নেমে আসছে মাথার ওপর—উড়ে চলেছে প্রধান সড়ক ধরে—যেন চলমান যন্ত্রযানদের প্রত্যেকটিকে সে পরখ করে দেখছে। এবং পরখ করার প্রতিটি মুহূর্তেই কিটসনের বুক দুরুদুরু করে কেঁপে উঠছে।

মাঝে মাঝে কয়েকটা বড়সড় ট্রাকের ওপর ঢাকনা খুলে অনুসন্ধান করে দেখছে পুলিশের দল। কিন্তু একটা ক্যারাভ্যানকেও তারা সন্দেহবশে থামাল না। হয়তো তাদের ধারণা, অত ভারী ট্রাকটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া ক্যারাভ্যানের মতো কোনও হালকা জিনিসের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবু ওই পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে, ঠিক তিরিশ মাইল বেগে গাড়ি চালানো কঠিন বইকি! অসীম প্রচেষ্টায় দুঃসাহসী ইচ্ছাকে সংযত করে গাড়ি চালাতে লাগল কিটসন।

দীর্ঘ ছ-ঘণ্টা ধরে ওরা গাড়ি ছুটিয়ে চলল।

জিনি কিটসনের পাশে নির্বাকভাবে বসে; কিটসনও যেন কথা বলার কোনও আন্তরিক তাগিদ খুঁজে পাচ্ছে না।

রাস্তায় যখনই কোনও পুলিশের গাড়ি অথবা মোটর বাইকে চোখে পড়েছে, তখনই ওরা আতঙ্কে সিঁটিয়ে উঠেছে। মোটের ওপর সহজ সাবলীলভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে এই সময়টুকু তাদের কাছে নিতান্তই অনুপযুক্ত মনে হয়েছে।

পাহাড়ি রাস্তায় ওরা যখন পৌঁছল, তখন সন্ধে সাতটা।

সূর্য অস্ত গেছে দূর পাহাড়ের আড়ালে, এবং একই সঙ্গে অন্ধকার নেমে এসেছে। কিটসন ততক্ষণে বিপরীতমুখী বাঁকের প্রথম সারি অনায়াসেই পার হয়ে গেছে।

পথ যতই যেতে লাগল, গাড়ি চালানো ততোই দুরূহ হয়ে উঠতে লাগল। কিটসন জানে, বাঁকের দূরত্ব অনুমানে সামান্যতম ভুলচুক হলেই ক্যারাভ্যান সমেত গড়িয়ে পড়তে হবে অতল খাদে। বাঁচবার কোনও আশাই থাকবে না।

সে বুঝল, ক্যারাভ্যান ও ট্রাকের পিছুটান বুইকের গতিকে ক্রমশই শ্লথ করে তুলেছে। অ্যাকসিলেটারের কাছ থেকে তেমন আশাব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছে না কিটসন। সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। কারণ কিটসন জানে আরও কুড়ি মাইল পরেই দেখা মিলবে রুক্ষ, খাড়াই রাস্তার, সে রাস্তা আরও অ-নে-ক বিপজ্জনক।

কিটসন চোখ ফেরাল থার্মোমিটারের দিকে—ডায়ালের পয়েন্টার ক্রমশ স্বাভাবিক থেকে উত্তপ্ত অংশের দিকে এগোচ্ছে।

'আর কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িটা গরম হয়ে পড়বে।' জিনিকে জানাল সে, 'ট্রাক ও ক্যারাভ্যানের ওজনের জন্যেই এই অবস্থা হচ্ছে। আমাদের সামনের কুড়ি মাইল রাস্তা মোটামুটি এইরকম—তারপরেই শুরু হবে আসল বিপদ।'

'কেন, এর চেয়েও খারাপ রাস্তা?' জিনি প্রশ্ন করল।

কিটসন সতর্কভাবে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে একটা বাঁকে মোড় নিল। গাড়িটাকে আবার আয়ত্তে এনে জিনির দিকে চোখ ফেরাল, 'খারাপ? সেই রাস্তার তুলনায় এই রাস্তা তো শ্বেতপাথরে বাঁধানো। গত সপ্তাহে এক প্রচণ্ড ঝড়ে সেই রাস্তা একরকম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সারানো আর হয়ে ওঠে—নি। হবেও না। অবশ্য এই রাস্তাটা কেউ কখনও ব্যবহার করে না। সকলেই ডুকাসের সুড়ঙ্গ পথটা ধরে যাতায়াত করে।'

আরও মাইল তিন-চারেক যাওয়ার পর থার্মোমিটার এসে থামল স্ফুটনাঙ্কের ঘরে। অগত্যা বাধ্য হয়েই গাড়ির গতি কমিয়ে আনল কিটসন, তারপর একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার পাশে।

'গাড়িটা কিছুক্ষণ ঠান্ডা হোক, তারপর আবার চালানো যাবে।' গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ল কিটসন। গোটাকয়েক বড় বড় পাথরের টুকরো নিয়ে গাড়ির চাকায় আটকে দিল সে। জিনি হাতল ঘুরিয়ে খুলে দিল ক্যারাভ্যানের দরজা।

কিটসন ঘুরে গিয়ে উঁকি মারল ক্যারাভ্যানের ভেতরে। ঘন অন্ধকারে ব্লেক বা সে, কারও পক্ষেই কাউকে দেখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ওরই মধ্যে ব্লেক অনুভব করল কিটসনের উপস্থিতি।

'কী হল, থামলে কেন?' সে জানতে চাইল।

'ইঞ্জিন ভীষণ গরম হয়ে পড়েছে। একটু ঠান্ডা হওয়া দরকার, তাই থামালাম।'

ব্লেক আড়ষ্ট দেহে নেমে দাঁড়াল ক্যারাভ্যান থেকে। এগিয়ে গেল রাস্তার ধারে। বুক ভরে শ্বাস নিল ঠান্ডা পাহাড়ি বাতাসে।

'হুঁ, আমরা তাহলে অনেকটা পথই এসে পড়েছি। ওপরে পৌঁছতে আর কতটা পথ বাকি?'

'প্রায় ষোলো মাইল। খারাপ রাস্তার এখনও সবটাই বাকি।'

'কী মনে হয়, শেষটুকু নির্বিঘ্নে পার হওয়া যাবে তো?'

কিটসন মাথা নাড়ল, 'কী জানি! এই ক্যারাভ্যান ও ট্রাকের ওজন তো নেহাত কম নয়! শুধু ক্যারাভ্যানটা টেনে তোলাই সমস্যা হয়ে উঠবে, ট্রাকের কথা তো ছেড়েই দিলাম।'

জিনি এসে দাঁড়াল ওদের পাশে।

'এক কাজ করা যাক। ট্রাকটা বের করে চালিয়ে নিয়ে চলো।' ও প্রস্তাব দিল, 'এখন যথেষ্ট রাত হয়েছে, সুতরাং বিপদের কোনও ভয় নেই।'

ব্লেক ইতস্তত করল।

'ট্রাকটাকে ওপরে তোলার এটাই একমাত্র পথ।' জিনির প্রস্তাবে সায় দিল কিটসন, 'এবং এ কাজটা যে খুব একটা সহজ হবে তা আমি বলছি না।'

'তাই করা যাক তাহলে, কিন্তু কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে তাহলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না।'

জিপো এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ক্যারাভ্যানের পাশে, চুপচাপ শুনছিল ওদের কথা এখন সে মুখ খুলল, 'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়? আর কতদূর?'

পাহাড়ের একেবারে ওপরে একটা হ্রদ আছে—আর আছে ঘন জঙ্গল। যদি আমরা সেখানে পৌঁছতে পারি,তাহলে সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।'

কিটসন জবাব দিল।

'কিন্তু ট্রাকটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে গেলে প্রথমে ব্যাটারির তার দুটোকে আবার লাগিয়ে নিতে হবে—জিপো, এদিকে এসো! ভূতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে একটু কাজের কাজ করো। ব্যাটারির তার দুটোকে লাগিয়ে দাও চটপট।' ব্লেক খেঁকিয়ে উঠল জিপোকে লক্ষ করে।

একটা শাবলের সাহায্যে ট্রাকের বনেট ভেঙে যখন ওরা ব্যাটারির তার-লাগানোর কাজ শেষ করল, ততক্ষণে বুইকের ইঞ্জিন অনেকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে।

'বুইকের সঙ্গে ট্রাকটাকে আরও কিছুক্ষণ টেনে নিয়ে গেলে কেমন হয়?' ব্লেক বলল। কারণ ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানের বাইরে আনার ব্যাপারে সে নিতান্তই অনিচ্ছুক।

'সেটা না করলেই ভালো হয়।' কিটসন জবাব দিল, 'কারণ রাস্তার খাড়াই ক্রমশ বাড়ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর বুইকের ইঞ্জিন আবার গরম হয়ে উঠবে, তখন আবার আমাদের রাস্তার ধারে অপেক্ষা করতে হবে।'

ব্লেক কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর উঠে বসল ট্রাকের ভেতরে। ইঞ্জিন চালু করে ট্রাকটাকে পিছিয়ে আনতে লাগল ক্যারাভ্যানের পাটাতন বেয়ে।

'তোমরা আগে আগে বুইক নিয়ে চলো।' কিটসনকে লক্ষ করে সে বলল, 'জিপো আর আমি ট্রাক নিয়ে তোমাদের পিছু পিছু আসছি। আমি ট্রাকের হেডলাইট জ্বালছি না। তোমাদের গাড়ির পেছনের লাল আলো দেখেই আমি পথ চিনতে পারব।'

কিটসন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর উঠল গিয়ে বুইকে, জিনির পাশে। সে গাড়ি চালু করতেই জিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ট্রাকটাকে দেখতে চেষ্টা করল।

আবার শুরু হল ওদের পথ চলা। ট্রাকের ক্লান্তকর ওজনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বুইকটা সহজ গতিতে, সগৌরবে চড়াই রাস্তা বেয়ে উঠতে লাগল।

'ওরা ঠিকমতো ফলো করছে তো?' কিটসন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। কিন্তু একটু আস্তে চালাও; বাঁক নেওয়ার সময় ওরা পিছিয়ে পড়ছে।'

এইভাবে মিনিট কুড়ি চলার পর ওরা এসে পৌঁছল রাস্তার সেই বিধ্বস্ত অংশের কাছে।

কিটসন হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি থামাল।

'তুমি গাড়িতেই থাকো। আমি সামনে গিয়ে রাস্তার অবস্থাটা দেখছি।'

কিটসন গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল ট্রাকের কাছে। ব্লেককে জানাল, সে সামনের রাস্তাটা একবার পরীক্ষা করতে যাচ্ছে।

বুইকের হেডলাইটের আলোয় ওরা তাকাল রাস্তাটার দিকে। রাস্তাটা সোজা উঠে গেছে ওপরে—প্রায় লম্বভাবে। বড় বড় পাথর, নুড়ি সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রাস্তার ওপর।

'আরে সর্বনাশ!' ব্লেক অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠল, 'আমাদের কি এই রাস্তা বেয়ে উঠতে হবে?'

'হ্যাঁ।' কিটসন মাথা নাড়ল, 'কাজটা যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই—তবে অসম্ভব নয়। প্রথমে আমাদের ওই বড় বড় পাথরগুলোকে রাস্তার মাঝখান থেকে সরাতে হবে।'

সে এগিয়ে চলল রাস্তা ধরে। বড় পাথরগুলোকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিতে লাগল রাস্তার ধারে।

সমস্ত বড় পাথরগুলো সরিয়ে, পথ পরিষ্কার করতে ওদের তিনজনের প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। প্রায় পাঁচশো গজ ধরে রাস্তাটার ওই রুক্ষ অবস্থা, তারপর থেকেই সেটা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

'যাক, মনে হয় এতেই কাজ হবে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিটসন, 'এই পর্যন্ত আসতে পারলেই বাকিটা আমরা সহজে পার হতে পারব।'

ওরার তিনজনে আবার ঢাল বেয়ে নেমে চলল দাঁড়িয়ে থাকা বুইকের কাছে।

'খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবে।' ব্লেককে বলল কিটসন, আর সবসময় গাড়িকে প্রথম গিয়ারে রাখবে। হেডলাইট জ্বালাতে ভুলো না যেন। তবে আর যাই করো গাড়ি এক মুহূর্তের জন্যেও থামবে না। যদি

একবার থামো, তাহলে নতুন করে আর চাকার জোর পাবে না।

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে—’ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল ব্লেক, ‘কী করে গাড়ি চালাতে হয় সেটা আর তোমাকে শোখাতে হবে না, তুমি তোমারটার দিকে খেয়াল রেখো, আমি আমরাটা দেখব।’

‘আমি একেবারে ওপরে না ওঠা পর্যন্ত তুমি কিন্তু ট্রাক নিয়ে উঠতে শুরু কোরো না। হয়তো প্রথমবারের চেষ্টায় আমি সফল নাও হতে পারি। আর যদি আমাকে গাড়ি পেছিয়ে নেমে আসতে হয়, তাহলে তোমার ট্রাক আমার রাস্তা বন্ধ করুক তা আমি চাই না।’

‘ঠিক আছে, এখন বেশি বকবক না করে কাজ শুরু করো।’ কিটসনকে খিঁচিয়ে উঠল ব্লেক।

কিটসন কাঁধ ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল বুইকের দিকে। উঠে বসল গাড়িতে।

হেডলাইট জ্বালিয়ে সে গিয়ার নামিয়ে দিল প্রথম ঘরে। তারপর অ্যাকসিলারেটারে প্রয়োজনীয় চাপ দিয়ে সে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে চলল খাড়াই রাস্তা ধরে।

প্রয়োজনের তুলনায় বুইকের শক্তির কমতি নেই। কিন্তু পিছনে বাঁধা ক্যারাভ্যানের—খালি হলেও—ওজন সে শক্তি হ্রাসের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াল। থেকে থেকেই গাড়ির পিছনের চাকা দুটো নিরালম্ব হয়ে বিদ্যুবেগে ঘুরতে লাগল। সেইসঙ্গে পাথরের টুকরো, শুকনো মাটি ছিটকে পড়তে লাগল চাকার দু-পাশে।

জিনি সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছিল—চোখের দৃষ্টি রইল রাস্তার দিকে। গাড়ির গতিপথে কোনও বড় পাথর পড়লেই জিনি কিটসনকে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছে।

বুইকের গতি এখন আরও কমে গেছে। স্টিয়ারিং হুইল শক্ত হাতে চেপে আপন মনেই শাপশাপন্ত করছে কিটসন। তার পা নির্মমভাবে চেপে বসেছে অ্যাকসিলারেটারে। গাড়ির প্রচণ্ড কাঁপুনি অনুভব করছে সে।

যে মুহূর্তে তারা থামবে, সেই মুহূর্তেই ঘটবে চরম সর্বনাশ। ভাবল কিটসন! সে আচমকা বাঁক নিল ডানদিকে, যাতে ক্যারাভ্যানের সরাসরি পিছুটানটা কিছুটা কমে যায়। এবং পরমুহূর্তেই আবার বাঁ-দিকে বাঁক নিল সে। ওইভাবে সেই সরু রাস্তায় একবার ডান দিক, একবার বাঁ-দিক করে সহজাত দক্ষতার সঙ্গে রাস্তার ধার বাঁচিয়ে সে বুইক নিয়ে এগিয়ে চলল।

গাড়ির গতি ক্রমশ বেড়ে উঠল।

রেডিয়েটারের জল ইতিমধ্যেই ফুটতে শুরু করেছে, সেইসঙ্গে গাড়ির ভেতরটাও হয়ে উঠেছে, অসহ্য গরম। হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়ল সামনের স্বাভাবিক রাস্তা।

‘ওঃ আর একটু।’ উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল জিনি, ‘আমরা প্রায় এসে গেছি।’

সম্ভবত এই বিশেষ মুহূর্তের জন্যেই বুইকের কিছুটা শক্তি কিটসন সংরক্ষিত রেখেছিল। এবার সে অ্যাকসিলারেটার চেপে ধরল গাড়ির মেঝের ওপর। গাড়ির পিছনের চাকা প্রথমটা নিরালম্ব হয়ে ঘুরতে লাগল, তারপর গাড়ির পিছন দিকটা সামান্য ডান দিকে সরতেই চাকায় জোর পাওয়া গেল। একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি এবং ক্যারাভ্যান রাস্তার স্বাভাবিক অংশে উঠে পড়ল—এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তার গতিবেগ বাড়তে শুরু করল।

গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করাল কিটসন।

‘যাক, আমরা তাহলে শেষ পর্যন্ত পেরেছি।’ কিটসন সাফল্যের হাসি হাসল, ‘ওফ্। আমি তো ভাবলাম বোধ হয় হয়ে গেল।’

‘তোমার এলাম আছে, আলেক্স। এরকমভাবে গাড়ি চালানো নেহাত সোজা ব্যাপার নয়।’

কিটসন ওর দিকে চেয়ে হাসল। ব্রেক আটকে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

ব্লেক ততক্ষণে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু কিটসনের বুইকের মতো প্রয়োজনীয় শক্তি তার ট্রাকের ছিল না। অবশ্য বুইকের মতো একটা ভারী ক্যারাভ্যানকেও তাকে টেনে তুলতে হচ্ছে না।

'ও বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি উঠছে।' কথাগুলো বলে কিটসন ঢাল বেয়ে দৌড়ে নামতে শুরু করল—সোজা ট্রাকের হেডলাইট লক্ষ করে।

ওপরে ওঠার জন্যে ব্লেকের তাড়াহুড়োর অন্ত ছিল না। সে অ্যাকসিলারেটার চেপে ধরেছে গাড়ির মেঝেতে—প্রয়োজনীয় মুহূর্তের জন্যে সামান্যতম শক্তিও সে অবশিষ্ট রাখছে না।

হেলতে দুলতে লাফাতে-লাফাতে ট্রাকটা বন্ধুর পথ ধরে ওপরে উঠতে লাগল। ব্লেকের পাশে বসা জিপো ট্রাকের ঝাঁকুনিতে বারবারই ছিটকে পড়তে লাগল দরজার গায়ে।

'ওঃ—সাবধানে চালাও!' জিপো আর্তনাদ করে উঠল, 'তুমি বড্ড বেশি জোরে চালাচ্ছ!'

'থামো!' ব্লেক চিৎকার করে বলল, 'আমার সে খেয়াল আছে।'

ট্রাকের হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় জিপো দেখল ওদের সামনে রাস্তায় পড়ে এক বিশাল পাথর।

'সাবধান!' বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল জিপো।

কিন্তু ব্লেক সাবধান হওয়ার আগেই ট্রাকের সামনে ডান দিকের চাকাটা ধাক্কা মারল পাথরটার গায়ে। এই আকস্মিক সংঘর্ষে ট্রাকটা ছিটকে গেল বাঁ-দিকে। ব্লেক সামাল দেওয়ার আগেই গাড়িটা হেলে পড়ল খাদের দিকে; আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির ইঞ্জিন।

ট্রাকটাকে একটা বিপজ্জনক কোণে হেলে পড়তে দেখে জিপো ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'গাড়িটা উলটে পড়ছে।' পাগলের মতো ট্রাকের ডানদিকে দরজা ধরে টানাটানি শুরু করে দিল সে। কিন্তু ট্রাকটা হেলে থাকার দরুন, এবং দরজার অস্বাভাবিক ওজনের জন্য জিপোর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল।

'চুপ করে বসে থাকো, গাধা কোথাকার!' খেঁকিয়ে উঠল ব্লেক, 'তোমার নড়াচড়ার জন্যেই গাড়িটা এবার ওলটাবে!'

কিটসন ছুটে এল ওদের কাছে।

ট্রাকটার এই বিপজ্জনক অবস্থা তাকে শঙ্কিত করে তুলেছে। সে লাফ দিয়ে উঠল দরজায় লাগোয়া পাটাতনের ওপর। শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ডান দিকের ঊর্ধ্বাভিমুখী চাকা দুটোকে স্থির রাখবার চেষ্টা করল।

'ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়ি আবার পেছতে শুরু করো।' ব্লেককে বলল সে।

ব্লেকের মুখ উত্তেজনা, আতঙ্কে ঘর্মাক্ত, রক্তিম। কিটসনের কথায় চাপা স্বরে সে খিঁচিয়ে উঠল, 'এতটুকু নড়বার চেষ্টা করলেই ট্রাকটা খাদে উল্টে পড়বে।'

'এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। খুব আস্তে-আস্তে ডান দিক চেপে গাড়ি চালু করো।'

অস্থির হাতে ইঞ্জিন চালু করল ব্লেক। তারপর ব্যাক গিয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়তে শুরু করল।

'খুব ধীরে-ধীরে ক্লাচ ছাড়বে। যেন ঝাঁকুনি না লাগে। তারপর গাড়িটা চলতে আরম্ভ করলেই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পেছতে শুরু করবে।'

চাপা স্বরে খিস্তি করে ক্লাচ ছাড়ল ব্লেক, ট্রাকটা সচল হতেই সে বাঁ-দিকে স্টিয়ারিং ঘোরাতে শুরু করল।

এক সংক্ষিপ্ত আতঙ্কিত মুহূর্তের জন্যে ব্লেক অনুভব করল ট্রাকের ডান দিকের চাকা দুটো মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ছে, কিন্তু কিটসনের ওজন চাকার ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করল এবং ধীরে-ধীরে ট্রাকটা পিছিয়ে এসে আবার খাড়াই রাস্তার সোজাসুজি দাঁড়াল।

ব্লেক এবার ব্যাক গিয়ার থেকে ফাস্ট গিয়ারে গাড়ি আনবার চেষ্টা করতেই ট্রাকটা রাস্তার ঢালের জন্যেই পিছন দিকে গড়াতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চেপে ধরল ব্লেক।

এবং অনিবার্যভাবেই ট্রাকের সচল ইঞ্জিন স্তব্ধ হল।

'ঠিক আছে। তুমি বেরিয়ে এসো, আমি দেখছি।' কিটসনের স্বরে তিরস্কার ও আদেশের আভাস।

গজ গজ করতে করতে বাইরে নেমে এল ব্লেক। কিন্তু ট্রাক চালানোর দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে সে যেন স্বস্তি বোধ করল।

কিটসন কিছুক্ষণ ধরে ট্রাকটার অবস্থাটা দেখল। তারপর মাথা নাড়ল ।

'কয়েকটা পাথর নিয়ে এসো। পেছনের চাকা দুটো ঠেকা দিতে হবে। নইলে ইঞ্জিন চালু করা যাবে না।' কথা শেষ করে রাস্তার ধারে এগিয়ে গেল সে। একটা বড় পাথরকে কোনওরকমে টানতে-টানতে নিয়ে এল ট্রাকের কাছে। তারপর পিছনের চাকার গায়ে নরম মাটিতে ঠেসে ধরল পাথরটা।

আরেকটা পাথর নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে এল ব্লেক। অন্য চাকাটায় ঠেকা দিল।

কিটসন এবার ট্রাকের ভেতর উঠে বসল, ইঞ্জিন চালু করল।

জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে সে বলল, 'যদি হঠাৎই ইঞ্জিন থেমে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি আর জিপো পেছনের চাকায় ঠেকা দেবে। যাতে ট্রাকটা আবার গড়াতে না পারে। হয়তো এইভাবেই আমাকে ওপরে উঠতে হবে, কারণ এই মাটিতে ট্রাকের চাকা ভালোভাবে ধরবে না।'

'নাও এবার কাজ শুরু করো।' ব্লেক বিরক্তিভরে খেঁকিয়ে উঠল, ট্রাকের চাকা নরম মাটিতে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে মনে মনে নিজেকেই দায়ী করল সে। তার বিরক্তিও অনেকটা সেই কারণেই।

কিটসন কিছুক্ষণ ধরে ইঞ্জিন চালু রাখল। তারপর হ্যান্ড-ব্রেকটা খুলে দিল। ট্রাকটা পিছনের পাথরে ভার রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

'এবার তাহলে সামনে এগোচ্ছি।' ব্লেক ও জিপোর উদ্দেশ্যে কথা কটা ছুড়ে দিয়ে আলতা করে ক্লাচ ছাড়তে শুরু করল কিটসন।

ট্রাকটা ধীরে-ধীরে সামনে এগোতে লাগল। ওটার পিছনের চাকা দুটো তেমন জোরালো অবলম্বন না পেয়ে পিছলে গেল, বনবন করে ঘুরতে আরম্ভ করল। একই সঙ্গে মাটি, পাথরের টুকরো ছিটকে গিয়ে আঘাত করল পিছনের দাঁড়ানো জিপো ও ব্লেকের গায়ে।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে পিছন ফিরে দাঁড়াল আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায়।

কিটসন ট্রাকটাকে সোজা রাখবার চেষ্টা করল, অ্যাকসিলারেটারে পুরো চাপ দিয়ে চেষ্টা করল সামনে এগোতে; কিন্তু ট্রাকের ইঞ্জিনের পক্ষে এতখানি ওজন সামলে রাখা সম্ভব হল না। ইঞ্জিন স্তব্ধ হল। তড়িঘড়ি ব্রেকে চাপ দিল কিটসন। এতক্ষণে সে মাত্র গজ দুয়েক দূরে এগিয়েছে।'

কিন্তু ব্রেক দেওয়া সত্তেও ট্রাকটা গড়িয়ে-গড়িয়ে পিছোতে শুরু করল। কিটসন চিৎকার করে ব্লেক ও জিপোকে ডাকল ট্রাক সামলানোর জন্য। ওরা এসে পিছনের চাকায় পাথর লাগাতে লাগাতে ট্রাকটা প্রায় গজখানেক পিছিয়ে এল।

দ্বিতীয় প্রয়াসে কিটসন আরও চার গজ এগিয়ে গেলে, কিন্তু তারপরেই যথারীতি ইঞ্জিন বন্ধ হল। এবার ব্লেক, জিপো প্রস্তুত ছিল। ইঞ্জিন থামতেই ওরা দৌড়ে এসে পিছনের চাকায় পাথর দিয়ে ঠেকা দিল।

এইভাবে আধঘণ্টা ধরে চলল ট্রাক চালানোর কাজ। কিটসন হ্যাঁচকা মেরে একটু একটু করে এগোয়ে আর ব্লেক ও জিপো এসে পাথরের ট্রাকের পতন রোধ করে।

অবশেষে ওরা ট্রাক নিয়ে বুইকের পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল। কিন্তু ততক্ষণে তিনজনেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই ব্লেক কিছুক্ষণ বিরতির প্রস্তাব করল।

'থাক, কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করা যাবে। শালার ইঞ্জিনটা একটু ঠান্ডা হোক।' ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল ব্লেক।

কিটসন ট্রাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

'যাক আর খুব বেশি রাস্তা বাকি নেই। এই রাস্তটুকু পার হলেই আর কোনও ভয় নেই। ট্রাক ঠিক চলবে।'

এমন সময় ছুটতে-ছুটতে জিনি নেমে এল ওদের কাছে, কিটসনকে লক্ষ করে বলল, 'সত্যি, তোমার গাড়ি চালানোর তুলনা নেই।'

কিটসন খুশি ভরা মুখে ওর দিকে চেয়ে হাসল।

'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ড্রাইভার কী বলো?' ব্লেক ব্যঙ্গ করে উঠল, 'নিঃসন্দেহে নবম আশ্চর্য!'

জিনি তাকাল ব্লেকের দিকে, 'তোমার তো সে ক্ষমতাটুকুও নেই। তবে আর মিছিমিছি ঠাট্টা করে লাভ কী?'

ব্লেক জিনিকে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'আর কারও না পাক, এ ব্যাপারে আলেক্স অন্তত তোমার সাপোর্ট পাবে। অতএব, মত পালটে ওকে নিরাশ কোরো না।'

কথা শেষ করে ব্লেক এগিয় গেল রাস্তার পাশের দিকে। একটা পাথরের ওপর বসে সে একটা সিগারেট ধরাল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কিটসনের যখন মনে হল ট্রাকটার ইঞ্জিন যথেষ্ট ঠান্ডা হয়েছে, তখন সে ব্লেককে ডাকল, উঠে বসল ট্রাকের ভেতরে।

দশ মিনিট পরে ট্রাকটাকে দেখা গেল বুইকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

'এখন এটাকে ক্যারাভ্যানে ভরে ফেলা যেতে পারে।' কিটসন বলল, 'বুইকের যখন টানতে অসুবিধে হবে না তখন ট্রাকটাকে আড়ালে রাখাই ভালো।'

সে ট্রাকটাকে চালিয়ে ঢুকিয়ে দিল ক্যারাভ্যানের ভেতরে। ব্লেক আর জিপো একই সঙ্গে ক্যারাভ্যানে আশ্রয় নিল।

ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করে কিটসন বুইকের কাছে এগিয়ে গেল। স্টিয়ারিং ধরে বসল চালকের আসনে —জিনির পাশে।

'তোমার দক্ষতায় আমি অবাক হয়ে গেছি আলেক্স। তুমি না থাকলে এ রাস্তা আমরা কোনওদিনই পার হতে পারতাম না।'

জিনি ঝুঁকে এল সামনের দিকে। ওর উষ্ণ ঠোঁট আলতোভাবে কিটসনের গাল স্পর্শ করল।

তাঁবুর পরদার ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসা সূর্যের আলো চোখে পড়তেই ব্লেকের ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে সে নির্বিকারভাবে তাকিয়ে রইল ওপরের চালু ক্যাম্বিসের ছাদের দিকে। সে কোথায় আছে, এই সামান্য কথাটা মনে করতেই তার কয়েকটা দ্বিধাভরা মুহূর্ত কেটে গেল।

চোখ বন্ধ করল ব্লেক। অনুভব করল সারা শরীরে ক্লান্তির অবসাদ। সারারাত রুক্ষ মেঝেতে শোয়ার ফলে তার হাত-পা সব আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ভুরু কুঁচকে পরিস্থিতি অনুমান করার চেষ্টা করল ব্লেক।

যাক, অন্তত লুকোবার জন্য একটা ভালো জায়গা ওরা পেয়েছে। যদি কপাল ভালো থাকে, তাহলে জিপো ট্রাক না খোলা পর্যন্ত বেশ নিরাপদেই এখানে লুকিয়ে থাকা যাবে।

কাছাকাছিই রয়েছে একটা ঝরনা—সুতরাং জলের অভাব নেই। তাছাড়া, তাদের আড়াল করে রেখেছে ঘন জঙ্গল। উড়ন্ত কোনও এয়ারক্র্যাফট যে তাদের দেখে ফেলবে, সে সম্ভবনাও কম। আর বড় রাস্তা থেকে তারা রয়েছেও প্রায় পাঁচশো গজ দূরে।

এই বিধ্বস্ত পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে যে ট্রাকটাকে ওপরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সেটা কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না। সুতরাং কেউ যে এখানে এসে হারানো ট্রাকের খোঁজ করবে সে সম্ভবনাও কম।

এখন সবকিছু নির্ভর করছে জিপোর ওপর। যদি এমনিতে সে তালা খুলতে না পারে, তাহলে বাধ্য হয়েই তাদের অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে হবে।

চার চারদিন ধরে ট্রাকটাকে হাতের মুঠোতে পেয়েও দশ লাখ ডলার এখনও তাদের নাগালের বাইরে, এ কথা ভাবতেই ব্লেক রাগে জ্বলে উঠল।

চোখ খুলল ব্লেক। চোখ কুঁচকে ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল। ছটা-পাঁচ। এবার মাথা তুলে ব্লেক তাকাল শুয়ে থাকা জিনির দিকে। একটা কোটকে ভাঁজ করে, তার ওপরে মাথা রেখে চাদর মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে ও।

কিটসন শুয়েছে জিনি ও ব্লেকের ঠিক মাঝখানে—এখনও গভীর ঘুমে অসাড়।

তাঁবুর ভেতর জায়গা খুব একটা বেশি নেই। কিন্তু তবুও ওরই মধ্যে জায়গা করে কোনওরকমে শুয়েছে ওরা। কারণ বাইরের অসহ্য ঠান্ডায় কারও পক্ষে রাত কাটানো সম্ভব নয়।

ব্লেক এবার চোখ ফেরাল জিপোর দিকে। এখনও বোধ হয় ব্যাটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে—ভাবল সে। কিন্তু চোখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠে বসল। তার মুখের পেশি অনিশ্চয়তায় টান-টান।

তাঁবুতে জিপো নেই।

এক মুহূর্তের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল ব্লেক। কিন্তু পরক্ষণে জিপোর এই অনুপস্থিতির একটা সম্ভাব্য সমাধান মনে পড়ায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হল সে। হয়তো জিপো বাইরে গেছে—তাদের জন্যে প্রাতরাশ তৈরি করছে।

কিন্তু তাকে নিশ্চিত হতে হবে। সুতরাং গায়ের চাদর ছুড়ে ফেলে ব্লেক কিটসনকে পা দিয়ে এক ধাক্কা মারল। কিটসনের ঘুম ভাঙতেই সে বলে উঠল ‘শিগগির ওঠো! জিপো এর মধ্যেই কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে। আমাদের হাতে আজ প্রচুর কাজ।’

কিটসন মাথা তুলে চোখ পিটপিট করে ব্লেকের দিকে তাকাল। তারপর উঠে আড়ামোড়া ভাঙল। তাঁবুর দরজার সব থেকে কাছাকাছি থাকায় সেই-ই প্রথম হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সূর্যের প্রখর আলোয় চোখ পিটপট করতে লাগল কিটসন।

ব্লেক কিটসনের ঠিক পরেই এল। ইতিমধ্যে জিনির ঘুম ভেঙেছে। চোখ কচলাতে কচলাতে ও উঠে বসল।

বাইরের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বোলাল কিটসন, জানতে চাইল, ‘জিপো কোথায়?’

ব্লেক চকিতে তাকাল অদূরে গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো ক্যারাভ্যানের দিকে। তারপর দেখল ঝরনার দিকে।

কোথাও জিপোর চিহ্নমাত্র নেই।

দু-হাতের চেষ্টায় মুখ আড়াল করে সর্বশক্তি দিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল ব্লেক, ‘জিপো ও—ও—’

কোনও উত্তর নেই। কিটসন ও ব্লেক, তাকাল পরস্পরের দিকে।

‘হতভাগাটা আমাদের ছেড়ে সরে পড়েছে।’ জিঘাংসা-নিষ্ঠুর স্বরে বলে উঠল ব্লেক, ‘মনে হয় পালিয়েই গেছে। ওর ওপর আমাদের নজর রাখা উচিত ছিল।’

জিনি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল।

‘কী হয়েছে?’

‘জিপো পালিয়েছে।’ কিটসন জবাব দিল।

‘তাহলে ও খুব বেশিদূর যেতে পারেনি। কারণ মিনিট কুড়ি আগেও ওকে আমি ঘুমোতে দেখছি।’

‘যে করেই হোক ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।’ ব্লেকের গলা ভয়ঙ্কর শোনাল, ‘জিপোকে ছাড়া আমরা অথৈ জলে পড়ব। নাঃ, ওর বোধহয় মাথার ঠিক নেই। নইলে কুড়ি মাইল পাহাড়ি রাস্তা পায়ে হেঁটে কেউ পালাবার মতলব করে। এখান থেকে বড় রাস্তায় পৌঁছতেই ওর ঘণ্টা দশেক লেগে যাবে।’

কিটসন রাস্তা লক্ষ করে ছুটতে শুরু করল। দেখাদেখি ব্লেকও তার সঙ্গ যোগ দিল।

ঘাসজমির শেষ প্রান্তে গিয়ে তারা থামল। তাকাল নীচের আঁকাবাঁকা সরু রাস্তার দিকে। পাহাড়ের গাঢ় রঙের পটভূমিকায় রাস্তাটাকে সাদা সুতোর মতো দেখাচ্ছে।

কিটসন হঠাৎ খামচে ধরল ব্লেকের হাত, আঙুল তুলে দেখাল, ‘ওই যে, জিপো যাচ্ছে।’

ব্লেক চোখের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করল কিটসন নির্দেশিত দিকে। কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর সে দেখতে পেল দেড় মাইল নীচে রাস্তা বেয়ে নেমে চলেছে, একটা ছোট সচল বস্তু—জিপো।

‘ওকে এখনও ধরা যাবে?’ ব্লেকের স্বর উত্তেজিত, ‘একবার ধরতে পারলে ওকে পালানোর ঠেলাটা হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দেব। চলো, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।’

‘না। রাস্তাটা অসম্ভব সরু। ওকে ধরতে পারলেও ওই রাস্তায় গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। তার চেয়ে চলো পাহাড়ের দিক দিয়ে নামতে থাকি, তাহলে দু-মাইল রাস্তা আমরা এক মাইল হেঁটেই পৌঁছে যাব।’

কথা শেষ করে কিটসন পাহাড়ের গা-বেয়ে নামতে শুরু করল। কখনও লাফিয়ে, কখনও বুকে হেঁটে সে খাড়াই বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে লাগল।

ব্লেক ইতস্তত করল। এই দুঃসাহসিক কাজটাকে তার ভীষণ বিপজ্জনক মনে হল। কিন্তু নিরুপায় হয়েই সে কিটসনকে অনুসরণ করল—তবে তার চেয়ে অনেক ধীর গতিতে সে নামতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদেই কিটসন রাস্তায় পৌঁছল। কিন্তু রাস্তা পেরিয়ে আবার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। এখানে পাহাড়ের গা আরও খাড়া, আরও ভয়ঙ্কর। সুতরাং সতর্কভাবে, আস্তে-আস্তে নামছে কিটসন। একবার আরেকটু হলেই সামনে হোঁচট খেয়ে পড়ছিল, কিন্তু কোনওরকমে শরীরকে পিছন দিকে ছিটকে ফেলে ভারসাম্য রাখল সে এবং গড়িয়ে গড়িয়ে এসে পড়ল রাস্তায় পরবর্তী পাকে। একই সঙ্গে কতকগুলো ছোট-বড় পাথরের টুকরো ছিটকে পড়ল নীচে। সামান্য আহত হলেও চটপট সে আঘাত সামলে উঠল কিটসন। তাকাল নীচের দিকে।

জিপোকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ঢালু রাস্তা ধরে বেশ দ্রুতগতিতে সে এগিয়ে চলেছে।

ব্লেক এসে দাঁড়াল কিটসনের পাশে।

‘ওই যে, ও যাচ্চে!’ কিটসন আঙুল তুলে জিপোকে দেখাল।

দাঁত খিঁচিয়ে রিভলভার উঁচিয়ে ধরল ব্লেক।

‘কী করছ কী?’ কিটসন ব্লেকের কবজি চোপ ধরল, ‘এখন জিপো আমাদের ট্রাঙ্ক খোলার একমাত্র ভরসা, আর ওকে তুমি খুন করতে চাইছ?’

ব্লেকের মুখমণ্ডল ঘামে ভেসে যাচ্ছে। সামান্য শ্বাস নেওয়ার জন্যে তাকে ভীষণভাবে হাঁপাতে হচ্ছে। হিংস্রভাবে এক ঝাঁকুনি দিয়ে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রিভলভারটা আবার খাপে গুঁজে রাখল। তারপর আবার পরের খাড়াই বেয়ে নামতে শুরু করল।

কিটসন ব্লেককে অনুসরণ করতে যাবে, হঠাৎই ওর চোখে পড়ল জিপোর ওপর। সে থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখ তুলে পাহাড়ের দিকে তাকাল জিপো। একমুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ছুটতে আরম্ভ করল।

‘ও আমাদের দেখে ফেলেছে।’ চিৎকার করে ব্লেককে জানাল কিটসন। তারপর গলা চড়িয়ে সে ডেকে উঠল, ‘জিপো! জিপো! থামো! ফিরে এসো!’

কিন্তু কে শোনে কার কথা! জিপো মরিয়া হয়ে ছুটে চলল। ওর পা দুটো যেন সীসের মতো ভারী ঠেসছে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ফুসফুস যেন ফেটে পড়তে চাইছে।

তার পালানোর এই চেষ্টা যে মূর্খামির ফল, তা সে যেন এতক্ষণে উপলব্ধি করল।

সকালে তাঁবুতে যখন জিপোর ঘুম ভেঙেছে, তখন ব্লেক, কিটসন ও জিনি তিনজনেই গভীর ঘুমে মগ্ন। ওদের ঘুমোতে দেখে এই পালাবার চিন্তা হঠাৎই ওর মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে। হঠাৎ বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

ওদের তিনজনের ঘুম না ভাঙিয়ে সে যে নিরাপদে তাঁবুর বাইরে বেরোতে পারবে, জিপো ভাবতে পারেনি। অবশ্য সেজন্য চেষ্টার কসুর করেনি জিপো। গায়ের চাদর সরিয়ে অতি সন্তর্পণে উঠে বসেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেছে তাঁবুর পরদার দিকে। কিটসনের ঘুমন্ত দেহকে অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সূর্যের পরশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে তার সহজ, সরল সাফল্যকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করেছে জিপো। সে জানে বড় রাস্তায় পৌঁছতে তাকে কুড়ি মাইল পাহাড়ি রাস্তা পার হতে হবে। তারপর সেখান থেকে কারও গাড়িতে চোপে সে পৌঁছে যাবে তার কারখানায়। কিন্তু কুড়ি মাইল পাহাড়ি রাস্তা!

তখন ঘড়িতে পৌনে ছটা। সুতরাং জিপো ভেবেছে, কম করে সাতটা আটটার আগে ওদের তিনজনের ঘুম ভাঙবে না। তার মানে সে পালাবার জন্যে অন্তত ঘণ্টা দেড় দুই সময় পাবে। সে যে ওদের ছেড়ে পালিয়েছে, সেটা বুঝতেও ব্লেক ও কিটসনের কিছু সময় লাগবে।

সুতরাং সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই রওনা দিয়েছে জিপো। দ্রুতপায়ে ঢালু রাস্তা ধরে চলতে শুরু করেছে।

এই আধঘণ্টায় সে প্রায় দু-মাইল রাস্তা পার হয়েছে। তারপর হঠাৎই অনেক ওপর থেকে ভেসে এসেছে ছোট বড় পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ।

চমকে মুখ তুলে তাকাতেই তার চোখে পড়েছে কিটসন আর ব্লেককে।

ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে নেমে আসছে, কখনও বুকে হেঁটে, কখনও গড়িয়ে কখনও বা একটুর জন্যে পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছে।

ওদের দেখেই আতঙ্কে হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে গেছে জিপোর।

সে শুনতে পেল কিটসনের চিৎকার, 'জিপো! থামো! ফিরে এসো।'

অন্ধের মতো দৌড়তে শুরু করল জিপো।

কয়েক শো গজ যাওয়ার পরই জিপো বুঝতে পেরেছে, এভাবে সে ওদের সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে পারবে না। তাই আবার সে পিছনে ফিরে দেখল।

ব্লেক তখন পাহাড়ের গা-বেয়ে নামছে। তারপর জিপোর দৃষ্টি সামনেই রাস্তায় পৌঁছল সে। কিটসন তার পিছন-পিছন গোড়ালিতে ভয় দিয়ে সরসর করে নেমে আসছে। সেইসঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে অজস্র পাথরের টুকরো, শুকনো ধুলোর মেঘ কিটসনকে যেন আড়াল করে দিতে চাইছে।

ফাঁদে পড়া ভয়ার্ত শিকারের মতো রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের ঢালের দিকে ছুটে চলল জিপো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভারসাম্য হারিয়ে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল সে। হাত দিয়ে পতনজনিত আঘাত রোধ করল জিপো। কিন্তু ওর ভারী শরীরটা পাহাড়ের রুক্ষ, অসমতল গা-বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। রাস্তার কাছাকাছি পৌঁছে জিপোর আহত দেহটা থামল। হাঁপাতে-হাঁপাতে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওপর দিকে।

না, এখান থেকে কিটসন বা ব্লেক কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা বড় বড় ঝুলন্ত পাথরগুলোই জিপো ও তাদের মাঝে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দেখতে না পেলেও ওদের এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ সে স্পষ্টই শুনতে পেল।সুতরাং মুহূর্তের জন্যে নিশ্চিন্ত বোধ করলেও আবার সচকিত হয়ে পড়ল জিপো। ওদের পায়ের শব্দ যেন অনেক বেশি কাছে মনে হচ্ছে।

জিপো উন্মত্তের মতো চারদিকে তাকাল। একটা আশ্রয় তার দরকার। নইলে মিনিট খানেকের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে।

সামনেই ডানদিকে সুবিস্তৃত ঘন বুনো গাছের ঝোপ-ঠিক পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে। শুধু একটা ভয়ার্ত চিন্তাই জিপোর মাথায় পাক খেতে লাগল; লুকোতে হবে। সুতরাং পরক্ষণেই ঝোপ লক্ষ করে তীরবেগে দৌড়ল সে। ঝোপের উচ্চতা বেশি নয়-জিপোর উরু পর্যন্ত। তারই মধ্যে দিয়ে টলতে-টলতে পড়িমড়ি করে ছুটে চলল সে। কাঁটাঝোপে লেগে তার প্যান্ট ছিঁড়ে গেল-পা কেটে গিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। ঝোপের মাঝামাঝি পৌঁছে উপুড় হয়ে হাঁপিয়ে পড়ল জিপো। মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল। ঝোপের ডালপালা আবার ফিরে এল নিজেদের জায়গায়, নিষ্পাপভাবে জিপোকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইল, যেন নিরাপত্তার চাদরে ভয়ার্ত জিপোকে আগলে রাখতে চাইছে।

গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল সে। উৎকর্ণ হয়ে নিশ্চলভাবে পড়ে রইল।

কিটসনই প্রথম রাস্তায় এসে পৌঁছল। কিন্তু সামনে পিছনে তাকিয়ে জিপোকে দেখতে না পেয়ে সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। আচমকাই থমকে দাঁড়াল কিটসন।

হাঁপাতে-হাঁপাতে একটা অশ্রাব্য কটূক্তি ছুড়ে ব্লেক এসে দাঁড়াল তার পাশে।

'কোথায় গেল ও?' শ্রান্ত স্বরে জানতে চাইল সে।

'মনে হয় কোথাও লুকিয়ে পড়েছে।' চিন্তিতভাবে জবাব দিল কিটসন।

ওরা দুজনেই তাকাল সামনের ঝোপের দিকে। কারণ এই রুক্ষ ধু-ধু পাহাড়ি এলাকায় লুকোবার এক এবং একমাত্র জায়গা ওই কাঁটাঝোপ।

'শালা ওখানেই লুকিয়েছে।' আঙুল তুলে ঝোপের বিস্তৃতির দিকে নির্দেশ করল ব্লেক। তারপর গলার স্বর উঁচু পরদায় তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'জিপো! বাইরে বেরিয়ে এসো। আমরা জানি তুমি ওখানে লুকিয়ে আছ!'

ব্লেকের স্বরে জিপো যেন আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল। নরম বেলে মাটিতে সে নিজেকে আর মিশিয়ে দিল, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে অনড় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ব্লেক ফিরল কিটসনের দিকে, 'চলো, ওকে ধরে বাইরে টেনে আনি। তুমি ওপাশ দিয়ে ভেতরে ঢোকো, আমি সামনে দিয়ে ঢুকছি।'

দু-হাতে কাঁটাগাছ সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে শুরু করল ব্লেক। কিন্তু এইভাবে গজ দশেক যাওয়ার পর সে থমকে দাঁড়াল। ব্লেক বুঝল, এভাবে শত পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করেও তার পক্ষে জিপোকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। কারণ গোটা এলাকাটাই ঘন ঝোপে ঠাসা। সুতরাং এর মধ্যে জিপোর অবস্থান নির্ণয় করা কোনও গণৎকারের পক্ষেও সম্ভব নয়, নেহাত ভাগ্য সহায় না হলে জিপোকে সে কোনওদিনই খুঁজে পাবে না।

ওদিকে ক্রম অগ্রসরমান কিটসনও একই সময়ে অবস্থাটা উপলব্ধি করল। সুতরাং একরাশ বুনো ঝোপের মাঝে সে থমকে দাঁড়াল।

সাগর-সবুজ বুনো ঝোপের বিস্তৃতিকে অতিক্রম করে ওরা দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল।

'জিপো।' ব্লেক চিৎকার করে উঠল। রাগে তার স্বর কাঁপছে, 'এই শেষবার তোমাকে বলছি। যদি এক্ষুনি বেরিয়ে না আস তাহলে পিটিয়ে তোমাকে ময়দার বস্তা করে ছাড়ব—এমন মার মারব, কোনওদিন ভুলবে না! বেরিয়ে এসো বলছি!'

ব্লেকের স্বরে ক্রোধ ও হতাশার আভাস জিপোকে নিশ্চিন্ত করল, সে বুঝল যদি সে সাহস করে নিশ্চলভাবে পড়ে থাকতে পারে, তাহলে তার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট। শুধু একটু সাহস...আর কিছু নয়।

হতাশ হলেও সামনের দিকে আরও কয়েক পা-এগিয়ে গেল ব্লেক। জিপো শুনতে পেল ঝোপঝাড় ঠেলে তার এগিয়ে আসার শব্দ—কিন্তু সে চলেছে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দিকে। কিটসনের অবস্থাও তথৈবচ সেও ব্লেকেরই মতো ভুল নিশানায় এগিয়ে চলল। জিপো দাঁতে-দাঁত চেপে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। তার হৃৎপিণ্ডের গতি ক্রমশ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এল।

বেশ কয়েক মিনিট পর যখন কিটসন ও ব্লেকের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল, তখন জিপো লুকোনো জায়গা ছেড়ে এগোতে মনস্থ করল।

কারণ ওরা যদি এইভাবে পুরো এলাকাটা তন্ন তন্ন করে চক্কর দেয়, তাহলে লুকোনো জায়গা ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলাই তার পক্ষে নিরাপদ।

সুতরাং বেলে মাটির ওপর ঘষটে সে এগোতে লাগল। খুব সতর্কভাবে কাঁটাগাছগুলোকে বিসদৃশভাবে না নড়িয়ে সে তার স্থূল দেহ নিয়ে এগিয়ে চলল। কারণ কাঁটাঝোপের সামান্য আন্দোলনই কিটসন ও ব্লেককে জানিয়ে দেবে তার অবস্থিতির কথা।

এইভাবে বুকে হেঁটে প্রায় তিরিশ চল্লিশ গজ যাওয়ার পর জিপো অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই সে দেখতে পেল সাপটাকে।

সবে সে তার ডান হাতটা সামনে বাড়িয়েছে, নিজেকে সামনে এগোবার প্রয়াসে তার আঙুলগুলো আঁকড়ে বসেছে নরম মাটিতে, এমন সময় সামনে চোখ পড়তেই জিপো দেখতে পেল সাপটাকে তার হাতের আঙুল থেকে ইঞ্চি কয়েক দূরেই ওটা কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রয়েছে। চ্যাপটা বাঁকানো ফণাটা শূন্যে স্থির।

বোবা আতঙ্কে দ্রুত শ্বাস টানল জিপো। তার সারা শরীর যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল, সমস্ত চেতনা হয়ে গেল আচ্ছন্ন। পাথরের মূর্তির মতো অনড় হয়ে পড়ে রইল সে রক্তের মধ্যে অনুভব করল বরফ শীতল আতঙ্কের সূক্ষ্ম স্রোত। হৃৎপিণ্ডের দুর্দম গতি বুঝি তার কণ্ঠনালী রোধ করে দিতে চাইছে।

সাপটাও নিশ্চলভাবে ফণা তুলে প্রতীক্ষায় রইল।

কয়েকটা যন্ত্রণাও উৎকণ্ঠাময় মুহূর্তের পর জিপো দাঁত দাঁত চেপে, মরিয়া হয়ে বিদ্যুগতিতে ফিরিয়ে আনল তার ডান হাত।

এবং সেই মুহূর্তেই সাপটা তার হাতে ছোবল মারল।

ডান হাতের চেটোয় অমানুষিক যন্ত্রণা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে জিপো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। উন্মাদের মতো কর্কশ গলায় এক অপার্থিব চিৎকার করে অন্ধের মতো ঝোপঝাড় ভেদ করে দৌড়তে শুরু করল।

ব্লেক ও কিটসন তখন বুনো ঝোপের একাংশের অনুসন্ধান সমাধা করে খোলা জায়গায় পৌঁছেছে। ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার অনুসন্ধান শুরু করতে যাবে, এমন সময় শুনতে পেল জিপোর মৃত্যুযন্ত্রণা-কাতর আর্তনাদ।

ওরা চমকে উঠল, থমকে দাঁড়াল।

দেখল, জিপো রক্ত-জমানো আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হাওয়ায় হাত ছুড়তে ছুড়তে উন্মাদের মতো ছুটে চলেছে।

‘শালা একেবারে পাগল হয়ে গেছে!’ বলেই ব্লেকও জিপোর পিছন-পিছন ছুটতে শুরু করল। ঝোপঝাড় ঠেলে কিটসনও তাকে অনুসরণ করল।

জিপোর আতঙ্কিত মস্তিষ্ক তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে, পাহাড়ের খাড়াই ঢালের দিকে। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোমাত্রই ভারসাম্য হারিয়ে পিছলে পড়ল জিপো। পাহাড়ের গা-বেয়ে গড়াতে-গড়াতে অসহায়ভাবে নেমে চলল নীচের রাস্তার দিকে। পড়বার সময় ইতস্তত পরে থাকা পাথরের টুকরোগুলো তার শরীরের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল নীচে, শুকনো ধুলোর মেঘ উড়িয়ে জিপোর স্থূলকায় শরীরটা গড়িয়ে চলল...

ব্লেককে পিছনে ফেলে কিটসনই আগে পৌঁছল জিপোর কাছে। নীচের রাস্তার কাছে একটা বড় পাথরের গায়ে পড়েছিল সে। কিটসন ঝুঁকে পড়ল জিপোর ওপর।

‘জিপো!’ কিটসন হাঁপাতে লাগল, ‘কোনও ভয় নেই। ব্লেক তোমাকে কিছু করবে না। কিন্তু তোমার হয়েছেটা কী!’

জিপোর কালশিটে পড়া মুখ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল কিটসন। ওর চোখ দুটো যেন সাদা ধূসর কাগজে দুটো বীভৎস ফুটো।

'একটা সাপ...' কোনওরকমে দম নিয়ে উচ্চারণ করল জিপো।

পড়িমড়ি করে এসে পৌঁছল ব্লেক। এতখানি পথ দৌড়ে আসার ফলে তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত লয়ে বইছে। জিপোকে দেখেই সে রাগে ফেটে পড়ল, 'শালা ভিতু কোথাকার! তোকে আমি খুন করে ফেলব!'

জিপোর স্থবির দেহ লক্ষ করে এক প্রচণ্ড লাথি চালাল ব্লেক। কিন্তু বাঁ-হাতে সে আঘাত রোধ করল কিটসন, 'থাক, এসব পরে হবে। দেখতে পাচ্ছ না, জিপোর কী অবস্থা হয়েছে।'

'সাপ... একটা সাপ...' জিপো ফুঁপিয়ে উঠল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতটা তুলে ধরে কিটসনকে আঘাতটা দেখাতে চাইল সে।

কিটসন সামনে ঝুঁকে এল। দেখল, জিপোর রক্তিম ডান হাত অস্বাভাবিক রকম ফুলে উঠেছে—সমস্ত রক্ত এসে যেন জমা হয়েছে তার হাতে। সে জিপোর স্ফীত হাতের ওপর আঙুল ছোঁয়াতে সে যন্ত্রণায় হৃদয়বিদারী এক আর্তনাদ করে উঠল। কিটসনের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল একটা শীতল শঙ্কার স্রোত।

জিপোর পাশে পা-ছড়িয়ে বসে পড়ল কিটসন, প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে, জিপো?'

'সাপ...একটা সাপ...' জিপো শ্বাসকষ্টে হাঁপাতে লাগল, '...আমাকে ছোবল... মেরেছে...'

জিপোর হাতের স্ফীত পেশির ওপর পাশাপাশি দুটো তীক্ষ্ণ দাঁতের দাগ কিটসনের চোখে পড়ল। সুতরাং বুঝতে তার আর কিছু বাকি রইল না।

'ভয় নেই জিপো।' ওকে আশ্বাস দিল কিটসন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি।'

'আমাকে...হাসপাতালে নিয়ে চলো।' জিপো ভাঙা স্বরে অনুনয় করল, 'আমি আমার ভাইয়ের মতো সাপের কামড়ে মারা যেতে চাই না...আলেক্স...'

কিটসন পকেট থেকে রুমাল বের করল। সেটাকে একটা দড়ির মতো পাকিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল জিপোর কবজিতে।

'তার মানে ওকে সাপে কামড়েছে?' উত্তেজিত হয়ে কিটসনের কাঁধ চেপে ধরল ব্লেক 'তাহলে তাহলে আমরা ট্রাকের তালা খুলব কী করে?'

কিটসন বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁধ থেকে ব্লেকের হাত সরিয়ে দিল। পকেট থেকে একটা ছোট্ট ছুরি বের করে তার ফলা খুলে ধরল।

'জিপো, এতে তোমার একটু ব্যথা লাগবে' বলতে বলতে জিপোর কবজি চেপে ধরল সে, 'কিন্তু কিছুটা আরাম পাবে। এ ছাড়া, এখন আর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।'

ছুরির ধারালো অগ্রভাগ জিপোর উত্তপ্ত, স্ফীত হাতে বসিয়ে দিল সে। লম্বা করে চিরে দিল খানিকটা।

জিপো চিৎকার করে বাঁ হাতে কিটসনকে আঘাত করল। আপ্রাণ চেষ্টা করল হাত ছাড়িয়ে নিতে।

ওর হাতের ক্ষতস্থান থেকে ধীরে ধীরে রক্ত বেরোতে শুরু করল। একইভাবে শক্ত হাতে জিপোর কবজি ধরে রইল কিটসন। হাতে চাপ দিয়ে ক্ষতমুখ দিয়ে বিষটা বের করার চেষ্টা করল সে। জিপোর বিবর্ণ, পাণ্ডুর মুখ দেখে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। মনে হল, জিপো যেন আসন্ন মৃত্যুর জন্যে নির্বিকারভাবে অপেক্ষা করছে।

'আলেক্স... তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু। তোমার সঙ্গে সেদিন যে দুর্ব্যবহার করেছি, সে সব ভুলে যেও। আমাকে... আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো...।'

'ভয় পেয়ো না, জিপো। আমি সব ব্যবস্থা করছি।' রুমালটাকে জিপোর কবজিতে আরও শক্ত করে বেঁধে দিল কিটসন—উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়াও, বুইকটা আগে নিয়ে আসি।'

'কী-কী বললে?' কিটসনের কথা শেষ হতে না হতেই খেঁকিয়ে উঠল ব্লেক।

'গাড়িতে করেই জিপোকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব। ওর অবস্থাটা একবার দেখো। বাঁচে কি না বাঁচে, ঠিক নেই।' ঘুরে দাঁড়িয়ে কিটসন পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'কিটসন!' ব্লেকের স্বরের তীব্রতায় কিটসন থামল, ঘুরে দাঁড়াল।

'আবার কী হল?'

'ফিরে এসো এখানে!' ব্লেক চিৎকার করে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? দেখো ওপরে!' আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখাল ব্লেক। একটা উড়োজাহাজ ধীর বেগে, চক্রাকারে পাহাড়ের ওপর দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'তুমি গাড়িটা আড়াল থেকে বাইরে আনলে ওরা দেখতে পাবে। তারপর পুলিশ নিয়ে এসে এ জায়গাটা গোরু-খোঁজা করতে ওদের কি খুব বেশি সময় লাগবে ভেবেছ?'

'তাতে কী হয়েছে?' রাগত স্বরে জবাব দিল কিটসন, 'একটা মানুষকে তো আর বসে বসে মরতে দেওয়া যায় না। জিপোকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে না গেলে ওর বাঁচার কোনও সম্ভাবনা নেই তুমি কি সেটা বুঝতে পারছ না?'

'গাড়িটা তুমি লুকোনো জায়গা থেকে বাইরে আনতে পারবে না, ব্যাস।'

'এখন থেকে হাসপাতাল কম করেও তিরিশ মাইল দূরে। এতটা রাস্তা আমি কি জিপোকে কাঁধে করে নিয়ে যাব?'

'তাতে আমার বয়েই গেলে!' খেঁকিয়ে উঠল ব্লেক, 'মোটমাট গাড়িটা তুমি দিনের আলোয় রাস্তায় বের করবে না। জিপোকে এখন ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। উপায় কী!'

'নিকুচি করেছে তোমার উপদেশের?' বলে কিটসন ঘুরে দাঁড়াল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রাস্তার দিকে উঠতে শুরু করল সে।

'কিটসন!'

ব্লেকের শাসানির সুরে থমকে দাঁড়াল কিটসন, ঘুরে তাকাল।

ব্লেকের রিভলভার তার হাতে উঠে এসেছে—কিটসনের শরীর লক্ষ করে স্থির হয়ে আছে কালো নলটা।

'এখানে ফিরে এসো।' ব্লেক নিষ্প্রাণ স্বরে আদেশ করল।

'দেরি হলে জিপো মারা পড়বে, এড। তুমি সেটা চোখে দেখছ না?'

'তুমি আগে এখানে ফিরে এসো।' ভয়ঙ্কর স্বরে শাসিয়ে উঠল সে, 'গাড়ি বের করার কথা ভুলে যাও। জলদি এদিকে এসো। আমি আর দ্বিতীয়বার বলব না।'

হৃৎপিণ্ডের অশান্ত স্পন্দনকে সঙ্গী করে ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল কিটসন। এতদিন বাদে তাহলে সময় এসেছে! সে ভাবল। আজই তাহলে একটা ফয়সালা হয়ে যাক। তবে ওর ডান হাতের দিকে আমাকে নজর রাখতে হবে। এই আমাদের চূড়ান্ত বোঝাপড়া। জিপোকে সে কিছুতেই অসহায়ভাবে মরতে দেবে না।

'কিন্তু আমাদের কিছু একটা করা উচিত।' ব্লেকের দিকে সহজ, স্বাভাবিক পদক্ষেপে এগিয়ে এল কিটসন। 'এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে জিপোকে আমরা মরতে দিতে পারি না। ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'ওর দিকে তাকিয়ে দেখো, গদর্ভ কোথাকার। যতক্ষণে তুমি ওপরে যাবে, গাড়ি বের করবে, গাড়ি নীচে নিয়ে এসে ওকে গাড়িতে তুলবে, তারপর হাসপাতালে রওনা হবে, ততক্ষণে ও মারা যাবে।'

'কিন্তু তাই বলে চুপচাপ বসে থাকলে তো চলবে না।' ব্লেকের দিকে না তাকিয়েই তাকে অতিক্রম করে গেল কিটসন, শরীরের প্রতিটি পেশি টানটান। আড়চোখে সে দেখল, ব্লেক রিভলভারটা সামান্য নামিয়ে নিল।

কিটসন পলকে ঘুরে দাঁড়াল। তার হাত কাটারির মতো বিদ্যুৎবেগে নেমে এল ব্লেকের কবজির ওপর।

ব্লেকের হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে গিয়ে পড়ল ঝোপের মতো। এক লাফে পিছিয়ে গিয়ে কিটসনের মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দাঁত বের করে নিঃশব্দে হেসে উঠল ব্লেক।

'তাহলে তাই হোক।' হালকা স্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করল ব্লেক, 'তুমিই যখন আগ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনলে তখন আমি কী করতে পারি। তোমাকে টিট করার ইচ্ছেটা আমার বরাবরের। সুতরাং সুযোগ যখন পেয়েছি, আজ তোকে সমঝে দের লড়াই কাকে বলে! শালা—'

সঙ্কুচিত চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে, মুষ্টিবদ্ধ হাতে অপেক্ষা করতে লাগল কিটসন।

চোয়াল নামিয়ে, দু-পাশে হাত রেখে ব্লেক সন্তর্পণে এগিয়ে আসতে লাগল।

কিটসন একটা বাঁ-হাতি ঘুষি চালাল ব্লেকের মুখ লক্ষ করে। কিন্তু চকিতে মাথা সরিয়ে নিল ব্লেক। কিটসনের ঘুষিটা তার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল, সে চট করে বসে পড়ল। কিটসনের ডান হাতর আড়াল কাটিয়ে তার বজ্রমুঠি সশব্দে আছড়ে পড়ল প্রতিদ্বন্দ্বীর পাঁজরে। আকস্মিক আঘাতে কিটসনের দম যেন বন্ধ হয়ে এল। সে কয়েক-পা পিছিয়ে গেল।

ব্লেক আরও এগিয়ে আসতেই কিটসনের বাঁ-হাতি ঘুষি তার মাথায় আঘাত করল। মুহূর্তের জন্য টলে উঠল ব্লেকের শরীর।

ওরা দুজনে আবার সরে গেল পরস্পরের কাছে থেকে। তারপর একই সঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল। কাছাকাছি আসতেই ওরা অন্ধ লক্ষ্যে ঘুষি চালাতে শুরু করল। কয়েকটা গায়ে মুখে আঘাত করল, কিন্তু তেমন জোরালো নয়। পরমুহূর্তেই ওরা ছিটকে সরে গেল পরস্পরের নাগাল থেকে। এইভাবে সতর্ক সাবধানি ভঙ্গিমায় চলল ওদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

হঠাৎই একটা সরাসরি সুযোগ পেয়ে ব্লেকের চোয়াল নিশানা করে একটা বাঁ-হাতি ঘুষি চালাল কিটসন। কিন্তু ব্লেকও এর জন্যে প্রস্তুত ছিল, পলকে সে মুখ সরিয়ে নিতেই ঘুষিটা তার কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। হিংস্রভাবে দাঁত বের করে কিটসনের বুক লক্ষ করে ডান হাতে জবাব দিল সে। ঘুষিটা সমস্ত শক্তি নিয়ে আঘাত করল প্রতিদ্বন্দ্বীর পাঁজরে।

জোরালো ঘুষির নিরেট আঘাত সইতে পারল না কিটসন। আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে।

হিংস্রভাবে হেসে এগিয়ে এল ব্লেক, আর একখানা ঘুষি বসিয়ে দিল কিটসনের ঘাড়ে। কিটসন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল, ওর মন ভরে গেল আকস্মিক শূন্যতায়।

ব্লেক পিছিয়ে দাঁড়াল।

হাতে এবং হাঁটুতে ভর দিয়ে কোনওরকমে উঠে বসল কিটসন। মাথা ঝাঁকিয়ে মস্তিষ্কের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাতে চাইল। দেখল, ব্লেক তার দিকে আবার এগিয়ে আসছে—সঙ্গে সঙ্গে ব্লেকের হাঁটু লক্ষ করে সে ঝাঁপ দিল। দু-হাতে ব্লেকের পা-দুটো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল সে।

কিটসনকে নিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল ব্লেক। কয়েক মুহূর্ত ওরা দুজনেই শিথিল ভঙ্গিতে হাত-পা এলিয়ে পড়ে রইল। তারপর কিটসন আচ্ছন্নভাবে ব্লেকের গলা টিপে ধরতে চাইল। কিন্তু ব্লেকের ঘুষি রগের পাশে এসে পড়তেই কিটসনের হাত আলগা হয়ে গেল। গড়িয়ে তার আওতার বাইরে চলে গেল ব্লেক।

একই সঙ্গে ব্লেক ও কিটসন উঠে দাঁড়াল। কিন্তু হাত উঁচিয়ে প্রস্তুত হতে কিটসনের বোধ হয় এক পলক দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ ব্লেকের ডান হাতি ঘুষিটা তার চোয়ালে আঘাত করল। ঘুষির প্রচণ্ড শক্তিতে কেমন যেন দুর্বল বোধ করল কিটসন। সামনের দিকে অনিশ্চিতভাবে ঝুঁকে পড়ে ব্লেকের হাত চেপে ধরল সে। এক দীর্ঘ মুহূর্ত ধরে চলল ওদের ধস্তাধস্তি। ব্লেক প্রাণপণে কিটসনের বাঁধন ছাড়াতে চেষ্টা করল, কিটসনও মরিয়া হয়ে ধরে রইল ব্লেকের হাত—সেই স্বল্প সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইল।

অবশেষে নিজেকে মুক্ত করে নিল ব্লেক। সঙ্গে সঙ্গেই চালাল বাঁ-হাতি ক্ষিপ্র ঘুষি। কোনওরকমে ঘুষিটাকে এড়াল কিটসন, ডান হাতে ব্লেকের উন্মুক্ত পাঁজরে একখানা বসিয়ে দিল, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল ব্লেক।

সাফল্যের আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে আরও এগিয়ে গেল কিটসন। এলোপাথাড়ি ঘুষি চালাল ব্লেকের মাথা লক্ষ করে।

কয়েকটা অস্ফুট শব্দ করে পিছিয়ে গেল ব্লেক।

এবার কিটসনের বাঁ-হাতি ঘুষি তার মাথায় গিয়ে বসতেই চোখে অন্ধকার দেখল ব্লেক। দু-হাত শূন্যে তুলে স্খলিত হয়ে আরও কয়েক পা-পিছিয়ে গেল। বিন্দুমাত্র দেরি না করে কিটসনের মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত আশ্রয় নিল ব্লেকের পেটে। হাঁপাতে-হাঁপাতে ছিটকে পড়ল ব্লেক। যন্ত্রণায় বেঁকে উঠল ওর সারা শরীর।

শিকারকে বাগে পেয়ে একরোখাভাবে অধৈর্য হয়ে এগিয়ে এল কিটসন। তার হাতে আঘাত করতে উদ্যত হতেই সে বুঝতে পারল শূন্যে ভেসে আসছে প্রতিদ্বন্দ্বীর ডান হাতি ঘুষি! কিন্তু তখন দেরি করে ফেলেছে।

সংঘর্ষটা কিটসন অনুভব করল তার চোয়ালে। তারপরই তার মস্তিষ্কে শ্বেত তপ্ত কিছুর বিস্ফোরণ ঘটল। সে বুঝল, নির্বোধের মতো ব্লেকের মার্কামারা ঘুষিকে আহ্বান জানিয়ে সে তার পরাজয়কে নিশ্চিত করে তুলেছে। অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ল কিটসন। পাথরের টুকরোর তীক্ষ্ণ আঘাতে তার মুখ জায়গায় জায়গায় কেটে গেল। যন্ত্রণায় চাপা আর্তনাদ করে গড়িয়ে চিৎ হল সে। তার ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সূর্যের উত্তপ্ত সোনা রোদ।

কয়েক মুহূর্তে অথর্ব হয়ে সে পড়ে রইল। তারপর আপ্রাণ চেষ্টায় মাথা তুলে দেখল ব্লেকের দিকে।

সে জিপোর দেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে—একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে।

কিটসন মাথা ঝাঁকাল, তারপর টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল। বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে সে ব্লেকের কাছে এগিয়ে এল। পায়ের শব্দে ব্লেক পিছনে মুখ ফেরাল—নির্লিপ্ত মুখের প্রতিটি পেশি টান টান।

‘ও মারা গেছে।’ ব্লেকের স্বর শীতল, নির্বিকার, ‘শেষ পর্যন্ত হতভাগাটা আমাদের এভাবে বোকা বানাল!’

কিটসন হাঁটু গেড়ে বসল জিপোর পাশে। ওর ঠান্ডা, ভিজে হাতটা তুলে নিল দু-হাতে।

জিপোর মুখমণ্ডলে প্রশান্তির ছাপ। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। ক্ষুদে ক্ষুদে কালো চোখজোড়া পরম নিশ্চিন্ততায় ওপরের অবতল নীলাকাশে নিবদ্ধ।

শরীরের অসহনীয় যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে কিটসন ভাবলঃ জিপোর মৃত্যুর পর ট্রাকের তালা খোলার ক্ষীণতম আশাও কি আর অবশিষ্ট আছে! দশ লক্ষ ডলার এক ছলনাময়ী মরীচিকা! হাতের মুঠোয় পৃথিবী।

হুঁ, তাই বটে! মরগ্যান যখনই এ কাজে হাত দিয়েছে তখনই সে করে বসেছে চরম গলদ, আজ যদি ফ্র্যাঙ্ক থাকত, তাহলে সে দেখত তার ভুলের নিষ্ঠুর পরিণতি।

‘চলে এসো’। ব্লেক ডাকল কিটসনকে ‘ও মারা গেছে। ওর জন্যে আমাদের তার কিছু করার নেই।’

কিটসন কোনও কথা বলল না। মৃত জিপোর মুখে তাকিয়ে চুপচাপ ধরে রইল তার হাত—যেন শেষ সান্ত্বনা দিতে চাইল।

ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকাল ব্লেক। তারপর দীর্ঘ পথ ধরে চলতে শুরু করল ট্রাকের উদ্দেশ্যে।

এগারো

হ্রদের কাছেই বসে ছিল ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড, একমনে খবরের কাগজ পড়ছিল। এমন সময় দুজন লোককে সামনের সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

ব্র্যাডফোর্ড সবেমাত্র প্রাতরাশ সেরে একটু বিশ্রাম করছিল। একটু আগেই তার স্ত্রী ও ছেলে হ্রদের দিকে বেড়াতে গেছে। সেও যাবে—তবে একটু পরে, এমন সময় তার চোখে পড়ল আগন্তুক দুজনের ওপর। অবাক হল ব্র্যাডফোর্ড, এরা কারা!

আগন্তুকদ্বয়ের একজনের পরনে সৈন্যবাহিনীর মেজরের পোশাক, দ্বিতীয় জনের পরনে সস্তা ছাই রঙের স্যুট, মাথায় সযত্নে বসানো টুপি।

মেজরের চেহারা বেঁটেখাঁটো। তামাটে লম্বা ধরনের মুখ। ঠোঁটের ওপর টানা মিলিটারি মার্কা গোঁফ। নীল চোখে অন্তর্ভেদী কঠিন দৃষ্টি!

মেজরের সঙ্গী যথেষ্ট লম্বা, চেহারা ভারীর দিকে। রক্তিম মুখমণ্ডল যেন পাথর খোদাই করে বসানো। চোখে-মুখে তীক্ষ্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট; ব্র্যাডফোর্ড অনুমান করল, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি সাদা পোশাকে পুলিশের কোনও অফিসার।

'মিঃ ব্র্যাডফোর্ড?' বসে থাকা ব্র্যাডফোর্ডের সামনে পৌঁছে প্রশ্ন করলেন মেজর।

'হ্যাঁ, কিন্তু'...উঠে দাঁড়াল ব্র্যাডফোর্ড, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড, জুনিয়র?' মেজর জানতে চাইল।

ব্র্যাডফোর্ড হাঁ-করে মেজরের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'না, সে আমার ছেলে—' বিব্রতভাবে খবরের কাগজটা ভাঁজ করে চেয়ারে রাখল ব্র্যাডফোর্ড, 'কিন্তু ওর সঙ্গে আপনাদের কী দরকার?'

'আমি মেজর ডিলেনি, ফিল্ড সিকিওরিটি।' এবার সঙ্গীর দিকে আঙুল দেখাল মেজর, 'আর ইনি হলেন লেফটেন্যান্ট কুপার, সিটি পুলিশ।'

ব্র্যাডফোর্ড অস্বস্তিভরা চোখে তাকাল দুজনের দিকে।

'আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশি হলাম। কিন্তু আপনারা কি আমার ছেলের সঙ্গেই দেখা করতে চান?'

'হ্যাঁ, কোথায় সে?' কুপার প্রশ্ন করল।

'ও তার মার সঙ্গে হ্রদের ধারে বেড়াতে গেছে। কিন্তু কী হয়েছে বলুন তো?' ব্র্যাডফোর্ডের স্বরে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

'চিন্তা করার কিছু নেই, মিঃ ব্র্যাডফোর্ড।' ডিলোনি তাকে আশ্বাস দিল, 'আমরা শুধু ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

এমন সময় সামনের রাস্তা ধরে বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে তীক্ষ্ণস্বরে শিস দিতে দিতে এসে হাজির হল ব্র্যাডফোর্ড জুনিয়র। কিন্তু বাবার সামনে দাঁড়ানো লোক দুজনকে দেখেই সে শিস দেওয়া বন্ধ করল তার গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে এল, মুখমণ্ডলে হঠাৎই ফুটে উঠল একটা সতর্ক ভাব।

'ওই যে, ও এসে গেছে।' ব্র্যাডফোর্ড ফিরল তার ছেলের দিকে, 'এই—জুনিয়র, এদিকে এসো। তোমার মা কোথায়? তাকে দেখছি না!'

'মা হ্রদের ধারে বসে আড্ডা মারছে।' বিরক্ত স্বরে জবাব দিল ছেলেটা।

'তুমিই কি ফ্রেড ব্র্যাডফোর্ড জুনিয়র?' ডিলোনিই প্রথম প্রশ্ন করল।

'ঠিকই ধরেছেন।' ওদের দুজনের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে।

'এটা কি তোমার লেখা?' পকেট থেকে একটা খাম বের করল ডিলোনি। খামের ভেতর থেকে একটা চিঠি বার করে দেখাল ছেলেটাকে, 'এই চিঠিটা?'

ব্র্যাডফোর্ড সহজেই তার ছেলের আঁকাবাঁকা হাতের লেখা চিনতে পারল। কিন্তু কী লিখছে সেটা বুঝতে পারল না।

'হ্যাঁ—আমারই লেখা।' গম্ভীরভাবে জুনিয়র জবাব দিল।

এবার মাটিতে উবু হয়ে বসল সে, মাথা থেকে শতছিন্ন শোলার টুপিটা খুলে তার মধ্যে ঘাস ভরতে লাগল।

ব্র্যাডফোর্ড বিস্ময়ে হতবাক। কোনওরকমে সে প্রশ্ন করল, 'আমার ছেলে আপনাদের চিঠি লিখেছে?'

‘হ্যাঁ, সে পুলিশ সদরে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, লুকোনো ট্রাকটার হদিশ সে জানে।’ ডিলোনি জবাব দিল।

ব্র্যাডফোর্ড হাঁ-করে তার ছেলের দিকে চেয়ে রইল। তার দু-চোখে চরম অবিশ্বাসের দৃষ্টি।

‘জুনিয়র! এ কী করেছ তুমি! তুমি ভালোভাবেই জানো, লুকোনো ট্রাকের হদিশ তুমি জানো না। তবে কেন...?”

অবজ্ঞাভরে বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাল ছেলেটা, তারপর আবার টুপিতে ঘাস ভরার কাজে মন দিল। টুপি ভর্তি হয়ে গেলে সে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, মাথাটা ঢুকিয়ে দিল টুপির ভেতর। মাথা সোজা করে ঘাসভর্তি টুপিটা ভালো করে চেপে বসাল। তারপর গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াল।

‘এইভাবে টুপি পরা ছাড়া উপায় নেই।’ নির্দিষ্ট কাউকে সম্বোধন না করেই সে বলে চলল, ‘নইলে সব খসে পড়ে যেত। এতে আমার মাথা ঠান্ডা থাকে। এটা সম্পূর্ণ আমার আবিষ্কার।’

ডিলেনি ও কুপার পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর ডিলেনিই আদর-মাখানো সুরে প্রশ্ন করল, ‘ট্রাকটা কোথায় আছে, খোকা?’

ছেলেটা আবার বসে পড়ল, পায়ের ওপর পা-রাখল। টুপিটা টেনেটুনে আরও শক্ত করে বসাল মাথায়।

‘ট্রাকটা কোথায় লুকোনো আছে আমি জানি।’ গম্ভীর সুরে ঘোষণা করল সে।

‘সে তো ভালো কথা।’ অসীম প্রচেষ্টায় নিজেকে সংযত রেখে উৎসাহভরে বলল ডিলেনি, ‘কোথায় আছে ওটা?’

‘কিন্তু পুরস্কারের কী হবে?’ চকিতে মুখ তুলে তাকাল ব্র্যাডফোর্ড জুনিয়র। স্থির, সপ্রতিভ চোখে চেয়ে রইমেল জরের দিকে।

‘শোনো জুনিয়র,’ অস্বস্তিতে ঘামতে শুরু করেছে ব্র্যাডফোর্ড, ‘তুমি বেশ ভালো করেই জানো, ট্রাকের কোনও খবরই তুমি জানো না। তাহলে শুধু-শুধু কেন এঁদের সময় নষ্ট করছ? এতে তুমি নিজেই বিপদে পড়বে-।’

‘ট্রাকটা কোথায় আছে সেটা আমি ভালো করেই জানি,’ ব্র্যাডফোর্ডকে ব্যঙ্গ করে শান্ত স্বরে ছেলেটা জবাব দিল, ‘কিন্তু পুরস্কারের টাকা হাতে না আসা পর্যন্ত একটা কথাও আমি বলছি না।’

‘শোনো খোকা,’ বিরক্তিতে ডিলেনির স্বর তীক্ষ্ণ হল, ‘যদি সত্যি সত্যিই ট্রাকের কোনও খবর তোমার কাছে জানা থাকে তো চটপট বলে ফেলো। তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন; শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট করার মতলব থাকলে তুমি ভীষণ বিপদে পড়বে।’

ছেলেটা ডিলেনির স্বরের তীক্ষ্ণতাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে জবাব দিল, ‘ট্রাকটা একটা ক্যারাভ্যানে লুকোনো আছে।’

‘ওঃ, আবার সেই একই কথা।’ ব্র্যাডফোর্ড অধৈর্য হয়ে পড়ল, ‘ও ব্যাপারটা নিয়ে কম করেও হাজারবার তোমার সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি। যেমন আমিও জানি, তেমন তুমিও জানো যে...।’

‘এক মিনিট, মিঃ ব্র্যাডফোর্ড,’ ডিলেনি বাধা দিল, ‘যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে কথা বলার সুযোগটা আমাকেই দিন।’ সে ফিরল ছেলেটার দিকে, ‘খোকা, তুমি বুঝলে কী করে যে ট্রাকটা একটা ক্যারাভ্যানের ভেতর লুকোনো আছে।’

‘আমি নিজের চোখে দেখেছি।’ জুনিয়র উত্তর দিল, ‘ক্যারাভ্যানটা যাতে ট্রাকের ওজন বইতে পারে, সেজন্যে ওরা ক্যারাভ্যানের তলায় দুটো ইস্পাতের চওড়া পাত লাগিয়ে নিয়েছে।’

‘ওরা’? তার মানে—কারা?’

‘যারা ট্রাকটাকে চুরি করেছে, আমি তাদের কথাই বলছি।’

ডিলেনি ও কুপার পরস্পরের চোখে-চোখ রাখল। ডিলেনির চোখে মুখে উত্তেজনার মৃদু আভাস।

‘তার মানে তুমি ট্রাকটাকে নিজের চোখে দেখেছ?’

মাথা নাড়ল ছেলেটা। তারপর চিন্তিত মুখে মাথা থেকে টুপি খুলে নিল।

'প্রথম প্রথম এটা বেশ ঠান্ডা থাকে,' আন্তরিক সুরে বলল সে, 'কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘাসগুলো গরম হয়ে যায়!' টুপির ভেতর থেকে ঘাসগুলো সে ঝেড়ে-ঝেড়ে বাইরে ফেলতে লাগল, 'নাঃ আবার নতুন করে ঘাস ভরতে হবে দেখছি—'

সুতরাং আবার সে স্ব-আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মনোযোগ দিল।

'ট্রাকটাকে তুমি কোথায় দেখেছ?' উত্তেজনায় তীব্র হল ডিলেনির কণ্ঠস্বর!

ছেলেটা মেজরের প্রশ্নের কোনও ভ্রূক্ষেপ করল না। মুঠো-মুঠো ঘাস ছিঁড়ে টুপিতে ভরতে লাগল।

'আমার কথা তোমার কানে গেছে?' খেঁকিয়ে উঠল ডিলেনি।'

কী বললেন?' থমকে গিয়ে চোখ তুলে তাকাল জুনিয়র।

'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি ট্রাকটা কোথায় রয়েছে?'

ছেলেটা ঘাস ভরতে -ভরতেই জবাব দিল, 'আমার বাবা বলছিল, পুলিশ নাকি আমাকে পুরস্কারের টাকাটা দেবে না; নিজেরাই ওরা মেরে দেবে।'

কুপার কটমট করে তাকাল ব্র্যাডফোর্ডের দিকে। ব্র্যাডফোর্ড অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে দাঁড়াল। তীব্রস্বরে ছেলেকে তিরস্কার করল, 'মোটেই আমি এই কথা তোমাকে বলিনি। এভাবে কথা বলার জন্যে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।'

ছেলেটা বাবার মুখের দিকে তাকাল। তারপর শিস দেওয়ার মতো একটানা এক বিচিত্র শব্দ করল।

'কী মিথ্যেবাদী?' শিস থামিয়ে বলে উঠল সে, 'তুমিই তো বললে, ট্রাকটা একটা ক্যারাভ্যানে লুকোনো আছে একথা পুলিশকে জানালে ওরা ভাববে আমরাই সেটা চুরি করেছি। তারপর বললে না, সব পুলিশই এক-এক নম্বরের চোর —'

ডিলেনি বহুক্ষণ একদৃষ্টে ব্র্যাডফোর্ডের দিকে চেয়ে রইল। তারপর মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ করল, 'হুম–'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে' কুপার গর্জন করে উঠল, 'তোমার বাবা কী বলেছে না বলেছে সেটা বাদ দাও। ট্রাকটাকে কোথায় দেখেছে সে কথাই আগে বলো!'

অত্যন্ত ধীরে, অত্যন্ত সতর্কভাবে ছেলেটা ঝুঁকে পড়ল টুপির ওপর, মাথাটা গুঁজে দিল ভেতরে। তারপর সোজা হয়ে টুপিটা শক্ত করে এঁটে দিল মাথায়।

'পুরস্কারের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত আমি আর কিছুই বলব না।' ছেলেটা উঠে দাঁড়াল, সরাসরি তাকাল লেফটেন্যান্টের চোখে।

'তাই নাকি। আচ্ছা, দেখা যাবে।' কুপারের মুখভাব কঠিন হল, 'তোমরা দুজন আগে থানায় তো চলো, তারপর দেখব। যদি দেখি যে এতক্ষণ ধরে তুমি শুধু আমাদের সময় নষ্ট করেছ, তাহলে...।'

'দেখি সরো, আমাকে কথা বলতে দাও।' কুপারকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিল ডিলেনি। শান্ত স্বরে বলল, 'শোনো খোকা, ট্রাকটা খুঁজে বার করার ব্যাপারে যে পুলিশকে সাহায্য করবে, সেই-ই পুরস্কারের টাকাটা পাবে। এর মধ্যে একচোখোমির কোনও প্রশ্নই নেই। তোমার দেওয়া খবর যদি আমাদের ট্রাকটাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে তবে তুমিই পুরস্কারের টাকাটা পাবে। এতে অবিশ্বাসের কী আছে?'

কয়েক সেকেন্ড ধরে মেজরকে জরিপ করল ব্র্যাডফোর্ড জুনিয়ার।

'সত্যি বলছেন?'

মেজর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, 'সত্যি বলছি।'

'পুরস্কারের টাকাটা আমার বাবাকে দেবেন না তো? আমার হাতেই দেবেন?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই দেব।'

'পাঁচ হাজার ডলার?'

'হ্যাঁ—'

ছেলেটা গুম হয়ে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করতে লাগল। তারা তিনজন একদৃষ্টে ওকে লক্ষ করতে লাগল।

'ঠিক বলছেন তো? ট্রাকের খবর দিলে টাকাটা আপনি আমাকেই দেবেন?' মেজরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছেলেটা আবার প্রশ্ন করল।

মেজর ঘাড় নাড়ল, মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

'আমি ঠাট্টা করছি না খোকা। মিলিটারির লোকেরা কখনও মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয় না। তাদের কথার দাম আছে।

আবার কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তায় পড়ল ব্র্যাডফোর্ড জুনিয়র। অবশেষে মনস্থির করে বলল, 'আচ্ছা তাহলে বলছি। ওরা মোট চারজন আছে, তিনজন পুরুষ একজন মেয়ে। তিনজনের মধ্যে দুজন সারাদিন ধরে ক্যারাভ্যানে থাকত। শুধু রাত্রি হলেই বাইরে বেরোত। একদিন রাতে আমি ওদের দুজনকে ক্যারাভ্যান ছেড়ে বেরোতে দেখেছি। ওদের গাড়ির নম্বরও রয়েছে আমার কাছে। ওরা বলছিল, এরপর স্ট্যাগ হ্রদে দিয়ে বেড়াতে যাবে, কিন্তু সব মিথ্যে কথা। ওরা রওনা হবার সময় আমি দেখেছি, স্ট্যাগ হ্রদের যাবার রাস্তায় না গিয়ে বড় রাস্তার দিকে গেছে। ক্যারাভ্যানের রং সাদা, কিন্তু ছাদটা নীল রঙের।' পকেট থেকে একটা ময়লা নোট বই বার করে তার একটা পাতা ছিঁড়ল ছেলেটা। ডিলেনির দিকে এগিয়ে দিল কাগজটা, 'ওদের গাড়ির নম্বরটা এই কাগজেই লেখা আছে।'

'কিন্তু ট্রাকটা যে ক্যারাভ্যানে আছে, সেটা তুমি জানলে কী করে?' নোট বইয়ের ছেঁড়া পাতাটা সযত্নে পকেটে রাখতে-রাখতে ডিলেনি প্রশ্ন করল?

'ওদের দুজন যখন ভোরবেলা ক্যারাভ্যানে ঢুকছিল তখন আমি দেখেছি। ট্রাকটা দেখবার জন্যেই তো অত ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিলাম—।'

'কিন্তু ওটা যে হারানো ট্রাক সেটা তুমি বুঝলে কী করে?'

ছেলেটা ধৈর্যসহকারে মেজরকে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর জবাব দিল, 'হারানো ট্রাক কেমন দেখতে তা আমি খবরের কাগজে পড়েছি। ওই ট্রাকটাই সেই হারানো ট্রাক; আমি স্পষ্ট দেখেছি।।'

'এ জায়গা ছেড়ে কখন রওনা হয়েছে ওরা।?'

'কাল দুপুরে। ওরা যখন যায় তখন আমি ঝোপের আড়াল থেকে লুকিয়ে, লুকিয়ে দেখছিলাম। স্ট্যাগ হ্রদের রাস্তার দিকে ওরা যায়নি। গেছে পাহাড়ি এলাকার দিকে।'

'ওঃ তাহলে অনেক সময় আমরা নষ্ট করে ফেলেছি।' ডিলেনি কঠিন চোখে তাকাল, 'তুমি তোমার বাবাকে বলে আমাদের সদরে একটা ফোন করতে পারতে—!'

'বাবাকে বলেছিলাম। কিন্তু বাবা নিজেও ফোন করবে না, আমাকেও করতে দেবে না। তাই শেষ পর্যন্ত চিঠি দিতে হল। বাবা খালি বলছিল, সব পুলিশের লোকই এক এক নম্বরের চোর।'

ডিলেনি ও কুপার একই সঙ্গে ফিরে তাকাল ব্র্যাডফোর্ডের দিকে। কটমট করে কয়েক মুহূর্তে চেয়ে রইল।

ঢোঁক গিলল ব্র্যাডফোর্ড। রক্তিম মুখে নিচু স্বরে জবাব দিল, 'আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। ওর ধারণাকে অপরিণত মস্তিষ্কের কল্পনা ভেবে...।'

'থাক হয়েছে।' রূঢ় স্বরে ব্র্যাডফোর্ডকে থামিয়ে দিল ডিলেনি। ফিরল জুনিয়রের দিকে, 'ওই লোকগুলোর চেহারার বর্ণনা তুমি দিতে পারবে, খোকা?'

'নিশ্চয়ই—' বলল সে, এবং কিটসন, জিনি, জিপো ও ব্লেকের নিখুঁত শারীরিক বর্ণনা গড়গড় করে বলে গেল।

একটা ছোট নোট বইয়ে ওদের চেহারার বর্ণনা টুকে নিল কুপার।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে।' ডিলেনি উৎসাহ ভরা সুরে বলে উঠল, 'তুমি একটা কাজের মতো কাজ করেছ। যদি ট্রাকটা আমরা খুঁজে পাই, তাহলে তুমি যাতে পুরস্কারের টাকাটা পাও সেজন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

নিশ্চিন্ত থাকুন—ট্রাক আপনারা খুঁজে পাবেনই।' মাথা থেকে টুপিটা খুলে ঝেড়ে ঝেড়ে ঘাসগুলো ফেলে দিল ছেলেটা, 'উহু, এই কায়দাটাই তেমন জুতসই নয়। বড্ড তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছে।'

কুপার দাঁত বের করে হাসল, 'এক কাজ করো, ঘাসের বদলে বরফ দিয়ে দেখো কাজ হবে।'

জুনিয়রের মুখে হতাশা নেমে এল।

'একেবারে আজব প্রস্তাব।' গম্ভীর স্বরে বলল সে, 'বরফ গলে যাবে না?'

ডিলেনি ওর কাঁধ চাপড়ে দিল, 'আমি একটা পথ বাতলাতে পারি। তোমার টুপির ওপরটা কেটে ফেলো। তাহলে স্বাধীনভাবে হাওয়া চলাচল করতে পারবে, মাথাও ঠান্ডা থাকবে। তাছাড়া, কে বলতে পারে কালকে এটাই একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াবে না!'

ছেলেটা কিছুক্ষণ প্রস্তাবটা ভেবে দেখল, তারপর মাথা নাড়ল, 'এটার মধ্যে বেশ নতুনত্ব আছে। দেখি, এই কায়দাটাই চেষ্টা করে দেখতে হবে। হয়তো এর থেকে বেশ কিছু টাকাও কামিয়ে ফেলতে পারি—।'

গাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে ডিলেনি বলল, 'পাহাড়ের ওপরে...একমাত্র ওই জায়গাটাই আমরা এখনও খুঁজতে বাকি রেখেছি। ওখানে ওরা থাকলেও থাকতে পারে।'

'অসম্ভব।' কুপার দৃঢ় স্বরে বলে উঠল, 'আমার যদি একবারও মনে হতো যে ওরা ওখানে লুকিয়ে, তাহলে এতদিনে ও জায়গাটা তুলোধোনা করে ছাড়তাম। কারণ ওই রাস্তা বেয়ে কারও পক্ষেই ওপরে ওঠা সম্ভব ন্য—ভারী ট্রাক নিয়ে তো দূরের কথা! কয়েক সপ্তাহ আগে প্রচণ্ড ঝড়ে ওই রাস্তার কিছুটা অংশ একেবারে ধুয়ে গেছে।

'কিন্তু একমাত্র ওই পাহাড়ি এলাকা ছাড়া আর কোনও জায়গাই তো আমরা খুঁজতে বাকি রাখি নি।...হোক অসম্ভব, তবু আমি একবার খুঁজে দেখতে চাই। হয়তো ভাগ্যের জোরে ওরা ট্রাকটা নিয়েই ও রাস্তাটা উতরে গেছে।'

গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করল।

'তুমি পুরস্কারের জন্যে সত্যি-সত্যিই ওই বাচ্চাটার নাম সুপারিশ করবে নাকি?' সে প্রশ্ন করল।

ডিলেনি কুপারের পাশে আয়েশ করে বসল। তার চোখে দূরাভিসারী শূন্যদৃষ্টি, 'একটা দশ বছরের বাচ্চা ছেলে পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে কী করবে বলতে পারো? মাঝখান থেকে ওর গেছো বাপটা ওই টাকাগুলো পকেটস্থ করবে।' কুপারের দিকে ফিরে তাকাল ডিলেনি, মুখে দুর্জ্ঞেয় হাসি, পুরস্কারের টাকাটা কে পাবে সেটা আমরা ভালোভাবেই জানি, তাই না? পুরষ্কারের শর্তে স্পষ্টই লেখা আছে, যে বা যারা ট্রাকটা খুঁজে বের করবে টাকাটা তারাই পাবে। আমরা ধারণা তুমি আর আমিই সেটা খুঁজে বের করতে চলেছি, অতএব...'

কুপার সশব্দে হাঁপ ছাড়ল, 'ওঃ তুমি যেভাবে ওই বাচ্চাটাকে বোঝাচ্ছিলে, আমি তো ভাবলুম বুঝি সত্যি সত্যিই...'

ডিলেনি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল, 'বাচ্চাদের পেট থেকে কিভাবে কথা আদায় করতে হয় সেটা আমি মোটামুটি জানি। ওদের সঙ্গে কথা বলার সময় তোমাকে একাগ্র এবং আন্তরিক হতে হবে; নইলে ওরা তোমার কোনও কথাই বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া, তুমি তো জানো, আমি বরাবরই একাগ্র এবং বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে ভালোবাসি।' উঁচু গলায় হেসে উঠল সে।

কিটসন যখন তাঁবুতে ফিলর তখন ন'টা বেজে গেছে। জিপোর বেলচাটা কাঁধে ফেলে শ্লথ ভঙ্গিতে সে এগিয়ে এল। গায়ের জামা ঘামে ভেজা।

গাছের ছায়ায় একটা পাথরের ওপর বসেছিল জিনি। মুখ অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে, সবুজ চোখে জল চিকচিক করছে।

ব্লেক এরই মধ্যে ট্রাকটাকে ক্যারাভ্যানের বাইরে বের করে ফেলেছে। ট্রাকের দরজায় কান পেতে সে ডান হাতে কম্বিনেশন চাকতিটা ঘুরিয়ে চলেছে। অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে, ধীরে ধীরে সে চাকতিটা ঘোরাচ্ছে—সম্ভবত জিপোর পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে চাইছে।

কিটসন বেলচাটা নামিয়ে রেখে জিনির দিকে এগিয়ে গেল। ওর পায়ের কাছে মাটিতে বসল, কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল একটা।

জিনি আলতোভাবে হাত রাখল কিটসনের কাঁধে।

'ওঃ কী ভাবেই না বেচারা মারা গেল', জিনির হাতের ওপর হাত রাখল কিটসন, 'কিন্তু ওর জন্যে আমাদের করার কিছুই ছিল না। জিপো যখন মারা যায় তখন আমি আর ওই ছুঁচোটা মারামারিতে মত্ত। অবশ্য এমনিতেই ওকে সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না, তার আগেই ও মারা যেত।'

'ওসব নিয়ে আর ভেব না, আলেক্স।'

'তারপর শেয়াল কুকুরের মতো ওর দেহটা কবর দেওয়া—জিপো বড় ভালো লোক ছিল, জিনি। ওর কথা আমার শোনা উচিত ছিল। এ কাজে জিপো হাত দিতে চায়নি। আমাকেও নিরস্ত করার জন্যে কম চেষ্টা করেনি। এখন ভাবছিঃ ওর কথা শুনলে বোধ হয় ভালো হতো।'

'হ্যাঁ।'

'ও বলেছিল, এ কাজের ফল কোনওদিনই ভালো হবে না: সেটা যে কত বড় সত্যি কথা, তা আজ এ মুহূর্তে আমি বুঝতে পারছি। চলো, জিনি—আমরা এখান থেকে চলে যাই; তুমি আর আমি। অন্ধকার হলেই আমরা রওনা হব।'

'তাই চলো। এ সবই আমার দোষ, আলেক্স। এর জন্যে আমি নিজেকে কোনওদিনই ক্ষমা করতে পারব না। এতসব গণ্ডগোলের মূলে একমাত্র আমি। তুমি যখন জিপোকে কবর দিতে নীচে গেলে, তখন থেকে আমি বসে-বসে খালি ভাবছি। এখন বুঝতে পারছি কত বড় ভুল আমি করেছি, কত অন্যায় করেছি। এখন যদি ট্রাক খোলাও হয়, তবু আমি এর একটা টাকাও ছোঁব না। মনে হচ্ছে, আমি যেন এতদিন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।'

'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আসতে রাজি?' জিনির দিকে মাথা না তুলেই বলল কিটসন, 'আবার নতুন করে জীবন শুরু করব, জিনি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?'

'তুমি চাইলে আমার আপত্তি নেই।' অস্ফুট স্বরে জবাব দিল ও, 'কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সত্যিই কি আমরা পালাতে পারব? আজ হোক-কাল হোক ওরা আমাদের ধরে ফেলবেই।'

সিগারেটটা নিভিয়ে দিল কিটসন, টোকা মেরে ফেলে দিল।

'কে জানে, হয়তো পারতেও পারি। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী। আমরা বুইকটা নিয়ে সোজা মেক্সিকো সীমান্তের দিকে রওনা দেব। পুলিশ তো আর আমাদের চেহারার বিবরণ জানে না। যদি একবার আমরা মেক্সিকোয় পৌঁছতে পারি...।'

'এই কিটসন! এদিকে এসো!' চিৎকার করে ডেকে উঠল ব্লেক, 'কী হচ্ছে ওখানে বসে? এখানে এসে কাজে হাত লাগাও, আমাকে সাহায্য করো।'

কিটসন ও জিনি দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর কিটসন উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে চলল ট্রাকের দিকে।

'তুমি অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করেতে জানো?' ব্লেক প্রশ্ন করল। তার মুখমণ্ডল কঠিন, যেন পাথরে খোদাই করা চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

'না জানি না।'

'তাহলে এখন থেকেই শিখতে শুরু করো। এই হতচ্ছাড়া বাক্সটা আমাদের তালা গলিয়ে খুলতে হবে। এসো, সিলিন্ডারগুলো একটু ঠিক করে ধরো।'

'ও আমার দ্বারা হবে না।' শান্ত স্বরে জবাব দিল কিটসন।

ব্লেক অগ্নিক্ষরা চোখে তাকাল তার দিকে, 'তার মানে? এই ট্রাকটা আমাদের যে করেই হোক খুলতে হবে, তাই না?'

'ওতে আমার কোনও উৎসাহ নেই। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়। প্রথম থেকেই আমার এ কাজে হাত দেওয়া ঠিক হয়নি। তোমার দরকার থাকে তুমি খোলো। যদি খুলতে পারো তো সমস্ত টাকাই তোমার। কেউই ওতে ভাগ বসাতে যাবে না। আমি এই ঝামেলায় আর থাকতে চাই না।'

ব্লেক গভীরভাবে শ্বাস নিল, 'শালা ভিতুর ডিম! বুঝতে পারছ না, এটা আমার একার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। ফালতু না বকে এসে হাত লাগাও, আমাকে সাহায্য করো!'

'অন্ধকার হওয়ামাত্রই আমি আর জিনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তুমি তোমার খুশিমতো পথ বেছে নাও, কিন্তু আমরা যে চলে যাচ্ছি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।'

'ও—তাই বুঝি!' খেঁকিয়ে উঠল ব্লেক, 'তোমরা দুজন...ও শেষ পর্যন্ত তাহলে জিনিকে কবজা করেছ?' কিন্তু তাই বলে দশ লক্ষ ডলারকে পায়ে ঠেলে চলে যাবে এ কেমন কথা! তোমার নিশ্চয়ই মাথার ঠিক নেই।'

'আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি!' কিটসন শান্ত স্বরে পুনরাবৃত্তি করল।

'তাহলে এক দীর্ঘ পদযাত্রার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করো।' ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল ব্লেক।

'আমরা বুইকটা নিয়ে যাচ্ছি।'

'সে তো তুমি ভাবছ! কিন্তু বুইকটা আমার কাজে লাগবে, আর এই মুহূর্তে আমি যাবার জন্যে প্রস্তুত নই।' ট্রাকের গায়ে বারকয়েক চাপড় মারল ব্লেক, আর কিছু করি না করি, এই ট্রাকের তালা আমি খুলবই। ভেব না, তোমার মতো কোনও ডরপোক ভেড়ুয়া বা তার পেয়ারের তওয়ায়েফ আমাকে রুখতে পারবে। যদি কেটে পড়তে চাও তো সোজা কেটে পড়ো। আমি বাধা দেব না। তবে বুইক নয়, শ্রীচরণ ভরসা করেই বিদেয় হও। গাড়ি আমি অত সহজে ছাড়ছি না।'

চোখের কোণ থেকে ব্লেকের নজর পড়ল জিনির দিকে। ও হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে।

ব্লেক বুঝল, সে একা—এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী একাধিক। তাছাড়া, জিনির কাছে হয়তো রিভলভারও আছে।

কিটসন তখন শান্ত স্বরে বলে চলেছে, 'আজ রাতেই আমরা চলে যাচ্ছি, এবং গাড়ি নিয়েই যাচ্ছি। তুমি যদি চাও তো আমাদের সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত আসতে পার, কিন্তু তারপরে তোমাকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে হবে। এবার যেটা পছন্দ বেছে নাও।'

ব্লেক ইতস্তত করল তারপর তাকাল জিনির দিকে। ও এখন নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে, ডান হাত শরীরের পাশে নামানো সকলের চোখের আড়ালে।

এখন যে যদি ঠিকমতো প্যাঁচ না কষতে পারে তাহলে ওরা দুজন তাকে খুন করবে—ভাবল ব্লেক।

অতএব সে কাঁধ ঝাঁকাল, কিটসনকে লক্ষ করে বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি যা বলছ তাই হবে। তাহলে সন্ধে পর্যন্ত আমরা ট্রাকটা খোলার চেষ্টা করতে পারি। বলা যায় না, এ বারো ঘণ্টার চেষ্টায় ট্রাকের তালা হয়তো খুলে যেতেও পারে। আশা করি এই সময়টা তুমি বসে-বসে কাটাবে না? এসো সিলিন্ডারগুলো ধরো—কাজের সাহায্য হবে।'

ব্লেকের এই আকস্মিক আত্মসমর্পণে কিটসন অবাক হল; কিছুক্ষণ ইতস্তত করল সে।

‘ঠিক আছে। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। বারো ঘণ্টা কেন, বারো বছর ধরে চেষ্টা করলেও এই ট্রাকের তালা গলানো সম্ভব হবে না।’

‘দেখাই যাক না।’ ব্লেক একপলক দেখল জিনির দিকে। ওর নজর এখনও ব্লেকেরই ওপর, কিন্তু মুখের অভিব্যক্তি অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। ‘তোমার বড় বেশি উপদেশ দেওয়ার স্বভাব, আলেক্স। এসো, কাজে হাত লাগাও।’

কিটসন ব্লেককে পাশ কাটিয়ে ক্যারাভ্যানের দিকে পা-বাড়াতেই ব্লেক তার রিভলভার বের করে কিটসনের দিকে চেপে ধরল।

‘রিভলভার ফেলে দাও!’ জিনিকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠল ব্লেক, ‘নইলে তোমার ভাতারের পেট ফুটো করে ছাড়ব!’

জিনির ডান হাতের মুঠো আলগা হল, রিভলভারটাও খসে পড়ল ঘাসের ওপর।

ওদের দুজনকে রিভলভার আওতায় রেখে পায়ে-পায়ে পিছিয়ে গেল ব্লেক। জিনিকে লক্ষ করে খিঁচিয়ে উঠল, ‘সরে যাও রিভলভারের কাছ থেকে!’

জিনি কিটসনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ব্লেক বৃত্তাকার পথে ওদের অতিক্রম করে তুলে নিল জিনির রিভলভারটা। ছুড়ে ফেলে দিলে হ্রদের জলে।

‘এবার শোনো। এই ট্রাকটা আমরা খুলবই। মনে কোরো না, তোমাদের দুজনকে আমি সামলাতে পারব না, ট্রাক না খোলা পর্যন্ত এ জায়গা ছেড়ে আমরা নড়ছি না। তোমরা এ টাকা না চাইতে পারো, কিন্তু আমি চাই। এবং শেষ পর্যন্ত টাকা আমি নেবই।’ কিটসনকে লক্ষ করে রিভলভার নাচাল সে, ‘যাও। ভেতরে গিয়ে সিলিন্ডারগুলো বের করো।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিটসন পা-বাড়াল ক্যারাভ্যানের দিকে। ব্লেক তাকে অনুসরণ করল।

‘এ কাজ আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়।’ কিটসন বলল, ‘গাড়িতে এগুলো তোলবার সময় জিপো আমাকে সাহায্য করেছিল। কারণ সিলিন্ডারগুলোর ওজন খুব একটা কম নয়। তুমি অন্য দিকটা না ধরলে হবে না।’

ব্লেক দাঁত বের করে হাসল। রিভলভারটা খাপে ঢুকিয়ে রাখল।

‘কোনওরকম চালাকি করার চেষ্টা কোরো না আলেক্স। তার ফল খারাপই হবে!’

হাত বাড়িয়ে সিলিন্ডারের এক প্রান্ত চেপে ধরল কিটসন। টেনে কিছুটা বের করে আনল তাক থেকে। ব্লেক সিলিন্ডারের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজের কাঁধ পাতল। তারপর দুজনে অতি সাবধানে এক-পা করে ক্যারাভ্যানের বাইরে এল।

ক্যারাভ্যানের বাইরে এসেই কিটসন সিলিন্ডারের এক প্রান্ত আচমকা ফেলে দিল কাঁধ থেকে। সিলিন্ডারের প্রান্তটা সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল। এই অতর্কিত আঘাতে ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়ল ব্লেক।

কিটসন সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর ডান হাতি ঘুষি ব্লেকের ঘাড়ে সজোরে আঘাত করল—চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে।

একটা মুখখিস্তি করে রিভলভার বের করার চেষ্টা করল ব্লেক। কিন্তু কিটসনের শরীরের তেরো স্টোন ওজন তার ওপর চেপে বসল।

কয়েক মুহূর্ত ধরে ওরা বন্য জন্তুর মতো যুঝে চলল। তারপর একসময় ব্লেক হাঁটু ভাঁজ করে আঘাত করল কিটসনের বুকে—ছিটকে ফেলে দিল ওকে। তারপরে সে রিভলভার বের করতেই কিটসন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার হাত লক্ষ করে।

কিটসন ডান হাতে ব্লেকের রিভলভার ধৃত হাত আঁকড়ে ধরল, এবং একই সঙ্গে তার বাঁ-হাত সপাটে আঘাত করল ব্লেকের মুখে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা খসে পড়ল ব্লেকের হাত থেকে।

সে ঘুষির আঘাত সামলে ওঠার আগেই কিটসন কুড়িয়ে নিয়েছে ব্লেকের রিভলভার। উঠে দাঁড়িয়ে উঁচিয়ে ধরেছে ব্লেকের দিকে।

ব্লেক কোনওরকমে উঠে বসল। ওর চোখের নীচে কাটা জায়গাটা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁট সরে গিয়ে তার আংশিক দাঁতের সারি এক বীভৎস জিঘাংসায় প্রকট হয়ে পড়েছে।

'এর বদলা আমি নেবই।' নৃশংস স্বরে হিসহিস করে উঠল ব্লেক।

'তোমরা বদলা নেবার দিন চলে গেছে এড।' হাঁপাতে-হাঁপাতে জবাব দিল কিটসন।

হঠাৎ, কোনওরকম পূর্বাভাস না দিয়েই ভেসে এল প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ। সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটা ছোট এয়ারক্র্যাফট হাওয়ার ঝাপটায় ঘাসের শিষগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে উড়ে গেল উপত্যকার দিকে।

ব্লেক টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল, হাঁ-করে চেয়ে রইল ক্রম অপসৃয়মান প্লেনের দিকে।

'ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে!' চাপা স্বরে বলে উঠল সে, 'ওরা নির্ঘাত আমাদের দেখে ফেলেছে! এখুনি ওরা উঠে আসবে এই পাহাড়ে, আমাদের পেছু নেবে।'

ওরা তিনজন নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দেখল বহুদূরে একটা ছোট বৃত্তাকার পথে বাঁক নিয়ে প্লেনটা আবার ফিরে আসছে তাদেরই দিকে।

'শিগগিরি লুকিয়ে পড়ো।' ব্লেক চিৎকার করে উঠল, অন্ধের মতো দৌড়ে গেল সামনের জঙ্গলের দিকে।

কিটসন আর জিনি ছুটল জঙ্গলের দিকে, তবে একসঙ্গে নয়, ভিন্ন পথে। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্লেনটা ওদের মাথার ওপর এসে পড়েছে।

বিকট গর্জন করে, হাওয়ার ঝাপটা তুলে মাত্র একশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা! ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল, খোলা ককপিট দিয়ে দুজন লোক বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সোজাসুজি তাকিয়ে আছে ওদেরই দিকে। একটু পরেই দূরত্ব বৃদ্ধির ফলে স্তিমিত হয়ে এল প্লেনের গর্জন।

কিটসন ও জিনি তাকাল পরস্পরের দিকে, ওদের চোখে উলঙ্গ আতঙ্কের ছাপ।

ব্লেক গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠল, 'লুকিয়ে পড়ো গর্দভ কোথাকার। বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না!'

ব্লেকের কথায় কর্ণপাত করল না কিটসন, বলে উঠল, 'ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে, জিনি।'

'হ্যাঁ, আমি তো আগেই বলেছিলাম, ওরা আমাদের ধরে ফেলবেই।'

কিটসন চকিতে পা বাড়াল রাস্তার দিকে। শরীরকে যথাসম্ভব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রাস্তা পার হল সে। চোখ রাখল ঘাসবন ছাড়িয়ে দূরের আঁকাবাঁকা সরু পথের দিকে। উপত্যকার কোল ঘেঁষে বেয়ে ওঠা রাস্তার ক্ষীণ সাদা পটভূমিতে তার নজরে পড়ল বিপদের যান্ত্রিক রূপ।

প্রায় মাইল দশেক নীচে তিনটে গাড়ি আঁকাবাঁকা পথ ধরে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটে আসছে।

কিটসন তার হৃৎপিণ্ডে অনুভব করল আচমকা আতঙ্কের ধাক্কা। সে ছুটে এল জিনির কাছে।

'ওরা আসছে।'

বিকৃত মুখে বনের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ব্লেক, 'ওদের দেখা যাচ্ছে?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ। যেভাবে ওরা গাড়ি ছুটিয়ে আসছে তাতে এখানে পৌঁছতে ওদের মিনিট দশেকের বেশি লাগবে না।'

'আমাদের এখনও পালাবার সুযোগ আছে।' কাঁপা স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ব্লেক, 'শিগগিরি বুইকটা নিয়ে এসো। আমরা যদি একবার পাহাড়ের মাথায় চড়তে পারি,তাহলে এখনও বাঁচবার উপায় আছে।'

কিটসন মাথা নাড়ল, এখান থেকে মাইলখানেক ওপরে রাস্তা একেবারে সরে গেছে। আমাদের হয়তো পাহাড় বেয়েই উঠতে হবে...।'

ব্লেক দৌড়ে গেল ক্যারাভ্যানের দিকে। অটোমেটিক রাইফেলটা নিয়ে ফিরে এল, 'আমি প্রাণ থাকতে ওদের হাত ধরা দিচ্ছি না।' ব্লেকের চোখ হিংস্রতায় চকচক করে উঠল, 'কারণ ইলেকট্রিক চেয়ার আমার একবারেই না-পসন্দ।'

কিটসন বুইকের দরজা খুলে ধরল। জিনি উঠে বসল তার পাশে। সে অনুভব করল জিনির শরীর কাঁপছে। ওর হাঁটুতে হাত রেখে সে আশ্বাস দিল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব।'

ব্লেক জিনির পাশে বসতেই কিটসন গাড়ি চালু করল। রুক্ষ ঘাসজমি পেরিয়ে রাস্তায় নিয়ে এল গাড়িটাকে।

ওরা তিনজন একবার ফিরে তাকাল দূরে গায়ের ছায়ায় দাঁড়ানো ট্রাকটার দিকে।

'ওই শালারা বলেছিল ওটা পৃথিবীর নিরাপদতম ট্রাক।' ট্রাকটার দিকে আঙুল দেখিয়ে নৃশংস স্বরে বলে উঠল ব্লেক, 'এখন দেখছি কথাটা কেবলমাত্র প্রচারের জন্যে নয়।'

কিটসনের সুদক্ষ হাতে বুইক অসমান রাস্তা ধরে ছুটে চলল!

ট্রাকটাকে শেষবারের মতো দেখার জন্যে বুইকের জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়ল ব্লেক। ট্রাকের ভেতরে আবদ্ধ টাকার পরিমাণ দশ-লক্ষেরও অনেক বেশি—ভাবল সে। ওই ট্রাকের ভেতরে একই সঙ্গে বন্দি হয়ে রয়েছে আমার ভবিষ্যৎ, আমার জীবন।

ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে চলল কিটসন। তার মুখের প্রতিটি পেশি টান-টান। চোখের দৃষ্টি সামনের রাস্তার দিকে নিবদ্ধ। প্রচণ্ড গতিবেগের জন্যে রাস্তার বাঁকে গাড়ির চাকা পিছলে যেতে লাগল।

প্রথম বিপরীতমুখী বাঁকের কাছে পৌঁছে গাড়ির গতি কমিয়ে আনল কিটসন। কিন্তু তার অনুমান সঠিক না হওয়ায় সে গাড়ি থামাতে বাধ্য হল। ব্লেক অধৈর্য হয়ে তাকে শাপশাপান্ত করতে লাগল। গাড়িটা কিছুটা পিছিয়ে আবার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল কিটসন।

কিন্তু পাহাড়ি রাস্তায় আবার উঠতে শুরু করামাত্রই সামরিক বাহিনীর উড়োজাহাজটা চঞ্চল হাউন্ডের মতো তার মাথার ওপরে, আকাশে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে লাগল।

'ওই ব্যাটাকে যদি একবার নাগালের মধ্যে পাই—।' উড়ন্ত প্লেনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠল ব্লেক। শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল অটোমেটিক রাইফেলটা।

ওরা শুনতে পেল দূর থেকে ভেসে আসা পুলিশ সাইরেনের একটানা কাতর আর্তনাদ।

জিনি ভয়ে কেঁপে উঠল। ওর হাত মুষ্টিবদ্ধ হল উত্তেজনায়।

গাড়িকে রাস্তার ওপর সচল রাখতে কিটসনকে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছিল। কারণ রাস্তাটা কয়েকশো গর্ত এবং আলগা পাথরে কণ্টকিত। হয়তো অতীতের সেই প্রচণ্ড ঝড়ের সাক্ষ্য বহন করছে।

ওদের বাঁ দিকে খাড়া পাহাড়, যেন একটা গ্রানাইট পাথরের দেওয়াল সোজা ওপরে উঠে গেছে। আর ডান পাশে অতল খাদ—নীচের উপত্যকা এখান থেকে দেখাচ্ছে একটা ছোট বোতামের মতো।

'এভাবে আমরা আর বেশি দূর যেতে পারব না।' গাড়ির গতি কিছুটা কমিয়ে আনল কিটসন, আর একটু পরেই আমরা সেই বিধ্বংসী অংশের মুখোমুখি হব।'

পরের বিপরীতমুখী বাঁকে মোড় নিতেই, আচমকা ব্রেক কষল কিটসন। থমকে দাঁড়াল বুইক।

অসংখ্য ছোট বড় পাথর, বুনো ঝোপ রাস্তার ঠিক মাঝখানেই চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। সে বাধা অতিক্রম করে বুইককে নিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

অটোমেটিক রাইফেলটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ব্লেক। অন্য দুজনের দিকে সে ফিরেও তাকাল না। ছুটে গেল পাথরের ঝোপে ঢাকা রাস্তার মাঝখানে ঢিবিটার দিকে। ওটা বেয়ে উঠতে লাগল।

কিটসন চোখ তুলে ওপরে তাকাল।

ওপরে, অনেক ওপরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের শুভ্র তুষারবৃত চূড়া। একমুহূর্ত ইতস্তত করল সে। তারপর জিনির হাত আঁকড়ে ধরে ওপর দিকে আঙুল তুলে দেখাল, 'জিনি, আমরা ওই পথ বেয়ে ওপরে উঠব।

ওখানে হয়তো লুকোবার যথেষ্ট জায়গা থাকতে পারে। তাছাড়াও আমরা যদি ব্লেকের সঙ্গে যাই, তাহলে ধরা আমরা পড়বই—বাঁচবার কোনও আশাই থাকবে না।'

পাহাড়ের বিস্তৃত আকারের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেল জিনি।

'ও আমি পারব না, আলেক্স। তুমি একাই যাও।'

কিটসন জিনিকে টেনে নামাল গাড়ি থেকে। ওকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

'গেলে আমরা দুজনেই একসঙ্গেই যাব।' বলে সে পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে উঠতে লাগল। প্রথম একশো গজ সহজেই ওঠা গেল ঃ জিনিরও তেমন অসুবিধে হল না। থেকে থেকেই কিটসন পিছন ফিরে জিনিকে উঠতে সাহায্য করছে। হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে তুলল ওপরে।

সাইরেনের শব্দ এখন আগের চেয়ে অনেক তীব্র, অনেক কাছে। ওদের আরোহণের গতি ক্রমশ কমে আসতে লাগল, কারণ ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে পাহাড়ে ঢাল।

পাহাড়ের বন্ধুর তলের পটভূমিতে ওরা নিজেদের বড় বেশি অরক্ষিত এবং অসহায় বোধ করল। কিন্তু আরও পঞ্চাশ ফুট ওপরে দেখা যাচ্ছে গোটাকয়েক বিশাল পাথর, যার আড়ালে ওরা সহজেই আত্মগোপদ করতে পারে। তাই কিটসন তাড়াতাড়ি ওঠার জন্যে জিনিকে বারেবারেই তাড়া দিতে লাগল।

হঠাৎ একসময় আতঙ্কে পিছলে গেল জিনির ডান হাত। কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে কিটসন ওকে আঁকড়ে ধরল। আবার টেনে নিল নিরাপদ আশ্রয়ে। সেখানে থেকে ওরা আবার শুরু করল ওদের পবর্তারোহণ।

অবশেষে ওরা পৌঁছল পাথরগুলোর আড়ালে। আর প্রায় একই সঙ্গে ওরা শুনতে পেল কতকগুলো গাড়ি এসে থামল রাস্তায় ওদের ঠিক নীচেই।

পাশাপাশি উপুড় হয়ে শুয়ে ওরা নীচের দিকে উঁকি মারল। অত্যধিক পরিশ্রমে ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ গভীর হয়ে উঠেছে।

নীচের রাস্তার একটা অংশকে কিটসনের দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল করে রেখেছে সামনের একটা বিশাল ঝুলন্ত পাথর। কিন্তু ডানদিকে চোখ রাখতেই কিটসন দেখল, ব্লেক পাগলের মতো হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে ছুটে চলেছে: আর মাঝে মাঝেই পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। সামনের বাঁকে মোড় ঘুরতেই কিটসন তাকে আর দেখতে পেল না।

কিটসন চোখ তুলে তাকাল। সম্ভবত বাঁচবার কোনও নতুন আশায়।

তাদের কাছ থেকে আরও অনেকটা ওপরে ছোট ঝোপঝাড়ের পরদায় ঢাকা একটা চওড়া পাথরের আড়াল তার নজরে পড়ল। সে ভেবে দেখল, যদি তারা একবার ওই পাথরের আড়ালে পৌঁছতে পারে তাহলে পুলিশের অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অতি সহজেই সে ও জিনি পরম নিশ্চিন্তে ওখানে আত্মগোপন করতে পারবে।

সে হাত বাড়িয়ে জিনির বাহু স্পর্শ করল, 'এখন ওপরে উঠতে পারবে?

জিনি ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল, 'হ্যাঁ চলো।'

কিটসন জিনির ঘর্মাক্ত মুখের দিকে চেয়ে হাসল। ওদের চোখজোড়া পরস্পরের খুব কাছাকাছি। সামান্য কাছে সরে এল জিনি, উষ্ণ ঠোঁট জোড়ার মাধ্যমে নিজের শরীরের মিশ্র অনুভূতি সঞ্চালিত করল কিটসনের দেহে।

'আমি দুঃখিত আলেক্স, এ সমস্তই শুধুমাত্র আমার দোষে।'

'উহুঁ, আমি নিজের ইচ্ছেতেই ফ্র্যাঙ্কের কথায় রাজি হয়েছিলাম। তবে দুঃখ এই, আমরা শেষ পর্যন্ত জিততে পারলাম না।'

নীচ থেকে লোকজনের উত্তেজিত ভাসাভাসা কথোপকথন ওদের কানে এল।

'ওরা নিশ্চয়ই বুইকটা খুঁজে পেয়েছে।' কিটসন ফিসফিস স্বরে বলল, 'চলো এগোনো যাক।'

ওরা আবার পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল।

জিনির কাছে পুরো ব্যাপারটাই যেন একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন বলে মনে হল। কিটসন যদি প্রতি পদে ওকে সাহায্য না করত, তাহলে হয়তো ওর পক্ষে ওই খাড়াই বেয়ে ওপরে ওঠা কোনওমতেই সম্ভব হতো না।

পাহাড়ের আড়ালটার কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকাল জিনি। ওপরের একটা ছোট ছুঁচলো পাথরকে দু-হাতে আঁকড়ে, একটা গাছের শেকড়ে পা-রেখে ও হাঁপাতে লাগল। দু-চোখ বোজা।

'আমি আর পারছি না, আলেক্স। আর এক পা ওঠারও সামর্থ্য আমার নেই। তুমি একাই ওপরে উঠে যাও, আমার জন্যে সময় নষ্ট কোরো না।'

কিটসন চোখ তুলে তাকাল। আর মাত্র ফুটখানেক ওপরে রয়েছে পাথরের আড়ালটা।

তারপর আবার জিনির দিকে চোখ নামাতেই, সে দেখল, দূরে—বহুদূরে বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অতল গভীরতার হাতছানি। একটা আচ্ছন্নতার বিক্ষুব্ধ ঢেউ এসে ঝাপটা মারল কিটসনের মস্তিষ্কে।

একটা ছোট কাঁটাঝোপের শেকড়কে অবলম্বন করে ঝুলতে লাগল কিটসন। ভয়ে চোখ বুজল সে। অনুভব করল তার মসৃণ মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দুর উপস্থিতি।

ওপরে তাকাতেই কিটসনের অবস্থা দেখে চমকে উঠল জিনি। ওর মনে হল, কিটসন বুঝি এখনই হাত ফসকে নীচে পড়ে যাবে।

'আলেক্স!!'

'কোনও ভয় নেই।' রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিল কিটসন, 'হঠাৎই কিরকম মাথাটা ঘুরে উঠেছিল। তুমি আর নীচের দিকে তাকিও না, জিনি। এক মিনিট অপেক্ষা করো—আমাকে একটু সামলে নেবার সময় দাও।'

মসৃণ দেওয়ালের গায়ে লেপটে থাকা দুটো নিঃসঙ্গ মাছির মতো ওরা স্থির হয়ে রইল। তবে সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই পরিপূর্ণ সাবধানতা নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল কিটসন। পা-রাখবার একটা জুতসই প্রশস্ত জায়গা খুঁজে পেতে তার দেরি হল না। নিজে প্রস্তুত হয়ে সে হাত বাড়াল জিনির দিকে।

'দেখি হাত ধরো।... এবার আস্তে আস্তে ওঠার চেষ্টা করো। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই, আমি তো ধরে আছি।'

'না, আলেক্স! এত করে তুমি আমাকে শেষ পর্যন্ত টেনে তুলতে পারবে না, আমি তার আগেই হয়তো নীচে...।'

'যা বলছি, করো। হাতটা বাড়িয়ে দাও।' কিটসনের স্বরে অধৈর্য আদেশের সুর।

'ও আলেক্স, আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি আর এভাবে ঝুলে থাকতে পারছি না। যে কোনও মুহূর্তেই আমার হাতের বাঁধন হয়তো খুলে যাবে—।'

পাথরের গা-থেকে ওর হাতের বাঁধন আলগা হতেই কিটসন ঝট করে জিনির কবজি চেপে ধরল। জিনির আর্ত চিৎকার হাওয়ার মাতাল ঝাপটায় মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। ওর দু-বাহুর শেষ প্রান্তে অসহায়ভাবে ঝুলতে লাগল জিনি। ওর স্কার্ট হাওয়ায় উড়তে লাগল; লম্বা, সুগঠিত পা-দুটো অবলম্বন পাওয়ার আশায় শূন্যে এলোপাথাড়ি মাথা খুঁড়ছে।

জিনির শরীরের সমস্ত ওজন নিজের হাতে নিয়ে ঝুলে রইল কিটসন।

'জিনি! সাবধান!' হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে উঠল কিটসন, 'আমি পাহাড়ের গা ঘেঁষে তোমাকে ধরে থাকছি, তুমি কোনও পাথরের খাঁজে-টাজে পা-রাখবার চেষ্টা করো। তারপর তোমাকে সহজেই আমি টেনে তুলতে পারব। কোনও ভয় নেই, শুধু আমাকে একটু সাহায্য করো, তাহলেই হবে।'

কিটসন জিনির শরীরটা সামান্য পাশে ঘোরাতেই ওর পায়ের আঙুল পাহাড়ের গায়ে এক অমানুষিক উন্মত্ততায় আশ্রয় খুঁজতে চাইল। একটু পরেই কিটসন অনুভব করল তার হাতের ওপর জিনির শরীরের

ওজন আর নেই—অর্থাৎ ও কোনও অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে।

একইভাবে ওর হাত ধরে রেখে কিটসন তাকাল জিনির দিকে।

ওরা সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে কেটে গেল এক দীর্ঘ মিনিট। তারপর শোনা গেল কিটসনের স্বর, 'আচ্ছা, এবার এসো।' বলে সে ওকে টেনে তুলতে শুরু করল।

চওড়া পাথরটার ওপরে পৌঁছেই শ্লথ, অবসন্নভাবে কিটসনের পাশে বসে পড়ল জিনি।

সেই মুহূর্তেই ওরা শুনতে পেল গুলির শব্দ। শব্দের তীব্রতা অবিশ্বাস্য রকম বেশি, এবং তার প্রতিধ্বনি সে তীব্রতাকে আরও কয়েক গুণ বাড়িতে তুলল।

জিনি ভয়ে যেন কুঁকড়ে গেল। ওর হাত আঁকড়ে ধরল কিটসনের কবজি।

গুলির শব্দটা এসেছে নীচ থেকেই, এবং ওদের ডান পাশ থেকে।

অত্যন্ত সাবধানে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল কিটসন, উঁকি মেরে ব্যাপারটা দেখতে চেষ্টা করল। নীচের রাস্তাটা এখান থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বুইকটা এবং তার কাছাকাছি দাঁড়ানো পুলিশের গাড়ি তিনটেও তার নজরে পড়ল।

রাস্তার অবরোধের ঠিক পিছনেই অতি সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে দশজন সৈনিক ও তিনজন পুলিশ অফিসার।

সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দুরে একটা বাঁকের আড়ালেই রয়েছে ব্লেক। দুটো ছোট ছোট গোলাকার পাথরকে সে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে সামনে রেখেছে। তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে তার অটোমেটিক রাইফেলের নল।

ব্লেকের কাছ থেকে আরও পঞ্চাশ গজ দুরে দাঁড়িয়ে একটা জিপ, তার পাশেই দাঁড়িয়ে তিনজন সৈনিক—ব্লেকের দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে।

কিটসন বুঝতে পারল, জিপটা নিশ্চয়ই পাহাড়ের অন্য দিক দিয়ে উঠে এসেছে এবং ব্লেককে ফাঁদে ফেলেছে। সে যে ব্লেককে অনুসরণ না করে পাহাড় বেয়ে উঠে এসেছে, সেজন্য মনে মনে অনেকটা স্বস্তি বোধ করল কিটসন।

ব্লেকের সোজাসুজি, রাস্তার বাঁকের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে একজন সৈনিক। তার মাথার একটা ক্ষত থেকে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আশপাশের মাটি রক্তের সংস্পর্শে ভিজে, কালচে হয়ে উঠেছে।

রাস্তা ধরে এগিয়ে আসা সৈনিকের দল বাঁকটার কাছে এসে থামল, ব্লেকের দৃষ্টিপথের আড়ালে। ব্লেকের কাছ থেকে ওদের দূরত্ব এখন মাত্র কুড়ি ফুট।

একজন বেঁটেখাটো তৎপর মেজর তার সোনালি চুলে ঢাকা মাথা অতি সাবধানে সামনে ঝুঁকিয়ে উঁকি মারল। কিন্তু মৃত সৈনিকটিকে দেখামাত্রই ব্যস্তসমস্তভাবে সে মাথাটা ভেতরে টেনে নিল।

গলার স্বর উঁচু পরদায় তুলে সে চিৎকার করে উঠল, 'আমি জানি, তুমি ওখানেই লুকিয়ে রয়েছ! অতএব মাথার ওপর হাত তুলে বাইরে বেরিয়ে এসো! তোমার বাঁচার আর কোনও আশাই নেই! চুপচাপ বেরিয়ে এসে ধরা দাও!'

কিটসনের নজর পড়ল, ব্লেক যেন নিজেকে মাটির সঙ্গে আরও মিশিয়ে ফেলতে চাইছে।

জিনি আস্তে আস্তে সরে এল কিটসনের পাশ থেকে, নীচে তাকাল।

রাস্তায় দাঁড়ানো সৈনিকদের চেয়ে প্রায় দুশো ফুট ওপরে থাকলেও, ওদের মনে হল লোকগুলো যেন ওদের বড় বেশি কাছে রয়েছে।

'তুমি নিজেই বেরিয়ে আসবে, না আমরা গিয়ে তোমাকে টেনে বার করব?' মেজর চিৎকার করে জানতে চাইল।

'আয় শালা আমাকে ধরবি আয়।' ব্লেক চিৎকার করে জবাব দিল। ওর স্বরে একটা নৃশংস, আতঙ্কিত সুর। 'আয় ধরবি আয়—তারপর দেখ, কেমন দাওয়াই তোদের দিই!'

মেজর একজন পুলিশ অফিসারকে ডেকে কী যেন বলল। উত্তরে অফিসারটি ঘাড় হেলাল।

তারপর মেজর এগিয়ে এল একজন সৈনিকের কাছে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা করার পর সৈনিকটা তার হাতের রাইফেলটা তুলে দিল আর একজন সহকর্মীর হাতে। তারপর পোশাকের পকেট থেকে ক্ষুদ্রাকৃতি কী একটা জিনিস হাত নিয়ে অতি সন্তর্পণে সে এগতে শুরু করল।

কিটসন রুদ্ধশ্বাসে সব লক্ষ করে চলল। তার হৃৎপিণ্ডের গতি হয়ে উঠেছে টলমল, উত্তাল।

রাস্তার বাঁকের কাছে পৌঁছেই সৈনিকটা থামল।

'এই তোমার শেষ সুযোগ!' মেজর চিৎকার করে বলল, 'এখনও বাইরে বেরিয়ে এসো।'

উত্তরে ব্লেক একটা অশ্রাব্য খিস্তি করে উঠল।

মেজর একই স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক!'

সৈনিকটি সেই ছোট জিনিসটাকে সহজ ভঙ্গিতে বাতাসে ছুড়ে দিল। অলসভাবে পাক খেতে-খেতে ওটা নীচে পড়তে শুরু করল।

কিটসনের কাঁধে মুখ ঢাকল জিনি।

কিটসন চিৎকার করে ব্লেককে সাবধান করে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। কারণ সামান্য শব্দ করামাত্রই সে নীচে দাঁড়ানো পুলিশ দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে! তখন এই লুকোনো জায়গার আর কোনও গুরত্বই থাকবে না।

যে পাথর দুটোর আড়ালে ব্লেক আত্মগোপন করেছিল গ্রেনেডটা গিয়ে পড়ল ঠিক তার সামনে।

কিটসন দু'হাতে চোখ ঢাকল।

গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দটা অস্বাভাবিক তীব্র শোনাল। বিস্ফোরক টুকরোগুলোর হাওয়ায় শিস কেটে উড়ে যাওয়ার শব্দ কিটসনের কানে এল। কানে এল ছোট ছোট আলগা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ।

এক হাতে জিনির শারীরকে আঁকড়ে ধরে সে আস্তে আস্তে ভেতরে পিছিয়ে এল; চোখ তখনও তার বোজা।

জিনি কিটসনকে দুহাতে জাপটে ধরে কাঁপছে থরথর করে। ওরার নিজেদের ভয়ার্ত শরীরকে পরস্পরের সংস্পর্শে এনে হয়তো চাইছে ঝুটো আশ্বাস।

হঠাৎ একটা লোক চিৎকার করে উঠল, 'এখানে তো মাত্র একজন। আর দুজন তাহলে গেল কোথায়? মেয়েটাও তো দেখছি এখানে নেই।'

'ভয় পেয়ো না, ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না!' কিটসনের চঞ্চল আঙুল তখন জিনির তাম্রাভ চুলে বিলি কাটছে, 'এই পাথরের আড়ালে আমাদের খোঁজ করার কথা ওদের মাথাতেও আসবে না।'

ঠিক তখনই সে শুনতে পেল কোনও এয়ারক্র্যাফট উড়ে আসার শব্দ। কিটসন জানত, ওপর থেকে নজর ফেললে তাদের খুঁজে পেতে কারোর পক্ষেই খুব একটা সময় লাগবে না। কারণ মসৃণ পর্বতের গায়ে তাদের শরীর দুটো খোলা মাঠে দাঁড়ানো মিনারের মতোই প্রকট।

ওরা তাকাল পরস্পরের দিকে। জিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল নিজের শরীরটা কিটসনের শরীরে মিশিয়ে ফেলতে। যেন কোনও আতঙ্কিত পশু দিশাহারা হয়ে তার গর্তে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

আতঙ্কের শীতল নাগপাশ কিটসনের হৃৎপিণ্ডকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। সম্মোহিতের মতো সে চেয়ে রইল দূরাগত এয়ারক্র্যাফটের দিকে।

সূর্যের রশ্মিকে অতিক্রম করে, তাদের ভয়ার্ত শরীরে ছায়া ফেলে, ওদের ঠিক ওপর দিয়েই উড়ে গেল প্লেনটা। ওপরে চোখ রাখতে কিটসন দেখল, প্লেন চালক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাদের দিকেই দেখছে।

এয়ারক্র্যাফটের ডানা দুটো এদিক-ওদিক হেলিয়ে ওরা চলে গেল। কিটসন বুঝল, প্লেনচালক যে তাদের দেখতে পেয়েছে সেটাই সে যাওয়ার আগে ডানা নেড়ে তাকে জানিয়ে দিয়ে গেল। কিটসন মানসচক্ষে যেন দেখতে পেল, প্লেনচালক তার বেতার যন্ত্রে তারস্বরে খবর পাঠাচ্ছে। নীচের রাস্তায় দাঁড়ানো লোকগুলোকে জানিয়ে দিচ্ছে পলাতকদের সন্ধান সে পেয়ে গেছে।

'জিনি! আমার কথা শোনো!' জিনির মুখটা আলতো করে তুলে ধরল সে। তাকাল ওর ভয়ার্ত চোখজোড়ার দিকে, 'ব্লেক ঠিকই বলেছিল। কারণ এখন দেখছি মরণ কারাগারে যাওয়ার ইচ্ছে আমারও নেই। কিন্তু তোমার এখনও বাঁচার সুযোগ আছে। নেহাতই তোমার ভাগ্য যদি মন্দ হয়, তাহলেও ওরা তোমাকে দশ বছরের বেশি জেলে রাখতে পারবে না। তোমার বয়েস অনেক কম। জুরিরা তোমার জন্যে সহানুভূতি দেখাবে। দশ বছর সময় কিছুই নয়; দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে তুমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে। তুমি বরং এখানেই থাকো, পুলিশের লোক এসে তোমাকে নামিয়ে নিয়ে যাবে।'

'আর তুমি?' জিনি কিটসনের বাহু আঁকড়ে ধরল।

কিটসন কষ্টকৃত হাসি হাসল, 'আমি এখান থেকে হাওয়ায় গা-ভাসিয়ে দেব। এই অবস্থায় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এ পৃথিবী ছেড়ে পালানোর পথ। আমি কিছুতেই মরণ কামরায় পা-রাখতে পারব না।'

জিনি গভীরভাবে শ্বাস নিল, 'আমরা একইসঙ্গে যাব, আলেক্স। এতে আমি ভয় করি না। কিন্তু দশ বছর জেল আমার কাছে অসহ্য। দশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবনকে আমি ভয় পাই। আমরা একসঙ্গেই যাব।'

হঠাৎই কোনও লাউডস্পিকারে ভেসে এল এক কর্কশ আদেশ, 'এই তোমাদের বলছি। নীচে নেমে এসো। আমরা জানি তোমরা পাথরের ওপরেই লুকিয়ে রয়েছে। আমরা কোনও রক্তপাত চাই না বলেই বলছি, চুপচাপ নেমে এসো।'

'তুমি থাকো, জিনি—'

'না। তা হয় না।'

কিটসন সামনে ঝুঁকে এল। জিনিকে সর্বশক্তি দিয়ে জাপটে ধরে আবেগভরে চুমু খেল, 'জিনি মনে আছে ফ্র্যাঙ্ক কী বলেছিল? হাতের মুঠোয় পৃথিবী। কে জানে, আমাদের সেই ইচ্ছার বাস্তব রূপ বোধ হয় এই পরণতি, হয়তো সে ইচ্ছাপূরণ এই পৃথিবীতে সম্ভব নয়, তার জন্যে রয়েছে অন্য কোনও পৃথিবী—যে পৃথিবীর সন্ধানে আমরা চলেছি।'

হাত ধরাধরি করে ওরা দুজন উঠে দাঁড়াল।

ওরা সোজাসুজি তাকাল নীচের রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ানো পুলিশ ও সৈন্যদের দিকে। তাদের রাইফেলের নল ঊর্ধ্বমুখী, তাক করা ওদের দুজনের দিকেই। যে কোনও মুহূর্তেই নিরাপদ আড়াল লক্ষ করে দৌড়নোর জন্যে তাদের শরীরের প্রতিটি পেশি টান-টান।

'ঠিক আছে' কিটসন চিৎকার করে উঠল। তার স্বর নীচে দাঁড়ানো সশস্ত্র সৈনিকদের কাছে দুর্বল, ক্ষীণ শোনাল, 'আমরা আসছি।'

সে চোখ ফেরাল, জিনির দিকে, 'তুমি তৈরি?'

জিনি আরও শক্ত করে কিটসনকে আঁকড়ে ধরল, 'আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো, আলেক্স। আমি তৈরি।'

নীচে দাঁড়ানো লোকগুলো ওদের লক্ষ করেছিল। তারা দেখল, ওরা হঠাৎই মসৃণ পাথরের আশ্রয় ছেড়ে হাওয়ায় গা-ভাসিয়ে দিল, পাহাড়ের পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে-খেতে এলোপাথাড়িভাবে সত্যি-সত্যিই ওরা নেমে আসতে লাগল দুশো ফুট নীচের রুক্ষ রাস্তায়।

দ্য ওয়ার্ল্ড ইন মাই পকেট

শুধু যাওয়া আসা

জেমস হেডলি চেজ



লেখক ও রচনা প্রসঙ্গে

আধুনিক ইংরেজি রহস্যগল্পের জগতে জেমস্ হেডলি চেজ (আসল নাম রেনি রেমণ্ড, জন্ম—১৯০৬) অতি বিখ্যাত একটি নাম। শুধু সে-দেশেই নয়, ইংরেজি-পড়া দুনিয়ায় হেডলি চেজের সমকক্ষ জনপ্রিয় লেখক বিশেষ চোখে পড়ে না। অনেকগুলি কাহিনীর লেখক তিনি, তার মধ্যে বেশ কিছু পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

হেডলি চেজের কাহিনীগুলোতে সচরাচর কোন গোয়েন্দা-নায়কের ডিটেকসনের ব্যাপার থাকে না। দীর্ঘকাল ধরে প্রধান রহস্যকাহিনীতে এদিকেই সব জোরটা দেওয়া হয়েছে। চেজ লক্ষ্যভেদ করেছেন পাপীর মনের ভিতরে ঢুকে তার কামনা-বিবেক-অনুশোচনার বিশ্লেষণ করে। প্রায়ই এই সব পাপীরাই তার কাহিনীর নায়ক, তারা একই সঙ্গে পাঠকের ঘৃণা এবং সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে।

প্রায়ই নায়কের নিষ্করুণ মৃত্যুতে কাহিনী শেষ হয়।

চেজের লেখায় ঘটনা ও মনস্তত্ত্বের, আবেগের ও ক্রিয়ার এমন একটি অচ্ছেদ্য যোগ থাকে, কাহিনীর গতি এমন দ্রুত বিস্ময়চকিত ও শ্বাসরোধী হয়ে ওঠে যে রহস্য গল্পপাঠের তীব্র উত্তেজনা থেকে এক মুহূর্তও মন ছাড়া পায় না। এখানেই হেডলি চেজের সাফল্যের চাবি।

এক

এগারোটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি, হাতের কাগজপত্তর সব গুছিয়ে অফিস থেকে কেটে পড়ার তাল করছি, এমন সময় বেরসিকের মতো বেজে উঠল টেলিফোনটা। আর যদি মিনিট পাঁচেক পরেও ফোনটা আসত, তবে ওটা ধরার জন্য আমার মাথাব্যথা থাকত না।

আমি লরেন্স সেফস্ কর্পোরেশনের নৈশ-বিভাগের কর্মচারী। রাত এগারোটা বাজলেই আমার ছুটি, অর্থাৎ ডিউটি শেষ হতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি। তা ছাড়া, নৈশ-টেলিফোনটা একটা টেপরেকর্ডারে যোগ করা থাকে, ফোন বাজতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয়-রেকডিং শুরু হয়ে যায়, সুতরাং না ধরলেই নয়।

'মালিকের শ্যেনচক্ষু সবসময় তোমাকে লক্ষ্য করছে'—এ কথাটা যাতে আমাদের অর্থাৎ কর্মচারীদের মনে থাকে, তার জন্যই এই অদ্ভুত রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা। কাজে একটু ফাঁকি দেবার জো নেই।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম, 'লরেন্স সেফস্ কর্পোরেশন—নৈশ-বিভাগ।'

'কি, ব্যাপার কি! অফিসসুদ্ধ, ঘুমোচ্ছে নাকি সবাই?—ফোন ধরতে এত দেরি হয় কেন?' টেলিফোনে ঝংকৃত হল বিরক্ত উদ্ধত কণ্ঠস্বর। নিঃসন্দেহে কোন লাখপতির।

'আপনি কে কথা বলছেন?—'

'হেনরি কুপার, অ্যাশলি আর্মস থেকে বলছি। চটপট একজন লোক আমার এখানে পাঠিয়ে দিন। সিন্দুকটা নিয়ে বড্ড অসুবিধেয় পড়েছি।'

বুঝলাম, আজ রাতে জ্যানিকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবার যে প্রোগ্রাম করেছি, তার বারোটা বেজে গেল। আর এ নিয়ে, এই এক মাসে তিন-তিনবার ওর সঙ্গে কথার খেলাপ করতে হল। রাগে বিরক্তিতে মেজাজ খিঁচড়ে উঠল। একটা অপ্রিয় কথা বলতে গিয়েও টেপটার কথা মনে রেখে জিভকে সংযত করলাম।

একবার এই টেপের কথা খেয়াল না থাকায় একজন খদ্দেরকে খেঁকিয়ে উঠেছিলাম। তার জন্য পরদিন 'বস' আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাই এবারে আর সে ভুলটা করলাম না। গলার স্বর যতটা সম্ভব মোলায়েম করলাম, 'সিন্দুকটা নিয়ে কি অসুবিধেয় পড়েছেন যদি বলেন—'

'সিন্দুকের চাবিটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। শীগগিরই লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।' সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হল। আমিও ঠকাস করে নামিয়ে রাখলাম রিসিভারটা। যাঃ-শা-লা—

জ্যানিকে কথা দিয়েছিলাম, ওকে সোয়া এগোরোটার সময় ওর বাড়ির কাছ থেকে তুলে নেব। তারপর দুজনে মিলে একটা নতুন ক্লাবে যাব নাচবার জন্য। এতক্ষণে ও হয়ত সেজেগুজে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

শহরের একেবারে অপর প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড ফ্ল্যাটবাড়ি—অ্যাশলি আর্মস। শহরের নাম-ডাকওয়ালা ধনী মহাজনদের বসবাস এই বাড়িটিতে। ওখানে গিয়ে, ওই হতচ্ছাড়া সিন্দুক খুলে, ফিরে এসে বাস ধরে জ্যানির বাড়ি যেতে যেতে সাড়ে বারোটা বেজে যাবে। আর জ্যানি ততক্ষণে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে বলে মনেও হয় না। ও আমাকে বলেছিল, আর কোনদিন যদি এভাবে কথার খেলাপ করি, তবে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কের সেইখানেই ইতি।

ভাবলাম, অফিস থেকেই জ্যানিকে একটা ফোন করি। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে অফিসের ফোন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুতরাং সামনের রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে যে ফোন-ঘরটা আছে, সেখান থেকেই ফোন করতে হবে জ্যানিকে।

অগত্যা যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অফিস বন্ধ করে যখন গ্যারেজ থেকে অফিসের ট্রাক বের করছি, বাইরে তখন ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বর্ষাতি না আনার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলাম।

ফোন-ঘরের কাছে পৌঁছেই দেখি মহা বিপদ! গাড়ি দাঁড় করাবার মতো একটু জায়গাও খালি নেই। গোটা রাস্তাটাই গাড়িতে গিজগিজ করছে। গাড়ি রাখবার আশায় এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলাম। প্রায় দশ মিনিট বাদে একটা গাড়ি তার জায়গা ছেড়ে বেরোতেই, গোটা কয়েক গাড়িকে রেসে হারিয়ে ট্রাকটা সেইখানে দাঁড় করালাম। তারপর রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে চললাম ফোনঘরের দিকে।

জ্যানির ফোন-নাম্বার ডায়াল করে হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। এগারোটা কুড়ি। ফোন বাজামাত্রই ওপ্রান্ত থেকে জ্যানির কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ও যেন সারা সন্ধে বসে আমার ফোনটারই অপেক্ষা করছিল।

আমি যে কেন যেতে পারছি না, সেকথা ওকে ভালো করে বুঝিয়ে বলবার আগেই ও রাগে ফেটে পড়ল, 'তুমি না এলে না আসবে, কোন ক্ষতি নেই। আমি আর একজনকে চিনি, যাকে সিন্দুক সারাতে যেতে হচ্ছে

না। শেট, আমি গতবারই সাবধান করে দিয়েছিলাম। রোজ রোজ তোমার এই কথার খেলাপ আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি না। তোমাকে বলেছিলাম, পরের বারই শেষ বার—অর্থাৎ এটাই!'

'কিন্তু—জ্যানি, আমার—আর কোন—।' আমি আবার রিসিভারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। জ্যানি অনেকক্ষণ আগেই লাইন কেটে দিয়েছে। ওকে আবার ফোন করলাম। কিন্তু ফোন বেজেই চলল, কেউ ধরল না। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে নামিয়ে রাখলাম। ফোন-ঘর ছেড়ে শ্লথ পায়ে এগিয়ে চললাম ট্রাকের দিকে।

এদিকে তখন তোড়ে বৃষ্টি নেমেছে। অঝোর ধারায় ঝরে চলেছে বড় বড় জলের ফোঁটা। অবসাদে ভরা মনে ট্রাক ছুটিয়ে চললাম অ্যাশলি আর্মসের দিকে। মনে মনে লরেন্স সেফস্ কর্পোরেশনকে আর হেনরি কুপারকে যথেচ্ছ খিস্তি করলাম। শালার একটা সময়জ্ঞান পর্যন্ত নেই! অফিসে ফিরে, সেখান থেকে বাড়িতে আমাকে হেঁটেই যেতে হবে। এসব জেনেও কেন যে বর্ষাতিটা আনলাম না।

শহরের অভিজাত অঞ্চলে বিশাল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'অ্যাশলি আর্মস'। ট্রাক থেকে নেমে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়িটার দিকে পা বাড়ালাম।

দালান ধরে সোজা এগোলাম দ্বাররক্ষীর ঘরের দিকে। তার কাছ থেকেই জানা গেল, মি. কুপার চারতলায় থাকেন।

লিফটে চারতলায় পৌঁছে, ফ্ল্যাটের বেল বাজালাম। দরজা খুললেন স্বয়ং হেনরি কুপার। লম্বা, বিশাল চেহারার পুরুষ। ভাবভঙ্গিতে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট। অতিরিক্ত মদ্যপানের প্রভাবে মুখে ঈষৎ নীলচে আভা। তার স্ফীত উদর ভোজনবিলাসের সাক্ষ্য বহন করছে। আমি ঘরে ঢোকামাত্রই বাজখাঁই গলায় ফেটে পড়লেন, 'এই সামান্য রাস্তা আসতে তোমার এতক্ষণ লাগল?'

বৃষ্টিতে রাস্তায় যে প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে আসতে হয়েছে, সেকথা জানিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম। তিনি সেকথা গায়েই মাখলেন না। আপন মনেই গজগজ করতে করতে বসবার ঘরের দিকে এগোলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। শৌখিনভাবে সাজানো ঘরের সর্বত্রই আভিজাত্যের ছাপ।

কুপার দ্রুতপায়ে দেওয়ালে টাঙানো একটা অয়েল-পেন্টিং-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। ছবিটা জনৈক স্থূলকায় মহিলার নগ্ন-মূর্তি। দেখে রুবেনস-এর আঁকা মনে হলেও সম্ভবত নকল। ছবিটাকে একপাশে সরিয়ে ধরতেই চোখে পড়ল, আমাদের কোম্পানির তৈরি একটা সুপার-ডি-লাক্স দেয়াল-সিন্দুক।

যন্ত্রপাতির ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখার সময় লক্ষ্য করলাম, পাশের লম্বা সোফাতে একটি মেয়ে শুয়ে আছে। পরনে সাদা সান্ধ্য পোশাক। পোশাকের গলার কাছটা এত বেশি উন্মুক্ত যে মেয়েটির উদ্ধত গোলাপী স্তনের ঊর্ধ্বাংশ সহজেই নজরে পড়ছে। মেয়েটি একটি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। মাদকতায় পরিপূর্ণ রক্তিম ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। চোখ তুলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকাল।

মেয়েটিকে দেখে আমার মনে পড়ল জ্যানির কথা। কারণ ওর চুলের রং ও পায়ের সুন্দর গড়ন অনেকটা জ্যানিরই মতো। কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে এমন একটা আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করলাম, যা জ্যানির মধ্যে নেই। মানছি, জ্যানির দৈহিক গঠন চঞ্চল করে তোলে দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা। ওর ব্যক্তিত্ব, ভারী নিতম্বের ছন্দোময় হিল্লোল পুরুষের হৃদয়ে তোলে তুমুল ঝঞ্ঝা। রাস্তার লোকে স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে জ্যানির গমনপথের দিকে। সবই মানলাম, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণই নিছক সস্তা চটক।

এই মেয়েটির মধ্যে সেরকম কিছু নজরে পড়ল না।

'এটা খুলতে তোমার কতক্ষণ লাগবে? আমার হাতে একদম সময় নেই?' কুপারের বাজখাঁই গলায় আমার চমক ভাঙল।

প্রায় একরকম জোর করেই মেয়েটির দিক থেকে চোখ সরিয়ে সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গেলাম, 'কম্বিনেশনটা পেলে বেশিক্ষণ লাগবে বলে মনে হচ্ছে না—।'

একটুকরো কাগজে কম্বিনেশনটা খসখস করে লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। তারপর সোজা এগিয়ে গেলেন বিপরীত দিকের দেওয়ালে গাঁথা ছোট একটা কাঠের আলমারির কাছে। পাল্লা সরাতেই চোখে পড়ল ভিতরের তাকে সাজানো সারি সারি মদের বোতল। একটা গেলাস টেনে নিয়ে নিজের জন্য হুইস্কি আর সোডা মেশাতে লাগলেন কুপার।

যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছি, এমন সময় পাশের কোন ঘর থেকে টেলিফোনের শব্দ ভেসে এল। ক্রি—রি—রি—রিং—রি—রি—রিং—

'মনে হয় জ্যাক ফোন করছে,' মেয়েটিকে লক্ষ্য করে কুপার বললেন। এবং দরজা খোলা রেখেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কুপার বেরিয়ে যেতেই মেয়েটি চাপা স্বরে হিসহিস করে উঠল, 'চটপট হাত চালাও, চাঁদ। ব্যাটা বুড়ো আজ একটা মুক্তোর নেকলেস কিনে দেবে বলেছে। ভয় হচ্ছে, এর মধ্যে বুড়ো আবার মত না পাল্টে ফেলে!'

আমি অবাক হয়ে, হাঁ করে চেয়ে রইলাম। মেয়েটির কাছ থেকে এ-ধরনের কথা আশা করিনি। ও সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চোখজোড়ায় সাপের চাউনি। জ্যানি যখন আমার কাছ থেকে কোন দামী উপহার আদায়ের চেষ্টা করত, তখন ওর চোখও ঠিক একই চাউনি লক্ষ্য করেছি।

'মিনিট তিনেকের বেশি লাগবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' হেসে ওকে আশ্বাস দিলাম।

তিনি মিনিটের কিছু কম সময়ের মধ্যেই সিন্দুকটা খুলে ফেললাম।

'হুঁঃ, ভারি তো একটা সিন্দুক! এ তো একটা বাচ্চা ছেলেও খুলতে পারে!' মেয়েটির গলায় তাচ্ছিল্যের সুর।

কিন্তু আমার চোখ তখন লেহন করে বেড়াচ্ছিল সিন্দুকের ভিতরটা। তিনটে তাকেই থরে থরে সাজানো একশ ডলার নোটের বান্ডিল। একসঙ্গে এত টাকা আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি। সব মিলিয়ে ঠিক কত হবে তা আন্দাজ করতে না পারলেও, পাঁচ লাখ ডলালের কম হবে না, সেটা বুঝতে পারলাম।

মেয়েটি সোফা ছেড়ে, ক্ষিপ্র পায়ে সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়াল—ঠিক আমার পাশে। ওর গা থেকে সেন্টের একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধ এসে ঝাপটা মারল আমার নাকে। ও আমার এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যে ওর বাহুর স্পর্শ অনুভব করলাম।

'উফ্, এত টাকা! এ যে আলাদিনের রত্নগুহা!' চাপা উত্তেজনায় আমার হাত খামচে ধরল মেয়েটি। তারপর হাত ছেড়ে আমার চোখে চোখ রাখল, 'আচ্ছা, আমরা দুজনেই যদি একটা খালি করার ব্যবস্থা করি, তাহলে কি রকম হয়?'

পাশের ঘরে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনতে পেলাম—টুং—। বুঝলাম কুপারের কথা বলা শেষ হয়েছে।

'এই রে, বুড়ো আসছে!' ও চটপট ফিরে গেল সোফার কাছে।

আমিও সিন্দুকের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই কুপার এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

'কী হল? এখনও ওটা খুলতে পারনি?' খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি।

'এক সেকেন্ড, স্যর,' লকটা সরিয়ে দিলাম, 'এই তো খুলে গেছে।'

কুপার এগিয়ে এসে হাতল ঘুরিয়ে সিন্দুকের দরজাটা ইঞ্চি কয়েক ফাঁক করলেন, 'হুম—। তুমি বরং একটা নকল-চাবির ব্যবস্থা করে দিও—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'আচ্ছা, স্যর।' সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়লাম। অতঃপর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে এগোলাম দরজার দিকে।

বেরোবার পথে সোফাতে-বসে থাকা মেয়েটিকে শুভরাত্রি জানালাম। প্রত্যুত্তরে ও ঘাড় হেলাল। দরজার কাছ অবধি পৌঁছে কুপার দুটো এক ডলারের নোট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। নোট দুটো নেবার সময়

তাঁর মুখের ভাবে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি টাকাটা আমাকে দিচ্ছেন।

শেষে বললেন, ভবিষ্যতে আবার যদি কখনও তাঁর আমাকে দরকার পড়ে, তবে যেন এবারের মতো এত দেরি না করি। আর নকল-চাবিটার কথা বারবার মনে করিয়ে দিলেন।

ট্রাক চালিয়ে ফিরে চললাম অফিসে। কুপারের টাকায় ঠাসা সিন্দুকটা চোখের সামনে ভাসতে লাগল—ইস্, যদি ওই টাকাগুলো আমার হত—কীভাবে খরচ করতাম—

অফিসের মাইনেতে আমি কোনদিনই সন্তুষ্ট নই, আমি নিরুপায়। জানি, ওই মাইনেতে আমাকে চিরকাল এই একই ভাবে কাটাতে হবে, ভবিষ্যৎ বলে কোন বস্তু আমার জীবনে নেই।

'আচ্ছা! ইচ্ছে করলে কুপারের ফ্ল্যাটে ঢুকে কত নির্ঝঞ্ঝাটেই না হাতানো যায় ওই টাকাগুলো! ভারি তো সিন্দুক! হুঁ,—সিগারেটের কৌটো খোলার মতন টুক্ করে খুলে ফেলব—!'

বারবার মনকে বুঝালাম, এসব চিন্তা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তবুও মন থেকে ওটাকে মুছে ফেলতে পারলাম না।

পরদিন রাতে ডিউটি বদলের সময় রয় ট্রেসি এল আমার জায়গায়। তখনও কিন্তু ওই সর্বনাশা চিন্তা উঁকি মারছে আমার মনের কোনায়।

রয়কে আমি অনেকদিন ধরেই জানি। ছোটবেলায় আমরা একসঙ্গে সুকলে পড়েছি। ওকে এই সিন্দুক-কোম্পানির চাকরিতে ঢুকিয়েছিল ওর বাবা, আর ওই একই দিনে আমার বাবাও, আমার ভবিষ্যতের গাঁটছড়া এই হতচ্ছাড়া কোম্পানির সঙ্গে বাঁধবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

এমনিতে আমার সঙ্গে রয়ের চেহারার অনেকখানি মিল আছে। রয় লম্বা চেহারার শক্তসমর্থ পুরুষ। গায়ের রং বাদামী। ঠোঁটের উপর সরু টানা গোঁফ থাকায় মুখে একটা ইতালীর আদল ফুটে উঠেছে। এছাড়া দুজনের মধ্যে আর যে মিল, তা হল অসীম অর্থলিপ্সা।

তবে রয়ের জীবনে মেয়েদের কোন স্থান নেই। আমার সঙ্গে একখানেই ওর সবচেয়ে অমিল। উনিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিল রয়। কিন্তু সুখী হতে পারেনি। বছরখানেক পরেই মেয়েটা ওকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। এবং সেইখানেই ওর জীবনের কামিনী-অধ্যায় হয়েছে সমাপ্ত। একটা নেশা ওর আছে, তা হল ঘোড়া-রোগ। মাইনের প্রায় সব টাকাই উড়িয়ে দেয় ঘোড়ার পিছনে। যার জন্য সর্বদাই ওর পকেট খালি থাকে, আর আমার থেকে ধার নেবার চেষ্টা করে।

ওকে কুপারের টাকার কথা বললাম।

আমরা দুজন ছাড়া অফিসে আর কেউ নেই। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জলের ছাট এসে আছড়ে পড়ছে জানলার সার্সির উপর। সাপের মতো এঁকেবেঁকে জলের ধারা সার্সি বেয়ে নেমে চলেছে। আমার বাড়ি যাওয়ার কোন তাড়া নেই। রয়কে কুপারের ফ্ল্যাটে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে সব বললাম। এমনকি মেয়েটার কথাও বাদ দিলাম না।

'দেখে মনে হল সিন্দুকটায় প্রায় পাঁচ লাখ ডলার আছে, জানিস। সবই একশো ডলারের নোট।' পায়চারি করতে করতে ঘাড় ফিরিয়ে রয়ের দিকে তাকালাম, 'ইস্—যদি এত টাকা পেতাম, তবে কি হত একবার ভেবে দেখ তো!'

রয়ের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। ও ডেস্কের কাছে বসে একমনে ধোঁয়া ছাড়ছিল, 'এরকম ভাগ্য সকলের হয় না।'

'হুঁ—, যা বলেছিস।' জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম। বাইরে বর্ষণসিক্ত রাতের দিকে তাকালাম। বৃষ্টি তখনও অবিশ্রান্ত ঝরে চলেছে। রাস্তার ধারের নর্দমাগুলো জলে ভরে গেছে। নির্জন রাস্তায় মধ্যে-মধ্যে জল ছিটিয়ে ছুটে যাচ্ছে দু-একটা গাড়ি।

'মনে হয় আর বেশি রাত করা ঠিক হবে না। উঃ—যা অবস্থা। বৃষ্টি বটে একখানা!'

'আরে যাবি—যাবি। অত তাড়ার কি আছে।' রয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল, 'পাঁচ লাখ ডলার?'—তুই ঠিক বলছিস?'

'তার চেয়ে কম হবে বলে তো মনে হয় না।—তিনটে তাকই ছিল পুরো ভর্তি।'

'আয়—বোস। ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।'

রয়ের চোখের দিকে তাকালাম। উৎকণ্ঠার ছায়া কাঁপছে ওর চোখের তারায়।

'শেট, ওরকম বেশ কিছু টাকা পেলে আমার কাজে লাগত।'

'কাজে আমারও লাগত।' ওর কাছে এসে বললাম।

'জানিস, মাত্র পাঁচশো ডলারের জন্য আমাকে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে?' টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মারল রয়, 'যেমন করেই হোক, কিছু টাকা আমাকে যোগাড় করতেই হবে—আচ্ছা মনে কর যদি আমরা ওই সিন্দুকটা—' চোখ নাচিয়ে হাতের একটা ভঙ্গি করল রয়। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে সরীসৃপের মতো শীতল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে, 'শুধু সামান্য একটু হাতের কাজ—'

অসম্ভব কিছু নয়।' আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল।

তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। আমরা দুজনেই জানলার দিকে চেয়ে রইলাম। শুনতে লাগলাম বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ।

'আমি বহুদিন ধরে শুধু এইরকম একটা সুযোগের অপেক্ষা করেছি, শেট। যেভাবে এখন আমাকে দিন কাটাতে হচ্ছে, তাতে জীবনের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। তোরও তো এই একই অবস্থা, তাই না?'

'হ্যাঁ—'

'তবে আর ভাবছিস কি? তোর কি কাজটা করার ইচ্ছে নেই?'

'না,—ইচ্ছে ঠিক নেই। কিন্তু তবুও করতেই হবে। কারণ কাজটা বড্ড বেশি সহজ।'

রয় দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল, 'আরে এত ভয় পাওয়ার কি আছে? ঠিকমতো বুদ্ধি করে করতে পারলে, কেউ আমাদের টিকিটি পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না।'

উত্তেজনায় উঠে বসলাম ডেস্কের উপর, 'সুতরাং—'

'ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা যাক। আয়, দুজনে বসে ঠান্ডা মাথায় একটু আলোচনা করি।'

একটা ঘণ্টা দেখতে দেখতে কেটে গেল। যতই আমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম, কাজটা ততই সোজা বলে মনে হতে লাগল।

'প্রথমেই আমাদের খোঁজ নিতে হবে, এই কুপার লোকটা রোজ ক'টার সময় ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোয়। এটা আমাদের জানতেই হবে। আর সময়টা জানতে পারলেই আমাদের কাজ শুরু হবে,—অর্থাৎ ফ্ল্যাটে ঢুকে, সিন্দুক খুলে, চটপট মাল হালকা করা।' আত্মপ্রত্যয়ের একটুকরো বাঁকা হাসিতে রয়ের ঠোঁট নেচে উঠল, 'এবার তোকে যা করতে হবে, তা হল ওই নকল-চাবিটা নিয়ে, কুপারের বাড়িতে গিয়ে দরজায় যে দারোয়ানটা থাকে, ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ গপ্পো মারবি। কথায় কথায় ওর থেকেই কুপারের বেরোবার সময়টা জেনে নিবি। কাজটা খুব একটা শক্ত হবে না। কারণ দারোয়ানরা সাধারণত গল্প করতে ভালোবাসে। তুই কথা বলার সময় খুব অন্তরঙ্গ ভাব দেখাবি, আর ওর সব কথায় সায় দিয়ে যাবি। রয় আমার মুখ লক্ষ্য করে পর পর কতকগুলো ধোঁয়ার রিং ছাড়ল, 'ব্যস—। একবার যদি জানতে পারি কুপার বাড়িতে নেই, তো সোজা ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকব এবং—' উত্তেজনায় প্রায় আস্ত সিগারেটটা ছাইদানে গুঁজে দিল রয়।

ব্যাপারটা আলোচনা করার পর মনে হল পৃথিবীতে এর চেয়ে সহজ কাজ আর হতে পারে না।

পরদিন রাতে নকল চবিটা নিয়ে অ্যাশলি আর্মসে গেলাম। আমার পরনে অফিসের ইউনিফর্ম—বাদামী রঙের জ্যাকেট আর গাঢ় সবুজ প্যান্ট। মাথায় বসানো ব্যাজ-লাগানো টুপি।

রয় বলেছে, হাতের কাজ শেষ করেই ও অ্যাশলি আর্মসে ট্রাক নিয়ে চলে আসবে। বাইরে অপেক্ষা করবে আমার জন্য।

অ্যাশলি আর্মসে যখন পৌঁছুলাম, সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ট্রাক ছেড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম দ্বাররক্ষীর ঘরের দিকে। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম।

দেখি, লোকটা বসে একটা পকেট-বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। মুখে বিরক্তির ভাব। হয়ত জীবনের একঘেয়েমিই এই বিরক্তির কারণ।

আমাকে দেখেই চিনতে পারল। বই বন্ধ করে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল, 'ও—তুমি? মি. কুপারের সঙ্গে দরকার বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কপাল খারাপ,—উনি বেরিয়ে গেলেন।'

কাউন্টারে হেলান দিয়ে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম, 'কখন ফিরবেন উনি?'

দ্বাররক্ষী দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি একটা হিসেব করল, 'আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরার কথা।'

'কি আর করা যাবে—অপেক্ষাই করতে হবে। ওনাকে একটা দরকারী জিনিস দেবার ছিল।'

'আমার কাছে রেখে যাও—মিঃ কুপার এলে তাঁকে দিয়ে দেব।'

'উঁহু,—তা সম্ভব নয়।—মানে ওঁর সিন্দুকের চাবি তো, আর কাউকে দেওয়াটা ঠিক হবে না। একেবারে ওঁর হাতে দিয়ে রসিদ নিয়ে যেতে হবে।'

দ্বাররক্ষী কাঁধ ঝাঁকাল, 'তোমার যা ইচ্ছে—।'

ওর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম, 'তুমি ঠিক জান, আর আধঘণ্টার মধ্যেই মি. কুপার ফিরে আসবেন?'

'সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোনদিনই তাঁর দেরি হয় না। ঠিক আটটার সময় বেরোন আর রাত এগারোটায় ফেরেন।'

'হ্যাঁ,—কিছু কিছু লোককে দেখেছি একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে।'

'মি, কুপারও ওই দলের। তিন তিনটে নাইটক্লাবের মালিক। প্রত্যেক দিন রাতে, নিজের ক্লাবে যান এমন কি রোববারও বাদ দেন না। দেখাশোনা করে, এগারোটায় ডিনার খেতে আসেন। ডিনার সেরে, একটার সময় আবার বেরিয়ে পড়েন। দৈনিক বিক্রির হিসেব চুকিয়ে, ক্লাব বন্ধ করে, তারপর ফেরেন। কোনদিন এর একটুও হেরফের হয় না।'

'তোমাকে কি সারারাতই থাকতে হয় নাকি?' ঘনিষ্ট হবার চেষ্টায় কপট সহানুভূতি দেখালাম।

'না—না। একটা বাজলেই আমি দরজায় তালা দিয়ে কেটে পড়ি। এ-বাড়ির প্রত্যেকের কাছেই দরজার নকল-চাবি আছে।' একটু থেমে অপেক্ষাকৃত নিচু স্বরে ও বলল, 'আরে, তুমি বিশ্বাস করবে না দোস্ত, কতদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে টেনে তুলেছে। কি হয়েছে, না কোন শালা মাল টেনে, দরজার চাবি হারিয়ে বসে আছে।'

এ সুযোগটা আমি হেলায় হারালাম না। রয়ে নির্দেশমতো গলায় একটা অন্তরঙ্গ সুর ফুটিয়ে তুললাম, 'এই তো সেদিন রাতে কুপার ওর সিন্দুকের চাবি হারিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাল। তখন সবেমাত্র এগারোটা। তারপর সিন্দুক সারিয়ে ফিরতে ফিরতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। শালা, পুরো সন্ধেটা মাটি!'

'ও ব্যাটা রোজরোজই চাবি হারাচ্ছে,' বিরক্তিতে মুখ বেজার করল দ্বাররক্ষী, 'এই তো গত সপ্তাহেই দরজার চাবি হারিয়ে, আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুলল। তখন ভোর পাঁচটা। হতভাগা চাবি হারানোর আর সময় খুঁজে পেল না! যত্তো সব—।'

'কুপার কি পাঁচটার সময় ফেরে নাকি?'

'হ্যাঁ—। তারপর সারাদিন তো পড়ে পড়ে ঘুমোয়। একেবারে অপদার্থ—'

আনন্দে আমার চোখ চকচক করে উঠল। আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। যা জানবার ছিল, তা জানা হয়ে গেছে। সুতরাং কায়দা করে প্রসঙ্গ পাল্টালাম। একথা-সেকথা নিয়ে বকর-বকর করে চললাম। ভুলেও দ্বাররক্ষীর কোন কথার প্রতিবাদ করলাম না। রয়ের নির্দেশমতো ওর সব কথাতেই সায় দিয়ে গেলাম। তারপর একসময় লক্ষ্য করলাম, লম্বা লম্বা পা ফেলে হেনরি কুপার এগিয়ে আসছেন। দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকালাম। এগারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি।

দ্রুতপায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম, 'আপনার নকল-চাবিটা নিয়ে এসেছি, স্যর।'

মুহূর্তখানেক তিনি তাঁর ছোট ছোট চোখ দিয়ে আমার আপাদমস্তক জরিপ করলেন। তারপর চিনতে পেরে বললে, 'ওহ্—তুমি!—ঠিক আছে, চাবিটা দাও।'

'স্যর, আমার মনে হয় চাবিটা ঠিক হয়েছে কিনা, সেটা একবার পরখ করা দরকার। অপনি যদি বলেন—'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ নিশ্চয়ই।' আমাকে অনুসরণ করতে বলে তিনি লিফটের দিকে পা বাড়ালেন।

চারতলায় পৌঁছে কুপার তাঁর ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে আমাকে আহ্বান জানালেন। তাঁর পিছন পিছন আমিও বসবার ঘরে প্রবেশ করলাম।

হেনরি কুপার ছবিটা সরিয়ে, আমাকে চাবিটা পরীক্ষা করার জন্য ইশারা করলেন। আমি চাবি ঘুরিয়ে সিন্দুকটা খোলার চেষ্টা করলাম। কুপার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর খুদে চোখজোড়া সিন্দুকের উপর নিবদ্ধ।

হাতল ঘুরিয়ে টান মারতেই খুলে গেল সিন্দুকের দরজা। চোখের সামনে আবির্ভূত হল চোখ-ধাঁধানো কুবেরের সম্পদ। একটা অবাস্তব চিন্তা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো ঝলসে উঠল আমার মনের আকাশে। ঘরে কুপার একা! যদি এখানেই ওকে আক্রমণ করি? ওই ফুলদানিটার বাড়ি মেরে ওকে অজ্ঞান করে, টাকা নিয়ে কেটে পড়তে আমার মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় লাগবে না। তারপর—কিন্তু না!

অসীম সংযমে দমিয়ে রাখলাম এই অদম্য স্পৃহাকে। সিন্দুকটা আবার বন্ধ করে কুপারকে চাবিটা এগিয়ে দিলাম, 'এই নিন, স্যর।'

'হুম—' চাবিটা তিনি পকেটে রাখলেন। আপন মনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'ঠিক আছে—।' তারপর ডান পকেটে হাত ঢোকালেন কিন্তু এই পর্যন্তই। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। পকেটের ভিতরেই থেকে রইল তাঁর ডান হাত, বাইরে আর এল না। কুপারের মনের ভাব কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। আগের দিন আমাকে যে দু-ডলার দিয়েছিলেন, সেটার কথাই তিনি এখন ভাবছেন। এবং আমার এই সামান্য কাজের বিনিময়ে দু-ডলারই যে যথেষ্ট, সম্ভবত সেকথা বলে মনকে প্রবোধ দিচ্ছেন।

লোকটার এই মাক্ষিচুসের মতো ব্যবহার দেখে রাগে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আমি শুধু দোমনা হয়ে ভেবেছি, রয়ের কথায় রাজি হব কি হব না। শুধু শুধু একটা লোকের সিন্দুক ভেঙে—কিন্তু না! সেই মুহূর্তেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। এরকম হাড়কিপটের সিন্দুক হাতালে কোন পাপ হয় না।

কুপারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লিফটে পা দিলাম। রাস্তায় নেমে বৃষ্টির বেগকে উপেক্ষা করে ক্ষিপ্রপায়ে হেঁটে চললাম। বৃষ্টির ফোঁটার ঝাপসা পর্দা ভেদ করেও দেখা যাচ্ছিল, অদূরে দাঁড়ানো ট্রাকটাকে।

ট্রাকে বসে রয় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই দরজা খুলে ধরল, 'ওই লালমুখো মোটা লোকটাই বুঝি কুপার?'

'হ্যাঁ,' রয়ের পাশে উঠে বসলাম। রয় স্টার্ট দিয়ে ট্রাক ছুটিয়ে চলল বৃষ্টিভেজা রাস্তা ধরে।

‘রোববার দিনই ব্যাটাকে কোপ দেওয়া যাবে, বুঝলি রয়। কোন ঝামেলার ভয় নেই।’

রোববার দিন আমার এবং রয়ের, দুজনেরই ছুটি। তাই ওই দিনটাই ঠিক করলাম।

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই আকাঙ্ক্ষিত, উৎকণ্ঠাময় দিন। রয় আগেই একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে রেখেছিল। রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় ও আমার বাড়িতে এল।

আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে গিয়ে উঠলাম গাড়িতে। মুহূর্তমাত্রও দেরি না করে রয় গাড়ি ছুটিয়ে দিল অ্যাশলি আর্মসের দিকে।

বৃষ্টির ফোঁটা নিষ্ফল আক্রোশে মাথা খুঁড়ছে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে। রয় একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। ওর চোয়ালের রেখা কঠিন। কেমন একটা নিঃশব্দ উৎকণ্ঠা অনুভূত হচ্ছিল গাড়ির আবহাওয়ায়। আমরা দুজনেই চুপ। কারো মুখেই কোন কথা নেই। শুধু অনুভব করলাম বুকের মধ্যে অশান্ত হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপি—টিপ টিপ—টিপ—টিপ।

বৃষ্টির জন্য আমাদের সুবিধেই হল। রাস্তায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। ঠিক একটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় আমরা অ্যাশলি আর্মসে পৌঁছলাম।

সারি সারি গাড়ি পার্ক করা রয়েছে রাস্তাটায়। একটা ক্যাডিলাক এবং একটা প্যাকার্ডের মাঝে গাড়িটা ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল রয়। তারপর শুরু হল আমাদের উদগ্রীব প্রতীক্ষা! বৃষ্টির ফোঁটা ঝমঝম করে আছড়ে পড়ছে গাড়িগুলোর ছাদে।

রয়ের দিকে তাকালাম। পলকহীন চোখে ও চেয়ে রয়েছে অ্যাশলি আর্মসের সদরদরজার দিকে। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ পরিষ্কার ছন্দে শোনা যেতে লাগল।

চোখ ফেরালাম অ্যাশলি আর্মসের দিকে। কখন বেরোবে কুপার? উত্তেজনায় শরীরের প্রতিটি স্নায়ু কাঁপছে।

ড্যাশবোর্ডে লাগানো ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত একটা। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম, একজন লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। আমি রয়ের দিকে ঘাড় ফেরাতেই দুজনের চোখাচোখি হল। রয়ের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

কুপার রাস্তায় এসেই মাথা ঝুঁকিয়ে দৌড়তে শুরু করল। আমাদের গাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাখা ছিল একটা সাদা জাগুয়ার। হাত দিয়ে বৃষ্টির বেগ প্রতিহত করতে করতে জাগুয়ারটার দিকে এগিয়ে চলল কুপার। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে উঠে বসল গাড়িতে। তারপর গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টিভেজা অন্ধকার গ্রাস করল সাদা জাগুয়ারটাকে।

‘এখনও আর একজন বাকি—।’ কাঁপা স্বরে বলল রয়।

‘হ্যাঁ—।’ অ্যাশলি আর্মসের থেকে চোখ না সরিয়ে জবাব দিলাম। কিন্তু নিজের গলাই কেমন অপরিচিত ঠেকল নিজের কাছে।

কয়েক মিনিট পর সেই দ্বাররক্ষীকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ও এসে দাঁড়াল কাচের দরজার কাছে। পকেট হাতড়ে একটা চাবি বের করল। তারপর চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল সদরদরজা।

দরজার কাচের পাল্লার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল লোকটাকে। ও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল বাড়ির অপর প্রান্তে। সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করল। বুঝলাম, ও ফিরে যাচ্ছে ওর কোয়ার্টারে। হয়ত বৃষ্টিভেজা ঠান্ডার রাতে একটা গভীর ঘুম দেবার মতলব ভাঁজছে।

‘চল, আর দেরি করে লাভ নেই।’ চমক ভাঙল রয়ের কথায়। কাঁপা হাতে আঁকড়ে ধরলাম যন্ত্রপাতির ব্যাগটা। রয় ততক্ষণে দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়েছে। অশান্ত মনকে কিছুতেই পারছি না শান্ত করতে। শ্বাস-প্রশ্বাসে কেমন একটা কষ্ট অনুভব করছি। রয়ের কথায় সায় না দিলেই হত! কিন্তু এখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই।

গাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরোতেই বৃষ্টির জল ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে, মাথায়। ঠাণ্ডা জলের ফোঁটায় সাময়িক ভাবে প্রশমিত হল রক্ত-উত্তাল করা উত্তেজনা। আঃ—পরমুহূর্তেই আমরা ছুটলাম সদরদরজা লক্ষ্য করে। প্রথমে রয়, আর তার পিছন পিছন আমি।

আগে থেকেই আমরা সব-কিছু ছকে রেখেছিলাম। আমার কাজ হবে তালাটা খোলা, আর রয় চারপাশে লক্ষ্য রাখবে। কোন বিপদের আশঙ্কা দেখলেই আমাকে সতর্ক করে দেবে।

দরজার কাছে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে পকেট থেকে চাবি-ভর্তি রিংটা বের করলাম। সদরদরজার কাছ থেকে বাড়ির ভিতরের দরজাটা দেখা যাচ্ছে না। যদি কেউ বাড়ির ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে? একথা ভাবতেই আতঙ্কে অবশ হয়ে গেলাম। পাঁচ আঙুলের ফাঁক থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে গেল চাবির রিংটা।

'কী, করছিস কী?' রয়ের চাপা ধমকানিতে সংবিত ফিরে পেলাম। চটপট রিংটা তুলে নিয়ে তালাটার দিকে মনোযোগ দিলাম।

এমনিতে এ-ধরনের তালা খোলা আমার কাছে কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু থরথর করে আমার হাত কাঁপছিল। তাই প্রয়োজনের অনেক বেশি সময়ই লাগল দরজাটা খুলতে। রয় ততক্ষণে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে।

হাতল ঘুরিয়ে অতি সন্তর্পণে দরজাটা ফাঁক করলাম। তারপর আমি আর রয় নিঃশব্দে ভিতরে পা বাড়ালাম। বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চললাম সিঁড়ির দিকে।

আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম, লিফট ব্যবহার করব না। কারণ দ্বাররক্ষী যদি হঠাৎই বিছানা ছেড়ে উঠে আসে, তবে লিফটের আলো দেখে ঠিক সন্দেহ করবে। আর যদি হই-চই শুরু করে দেয়, তবে তো হয়েই গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উপড়ে উঠতে শুরু করলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে, কারণ মাঝপথে কারো মুখোমুখি পড়তে হল না।

যখন কুপারের ফ্ল্যাটের সামনে উপস্থিত হলাম, তখন আমরা দুজনেই হাঁপাচ্ছি। পকেট থেকে চাবির রিংটা বের করে, একটা চাবি লাগাতেই খুলে গেল ফ্ল্যাটের দরজা। ভয় অনেকটা কমে এসেছিল। এতটা যখন নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসেছি, তখন—।

সিন্দুকের টাকার কথা মনে পড়তেই হারানো সাহসের অনেকখানি ফিরে পেলাম। হাতের চাপে ফাঁক হয়ে গেল দরজার পাল্লা।

ঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আমাদের গ্রাস করতে এগিয়ে এল। দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে, ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলাম সামান্যতম শব্দ।

শুধু ভেসে এল দেওয়াল ঘড়ির টিক-টিক-টিক—আর রেফ্রিজারেটরের মৃদু টানা গুঞ্জন—

'কি হল তোর? দাঁড়িয়ে রইলি কেন?' পিছন থেকে আমাকে ঠেলা মারল রয়।

বুঝলাম এই অসহ্য উৎকণ্ঠায় ওর স্নায়ু ভেঙে পড়তে চাইছে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ডের কাছে এগিয়ে গেলাম, আলো জ্বেলে দিলাম। ধবধবে মার্কারি ল্যাম্পের চোখ-ঝলসানো আলোয় ঘর ভেসে গেল। রয় ভিতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। ইয়েল লক দরজা 'ক্লিক' শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল।

'একখানা ঘরের মতো ঘর বটে!' ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল রয়, 'কুপার ব্যাটা দেখছি টাকার কুমির!—যাকগে, সিন্দুকটা কোথায়?'

কোন জবাব না দিয়ে, অয়েলপেন্টিংটার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ছবিটা সরিয়ে ধরলাম একপাশে। সামনেই সিন্দুকটা—।

‘নে, চটপট কাজ শুরু কর।’ ঘরের এককোণে রাখা দামি টেলিভিশন সেটটার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই রয় তাড়া লাগাল।’

কম্বিনেশন-নম্বরটা আমার মুখস্থই ছিল। তা ছাড়া, সঙ্গে ছিল সিন্দুকের নকলচাবি। কুপারের চাবিটা তৈরির সময় এটাও তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খুলে ফেললাম সিন্দুকের দরজা, ‘রয়, দেখবি আয়—’

বিস্ময়ে হতবাক দুজন, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, হাঁ করে চেয়ে রইলাম টাকার পাহাড়ের দিকে।

‘একি স্বপ্ন দেখছি!’ রয়ের পাঁচ আঙুল ওর অজান্তেই শক্ত হয়ে চেপে বসল আমার হাতে, ‘শেট বাকি জীবনটা তাহলে পায়ের ওপর পা তুলেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে, কি বলিস?’

‘সত্যিই, পৃথিবীতে এর চেয়ে সহজ কাজ আর হতে পারে না। আনন্দের ঢেউ তখন আছড়ে পড়ছে বুকের ভিতরে।

আড়াই—লাখ—ড—লা—র!—সম্পূর্ণ—আমার—এও কি সম্ভব?

কতক্ষণ যে ওইভাবে একটা ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ শুনতে পেলাম। রয়ের দিকে চেয়ে দেখি, ও তখনও লুব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে টাকার বান্ডিলগুলোর দিকে। অবচেতন মনে শব্দটাকে ততটা আমল দিইনি। কিন্তু পুরমুহূর্তেই, ওই শব্দের অর্থ বুঝতে পেরে আতঙ্কে জমে পাথর হয়ে গেলাম। রয়কে এক ধাক্কা মারতেই ও সংবতি ফিরে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে আমরা দুজনেই দরজার দিকে তাকালাম।

একটা ছবির অগ্রভাগ বেরিয়ে আছে চাবির ফুটো দিয়ে। আস্তে আস্তে ঘুরছে চাবিটা। আমাদের আতঙ্ক-বিস্ফোরিত চোখের সামনেই ‘ক্লিক’ করে একটা শব্দ হল এবং চাবিটা ফুটো থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি তখন জড়পদার্থের মতো অচল, অনড়! দেহের সমস্ত অনুভূতি যেন জমে বরফে পরিণত হয়েছে। সাধারণ বুদ্ধিটুকুও যেন লোপ পেয়েছে।

দেখলাম রয় হঠাৎ পাগলের মতো ছুটে গেল সুইচবোর্ড লক্ষ্য করে, আর একই সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল দরজার হাতলটা। অর্থাৎ বাইরে থেকে কেউ দরজা খুলছে!

রয় সুইচ অফ করার সঙ্গে-সঙ্গেই একরাশ অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। পরমুহূর্তেই ধীরে ধীরে খুলতে লাগল ফ্ল্যাটের দরজা। বারান্দার একফালি আলো দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়ল। দরজা যতই খুলতে লাগল, ততই চওড়া হতে লাগল সেই আলোর রেখা। ক্রমশ আমার গায়ে এসে পড়ল সেই আলো, এবং আমাকে অতিক্রম করেও বেশ কিছুটা গিয়ে তারপর থামল। অর্থাৎ দরজা সম্পূর্ণটাই খুলে গেছে আর ঠিকরে-পড়া বারান্দার আলোর বৃত্তে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি।

রয়কে অন্ধকারে দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম, দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই আগের দিনের দেখা মেয়েটি। মুহূর্তমাত্র আমরা তাকিয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে।

পরক্ষণেই মেয়েটির তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকারে চমকে উঠলাম, ‘চোর—চোর! হেনরি—ঘরে চোর ঢুকেছে—।’ আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে, পা দুটো যেন আটকে আছে মেঝের সঙ্গে। মনে হল, কানের ভিতর কেউ যেন ঢেলে দিয়েছে গরম সীসে।

দেখলাম, কুপার এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির পিছনে। এক ঝটকায় ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, কুপার আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। দুহাতের দশ আঙুল যেন চিতার থাবার মতো রক্ত-পিপাসায় বাঁকানো। চোখের অগ্নিক্ষরা দৃষ্টিতে জ্বলছে আক্রোশের লেলিহান শিখা।

আমি তখন বোবা-আতঙ্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

মেয়েটা ঝড়ের বেগে ছুটে গেল সিঁড়ি লক্ষ্য করে। ওর তীক্ষ্ণ কানফাটানো আর্ত চিৎকারে গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠতে লাগল।

এবার আমি রয়কে দেখতে পেলাম। জাগুয়ারের মতো গুঁড়ি মেরে, দেয়াল ধরে ও এগিয়ে চলল দরজার কাছে, কুপারের ঠিক পিছনে। কুপার রয়কে দেখতে পায়নি। সে সোজা এগিয়ে আসছিল আমারই দিকে। দু-হাত বাড়িয়ে সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কিছু একটা ঝলসে উঠল রয়ের হাতে। একটা শব্দ হল—ঠকাস! কুপারের বিশাল দেহ গোড়াকাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে।

লক্ষ্য করলাম, রয়ের দুহাতে, বজ্রমুষ্টিতে ধরা রয়েছে সেই ভারী ফুলদানিটা। অর্থাৎ হাতের কাছে আর-কিছু না পেয়ে, ওই ফুলদানিটাই কুপারের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে রয়।

'শেট—' আমার হাত ধরে ও এক হ্যাঁচকা টান মরল, 'শীগগির—'

আমি যেন এতক্ষণ দেখা দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে উঠলাম। সমস্ত বোধশক্তি লোপ পেয়ে, শুধু একটা চিন্তাই ঘুরতে লাগল মনের মধ্যে—পালাতে হবে।

কোন-কিছু ভাববার আগেই টের পেলাম, আমি উন্মাদের মতো দরজা লক্ষ্য করে দৌড়চ্ছি। পিছন থেকে রয়ের চাপা ধমক শুনতে পেলাম, 'অ্যাই শেট, নিচে নয়—ওপরে—!' ভয়ে ওর গলা কাঁপছে।

আমি তখন আতঙ্কে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে চলেছি। নিচ থেকে মেয়েটির গলাফাটানো আর্তচিৎকার তখনও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে তখন একটাই চিন্তা—যে করে হোক আমাকে গাড়ির কাছে পৌঁছতে হবে।

'শেট, নীচে নয়—ওপরে আয়—ওপরে—।' রয়ের অধৈর্য চাপা গলা শুনতে পেলেও, ওর কথা আমার আচ্ছন্ন মনে কোন রেখাপাত করল না। এক এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে অন্ধের মতো ছুটে চললাম।

সেকেন্ড কয়েকের মধ্যেই তিনতলায় পৌঁছলাম। দোতলায় সিঁড়ি লক্ষ্য করে দৌড়চ্ছি, একটা ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। একজন রোগা, সানাচুলওয়ালা বুড়ো বেরিয়ে এল। কিন্তু পরমুহূর্তেই একলাফে ফ্ল্যাটে ঢুকে, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। একটুও না থেমে ছুটে চললাম।

পরের সিঁড়িগুলো তিন লাফে পার হয়ে, দৌড়তে শুরু করলাম নিচের তলার সিঁড়ি লক্ষ্য করে। কিন্তু হঠাৎই পা পিছলে যাওয়ায়, মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়লাম মেঝেতে। কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে, আঘাত গ্রাহ্য না করে আবার দৌড়লাম। ছুটতে ছুটতে অবশেষে এসে উপস্থিত হলাম দালানে।

মেয়েটা তখন দ্বাররক্ষীর অফিসের কাছে দাঁড়িছে, দরজার হাতল ধরে টানাটানি করছে। আমাকে দেখে আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপরই ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল হাঁড়িচাঁচা-কণ্ঠে এক অমানুষিক আর্ত চিৎকার।

এমন সময় লক্ষ্য করলাম, দ্বাররক্ষী ওর কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আসছে। প্রথমে ও চোখ গোল গোল করে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল, পরক্ষণেই সংবিত ফিরে পেয়ে, হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে বুনো মোষের মতো ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে। জাপটাজাপটি করে দুজনেই ছিটকে পড়লাম মেঝেয়। ওর শক্ত হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে আমি শুধু কোনরকমে পালাতে পারলেই বাঁচি!

ভয়ে মরিয়া হয়ে, লোকটার চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে সজোরে ঠুকে দিলাম। তাতেও যখন কিছু হল না, তখন দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। লোকটা আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই ওকে ঠেলে সরিয়ে টলতে টলতে উঠে, আবার ছুটতে শুরু করলাম—লক্ষ্য সদর দরজা।

দরজা খুলে ঠিক বাইরে পা দিচ্ছি, এমন সময় বেজে উঠল কানফাটানো এক পুলিশহুইহল্। নিশ্চয়ই দ্বাররক্ষীর কাণ্ড! মেয়েটির বীভৎস চিৎকার আর এই হুইশল্-এর কানফাটানো শব্দে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম। পড়িমরি করে দৌড়লাম রাস্তা লক্ষ করে।

বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে চলেছি কানে তখনও ভেসে আসছে সেই চিৎকার। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দ।

এই বৃষ্টিতেও আমি তখন কুলকুল করে ঘামছি। হৃৎপিণ্ড যেন বুক ফেটে বেরিয়ে আসছে চাইছে। কিন্তু আমার পা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

'হে—ই—ই—' ছুটতে ছুটতেই পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। একটা ছায়ামূর্তি আমার পিছনে পিছনে দৌড়ে আসছে। তার মাথায় টুপি কোটের বোতামগুলো অন্ধকারেও ঝকঝক করছে।—পুলিশ! ভয়ে আমার দেহ অবশ হয়ে এল।

কিন্তু ওই তো—সামনেই দেখা যাচ্ছে আমাদের গাড়িটা। একবার গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারলেই—

নতুন উদ্যমে ছুটে চললাম! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেসে এল রিভলভারের শব্দ—ফটাস!

'উঃ—' আমার গাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল একটা আগুনের হালকা। গালের চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলাম।

চট করে মাথা নিচু করে, রাস্তার অপর প্রান্ত লক্ষ্য করে ছুটে চললাম। সেদিকটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। যদি একবার ওখানে পৌঁছুতে পারি, তবে এখনও পালাবার আশা আছে।

দৌড়তে দৌড়তেই আবার শুনতে পেলাম সেই কালান্তক রিভলবারের শব্দ—উঃ—! পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ভিজে রাস্তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। যেন কেউ একটা উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা বিঁধিয়ে দিয়েছে আমার পিঠে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বরই বেরোল না। অজান্তেই হাত চলে গেল পিঠে, আহত জায়গাটা চেপে ধরতে। হাত সামনে আনতেই দেখলাম, হাতময় চটচটে ভিজে রক্ত। বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে, সেই রক্ত টপ টপ করে পড়ছে পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে।—প্রতিটি অনুভূতি অবশ হয়ে আসতে লাগল—

শুনতে পাচ্ছি কয়েক জোড়া ভারী বুটের শব্দ—খট—খট—খট—খট। তীরবেগে কারা যেন দৌড়ে আসছে আমারই দিকে—খট—খট—খট—খট—

—উঃ—কি অন্ধকার—!—মাগো—

তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

দুই

বহুদূর থেকে ভেসে আসা কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলাম। যেন কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে—অনেক—অনে—ক দূর থেকে—

ক্রমশ চেতনা ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হল। যতই সময় যেতে লাগল, ততই যেন তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল ব্যথাটা।

আস্তে আস্তে চোখ ফেললাম। দুধ-সাদা-চারদেয়ালে-ঘেরা একটা ঘরের মধ্যে আমি শুয়ে আছি। আমার মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে একটা মুখ। দুটো উদগ্রীব চোখ স্থিরলক্ষ্যে চেয়ে আছে আমার দিকে। এক সময় সেই মুখের ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে, কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল। বুকের মধ্যে তীব্রতর হয়ে উঠল সেই অসহ্য যন্ত্রণা। থর থর করে কেঁপে উঠলাম। আপনা থেকেই চোখ বুঝে এল।

কিন্তু ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলো, মনের পর্দায় ছবির মতো পর পর ভেসে উঠতে লাগল। মনে পড়ল, উন্মাদের মত সিঁড়ি ভেঙে দৌড়নোর কথা। দ্বাররক্ষীর সঙ্গে ধবস্তাধবস্তি, মেয়েটির বীভৎস আর্ত চিৎকার, অন্ধের মতো রাস্তা লক্ষ্য করে আমার ছুটে যাওয়া—সব—স—ব একে একে এসে ভিড় করল আমার মনের আয়নায়। এমন কি রিভলবারের সেই ভয়ঙ্কর শব্দগুলোও যেন আবার শুনতে পেলাম—

রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে এই হল পরিণতি।—হুঁঃ—আমি আজ শুয়ে আছি হাসপাতালের বিছানায়—আহত অবস্থায়, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণদর্শন এক পুলিশ-সার্জেন্ট—একেই বলে নিয়তি!

আপনি তো বলছেন, এর আঘাত নাকি ততটা গুরুতর নয়। তাহলে ব্যাটা নিশ্চয়ই মটকা মেরে পড়ে আছে। কলার ধরে তুলে, এক লাথি ঝাড়লেই সুড়সুড় করে জ্ঞান ফিরে আসবে—।' সাজেন্টের শ্লেষ-ভরা অধৈর্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

'না—না, —তাড়াহুড়ো করাটা ঠিক হবে না, সার্জেন্ট, লোকটা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। গুলিটা আর একটু বাঁদিক ঘেঁষে গেলেই—।' শান্ত ভদ্র কণ্ঠস্বর—সম্ভবত ডাক্তারের।

'তাই নাকি! আমার তো মনে হয়, আমার দাওয়াই খাওয়ার পর ওর মনে হবে, গুলিটা একটু বাঁদিকে ঘেঁষে গেলেই ওর পক্ষে ভালো ছিল—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—।' হায়েনার হিংস্র হাসি ভেসে এল সার্জেন্টের গলা দিয়ে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি। চোখ পিটপিট করে তাকালাম। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন লোক। প্রথমজনের চেহারা মেদবহুল, মুখে প্রশান্তির ভাব। গায়ে একটা সাদা আলখাল্লা।—এ শালাই তাহলে ডাক্তার।

দ্বিতীয়জন ছোটখাটো পাহাড়ের মতো। ভোঁতা নাক, পাতলা, ঠোঁট, আর ছোট ছোট হিংস্র চোখ। পরনে তেলচিটে ময়লা পোশাক। কিন্তু তার টুপি পরার ধরন দেখেই বুঝলাম, এ ব্যাটা নিঃসন্দেহে পুলিশের লোক —।

চুপচাপ শুয়ে বুকের যন্ত্রণা সহ্য করছি—হঠাৎ মনে পড়ল রয়ের কথা! শেষ পর্যন্ত ও কি পালাতে পেরেছে? ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

অবশ্য রয় আমার মতো ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েনি। বরং বুদ্ধিমানের মতোই উপরে ছুটেছিল। আর আমি গাঁথার মতো দৌড়েছিলাম নীচে—সোজা পুলিশের হাতে।

রয় যদি ঠিকমতো সবার অলক্ষ্যে অ্যাশলি আর্মস ছেড়ে পালাতে পেরে থাকে, তবে ওর আর জড়িয়ে পড়ার কোন ভয় নেই। কারণ কুপারের টাকা প্রথম দিন আমিই দেখেছিলাম, দ্বাররক্ষীর সঙ্গে গল্প করেছিলাম আমিই, এবং আমাকেই সিঁড়ি ভেঙে উন্মাদের মতো ছুটতে দেখেছে লোকেরা। সুতরাং রয় সম্পূর্ণ বিপদ-মুক্ত।

তারপরেই মনে হল সেই 'ঠকাস—' শব্দটার কথা। ভাবতেই পারিনি, রয় ঐ ভারী ফুলদানিটা ওরকম আসুরিক শক্তিতে বসিয়ে দিতে পারবে কুপারের মাথায়।

এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। কুপারের কি হল? ব্যাটা টেঁসে যায়নি তো—?'

হঠাৎ একটা বিশ্রী ঘামের গন্ধে আর তামাকের ধোঁয়ায় চমকে উঠলাম। এত কাছে গন্ধটা—ধীরে ধীরে চোখ খুললাম—আমার সামনেই সার্জেন্টের হিংস্র লালচে মুখ।

দেখলাম, ঘরে ডাক্তার নেই অর্থাৎ আমরা দুজন একা।

সার্জেন্টটি তার বীভৎস মুখ আরো নামিয়ে আনল, 'ঢের হয়েছে! এবার দয়া করে মুখ খুলুন দেখি, বাবা যুধিষ্ঠির! আপনার শ্রীমুখের বাণী শোনার জন্য গত দুদিন ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি!—নে শালা, চটপট মুখ খোল!' নেকড়ের মতো দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল সে। তামাকে কালো হয়ে যাওয়া চকচকে দাঁতের সারি কিড়মিড় করে উঠল।—শুরু হল পুলিশের হাতে নরক-যন্ত্রণা।

ওদের একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কাজটা আমি একা করিনি। তাই হাজার রকম প্রশ্ন করে, ভয় দেখিয়ে, আমার মুখ থেকে সে-কথাটা বের করতে চাইল। কিন্তু আমি ঘাড় নেড়েই চললাম। কারণ, ওদের কথা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম, রয়ের উপস্থিতির কোন প্রমাণই পুলিশের হাতে নেই। এমনকি কুপারের খুনের দায়ে আমাকেই পড়তে হবে বলে ভয় দেখালেও, আমি মুখ খুললাম না।

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ওরা ক্ষান্ত হল। এ কথাও জানাল, কুপার সেরে উঠেছে। কুপারের সেরে ওঠাটা, ওরা যে ভালো চোখে দেখছে না, সেটা বুঝতে কষ্ট হল না। কারণ ও বেঁচে যাওয়ার জন্যই, আমি

গ্যাস-চেম্বারের হাত থেকে রেহাই পেলাম।

'কুপার বেঁচে গেছে বলে ভেব না, তুমি বেঁচে যাবে।' সার্জেন্ট দাঁত খিঁচিয়ে আমার দিকে তাকাল, 'ওই আঘাতে কুপার মারাও যেতে পারত।—তবে ঘাড়বার কোন কারণ নেই বাছাধন, তোমার দশ বছরের ঘানি ঘোরানো কেউ রুখতে পারবে না—হাঃ হাঃ—' হায়েনা-হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর বিশাল দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

হাসপাতাল থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল জেল-হাজতে।

সেখানে তিন মাস কাটানোর পর জানতে পারলাম, কুপার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, বেশ বহাল তবিয়তেই সে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবে।

ক্রমে এগিয়ে এল বিচারের দিন। দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে, কোনদিন ভুলব না।

আদালতে এসে চারদিকে চোখ বোলালাম। যদি কোন পরিচিত মুখ নজরে পড়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল, দর্শকদের ভিড়ে জ্যানি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই, ও হেসে ফেলল। খুব অবাক হলেও, মুখে একটা চেষ্টাকৃত হাসি ফুটিয়ে তুললাম। সত্যি—আর যেই আসুক না কেন, ভাবতেই পারিনি, জ্যানি এখানে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

তারপরই চোখ পড়ল, আমার বস—ফ্রাঙ্কলিনের উপর আর তার পাশে ভিজে বেড়ালের মতো চুপটি করে বসে আছে রয়।

রয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হল। ওর মুখ পাণ্ডুর, এ তিন মাসে চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। হয়তো দিনরাত খালি ভেবেছে ওর নাম আমি পুলিশকে জানিয়েছি কিনা।

এবার চোখ ফেললাম বিচারপতির দিকে। হাড়-বের-করা মুখ। কোটরগত অনুভূতিহীন চোখ। সারা মুখ জুড়ে একটা অদ্ভুত কাঠিন্য।

কেন জানি না, হঠাৎ মনে হল, এর হাত থেকে আমার আর নিস্তার নেই! দেখলাম, শাস্তির কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে আসছে কুপার। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, চোখমুখ বিবর্ণ, আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে।

কুপার শপথ নিল। তারপর সিন্দুক খোলার জন্য আমাকে ডেকে পাঠানো থেকে শুরু করে,—নকল চাবির কথা, ওকে আক্রমণ করার কথা—একে একে সব বলে গেল। কিছুই বাদ দিল না।

এরপর কাঠগড়ায় এসে উপস্থিত হল, কুপারের ফ্ল্যাটে দেখা সেই মেয়েটি। ওর পরনে একটা চাপা আকাশ-নীল পোশাক। আদালতের সমস্ত লোক, এমনকি বিচারপতি পর্যন্ত ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মেয়েটির বিবৃতি থেকে জানা গেল, ও কুপারের একটা নাইট-ক্লাবে গান গায়। সেদিন একটা গানের রিহার্সাল দিতে ও কুপারের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল, এরকম ও মাঝেমধ্যেই যায়। গানের না কিসের রিহার্সাল, সেটা দর্শকরা বেশ ভালোই বুঝতে পারল। সম্ভবত কুপারকে হিংসাও করতে লাগল মনে মনে।

সেদিন কুপার ফোন ধরতে পাশের ঘরে গেলে, আমি যে সিন্দুক খুলে টাকাগুলো দেখেছিলাম, সে-কথার উপর মেয়েটা একটু বেশি জোর দিল।

কিন্তু ফ্রাঙ্কলিনের সাক্ষ্য আমাকে অবাক করল। তিনি কাঠগড়ায় উঠে আমার প্রশংসাই করলেন। আমি যে তার কোম্পানির একজন বিশ্বাসী ও সুদক্ষ কর্মচারী, সে-কথা তিনি বিচারপতিকে বার বার জানালেন। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, ফ্রাঙ্কলিনের কথা তার এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার উকিল উঠে দাঁড়িয়ে, আদালতের কাছে আমার জন্য করুণা ভিক্ষা করলেন। অর্থাৎ, এই আমার প্রথম অপরাধ। সুতরাং বিচারপতি যেন শাস্তির ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখেন। তাঁর কৃপা-প্রার্থনার ভঙ্গি দেখে মনে হল, আমি দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে তিনি বেশ আনন্দিত হয়েছেন। তারপর তিনি চেয়ারে বসে কতকগুলো কাগজপত্র ওল্টাতে লাগলেন। দূর থেকে তার লেখাগুলো পড়তে না পারলেও, আমি বাজি রেখে

বলতে পারি, ওগুলো তাঁর পরবর্তী মামলার নথি। এক কথায় উকিলটি বেশ বুদ্ধিমান। আমার মামলা নিয়ে ফালতু সময় নষ্ট করে যে আর লাভ নেই, সেটা তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন।

এরপরই কানে এল বিচারপতির গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'শেট কারসন, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বিচার করে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, তুমি দোষী। এ-বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। যেহেতু এটাই তোমার প্রথম অপরাধ, সেহেতু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে লঘুদণ্ড দিতে আমি আইনসঙ্গতভাবে বাধ্য। তুমি যেভাবে মি. হেনরি কুপারকে আক্রমণ করেছ, তাতে তোমার হিংস্র মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভুলে যেও না, তোমার আঘাতে মি. কুপার মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারতেন।

'এছাড়া, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানির সুনাম তুমি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছ, কারসন! যে কোম্পানিতে তোমার বাবা এবং ঠাকুর্দা বিশ্বস্তভাবে কাজ করে গেছেন, তুমি তাদেরই বংশধর হয়ে এই হীন-কাজ করেছ, একথা ভাবতেও তাঁরা লজ্জাবোধ করবেন—'

বিচারপতির কোন কথাই আমার কানে ঢুকল না। আমি শুধু ব্যাটার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম শেষ লাইনটার অপেক্ষায় যেটা আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী। অর্থাৎ ক'বছর? পাঁচ—দশ—না পনেরো?

'—সমস্ত বিচার করে আমি তোমাকে ফার্নওয়ার্থ বন্দীশিবিরে দশ বছরের নির্বাসন দণ্ড দিলাম।' বিচারপতি উঠে দাঁড়ালেন।

থর থর করে কাঁপতে লাগল আমার পা দুটো। ফার্নওয়ার্থ?! ওঃ—ভগবান! আমি—আমি তো একথা কল্পনাও করিনি! মনে হল গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠি—দোহাই হুজুর, আমাকে কুড়ি—পঁচিশ—যত বছর খুশি কারাদণ্ড দিন! কিন্তু ফার্নওয়ার্থ—না—না—না!

প্রচণ্ড ক্ষোভ আর আফসোসের রুদ্ধ কান্না যেন সমস্ত সত্তাকে ভেঙে খান খান করে দিল। আগামী দশটা বছরের কথা চিন্তা করে, হৃৎপিণ্ড আতঙ্কে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল।—উঃ—! মাথা রাখলাম কাঠগড়ার রেলিঙের উপর।

হঠাৎ এক অদ্ভুত চিন্তা ভেসে উঠল আমার ভয়ার্ত হৃদয়ে। রয়—রয়ই তো এসবের জন্য দায়ী! ও যদি কুপারকে না মারত, তাতে তো আমাকে ফার্নওয়ার্থে যেতে হত না। হয়ত পাঁচ বছর জেল খেটেই রেহাই পেতাম!—শুধু রয়ের জন্যই আজ আমাকে ফার্নওয়ার্থে যেতে হচ্ছে।

এখনও সময় আছে, কারসন,—মন বলে উঠল, বিচারপতিকে রয়ের নাম বলে দাও। এ ছাড়া তোমার মুক্তির আর-কোন পথই খোলা নেই—

মন স্থির করে নিয়ে এক ঝটকায় সিধে হয়ে দাঁড়ালাম। মুখ তুলতেই চোখ পড়ল রয়ের চোখে। ফ্রাঙ্কলিনের পাশে সোজা হয়ে, রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে রয়। আতঙ্ক-উৎকণ্ঠায় ওর মুখ মৃতের মতো বিবর্ণ, সমস্ত রক্ত কেউ যেন শুষে নিয়েছে। রয়ের দিকে চেয়ে আমার মনে পড়ল আমাদের ছেলেবেলার কথা। সেই যখন আমরা একসঙ্গে সুকলে যেতাম—গাছ থেকে ফল পাড়তাম—মাছ ধরতাম। এমনি আরও কত ছোট ঘটনা ছবির মতো ভেসে উঠল মনের পর্দায়।—রয়ই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু—এবং এখনও আছে। ওর দিকে চেয়ে আশ্বাসের হাসি হাসলাম। বোঝাতে চাইলাম, 'তোর কোন ভয় নেই রে, রয়! যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, এতটুকু বিপদের ছোঁয়া তোর গায়ে লাগতে দেব না।—আচ্ছা রয়,—মনে পড়ে, একবার আমরা পাশের সেই জঙ্গলটায় শিকার করতে গিয়েছিলাম? তারপর—অবাধ্য চোখের জল গাল বেয়ে পড়ল। রয়েরর দিকে চেয়ে হেসে হাত নাড়লাম। ওর মুখ ঝাপসা হয়ে এল।

পিছন থেকে কে যেন একটা ধাক্কা মারল, 'এই চল্ চল্—।' তাকিয়ে দেখি একজন কনস্টেবল। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম আদালত ছেড়ে। শেষবারের মত জ্যানির দিকে তাকালাম। ও কাঁদছে—। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সত্যিই ও আমার জন্য কাঁদছে—! জ্যানি! ডুকরে কেঁদে উঠলাম। জলভরা চোখে ফিরে তাকালাম রয়ের

দিকে। ওর চোখেও জল। মুখে কৃতজ্ঞ হাসি। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, ও মুক্ত—আমি ওকে রেহাই দিয়ে গেলাম।

বোধহয় মুহূর্তের জন্য নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কনস্টেবলের ধাক্কায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এগিয়ে চললাম। স্পষ্টই দেখতে পেলাম, সামনে অপেক্ষা করছে অন্ধকার ভবিতব্য আর অসীম নরকযন্ত্রণা—ফার্নওয়ার্থ—! রক্তজমানো একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া দিয়ে। ইচ্ছে হল, কনস্টেবলের হাত ছাড়িয়ে এখুনি ছুট লাগাই—কিন্তু—।

একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেলাম—আমার বন্ধু রয়ের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমি ওকে বাঁচাবার সুযোগ দিয়েছি। নিজের বিবেকের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। পরিষ্কার অনুভব করলাম ঃ এই একটা কথাই আমাকে ফার্নওয়ার্থের নরক-যন্ত্রণায় সান্ত্বনা দেবে। —রয়ের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি—ও আমার বন্ধু ছিল—আছে—এবং থাকবে—।

জমাট দুঃস্বপ্নের কুৎসিত নরক এই ফার্নওয়ার্থ বন্দীশিবির।

কাগজপত্রে এর বীভৎসতা নিয়ে বহুবার লেখালেখি হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানকে বারংবার অনুরোধ করা হয়েছে, এই অমানুষিক বন্দীশিবির বন্ধ করার জন্য। তিনি ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। ভাবতে ভাবতে বছর তিনেক এর মধ্যেই পার হয়ে গেছে। কিন্তু রাষ্টপ্রভধানের 'ভেবে দেখা' আজ আজও শেষ হয়নি।

জার্মান-সৈন্যরা নাৎসী বন্দীশিবিরের জন্য আজও বিখ্যাত। সেখানে তারা অকথ্য অমানুষিক অত্যাচরের যেসব উপার বের করেছিল, তা শুনে আজও সাধারণ মানুষের বুক কেঁপে ওঠে।

কিন্তু এহেন কুখ্যাত নাৎসী বন্দীশিবিরকেও হার মানতে হয়েছিল ফার্নওয়ার্থের কাছে। এর বীভৎসতা নাকি কল্পনা করা যায় না।

খবরের কাগজে লেখা প্রবন্ধগুলো আমি পড়েছিলাম। সে-লেখার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তবে ফার্নওয়ার্থকে নরক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সাধারণ জেলের মতো ফার্নওয়ার্থের চারদিকে বিশাল উঁচু পাঁচিল এবং কয়েদীদের কুঠরি আছে, একথা ভাবলে ভীষণ ভুল করা হবে। ওসবের কোন বালাই ফার্নওয়ার্থের নেই। এখানে কয়েদখানা বলতে, ধু-ধু করছে এক বিশাল তেপান্তরের মাঠ—তার মাঝে একটা ঘর। পঞ্চাশ ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া। ঘরে ঢোকবার একটাই দরজা। নিরেট লোহার তৈরি। এছাড়া মোটা লোহার গরাদ বসানো একটা ছোট্ট জানলা আছে—তাও প্রায় মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে। সেটা দিয়ে যা আলো আসে, তা আর কহতব্য নয়।

পাহারাদার হিসেবে দিনের বেলায় আছে বন্দুক-বাজ প্রহরী দল এদের মধ্যে ছ-জন অশ্বারোহী। তাদের শক্তিশালী রাইফেল দিয়ে দু-মাইল দূর থেকেও লক্ষ্যভেদ করা যায়।

বাইরের মাঠে লুকোবার ছিটেফোঁটা জায়গাও নেই। দূরে—বহুদূরে দেখা যায় এক চিলতে রুপোলী রেখা—নদী। তার তীরে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত নলখাগড়ার ঝোপ। এছাড়া আর-কিছু চোখে পড়ে না। অর্থাৎ দিনের বেলা যদি কেউ ফার্নওয়ার্থ থেকে পালাবার চেষ্টা করে, তবে পিছন পিছন হাওয়ার বেগে ধেয়ে যাবে ঘোড়ার চড়া প্রহরী। চারদিকের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ছুটে যাবে রাইফেলের গুলি—ফটাস—। নাঃ—দিনের বেলা ফার্নওয়ার্থ ছেড়ে পালানো অসম্ভব।

আর রাতের প্রহরী? রাতের প্রহরী একপাল রক্তলোলুপ, হিংস্র শিকারী কুকুর। তাছাড়া কয়েদীদের পায়ে তলা দিয়ে লাগানো থাকে ভারী লোহার শেকল।

এ সব জেনেও, প্রথমদিন ফার্নওয়ার্থে পা দিয়েই ঠিক করলাম, যেভাবেই হোক এই জীবন্ত নরক ছেড়ে আমাকে পালাতেই হবে। এখানে দশ বছর থাকলে, আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব। এই নরককুণ্ডে দশ বছর

কাটানোর চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভালো—নাঃ—পালাতে আমাকে হবেই—সে যেমন করেই হোক—কিন্তু কেমন করে?—

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে গেল। দশ-দশটা বীভৎস দুঃস্বপ্নের দিন! সকাল হলেই প্রহরীরা এসে আমাদের নিয়ে যায় মাঠে। প্রত্যেকের নাম ডাকা হয়ে গেলে পোশাক ছেড়ে খালি গায়ে আমাদের যেতে হয়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সাতাত্তর জন বিভিন্ন চেহারার কয়েদী, সার বেঁধে এগিয়ে চলেছি—আর আমাদের দু-পাশে ঘোড়ার চড়ে তিনজন করে ছ-জন প্রহরী।

এরপর চলে পাথর ভাঙার কাজ। কাটফাটা রোদ্দুরে, খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাঙতে হয় পাথর। দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই ছ-জন ঘোড়ায়চড়া প্রহরী। এছাড়া আর যে ছ-জন আছে, তারা পায়চারি করে বেড়ায়, হাতে তাদের শঙ্করমাছের লেজ দিয়ে তৈরি লিকলিকে চাবুক। কারো কাজে সামান্যতম ঢিলেমি দেখলেই, সেই চাবুক সপাং করে এসে আছড়ে পড়ে তার পিঠে। চামড়া কেটে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ে। উঃ—কি পৈশাচিক!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের পর, শ্রান্ত ক্লান্ত আমরা, রক্তাক্ত দেহে ফিরে চলি, কয়েদখানার দিকে—তেলচিটে পোশাকে, শ্লথ পায়ে, টলতে টলতে। বেলা শেষের আলো ক্রমশই স্তিমিত হতে থাকে। তারপর একসময় চিল তার ডানা থেকে রোদ্দুরের গন্ধ মুছে ফেলে আশ্রয় নেয় নীড়ে। চারদিকে কেমন একটা শ্রান্ত অথচ স্নিগ্দভাব ফুটে ওঠে। দূরের কোন গির্জা থেকে ভেসে আছে—ঢং—ঢং—ঢং সাতটা বাজে। ঠিক সেই কন্যাসুন্দর বেলায় ফার্নওয়ার্থকে ততটা নৃশংস মনে হয় না—।

কিন্তু সামনে পড়ে থাকা লম্বা রাতের কথা ভেবে শিউড়ে উঠি। রাত কাটানোর কথা চিন্তা করলেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে আতঙ্কে। কারণ ফার্নওয়ার্থের দিনগুলো যেমন বীভৎস, তার চেয়ে ভয়াবহ এর রাতগুলো!

কয়েদখানার ভিতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে, দেওয়ালে গাঁথা, লোহার জালের তৈরি শোবার তাক। একটার নীচে একটা—এরকম অসংখ্য তাক। ঘরে টিমটিম করে জ্বালা থাকে কয়েকটা মাত্র লণ্ঠন। যার আলো কয়েদখানার পরিবেশকে আরো করে তোলে ভয়ঙ্কর। লোহার জালের ছায়াগুলো, ঘরের নোংরা তেলচিটে দেওয়ালে কেঁপে উঠে একটা অমানুষিক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে।

সাতাত্তর জন কয়েদীকে গরু-ছাগলের মতো ঢোকানো হয় সেই ঘরে। দুর্গন্ধে ভরে ওঠে গোটা ঘরটা। স্নানের অভাবে আর অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রত্যেককেই তখন পাগলের মতো দেখায়। একরাশ ধুলো-ভরা মাথার চুলে জট, গালভরা খোঁচাখোঁচা দাড়ি-গোঁফ। চোখে-মুখে হতাশা।

যে যার তাকে উঠে পড়ে শোবার আশায়। অবশ্য যদি সেটাকে শোওয়া বলা যায়। প্রহরীরা এগিয়ে এসে প্রত্যেকের পায়ে শেকল লাগিয়ে তালা এঁটে দেয়। তারপর লণ্ঠনগুলো নিয়ে তারা চলে যায়। রেখে যায় ঘরভর্তি জমাট, নিঃসীম অন্ধকার।

তার বের করা লোহার জালের উপরেই গা এলিয়ে দিতে হয়। এতটুকু নড়বার উপায় নেই। কারণ প্রত্যেকের পায়ের শেকলই একটা বিরাট লম্বা শেকলের সঙ্গে বাঁধা। এই বিরাট শিকলটা, কয়েকটা আংটার সাহায্যে, সেই পঞ্চাশ ফুট লম্বা ঘরের চার দেওয়ালের গায়ে আটকানো—এমনভাবে, যে কেউ যদি একটুও নড়াচড়া করে, তবে বড় শেকলের টান পড়ার জন্য, অন্যান্য সমস্ত কয়েদীর পায়েই টান পড়বে, এবং তাদের ঘুম ভেঙে যাবে। নরকেও বোধ করি এর চেয়ে আরামে থাকা যায়!

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর, ঘুমের ঘোরে কোন কয়েদী যদি আচমকা পাশ ফেরে, তবে শেকলে টান পড়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ার জন্য, পাশের কয়েদী হিংস্রভাবে তার সঙ্গে মারামারি শুরু করে দেয়। ক্রমে এক তাক থেকে আরেক তাকে ছড়িয়ে পড়ে সেই মারামারি। ওই অন্ধকারেই, পা-বাঁধা অবস্থায়, যে যার তাকে

বসেই অন্যকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি ঘুঁষি চালায়। আঁচড়ে, কামড়ে, গলা টিপে, তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো লড়াই করে চলে। অন্ধকারেই ভেসে আসে গর্জন,—আর্তচিৎকার—হাঁপানির শব্দ—।

না, প্রহরীরা এসব মারপিট নিয়ে একদম মাথা ঘামায় না। যদি কেউ মরে যায়, তবে ভোরবেলা এসে, ওরা সেই লাশটাকে একটা জায়গায় নিয়ে ফেলে দেয়। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লাশটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে শেষ করে দেয় শকুনের দল। অর্থাৎ ফার্নওয়ার্থ থেকে বেঁচে ফেরার আশা আর নেই!

সুতরাং পালাবার চিন্তাটা মনের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে লাগল।

ফার্নওয়ার্থে রক্ষীর সংখ্যা মোট বারোজন। রাত হলে ওরা সকলেই ঘরে ফিরে যায়—শুধু একজন বাদে। তার নাম বাইফ্লিট। ওর কাজ, কুকুরগুলোকে দেখাশোনা করা। বাইফ্লিটের চেহারায় এমন একটা আদিম হিংস্র ভাব আছে যে রক্ত-লোলুপ হাউন্ডগুলো পর্যন্ত ওকে দেখলে ভয় পায়।

দিনের বেলা কুকুরগুলো একটা বড়সড় লোহার খোঁয়াড়ে বন্ধ থাকে। আর ওদের খাওয়ানো হয় দিনে মাত্র একবার। যার জন্য হাউন্ডগুলো বাঘের চেয়েও হিংস্র হয়ে থাকে।

রাত আটটার সময় অন্য প্রহরীরা চলে গেলে বাইফ্লিট পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কুকুরের খোঁয়াড়ের দিকে। ওর হাতে তখন থাকে একটা ভারী মোটা লাঠি। সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে ও গিয়ে খুলে দেয় খোঁয়াড়ের দরজা। একে একে বেরিয়ে আসে হিংস্র হাউন্ডের দল। ওদের ক্ষুধার্ত, হিংস্র শ্বাপদের মতো চোখ ধকধক করে ওঠে রক্ত লালসায়।

বাইফ্লিটের চেহারা চৈত্যের মতো বিশাল, শুয়োরের মতো বীভৎস, কুৎসিত মুখ, নিশাচরের মতো জ্বলজ্বলে চোখ। রাত্রিবেলাটা যেন ওরই রাজত্ব। খেয়ালখুশিমতো ও কুকুরগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কারোর সাহস হত না, সেই রাজত্বে অনধিকার প্রবেশ করে।

ভোর সাড়ে চারটের সময় বাইফ্লিট কুকুরগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ওদের খোঁয়াড়ে। তারপর অন্যান্য প্রহরীরা আসে তাদের দৈনন্দিন প্রহরায়।

ঘুম আমার আসে না। তাই রাতের পর রাত জেগে কাটাই, আর শুনি ক্ষুধার্ত সারমেয়দলের রক্ত-হিম করা গর্জন। তখন ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় আমার পালাবার স্বপ্ন। ইস্—শুধু যদি কুকুরগুলো না থাকত, তাহলে —

পায়ের তালা-লাগানো শেকল বা ঘরের লোহার দরজা এ দুটোর কোনটাই আমার কাছে কোন সমস্যা নয়। কারণ প্রথম রাতেই, আমার লোহার জাল দিয়ে তৈরি শোবার তাক থেকে অতিকষ্টে ইঞ্চিতিনেক লম্বা একটুকরো তার ভেঙে রেখেছিলাম। আঙুল কেটে রক্ত বেরোলেও মন ভরে গিয়েছিল আনন্দে। ওই তার এবং সামান্য সময় পেলে, ফার্নওয়ার্থের যে-কোন তালাই আমি খুলে ফেলতে পারি। সিন্দুক কোম্পানি আমার মন ভরার মতো পয়সা নিতে দিতে পারলেও, পৃথিবীর কঠিনতম তালা কিভাবে খুলতে হয়, সেটা শিখিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকেই পালাবার চিন্তাটা আরো জমাট বেঁধেছে আমার উর্বর মস্তিষ্কে। বারবার মনে হয়েছে, তালা খুলে ছুটে পালাই। রক্ষীদের গুলি খেয়ে যদি মরেও যাই, কোন দুঃখ নেই কিন্তু এই ফার্নওয়ার্থ আমার পক্ষে অসহ্য! আমি পাগল হয়ে যাব!

রাতে শুয়ে শুয়ে পালাবার কথা চিন্তা করলেই, শুনতে পাই হাউন্ডগুলোর হিংস্র গর্জন। নাঃ—যে করে হোক এই কুকুরগুলোকে বোকা বানাতেই হবে। নয়তো পালানো অসম্ভব! দিনরাত খালি ভাবি, কিভাবে কুকুরগুলোর একটা ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু নিরেট মাথা থেকে কিছুই আর বেরোয় না।

রোজ ভোরবেলা নাম-ডাকার সময়, খোঁয়াড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অসহায় ভাবে অর্ধভুক্ত কুকুরগুলোর দিকে চেয়ে দেখি। আমাদের দেখেই ওরা শিকার দেখার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ধোঁয়াড়ের গরাদের রগায়ে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা দৃশ্য—একটা লোক রাতের অন্ধকারে ছুটছে আর তার পিছন পিছন নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলছে দশটা হাউন্ড! মুহূর্তের মধ্যে কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। দাঁতে নখে ফালা ফালা করে ফেলল তার দেহ।—ওঃ—কি ভয়ানক!

ফার্নওয়ার্থে প্রায় একমাস কাটানোর পর মুশকিল আসান হল। সমাধান হল সারমেয়-সমস্যার।

আমাকে বাইরের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে ঢোকানো হল রান্নাঘরের কাজে। সেখানে আমাকে জল তুলতে হয়, বাসন মাজতে হয়, মসলা পিষতে হয়—মসলা বলতে শুধু মরিচ।

প্রত্যেকটি কয়েদীই ভয় করে এই কাজটাকে। এর চেয়ে বাইরে পাথর ভাঙাই ওদের কাছে শ্রেয়ঃ মনে হত।

বন্দীদের জন্য যা খাবার তৈরি হয়, তা আর বলার নয়। রোজ দু-বেলা একই খাবার চলে। অখাদ্য পচা আলুর পাতলা ঝোল, আর তার মধ্যে ভাসছে আধপচা বাসী মাংসের ডেলা। অসহ্য গরম এবং রান্না-করা খাবারের বিটকেল দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। তবুও ওর মধ্যেই ঠায় দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। সে এক বিশ্রী অভিজ্ঞতা।

মাংসের পচা গন্ধটাকে চাপা দেওয়ার জন্য, পাচক ওই ঝোলের মধ্যে প্রাণভরে মরিচ ঢালে। কিন্তু তবু কি সেই পচা বিটকেল গন্ধকে চাপা দেওয়া যায়?—একদিন এই মরিচ পিষতে পিষতেই কুকুরগুলোকে বোকা বানানোর মতলব আমার মাথায় এল।—সত্যি,—ভাগ্যিস এই রান্নাঘরের কাজটা আমাকে দিয়েছিল,—তা সে যত খারাপরই হোক! মনে মনে বেশ উৎসাহ পেলাম। এতদিনে খুঁজে পাওয়া গেল একটা উপায়ের মতো উপায়।

পরপর কয়েকদিন, রান্নাঘরের কাজ সেরে কয়েদখানায় ফেরার সময় লুকিয়ে পকেটভর্তি করে মরিচের গুঁড়ো নিয়ে এলাম। পাচক ব্যাটা জানতেই পারল না। সেই মরিচকে একটা ছোট পুঁচলি করে, আমার শোবার তাকের এককোণায় লুকিয়ে রাখলাম। কারণ এই মরিচই এখন আমার প্রাণ।

এইভাবে পালাবার পথে দু-ধাপ এগিয়ে গেলাম। প্রথমত, দরজা খুলতে আমার অসুবিধে হবে না। আর দ্বিতীয়ত, কুকুরগুলোকে অনুসরণ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছে মরিচ। অতএব এ দুটো জিনিসের সাহায্যে আমি মাঠ ছাড়িয়ে অন্তত দূরে নদীর কাছে পৌঁছতে পারব। আর তারপর লুকোবার জন্যে নদীর পারেই তো রয়েছে ঘন নলখাগড়ায় ঝোপ। সুতরাং ফাঁকা মাঠ পার হয়ে নদী পর্যন্ত আমাকে পৌঁছতেই হবে। তারপর ভরসা ওই নলখাগড়া।

কিন্তু কুকুরগুলো যদি পালাবার সময় আমাকে দেখতে পায়, তবে আর মরিচ-ফরিচ দিয়ে কোন কাজই হবে না—ছুটে এসে ওরা আমাকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু কোনরকমে যদি ওই হিংস্র জীবগুলোর অলক্ষ্যে পালাতে পারি, তবেই মরিচে কাজ হবে। কারণ মরিচের উগ্রগন্ধে, কুকুরগুলো আমার গন্ধ আর পাবে না ওদের অনুসরণের হাত থেকে রেহাই পাব।

হাউন্ডগুলোর অলক্ষ্যে আমাকে নদী পর্যন্ত পৌঁছতেই হবে। কিন্তু কী করে—? শুধু এই প্রশ্নের উত্তর জানতে পারলেই আমি পালাতে আর দ্বিধা করব না।

ভাবতে ভাবতে চার রাত্তির পার হয়ে গেল। কোন সমাধানেই পৌঁছতে পারলাম না। তারপর একদিন—রয়ের কাছ থেকে শেখা, দারোয়ানকে পটানোর বুদ্ধির কথা মনে পড়ল—আর দেরি করলাম না।

পরদিন সকালে রান্নাঘরে পৌঁছেই রাধুঁনি ব্যাটার সঙ্গে সুযোগ বুঝে

সুখ-দুঃখের গল্প জুড়ে দিলাম। লোকটা এই পচা রান্নাঘরের পচা মাংস রেঁধে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আমার জানবার ছিল শুধু রাতের প্রহরায় ব্যাপারটা—বাইফ্লিটের গতিবিধির কথা। ওর থেকেই কায়দা করে জেনে নিলাম।

প্রতিদিন রাত আটটায় অন্যান্য প্রহরীরা বাইফ্লিটের ঘাড়ে সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে ঘুমোতে চলে যায়। বাইফ্লিট কয়েদখানার দরজায় তালা দিয়ে, খোঁয়াড়ে গিয়ে কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেয়। তারপর এগিয়ে যায় অদূরেই অবস্থিত একটা ছোট্ট কুড়েঘরের দিকে। সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়ে—সম্ভবত ঘুমিয়েও পড়ে। কারণ দশ-দশটা হিংস্র জীব সেখানে পাহারা দিচ্ছে, যেখানে মানুষের আর কী দরকার?

রাত পৌনে চারটের সময় বাইফ্লিট কুড়েঘর ছেড়ে বেরিয়ে রান্নাঘরে যায়। সেখানে কুকুরগুলোর জন্যে দুটো ঝুড়িতে মাংসের ছাঁট রাখা থাকে। সেই ঝুড়ি দুটো নিয়ে বাইফ্লিট খোঁয়াড়ে যায়। কুকুরগুলোও ওকে অনুসরণ করে। খোঁয়াড়ের ভিতর ঢোকার পর ওদের খাওয়া শুরু হয়।

রাঁধুনির কথামতো, শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই কুকুরগুলোর বীভৎস চিৎকার। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করার ফ্যাঁসফ্যাঁসে চাপা গর্জন শুনে বুঝতে পারি, ওরা মাংসের টুকরো নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। আর মাঝে-মধ্যে শোনা যায় বাইফ্লিট ওদের ধমক দিচ্ছে। কেঁউ কেঁউ চিৎকার শুনলেই বুঝি, বাইফ্লিট লাঠি দিয়ে প্রয়োজন মতো ওদের ঠ্যাঙাচ্ছে। এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর চারটে কুড়ির সময় ও খোঁয়াড় বন্ধ করে দেয়। তারপরেই শোনা যায় বৈদ্যুতিক বাঁশির কানফাটানো শব্দ—একবার-দুবার, এটা ছিল বাইফ্লিটের রোজকার সংকেত। অর্থাৎ, অন্যান্য রক্ষীদের জানানো কুকুরগুলো খোঁয়াড়ে ফিরে গেছে। সেই সঙ্গে কয়েদীরাও জেগে ওঠে—

এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। ঠিক করলাম, যখনই বাইফ্লিট পৌনে চারটের সময় কুকুরগুলোকে খাওয়াতে শুরু করবে, তখনই কয়েদখানার দরজা খুলে ছুট লাগাব—সোজা নদীর দিকে—।

পালাবার জন্য সময় খুবই কম পাওয়া যাবে বড়জোর আধঘণ্টা—কি তার চেয়েও কিছু কম। তবু তার মধ্যেই পালাতে হবে। এখনও পর্যন্ত আমার শরীর বেশ সুস্থ সবল আছে, তাছাড়া প্রচণ্ড জোরে ছুটতেও পারি। মাথা ঠিক রেখে দৌড়তে পারলে, নদী পর্যন্ত পৌঁছতে মিনিট কয়েকের বেশি সময় লাগবে না। তার পর থেকেই কুকুরগুলোকে ধোঁকা দেবার জন্য মরিচের গুঁড়ো কাজে লাগাব—তার আগে নয়।

প্রহরীরা যদি খুঁজতে বেরোয়, তখনকার মতো নলখাগড়ার ঝোপে গা ঢাকা দেব। তারপর যদি বরাত জোরে ওদের হাত থেকে রেহাই পাই, তবে আমার পথ চলা শুরু হবে। সকলেরই চোখ এড়িয়ে চলার পক্ষে, রাতের অন্ধকার আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এইভাবে, শুধুমাত্র রাতের অন্ধকারেই পথ চলে, পৌঁছতে হবে রেললাইন পর্যন্ত। জানি না ক-রাত লাগবে! ফার্নওয়ার্থ থেকে রেললাইনের দূরত্ব কুড়ি মাইল। সেখানে পৌঁছতে পারলে আর কোন ভয় নেই। যে-কোন একটা চলতি ট্রেনে সোজা গিয়ে নামব ওকল্যান্ডে। এই জেলার মধ্যে ওকল্যান্ডই সবচেয়ে বড় শহর। সেখানে লোকের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে আমার বেশি সময় লাগবে না।

কিন্তু এখনও একটা বিরাট সমস্যা আমার সামনে রয়েছে।

পায়ে লাগানো শেকলের তালা খুলতে আমার কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে। কিন্তু কয়েদখানার ভারী দরজা—উঁহু—ওটা তো আর অল্পসময়ে হবে না। ওই দরজা খোলার সময় অন্য কোন কয়েদী যদি জেগে উঠে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়?—আর সেই চিৎকার যদি বাইফ্লিট শুনতে পায় তাহলেই সর্বনাশ! তীরে এসে তরী ডুববে—। আর এছাড়াও নিজের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য,আরও একটা লোক আমার বিশেষ প্রয়োজন, যার পিছনে হাউন্ডগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করাব। কিন্তু কাকে?—নাঃ—এ ব্যাপারটার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—

পালাবার পথে এতটা এগিয়ে আমি কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে চাইছি না। প্রথম থেকেই যখন এত কষ্ট করে, এত নির্ভুলভাবে পালাবার জন্য তৈরি হয়েছি, তখন এই সামান্য সমস্যার নিখুঁত সমাধান না করে এক পা-ও এগোচ্ছি না। তা দু একদিন যদি দেরি হয় তো হোক!

হঠাৎ মনে হল বয়েডের কথা।—ওকে দিয়েই কাজ হবে!

প্রত্যেক কারাগারেই এমন একজন কায়েদী থাকে, যাকে অন্যান্য কয়েদীরা তার দৈহিক শক্তির জন্য ভয় পায়। মাস্তান গোছের আর কি! এখানেও এমনি একটি মাস্তান আছে। তার নাম জো বয়েড।

বয়েড লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির বেশি হবে না, কিন্তু চওড়ায় সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ। মুখভর্তি কাটা দাগ। সমস্ত ছুরির আঘাতেই হয়েছে। নাকটা মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো চ্যাপটা—মুখের উপর ছড়ানো, যেন লেপটে আছে। লোমশ ভুরু জোড়ার নিচে জ্বলজ্বলে কুতকুতে চোখ। মোটের উপর বয়েডের চেহারা অনেকটা গরিলার মতো। এবং গরিলার মতো শক্তিও রাখে দেহে।

ওর চেহারা দেখেই বোঝা যায়, বাকি কয়েদীরা কেন ওকে এত ভয় করে। বয়েডের শোবার তাক আমার ঠিক নিচেই। জানতাম, যদি ভজিয়ে ভাজিয়ে ওকে আমার সঙ্গে টানতে পারি, তবে দরজার তালা খোলার সময় কেউ যদি জেগেও যায়, বয়েডকে দেখলে আর চেঁচাতে সাহস করবে না।

কিন্তু বয়েডকে কি বিশ্বাস করা চলে?—ও যদি রাজি না হয়?—যদি ডেকে পাঠায় বাইফ্লিটকে?

বয়েডকে বোঝা মুশকিল। কারণ ও কারো সঙ্গেই কথা বলে না। সবসময় নিজের মনে চুপচাপ বসে থাকে। দু-একজন শক্তি দেখিয়ে ওর উপরে টেক্কা দিতে চেয়েছিল কিন্তু বয়েডের ঘুঁষি খেয়ে ঠান্ডা হয়ে গেছে। তাতে কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে কেউ আর ওর কাছ ঘেঁষে না।

ভাবতে ভাবতে অর্ধেক রাত হয়ে গেল। শুয়ে শুয়ে বয়েডের শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ শুনতে লাগলাম। ওকে কি বলব আমার মতলবের কথা? হাজার হলেও বন্দী তো! মুক্তির স্বাদগ্রহণের ইচ্ছে কি ওর হবে না? —কিন্তু—

রাত প্রায় দুটোর সময় ঠিক করলাম বয়েডকে বলব। এটুকু ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে, নয়ত পালানো অসম্ভব।

মনস্থির করে পায়ে লাগানো শেকলের তালা খুলে ফেললাম। উপুড় হয়ে লোহার জালের ফাঁক দিয়ে তাকালাম। নিকষ মিসমিসে অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না। শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে আর তেলচিটে দুর্গন্ধে বুঝলাম বয়েড ওর তাকে শুয়ে আছে।

'অ্যাই—বয়েড!' চাপা ফিসফিস স্বরে ওকে ডাকলাম।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারী শব্দ—বয়েড জেগেছে! এক ডাকেই ও উঠে পড়বে, ভাবতে পারিনি একটু অপেক্ষা করলাম—

'বয়েড! শুনতে পাচ্ছ?' অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও বুঝলাম ওর সন্দিগ্দ ঘন জ্বলজ্বলে চোখজোড়া আমারই দিকে চেয়ে আছে।

'কী ব্যাপার?' চাপা হালকা স্বরে ভেসে এল কথাগুলো।

'আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমি এখান থেকে পালাচ্ছি। তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে?'

'পা-লা-চ্ছ?' বয়েড যেন আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারছে না।

'হ্যাঁ, বাইফ্লিট যখন কুকুরগুলোকে খাওয়াতে শুরু করবে, তখন।—কি, আসবে?'

'তুমি কি পাগল! কয়েকখানা থেকে বেরোবে কেমন করে?'

'পায়ের শেকল আমি এর মধ্যেই খুলে ফেলেছি! তুমি রাজি থাকলে বল তোমারটাও খুলে দিই—আর দরজা? ওটা খুলতে আমার মিনিট দুয়েকের বেশি লাগবে না। তুমি কি আসছ?'

'কিন্তু বাইরের কুকুরগুলো?'

'বললাম না, বাইফ্লিট যখন কুকুরগুলোকে খাওয়াবে, তখন আমরা পালাবো।'

'কিন্তু পালিয়ে যাবটা কোথায়?'

'নদীর দিকে। সেখান থেকে রেললাইন। তারপর ভাগ্য ভালো থাকলে, কোন চলতি ট্রেনে উঠে—যাকগে, তুমি রাজি কিনা বল?' উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলাম।

‘এই শালার শেকলটা তুমি খুলতে পারবে।’ বয়েড শেকলটা ধরে আস্তে টান মারল।

‘হ্যাঁ—’

‘তাহলে আগে এটা খোল!’

তাকে ভর দিয়ে নিঃশব্দে মেঝেয় নামলাম। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে, হাত পড়ল বয়েডের পায়ে—ওর লোমশ পেশীবহুল পা—এই তো শোকলটা! তারের টুকরোটা দিয়ে কাজ শুরু করলাম। অন্ধকারে অসুবিধে হলেও, মিনিটখানেকের মধ্যেই তালাটা খুলে ফেললাম। শেকলটা খুলে ঠং করে জালের ওপর পড়ল।

তালাটা খুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই, দুটো উত্তপ্ত ঘামে ভেজা বলিষ্ঠ হাত এসে পড়ল আমার গায়ে। ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই, সেই থাবা আমার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করল। পরমুহূর্তেই একটা অসহ্য চাপা অনুভব করলাম গলায়। কানে এল বয়েডের চাপা গর্জন, ‘শোন্ শালা, যদি আমাকে বিপদে ফেলার কোন মতলব করে থাকিস, একেবারে খাল খিঁচে নেব!’ অন্ধকারেই চোখে পড়ল ওর সাদা ঝকঝকে দাঁতের সারি।

দমবন্ধ থাকায় বুকে বাতাস নেবার জন্য খাবি খাচ্ছিলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে ওর শক্ত হাতের বাঁধন ছাড়াবার চেষ্টা করলাম, ‘ফোট শালা গরিলার বাচ্চা! তুই না-যাবি তো সেকথা বল্—আমি তাহলে একাই যাব।’

আমার চাপা ক্রুদ্ধ হিসহিসে স্বরে বয়েড একটু থতিয়ে গেল। এরকম জবাব ও কারো কাছ থেকেই আশা করেনি। ওর হতভম্ব ভাবটার সুযোগে, এক ঝটকায় নিজেকে ছানিয়ে নিলাম। ফেরার উপক্রম করতেই, কানে এল, ‘অ্যাই—আমিও যাব!’

‘তাহলে শোন্, বাইরে বেরিয়েই আমরা একসঙ্গে নদীর দিকে ছুটব। সেখানে পৌঁছে দুজনে দুদিকে যাব। বাইফ্লিট সম্ভবত কুকুরগুলোকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেবে, কিন্তু কোনরকমে যদি নদীটা পার হতে পারি, তবে কুকুরগুলো আর আমাদের গন্ধ পাবে না—তুই সাঁতার জানিস?’

‘আমি কি জানি না জানি, সেটা তোকে ভাবতে হবে না, শালা।’ বয়েড খেঁকিয়ে উঠল, ‘তুই শুধু দরজাটা খুলবি, তারপর আমারটা আমি বুঝব।’

আর কথা না বাড়িয়ে শোবার তাকে উঠে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে গলায় হাত বোলাতে লাগলাম, আর অপেক্ষায় রইলাম আসন্ন মাহেন্দ্রক্ষণের।

ভোরের হালকা রুপোলী আলোর আভা, জানলা দিয়ে এসে পড়েছে কয়েদখানার দেওয়ালে। আর ঘণ্টাখানেক পরেই দরজার তালায় হাত লাগাব।

মরিচের পুঁটলিটা তাকের কোনা থেকে বের করে জামার ভিতর গুঁজে নিলাম। ভুলেও এর একটি কণা আমি বয়েডকে দিচ্ছি না। কুকুরগুলোকে বোকা বানাতে হয়তো এর প্রতিটি কণাই আমার কাজে লাগবে। এই মরিচের গুঁড়োর উপরেই নির্ভর করছে আমার মরণ-বাঁচন।

স্থিরচোখে চেয়ে আছি জানলার দিকে। কখন দেখতে পাব সোনালী রোদের আভা। কানে আসছে বয়েডের শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ।

হঠাৎ ওর ফিসফিসানি শুনতে পেলাম, ‘দরজাটা কি তুই সত্যিই খুলতে পারবি?’

আমি ঘুরে উপুড় হয়ে শুলাম, ‘কোন ভয় নেই, ঠিক খুলতে পারব।’

‘তোর কি মনে হয়, আমরা পালাতে পারব?’

‘এই নরকে দিন কাটানো ছাড়া, আমি সব-কিছু করতে রাজি আছি—তাছাড়া একবার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?’

‘হুঁ—’

অনেকক্ষণ চুপচাপ। কানে এল হাউন্ডগুলোর হিংস্র গর্জন। ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল।

‘ওই—ওই হাউন্ডগুলো—’ বয়েডের স্বর ভয়ে কাঁপছে।

‘বাইফ্লিট ওদের খাওয়াতে শুরু করলে, ওরা আর ঝামেলা করবে না।’

‘সেটা তুই ভাবছিস—কিন্তু যদি—’ বয়েডের গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। বুঝলাম, ও ভীষণ ভয় পেয়েছে। আশ্চর্য! বয়েডের মত বুনো গরিলা পর্যন্ত এই কুকুরগুলোকে ভয় পায়!

সময় যেন আর কাটতেই চায় না। এক একটা মিনিট মনে হয় এক এক ঘণ্টার সমান। ক্রমে অবসান হল উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার। কয়েদখানার ছোট্ট জানলা দিয়ে, ঘরের ভিতরে ঠিকরে পড়ল এক ফালি সোনালী রোদ। যতই সময় যেতে লাগল, ততই জোরালো হল সেই রশ্মি-রেখা। একসময় বুঝলাম, পালাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

মুঠো-করা হাত ঘামে ভিজে উঠেছে। উত্তাল হৃৎপিণ্ড আছড়ে পড়ছে বুকের খাঁচায়—ঢিপ—ঢিপ—ঢিপ—ঢিপ। আর অপেক্ষা করতে হল না। কানে এল কুকুরগুলোর উল্লসিত চিৎকার। অর্থাৎ বাইফ্লিট ওর কুড়েঘর ছেড়ে রান্নাঘরে যাচ্ছে। না—আর দেরি নয়—!

লাফিয়ে ঘরের মেঝেয় নামলাম, ‘বয়েড, লক্ষ্য রাখিস—যখন দরজা খুলব, তখন যেন কেউ চেঁচামেচি না করে।’

‘ঠিক আছে, তুই চটপট হাত লাগা,’ বয়েডও তাক থেকে মাটিতে নামল।

ঘরসুদ্ধ সব কয়েদীই ঘুমে অচেতন। যদি কেউ আচমকা জেগে ওঠে, তবে বয়েডই তাকে রুখবে, আমাকে আর ভাবতে হবে না।

বেড়ালের মতো নিঃসাড়ে দরজার দিকে এগোলাম।

নাঃ—তালাটা যতটা শক্ত হবে ভেবেছিলাম, ততটা নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, কারণ কয়েদীরা কেউ জেগে উঠল না। বাইরে বাইফ্লিটের ধমকানির শব্দ শুনে বুঝলাম, কুকুরগুলো এখন খেতে ব্যস্ত।

‘বয়েড—তাড়াতাড়ি—।’ আস্তে আস্তে দরজা ফাঁক করে,বাইরের ঠান্ডা হাওয়ায় পা রাখলাম। ডানদিকে, গজ পঞ্চাশেক দূরে দেখা যাচ্ছে কুকুরের খোঁয়াড়টা। বাইফ্লিট আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে, ঝুড়ি থেকে মাংসের ছাঁট একটা পাত্রে ঢালছে। আর কুকুরগুলো খাওয়ার রজন্য পরস্পরকে আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে,—মাংসের টুকরো নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে।

আমার পিছন পিছন বয়েড বাইরে এল। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দূরে খোঁয়াড়ের দিকে তাকাল। ও যে মুহূর্তের জন্যে ভীত হয়ে পড়েছে সেটা বুঝতে পেরেই ওকে এক ধাক্কা মারলাম, ‘বয়েড, চটপট—।’ সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম দৌড়। জীবনে কখনও এত জোরে দৌড়োইনি। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাওয়ার বেগে ছুটে চললাম।

শুনতে পাচ্ছি, পিছন পিছন ধুপধাপ করে ছুটে আসছে বয়েড। ওর হাঁপানোর শব্দ পর্যন্ত আমার কানে আসছে। ও আমার মতো জোরে দৌড়তে পারে না, যার জন্য অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর। তার উপর দিয়েই ছুটে চলেছি। লক্ষ্য দূরের নদী। নিজেকে বড্ড বেশী অসহায় মনে হতে লাগল।

দূরে অস্পষ্ট নলখাগড়ার ঝোপ ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে চোখে ধরা দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই নতুন আশায় উদ্দীপিত হয়ে, যথাসম্ভব জোর দৌড়বার চেষ্টা করছি—হঠাৎ—

ভোরের শান্ত পরিবেশের নিস্তব্ধ পর্দা বিদীর্ণ করে ভেসে এল রিভলবারের শব্দ—ফটাস।

ছুটতে ছুটতেই চকিতে পিছনে তাকালাম।

বাইফ্লিট খোঁয়াড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা একটা .৪৫ বোবের রিভলবার। ও আবার গুলি করল—ফটস।

বয়েড এঁকেবেঁকে দৌড়চ্ছিল। ওর ঠিক হাত পাঁচেক দূরে, ধুলো উড়িয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেল। ও আরও জোরে ছুটতে শুরু করল।

বাইফ্লিটের রিভলবারের তাক যদি আর-একটু ভালো হত, তবে বয়েডকে আর দৌড়তে হত না।

আরও জোরে ছুটতে শুরু করলাম। নলখাগড়ার ঝোপ আর বেশি দূরে নেই—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—নলখাগড়ায় ছাওয়া নদীর তীর—আমার বিপদের আশ্রয়স্থল।

ছুটতে ছুটতে আর-একবার পিছনে তাকালাম। বয়েড প্রায় দু-শ গজ পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু উন্মাদের মতো পড়িমরি করে দৌড়ে আসছে—

পরমুহূর্তেই কানে এল সেই বৈদুতিক বাঁশির কানফাটানো শব্দ—বেজেই চলল, আর থামে না। অর্থাৎ আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই অশ্বারোহী রক্ষীরা আমাদের পিছনে ধেয়ে আসবে!

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে। তাড়াতাড়ি ঝোপ ভেদ করে নদীর কিনারায় পৌঁছে, বাঁদিকে এগিয়ে চললাম। পাড় ধরে এক-শ গজ মতো গিয়ে আমার ঢুকে পড়লাম দুর্ভেদ্য নলখাগড়া-ঝোপে। লুকিয়ে পড়লাম।

কয়েক সেকেন্ড বাদে বয়েড ঝোপ ভেদ করে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল। আমার থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে। এদিকে-ওদিক চাইতে লাগল, সম্ভবত আমাকে খুঁজছে। কিন্তু নলখাগড়ার ঝোপ এত ঘন, ওর পক্ষে আমাকে দেখা সম্ভব হল না।

হাঁপাতে হাঁপাতে চাপা স্বরে ও ডাকল, 'অ্যাই! অ্যাই কারসন,—তুই কোথায়?'

পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলাম। বয়েড আমার সঙ্গে আসুক তা আমি মোটেই চাই না। কারণ, প্রহরীরা যখন বয়েডের পিছু নেবে, তখন আমি পালাবার সুযোগ পাব। আর ওরা যদি আমাকে দেখতেই পায়, তবে বয়েড থাকলেই বা কী, আর না থাকলেই বা কী।

বয়েড নদীতে নামতে শুরু করল। দু-একবার থেমে পিছনে তাকাল। তারপর জলে পা দিল—বলিষ্ঠ হাতে জল কেটে, সাঁতরে এগিয়ে চলল ওপারে।

এবার মরিচের পুঁটলিটা বের করে, প্যান্টের গোড়ালির ভাঁজগুলো ওই গুঁড়ো দিয়ে ভর্তি করলাম। যাতে ছোটবার সময় মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে আর পায়ের গন্ধ ঢেকে দেয়।

ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চললাম। বেশ কিছুটা যাবার পর নিঃসন্দেহ হলাম, বয়েড আমার পায়ের শব্দ আর শুনতে পাবে না। তখন আবার ছুটতে শুরু করলাম।

মুহূর্ত পরেই কানে এল ঘোড়ার ঘুরের শব্দ। ঝড়ের বেগে নদীর দিকে ছুটে আসছে প্রহরীরা। এখুনি লুকোতে হবে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে লুকোবার একটা ভালো জায়গা খুঁজতে লাগলাম—ওই তো!—

তড়িৎগতিতে এগিয়ে চললাম নলখাগড়া-ঝোপের দিকে। ঝোপের যে-জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ঘন সেদিকে ছুটলাম। বুকপেছলা দিয়ে আশ্রয় নিলাম ঝোপের অনেকটা ভিতরে, উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম। বুকের ভিতর কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে—ঘামে ভিজে উঠেছে সর্বাঙ্গ। অপেক্ষা করতে লাগলাম প্রহরীদের—ওরা কি খুঁজে পাবে আমাকে?

একটু পরেই শুনতে পেলাম খস-খস শব্দ। অশ্বরোহী রক্ষীরা দুদ্দাড় করে, ঝোপ ভেদ করে নদীর পাড়ে আসছে। শব্দ শুনে বুঝলাম, আমি যেখানে লুকিয়ে আছি, সেখান থেকে দূরে ওর নেই। রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষায় রইলাম। ওরা কি এদিকেই এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড উল্লসিত চিৎকারে চমকে উঠলাম। পরক্ষণেই কানে এল জলে কারুর ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ। হয়ত কোন প্রহরীর ঘোড়া নিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে যাচ্ছে।

'ওই তো—ওই তো শালাকে দেখা যাচ্ছে—।' গলা ফাটিয়ে একজন চিৎকার করে উঠল।—ফটাস—নিঃসন্দেহে রাইফেলের শব্দ।

আর-একটা ঘোড়া নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কানে ভেসে এল একাধিক গুলির শব্দ।—উৎকণ্ঠায়-আতঙ্কে মাথা গুঁজে পড়ে রইলাম।

ওরা কি তাহলে বয়েডকে দেখতে পেয়েছে?

অদম্য কৌতূহলে মাথা তুললাম। বয়েড কি শেষে ধরাই পড়ল? নলখাগড়াঝোপের গোড়ার দিকের আগাছা আর সরিয়ে উঁকি মারলাম। দেখি, একজন অশ্বারোহী প্রহরী ঘোড়া নিয়ে সাঁতরে ওপারে যাচ্ছে—হাতে তার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল।

ওপারে পৌঁছে সে পাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল একটা কানফাটানো শব্দ—আগের চেয়ে অনেক কাছে। প্রহরীরা কি আমার দিকেই আসছে? হঠাৎ দেখি, বয়েড ওর লুকোনোর জায়গা ছেড়ে এক লাফে নদীতে এসে পড়ল। উন্মাদের মতো সাঁতরে—আমি যেখানে লুকিয়ে ছিলাম, সেদিক লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে লাগল। দুরু-দুরু বুকে, চোখ গোল-গোল করে চেয়ে রইলাম। বয়েড যদি এপারে এসে ওঠে, তাহলে আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হবে।

কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ওপারের রক্ষীটি তার ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। হাঁটু গেড়ে বসে, রাইফেল বাগিয়ে তাক করছে বয়েডকে লক্ষ্য করে। সাঁতরাতে থাকলেও, বয়েড বোধহয় আন্দাজ করেছিল এই আসন্ন বিপদের কথা। কারণ হঠাৎ-ই জলের মধ্যে ডুব দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের গর্জন—গুলির আঘাতে খানিকটা জল ছলকে উঠল শূন্যে।

আর-একজন প্রহরী নলখাগড়া-ঝোপ ভেদ করে এপারে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই প্রথম জন চিৎকার করে উঠল, 'ব্যাটা সাঁতরে ওপারে ফিরে যাচ্ছে। শীগগিরই জলে নেমে শালাকে তাড়া কর! আমি এখান থেকে ব্যাটাকে লক্ষ্য রাখছি—।' ততক্ষণে নিশ্চিত হলাম, মাত্র-দুজন প্রহরীই আমাদের ধরতে এসেছে, তার বেশি নয়।

এপাশের প্রহরীটি দেরি না করে ঘোড়া নিয়ে জলে নেমে পড়ল। ঘোড়াটা সাঁতরে বেশ কিছুটা এগিয়েছে, এমন সময় বয়েড ভেসে উঠল। প্রহরীটি বয়েডকে দেখতে পেয়েই ঘোড়াটাকে সেদিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। মুহূর্তমধ্যে বয়েড আবার ডুব দিল। বেশ বুঝলাম, এভাবে ও আর বেশিক্ষণ যুঝতে পারবে না।

বয়েড বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, এভাবে সাঁতরে ও নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে পারবে না। তার আগেই প্রহরীটি ওকে ধরে ফেলবে। সেইজন্যই ও ডুবসাঁতার দিয়ে প্রহরীটির দিকে এগিয়ে আসছিল। কারণ, একটু পরেই দেখলাম, ও লোকটার ঠিক পিছনে ভেসে উঠেছে।—সাবাস! মনে মনে বয়েডের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না।

প্রহরীটি বয়েডকে দেখতে পায়নি, কিন্তু ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ওকে দেখতে পেয়েই বিকট চিৎকার করে উঠল, 'ওই যে, তোর পেছনে—।' বয়েড অশ্বারোহী রক্ষীর এত কাছে ভেসে উঠেছে, যে ওপার থেকে সে গুলিও করতে পারছে না, পাছে নিজের লোকের গায়ে লেগে যায়।

জলের অশ্বারোহী রক্ষীটি বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে রাইফেলের বাঁট সজোরে নামিয়ে আনল বয়েডের মাথায়। কিন্তু বয়েড অসামান্য ক্ষিপ্রতায় মাথা সরিয়ে নিয়ে, লোকটার কব্জি করে এক হ্যাঁচকায় জলে নামিয়ে আনল। জল তোলপাড় করে শুরু হল ধবস্তাধবস্তি—।

কিন্তু বয়েডের পশু-শক্তির কাছে লোকটা অসহায় হয়ে পড়ল। যেন কোন বেড়াল ইঁদুর নিয়ে খেলা করছে। ওরা দুজনেই জলে তলিয়ে গেল। ভীষণ ভাবে জল তোলপাড় শুরু হল। বয়েড কি লোকটাকে ডুবিয়েই মারবে?

একটু পরে বয়েড একা ভেসে উঠল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সাঁতরে-যাওয়া ঘোড়াটাকে ধরে, এমনভাবে তার আড়ালে ভেসে এগিয়ে চলল, যাতে ওপারের প্রহরীটি গুলি করতে না পারে। মাঝে মাঝে, তাড়াতাড়ি সাঁতরাবার জন্যে ঘোড়াটাকে খোঁচা মারতে লাগল।

লোকটা বয়েডের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই একলাফে ঘোড়ায় চাপল। তীরের বেগে ঘোড়াসুদ্ধ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বয়েডকে অনুসরণ করল।

ওদিকে বয়েড তখন ওর ঘোড়াটাকে নিয়ে ভীষণ অসুবিধায় পড়েছে। বারবার ধাক্কা মেরে ওটাকে প্রহরীর দিকে ফিরিয়ে নিজেকে আড়াল করছে।

আমি যেখানে লুকিয়ে ছিলাম, ঠিক তার সামনে দিয়ে বয়েড ভেসে এগিয়ে চলল। ওর বীভৎস মুখ আতঙ্কে পাণ্ডুর—চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। ভিজে চুল থেকে জলের ফোঁটা টপটপ করে মুখের উপর গড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে খিস্তি দিয়ে ঘোড়াটাকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার জন্য ধাক্কা মারছে।

ওদিকে অনুসরণরত রক্ষীটি বয়েডের দিকে বেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেও ঘোড়াটার আড়াল থাকার জন্য গুলি করতে পারছে না। তাই চেষ্টা করছে পাশে সরে যেতে। যদি সেখান থেকে বয়েডকে গুলি করা যায়।

হঠাৎ ঘোড়া ছেড়ে জলের মধ্যে ডুব দিল বয়েড। কী ব্যাপার? আগের প্রহরীর মতো এটাকেও শেষ করবে নাকি?

ও ডুব দেওয়ামাত্রই অনুসরণরত অশ্বারোহী প্রহরীটি সতর্ক হয়ে হাতে রাইফেল তুলে নিল। চারদিকে নজর রাখতে লাগল—কোথায় বয়েড ভেসে ওঠে।

বয়েড ডুব-সাঁতারে প্রহরীর দূরত্বটা ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি। ভুলক্রমে ও লোকটার ঠিক পাশেই ভেসে উঠল। মাথা ঝাঁকিয়ে জল ঝেড়ে, বিদ্যুৎগতিতে তাকে ধরতে গেল। কিন্তু আগের ব্যাপারটার পর লোকটা খুবই সতর্ক ছিল। উদ্যত রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল বয়েডের মাথায়। বয়েড মাথা সরিয়েও সে আঘাত এড়াতে পারল না। সোজা তলিয়ে গেল। ক্রমে সেখানকার জল ফিকে লাল—লাল—গাঢ় লাল হয়ে উঠল।

লোকটা ঘোড়া নিয়ে চটপট এপারে এসে উঠল। অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে বয়েডের ভেসে ওঠার অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরেই বয়েডকে দেখা গেল। ওর দেহটা উপুড় হয়ে ভাসছে—এগিয়ে চলেছে স্রোতের টানে। ভাসতে ভাসতে কিছুদূর গিয়ে দেহটা নদীর পাড়ে ঠেকে রইল।

ওদিকে অন্য প্রহরীর মৃতদেহটাও ওপারে ভেসে উঠেছে।

অপেক্ষামাণ রক্ষীটি চোখ বুলিয়ে মৃতদেহ দুটো দেখল। তারপর চুকচুক শব্দ করে নদীতে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়াটাকে ডাকল। ঘোড়াটা উঠে আসতেই সে গিয়ে তার লাগাম চেপে ধরল—দুটো ঘোড়াই ছুটিয়ে দিল।

নলখাগড়ার ঝোপ ভেদ করে, ঝড়ের বেগে ওরা ছুটে চলল। ছুটে চলল ফার্নওয়ার্থের দিকে।

ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর অতি সন্তর্পণে লুকনো জায়গা ছেড়ে বাইরে এলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী পার হয়ে পালাতে হবে। কারণ এই মৃতদেহ দুটোর ব্যবস্থা করেই ওরা সদলবলে আমার পিছু নেবে। নিঃসন্দেহে সঙ্গে থাকবে ওই কালান্তক হাউন্ডগুলো।

তা ছাড়া, বেতারে ছড়িয়ে পড়বে আমার পালানোর কথা। জেলার প্রতিটি পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াবে। রাষ্ট্রের প্রতিটি পুলিসফাঁড়িকে আমার চেহারার বিবরণ জানিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হবে—নাঃ, দেরি করা চলবে না, যেমন করেই হোক একটা নিরাপদ আশ্রয়ের পৌঁছতে হবে।

প্যান্টের ভাঁজে ছাড়া যে অবশিষ্ঠ মরিচটুকু পুঁটলিতে ছিল, সেটাকে ভালো করে বাঁধলাম। এর মধ্যে সূর্য মাথার উপর চলে এসেছে। রোদের অসহ্য উত্তাপ এমনই অনুভব করতে পারছি। আর দেরি না করে ছুটলাম। প্যান্টের ভাঁজ থেকে মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যাক, কুকুরগুলোর জন্য আর চিন্তা নেই। অক্লান্তভাবে ছুটে চললাম।

নদীর পাড় ধরে মাইল দুয়েক দৌড়বার পর ঠিক করলাম, এবার নদী পার হতে হবে। এখান থেকে রেললাইন প্রায় ষোল মাইল দূরে।

হাঁপাতে হাঁপাতে প্যান্ট খুলে, তার মধ্যে মরিচের পুঁটলিটা রেখে, ভালো করে ভাঁজ করলাম।

অন্তর্বাস পরেই পায়ে পায়ে এগোলাম নদীর দিকে। ভাঁজ-করা প্যান্টটা মাথার উপর রেখে, কোমরের বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধলাম। মরিচটুকু ভিজলে চলবে না। কারণ এখনও এর প্রয়োজন আছে।

গা ভাসিয়ে দিলাম নদীর শীতল জলে—সর্ব শক্তি দিয়ে সাঁতরে চললাম—নদী পার হয়ে পালাতে হবে। —তবে জানি না, সফল হব কিনা!

তিন

বিকেল হয়ে গেছে। রোদের তাপ অনেকটা কমে এসেছে। একটা বিশাল গাছের ছায়ায় অবসন্ন দেহে শুয়ে আছি। সামনেই পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে—তার কোল ঘেঁষে বড় রাস্তা। মাঝে-মাঝে দু একটা মালবোঝাই ট্রাক হাওয়ার বেগে ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, একজন পুলিশ অফিসার মোটরবাইকে চড়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে তাঁর পিছন পিছন একটা ওয়্যারলেসের গাড়ি—সম্ভবত আমারই খোঁজে—

ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেকে, অন্যের চোখ বাঁচিয়ে এতখানি রাস্তা পার হয়ে এসেছি, কেউ আমাকে অনুসরণ করেনি। মরিচের গুঁড়ো সত্যিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

রেললাইন এখনও পাঁচ মাইল দূরে। অপেক্ষা না করে দৌড়লে হয়ত অনেক আগেই ওখানে পৌঁছে যেতাম, কিন্তু দিনের বেলায় এ জায়গাটা পার হওয়া উচিত হবে না। চারিদিক খাঁখাঁ করছে। অদূরে একটা গোলাবাড়ি ছাড়া লুকোবার আর কোন জায়গাই নেই। অগত্যা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করলেই নয়।

চারদিকে বুকসমান উঁচু কাঠের বেড়ার মাঝখানে অবস্থিত এই গোলাবাড়িটা আর তার পাশেই টিনের চালা-দেওয়া একটা গুমটিঘর। চারদিকের বেড়ার এককোণে একটা কাঠের দরজা।

হঠাৎ দেখি সেই গোলাবাড়ি থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসছে। প্রথমে মেয়েটিকে ততটা গুরুত্ব দিইনি —কিন্তু ওর হাতের দিকে নজর পড়তেই আমার জিভে জল এল।—সেই সকাল থেকে না খেয়ে আমি—একবিন্দু জল পর্যন্ত পেটে পড়েনি—তরমুজের ঝুড়িটা দেখে মনে হল ছুটে যাই মেয়েটির কাছে। ও তরমুজের ঝুড়িটা নিয়ে গুমটিঘরে ডুকে পড়ল। একটু পরেই খালি হাতে বেরিয়ে এল। আবার ফিরে চলল গোলাবাড়ির দিকে।

ঠিক করলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে ওই গুমটিঘরে ঢুকে গোটাকয়েক তরমুজ সাবাড় করতে হবে। কারণ, পেটে কিছু না পড়লে পথ চলা অসম্ভব।

সময় গড়িয়ে চলল—

এমনি করে আরও ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে এল চারদিকে। বড় রাস্তার যানবাহনের চলাচল ফিরে হয়ে এল। গোলাবাড়ির ভিতর কতকগুলো ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। আকাশে তাকালে চোখে পড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অসংখ্য তারা।

এর মধ্যে পুলিশের গাড়ি আর চোখে পড়েনি। হয়ত অন্য কোন অঞ্চলে ওরা আমার খোঁজ করছে।

অন্ধকারে কারুর নজরে পড়ার ভয় নেই দেখে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এগিয়ে চললাম। পাহাড়ি ঢালু জমি ধরে একছুটে গিয়ে পৌঁছলাম বড় রাস্তায়। নাঃ—কোন গাড়িই নজরে পড়ছে না। ক্ষিপ্রগতিতে রাস্তা পার হয়ে মেঠো পথ ধরলাম। বিকেল থেকেই লক্ষ্য করেছি, বাড়িটায় কোন পোষা কুকুর নেই। সুতরাং নির্ভয়ে এগিয়ে চললাম। বেড়ার কোনায় কাঠের দরজাটা বন্ধ ছিল। একটুও দ্বিধা না করে ওটা টপকে ভিতরে নামলাম। ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম টিনের চালা-দেওয়া গুমটিঘরে। অন্ধকারেই নাকে এল তরমুজের সুস্বাদু গন্ধ। খিদেটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগোলাম। একটু এগিয়েই হাত ঠেকল তরমুজের স্তূপে। এতক্ষণে বুঝলাম, এ ঘরটায় তরমুজ রাখা হয়। এরা বোধহয় তাহলে তরমুজের চালানদার। একটা বড়সড় তরমুজ তুলে নিয়ে দাঁত বসালাম। অসুবিধে হলেও, সে অসুবিধে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে হার মানল।

গোটা তিনেক তরমুজ শেষ করার পর, পেটের খিদে শান্ত হল। কিন্ত ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। ভাবলাম, একটু ঘুমিয়ে নিই নয়ত এই ক্লান্ত অবসন্ন দেহে রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না।

হাতড়ে হাতড়ে, তরমুজের স্তূপের পিছনে আশ্রয় নিলাম। শুয়ে পড়তেই চোখ বুঝে এল। কানে এল বাড়ির ভিতর ভেসে-আসা কোন যন্ত্রসঙ্গীতের সুর। শুয়ে শুয়ে মনে পড়ল ফার্নওয়ার্থের কথা। এতখানি পথ নির্বিঘ্নে পালিয়ে এসেছি, কোন বিপদের মুখোমুখি হইনি। ভাগ্য ভালো থাকলে হয়ত কোন ট্রেনেও উঠতে পারব—তারপর—যদি—

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। উঠে দাঁড়ালাম একলাফে। গুমটিঘরের খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল দূরের ধূসর পাহাড়। তার পিছন থেকে উঁকি মারছে ভোরের সূর্য। আবিরে রাঙানো আকাশে গা ভাসিয়ে উড়ে চলেছে একঝাঁক পাখি। ভোরের বিবর্ণ আলো এসে ঠিকরে পড়েছে ঘরের ভিতরে।

একটা অজানা ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরল। সেই সন্ধ্যা থেকে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। কেউ আমাকে দেখে ফেলেনি তো?

আমার পরনে কয়েদীর ডোরাকাটা পোশাক। এই পোশাকে যদি দিনের বেলায় বেরোই, তবে নির্ঘাৎ ধরা পড়তে হবে। সুতরাং রাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই। ইতিমধ্যে চারদিকের খোঁজ-খোঁজ রব অনেকটা ঠান্ডা হয়ে আসবে। বেশ নিশ্চিন্তেই পথ চলতে পারব।

আরও কয়েকটা তরমুজ সাবাড় করে, একটা ছেঁড়া বস্তা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে ঘুম নেমে এল।

—ঘণ্টাখানেক পরে আচমকা জেগে উঠলাম। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলে উঠল—ঘরে কেউ ঢুকেছে।

কানে এল কারও নড়াচাড়ার শব্দ। অতি সপ্তর্পণে মাথা তুলে উঁকি মারলাম। আগের দিন দেখা মেয়েটি তরমুজগুলোকে বেছে, একপাশে সরিয়ে রাখছে। ওর বয়স বছর সতেরো হবে। গায়ের রঙ বাদামী, দেখতে খুব একটা সুন্দরী না হলেও কেমন যেন একটা আলগা আকর্ষণ আছে। হয়তো ওর উদ্দাম সপ্তদশী যৌবনই এর জন্য দায়ী। চটপটে অভ্যস্ত হাতে মেয়েটি কাজ করে চলল। আমাকেও দেখতে পায়নি। ঝুঁকে পড়ে, বড় তরমুজগুলো ও আলাদা করে রাখছে। ওর লম্বা ছাই-রঙা চুল কাঁধ বেয়ে ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে।

মেয়েটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে করতে লাগলাম। ওকে কি আমার উপস্থিতির কথা জানাব? হঠাৎ বুঝলাম, সেকথা জানানোর আর-কোন প্রয়োজন নেই। ও বুঝতে পেরেছে, আমি ওকে লক্ষ্য করছি। মেয়েটির কাজের নিটোল ছন্দ কেটে গেল। পলকের জন্য ওর হাত দুটো থেমে রইল—পরমুহূর্তেই আবার কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু আগের মতো অভ্যস্ত হাতে নয়। পরিষ্কার বুঝলাম, ও ভয় পেয়েছে।

এখুনি কিছু করা দরকার। নয়তো বাইরে বেরিয়ে মেয়েটি যে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ওর মুখে কেমন একটা চাপা উত্তেজিত ভাব।

আড়াল ছেড়ে বাইরে এলাম, 'ভয় পেয়ো না।'

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। আতঙ্কে ওর গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না—ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমার মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, গায়ে ছেঁড়া, নোংরা পোশাক—এসব দেখে মেয়েটা আরও বেশি ভয় পেয়েছে। মনে মনে ওর জন্য দুঃখ হল।

'ভয় নেই, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।' স্থির চোখে ওকে লক্ষ্য রেখে আশ্বাস দিলাম। কিন্তু ও এক পা এক পা করে পিছিয়ে চলল। টিনের দেওয়ালে পিঠ ঠেকতেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। যেন দেওয়ালের গায়ে মিশে যাবে।

মেয়েটির পরনে একটা চাপা প্যান্ট আর লাল-সাদা চেক-টানা শার্ট। ও দেওয়ালে হেলান দিয়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওর পীবর স্তনদ্বয় একবার উঠছে, একবার নামছে।

'খবরদার, আমার কাছে এসো না!' চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে ও আর্তনাদ করে উঠল।

'তুমি আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ?—আমিও তা তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে ছিলাম।' আশ্বাসের নরম সুরে ওকে বোঝাতে চাইলাম, 'পুলিশ আমাকে খুঁজছে—আমিই ফার্নওয়ার্থ থেকে পালিয়ে এসেছি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?' কথা বলে কোনরকমে ওকে আটকে রাখার চেষ্টা করলাম। ভয় হচ্ছে, হঠাৎ না আবার বাইরে দৌড় লাগায়—তাহলেই সর্বনাশ!

'আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে,—তাছাড়া কিছু জামাকাপড়ও দরকার,—তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?'

দেখলাম, এতক্ষণে মেয়েটির ভয় অনেকটা কমে এসেছে। ও সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'তুমি এখানে কি করতে ঢুকেছ?'

'দূর থেকে তরমুজগুলো দেখে, খিদের জ্বালায় নিজেকে আর সামলাতে পারিনি। খাওয়াদাওয়ার পর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, রাতের অন্ধকারে রেললাইন পর্যন্ত গিয়ে, কোন চলতি ট্রেনে উঠে পালাব, কিন্তু—'

'পুলিশ রেললাইন পাহারা দিচ্ছে—' আমাকে বাধা দিয়ে ও বলে উঠল, 'গত রাতে রেডিয়োতে বলেছে, তুমি রেললাইনের দিকে যাবে বলেই পুলিশ সন্দেহ করছে—। কিন্তু ফার্নওয়ার্থে যাবার মতো তুমি কী করেছিলে?' মেয়েটা তার সন্দেহকুটিল দৃষ্টি আমার চোখে রাখল।

'তাহলে শোন—' ওকে একে একে সব খুলে বললাম। কিছুই গোপন করলাম না। মেয়েটি চোখ গোল গোল করে, স্তব্ধ বিস্ময়ে, হাঁ করে শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে ওর মুখে কেমন একটা করুণার ভাব ফুটে উঠল। মমতায় ছলছল করে উঠল ওর দুই গভীর চোখ। সব বলতে পেরে মনটা যেন হালকা হল।

'ফার্নওয়ার্থে আমি কিছুতেই ফিরে যাব না। তুমি যদি সাহায্য না কর, তাহলে আমার আর-কোন উপায় নেই। ওখানে ফিরে যাওয়ার চেয়ে আমি আত্মহত্যা করব।'

মেয়েটি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এল, 'ফার্নওয়ার্থ সম্বন্ধে আমিও কাগজে পড়েছি। সব কথা শোনার পর তোমাকে ওখানে ফেরত পাঠাতে আমার বিবেকে বাঁধছে। আমি তোমাকে সাহায্য করব—তোমার কি খিদে পেয়েছে?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

'তাহলে এখানে অপেক্ষা কর, আমি এখুনি আসছি।' গুমটিঘর ছেড়ে ও বেরিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত মন ভয় পেল—ওকে বিশ্বাস করা কি ঠিক হল? কিন্তু এছাড়া কোনও পথ তো আমার নেই। ও যদি পুলিশে খবর দেয়, তবে সেটাকে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? দেখা যাক—

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, মেয়েটি আর ফেরে না। একবার মনে হল, গিয়ে দেখব নাকি, ও কী করছে? এমন সময় মেয়েটি আসছে। ডান হাতে ঝোলানো একবালতি গরম জল, আর বাঁ-হাতে একটা তোয়ালে, সাবান, ক্ষুর আর কিছু জামাকাপড়।

বালতিটা সামনে রেখে, জামাকাপড়গুলো ও আমার হাতে দিল, 'হাত-পা ধুয়ে এগুলো পরে নাও। আমি খাবার নিয়ে আসছি।'

মিনিট দশেক পরে ও ফিরে এল। ততক্ষণে আমার হাত-পা ধোয়া, দাড়িকামানো—সব হয়ে গেছে। কয়েদীর পোশাক ছেড়ে, ওর দিয়ে-যাওয়া পোশাকগুলো পরে ফেলেছি। লক্ষ্য করলাম, ওর হাতে খাবারের ট্রে। তাতে মাংস, ডিমসেদ্ধ আর কফি। আমার কাছে সেটাই যথেষ্ট মনে হল। হুমড়ি খেয়ে, গোগ্রাসে গিলে চললাম। ও একটা ভাঙা প্যাকিং বাক্সের উপর বসে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে, মেয়েটি আমার দিকে একপ্যাকেট সিগারেট এগিয়ে দিল। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লাম। নিজেকে বেশ সুস্থ সতেজ মনে হল। এতদিন পরিশ্রমের পর বোধহয় এই বিশ্রামটুকু প্রয়োজন ছিল।

'তুমি রেললাইনের দিকে গেলেই ধরা পড়বে।—যদি ওকল্যান্ডে যেতে চাও তো তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'আমি ট্রেন ধরে ওকল্যাণ্ডেই যাব ঠিক করেছিলাম। ওখানে যেতে চাওতো তোমাকে সাহাহ্য করতে পারি।'

'আমি ট্রেন ধরে ওকল্যান্ডেই যাব ঠিক করেছিলাম। ওখানে যেতে পারলে আমার পক্ষে খুব সুবিধে হয়। —কিন্তু যাব কি করে?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, এই তরমুজগুলো নিয়ে যাবার জন্য, একটা ছেলে ট্রাক নিয়ে আসবে। রোজ এই একই সময়ে ও এখানে আসে। এখানেই খাওয়াদাওয়া সেরে আবার ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সোজা যায় ওকল্যান্ডের বাজারে। সেখানে ট্রাক রেখে, টাকার তাগাদায় যায়। ও এসে যখন বাড়িতে খেতে ঢুকবে, তখন তুমি গিয়ে ওর ট্রাকের পেছনে লুকিয়ে পড়বে। তারপর ওকল্যান্ডে পৌঁছে, চুপিসাড়ে নেমে পড়বে।'

মেয়েটির কথা রাজি হলাম।

রাজি না হয়ে উপায়ই বা কি! ও একটা পাঁচ ডলারের নোট এনে আমার হাতে দিল—আর তার সঙ্গে দু-প্যাকেট সিগারেট। ওকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে চোখ সজল হয়ে উঠল।

একটু পরে ট্রাকটা এসে পৌঁছল। চালক একটি অল্পবয়সী ছেলে। সে ট্রাক রেখে ভিতরে যেতেই,গাড়ির পিছনে উঠে পড়লাম।

তারপর একসময় ট্রাক ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ পর তরমুজের বাক্সগুলো সরিয়ে, অতিসন্তর্পণে তার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম—বিকেলের রোদ তখন ঝিমিয়ে এসেছে—দূরে দেখা যাচ্ছে সেই গোলাবাড়িটা। তার দরজায় দঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি। পড়ন্ত রোদ ওর লাল-সাদা ডোরাকাটা শার্টের গা থেকে ঠিকরে পড়ছে। মেয়েটি আস্তে আস্তে হাত তুলে আমাকে উদ্দেশ্য করে নাড়তে লাগল। ট্রাক ক্রমশ এগিয়ে চলল—ক্রমে মিলিয়ে আসতে লাগল—মেয়েটি—গোলাবাড়ি। ট্রাক ছুটে চলল।

নিজের অজান্তেই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু-ফোঁটা অশ্রু।

এই সুন্দর স্মৃতিটুকু একান্ত আমার করেই সযত্নে তুলে রাখব মনের মণিকোঠায়। অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনের পথে এ স্মৃতিটুকুই হোক আমার একমাত্র সঙ্গী।

ফার্নওয়ার্থ থেকে পালাবার চারদিন পরে লিটল ক্রিকে এসে পৌঁছলাম। ওকল্যান্ড থেকে একটা মালগাড়ি ধরে প্রায় এক হাজার মাইল পার হয়ে, এসে উপস্থিত হয়েছিল এই লিটল ক্রিকে।

মাথার উপর দুপুরের চড়া রোদ। রাস্তাঘাট নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একজন পথচারী চোখে পড়ছে।

মেয়েটি যে পাঁচ ডলার দিয়েছিল, তা থেকে এখন অবশিষ্ট মাত্র এক ডলার। ওকল্যান্ড থেকে ট্রেনে করে এখানে আসবার পথে কিছুই পেটে পড়েনি। চারপাশে চোখ বোলালাম—যদি কোন দোকান চোখে পড়ে। অদূরেই একটা স্ন্যাক-বার দেখতে পেলাম। এগিয়ে চললাম পায়ে পায়ে—দেখি সামান্য কিছু যদি পেটে দেওয়া যায়। সম্বল তো মাত্র এক ডলার!

ঢুকে পড়লাম দোকানে। কোণের দিকের একটা চেয়ার দখল করে বেয়ারাকে স্যান্ডউইচ আর কফি আনতে বললাম।

—এরপর কোথায় যাব? এই শহরের সীমান্তে যে পাহাড় আছে, তার ওপারেই ট্রপিকা স্প্রিংস। যদি একবার ওখানে পৌঁছতে পারি, তবে আর-কোন ভয় নেই—একেবারে নিশ্চিন্ত। কিন্তু যাব কেমন করে?

ট্রপিকা স্প্রিংসের দূরত্ব এখান থেকে দু-শ মাইল। সেখানে পৌঁছবার একমাত্র উপায় কোন চলতি গাড়ি বা ট্রাকে আশ্রয় নেওয়া। কিন্ত আমার এই নোংরা পোশাক, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল—নাঃ—এ অবস্থায় কারো গাড়িতে আশ্রয় পাওয়ার আশা আমাকে ছাড়তে হবে। তার চেয়ে দেখি, কোন ট্রাকে যদি জায়গা পাই।

খাওয়া-দাওয়া সেরে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটির দিকে এগিয়ে গেলাম, 'আচ্ছা ভাই, এখান থেকে ট্রপিকা স্প্রিংস যাব—কোন গাড়ি-টাড়িতে জায়গা পাওয়া যাবে?'

'উঁহু—' লোকটি মাথা নাড়ল, 'সেরকম আশা খুবই কম। এখান দিয়ে অনেক গাড়িই যায় বটে, কিন্তু কেউ থামে না। আর থাকবে—সে-আশাও খুব কম। তুমি বরং এক কাজ কর—এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা পেট্রল-পাম্প আছে—তার নাম 'পয়েন্ট অফ নো রির্টান'। তুমি সোজা সেখানে চলে যাও। ওখানে প্রত্যেকটা গাড়িই তেল, মোবিল নেবার জন্য থামে। দেখ, যদি কোন ড্রাইভারকে বলেকয়ে রাজি করাতে পার—'

'পেট্রল-পাম্পটার অদ্ভুত নাম তো!'

'তা বটে, কিন্তু তার একটা কারণও আছে। এর পরের পেট্রল-পাম্পটা একেবারে পাহাড়ের ওপারে—একশ ষাট মাইল দূরে। সেইজন্যই এর মালিক কার্ল জেনসন এর নাম দিয়েছে 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'—অর্থাৎ, 'শেষ সীমান্ত'। তা ছাড়া, এর সঙ্গে লাগোয়া একটা রেস্তোরাঁও আছে—জেনসনই তার মালিক।

'তুমি তো বলেই খালাস কিন্তু এতটা রাস্তা কি হাঁটব নাকি?'

লোকটা হাসল, 'আরে না, না,—হাঁটতে যাবে কোন দুঃখে? মি. জেনসন প্রতিমাসে পুরোনো লোহালক্কড় কিনতে শহরে আসেন। প্রতিবারই ফেরার পথে আমার দোকান হয়ে যান। তোমার ভাগ্য ভালো, আজই তিনি এদিকে এসেছেন। ফেরার পথে আমার দোকানে এলে, তাঁকে বরং একবার বলে দেখো—তিনি খুব ভালো লোক, আমাকে বহুবার সাহায্য করেছেন। দেখ, হয়তো তোমাকে সঙ্গে করে নিতেও যেতে পারেন।'

'কখন আসবেন তিনি?'

লোকটা নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল, 'এই এসে পড়লেন বলে—।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই দোকানের খোলা দরজায় আবির্ভূত হল এক বিশাল চেহারার পুরুষ। যে কাউন্টারের দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল, 'ঝটপট এক কাপ কফির ব্যবস্থা কর মাইক, এখুনি আবার বেরিয়ে পড়তে হবে।' কথা শেষ করে লোকটি আমার দিকে এক পলক তাকাল। তারপর আবার চোখ ফেরাল মাইকের দিকে, ' তোমার বউ কেমন আছে হে? তাকে যে দেখছি না?'

'ও ওয়েন্টওয়ার্থে গেছে, মি. জেনসন। আপনার সঙ্গে দেখা হল না বলে খুব দুঃখ পাবে।' মাইক আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল। অর্থাৎ, এই কার্ল জেনসন।

জেনসন লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ-ফুট। গায়ের রঙ তামাটে। মুখ দেখে বেশ হাসিখুশি মনে হয়। বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি হবে। কিন্তু হলে কি হবে—দেখে মনে হয়, এখনও দু-জন লোকের মহড়া নেবার ক্ষমতা রাখে।

মাইকে কফির কাপ এগিয়ে দিল জেনসনের দিকে, 'মি, জেনসন, এই লোকটি পাহাড় পেরিয়ে ট্রপিকা স্প্রিংসে যেতে চায়। আমি বলেছি, আপনার ওখানে যেতে,—সেখানে যদি কোন ট্রাক ধরতে পারে। এখানে তো আর-কোন গাড়ি থামবে না।'

জেনসন আমার দিকে ফিরে হাসল, 'মাইক ঠিক বলেছে। ও ছাড়া তোমার উপায় নেই। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পার, কিন্তু ওই পর্যন্তই—! কোন ট্রাক-চালকের রাজি করানোর ভার তোমার। জানই তো, কেউই আজকাল অচেনা লোককে ট্রাকে তুলতে চায় না—দেখ, যদি ভাগ্য ভালো থাকে—।'

'কিন্তু আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল জেনসন, 'পাগল নাকি! এতখানি রাস্তা যে একজন সঙ্গী পাব, তাই যথেষ্ট।'

হঠাৎ কি মনে হতেই জেনসন আর পেশীবহুল হাত আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'আমার নাম কার্ল জেনসন—।'

জেনসনের হাতে হাত মেলালাম, 'আমি জ্যাক প্যাটমোর—।' প্রথমেই যে নামটা মনে এল, সেটাই বলে দিলাম।

'চল, আর দেরি করে লাভ কি?' জেনসন কফির কাপ নামিয়ে রাখল, পকেট থেকে একটা দশ সেন্ট বের করে মাইকের হাতে দিল, 'চলি মাইক—আবার দেখা হবে—' তারপর দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

মাইককে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম।

বাইরে একটা বড়সড় ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। জেনসন এগিয়ে গিয়ে তার চালকের আসনে বসল। আমিও তার পাশে গিয়ে বসলাম। ওঠবার সময় লক্ষ্য করলাম—ট্রাকটা পুরোনো লোহালক্কড়ে ভর্তি।

ট্রাকের ভিতরটা অসহ্য গরম। আমরা দুজনেই গায়ে কোট খুলে ফেললাম। জেনসন সিগারেট বের করে নিজে ধরাল, আমার দিকে একটা এগিয়ে দিল। তারপর স্টার্ট দিয়ে ট্রাক ছেড়ে দিল।

শহরের বাইরে পৌঁছতেই চোখে পড়ল দিগন্তপ্রসারী মরুভূমি। চারদিকে শুধু বালি আর বালি। মাঝের সরু পিচঢালা রাস্তা ধরে জেনসন ট্রাক ছুটিয়ে চলেছে। দূরে—বহুদূরে চোখে পড়ছে পাহাড়—তার ওপারেই ট্রপিকা স্প্রিংস। মাথার উপরে সূর্য কিছুটা ঢলে পড়লেও গরম কমেনি। ট্রাকের চলন্ত চাকা উড়িয়ে দিচ্ছে ধুলোর মেঘ—

হঠাৎ জেনসন প্রশ্ন করল, 'তুমি কি এখানে এই প্রথম এলে?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে আসছ?'

'ওকল্যান্ড থেকে—'

স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে আড়চোখে আমাকে দেখল জেনসন, 'যদি কিছু মনে না কর জ্যাক, তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—তুমি কোথায় কাজ কর?'

'আমাদের তালার ব্যবসা আছে, আমার বাবাও এই ব্যবস্থা করতেন।' সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে একটা জবাব দিলাম।

'তালার ব্যবসা? তাহলে তো লোহা সম্বন্ধে তোমার বেশ জ্ঞান আছে,—কি বল?'

'হ্যাঁ—তা একটু আছে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। একসময় জেনসনই প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা জ্যাক, তুমি গাড়ির ইঞ্জিন-টিঞ্জিনের ব্যাপার বোঝ?'

'খুবই সামান্য—' তার একটানা প্রশ্নে বিব্রত বোধ করলাম, 'দু-একবার কয়েকটা গাড়ির কাজ করেছি—এ সেলফ ঠিক করা, ডিস্ট্রিবিউটর হেডের পয়েন্ট সারানো—এরকম সামান্য কয়েকটা কাজ।'

জেনসন তার নীল চোখের দৃষ্টি স্থিরভাবে মেলে ধরল আমার দিকে, 'তার মানে গাড়ির কাজ জান—।—তুমি কি ট্রপিরকা স্প্রিংসে থাকবে বলে ঠিক করেছ, জ্যাক?'

'হ্যাঁ—' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। রোদ-ঝলসানো উজ্জ্বল আকাশে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটাকয়েক চিল।

'ওখানে কোন চাকরি নিয়ে যাচ্ছ নাকি?'

এবার আমার মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। সেটা লক্ষ্য করে জেনসন একটু বিব্রত হল, 'মানে—যদি কোন চাকরির ব্যাপারে হয়, তবে আমিই তোমাকে একটা চাকরি দিতে পারি।'

অবাক হয়ে জেনসনের দিকে তাকালাম, 'আপনি আমাকে চাকরি দেবেন? কি চাকরি?'

'লোহালক্কড় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, গাড়ির কাজও জানে, এমন একজন লোকই আমার দরকার। আমি আর আমার স্ত্রী—লোলা—সব কাজ সামলে উঠতে পারি না। তোমার মতো একজন লোকই আমি খুঁজছি। তবে সপ্তাহে তিন-চারদিন কিন্তু রাত্তিরে কাজ করতে হবে—অবশ্য দিনে বিশ্রাম পাবে। আমার ওখানেই থাকবে, খাবে। আমার বউ ভারি চমৎকার রান্না করে। সে তুমি খেলেই বুঝতে পারবে—আর হ্যাঁ, মাইনে সপ্তাহে চল্লিশ ডলার—কি রাজি?'

ভাবলাম—গা-ঢাকা দেবার এমন একটা সুযোগ ছাড়ি কেন! এই পাণ্ডব-বর্জিত মরুভূমির দেশে পুলিশ আমার খোঁজও পাবে না। আর এখানে মাইনের টাকা কিসেই বা খরচ করব! বরং জমাতে পারলে, কিছু অন্তত সঙ্গে নিয়ে পালানো যাবে—ভালোই হবে!

হেসে জেনসনের চোখে চোখ রাখলাম, 'রাজি—অবশ্য আমার কাজ যদি আপনার পছন্দ হয়—'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল জেনসন, প্রচণ্ড এক চাপড় কষিয়ে দিল আমার ঊরুতে, 'ওসব বিনয়-টিনয় ছাড় জ্যাক—আজ থেকে তুমি আমার ওখানে চাকরিতে ঢুকলে—কোন আপত্তি চলবে না।'

অদ্ভুত নামের এক পেট্রল-পাম্পে অদ্ভুতভাবেই চাকরি পেলাম!

চার

সামনের একটা উঁচু ঢিবি পেরোতেই, চোখে পড়ল পাহাড়ি ঢালু রাস্তা। যেদিকে চোখ যায়, শুধু বালি আর বালি। বিকেলের চড়া রোদ বালির সমুদ্রকে করে তুলেছে উজ্জ্বল, তার গা থেকে ঠিকরে-আসা সোনালী আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। দূরে—বহুদূরে চোখে পড়ল একটা অস্পষ্ট বিন্দু—সরু ঢালু রাস্তা ধরে ট্রাক ছুটে চলল—এবারে চোখে পড়ছে গোটাকয়েক ঘর—

'ওই যে দেখা যাচ্ছে—' জনসন আঙুল তুলে দেখাল, 'ওটাই আমার পেট্রল-পাম্প—''পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন''।'

ঘরগুলোকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রাস্তার বাঁ দিকে একটা ছোট বাংলো। তার সঙ্গে লাগোয়া গোটাদুয়েক একচালা ঘর—আর একটা অপেক্ষাকৃত বড় গুমটিঘর। পেট্রল নেবার তিনটে পাম্পও চোখে পড়ছে।

এ ছাড়া রাস্তার ওপারে, বাংলোর ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে একটা ঘর। রাস্তা ক্রমে মিলিয়ে গেছে পাহাড়ের ওপিঠে—

সবকটা ঘরের রঙই আকাশ-নীল। ধুধু করছে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির বুকে সেই ঘরগুলো—যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা নীল রঙের কয়েকটা আঁচড়।

'রাস্তার ওই ডানদিকের ঘরটা তোমার। আর এদিকের বাংলোটায় আমি আর লোলা থাকি। ব্যস—। জায়গাটা এমনিতে নির্জন আর বিরক্তিকর শুধু লোলা আছে বলেই সব-কিছু ভুলে থাকতে পারি। যাকগে, এখন তুমি এসেছ—আমাদের কাজের অনেক সুবিধে হবে।—ওঃ, রোজ মাঝরাতে ট্রাক-ড্রাইভারগুলো কি কম জ্বালাতন করে!'

আমরা পেট্রল-পাম্পে প্রায় পৌঁছে গেছি। জেনসন দুবার টানা হর্ন বাজিয়ে আমার দিকে তাকাল, হাসল, 'আমি যে আসছি, সেটা লোলাকে জানালাম। তোমাকে দেখে কিরকম অবাক হয়ে যায় দেখবে। আগে যতবার লোকের কথা বলেছি, ততবারই ও বারণ করেছে। কি—না, টাকা খরচ হবে! আরে বাবা, এত টাকা আমি করবটা কী? একজন লোক রাখলে কত সুবিধে হয়। রাত্রিবেলাটা আর বিছানা ছেড়ে ওঠাউঠি করতে হয় না—তা কে শোনে! বেশি বলাবলি করলে, সোজা মুখের ওপর বলে দেবে, 'আমি যদি মাঝরাতে উঠতে পারি, তো তুমিও পারবে'—বুঝলে জ্যাক, এই পঞ্চান্ন বছর বয়সে এত খাটাখাটনি আর পোষায় না! ছিল একদিন, যখন টাকার জন্য দিনে সতেরো ঘণ্টা করে কাজ করেছি! আজ আমার টাকার অভাব নেই।

তা এখন যদি একটু ফুর্তিই না করব, তো করব কবে?—তুমিই বল জ্যাক, লোকে টাকা জমায় কিসের জন্য, অ্যাঁ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল জেনসন।

'আমার নমে হয়, প্রথমে দুঃসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করা দরকার। আর সেটা হয়ে গেলে একটু ফুর্তি না হয় করলেনই—ক্ষতি কী?'

'ঠিক বলেছ!' উল্লাসে আমার হাঁটুর উপর সশব্দে চাপড় মারল জেনসন, 'সেসব ব্যবস্থা আমার হয়ে গেছে। হেসেখেলে বাকি দিন ক-টা আমি কাটাতে চাই। এখন তুমি আছ, আর-কোন চিন্তা নেই। আমি আর লোলা প্রায়ই ওয়েন্টওয়ার্থে বেড়াতে যেতে পারব, কী বল?'

জেনসন বেশ দিলদরিয়া মেজাজেই কথা বলছিল, কিন্তু তার ভিতরেও কোথায় যেন একটা চাপা সংশয় রয়েছে মনে হল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। জেনসনের চোখ সামনের রাস্তায় স্থির হয়ে আছে। ট্রাক এগিয়ে চলেছে—রাস্তার ধারে একটা বড় কাঠের ফলক চোখে পড়ল—

—পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন—

প্রত্যেককে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে—পরের একশ ষাট মাইলের মধ্যে কোন পেট্রল-পাম্প নেই। তেল, মোবিল নেবার এই শেষ সুযোগ!

গাড়ির মেরামতের যাবতীয় কাজ করা হয়।
আপনাদের সুবিধার্থে রেস্তোরাঁ আছে।

ফলকের ঠিক পিছনেই দেখা যাচ্ছে পেট্রল নেবার তিনটে পাম্প। তাদের চারপাশে বাহারী ফুলের গাছ। তাতে ফুটে রয়েছে রঙ-বেরঙের ফুল। কেউ যেন অবহেলাভরে ছুড়ে দিয়েছে একরাশ রঙ। অদূরেই চোখে পড়ছে বাংলো। তার দরজার রঙ সাদা। আর জানালাগুলো গাঢ় নীল পর্দায় ঢাকা। বাংলোর সামনে একটা বারান্দা তার থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে একটা মেঠো পথ এগিয়ে এসেছে রাস্তা পর্যন্ত। তার দু-পাশে পাথর বসানো। সেগুলো আবার সাদা রঙ-করা। বাংলোর পাশেই যে লম্বা একচালা ঘর, সেটাই সম্ভবত রেস্তোরাঁ। এর থেকে একটু দূরেই একটা গ্যারেজ, আর তার পাশেই একটা একচালা গুমটিঘর।

রাস্তার ডানদিকে আমার থাকবার ঘর। একটা পাথরবসানো মেঠো পথ চলে গেছে ঘরের দরজা পর্যন্ত।

এককথায়, পুরো জায়গাটা যেন ছবির মতো। জেনসনের ভাষায় 'নির্জন, বিরক্তিকর জায়গা' যে এত সুন্দর হতে পারে, তা ভাবতে পারিনি।

'বাঃ, ভারি চমৎকার জায়গা তো!' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'শুনে খুব খুশি হলাম, জ্যাক।' জেনসন একগাল হাসল, 'কিন্তু এর পেছনে কি আমাকে কম খাটতে হয়েছে! অবশ্য এরপর আমরা দুজনে মিলে এটাকে আরও ভালো করে তুলব, কী বল?' গাড়ির দরজা খুলে জেনসন নেমে পড়ল। পিছন পিছন আমিও নামলাম। বালি ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাই দায়।

একটা ব্যাপারে আশ্চর্য হলাম। জেনসন আগেই দুবার হর্ন বাজিয়েছে। কিন্তু কই, তা শুনে ভিতর থেকে লোলা তো বেরিয়ে এল না?

কিন্তু আমি যদি জেনসন হতাম, আর ওইভাবে হর্ন বাজাতাম, তবে আশা করতাম, আমার স্ত্রী হর্ন শুনে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে আসবে।

অথচ এতে জেনসনের কোন বিকারই দেখলুম না। যেন এরকম ব্যবহার পেতেই সে অভ্যস্ত। ও আমার ঘরটার দিকে আঙুল দেখাল, 'জ্যাক, তুমি আর দেরি করো না। যাও, হাতমুখ ধুয়ে, দাড়ি কামিয়ে চলে এস। আমি এদিকে তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি।—যাও, যাও—আর বেশি দেরি করো না!' জেনসন আমাকে আস্তে ঠেলা দিল। ওর হাতের ওই সামান্য ধাক্কা খেয়েই পড়ে যাচ্ছিলাম, নিজেকে সামলে নিলাম, 'আমাদের কোথায় দেখা হবে, মি. জেনসন?'

‘খাবার ঘরে’—রেস্তোরাঁটা দেখিয়ে সে বলল। তারপর বালিতে ঢাকা মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলল বাংলোর দিকে।

আমিও পা বাড়ালাম ঘরের দিকে। দরজা খুলতেই বসবার ঘর। বেশ ছিমছাম ভাবে সাজানো—ঘরের এককোনায় একটা টেলিভিশন সেটও রয়েছে। বসবার ঘর পেরোলেই একটা ছোট্ট শোবার ঘর।

শোবার ঘরে জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে গেলাম—হাত-মুখ ধুয়ে দাড়ি কামাতে শুরু করলাম। এক-দিনে আমার গোঁফ বেশ ঘন হয়েছে। ঠিক করলাম—গোঁফটা কামাব না—রাখব। দাড়ি কামানো হয়ে গেলে আয়নায় নিজের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম—গোঁফটার জন্য আমার চেহারা অনেকখানি বদলে গেছে। খবরের কাগজে যদি আমার ছবিও ছাপা হয়ে থাকে, তবু কারও পক্ষে আমাকে চেনা সম্ভব হবে না।

জামাকাপড় পরে বেশ উৎফুল্ল চিত্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম জেনসনের বাংলোর দিকে। তারপর দু-পাশে তাকালাম। পিচ-ঢালা রাস্তা এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গেছে পাহাড়ের ওপারে। আর সামনে পিছনে তাকালে বালি ছাড়া আর-কিছুই চোখে পড়ে না।

মনে মনে আশ্বত হলাম। পুলিশ হয়ত ওকল্যান্ড বা অন্য-কোন শহরে আমার খোঁজ করবে, কিন্তু এই মরুভূমিতে—উঁহু, এখানে খোঁজ করার কথা ওরা চিন্তাই করবে না। ঠিক করলাম, যতদিন পারা যায়, এখানেই থাকব।

রাস্তা পেরিয়ে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের একপাশে সাজানো পাঁচটা টেবিল আর কতকগুলো চেয়ার। এছাড়া কাউন্টারের সামনে গোটা দশেক টুল। কাউন্টারের উপর সাজানো সারি সারি বীয়ার ও সোডার বোতল। একপাশে গোটাদুয়েক আচারের শিশি। তার সঙ্গে রয়েছে একগাদা কাঁচের গ্লাস, ছুরি, কাঁটা-চামাচ আর কাগজের রুমাল। প্রতিটি জিনিসই পরিষ্কার ঝকঝক করছে। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো একটা ফলকে ছাপা হরফে লেখা রয়েছে—

—আজকের খাদ্য-তালিকা—

*

ফ্রায়েড চিকেন

ভিল স্টেকস

বীফ হ্যাশ

ফ্রুট পাই

কাউন্টারের পিছনে আধ-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে রান্নার সুস্বাদু গন্ধ ভেসে আসছে। ভাবছি, কাউন্টারের উপর শব্দ করে কাউকে ডাকব, কানে এল জেনসনের গলা, ‘এই, লোলা শোন, অবুঝ হয়ো না। অনেক ভেবেচিন্তেই আমি জ্যাককে এখানে নিয়ে এসেছি। ও এখানে কাজ দেখাশোনা করলে, আমরা সপ্তাহে দু-চারদিন করে ওয়েন্টওয়ার্থে বেড়াতে যেতে পারব। ওয়েন্টওয়ার্থে তোমারএকা যাওয়াটা আমি পছন্দ করি না। কোন স্ত্রীলোকেরই একা একা সিনেমা যাওয়া ঠিক নয়—বিশেষ করে ওয়েন্টওয়ার্থের মতো একটা বাজে শহরে—।’

‘কেন, ঠিক নয় কেন?’ লোলার তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে এল, ‘একা সিনেমায় গেলে তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে?’

‘শোন, লোলা—’, জেনসন বোঝাতে চাইল, ‘তুমি একজন সম্ভ্রান্ত বিবাহিতা মহিলা। তোমার পক্ষে একা যাওয়াটা ভালো দেখায় না। তা ছাড়া ওয়েন্টওয়ার্থে বহু বাজে লোক আছে যারা—’

‘তুমি কি বলতে চাও, কার্ল? ওয়েন্টওয়ার্থে গিয়ে আমি বাজে লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই?’

‘ছি ছি, লোলা,—তুমি আমার কথা বুঝতে পারনি। আমি শুধু বলেছি, তোমার একা যাওয়াটা ভালো দেখায় না। জ্যাক এখানে থাকলে, তুমি আর আমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতে পারব—তাই না?’

'দ্যাখ কার্ল, একটা কথা তোমাকে হাজারবার বলেছি, আজও বলছি—কোন উটকো লোককে আমি এখানে রাখব না, ব্যস।'

'হ্যাঁ, জানি তুমি বলেছ। কিন্তু এটা বুঝতে পারছ না, একজন লোক রাখা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। ভেবে দেখো তো, কাল রাতে তোমাকে ক-বার বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছে? ছ-বার—ছ-বার তোমাকে উঠে এসে এই হতচ্ছাড়া ট্রাকগুলোকে পেট্রল দিতে হয়েছে!—তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন, লোলা। জ্যাক যদি রাত্রিবেলাটা কাজ করে, তবে আমরা একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি—এ সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না?'

'তোমাকে এক কথা কতবার বলতে হবে, কার্ল?' লোলা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কোন অচেনা লোককে এখানে আমি রাখতে দেব না। আর তাছাড়া ওই লোকটা নিশ্চয়ই বিনা পয়সায় কাজ করছে না?—হুঁ—যত্তসব,—কবে থেকে এরকম টাকা ওড়াতে শুরু করেছ?'

'অভদ্রের মতো চেঁচিয়ো না!' জেনসনের চাপা স্বর শুনতে পেলাম, 'দু-চারদিন দেখাই যাক না। তারপর তোমার যদি পছন্দ না হয়, তো জ্যাককে বারণ করে দিলেই হবে। দেখ, ওর কাজে তুমি অখুশি হবে না। এখন এসব ঝগড়াঝাঁটি বাদ দাও—এস, কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক।'

'তুমি কি করে জানলে লোকটা বিশ্বাসী? ওকে এখানে রেখে আমরা ওয়েন্টওয়ার্থে যাব, আর ও হাত গুটিয়ে থাকবে মনে করেছ? সিন্দুক ভেঙে টাকা হাতিয়ে সোজা কেটে পড়বে! তোমার মাথা ঠিক থাকলে ওকে আনতে না।'

লোলার মনোভাবে অস্বস্তি বোধ করলাম। ওর অমতে এখানে কথাটা কি ঠিক হবে?—সে যা হোক, পরে একটা কিছু ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে। কিন্তু—আপাতত সাড়া দেওয়া দরকার।

রেস্তোরাঁর দরজার কাছে চুপিসাড়ে ফিরে গেলাম। দরজাটা খুলে সশব্দে বন্ধ করলাম—যেন এইমাত্র ঢুকলাম। তারপর গটমট করে এগিয়ে এলাম কাউন্টারের দিকে, 'কেউ আছেন নাকি?'

রান্নাঘরের ভিতর থেকে ভেসে-আসা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। একসময় দরজার খুলে জেনসন বেরিয়ে এল, মুখে কেমন একটা অপ্রতিভ হাসি, 'এস, জ্যাক। ঘরে কেমন লাগল? পছন্দ হয়েছে তো?'

আমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে জেনসন আশ্বস্ত হয়েছে মনে হল। অর্থাৎ লোলার কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া চলতে পারে।

মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে তুললাম, 'পছন্দ হয়নি মানে? সত্যি মি. জেনসন, আপনার 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এর তুলনা নেই।'

জেনসন মাথা নাড়ল। কিন্তু সেই গর্বের হাসি তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে। সম্ভবত, সে লোলার সঙ্গে তার ঝগড়ার কথা ভাবছিলাম।

'জ্যাক, তোমার নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে? দাঁড়াও, আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।' জেনসন আমার কাছে যেন মুক্তি পেল, চটপট এগিয়ে চলল রান্নাঘরের দিকে। তার অস্বস্তি দেখে দুঃখ অনুভব করলাম।

কিন্তু জেনসন রান্নাঘরে পা বাড়াতেই কানে এল বাইরে থেকে ভেসে-আসা কোন গাড়ির হর্নের শব্দ।

'আমি যাব নাকি, মি. জেনসন?' রেস্তোরাঁর দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

'না জ্যাক,—তোমাকে যেতে হবে না, আমিই দেখছি। আগে খেয়ে নাও। তারপর কাজ করার অনেক সময় পাবে।' জেনসন বাইরে চলে গেল।

ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে—বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা জীর্ণ ধূলিমলিন প্যাকার্ড। চালকের নির্দেশে জেনসন গাড়িটার ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালতে লাগল।

হঠাৎ পেছনে সামান্য শব্দ হতেই চমকে ফিরে দাঁড়ালাম।

রান্নাঘরের খোলা দরজার দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। ওর চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে সীমাহীন কৌতূহল।

মেয়েটির মাথাভর্তি একরাশ লাল চুল। কামনা-মদির পুরু ঠোঁট। তিরিশ বসন্তের শরীরে ভরন্ত যৌবন। তার পান্না-পবুজ টলটলে চোখ রক্তে নেশা ধরায়। মেয়েটিকে দেখার পর কোন পুরুষের পক্ষেই ওর যৌবনের হাতছানিকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। ওর পরনে একটা সাদা গাউন—শরীরের সঙ্গে যেন ভেজা কাপড় হয়ে লেপটে আছে।

মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে এল। লক্ষ্য করলাম, ওর গাউনের নিচে কোন অন্তর্বাসের বালাই নেই।

স্থিরদৃষ্টিতে দুজনেই চেয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে। কারুর মুখে কথা নেই।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে জানি না, একসময় খেয়াল হল জেনসন আমার পাশে দাঁড়িয়ে, 'এই যে লোলা, তুমি এসেছ, আলাপ করিয়ে দিই—এই জ্যাক—জ্যাক, এ হচ্ছে লোলা—আমার স্ত্রী।'

মেয়েটি ছোট্ট করে ঘাড় নাড়ল—গভীর সবুজ চোখে শুধুই ঘৃণা।

জেনসন অপ্রতিভভাবে দাঁড়িয়ে গালে হাত বোলাতে লাগল তারপর হঠাৎ কি মনে হতে একগাল হেসে দু-পা এগিয়ে এল, 'লোলা, জ্যাকের বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে। আর আমারও তো দুপুর থেকে কিছু পেটে পড়েনি, দেখ না, যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়।'

ভাবলেশহীন মুখে লোলা জবাব দিল, 'অপেক্ষা কর, আমি আসছি।'

ও ফিরে চলল। চলার সময় স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর ভারী নিতম্বের সুডৌল রেখা। নিটোল ছন্দে হিল্লোল তুলে ও এগিয়ে চলল রান্নাঘরের দিকে।

আমার সারা মুখ তখন ঘেমে উঠেছে। একটা কাগজের রুমাল টেনে নিয়ে মুখ মুছলাম।

'ভীষণ গরম, কী বল জ্যাক?' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে একটু হাসল জেনসন।

'সত্যিই বড্ড গরম—' প্রত্যুত্তরে হাসতে গিয়ে অনুভব করলাম গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে,—চোখের সামনে এখনও হাতছানি দিয়ে ডাকছে লোলার পাগল করা যৌবন!

খাওয়াদাওয়া সেরে আমি আর জেনসন বাইরে এলাম। আমাকে কোন্ কোন্ দিন কাজ করতে হবে, সেটা তার থেকে জেনে নিয়েছি।

সপ্তাহে তিনদিন আমাকে রাতে কাজ করতে হবে। গাড়ি ব্রেকডাউনের ব্যাপার হলে আমাকেই সামলাতে হবে। আর গ্যারেজ এবং পাম্পের কাজটা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

এসব কাজ আমার কাছে সামান্যই মনে হল। তা ছাড়া সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকলে ভালোই হবে—লোলাকে মন থেকে সরিয়ে রাখতে পারব।

বাইরে এসে জেনসন আমাকে দেখিয়ে দিল, কিভাবে পাম্প থেকে পেট্রল দিতে হয়। মোবিল আর পেট্রলের দাম কীভাবে হিসেব করতে হবে, তা-ও বুঝিয়ে দিল। তারপর লোহা-বোঝাই ট্রাকটা খালি করার জন্য আমাকে ডাকল।

এরই মধ্যে সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। দিনের অসহ্য গরম আর নেই। মরুভূমির ঠান্ডা হাওয়ায় ভেসে আসছে অসংখ্য বালুকণা। গোধূলির আলোয় দূরের ধূসর পাহাড় হয়ে উঠেছে রক্তাভ। একটা শান্ত সমাহিত ভাব নেমে এসেছে দিনের উত্তপ্ত মরুভূমিতে।

আমি আর জেনসন মিলে লোহালক্কড়গুলো একে একে নামাতে লাগলাম। কাজ করতে করতে হঠাৎই জেনসন আমার দিকে তাকাল, 'লোলার ব্যবহারে কিছু মনে করো না জ্যাক,—ও ওইরকমই। কেউ এখানে কাজ করুক, তা ও চায় না—কে জানে কেন? হয়ত সব মেয়েরাই ওইরকম—' জেনসনের মুখে চিন্তার ছায়া। কথা বলতে বলতে একটা পুরোনো মরচে-পড়া গাড়ির ইঞ্জিন ও এক হ্যাঁচকায় মাটিতে নামল। ওর শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। অত ভারী ইঞ্জিনটাকে এমনভাবে বয়ে নিয়ে চলল, যেন পালকের তৈরি খেলনা। গুমটিঘরে ওটা রেখে সে ফিরে এল, 'জ্যাক, নাও, একটা সিগারেট ধরা—' পকেট থেকে

সিগারেটের প্যাকেট বের করে সে আমার দিকে এগিয়ে দিল, '—অনেক পরিশ্রম গেছে।—হ্যাঁ, যা বলছিলাম,—প্রথম প্রথম লোলা হয়ত তোমাকে ভালো চোখে দেখবে না—কিন্তু দেখ, কয়েকদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কোন উত্তর দিলাম না।

'তা লোলাকে কেমন দেখলে, সুন্দরী না?'

'হ্যাঁ।' ভয় হচ্ছিল বুকের টিপটিপ শব্দ বুঝি জেনসন শুনে ফেলবে।

'কীভাবে যে লোলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, হুঁঃ—,' জেনসন হাসল, 'ভাবতে অবাক লাগে।—সে ভীষণ মজার ব্যাপার, বুঝলে জ্যাক। আজ থেকে বছর দুয়েক আগের কথা। আমার প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ায়, তখন একাই সব সামলাচ্ছি। মন মেজাজ খুব খারাপ থেকে থেকেই বউয়ের কথা মনে পড়ছে। সমস্ত পরিবেশ যেন আমার মতোই বিষন্ন—নিঃসঙ্গ। চুপচাপ বসে আছি, এমন সময় একটা বাস এসে দাঁড়াল সামনের রাস্তায়। যাত্রীরা সব একে একে নেমে এল প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন হবে। তার মধ্যে লোলাও ছিল। কি অদ্ভুত দেখ, এখনও আমার ছবির মতো সব মনে পড়ছে। এমন কি লোলা কি রঙের পোশাক পরে ছিল, তা-ও মনে আছে। রেস্তোরাঁর কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যাত্রীরা সব হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। সবাই তখন ক্ষুধার্ত, অথচ হাতে সময় মাত্র কুড়ি মিনিট, তারপরই বাস ছাড়বে। আমার তো সাংঘাতিক অবস্থা। একবার রান্নাঘর, আর একবার খাওয়ার টেবিল—এই করে একেবারে হিমসিম খেয়ে যাবার যোগাড়। হঠাৎ দেখি, সবুজ পোশাকে সজ্জিতা একটি সুন্দরী তরুণী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অভ্যস্ত হাতে যাত্রীদের দিকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিচ্ছে—

'যখন বাস ছাড়বার সময় হল, ততক্ষণে সবাইর খাওয়া হয়ে গেছে। মেয়েটি সাহায্য না করলে কি যে করতাম তাই ভাবি! বাস ছাড়ার সময় ওকে জিগ্যেস করলাম, ও আমার এখানে চাকরি করবে কিনা। মেয়েটি তো এক কথায় রাজি। বাস ছেড়ে দিল—কিন্তু ও থেকে গেল।

'তারপর থেকে দুজনে কাজ করি। বেশ ভালোভাবেই দিন যায়—, হঠাৎ একদিন ওয়েন্টওয়ার্থে গিয়ে কানে এল দু-চারটে কথা—আমাকে আর লোলাকে জড়িয়ে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ভেবে দেখলাম, সত্যিই তো, এভাবে আমাদের দুজনের থাকাটা ভালো দেখায় না। সুতরাং ফিরে এসেই ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলাম। আমার থেকে তেইশ বছরের ছোট হলেও, ও রাজি হয়ে গেল।

'এমনিতে মাঝে মাঝে মান-অভিমান করে বটে, কিন্তু লোলা খুব কাজের মেয়ে। ওর মতো মেয়ে আমি আর দুটি দেখিনি। এখন কয়েকদিন একটু অভিমান করে থাকবে। তারপর দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এমন সময়ে একরাশ ধুলো উড়িয়ে একটা ক্যাডিলাক এসে দাঁড়াল। জেনসন আমাকে ওটা দেখতে বলে রেস্তোরাঁয় ফিরে গেল।

পেট্রল দিতে দিতে গাড়ির আরোহীদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলাম। কথায় কথায় জানলাম, এখানে রেস্তোরাঁও আছে, ইচ্ছে করলে তাঁরা খেয়ে নিতে পারেন। কারণ এরপর ট্রপিকা স্প্রিংস পর্যন্ত রাস্তায় কোন দোকান নেই। আমার কথায় রাজি হয়ে ওরা গাড়ি থেকে নেমে রেস্তোরাঁয় দিকে এগিয়ে চলল।

এইভাবে শুরু হল আমার প্রথম কর্মব্যস্ত সন্ধ্যা। গাড়ির পর গাড়ি আসতে লাগল—কাজ করে চললাম, তার সঙ্গে সঙ্গে চলল রেস্তোরাঁর গুণগান—একসময় জেনসন রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এল, 'জ্যাক, চমৎকার! তোমার জবাব নেই! আমাদের ডিনার সব শেষ। আর-কোন খদ্দেরকে খাবার জন্য অনুরোধ করো না। অন্যদিন বড়জোর দু-চারজন এখানে ডিনার খেতে নামে, কিন্তু আজ তোমার পাল্লায় পড়ে প্রায় বিশজন খদ্দের ডিনার খেয়েছে—'

'আপনি কি তা চান না, মি জেনসন?' একটু অবাকই হলাম।

'চাই না আবার!—আরে, আগে কি ছাই বুঝেছি, তুমি এলে বিক্রি পাঁচগুণ বেড়ে যাবে? ঠিক আছে, কাল থেকে দেখা যাবে। কুড়িজন কেন, চল্লিশজন এলেও তুমি আমাকে হারাতে পারবে না!' জেনসন গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল, '—এখন শুধু স্যান্ডউইচ, ডিম আর ফ্রুট পাই শেষ হতে বাকি। দেখ, ওগুলোর যদি কোন ব্যবস্থা করতে পার—' জেনসন খাবার ঘরে ফিরে চলল।

এবার ট্রাকের ভিড় বাড়তে শুরু করল।

এইভাবে ঘণ্টাদুয়েক চলার পর রাত প্রায় দশটার সময়ে তা-ও কমে এল। একনাগাড়ে আধঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পরও যখন কোন গাড়ির হেডলাইট চোখে পড়ল না, তখন ফিরে চললাম খাবার ঘরে।

গিয়ে দেখি, দুজন ট্রাক-চালক কাউন্টারের সামনে টুলে বসে। তাদের সামনের প্লেটে ফ্রুট পাই। আর জেনসন এঁটো প্লেটগুলো ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে একপাশে সাজিয়ে রাখছে। লোলাকে কোথাও দেখলাম না কিন্তু রান্নাঘরের ভিতর থেকে বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ কানে আসছে—অর্থাৎ লোলার।

'মি. জেনসন, আমাকে দিন, আমিই এগুলো ধুয়ে রাখছি।' জেনসনের হাতের প্লেটগুলো দেখালাম।

'না, না—ঠিক আছে। ও আমরা করে দিতে পারব। তুমি আর দেরি করো না,—যাও, শুয়ে পড় গিয়ে। —আজ রাতে আমার পালা, কাল থেকে তোমাকে রাত্তিরে কাজ করতে হবে। যাও, চটপট শুয়ে পড়—'

দরজার দিকে এগিয়ে চললাম। চৌকাঠ পেরোতেই জেনসন পিছু ডাকল, 'জ্যাক!' ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম, 'তোমার কাজে আমি যেমন সন্তুষ্ট, আশা করি তুমিও একাজে অসন্তুষ্ট নও?'

'আপনি যে আমার কাজে খুশি হয়েছে, তাতেই আমি খুশি।' রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে চললাম ঘরের দিকে।

জামাকাপড় ছেড়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। অজস্র চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত। থেকে থেকেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে লোলার ছবি—ও যেন হেঁটে চলেছে রান্নাঘরের দিকে, পরনে সেই সাদা গাউন।

লোলা পরস্ত্রী। ওর কথা এভাবে ভাবা আমার উচিত নয়, কিন্তু তবুও ওর চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

ঘরের জানালার ঠিক পাশেই আমার শোবার খাট। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে-থাকা বাংলোটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম বাংলোর দিকে—ঘুম কিছুতেই আসছে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এভাবে শুয়ে থাকার পর, একসময় বাংলোর একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল। জানালার নীল পর্দা সরানো থাকায় আলোকিত ঘরটা পরিষ্কার চোখে পড়ছে—ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোলা। ওর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তার ধোঁয়ায় ওর মুখটা ঝাপসা দেখাচ্ছে। একটু পরেই শ্লথ পায়ে ড্রেসিং-টেবিলের কাছে গিয়ে, ও সিগারেটটা একটা ছাইদানে গুঁজে দিল। আয়নার মুখোমুখি বসে বাঁ হাতে খুলে ফেলল চুলের কাঁটা। একরাশ চুল বাঁধ-ভাঙা ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল কোমরের কাছে।

উঠে বসলাম, দেখতে লাগলাম লোলাকে। অনুভব করলাম হৃদয়-তোলপাড়-করা উত্তেজনা।

একটা চিরুনি নিয়ে লোলা চুল আঁচড়াতে লাগল। প্রায় মিনিট পাঁচেক পর ও চেয়ার ছেড়ে বিছানার কাছে এগিয়ে এল, উপরের ঢাকনাটা তুলে সরিয়ে রাখল এক পাশে। তারপর জানালার কাছে এসে, ও গাউনের বোতাম খুলতে শুরু করল—সাদা গাউনটা খসে পড়ল মেঝেতে—ও হাত বাড়িয়ে জানলা বন্ধ করে দিল। ঘষা কাচের পাল্লায় ভাসতে লাগল ওর নগ্ন শরীরের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

অন্ধকারে কতক্ষণ ওভাবে বসেছিলাম জানি না। এক সময় খেয়াল হল বাংলোর আলো নিভে গেছে—কানে এল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। চোখ ফিরিয়ে দেখি, একটা ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে সামনের রাস্তায়—আর বাংলোর দরজা খুলে জেনসন ওটার দিকে এগিয়ে আসছে।

অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু সে-রাতে আর ঘুম এল না।

পাঁচ

পরদিন সকালে যখন খাবার ঘরে এলাম, তখন সাতটা বাজে। দেখি, লোলা এক টুকরো কাপড় দিয়ে কাউন্টারের ওপরটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে। ওর পরনে খুব খাটো একটা লাল প্যান্ট, গায়ে হলদে চোলি। এই পোশাক লোলাকে যেন আরও দশগুণ বেশি আকর্ষণীয়া করে তুলছে। আমার চোখ খেলে বেড়াতে লাগল ওর দেহের উপর। এই স্বল্প পোশাকের বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ করছে ওর উদ্ধত যৌবন! মনে মনে জেনসনকে হিংসা করলাম। ওফ্-যে-কোন মুহূর্তে তার সঙ্গে জায়গা বদল করতে আমি রাজি!

লোলা প্রথমে আমাকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে চোখ তুলে তাকাল—মুখে বিরক্তির ভাব। তারপর আবার কাজে মন দিল।

‘সুপ্রভাত, মিসেস জেনসন—দিন, আমিই ওটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি।’

ঘৃণাভরা চোখে আমাকে দেখল লোলা, ‘প্রয়োজন হলে তোমাকে বলা হবে।’

কাউন্টারের উপর ঝুঁকে পড়ে ও সামনের দিকটা ঘষতে লাগল। ঝুঁকে পড়ায় চোখের পড়ল ওর সুগঠিত দুই স্তন—অন্তর্বাসের অনুপস্থিতি।

হঠাৎ কি মনে হতে লোলা মুখ তুলে তাকাল, বুঝতে পারল আমার মনোযোগের কারণ, ‘হাঁ করে কী দেখছ?’

‘কই, কিছু না তো?’ চটপট কাউন্টার পার হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

রান্নাঘরের টেবিলের কাছে জেনসন বসেছিল। টেবিলের উপর স্তূপীকৃত নোট আর খুচরো পয়সা। একপাশে একটা খালি প্লেট, ছুরি, কাঁটা-চামচ, আর এক কাপ কফি। আমাকে দেখে সে হাসল, ‘এস, জ্যাক, ভেতরে এস। কী খাবে বলো? স্যান্ডউইচ, ডিম?’

‘না, মি. জেনসন, শুধু এক কাপ কফি।’ স্টোভে বসানো কফির কেটলির দিকে এগিয়ে গেলাম।

‘এদিকের সব কাজ সারা হয়ে গেলে, আমি আর লোলা ওয়েন্টওয়ার্থে যাব, কিছু জিনিসপত্র কেনার আছে। গতকাল যা বিক্রি হয়েছে, গত ক-বছরের কোন দিন ওর অর্ধেকও বিক্রি হয়নি। জ্যাক, ঠিক করেছি এবার থেকে রেস্তোরাঁর বিক্রির ওপর তোমাকে পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন দেব, খুশি তো?’

‘ধন্যবাদ, মি জেনসন।’ কফির কাপ নামিয়ে রাখলাম।

‘ওয়েণ্টওয়ার্থ থেকে ফেরার সময় একটা অ্যাপ্রণ নিয়ে আসব— তোমার কাজ করার সুবিধে হবে। আর-কিছু লাগবে’

‘কিছু জামাকাপড়ের প্রয়োজন ছিল—থাকগে, ও আমি নিজে গিয়েই কিনে আনব।’

‘সেই ভালো। কাল গাড়ি নিয়ে যেও তোমার পছন্দমতন কিনে এনো। এই নাও—এই একশ ডলার রাখ। রেস্তোরাঁর কমিশন হিসেবে আগাম দিলাম। এতে হবে তো?’ পাঁচটা বিশ ডলারের নোট সে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুব হবে। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব—’ হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিলাম।

‘আরে ধন্যবাদের কি আছে? এ তো তোমারই পাওনা টাকা থেকে দিলাম!—তাহলে কালই তুমি ওয়েন্টওয়ার্থে যাচ্ছ?’

‘হ্যাঁ।’

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জেনসন, ‘জ্যাক, কাল যে পুরোনো ইঞ্জিনটা দেখলে, ওটা ওজন-দরেই কিনে এনেছি, কিন্তু ভাবছি ইঞ্জিনটার পেছনে একটু খাটলে, হয়তো ওটাকে চালু করা যাবে। তুমি কি বল?’

‘আমি একটু পরেই যাচ্ছি—ওটাকে নেড়েচেড়ে দেখব’খন।’

‘কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যে আমি আর লোলা বেরিয়ে পড়ছি, তুমি একা কি পারবে?’

‘কেন পারব না?’

কফির কাপটা ধুয়ে রাখলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে খাবার ঘরে গেলাম।

লোলা পিছন ফিরে ফ্রুট পাই-এর জারে লেবেল লাগিয়ে রাখছিল—যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। শরীরের রক্ত-চলাচল দ্রুত হয়ে উঠল। যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, গত রাতে জানালায় দাঁড়িয়ে-থাকা লোলাকে।

ও হয়তো আমার উপস্থিতি টের পেয়েছিল। কারণ লেবেল লাগাতে লাগাতে ওর হাত থমকে গেল,—কিন্তু ঘুরে তাকাল না। আর অপেক্ষা না করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

সকালে হালকা রোদে বেশ ভালোই লাগছে। রাতের ঠান্ডা আমেজটা যেন যাই-যাই করেও যায়নি। একটা ঝাঁটা নিয়ে পাম্পের কাছটা ঝাঁট দিতে শুরু করলাম।

একটু পরেই দুটো ট্রাক এসে দাঁড়াল তেল নেবার জন্য। তেল দেওয়া হয়ে গেলে ট্রাক-চালকদের ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে অনুরোধ করলাম, কিন্তু তাড়া থাকায় ওরা রাজি হল না।

ঝাঁট দেওয়া শেষ করে গুমটিঘরে গেলাম—সেখানে ইঞ্জিনটা নিয়ে পড়লাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে জেনসন আমার পাশে এসে দাঁড়াল, 'আমরা বেরোচ্ছি, জ্যাক। তোমার কোন অসুবিধে হবে না তো?'

'না, না আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ঠিক পারব।'

জেনসন ওর পেশীবহুল হাত আমার কাঁধে রাখল, 'আগে মরচেটা তুলে ফেলার ব্যবস্থা কর, তারপর বাকিটা আমি দেখব। আচ্ছা জ্যাক—তাহলে চলি।'

জেনসনের পিছন পিছন গুমটিঘরের দরজা পর্যন্ত এলাম। দেখি, বাংলো থেকে লোলা বেরিয়ে আসছে। পরনে একটা সবুজ রঙের আঁটসাঁট সুতী পোশাক।

জেনসন আমার কোমরে এক খোঁচা মারল, 'কি হে, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে! দেখেছ, কিরকম সেজেছে আমার বউ?'

বোকার মতো হাসলাম, 'আপনার স্ত্রী সত্যিই সুন্দরী, মি. জেনসন।'

'সবাই তো তাই বলে' জেনসনের মুখে গর্বের হাসি, 'যাক্ গে, চলি—আবার দুপুরে দেখা হবে।'

ওদের গাড়ি একরাশ ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চারপাশে তাকালাম—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্নকে'। সত্যিই, এরকম একটা জায়গা যদি আমার থাকত! আর থাকত লোলার মতো সুন্দরী স্ত্রী!

নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আবার ইঞ্জিনটার কাছে ফিরে গেলাম।—কি হবে এসব ভেবে? কিন্তু নাঃ, লোলার চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলা অসম্ভব। গত রাতের কথা বারে বারেই মনে পড়ছে—কিছুতেই স্থিরভাবে কাজ করতে পারছি না।

এইভাবে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। এক সময় দেখি, একটা লড়ঝড়ে শেভ্রলে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে গুমটিঘরের দরজায়। আরোহী গাড়ি থেকে নামল। বয়স বছর চল্লিশেক হবে। লম্বা, রোগা চেহারা। পরনে রঙ-ওঠা একটা নীল প্যান্ট, ময়লা কালো জামা। গলায় বাঁধা একটা লাল রুমাল। মাথার বাদামী রঙের টুপি—রোদে তার রঙ জ্বলে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

আগন্তুক গুমটিঘরে এসে ঢুকল। কাছ থেকে আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখলাম—রোদে-পোড়া চেহারা, হনু বের করা মুখ, চোখ নাক, পাতলা ঠোঁট। ঘন ভুরুজোড়ার নিচে স্থির অন্তর্ভেদী চোখ।

তাকে দেখেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করলাম। মনে হল, লোকটার চেহারার কেমন একটা পুলিশি ভাব। বিশেষ করে, ওই অন্তর্ভেদী, সন্দেহে ভরা শিকারী চোখজোড়ায়।

আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। শেষে আমিই চোখ সরিয়ে নিলাম, ইঞ্জিনটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'কী চাই?' তার চোখে সেই একই চাউনি—যেন আমার ভিতরটা তন্নতন্ন করে দেখছে।

লোকটা আয়েশ করে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ওর পায়ের কাছে, চুপটি করে লেজ গুটিয়ে বসে আছে একটা হলদে কুকুর, রোগা হাড়জিরজিরে চেহারা, লাল চোখ দুটোয় বিষাদভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। গলায় বকলসও রয়েছে একটা।

প্যান্টের পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকাল লোকটা, 'চাই তো অনেক কিছুই! যেমন ধর, জানতে চাই তোমার পরিচয় এখানে তুমি কী করছ,—হয়ত জানতে চাই—মি. জেনসন এখন কোথায় আছেন।—হয়ত তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই, 'নিজের চরকায় তেল দিন' উপদেশটা, কী বল?' শেয়ালের মতো খিকখিক করে হেসে উঠল লোকটা।

রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। কিন্তু না,—লোকটা কে, সেকথা না জেনে কিছু বলে বসা ঠিক হবে না। ঠান্ডা স্বরেই জবাব দিলাম, 'মি. জেনসন ও মিসেস জেনসন ওয়েন্টওয়ার্থে গেছেন। আর আমি জ্যাক প্যাটামোর, এখানে নতুন চাকরিতে ঢুকেছি।'

'তাই নাকি!' দরজা ছেড়ে সে দু-পা এগিয়ে এল। 'তার মানে কার্ল তোমাকে চাকরি দিয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হুঁ—ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! আমি তো ভাবতেই পারিনি ওর বউয়ের অমতে কার্ল এখানে লোক রাখবে।' কথা বলার সময় তার সন্দেহভরা চোখ আমার ময়লা পোশাক, ছেঁড়া জুতো, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, এমন সময় আপমনমনেই মাথা নাড়ল, 'উঁহু—ভারি আশ্চর্য!' চোয়ালে হাত বুলিয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, 'আমি কার্লের শ্যালক। আমার নাম রিক্স—জর্জ রিক্স।'

অনুমানে মনে হল, এ নিশ্চয়ই জেনসনের মৃতা স্ত্রীর ভাই, লোলার কেউ নয়। সুতরাং বাজে কথায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই ভেবে ইঞ্জিনটার দিকে মনোযোগ দিলাম।

'কার্লের সঙ্গে ওর বউও ওয়েন্টওয়েৰ্থে গেছে?' পিছন থেকে রিক্সের স্বর ভেসে এল।

'হ্যাঁ।' মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলাম।

'তার মানে তুমি এখানে একা?'

'ঠিক ধরেছেন।'

শ্লেষটা রিক্স বুঝতে পারল কিনা জানি না, হঠাৎ ঘাড়ের উপর তার উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করলাম। গিয়ার-বক্সের উপর থমকে দাঁড়াল আমার কর্মব্যস্ত হাত।

'এসবে পুরোনো মাল কেনা-বেচার ব্যাপারে কার্লের বুদ্ধি আছে, কিন্তু মানুষ চিনতে ওর সময় লাগে—সেরকম বুদ্ধি ওর নেই?'

ইঞ্জিনটার উপর ঝুঁকে থাকায় সে আমার মুখের পরিবর্তন দেখতে পেল না। কারণ, রিক্স কি করে জানবে, সবসময় আমি শুধু লোলার কথাই ভাবছি!

'ভালোই—' স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে ক্লাচ-প্লেট খুলতে শুরু করলাম।

'ভালো? তোমার তাই মনে হয়? কিন্তু জেনে রেখো চাঁদ, লোলা তোমাকে পছন্দ তো করেই না, এখানেই কেউ কাজ করুক তা-ও সে চায় না—আমাকেই বলে তাড়াতে পারলে বাঁচে! হু—ওরমক একটা উটকো মেয়েকে কার্ল যে হুট করে বিয়ে করে বসবে তা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু লোলা সেয়ানা মেয়ে। কার্লের মতো পয়সাওয়ালা লোককে ও হাতছাড়া করতে চায়নি। তাই ওর সামনে যৌবনের মায়াজাল বিছিয়ে টোপ ফেলেছে। আর কার্লটাও তেমনি বুড়ো গর্দভ, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করে বসল,—কিন্তু, তুমি সাবধানে থেকো বৎস, মনে রেখো, তোমাকে বেশিদিন এখানে থাকতে হচ্ছে না। কার্লকে যেমন করে হোক রাজি করিয়ে, ও তোমাকে তাড়াবেই—কেন জান?'

যেন খুব অবাক হয়ে গেছি, এরকম একটা ভাব করে, বোকা-বোকা চোখে বেশ কিছুক্ষণ রিক্সের দিকে চেয়ে রইলাম, 'আপনি কী বলছেন! কিছুই তো বুঝতে পারছি না!— আমি এখানে শুধু চাকরিতে ঢুকেছি।'

রিক্স দাঁত বের করে হাসল, পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে আবার দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল, ‘হ্যাঁ, তুমি এখানে চাকরিতে ঢুকেছ ঠিক কথা, কিন্তু কেউ কার্লের টাকায় ভাগ বসাক, তা লোলা চাইবে না। সমস্ত টাকা ও একাই নিতে চায়।—আমি জানি। আমার চোখকে ও ধোঁকা দিতে পারবে না। শুধু টাকার জন্যই ও কার্লকে বিয়ে করেছে। লোলাকে চিনতে তোমার এখনও অনেক বাকী আছে।’

‘তাছাড়া, তুমি হয়ত জানা না, কার্ল অত্যন্ত মিতব্যয়ী। বছরের পর বছর ও শুধু টাকা জমিয়ে গেছে। বিনা প্রয়োজনে একটা পয়সাও খরচা করেনি। তাই বলে ভেব না ও কঞ্জুস। কারুর উপকার করার সুযোগ পেলে, কার্ল টাকা ছড়াতে কখনোই দ্বিধা করবে না, আর লোলা সেটা ভালোভাবেই জানে। তাই সবসময়—তুমি জান, লোলা এখানে আসার আগে কার্ল আমাকে কত খাতির করত। এমনকি ডেকে খাওয়াত পর্যন্ত! কিন্তু আজ? —হুঁ আমি এলেই শ্রীমতী লোলা বিরক্ত হন। আর, কার্ল যদি ওর অমতে আমাকে খেতে দেয়—তবে কি হয় জান? রাত্রিবেলা শোবার ঘরের দরজা লোলা বন্ধ করে দেয়।’ রিক্স হাত দিয়ে চাবি ঘোরানোর একটা ভঙ্গি করল, ‘কার্লটাও তেমনি ভোঁদাই, বউয়ের সঙ্গে এক খাটে জড়াজড়ি করে না শুলে ওর না ঘুমই আসে না! এবার বুঝেছ, প্যাঁচটা কোথায়? লোলার অমতে কোন কাজ করলেই শোর ঘরের দরজায় তালা, ব্যস!’ আবার শেয়ালের মতো খিকখিক করে হেসে উঠল রিক্স, ‘তবে তুমিও এখানে আর বেশিদিন নেই। লোলা হয়ত ভাবছে, ওর মতো তুমিও কার্লের টাকা হাতানোর ধান্দায় আছ।’

কোন জবাব না দিয়ে কাজ করে চললাম। ক্লাচ-প্লেটগুলো পেট্রলে ভিজিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। যন্ত্রপাতির তাক থেকে একটা কাপড় নিয়ে হাতের কালি মুছতে লাগলাম।

রিক্স তখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু আমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করল।

‘আচ্ছা—শুধু শুধু আর তোমার সময় নষ্ট করব না,’ দরজা ছেড়ে রিক্স এগিয়ে এল, ‘বাড়িতে একটা কাজের জন্য আমার কয়েকটা যন্ত্রপাতি দরকার। অন্য সময় কার্লের থেকেই নিয়ে যাই—কিন্তু সে তো এখন নেই, কি আর করা—,’ বলতে বলতে সে যন্ত্রপাতির তাকের কাছে এগিয়ে গেল, ‘দেখি, কোনটা লাগবে—।’ হাত বাড়িয়ে রিক্স দুটো স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা হাতুড়ি তুলে নিল, তারপর হাত বাড়াল একটা ড্রিল-এর দিকে।

‘মি. রিক্স, ওগুলো আপনাকে দিতে পারছি না বলে দুঃখিত।’

থমকে দাঁড়াল রিক্স, ভাবলেশহীন মুখে ফিরে তাকাল, ‘তার মানে?’

‘মি. জেনসন তো এখানে নেই, তাঁর অনুমতি ছাড়া যন্ত্রপাতি দেওয়াটা ঠিক হবে না। আপনি অপেক্ষা করুন, তিনি ফিরে এলে তাঁকে বলে নিয়ে যাবেন।’

রিক্স আমার কথায় কর্ণপাত না করে ড্রিলটা তুলে নিল। আবার হাত বাড়াল একটা করাতের দিকে, ‘ওর জন্য ভেব না, দোস্ত। আমি কার্লের আত্মীয়। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ অচেনা কাউকে যন্ত্রপাতি দেওয়াটা ঠিক নয়—কিন্তু আমার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি এগুলো নিলে কার্ল কিচ্ছু মনে করবে না।’

আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। রাগে, বিরক্তিতে রিক্সের দিকে এগিয়ে গেলাম, ‘আমি দুঃখিত, মি. রিক্স! মি. জেনসনের অনুমতি ছাড়া আমি কোন জিনিস কাউকে দিতে পারি না।

দপ করে জ্বলে উঠল রিক্সের শিকারী চোখজোড়া, ‘শোন দোস্ত, তুমি এখানে নতুন চাকরিতে ঢুকেছ সেটা কি খোয়াতে চাও? আমি যদি কার্লকে বলি—’

‘দয়া করে তাই বলুন গিয়ে! মি. জেনসন না বললে একটা যন্ত্রপতিও আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না—আমি নিরুপায়। আর আপনার যদি সেরকম দরকার থাকে, তবে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, মি. জেনসন এসে পড়বেন।’

'ও—এই ব্যাপার!' রিক্সের সারা মুখ ঘেমে উঠেছে, মুখটা যেন হয়ে উঠেছে আরও কুৎসিত। আর কুকুরটা ভয় পেয়ে গাড়ির দিকে ছুটল, 'তাহলে তুমিও লোলার সঙ্গে ভিড়েছ, অ্যাঁ? কার্লের টাকার লোভ তোমার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না! তাহলে কি লোলার সঙ্গে খাটবাজি করছ?'

মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল। খামচে ধরলাম রিক্সের জামার কলার। দুবার ঝাঁকানি দিয়ে এক ঝটকায় দরজার দিকে ছিটকে ফেলে দিলাম, 'বেরো শালা এখান থেকে! বেরো—'

রিক্সের হাত থেকে যন্ত্রপাতিগুলো ছিটকে পড়ল। গলায় হাত বোলাতে বোলাতে সে উঠে দাঁড়াল। মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে, চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি, 'ঠিক আছে!—দাঁড়া শালা, কার্লকে তোর ব্যবস্থা করছি—'

কিন্তু আমি তেড়ে যেতেই, ও ছুট লাগাল গাড়ির দিকে। কুকুরটা তখন লেজ গুটিয়ে গাড়িতে বসে জুলজুল করে তাকিয়ে রয়েছে। রিক্স মুহূর্তমাত্র দেরি না করে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। একরাশ ধুলোর মেঘে ওর গাড়িটা ঢাকা পড়ে গেল।

একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। এ-ব্যাপারটা জেনসনের কানে গেলে কি হবে কে জানে! তবে ভরসা এই, রিক্সের নালিশ শোনার আগেই, আমি আমার সাফাই গাইতে পারব।

দুপুরের দিকে মালপত্তর কিনে জেনসন ফিরে এল। গাড়ি থেকে মাল নামাতে নামাতে তাকে রিক্সের ব্যাপারটা বললাম। কিন্তু লোলার সম্বন্ধে যে-কথাগুলো শুনেছি, সেগুলো চেপে গেলাম, '—তার সঙ্গে শেষে একটু খারাপ ব্যবহার করতে হয়েছে, মি. জেনসন। মি. রিক্স কিছুতেই আমার কথা না শোনায় তাকে আমি তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।'

জেনসন সশব্দে হেসে উঠল, 'ঠিক করেছ। জর্জ ব্যাটা এক নম্বরের বদমাশ। আগে যতবারই জিনিসপত্র নিয়ে গেছে, একবারও ফেরত দেয়নি। এখন লোলা আসাতে ব্যাটা টিট হয়েছে, এদিক আর মাড়ায় না। বহুদিন ওর দেখা পাইনি—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ও আবার আসবে।—তবে তোমাকে বলে রাখছি জ্যাক, আমি না থাকলে ওকে একটা জিনিসও দেবে না।'

নিশ্চিন্ত হলাম। জেনসন যে আমার উপর রাগ করেনি তাতেই আমি খুশি। কিন্তু মনে হল রিক্সকে রাগিয়ে আমি বোধহয় ভালো করিনি—। এবার থেকে ওর উপর নজর রাখতে হবে। বলা যায় না, কোনদিন হয়তো আমার অজান্তেই ও আমার বিপদ ডেকে আনবে!

পুব আকাশে দেখা দিয়েছে ভোরের সূর্য। একটা হালকা কুয়াশা ছড়িয়ে রয়েছে মরভূমির আবহাওয়ায়। তারই আস্তরণ ভেদ করে চোখে পড়ছে ভোরের বিবর্ণ, রক্তিম আভা। দূরের ধূসর পাহাড়ের ছায়া যেন পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে মরুভূমির বালির উপর। দুপুরের রৌদ্রকরোজ্জ্বল চোখধাঁধানো বালির সমুদ্র এখন আবিরে রাঙানো, স্নিগ্ধ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম গত তিন সপ্তাহের কথা—জেনসনের কথা—লোলার কথা। এ তিন-সপ্তাহ এখানে কাটানোর পর ফার্নওয়ার্থকে মনে হয় এক মিথ্যে দুঃস্বপ্ন। জীবনের সেই অধ্যায়টা যেন কেউ সযত্নে মুছে ফেলেছে স্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে। হয়ত ওরাও ভুলে গেছে শেট কারসন নামে কয়েদীর কথা। কে জানে?

লোলা আমাকে এখনও সহজভাবে নিতে পারেনি। খুব প্রায়াজন ছাড়া কথা বলে না। কিন্তু ওর প্রভাবকে আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি—পারব কিনা জানি না।

জেনসনকে যতই দেখছি, ততই ভালো লাগছে। এত চমৎকার, সরল মানুষ আমি জীবনে আর দেখিনি। শ্রদ্ধায় মন ভরে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে কাজ করেছি, আর শুনেছি তার জীবনের কাহিনী।

একথা ঠিক, লোলাকে জেনসন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু আড্ডা দেওয়া, তাস খেলা ইত্যাদির জন্য কোন পুরুষ সঙ্গী ওর প্রয়োজন ছিল। তাই আমাকে নিয়ে একেবারে মেতে উঠেছে।

নাঃ, এরকম লোকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারব না—মরে গেলেও না।

জেনসনের মুখ থেকেই শুনেছি, কিভাবে আয়কর ফাঁকি দিয়ে বছরের পর বছর সঞ্চয় করে, সে এক লাখ ডলার জমিয়েছে। এ টাকাটার একটা মোটা অংশ যে পুরোনো লোহালক্কড় থেকে এসেছে, তা জেনসন নিজেই বলেছে। ওর একমাত্র ইচ্ছে, আরও কিছু জমিয়ে, বছর দুয়েক পর এসব ছেড়েছুড়ে, লোলাকে নিয়ে পৃথিবীভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে। রাজার হালে থাকবে, খাবে। তারপর বেড়ানো হয়ে গেলে, ফিরে এসে কিছু মূলধন নিয়ে আবার একটা ব্যবসা ফাঁদবে।

একদিন মুখ ফসকে বলেই ফেলেছি, 'মিসেস জেনসন কি একথা জানেন?'

'কত টাকা জমিয়েছি তা জানে, কিন্তু তা দিয়ে কি করব, সেটা এখনও বলিনি। শেষ সময়ে বলে একেবারে চমকে দেব।' জেনসন আত্মতৃপ্তির হাসি হেসেছে। কিন্তু একটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছি মনে পড়েছে রিক্সের কথাগুলো—লোলা টাকার জন্যেই জেনসনকে বিয়ে করেছে!

বিছানা ছেড়ে উঠতেই নজর পড়ল রেস্তোরাঁর বারান্দার দিকে। লোলা একটা চেয়ারে বসে ছুরি দিয়ে তরকারি কুটছে। এমন সময় দৈনন্দিন জিনিসপত্র নিয়ে একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল। রোজ সকাল ছ-টায় এই ট্রাকটা এসে রান্নার জিনিসপত্র দিয়ে যায়। ট্রাক-চালক জিনিসপত্র-ভর্তি বাক্সটা নিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে চলল। লোলাও অনুসরণ করল তাকে।

আজ আমার মাইনের দিন।

বাথরুমে স্নান করতে করতে ভাবছিলাম, কোথায় ফার্নওয়ার্থ আর কোথায় জেনসনের আন্তরিকতা—নেহাত ভাগ্য আর বুদ্ধির জোরে আজ এই সুখের স্বর্গে পা রাখতে পেরেছি। এবং এই ভাবেই বাকি জীবনটা আমি কাটিয়ে দিতে চাই।

প্রাতরাশ সেরে গুমটিঘরে গেলাম। আগের দিন জেনসন একটা পুরোনো মোটর কিনে এনেছিল, সেটা সারাতে বসলাম। কিছুক্ষণ বাদেই জেনসন এসে উপস্থিত হল, হাতের মুঠোয় একগোছা নোট, 'জ্যাক, নাও—ধর। এখানে আড়াই-শ ডলার আছে—মাইনের চল্লিশ, রেস্তোরাঁর কমিশন এক-শ দশ, আর সেই খাজা ইঞ্জিনটার জন্য এক-শ। —জান, সেই ইঞ্জিনটা আমি দু-শ ডলারে বেচেছি?'

'কিন্তু—মি. জেনসন—এত টাকা—'

'শোন ছেলের কথা! আরে, তোমার জন্যই তো আজ আমার ব্যবসা এত ফুলে ফেঁপে উঠেছে! তুমি আসার পর থেকেই লাভের অঙ্ক দ্বিগুণ হয়ে গেছে—নাও, নাও, যা দিচ্ছি ধর, আর তর্ক করো না!'

'আপনি যখন বলছেন—' হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিলাম, 'কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কি?'

'না—বলছিলাম, এগুলো নিয়ে আমার কাছে মোট পাঁচ-শ দশ ডলার হল, কিন্তু টাকাগুলো খরচ করার তো কোন রাস্তা দেখছি না। বরং, যদি আপনার ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন, তাহলে টাকাগুলো ওখানেই রাখতে পারি—।'

'ব্যাঙ্ক? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—' জেনসনের হাসির দমক আর থামতেই চায় না—, 'ব্যাঙ্কে কখনও কেউ টাকা রাখে? পাগল নাকি! কখন কোন ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বালবে কেউ বলতে পারে? আমি আমার সমস্ত টাকা একটা সিন্দুকে রাখি। বুঝলে হে, একেবারে হাতের কাছে—যখন ইচ্ছে খরচ করতে পারব। তাছাড়া আমার ভালোমন্দ কিছু একটা হলে, লোলা সহজেই টাকাটা পেয়ে যাবে। সইসাবুদের কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না। তুমি ইচ্ছে করলে তোমারটাও আমার কাছে জমা রাখতে পার, জ্যাক। যখন খুশি চেয়ে নেবে। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কি আছে, বল? হয়ত সুদের লোভে ব্যাঙ্কে রাখতে গেলে, আর ব্যাঙ্কও লালবাতি জ্বালাল—ব্যস—পুরো টাকাটাই জলে!'

হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ালাম, নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম জেনসনের দিকে।

'তার মানে—ওই লাখ ডলার আপনি একটা সিন্দুকে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?—হুঁ হুঁ বাবা, যে-সে সিন্দুক নয়, রীতিমতো লরেন্স কোম্পানির সিন্দুক—বাজারের সেরা!' জেনসনের মুখে গর্বের হাসি আর ধরে না, তুমি তো সিন্দুকের কাজে ছিলে, তুমিই বল—ওর চেয়ে ভালো সিন্দুক আর আছে?'

ভালোই বটে! খুলতে দু-মিনিটের বেশি লাগবে না—ভালো নয়?

কিন্তু জেনসনকে তো আর সেকথা বলা যায় না। তাই ওর কথায় সায় দিলাম, 'সত্যিই, ওর চেয়ে ভালো সিন্দুক বাজারে আর নেই।'

আনন্দে সে আমার পিঠে এক চাপড় কষিয়ে দিল, 'যাও, টাকাগুলো নিয়ে এস। সিন্দুকে জমা করে একটা রসিদ দিয়ে দিই। দরকার পড়লেই চাইবে, লজ্জা করবে না—সঙ্গে-সঙ্গে পেয়ে যাবে।'

আমি আর কিছু না বলে তোশকের তলা থেকে সব টাকা বের করে এনে জেনসনের হাতে তুলে দিলাম। সে আমাকে পাঁচ-শ দশ ডলারের একটা রসিদ দিল। রসিদটাও এক পলক দেখে নিয়ে পকেটে ভরলাম।

টাকাগুলো পকেটে রেখে জেনসন ঘড়ি দেখল, 'বেলা হয়ে এল। একটু পরেই বাস এসে পড়বে। প্রায় ৩০-৩৫ জনের খাওয়ার যোগাড় করতে হবে। জ্যাক, তুমি বরং রান্নাঘরে গিয়ে লোলাকে সাহায্য কর টাকাটা রেখে এসে আমি এদিকটা সামলাচ্ছি। যাও, এখন থেকেই লেগে পড়, পরে আর থৈ পাবে না।'

সম্মতি জানিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়ালাম।

লোলা ফ্রুট পাইগুলো জারে জারে সাজিয়ে রাখছিল, আমি ঘরে ঢুকতেই পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল। ওর সবুজ চোখে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে। সারা মুখে খেলা করছে একটা চাপা কৌতুক।

'কোন কাজ আছে নাকি, মিসেস জেনসন?'

হাসল লোলা। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুক ধড়াস করে উঠল! কী ব্যাপার? আজ পর্যন্ত একদিনও আমাকে দেখে হাসেনি। তাহলে আজ কেন—

'অনেক-ক কাজ আছে, ——মি-স-টা-র প্যা-ট-মো-র।' লোলার হাসি আরো ক্রূর হয়ে উঠল।

মুহূর্তে বিপদের লাল সংকেত ভেসে উঠল চোখের সামনে। মিস্টার প্যাটমোর? কথা বলার সুরটা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে না!

'রান্নাঘরে যাও। সকালে যে জিনিসপত্রের বাক্সটা দিয়ে গেছে, ওটা আমি টেবিলের ওপর তোমার জন্য খুলে রেখে এসেছি। গেলেই দেখতে পাবে, স—ব রয়েছে,' লোলা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, 'ভেতরের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখ দিয়ে।'

রান্নাঘরে গেলাম। দেখি, টেবিলের উপর ছড়ানো রয়েছে কতকগুলো খাবারের টিন, পলিথিনে মোড়া দু-ডজন মুরগি, তাছাড়া অন্যান্য কিছু জিনিসপত্র।

খাবারের টিনগুলোর উপরে রাখা রয়েছে, একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ—সম্ভবত কোন-কিছু মোড়া ছিল। ওটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করলাম। অর্ধেকটা খুলতেই বুকের ভিতর বিস্ফোরণ ঘটল—চোখের সামনে যেন মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে—

কাগজের প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফের লেখা—

—কুখ্যাত সিন্দুক লুণ্ঠনকারী আজও পলাতক—

তার নিচে আমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ছাপানো ফটোটার দিকে চোখ পড়তেই অনুভব করলাম মৃত্যুর অশরীরী স্পর্শ। এমনিতে ফটোটা অত্যন্ত বাজে ছাপা হয়েছে বলতে গেলে আমাকে চেনা যায় না। কিন্তু লোলার তাতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি।

ফটোটার উপর পেন্সিল দিয়ে ও আমার গোঁফটা নিখুঁতভাবে এঁকে দিয়েছে।

ফার্নওয়ার্থকে আর মিথ্যে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হল না। চোখের সামনে ভেসে উঠল তার বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য!

ওকল্যাণ্ডের খবরের কাগজ কি করে ওয়েন্টওয়ার্থের দোকানে গেল, তা বলতে পারি না। আর সেটা যেভাবে 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এ এসেছে, তাকে নিয়তির নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায়!

আমার শান্তি, নিরাপত্তার সুখ-স্বপ্ন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

লোলা কি জেনসনকে একথা বলেছে?

না, এখনও বোধহয় বলেনি। বলে থাকলে, জেনসনের কথাবার্তায় তা বুঝতে পারতাম। এখন তাহলে লোলার ফোন করার অপেক্ষা। ফোন পেয়েই পুলিশভ্যান এসে আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে ফার্নওয়ার্থে। তারপর?—হয়তো বাকি জীবনটা বিকলাঙ্গ হয়েই কাটাতে হবে—

তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা নিয়ে জ্বলন্ত স্টোভে গুঁজে দিলাম। দেখতে দেখতে ওটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কিন্তু এবার কি করব? পালব?—কিন্তু কেমন করে?

তাছাড়া পালানোর পর লোলা যদি ফোন করে পুলিশকে জানিয়ে দেয়, আমি এখানে ছিলাম, তাহলে প্রথমেই ওরা যে-শহরে আমার খোঁজ করবে, তা হল ট্রপিকা স্প্রিং। আর ওকল্যান্ডে ফিরে যাব, সে-সাহসও আমার নেই। তাহলে উপায়?

না, তার চেয়ে বরং ট্রপিকা স্প্রিংসেই যাওয়া যাক। তারপর সেখান থেকে অন্য কোথাও পালানো যাবে। পাঁচ-শ ডলার তো আছেই সে-টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ন্যু-ইয়র্কের প্লেন ধরে—। কিন্তু পাঁচ-শ ডলার? মনে হল, কেউ যেন বরফশীতল হাতে আঁকড়ে ধরেছে আমার হৃদপিণ্ড! কোথায় টাকা? সে তো জেনসনের হাতে আধঘণ্টা আগেই তুলে দিয়েছি! আমার এখনই যদি টাকা চাই, তবে কি জেনসন সন্দেহ করবে না?

বিস্ময়-বিভীষিকায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে।

এমন সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে ভিতরে এসে ঢুকল লোলা। ওর চোখের স্থিরদৃষ্টি যেন আমার মনোভাব আন্দাজ করতে চাইছে।

'কী হল, এখনও ওগুলো গুছিয়ে রাখনি?' গলার স্বরে কি ব্যঙ্গের আভাস রয়েছে? নাকি আমার শোনবার ভুল?

'এই যে, রাখছি।'

হারামজাদী মাগী! তুই কি এর মধ্যেই পুলিশে ফোন করেছিস নাকি?

লোলা এগিয়ে এসে পলিথিনে মোড়া মুরগিগুলোকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে লাগল—গুনগুন করে গাইতে লাগল একটা গানের কলি।

কাজ শেষ করেই ও হঠাৎ ঘুরে তাকাল, 'আমাদের দুজনের একটা অলোচনা হওয়া দরকার। আজ তো তোমাকে সারারাত কাজ করতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ওকে দেখতে লাগলাম।

'রাতে কার্ল ঘুমোলে, আমি আসব।'

বুঝলাম, ও পুলিশে খবর দেয়নি। আমার সঙ্গে আলোচনা করে কোন রফা করতে চায়। কিন্তু আমার নিরাপত্তার বিনিময়ে ও কি চাইবে?

'আপনি যা বলবেন, আমি তাতেই রাজি,' কেমন যেন ভিক্ষে চাওয়ার মতো শোনাল নিজের কথাগুলো—কিন্তু আমি নিরুপায়।

'আপাতত রান্নাঘর থেকে কেটে পড়ুন, মি. শেট কারসন। আমি একাই সব সামলাতে পারব। আপনার সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই।'

আমি এখন লোলার মুঠোয়। ও যা বলবে, তা করতে আমি বাধ্য, এবং লোলাও সেটা জানে। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে রান্নাঘর ছেড়ে খাবার ঘরে পা বাড়ালাম। যাবার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম ওর হলদে চোলি আর লাল প্যান্টের উপর। অবশেষে ওর চোখে চোখ রাখলাম, 'আপনি যা বলবেন—'

লোলা হাসল—বড় নিষ্ঠুর সে-হাসি, 'হুঁ—ঠিক বলেছ, কারসন। এখন থেকে আমি যা—বলব—'

ভারাক্রান্ত মনে বাইরে এলাম। লোলার মনে কি আছে তা কে জানে? ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর উপায় দেখছি না!

একটু পরেই বাস এসে পড়ায় আমরা তিনজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। রেস্তোরাঁয় খদ্দেরের ভিড় বাড়তে লাগল—

ঘণ্টাখানেক পর বাস চলে গেলে জেনসন ঘাম মুছতে মুছতে আমার দিকে এগিয়ে এল, 'জ্যাক, এই এঁটো প্লেটগুলো আমি আর লোলা ধুয়ে রাখতে পারব। তুমি বরং বাইরে বসে পাম্পগুলোর দিকে খেয়াল রাখ, খাটুনিটা কম পড়বে। তোমাকে তো আবার রাতেও জাগতে হবে।'

জেনসনের কথামতো বাইরে বারান্দায় এলাম। এখানে বসে অন্তত একটু ভাববার সময় পাওয়া যাবে। এতক্ষণ পর সেই ভয়টা আবার আমাকে আঁকড়ে ধরল। সম্ভব অসম্ভব নানান চিন্তা এসে ভিড় করল মাথার মধ্যে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম।

হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তি হতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। দেখি লোলা রেস্তোরাঁর বাইরে বেরিয়ে এসেছে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে। লোভে চকচক করছের ওর সবুজ চোখ। জেনসনসও এসে দাঁড়িয়েছে লোলার পিছনে, হাতে একগাদা প্লেট, চোখে অপ্রস্তুত দৃষ্টি।

'এই অপোগণ্ড লোকটাকে এখানে এনেছ কিজন্য? লোলা তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কাজের নামে দেখা নেই, খালি বসে বসে গিলবে! আমাকে একাই কি সব কাজ করতে হবে নাকি?'

'ছিঃ লোলা, জ্যাককে সারারাত—'

'সারারাত কাজ করতে হবে!' জেনসনকে ভেংচে উঠল লোলা, 'তাতে আমার বয়েই গেল।' তারপর ও আমার দিকে ফিরল, 'যাও, হাঁ করে দেখছ কি? প্লেটগুলো ধুয়ে ফেলার ব্যবস্থা কর গিয়ে। তোমাকে মাইনে দেওয়া হয় গতর খাটানোর জন্য, হাওয়া খাওয়ার জন্য নয়।'

'লোলা!' চাপা স্বরে ধমকে উঠল জেনসন।

আমি চেয়ার ছেড়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগোলাম, 'ভুল হয়ে গেছে মিসেস জেনসন, এবারকার মতো মাপ করুন।'

'লোলা।' জেনসন রাগে ফেটে পড়ল, 'ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখ। আমি জ্যাককে বলেছি এখানে বসতে, পাম্পগুলো দেখতে।'

'তাহলে আমার কথার কোন দাম নেই? তাতে কি জন্য আমি এখানে রয়েছি? রান্না করা, আর রাতে তোমার পাশে শোবার জন্য?' লোলার মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে উঠল। কথা শেষ করেই ও ঝড়ের মতো চলে গেল বাংলোর দিকে। ভিতরে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিল সদর দরজা।

লোলা চলে গেলে হাতের প্লেটগুলো নামিয়ে রেখে জনসন ফিরে এল, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। তার মনের ভাব অনুমান করে সান্তনা দিলাম, 'ওঁর জন্য ভাববেন না, মি. জেনসন। সারাটা দিন খাটাখাটনি করে মাথার আর ঠিক নেই, কালই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি তো বলছ, কিন্তু এর আগে লোলা কোনদিন আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেনি।' চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে মাথা নাড়ল জেনসন।

সবই আমি বুঝেছি। কিন্তু কি করে জেনসনকে বলি, এ-ব্যাপারটা পুরোটাই একটা সাজানো নাটক, আজ রাতে আলাদা শোবার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করার জন্যই লোলার এই অভিনয়।

'যাকগে,—চলুন, প্লেটগুলো ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রাখা যাক।'

'তুমি খুব ভালো লোক, জ্যাক।' জেনসনের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, 'অন্য কেউ হলে এই মুহূর্তে এ-চাকরি ছেড়ে চলে যেত। লোলা বলে তোমাকে এমন কথা বলতে পারল। এম্মি—আমরা আগের

স্ত্রী—কখনও কারুর সঙ্গে এভাবে কথা বলত না—চল, কাজ ফেলে রেখে লাভ নেই।'

রান্নাঘরে দুজনে কাজ করছি, হঠাৎ কানে এল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারলাম—লোলা গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছে। পরনে সেই সবুজ পোশাক। ও গাড়ি ছুটিয়ে দিল ওয়েন্টওয়ার্থের দিকে।

চমকে উঠলাম। কোথায় যাচ্ছে লোলা? থানায় না তো?

পাশেই কর্মরত জেনসনকে সেকথা জানালাম, 'মি. জেনসন, আপনার স্ত্রী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।'

'আমার সঙ্গে ঝগড়া হলেই লোলা ওরকম করে।' বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিল, জেনসন, 'জান জ্যাক, মাঝে মাঝে ওর জন্য আমার দুঃখ হয়। ভাবি, প্রথম জীবনে ওকে হয়ত খুব কষ্ট করতে হয়েছে, তাই ওর ব্যবহার এইরকম। এখানে আসার আগে ও কোথায় থাকত, কি করত,—সে-কথা অনেকবার জিগ্যেস করেছি, কোন জবাব দেয়নি। ভেবে ছিলাম, তুমি আসার পর আমরা দুজনে একটু নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পাব, কিন্তু কোথায় কি? দেখেছ তো, কতদিন ওকে সিনেমায় যাওয়ার জন্য সেধেছি, রাজি হয়নি! হয় মাথাধরা, নয় ক্লান্ত, এমনি নানান অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু ও যখন ওয়েন্টওয়ার্থে একা যায়, তখন বড় চিন্তা হয়, জ্যাক। মাঝে মাঝে মনে হয়, ও হয়ত অন্য-কোন—যাকগে, বাদ দাও ওসব কথা।' দীর্ঘশ্বাস পেলে সে আবার কাজে মন দিল।

খুলে না বললেও, জেনসন কি বলতে যাচ্ছিল আমি আঁচ করলাম। ও হয়ত সন্দেহ করে, লোলা ওয়েন্টওয়ার্থে গিয়ে ছেলে-ছোকরার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। হাতেও পারে—অসম্ভব কিছু নয়!

এরপর গাড়ির ভিড় বাড়তে শুরু করায় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

রাত প্রায় সোয়া এগারোটার সময় লোলা ফিরল। গাড়ি থেকে নেমে সোজা গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। সশব্দে বন্ধ করে দিল ঘরের দরজা।

জেনসন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, মাথা নাড়ল, 'মাঝে মাঝে আমার এমন রাগ হয়, মনে হয়, দুটো থাপ্পড় মেরে লোলাকে ভদ্রতা জিনিসটা শিখাই। কিন্তু—যাক, রাত তো অনেক হল, চলি, জ্যাক—শুভরাত্রি।' জেনসন ভারী পদক্ষেপে বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল। বিষাদের ছায়া তখনও মিলিয়ে যায়নি ওর মুখ থেকে।

ভাবলাম, লোলার গায়ে হাত তোলা, আর কালো-কেউটের ল্যাজে পা দেওয়ার মধ্যে কোন তফাত নেই! জেনসন জানে না, এক ক্রূর সাপিনীকে ও বিয়ে করে বসেছে।

রেস্তোরাঁয় বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে শ্রীমতীর অপেক্ষায় রইলাম। জেনসন ঘুমিয়ে না পড়লে লোলা আসতে পারবে না। সুতরাং সময় লাগবে। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লাম। ভাবতে লাগলাম নিজের বর্তমান অবস্থার কথা।

যদি জেনসনের কাছে টাকাগুলো না রাখতাম, তো কখন হাওয়া হয়ে যেতাম। কেউ আমার খোঁজও পেত না। কিন্তু এই কপর্দকহীন অবস্থায় পালাবার চিন্তা করা নেহাতই পাগলামি।

সুতরাং, মাথায় হাজার চিন্তার মেলা নিয়ে লোলার আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। চোখদুটো আটকে রইল বাংলোর আলোকিত জানালার দিকে।

ছয়

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত একটা চল্লিশ। তিন ঘণ্টার উপর হয়ে গেল, কিন্তু এখনও লোলার পাত্তা নেই। ট্রাক-চলাচল একেবারে পাতলা হয়ে এসেছে। গত আধঘণ্টার মধ্যে একটা ট্রাকও চোখে পড়েনি। চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম—হঠাৎ চোখ পড়ল বাংলোর দরজায়। লোলা চুপিসাড়ে বেরিয়ে আসছে। অবসন্নভাবে পা ফেলে ও আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পরনে একটা সাদা শার্ট আর ফিকে সবুজ রঙের স্কার্ট।

রেস্তোরাঁর বারান্দা অন্ধকারে ঢাকা। মরা চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সামনের খোলা উঠোনে। লোলা উঠে এল বারান্দায়, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার কাছে বসল।

মনকে প্রস্তুত করলাম। জানি না, কি শর্তের বিনিময়ে ও আমার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখবে। সুতরাং সতর্ক থাকা ভালো।

অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছেণ আমার সিগারেটের অগ্রভাগ। তার হালকা লাল আলোর লোলার মুখটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

'তোমাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছি, কারসন। প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম তুমি ছদ্ম-পরিচয়ে এখানে আছ। কিন্তু তুমিই যে ফার্নওয়ার্থ থেকে পলাতক—শেট কারসন, তা ভাবতে পারিনি—আর, তোমার সিন্দুক-বিশারদ হওয়াটা নিতান্তই ভগবানের আশীর্বাদ।' লোলা তার লোভনীয় পা দুটোকে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে হাসল।

'আপনি কি পুলিশে খবর দিতে চান?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি। সেটা তোমার মতামতের ওপর নির্ভর করছে। আমার কথায় রাজি হলে ভালো, নয়তো সোজা ফার্নওয়ার্থ।'

উদগ্রীব হয়ে ওর পরবর্তী কথাগুলো শোনার অপেক্ষায় রইলাম।

'কাগজে লিখেছে, তুমি 'লরেন্স সেফস্ কর্পোরেশন'-এ কাজ করতে—তোমাকে একটা সিন্দুক খুলতে হবে, কারসন!'

'তার মানে?' সিগারেটের টুকরোটা ছুড়ে ফেলে নিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

'কার্লের একটা লরেন্স-সিন্দুক আছে—তোমাকে সেটা খুলতে হবে।' লোলার কণ্ঠে নির্বিকার সুর। যেন অত্যন্ত একটা ব্যাপার তার চেয়েও সহজভাবে আমাকে বোঝাচ্ছে।

তাহলে রিক্স দেখছি মিথ্যে কথা বলেনি। লোলা শুধুমাত্র টাকার লোভেই জেনসনকে বিয়ে করেছে।

'সিন্দুক থেকে কিছু যদি আপনার নেবার থাকে, তো মি. জেনসনকে বলছেন না কেন?' বোকা সাজলাম। কারণ, লোলার উদ্দেশ্যটা আমি ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই।

'বেশি চালাক সাজবার চেষ্টা করো না, কারসন। বিকেলে কি বলেছিলাম তা আশা করি ভুলে যাওনি? এখন থেকে আমি যা 'বলব—নয়ত—'

'রিক্সের কথাই দেখছি সত্যি! শুধু টাকার জন্যই অ্যাদ্দিন এখানে পড়ে ছিলেন?'

'বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা এস। সিন্দুক তুমি খুলছ কিনা বল?'

'খোলার পর—?'

লোলা নড়েচড়ে বসল, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, 'তুমি এক হাজার ডলার পাবে। আর চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেব পালাবার জন্য।'

সাবাস লোলা, সাবাস! কে বলে মেয়েদের বুদ্ধি নেই! আমি খুলব সিন্দুক, আর এক লাখ ডলার হাতাবে তুমি! তারপর দয়া করে আমাকে ভিক্ষে দেবে এক হাজার ডলার, আর পালাবার জন্য কিছু সময়! আর তাও কিনা, জেনসন থেকে শুরু করে পুলিশ পর্যন্ত সবাই যাতে ভাবে, আমিই সিন্দুকের টাকা হাতিয়ে কেটে পড়েছি! চমৎকার—তোমার জবাব নেই সুন্দরী!

'আপনি ওই এক লাখ ডলার চুরি করার মতলবে আছেন, আর মি. জেনসন ভেবেছিলেন আপনাকে নিয়ে পৃথিবীভ্রমণে যাবেন, দু-হাতে খরচ করবেন—সব আপনারই জন্য।' শ্লেষে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আমার স্বর। লোলাকে যেন আর সহ্য করতে পারছি না। আমার কব্জা করেছে বলে ওর উপর যত না রাগ হল, তার চেয়েও বেশি হল জেনসনের মতো লোককে ও ঠকিয়েছে বলে।

'কার্ল? ওই পেটমোটা বুড়োটার সঙ্গে বেড়াতে যাব?' নৃশংস মনে হল লোলার স্বর, 'হুঁঃ—ওর সঙ্গে ওয়েন্টওয়ার্থ যেতেই আমার গা ঘিনঘিন করে, তার ওপর আমার পৃথিবীভ্রমণ!—যাকগে, সিন্দুকটা খুলতে তোমার কতক্ষণ লাগবে?'

'খুলতেই পারব কিনা ঠিক নেই, তার আবার কতক্ষণ লাগবে! এই সিন্দুকগুলো খুব মজবুত হয়। কম্বিনেশন নম্বর না পেলে খোলা অসম্ভব।'

'কারসন, আমার মনে হয় সিন্দুকটা খুললেই তুমি ভালো করবে।' অন্ধকারেই অনুভব করলাম লোলা আমার দিকে অপলকে চেয়ে আছে।

বেশ বুঝতে পারছি, সিন্দুকটা আমাকে খুলতেই হবে। এ ছাড়া কোন দ্বিতীয় উপায় আমার নেই। কিন্তু জেনসনের কথা ভাবলেই মন বিদ্রোহ করছে। সে আমার একমাত্র বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী—আমার জন্য কত করেছে, আর তাকেই এভাবে পথে বসাব? অথচ ফার্নওয়ার্থের কথা মনে পড়লেই ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠছি। ওই দুঃস্বপ্নের নরকে ফিরে যাবার মতো সাহস আমার নেই।

'সিন্দুকটা কোন্ ঘরে আছে?' লোলাকে প্রশ্ন করলাম।

'বাংলোর বসবার ঘরে।'

'বসবার ঘরে? তার মানে? আপনি ভাবছেন আমি মি. জেনসনের কোলে বসে সিন্দুক খুলব? আমি টাকার বান্ডিলগুলো বের করব, আর উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবেন?' ব্যঙ্গে বিকৃত হল আমার মুখ। কথায় কথা বাড়িয়ে সময় নেবার ফিকির খুঁজতে লাগলাম। মুখে কথা বললেও, আমার মনের মধ্যে তখন বয়ে চলেছে চিন্তার ঝড়।

'না, না, সে ভয় নেই। আগামী শনিবার সন্ধেবেলা কার্ল ওয়েন্টওয়ার্থে একটা মিটিংয়ে যাবে। তারপর রাত একটায় ফিরবে। ওর মধ্যেই তোমাকে কাজটা সারতে হবে।'

একটা সিগারেট ধরালাম। লাইটারের আলোয় দেখলাম, লোলার চোখজোড়া লোভে চকচক করছে। কারও আসন্ন মৃত্যুর প্রত্যাশায় যেন অপেক্ষা করছে এক বিশাল শকুনি।

'সে না হয় হল, কিন্তু সিন্দুক খোলার সময় আপনি কোথায় থাকছেন?'

'শনিবার তোমার জায়গায় সারারাত আমি কাজ করব। তুমি যখন সিন্দুক খুলে টাকা নিয়ে হাওয়া হবে, তখন আমি রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত থাকব। টাকা যে চুরি গেছে, সেসব কিছু জানতেই পারব না—অন্তত লোকে তাই জানবে। তারপর কার্ল ফিরে এসে সিন্দুক খালি দেখলে, ওকে বলব, আমি কাজে ছিলাম, কখন তুমি টাকা নিয়ে ভেগেছ টেরই পাইনি।' আধো-আঁধারিতে ঝকঝক করে উঠল লোলার সাদা দাঁতের সারি। পৈশাচিক হাসিতে ওর সবুজ চোখ নেকড়ের মতো জ্বলছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মতলবটা আমার মাথায় এল। এমনিতেই তো আমাকে পালাতে হবে, ক্ষতির মধ্যে শুধু চাকরিটা—, তা যাকগে, কিন্তু জেনসন যাতে আমাকে ভুল না বোঝে, সে-ব্যবস্থা আমাকেই করতেই হবে। মতলবটা যে কার্যকর হবে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আমি সিন্দুক খোলার পর লোলা যখন টাকাগুলোর নিতে থাকবে, তখন এক ঘুঁষিতে ওকে অজ্ঞান করে সমস্ত টাকা নিয়ে পালাব। যাবার আগে কেটে দিয়ে যাব টেলিফোনের তার। তারপর ট্রপিকা স্প্রিংস থেকে জেনসনের সমস্ত টাকা ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করব। সঙ্গে লিখব একটা চিঠি। জানাব, কিরকম একটা বাজারে-মাগীকে সে বিয়ে করেছে। তাহলে নিশ্চয়ই জেনসনের ভুল ভাঙবে।

মনে মনে হাসলাম। দাঁড়া শালী, তোকে আমি আঁটি চোষাব! শেট কারসনকে চিনতে তোর এখনও অনেক দেরি আছে।

কিন্তু মুখে ন্যাকা সাজলাম, 'দেখুন, মিসেস জেনসন—মি. জেনসনকে ঠকানোটা আমার ঠিক ভালো লাগছে না। তিনি আমার জন্য কত করেছেন, তা ছাড়া—।'

‘ওসব ন্যাকামো ছাড়, কারসন। সোজাসুজি বল, সিন্দুক খুলছ, না ফার্নওয়ার্থে ফিরে যাবে?’

‘আর যেখানেই যাই, ফার্নওয়ার্থে আমি ফিরছি না।’

‘তাহলে শনিবার দিনই?’

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। যেন মনস্থির করতে চাইছি।

অবশেষে কাঁধ ঝাঁকালাম, ‘অগত্যা রাজি না হয়ে উপায়ই বা কী!’

লোলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, ‘ভেব না আমি ইয়ার্কি করছি। সিন্দুক না খুলে দেখ কী হয়।’

লোলার দিকে চোখ তুলে তাকালাম, ‘অতবার করে আপনাকে বলতে হবে না। যখন বলেছি খুলব, তখন খুলব।

‘তাই যেন হয়, মিস্টার শেট কারসন।’ সিঁড়ি ভেঙে ও বালির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল বাংলোর দিকে। চাঁদের আলোর পরিষ্কার দেখলাম, যেতে যেতে ও একবার ঘুরে তাকাল—মুখে জয়ের হাসি।

সিগারেটের টুকরোটা ছুড়ে দিলাম বালির উপর, ‘দেখা যাক সুন্দরী, কে হারে কে জেতে! তবে মনে রেখো, তোমার রঙের সাহেবের উত্তরে আমার হাতের পাঞ্জায় লুকোনো রয়েছে রঙের টেক্কা!’

পরদিন লোলাকে রান্নাঘরে একা পেয়ে সিন্দুকের নম্বরটা এনে দিতে বললাম। কারণ ওটা না পেলে সিন্দুকটা কি ধরনের তা বোঝা যাবে না আর সিন্দুক ভাঙতে হলে সেটা জানা বিশেষ প্রয়োজন।

পরে বেলার দিকে জেনসনের অনুপস্থিতির সুযোগে, ও একটুকরো কাগজা এনে আমার হাতে দিল। নম্বরটা দেখেই বুঝলাম, সিন্দুকটা অত্যন্ত পুরোনো মেডেলের। বাজারে এখন আর পাওয়াই যায় না। এ-ধরনের সিন্দুকগুলোর দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনা থেকে তালা এঁটে যায়, চাবির আর দরকার হয় না। বেশির ভাগ লোকই এ-ধরনের চাবি ছাড়া সিন্দুক অপছন্দ করার কোম্পানি এই সিন্দুক তৈরি বন্ধ করে দেয়। তার উপর এই সিন্দুকগুলো খুলতে চোর-ছ্যাঁচড়দের খুব একটা কষ্ট করতে হয় না।

খুশিই হলাম। সিন্দুকটা খুলতে আমার বড় জোর দশ মিনিট লাগবে। আর সময় যত কম লাগবে, ততই ভালো—পালাবার জন্য সময় কিছু বেশি পাওয়া যাবে।

বৃহস্পতিবার সকালবেলা—আমি আর জেনসন গ্যারেজে কাজ করছি, হঠাৎ কাজ থামিয়ে ও বলে উঠল, জ্যাক, শনিবার সাতটায় আমাকে ওয়েন্টওয়ার্থে যেতে হবে—একটা মিটিং আছে। ফিরতে ফিরতে ধর, একটা-দেড়টা বাজবে।—লোলা সেদিন রাত্তিরে কাজ করবে বলছিল, তুমি পার তো ওর দিকে একটু লক্ষ্য রেখ, কেমন? বলা তো যায় না, কখন কোন মাতাল ড্রাইভার উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে।’

বুকের ভিতর একটা চাপা দুঃখ অনুভব করলাম। জেনসন আমাকে এতখানি বিশ্বাস করে? একবারও ভাবল না, লোলাকে একা পেয়ে আমিও তো কোন মাতাল ড্রাইভারের মতো কাজ করতে পারি!

মুখে আশ্বাস দিলাম, ‘আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মি. জেনসন, আমি নজর রাখব’খন।’

জেনসন হাসল, ‘তোমার মতো একজন বিশ্বাসী লোক পেয়ে আমার অনেক সুবিধে হয়েছে, জ্যাক—তোমাকে চিনতে আমি ভুল করিনি।’

শুক্রবারে আমার ছুটি থাকায় জেনসনের কাজ থেকে ওর গাড়িটা ধার চাইলাম। আর চাইলাম একশ ডলার—বললাম, ট্রপিকা স্প্রিংসে কয়েকটা জিনিস কেনার আছে। জেনসন একটু অবাক হলেও টাকাটা এনে দিল, আর কিছু উপদেশও দিল, ‘দেখো জ্যাক, ওখানে গিয়ে সাবধানে থেক। রাস্তায় ওত-পেতে-থাকা সুন্দরীদের খপ্পরের যেন পড়ো না।’

হেসে অভয় দিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। দেখি, লোলা হাসিমুখে রেস্তোরাঁর দরজার দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। যদি জানত ওর জন্য আমি কি ফাঁদ পেতেছি হতে হয়তো অমন করে হাসত না। জেনসনের কাছ থেকে তখনকার মতো বিদায় নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টাচারেক লেগে গেল। সেখানে পৌঁছে খোঁজ নিলাম, ন্যু-ইয়র্কের ট্রেন-ক-টায় ছাড়ে। প্লেনে করে পালানোর মতলব অনেক ভেবেচিন্তেই ত্যাগ করেছি। কারণ লোলা পুলিশে আমার পালানোর খবর দেওয়ামাত্রই ওরা ট্রপিকা-স্প্রিংসের এয়ারপোর্টে আমার খোঁজ করবে। তা ছাড়া, রাত্রিবেলা কোন প্লেন পাব কিনা, তারও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, রাত সাড়ে বারোটায় ন্যু-ইয়র্কে যাবার একটা ট্রেন আছে। অতএব চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। জেনসন সাতটায় ওয়েন্টওয়ার্থে রওনা হবে। আর সাড়ে সাতটার মধ্যে সিন্দুক খুলে লোলাকে ল্যাং মেরে আমিও কেটে পড়ব। তাহলে ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছে ট্রেন ধরার জন্য আধঘণ্টারও বেশি সময় পাওয়া যাবে।

কিন্তু এ-ও আমি জানতাম, লোলা পুলিশে খবর দেবার সময় আমার চেহারার বর্ণনা তো দেবেই, সাজ-পোশাকের বিবরণ দিতেও ছাড়বে না। সুতরাং 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' থেকে পালানোর পরই আমাকে ছদ্মবেশ ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে।

তাই ট্রেনের খোঁজখবর নিতে গেলাম একটা দোকানে। একটা হালকা বাদামী প্যান্ট আর একটা চাইরঙের কোট কিনলাম। কোটের সামনের পকেটদুটো গাঢ় সবুজ রঙের—যাতে বহুদূর থেকে চোখে পড়ে। আরও কিনলাম একজোড়া জুতো, বাদামী রঙের একটা টুপি, এক শিশি কলপ ও একটা গগল্স্। এই জিনিসগুলো একটা সুটকেস কিনে তাতে ভরে ফেললাম। গাড়ির ক্যারিয়ারে স্যুটকেসেটা বন্ধ করে ফিরে চললাম 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এ।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা পার হয়ে মরুভূমিতে এসে পড়লাম। দূরে বালিয়াড়ির উপর ইতস্তত ছড়ানো ঘন ক্যাকটাসের ঝোপ। গাড়ি থামিয়ে ক্যারিয়ার থেকে স্যুটকেসটা বের করে এগিয়ে চললাম ক্যাকটাস-ঝোপের দিকে। একটা ঘন ঝোপের ভিতর ওটাকে লুকিয়ে ফেললাম। একমাত্র আমি ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে এটা খুঁজে বের করা একেবারেই অসম্ভব। 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' ছেড়ে পালাবার পথে এখানে নেমে চেহারা এবং বেশবাস, সব পালটে নেব। তারপর ট্রপিকা স্প্রিংস থেকে ট্রেন ধরে সোজা ন্যু-ইয়র্ক। লোলা আমার চেহারার বর্ণনা দিলেও পুলিশ আমাকে ছদ্মবেশে চিনতে পারবে না।

নিশ্চিন্ত মনে আবার গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। সত্যিই, যে নিখুঁত প্ল্যান আমি এঁটেছি, তাতে ভুল হওয়ার কোন জো নেই। এখন শুধু শনিবারের অপেক্ষা—

ফিরে এসেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমি, জেনসন এবং লোলা—তিনজনেই কাজ করে চললাম যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতায়। খদ্দেরদের চেঁচামেচিতে রেস্তোরাঁ জমজমাট। এইভাবে চলতে চলতে রাত প্রায় এগারোটার সময় রেস্তোরাঁ একেবারে খালি হয়ে গেল। শেষ-খদ্দেরটি চলে যাবার পর আমাকে পেট্রল-পাম্পগুলো দেখতে বলে জেনসন শুতে গেল। আর, লোলা রান্নাঘরে ঢুকল এঁটো কাপ-প্লেটগুলো ধুয়ে রাখতে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে এসে বসলাম। কিছুক্ষণ পর লোলা সামনে এসে দাঁড়াল, 'ট্রপিকা স্প্রিংসে কি করতে গিয়েছিলে?'

'তাতে আপনার কী দরকার?' রুক্ষস্বরে জবাব দিলাম।

লোলা কাঁধ ঝাঁকাল, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, 'না, দরকার কিছু নেই! তুমি শুধু সিন্দুক খুললেই আমি খুশি।'

'সে তো বলেইছি খুলব—' ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম।

লোলা বাংলোর দিকে ফিরে চলল, মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল, 'না খুললে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'কে আর-একবার ভালো দেখলাম। একটা দিন! আর মাত্র একটা দিন! তারপরই এ-জায়গা ছেড়ে আমাকে চিরকালের জন্য চলে যেতে হবে। শুধু স্মৃতিটুকু বেঁচে

থাকবে মনের পাতায়—শেষে একদিন তাও মুছে যাবে। আজই অনুভব করলাম, 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-কে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। এ-জায়গা ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না।

শনিবার সন্ধ্যা সাতটা। গুমটিঘরে সেই পুরোনো মোটরটা নিয়ে কাজ করেছিলাম, পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালাম। সামনেই দাঁড়িয়ে জেনসন।

'জ্যাক, আমাকে এখনই যেতে হবে। সাতটা বাজে, আর দেরি করা ঠিক হবে না। ফিরতে ফিরতে হয়তো দুটোও বেজে যেতে পারে। জানই তো, এসব মিটিংয়ের শেষে একটু-আধটু—' জেনসন চোখ টিপল, বুড়ো আঙুল তুলে মুখে কিছু ঢালার ভঙ্গি করল, 'দেখো, লোলাকে আবার এসব বল না যেন?'

তার দিকে চেয়ে হাসলাম, 'না, না—আপনি যান, ঘুরে আসুন। আমি আর মিসেস জেনসন ঠিক সামলাতে পারব, কোন অসুবিধে হবে না।'

জেনসন রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়াল। সম্ভবত লোলার কাছ থেকে বিদায় নিতে। একটু পরেই সে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলল জেনসনের মার্কারি। যতদূর দেখা গেল চেয়ে রইলাম। তারপর একসময় দূরের বালিয়াড়ির আড়ালে গাড়িটা মিলিয়ে গেল।

যে স্টেশন-ওয়াগনে করে পালাব ঠিক করেছি, সেটার পেট্রল, মোবিল আর-একবার পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট মনে পা বাড়ালাম বাংলোর দিকে।

প্ল্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এইবার শুরু হবে। খুলতে হবে সেই অভিশপ্ত সিন্দুক। অভিশপ্ত ছাড়া আর কি? এর জন্যই তো আমাকে জেনসনের মতো লোককে বন্ধুত্ব হারাতে হচ্ছে!

লোলা বাংলোর দরজায় দাঁড়িয়ে আমারই অপেক্ষা করছিল। উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় ওর মুখমণ্ডল বিবর্ণ। কিন্তু চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল। আমাকে দেখেই চাপা স্বরে ও বলে উঠল, 'তাড়াতাড়ি শুরু কর, কারসন।'

'কোথায় আছে সিন্দুকটা?'

'বসবার ঘরে—সোফার ঠিক পেছনে।'

'ঠিক আছে, আপনি বরং পাম্পের কাছে থাকুন। বলা যায় না, হয়তো তেল নেবার জন্য কোন ট্রাক-ফাক এসে পড়তে পারে। তা ছাড়া, ঘণ্টা দুয়েকের কমে সিন্দুকটা খোলা যাবে বলে তো মনে হয় না।'

সন্দেহের কুটিল ছায়া নেচে উঠল লোলার সবুজ চোখের তারায়, 'অতক্ষণ—?

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, এই সিন্দুকগুলো খুব মজবুত হয়। তা ছাড়া মি. জেনসনের কাছ থেকে কম্বিনেশনটাও তো যোগাড় করতে পারেননি। অতএব তর্ক না করে যা বলছি তাই করুন গিয়ে।'

বসবার ঘরে গিয়ে সোফাটা সরিয়ে সিন্দুকটাকে এক নজর দেখলাম। যা ভেবেছি ঠিক তাই। শুধু কম্বিনেশন ঘোরালেই—সিন্দুকটা খুলে যায়—চাবির আর দরকার হয় না। লোলো দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিল। ওকে বললাম, 'গ্যারেজ থেকে কয়েকটা যন্ত্রপাতি আনতে হবে। আপনি বরং রেস্তোরাঁটা বন্ধ করে দিন। নয়তো কোন খদ্দের এসে খাওয়ার জন্য চেঁচামেচি শুরু করে দেবে।'

'সে আমি আগেই বন্ধ করে দিয়েছি।'

আর-কোন কথা না বলে, ওকে পাশ কাটিয়ে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। গ্যারেজ থেকে গোটা কয়েক যন্ত্রপাতি নিয়ে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে ভরে বাংলোয় ফিরে চললাম। টাকাগুলো এই ব্যাগে করে নিয়েই পালাতে হবে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, একটা পুরোনো ঝরঝরে প্যাকার্ড ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে আসছে।

লোলা বাংলোর দরজা থেকেই গাড়িটাকে দেখতে পেয়ে পাম্পের দিকে এগিয়ে এল। ততক্ষণে গাড়িটা পাম্পের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

আর অপেক্ষা না করে বাংলোর দিকে পা বাড়ালাম। যাবার আগে নিছক কৌতূহলবশে গাড়িতে বসে-থাকা লোকদুটোর দিকে একপলক তাকালাম—হাজার হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরের প্রতিটা শিরা-

উপশিরায়—পা দুটো মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গেল, যেন কেউ আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে মেঝেতে—শুকনো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম—

গাড়িতে বসে দুজন পুলিশ! সাদা পোশাকে থাকলেও ওদের চিনতে অসুবিধে হওয়ার কোন কারণ নাই। রোদে-পোড়া বিশাল চেহারা, চৌকো চোয়াল, সতর্ক চোখজোড়া বেজীর মতো চঞ্চল।

আমি তখন ঘামতে শুরু করেছি। অসাড় হাত-পা বশে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। পায়ে পায়ে বাংলোর দিকে এগোলাম, যেন ওদের খেয়ালই করিনি।

'অ্যাই—শোন—' বাজখাঁই গলায় ডেকে উঠল ওদের একজন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ছুট লাগাই। দৌড়ে পালানোর একটা দুর্দম ইচ্ছা আমাকে গ্রাস করল। কিন্তু অনেক চেষ্টায় অবাধ্য পা দুটোকে সংযত করে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালাম।

ওরা দুজনেই তখন গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে।

লোলাও বুঝতে পেরেছিল লোকদুটোর আসল পরিচয়। দেখলাম, ও ভয়ার্ত চোখে ওদের দিকে চেয়ে আছে।

ধীরে ধীরে ওদের কাছে এগিয়ে গেলাম। কিছুটা ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। নয়তো, দৌড়ে পালাবই বা কোথায়!

'আমাদের একটা চাকা আসবার পথে ফেঁসে গেছে। গাড়ির ক্যারিয়ারে আছে—এই নাও চাবি,' লোকটা ক্যারিয়ারের চাবিটা আমার হাতে দিল, 'চটপট সারাবার ব্যবস্থা কর। এখনও অনেকটা রাস্তা যেতে হবে, একটা চাকা হাতে রাখা ভালো।'

ক্যারিয়ার খুলে চাকাটা বের করলাম। অপরজন লোলার দিকে তাকাল, আঙুল দিয়ে দেখাল গাড়িটাকে, 'এটাতে পেট্রল ভরার ব্যবস্থা কর, আর দেখো, খাবার-দাবার কিছু আছে কিনা।'

চাকাটা গড়িয়ে গড়িয়ে গুমটিঘরের দিকে নিয়ে গেলাম। বাঁ হাতে রইল ক্যাম্বিসের ব্যাগটা।

লোলা দ্বিতীয় জনের কথায় কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। রেস্তোরাঁ যে বন্ধ, সে কথা বলতে সাহস করল না।

'স্যান্ডউইচ হলে চলবে?' লোলা প্রশ্ন করল।

'খুব চলবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি কর, এমনিতেই আমাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

আটটা দশের সময় হতচ্ছাড়া পুলিশ দুটোর হাত থেকে রেহাই পেলাম। যদি ওরা না আসত, তবে এতক্ষণে স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে কোথায় চলে যেতাম! মনে হচ্ছে, ন্যু-ইয়র্ক যাবার ট্রেন বোধ হয় আর ধরা হল না!

শেষ পর্যন্ত তাই হল। গাড়ির পর গাড়ি আসতে লাগল। খদ্দেরের আর বিরাম নেই। অবশেষে বাধ্য হয়ে রেস্তোরাঁ খুলতে হল। আমি আর লোলা অক্লান্ত ভাবে খেটে চললাম—

রাত প্রায় দশটার সময় নিশ্বাস ফেলার একটু সুযোগ পেলাম। এই গরমে এত পরিশ্রম করে নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হল। আজকের গরমটা যেন অন্যদিনের চেয়েও বেশি লাগছে। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। সামনে এঁটো কাপ-প্লেটের স্তূপ। পাশেই দাঁড়িয়ে লোলা।

'আমি এগুলো ধুয়ে রাখছি, তুমি সিন্দুক খোল গিয়ে।'

'আজ আর হবে না, মিসেস জেনসন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমাদের পরে অন্য একটা দিন ঠিক করতে হবে।'

লোলা আগুন-ঝরা চোখে আমার দিকে তাকাল, 'আশা করি আমার কথাটা তোমার কানে গেছে, কারসন।'

'আর ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই তো মি. জেনসন ফিরে আসবেন, তাহলে পালাবার সময়টা আমি পাব কখন?'

লোলা কোন জবাব না দিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওকে অনুসরণ করলাম। ও সোজা এগিয়ে গেল দেওয়ালে লাগানো টেলিফোনের দিকে, 'সিন্দুক খুলবে, না পুলিশে ফোন করব?'

'আপনি বলেছিলেন, আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা পালাবার সময় দেবেন—'

'সে-সময় তুমি ঠিকই পাবে। কাল সকাল আটটার আগে কার্ল কিছুই জানতে পারবে না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।' লোলা হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল, 'এখনও ভেবে দেখ, কী করবে।'

বুঝলাম, ও মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না। সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করে গ্যারেজে গেলামে। যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে আবার ফিরে চললাম বাংলোর দিকে।

এখন দশটা বেজে দশ মিনিট। অর্থাৎ তিনটের আগে ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছনো অসম্ভব। সেখানে গিয়ে প্রথমেই আমাকে স্টেশন-ওয়াগনটার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, জেনসন পুলিশকে যখনই জানাবে আমি স্টেশন-ওয়াগনে করে পালিয়েছি, ওরা ট্রপিকা স্প্রিংসে এসে আগে ওটারই খোঁজ করবে। তারপর আমাকে অপেক্ষা করতে হবে ট্রেনের জন্য। ভাগ্য সহায় থাকলে হয়তো পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারব।

বসবার ঘরে গিয়ে প্রথমেই আলো জ্বেলে দিলাম। তারপর যন্ত্রপাতি নিয়ে সিন্দুকের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলাম।

নম্বর-বসানো চাকতিটা একটু একটু করে ঘোরাতে শুরু করলাম। ঝুঁকে পড়ে কাপ চেপে রইলাম সিন্দুকের ইস্পাতের দরজায়। একটু পরেই 'খুট' করে একটা শব্দ হল। অর্থাৎ, প্রথম নম্বরটা মিলে গেছে। সিন্দুক সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তারা এই সামান্য শব্দ শুনেই বুঝতে পারে নম্বরটা ঠিকমতো মিলেছে কিনা। এবার দ্বিতীয় সারির চাকতি নিয়ে পড়লাম।

মিনিট দশেক পর হাতল টেনে সিন্দুকের দরজা খুলে ফেললাম। চোখের সামনে থাকে থাকে সাজানো এক-শ ডলার নোটের বান্ডিল। এক লাখ ডলার—জেনসনের সারা জীবনের সঞ্চয়!

ক্যাম্বিসের ব্যাগটা টেনে নিয়ে নোটের বান্ডিলের দিকে হাত বাড়ালাম।

'এ কি! জ্যাক!! তুমি এখানে কী করছ!!!'

একটা উত্তপ্ত ইস্পাতের ফলা যেন আমার বুকটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল—সেকেন্ড দুয়েক নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম—একটা হাত নোটের বান্ডিলের উপর স্থির—সময়ের তরঙ্গ থেমে রইল এই একটি বিশেষ মুহূর্তে। আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জেনসন, চোখদুটো যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমি তখন অসাড় হয়ে গেছি। ফ্যালফ্যাল করে জেনসনের বিশাল চেহারার দিকে চেয়ে রইলাম। জেনসন ভারী পা ফেলে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল, 'জ্যাক! এ তুমি করছ কী?' সমস্ত যন্ত্রণা, হতাশা ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। জেনসনের বিশ্বাসের স্বর্গ আমি নিষ্ঠুরভাবে পায়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছি।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মি. জেনসন। আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি আপনার টাকা চুরি করছে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা নয়। যদিও জানি, একথা বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে খুব কঠিন, তবু দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

এমন সময় ঘরের দরজায় লোলা এসে দাঁড়াল। ওর মুখ মড়ার মতো সাদা, সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। জেনসনকে দেখেই তীক্ষ্ণস্বরে ও চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হয়েছে, কার্ল?—একি? ও সিন্দুক খুলছে? আমি আগেই জানতাম। তোমাকে বারবার সাবধান করেছি—অচেনা লোককে কখনও বিশ্বাস করো না। এখন দেখছ তো! আমি রান্নাঘরে ছিলাম, আর এদিকে—'

লোলার কথাগুলো জেনসনের কানে ঢুকল বলে মনে হল না। সে তখন একইভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে, 'জ্যাক! তুমি—তুমি এভাবে—' তার অর্ধসমাপ্ত কথাগুলো চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল আমার

বিবেকের উপর।

'কিন্তু মি. জেন—'

'এরপরেও কি তোমার বলার কিছু আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। আমার নাম জ্যাক প্যাটমোর নয়, শেট কারসন। দেড় মাস আগে আমিই ফার্নওয়ার্থ থেকে পালিয়ে এসেছি।'

জেনসনের চওড়া কপালে ভাঁজ পড়ল। সে এগিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসল, 'ও, তুমিই তাহলে কারসন কাগজে দেখেছিলাম বটে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছেন। একটা কাগজে আমার ছবি দেখে মিসেস জেনসন আমাকে চিনতে পারেন, এবং আমি যদি আপনার সিন্দুক না খুলি, তবে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন বলে ভয় দেখান।'

'চোর, মিথ্যেবাদী কোথাকার!' লোলা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কার্ল! তুমি এই লোকটার কথায় কান দিও না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য ও মিথ্যে কথা বলছে! আমি এখনই পুলিশে ফোন করছি।'

জেনসন ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল লোলার দিকে, 'তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এস না, লোলা। পুলিশ ডাকব কি না ডাকব, সেটা আমিই বুঝব।'

লোলা দেওয়ালে হেলান দিয়ে গোখরো সাপের মতো ফুঁসতে লাগল। ওর সবুজ চোখের তারায় ভয়ার্ত সতর্ক দৃষ্টি।

জেনসন এবার আমার দিকে তাকাল, 'তারপর?'

একে একে সমস্ত জানালাম। টাকাটা যে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিতাম, তা-ও বললাম।

জেনসন অপলক চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। আমিও স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তার চোখের তারায়।

তারপর একসময় সে চোখ ফেরাল লোলার দিকে। তার অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে লোলা যেন কুঁকড়ে গেল।

'লোলা, তুমি বলছ, জ্যাক মিথ্যে কথা বলেছে?'

'নিশ্চয়ই!' লোলা চোখ সরিয়ে নিল।

'তাহলে আমার দিকে তাকাও!'

কিন্তু লোলা পারল না। বারবার ও চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবারই জেনসনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে ও হেরে গেল। জেনসনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হল।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল জেনসন। এই কয়েক মিনিটেই তার বয়স যেন অনে-ক বেড়ে গেছে। শালপ্রাংশু চেহারা যেন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে।

'শুয়ে যাও, লোলা,' থমথমে গলায় জেনসন বলল, 'এ ব্যাপার নিয়ে কাল আলোচনা করা যাবে। আজ আর তোমাকে রাত জাগতে হবে না, আমিই থাকব। যাও শুয়ে পড় গিয়ে।'

'কিন্তু এ-লোকটার কী হবে? তুমি কি ওকে পুলিশে দেবে না? আমি এখনি ফোন করছি।'

জেনসন পায়ে পায়ে লোলার কাছ এগিয়ে গেল, ওর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারল, 'শুতে যাও! ফোন করার ব্যাপারটা আমিই ভাবব।'

ঘর থেকে এক ধাক্কায় ওকে বের করে দিয়ে জেনসন ফিরে এসে সোফায় বসল।

তখনও আমি খোলা সিন্দুকের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

'কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখ, জ্যাক! আমাদের সভাপতি হঠাৎ হার্টফেল করায় মিটিং মাঝপথেই ভেঙে গেল। আশ্চর্য! কোথায় একজন মারা গেল, আর তার জন্য আমি আবিষ্কার করলাম, আমার বউ একটি বাজারের-মেয়ে।' জেনসন আপন মনেই মাথা নাড়ল।

তার কথায় চমকে উঠলাম, 'তার মানে—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন?'

জেনসন হাঁটুতে হাত ঘষে চোখ তুলে তাকাল। একটা বিষণ্ণ বেদনার ছায়া ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। চোখের মণির উপর অশ্রুর আস্তরণ। সে মৃদুস্বরে বলল, 'জ্যাক, তোমাকে আগেই বলেছিলাম, লোক চিনতে আমি ভুল করি না। কিন্তু স্ত্রীলোকের ব্যাপারে আমি যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তা এখন বুঝতে পারছি।'

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মি. জেনসন। বুঝতেই তো পারছেন, এ ছাড়া আমার আর-কোন উপায় ছিল না।' অনেকক্ষণ বাদে বুকভরে শ্বাস নিলাম। মনটা যেন অনেক হালকা হল।

জেনসন খোলা সিন্দুকের দিকে এক পলক দেখে কাঁধ ঝাঁকাল, 'কিন্তু তোমাকে এ-জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে, জ্যাক। এখানে থাকাটা তোমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। লোলা তোমার কথা পুলিশে জানাবেই —এ-বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থেকো।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি। স্টেশন-ওয়াগনটা নিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়, নয়তো বিপদে পড়বে। লোলাকে বিশ্বাস নেই, কে জানে এর মধ্যেই হয়তো—তা কোথায় যাবে ঠিক করেছ?'

'ন্যু-ইয়র্ক। যেখানে পৌঁছতে পারলে, পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ হবে।'

'তাহলে এক কাজ কর তোমাকে তিরিশ হাজার ডলার দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে যা-হোক একটা ব্যবসা শুরু করতে পারবে—ভালোই হবে।'

মাথাটা কেমন টলে উঠল। আমি কি ভুল শুনছি। তি-রি-শ হা-জা-র ডলার! ওই তো জেনসন এখনও হাসছে, কিন্তু বড় বিষণ্ণ সে-হাসি। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতেই আমি উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলাম, 'না, মি. জেনসন, না! এ টাকা আমি নিতে পারব না, কিছুতেই না!—ভাববেন না, আমি অকৃতজ্ঞ। কিন্তু এত টাকা নেবার জন্য দয়া করে আমাকে অনুরোধ করবেন না।'

'জ্যাক, আমি যখন বলেছি, এ-টাকা তোমাকে নিতেই হবে। পৃথিবীভ্রমণের শখ আমার মিটে গেছে। সুতরাং এ-টাকা দিয়ে আমি কি করব? কিন্তু তোমার এখন টাকার প্রয়োজন, তাই তোমাকে দিচ্ছি। আর একটা কথা মনে রেখ, জ্যাক, তোমাকে আগে যেমন ভালোবাসতাম, এখনও তেমনি বাসি।' জেনসনের চোখের কোণে চিকচিক করছে দু-ফোঁটা অশ্রু। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল, 'তোমার মতো লোককে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে না।'

ঠিক তখনই লোলাকে দেখলাম। ও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে একটা সবুজ পোশাক। মুখ শুকনো পাতার মতো বিবর্ণ, চোখদুটো বেড়ালের মতো জ্বলছে। আর—

—আর, ওর হাতের মুঠোয় রয়েছে একটা .৪৫ রিভলভার। তার নিকষ কালো নলটা যেন নরকের দরজার চাবিকাঠি।

সাত

মুহূর্তে ঘরের পরিবেশে নেমে এল মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। শুধু টেবিল-ঘড়ির টিক টিক, আর লোলার উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জেনসন—চোখে ভূত দেখার চাউনি, 'এ কি? লোলা!—' বলার সঙ্গে সঙ্গে জেনসন ওর দিকে এগোতে গেল।

'খবরদার! এক পা নড়বে না! কর্কশ স্বরে শাসিয়ে উঠল লোলা, 'সিন্দুকের সমস্ত টাকা আমি নেব। কাউকে এর একটা পয়সাও আমি দিচ্ছি না।'

'লোলা! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? গুলি-ভরা রিভলভার নিয়ে আর ছেলেমানুষি করো না—ওটা নামিয়ে রাখ।'

‘শোন কার্ল, তোমার ওই ন্যাকামো আমি বহুদিন সহ্য করেছি,—আর নয়। মনে করো না, তোমরা আমাকে আটকাতে পারবে। চুপচাপ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক, নয়তো—’

জেনসনের চোয়ালের রেখা কঠিন হল, ‘ছি, ছি—তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, লোলা। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে এ-টাকা আমি কার জন্য সঞ্চয় করছি? শুধু তোমার আর আমার জন্যই তো! আর তুমি কিনা—নাও, এসব পাগলামি ছেড়ে বন্দুক নামিয়ে রাখ।’

‘ওসব বাজে ফিরিরে কোন কাজ হবে না, কার্ল! আমাকে আটকালে পরে কি হবে ভেবে দেখেছ? আমি পুলিশকে বলে দেব—একজন জেল-পালানো কয়েদীকে তুমি এতদিন ধরে জেনেশুনে আশ্রয় দিয়েছ। জানাব, আয়কর ফাঁকি দিয়ে জমানো এই একলাখ ডলারের কথা, তখন?’

রাগে জেনশনের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। সে এক পা এক পা করে লোলার দিকে এগোতে লাগল, ‘ছেনাল মাগী, দাঁড়া—তোকে এমন শিক্ষা দেব, জীবনে ভুলবি না! এতদিন ভালো ব্যবহারের এই প্রতিফল? জুতিয়ে আমি তোকে লম্বা করব!’

‘সাবধান, মি. জেনসন—’, তীক্ষ্ণ চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের দরজার হাঁটু দিয়ে মারলাম এক ধাক্কা। দরজা সশব্দে বন্ধ হওয়ামাত্রই স্বয়ংক্রিয় তালা ‘ক্লিক’ করে এঁটে গেল।

লোলা হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। পলকে বুঝতে পাল, সিন্দুকের দরজায় স্বয়ংক্রিয় তালা এঁটে গেছে। অন্ধ ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণীর মতো হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে ও এগিয়ে এল—ফটাস—রিভলভারের বিকট শব্দে জানালার সার্সীগুলো ঝনঝন করে কেঁপে উঠল।

জেনসন লোলার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ভয়ার্ত চোখে তার দিকে তাকালাম। কয়েক সেকেন্ড পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইল জেনসনের বিশাল দেহ, পরমুহূর্তেই হাঁটু ভেঙে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। পড়বার সময় হাতদুটো পাশের টেবিলটা আঁকড়ে ধরার সেটাও হুড়মুড় করে উলটে পড়ল। গোটা বাংলোটাই কেঁপে উঠল থরথর করে।

লোলা ভয়ার্ত চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেলাম। তখন ওর হাত থেকে কুৎসিত দর্শন রিভলভারটা খসে পড়েছে। পিছন ফিরে দু-হাতে মুখ ঢেকে ও বসে আছে—যেন নিষ্ঠুর বাস্তবকে অস্বীকার করতে চাইছে।

কাঁপতে কাঁপতে জেনসনের উপর ঝুঁকে পড়লাম। ওর বুকের বাঁ দিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। দেহ নিথর নিস্পন্দ। সামান্য সীসের টুকরো ওর জীবনীশক্তি নিঃশেষে শুয়ে নিয়েছে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা, হাসিখুশি কার্ল জেনসন যে আর বেঁচে নেই, এই সরল সত্যটুকু যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

‘তুমি—তুমি ওকে মেরে ফেলেছ!’ আমার গলা দিয়ে ভাঙা-বিকৃত স্বর বেরিয়ে এল।

লোলা একটা আর্তনাদ করে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই অন্ধের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কানে এল ওর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ।

বিমূঢ়ভাবে জেনসনের মৃতদেহের কাছে বসে রইলাম। কী করব এখন? পুলিশে খবর দেওয়ার মতো গর্দভ আমি নই। লোলা যদি বলে বসে, জেনসনকে আমিই গুলি করেছি, আর আমার আসল পরিচয়টা জানিয়ে দেয়, তবে ওরা—আর কোন প্রমাণ চাইবে না।

হঠাৎ বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ পেলাম। পরক্ষণেই অধৈর্যভাবে তার হর্ন বেজে উঠল—একবার—দুবার—তিনবার।

চটপট উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে যেই আসুক না কেন, তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। নয়তো, ঘরের আলো দেখে কেউ যদি জানালা দিয়ে উঁকি মারে, তবে সর্বনাশের আর-কিছু বাকি থাকবে না।

দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগোতেই পায়ে ঠেলক রিভলভারটা। ওটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখলাম। বাংলো থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চললাম পাম্পের দিকে।

বাইরে বেরুতেই চোখে পড়ল একটা বিরাট সবুজ রঙের ক্রাইসলার পাম্পের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির আরোহী একজন মোটাসেটা বয়স্ক লোক, সঙ্গিনী একটি অল্পবয়সী মেয়ে। আমাকে আসতে দেখেই লোকটা গাড়ি থেকে নেমে এল, 'বিশ লিটার পেট্রল আর দু-লিটার মোবিল—আচ্ছা, খাবার-দাবারের কিছু ব্যবস্থা হবে?'

লোকটার একটা কথাও আমার কানে ঢুকল না। আচ্ছন্নের মতো যান্ত্রিকভাবে গাড়ির ট্যাঙ্কে তেল ঢালতে শুরু করলাম।

'কী হল?' দাঁত বের করে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা, 'কানে গেল না আমার কথা? আমাদের ক্ষিদে পেয়েছে।'

'দুঃখিত, আজ রেস্তোরাঁ বন্ধ আছে।' সবিনয়ে তাকে জানালাম।

'বন্ধ আছে বললেই হবে! ক্ষিদে পেয়েছে, খাবার চাই—ব্যস!'

ট্যাঙ্কের ঢাকনা বন্ধ করে বিরক্তি দৃষ্টিতে বুড়োটার দিকে তাকালাম। যেমন করেই হোক এই লোকটাকে তাড়াতে হবে। যত সব ঝুট-ঝামেলা—

'আমার কথা কানে যায়নি আপনার?' ঠিক ওর মতো করেই খেঁকিয়ে উঠলাম, 'রেস্তোরাঁ এখন বন্ধ আছে!'

'ও—' কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে আমাকে দেখল সে। তারপর বলল, 'তোমার মনিবকে ডাক। আমি খোদ মালিকের সঙ্গেই দেখা করতে চাই।'

'হ্যারি, কী করছ—' মেয়েটি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল।

'তুমি চুপ করবে? আজ ওর একটা হেস্তনেস্ত আমি করবই! মালিকের সঙ্গে কথা না বলে আমি যাচ্ছি না।'

লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে বাংলোর দিকে এগোতে লাগল। জানলার আলো দেখে হয়তো ভেবেছে ওটাই মালিকের ঘর। সর্বনাশ!!

দৌড়ে গিয়ে তার পথরোধ করে দাঁড়ালাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে—উত্তেজিত হবেন না। দেখছি, আপনাদের খাওয়ার কী ব্যবস্থা করা যায়। মি. জেনসন এখন ঘুমোচ্ছেন—।'

লোকটা কটমট করে আমার দিকে চাইল, যেন গিলে ফেলবে। আমার আপাদমস্তক ভালো করে চোখ বুলিয়ে বলল, 'ঘুমোচ্ছেন?—ঠিক আছে, কি করছেন সেটা গিয়েই দেখছি।'

সে পা বাড়াতেই আবার বাধা দিলাম, 'আসুন, আসুন—রেস্তোরাঁয় চলুন।'

অনেক কষ্টে ওদের খেতে বসিয়ে বাইরে এলাম। ঠান্ডা হাওয়ায় বসে একটু ভাববার সময় পেলাম।

যেভাবেই ধরা যাক না কেন, আমার অবস্থা এখন কলে-পড়া ইঁদুরের মতো। অবশ্য লোলারও একই অবস্থা। তবে জেনসনের মৃত্যুটাকে নেহাত আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর-কিছু বলা যায় না। লোলা হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসার সময় আচমকা ট্রিগার চাপ পড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে দুর্ঘটনা। কিন্তু পুলিশ কি তা মানবে? ওরা জানতে চাইবে, লোলা রিভলভার নিয়ে অত রাতে কি করেছিল? তখনই লোলাকে টাকার কথা বলতে হবে, আর তাহলেই একে একে স—ব বেরিয়ে পড়বে। লোলা খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়বে।

তবে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একটা উপায় ওর আছে? তা হল, জেনসনের হত্যার দায়টা স্রেফ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। এবং ও যে তাই-ই করবে, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তার উপর আমার আসল পরিচয় ফাঁস হওয়ার পর পুলিশ আর একটুও দেরি করবে না। সোজা নিয়ে জেলে পুরে দেবে।

ইচ্ছে হল, স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে এখুনি পালাই। কিন্তু লোলা যদি পুলিশে ফোন করে জানিয়ে দেয়? অতএব প্রথমেই ফোনের তার কাটতে হবে। তারপর ওর হাত-পা বেঁধে রেখে কেটে পড়বে—কিন্তু না, তাতেও বিপদ আছে। হয়তো কোন গাড়ির চালক তেল নিতে এসে কাউকে না দেখে, বাংলোয় গিয়ে খোঁজ

করতে পারে। তারপর লোলাকে হাত-পা বাঁধা-অবস্থায় দেখতে পেলেই ফোনের তার কাটার আর কোন মূল্য থাকবে না। ওই ড্রাইভার ব্যাটাই পুলিশে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় ভর করল। লোলা যদি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়, দিক না। আমিও তাহলে পুলিশকে এই এক লাখ ডলারের কথা জানিয়ে দেব। বলব, ওই টাকার কোন আয়কর জেনসন দেয়নি। তাহলেই লোলার বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন হু-উ-স করে মিলিয়ে যাবে। আর লোলার যা টাকার লোভ, ও কখনই এটা চাইবে না। তাছাড়া বন্ধ সিন্দুক খোলার জন্য লোলার এখন আমাকে প্রয়োজন। কারণ সিন্দুকের কম্বিনেশনটা জেনসন ছাড়া আর-কেউই জানে না। সুতরাং সিন্দুক ভাঙতে হলে আমি ছাড়া উপায় নেই।

এই প্যাঁচেই লোলাকে কায়দা করব ঠিক করলাম। কিন্তু জেনসনের মৃতদেহটা কি হবে? নাঃ, দেশেশুনে কোন-একটা জায়গায় পুঁতে ফেলব। আর সেই সঙ্গে ওর অনুপস্থিতির জন্য একটা সুতসই গল্প ফাঁদতে হবে। খদ্দেরদের শোনাতে হবে না? নয়তো ওরা সে সন্দেহ করবে, রাতারাতি জেনসন গেল কোথায়!

বসে বসে ভাবছি এমন সময় সেই বুড়োটা আর মেয়েটা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। টাকা-পয়সা মিটিয়ে ওরা গাড়ি ছেড়ে দিল। যাবার আগে বুড়োটা বলে গেল, ‘ওহে, তোমার এই এঁড়ে রেস্তোরাঁয় আমি আর কোনদিন আসছি না।’

‘কে তোমাকে আসতে বলছে, বাবা?’ মনে মনে জবাব দিলাম।

ওদের হাত থেকে রেহাই পেতেই ছুটলাম বাংলোর দিকে। দরজা ঠেলে ঢুকতেই কানে এল রিসিভার তুলে নেওয়ার শব্দ—টুং—দেখি, লোলার হাতে টেলিফোনের রিসিভার।

ও পুলিশে ফোন করছে।

আমাকে দেখেই টেলিফোন ডায়ালের উপর থমকে দাঁড়াল ওর হাত।

এই মধ্যেই লোলার চেহারা ভেঙে পড়েছে। ভয়ার্ত চোখজোড়া কোটরাগত। ঠোঁটদুটো পর্যন্ত সাদা শরীরের সমস্ত রক্ত কেউ যেন শুষে নিয়েছে।

পাথরের চোখের মতো স্থিরদৃষ্টিতে একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে রইলাম। যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আসন্ন সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে সামান্য অঙ্গুলি-হেলনেই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে পরস্পরের উপর।

লোলার হাতে রিসিভার, আর আমার হাতে .৪৫ রিভলভার—ওরই দিকে তাক করা।

‘রিসিভার নামিয়ে রাখ, লোলা।’ দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলাম, ‘না হলে—’

সিভলভারের দিকে চোখ পড়তেই লোলা শিউরে উঠল। মুহূর্তের জন্য হয়তো ভাবল, আমি ওকে নৃশংসভাবে খুন করব। কাঁপা হাতে ও রিসিভার নামিয়ে রাখল।

‘শোবার ঘরে চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।’ রিভলভার নাচিয়ে ওকে এগোতে ইশারা করলাম। ও আস্তে আস্তে পিছোতে শুরু করল—

শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে, তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। লোলা এগিয়ে গিয়ে খাটের উপর বসল। হাঁটুতে হাত রেখে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইল আমার হাতের রিভলভারের দিকে।

‘তুমি কোথায় ফোন করছিলে, লোলা—পুলিশে?’ দাঁত বের করে হাসলাম, ‘ভালো—ভালো! হয়তো ভেবেছ, জেনসনকে খুন করার দায়টা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে, কি বলো না, ফন্দিটা মন্দ নয়! কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ, পুলিশে খবর দিলে তোমার অবস্থাটা কী হবে? ওরা যদি আমাকে এই খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করে, তবে ওই টাকার কথা আমাকে বলে দিতে হবে। আর, ওরা সমস্ত আয়কর হিসেব করে বুঝে নেওয়ার পর, তোমার ভাগ্যে থাকবে লবডঙ্কা! তোমাকে আঙুল চুষতে হবে!’

লোলার চাউনি দেখে বুঝলাম, আমার কথায় ও ভয় পেয়েছে। অত টাকা হারাবার আশঙ্কায় ওর মনের ভিতর শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড সাইক্লোন।

‘এ ছাড়া আর-একটা উপায় আছে। তা হল জেনসনের দেহটা লুকিয়ে ফেলতে হবে। রটিয়ে দিতে হবে, ও জরুরি কাজে হঠাৎ বাইরে গেছে। তারপর যখন নিরাপদ মনে করব, সিন্দুক খুলে দিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাব, এবং তোমার টাকা তুমি পেয়ে যাবে।—এবার যাও,ইচ্ছে হলে পুলিশে ফোন করো, আর সেই সঙ্গে নিজের পায়েও কুড়ুল মারো।’

‘কার্ল দুর্ঘটনায় মারা গেছে!’ লোলা চাপাস্বরে ফিসফিস করে উঠল, ‘আমি—আমি—’

‘দুর্ঘটনা? তুমি প্রমাণ করতে পারবে? উঁহু—। ওটা যে দুর্ঘটনা নয়, তার সাক্ষী আমি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তুমি নৃশংসভাবে কার্লকে খুন করেছ। অতএব ওসব বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথায় এসো। তুমি যদি টাকা না চাও—তো ফোন করো পুলিশে—আমি বাধা দেব না আর যদি টাকা পেতে চাও, তবে আমার কথায় তোমাকে রাজি হতেই হবে।’

লোলা ইতস্তত করল হয়তো আমার উদ্দেশ্য বুঝতে চাইল। ধৈর্য ধরে ওর উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম—উত্তেজনায় স্নায়ুতন্ত্রী যেন ছিঁড়ে পড়ছে। জানতাম, এত সবের পর ও আর পুলিশে খবর দেবে না, তবু রিভলভার হাতে সতর্ক রইলাম যদি—

অবশেষে ও মুখ খুলল, ‘টাকাগুলো এখনই দিয়ে দাও, আমি এখনই চলে যাচ্ছি। কথা দিচ্ছি, কাউকে তোমার কথা বলব না।’

‘না! আমি যখন ভালো বুঝব, তখনই তুমি টাকাগুলো পাবে—তার আগে নয়। আর যদি এটুকু ধৈর্য না ধরতে পার, তো যাও, পুলিশকে ডাকো—।’

এতক্ষণে নিজের বর্তমান অবস্থাটা ও বোধহয় উপলব্ধি করতে পারল। বুঝল, একটা অদৃশ্য ফাঁদ ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে, যার হাত থেকে ওর আর মুক্তি নেই। হতাশা, ক্ষোভ, ক্রোধ একসঙ্গে জড়িয়ে পড়ল ওর মুখের উপর। প্রাণপণ শক্তিতে ও চিৎকার করে উঠল, ‘বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।’ ওর গলার শিরা রাগে উত্তেজনায় ফুলে উঠল-কাঁপতে লাগল তিরতির করে। উপুড় হয়ে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে লোলা কান্নায় ভেঙে পড়ল। থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল ওর বিস্রস্ত দেহ। এবারের যুদ্ধে লোলা হেরে গেছে।

ওকে কিছুক্ষণ সময় দেবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আগে আঘাতটা সামলে উঠুক, তারপর দুজনে মিলে জেনসনের মৃতদেহটার ব্যবস্থা করব।

ঘড়ি দেখলাম—সাড়ে এগারটা। নাঃ, অন্ততপক্ষে রাত একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তার আগে ট্রাকের ভিড় কমবে বলে মনে হয় না। সময় কাটাবার জন্য রেস্তোরাঁয় গিয়ে কাজে লেগে গেলাম।

রাত সোয়া একটায় আবার বাংলোয় ফিরে এলাম। গত একঘণ্টায় আর-কোন ট্রাক বা গাড়ি আসেনি। সুতরাং এই উপযুক্ত সময়।

লক্ষ্য করলাম, লোলার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। ঘরের দরজায় পৌঁছে হাতল ঘোরাতেই বুঝলাম, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

‘লোলা! আর দেরি করো না—এসো—’ ওকে ডাকলাম।

‘চলে যাও! চলে যাও এখান থেকে!’ বন্ধ দরজার ও-পিঠ থেকে ওর চিৎকার ভেসে এল, ‘আমি ওসবের মধ্যে নেই! তোমার যা ইচ্ছে তাই করো!’

বুঝলাম, ও এখনও প্রকৃতিস্থ হয়নি। কিন্তু আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। ও যখন আসবে না, তখন একাই সব করতে হবে।

প্রথমে ভেবেছিলাম, জেনসনকে বাইরে মরুভূমির মধ্যে কোথাও পুঁতে ফেলব। কিন্তু ভেবে দেখলাম গর্ত খোঁড়ার সময় কেউ আমাকে দেখে ফেলতে পারে। তারই ঠিক করলাম, গুমটিঘরেই ওকে কবর দেব। তাহলে, কেউ যে দেখে ফেলবে, এমন সম্ভাবনা কম।

একটা কোদাল আর একটা বেলচা নিয়ে গুমটিঘরে গেলাম। কোণের দিকে পুরোনো লোহালক্কড়ের স্তূপের পাশে একটা জায়গা দেখে খুঁড়তে শুরু করলাম।

প্রায় সাড়ে তিনটের সময় গর্ত খোঁড়া শেষ করে ফিরে চললাম ঘরের দিকে। এই অমানুষিক পরিশ্রমে একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছি। ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে কাজ করার ঢোলা অ্যাপ্রনটা গায়ে চড়িয়ে বাংলোয় ফিরে গেলাম।

বসবার ঘরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে আলোর সুইচ জ্বেলে দিলাম। জেনসনের পর্বতপ্রমাণ দেহ তখনও একইভাবে পড়ে রয়েছে। গায়ে হাত দিয়ে বুঝলাম, মৃতদেহ শক্ত হতে শুরু করেছে। আর ঘণ্টাখানেক দেরি হলেই নড়ানো কঠিন হবে।

তাই আর দেরি না করে গুমটিঘরে ফিরে গেলাম। ভারী-ভারী ইঞ্জিনগুলোকে নাড়াচাড়া করার জন্য একটা ছোট ঠেলাগাড়ি ছিল। সেটাকে ঠেলে নিয়ে চললাম। তার লোহার চাকাদুটো ঢিলে থাকায়, বিশ্রী ঘড়-ঘড় শব্দ হতে লাগল। বাংলোর কাছে পৌঁছে ওটাকে টেনে-হিঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে তুললাম। তারপর বারান্দা পার হয়ে এগোলাম বসবার ঘরের দিকে। চাকাদুটোর বিরক্তিকর শব্দের এতটুকু বিরাম নেই। কিন্তু আমি কি করছি লোলা একবারও দেখতে এল না।

বসবার ঘরে পৌঁছে জেনসনের ভারী দেহটাকে অনেক কষ্টে টেনে গাড়িতে তুললাম। উফ, কম করে তিন মণ ওজন হবে। রক্ত এর মধ্যেই জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। ওর মরা-মুখে নেমে এসেছে প্রশান্তির ভাব। আর-একবার বুঝি বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু দুঃখ করে লাভ নেই। এ তো সামান্য একটা মৃতদেহ! এর মধ্যে কোন কার্ল জেনসন নেই!

গাড়িটা বসবার ঘরে রেখে, বাইরে এসে দুপাশে তাকালাম। না, কোন গাড়িই দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। দূরের কোথাও কোন আলো চোখে পড়ছে না। শুধু বিষণ্ণ চাঁদ ভেসে রয়েছে পাহাড়ের মাথায়।

ফিরে এসে গাড়িটা দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে চললাম। সিঁড়ির কাছে পৌঁছেই মহা বিপদ! গাড়িটাকে এক-এক ধাপ নামানোর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। একটু ভয় পেলাম। মনে হল, কেউ হয়তো শুনে ফেলছে এই হতচ্ছাড়া শব্দগুলো। উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে গাড়ি নিয়ে গুমটিঘরের দিকে এগোলাম।

গর্তের পাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে, জেনসনের দেহটা ঠেলে ফেললাম গর্তের ভিতর। বেলচা দিয়ে মাটি চাপা দিতে শুরু করলাম।

গর্ত ভরাট করে, উপরটা সমান করতে করতে প্রায় একঘণ্টা লেগে গেল। তারপর কাজ করার যে বড় ভারী টেবিলটা ছিল, সেটাকে টেনে নিয়ে এসে রাখলাম জেনসনের কবরের উপর। কারুর পক্ষে জানা তো দূরের কথা, আন্দাজ করাও সম্ভব নয় যে ওটার তলায়—মাটির চার ফুট নিচে জেনসন শুয়ে আছে।

গুমটিঘরের আলো নিভিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম। স্নান করে, জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। এর মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। পাহাড়গুলোকে আকাশে পটভূমিকায় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাহাড়ের ফাঁকে উঁকি দেবে ভোরের সূর্য।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। জেনসনের অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প তৈরি করতে হবে। যদি তেমন বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তবে কেউ হয়তো সন্দেহ করে পুলিশে যেতে পারে। না, গল্পটা ভালো হওয়া চাই-ই—

সকাল সাড়ে ছ-টার সময় ট্রপিকা স্প্রিংসে যাবার প্রথম ট্রাকটা এসে দাঁড়াল। ট্যাঙ্কে তেল ভরছি, ড্রাইভারটা হঠাৎ জিগ্যেস করে বসল, 'মি. জেনসনকে যে দেখছি না?'

এরকম অবস্থায় যে পড়তে হবে, জানতাম। এখান থেকে দিনের পর দিন শুনতে হবে এই একই প্রশ্ন—'জেনসন কোথায়!'

'মি. জেনসন এখানে নেই, অ্যারিজোনায় গেছেন। ওখানে আরেকটা পেট্রল-পাম্প খুলবেন, তাই জায়গা দেখতে গেছেন।'

গত রাতে ভেবে ভেবে এই গল্পটাই তৈরি করেছি। এর চেয়ে ভালো কিছু আর মাথায় আসেনি।

'তাই নাকি?' লোকটাকে বেশি কৌতূহলী মনে হল, 'তাহলে এটা এখন কে দেখাশোনা করবে, তুমি?'

'হ্যাঁ—' একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললাম, 'আমি আর মিসেস জেনসন।'

'মিসেস জেনসন!' লোকটা চমকে উঠল। চকিতে ভুরু কুঁচকে মুখ তুলে তাকাল—যেন ওর কানে কেউ একটা জ্যান্ত সাপ ঢুকিয়ে দিয়েছে, 'তার মানে—উনি এখানে রয়েছেন? বাঃ, বেশ—বেশ। —জেনসনের বউটা ভালোই দেখতে—কি বলো?' আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে ব্যাটা মুচকি হাসল।

রাগ হলেও চেপে গেলামে। এ তো সবে শুরু—এভাবেই চলবে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস। ভাব শালা, যা খুশি ভাব! ভাবতে তো আর পয়সা লাগে না! তবে প্রমাণ তুমি করতে পারছ না।

লোকটা রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া সেরে, দাম মিটিয়ে ট্রাকে এসে উঠল। একথা-সেকথা বলতে বলতে আমিও ট্রাক পর্যন্ত এলাম। আর ঠিক তখনই ঘটে গেল চরম বিপর্যয়।

বাংলোর দরজা খুলে লোলা বেরিয়ে এল। পরনে সেই ছোট্ট লাল প্যান্ট, গায়ে সাদা চোলি।

লোলাকে দেখেই লোকটা সড়াৎ করে জিভে জল টানল। বিরাট হাঁ করে চেয়ে রইল ওর দিকে। তারপর আমার দিকে চেয়ে হাসল—কান-এঁটো-করা হাসি। 'তোমার জায়গায় কাজ করতে পারলে আমি খুশি হতাম, দোস্ত। চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও! তোমার কাজটা বেশ রসালো মনে হচ্ছে!'

দড়াম করে ট্রাকের দরজা বন্ধ করে সে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল, তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল। লোলার পাশ দিয়ে যাবার সময় তীক্ষ্ণ কান-ফাটানো শব্দে শিস দিয়ে উঠল হতচ্ছাড়া ড্রাইভারটা।

আট

লোলার দিকে একনজরে তাকিয়ে বুঝলাম, গত রাতে ওর ভালো ঘুম হয়নি। চোখের কোলে কালি, মুখে কেমন একটা শ্রান্ত, অবসন্ন ভাব।

ও যে ওইরকম স্বল্প পোশাকে কোন অচেনা লোকের সামনে বেরিয়ে আসবে, ভাবতে পারিনি। এখন ড্রাইভারটা পাঁচজনকে একথা-সেকথা বলে বেড়াবে। ঠিক যে ভয়টা করছিলাম, তাই হয়েছে।

টেবিলের উপর রাখা গাউনটা নিয়ে ওর মুখের উপর ছুড়ে দিলাম, 'নাও, দয়া করে এটা পরে নাও। এই পোশাকে বেরিয়ে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে না, তুমি মেয়েছেলে। গাউনটা পরা থাকলেও লোকে সেটা বেশ বুঝতে পারবে!'

'কেন, কি হয়েছে?' ওর চোখে শূন্য দৃষ্টি—আমার কথা যেন কিছুই বুঝতে পারেনি।

'দোহাই তোমার, একটু মাথা খাটাবার চেষ্টা করো।' অধৈর্য স্বরে থমকে উঠলাম, 'ড্রাইভারটা একটু আগেই তোমাকে ওই পোশাকে দেখেছে। তারপর আমাকে কি বলেছে জান? আমার কাজটা নাকি খুব রসালো! এভাবে কথাগুলো ছড়াতে ছড়াতে, কোন্দিন দেখবে পুলিশ এখানে এসে হাজির হয়েছে!'

মুখ গোমড়া করে ও গাউনটা পরে নিল। তারপর আমার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল, 'কার্লের কি করলে?'

'ওর দেহটা আমি পুঁতে ফেলেছি।—যাকগে, শোনো—এখন থেকে আমরা দুজনে মিলেই এ জায়গাটা দেখাশোনা করব। কিন্তু কেউ কারুর ব্যাপারে নাক গলাব না। যখন সময় হবে, আমি চলে যাব। যাবার আগে সিন্দুক খুলে দিয়ে যাব।'

লোলার চোখে ঝিলিক দিল হায়েনার লোভাতুর দৃষ্টি, 'কিন্তু সেটা কবে?'

'তা বলা সম্ভব নয়। যদ্দিন না পুলিশ আমার খোঁজ করা বন্ধ করছে, আমি এ জায়গা ছেড়ে নড়ছি না।'

মুহূর্তেই বড় হতাশ দেখাল লোলাকে। বুঝলাম, টাকার জন্য একটা দিনও অপেক্ষা করতে ও রাজি নয়।

‘কিন্তু কার্লের বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা জানতে চাইবে কার্ল কোথায় গেছে।’

‘সেসব আমার অকে আগেই ভাবা হয়ে গেছে। তোমাকে কেউ কিছু জিগ্যেস করলে বলবে, সে অ্যারিজোনায় গেছে। মাস দুয়েকের আগে ফিরবে না। এ ক-মাস তুমিই এসব দেখাশোনা করবে, আর আমি তোমাকে সাহায্য করছি।’

‘সে না হয় হল। কিন্তু দুমাস পর কি হবে? কার্লকে তো ওরা আর ভুলবে না তখনও একই কথা বার বার জিগ্যেস করবে। কি জবাব দেব তখন?’

‘দু’মাস পর তুমি কার্লের একটি চিঠি পাবে। তাতে লেখা থাকবে, সে ওখানে গিয়ে আরেকটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে এবং তাকে শিগগিরই বিয়ে করছে। এখানে সে আর ফিরবে না। তোমাকে যাতে খাওয়া-পরার কষ্টে না পড়তে হয়, সেজন্য এখানকার পেট্রল-পাম্পটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে। এই দুঃসংবাদটা প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবে। ব্যস—ঝামেলা চুকে গেল। তারপর চারদিক ঠান্ডা হলে আমিও কেটে পড়ব। তখন ইচ্ছে করলেও এ জায়গাটা বেচে, তুমি অন্য কোথাও চলে যেও।’

‘তার চেয়ে এক কাজ করো কার্ল তোমাকে যে তিরিশ হাজার ডলার দিচ্ছিল, সে-টাকাটা তুমি এখনই সিন্দুক খুলে নিয়ে নাও। তাহলে ন্যু-ইয়র্কে পৌঁছতে তোমার অসুবিধে হবে না। তারপর বাকি টাকাটা—’

‘না। জেনসনের একটা টাকাও আমি ছোঁব না। তা ছাড়া এ জায়গাটা আমার পক্ষে বেশ নিরাপদ। আর কিছুদিন না দেখে পালানোটা ঠিক হবে না। বলেছি তো, যখন যাব তোমার টাকা তুমি পেয়ে যাবে—তার আগে নয়।’

লোলা উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পেলাম। চটপট রান্নাঘর ছেড়ে বেরোতেই দেখি, একজন লম্বা, থলথলে চেহারার পুরুষ রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে—চুলের রঙ সোনালী, গাঢ় নীল চোখ, বয়স আন্দাজ চল্লিশ হবে।

লোকটা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখল। তারপর দরজা ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এল, ‘জেনসন কোথায়?’

আচমকা এই সরাসরি প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেলাম। কোনরকমে জবাব দিলাম, ‘তিনি—তিনি বেরিয়েছেন।’

‘বেরিয়েছেন!! এই সাতসক্কালে!! কোথায় গেছে ও?’

‘কিছু দরকার থাকলে আমাকে বলতে পারেন।’ তারপর কি মনে হতেই আবার বললাম, ‘মিসেস জেনসনকে ডেকে দেব?’

কথাবার্তার শব্দ শুনে লোলা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। আগন্তুকের দিকে চোখ পড়তেই মিষ্টি হাসিতে ওর মুখ ভরে গেল, ‘ও, মি. ল্যাশ! এত সকাল সকাল যে—কি ব্যাপার?’

লোলাকে দেখে ল্যাশের মুখ থেকে সন্দেহের ছায়াটা মিলিয়ে গেল। সে টুপি খুলে লোলাকে অভিবাদন জানাল, সুপ্রভাত মিসেস জেনসন। ওয়ালেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে কার্লের সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল। ও বোধ হয় আপনাকে বলেছে, আমাদের সভাপতি ওয়ালেস কাল রাতে হার্টফেল করে মারা গেছে। তাঁর শোকসভায় কার্লেরই বক্তৃতা দেবার কথা। কিন্তু এ আমাকে বলল, কার্ল নাকি এখানে নেই!’

চোখ ফেরালাম লোলার দিকে। ওয়ালেসের মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্রই, হাসি মিলিয়ে গিয়ে ওর মুখে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব ফুটে উঠল। ওফ, অভিনয় জানে বটে মেয়েটা!

‘হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে। একটু আগেই এলেই কার্লের সঙ্গে আপনার দেখা হত। এই আধঘণ্টা হল ও ট্রপিকা স্প্রিংসে রওনা হয়েছে।’

ল্যাশ অবাক হয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকাল, ‘অসম্ভব! এই তো ঢুকবার সময় দেখলাম, ওর গাড়িটা গ্যারেজেই রয়েছে, তাহলে—’

ল্যাশের কথায় হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল গলার কাছে! তাই তো, গাড়িটার কথা তো ভাবিনি!

কিন্তু দেখলাম মিথ্যে কথা বলতে লোলার জুড়ি নেই। ল্যাশের কথায় ওর মুখের ভাবে এতটুকু পরিবর্তন হল না। ও হাসল—ছোটদের নির্বুদ্ধিতায় বড়রা যেমন হাসে, সেইরকম হাসি। 'ঠিকই দেখেছেন, মি. ল্যাশ। কার্ল বলে গেছে, ফিরতে ওর মাস দুয়েক লাগবে। এতদিন গাড়ি ছাড়া আমার অসুবিধে হবে ভেবে, গাড়িটা আর নিয়ে যায়নি। অ্যাডাম ওকে তার ট্রাকে করে ট্রপিকা স্প্রিংসে নিয়ে গেছে।'

'ও—!' ল্যাশ চোয়ালে হাত বোলাতে লাগল। বুঝলাম, সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। কার্লের হুট করে উধাও হয়ে যাওয়াটা তার কাছে ভালো ঠেকছে না।

'কেন গেছে কিছু জানেন?' একটা ক্ষীণ সন্দেহ কি ল্যাশের মনে উঁকি মারছে?

'গতরাতে মিটিং থেকে ফেরার পর কার্লের একটা ফোন আসে। কে যেন খবর দেয়, অ্যারিজোনায় একটা পেট্রল-পাম্প নাকি জলের দরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ব্যস, এই খবর পেয়েই ও সাত-তাড়তাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। কাউকে জানাবার আর সময় পায়নি।'

'অ্যারিজোনা! সে তো অনেক দূর! তা— ওকি জায়গা ছেড়ে একেবারে চলে যাবার মতলব করছে নাকি?'

'না, না। আমার মনে হয়, ওখানে দেখাশোনার জন্য কোন লোক ঠিক করেই ও ফিরে আসবে। এসে হয়ত আপনাকে সব বলবে।'

সত্যি, লোলার প্রশংসা করতে হয়। গল্পটা এর চেয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে আমিও পারতাম না।

লোলার উত্তরে ল্যাশ যেন কিছুটা অপ্রস্তুত হল, 'মানে—ব্যাপার কি জানেন, আমি ভাবতেই পারিনি, কার্ল এমনি না বলে-কয়ে হুট করে চলে যাবে। যাকগে, ও ফিরে এলেই আমাকে ফোন করতে বলবেন—'

যেতে গিয়েও ল্যাশ থমকে দাঁড়াল, ঘুরে তাকাল আমার দিকে, 'একে তো চিনলাম না, মিসেস জেনসন?'

'ওর নাম জ্যাক প্যাটমোর—আমাদের এখানে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে। কার্লই ওকে এনেছে।'

'হুঁ—' ল্যাশের চাউনি দেখে বুঝলাম, আমাকে তার একটুও পছন্দ হয়নি। একটু ইতস্তত করে সে দরজার দিকে পা বাড়াল, 'আচ্ছা—মিসেস জেনসন, চলি—। কার্ল ফিরে এলে আমাকে অবশ্যই খবর দেবেন।'

ল্যাশ চলে যেতেই লোলা রান্নাঘরে ফিরে গেল। এতক্ষণে সাহস ফিরে পেলাম। জেনসনের অ্যারিজোনায় যাওয়ার গল্পটা ল্যাশ যখন বিশ্বাস করেছে, অন্য লোকেও করবে। তবে আমার সঙ্গে লোলাকে জড়িয়ে যে অনেক কথা উঠবে, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অতএব সাবধান থাকতে হবে।

আজ রবিবার। কাজের চাপ অত্যধিক। সারা দিনে লোলা আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। রাত বারোটার সময় কাজের হাত থেকে রেহাই পেলাম। একটু ফুরসত হওয়ায় গেলাম রান্নাঘরে।

গিয়ে দেখি রান্না শেষ হয়ে যাওয়ায় লোলা ওর গাউনটা খুলতে শুরু করেছে। আমাকে দেখেই ও থমকাল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। আবার গাউন খোলায় মন দিল।

হঠাৎ যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। শরীরে বয়ে গেল বিদ্যুতের স্রোত। বুকের মধ্যে লকলক করে জ্বলে উঠল কামনার লেলিহান শিখা। মুহূর্তে বিদ্রোহ করতে চাইল আমার অশান্ত যৌবন। কিন্তু প্রচণ্ড চেষ্টায় নিজেকে সংযত করলাম।

লোলা গাউনটা খুলে একটা বাক্সে রাখল। তারপর রান্নাঘরের খিড়কি-দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

আলো নিভিয়ে ঘিরে ফিরে গেলাম। দেখা যাক এইভাবে কদ্দিন চলে! শোবার আগে জানালা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

লোলার শোবার ঘরে জানালা হাট করে খোলা। ঘরে আলো জ্বলছে। শুধু তাই নয়, লোলা দাঁড়িয়ে রয়েছে আলোর ঠিক নিচেই। পরনের চোলিটা ওর বাঁ ঝুলছে। একটু পরেই ও ঝুঁকে পড়ে প্যান্টটা মেঝে থেকে তুলে নিল। বোধহয় প্রয়োজনের একটু বেশিই অপেক্ষা করল। তারপর লঘুছন্দে এগিয়ে চলল বাথরুমের দিকে—বন্ধ হয়ে গেল বাথরুমের দরজা।

অবশ হাতকে প্রাণপণ চেষ্টায় জানলা বন্ধ করতে বাধ্য করলাম।

এভাবে আর কতদিন? মনে মনে প্রশ্ন করলাম নিজেকে।

একই ভাবে দিন যায়।

সারাটা দিন লোলার রান্নাঘরেই কাটে। আমার দিকে একবার তাকানো তো দূরের কথা, একটা কথাও বলে না। অর্থাৎ, রান্না ছাড়া সব কাজ আমাকে একাই করতে হয়।

রাতের নিয়মেরও কোন হেরফের নেই।

রাত এগারটা বাজলেই লোলা বাংলোয় ফিরে যায়। ওর শোবার ঘরের জানালা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয় না। এই চূড়ান্ত প্রলোভন এড়াবার জন্য এই সময়টা রেস্তোরাঁ ছেড়ে একদম বেরোই না। যখন দেখি বাংলোর আলো নিভে গেছে, তখন শুতে যাই। কিন্তু শয়নে-স্বপনে-জাগরণে চোখের সামনে যদি একই ছবি ভাসতে থাকে—ঘুমোব কখন?

এইভাবে চারদিন কেটে গেল। গরমটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেছে। উত্তপ্ত মরুভূমির হাওয়া হয়ে উঠল অসহ্য। ট্রাক-গাড়ির চালাচল কমে আসতে লাগল। কারণ মালপত্র পরিবহনের পক্ষে এইরকম আবহাওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। অতএব স্বাভাবিকভাবেই কাজের চাপ একেবারে কমে এল। অলসভাবে বসে থাকার ফলে মাথায় শয়তান এসে বাসা বাঁধে। অতিকষ্টে তাকে মন থেকে সরিয়ে রাখি।

জেনসন মারা যাবার পর আটদিনের দিন লোলা গাড়ি নিয়ে ওয়েস্টওয়ার্থে গেল। সম্ভবত সাপ্তাহিক কেনাকাটা করতে। একবারও ভাবল না কাজকর্ম আমি একা সামলাব কেমন করে!

ও চলে যাওয়ার পর যা হোক কিছু-একটা করার জন্য, স্টেশন-ওয়াগনটার ডিস্ট্রিবিউটর হেড নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম গুমটিঘরের দরজায় একটা মানুষের ছায়া। চমকে মুখ তুলে তাকালাম। মুহূর্তে পায়ের নীচে মাটি যেন দুলে উঠল।

দরজায় দাঁড়িয়ে জর্জ রিক্স।

এতদিন ওর কথা আমার মনেই ছিল না। আসন্ন বিপদের জন্য মনে মনে সতর্ক হলাম। রিক্সের পরনে সেই নোংরা পোশাক। পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ওর সেই কুকুরটা—বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে।

রিক্সের চোখে শকুনের চাউনি—ঝুঁকে পড়ে যেন কোন মড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'সুপ্রভাত!' আড়চোখে আমার দিকে তাকাল সে, 'কার্ল কোথায়?'

ঘর্মাক্ত হাতদুটো কাপড়ে মুছতে মুছতে জবাব দিলাম, 'মি. জেনসন এখানে নেই, বাইরে গেছেন।'

'বাইরে!' ঘরের ভিতর কয়েক পা এগিয়ে এল রিক্স, 'কি বলছ তুমি?—বাইরে গেছে?'

'কী চাই আপনার?'

'শোন ছোকরা, বেশি ফড়ফড় করো না। আমার দরকার আমি বুঝব। তুমি এখানে চাকরি কর বলেই তো জানতাম! নাকি হঠাৎ মালিক হয়ে বসেছ?'

'আমি তো তা বলিনি। আপনার কি দরকার, তা জানতে চেয়েছি।' মেপে মেপে উত্তর দিলাম। কারণ, একে চটালে চলবে না।

'তা রঙ্গিণী কোথায়? এখানে নেই নাকি?'

'রঙ্গিণী? আপনি কী বলছেন—'

'আমার কাছে আর ন্যাকা সেজ না। কার্লের বউয়ের কথা বলছি—কোথায় সে?'

'কিছুক্ষণ আগে ওয়েস্টওয়ার্থে গেছেন—'

রিক্স ঝুঁকে পড়ে কুকুরটার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। কিন্তু কেন জানি না, কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে সরে যেতে চাইল।

'কার্ল কোথায় গেছে?'

'ব্যবসার ব্যাপারে অ্যারিজোনায় গেছেন।'

'অ্যারিজোনা! কি কাজে?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে কুকুরটার পেটে ক্যাঁৎ করে লাথি মারল।

'সেটা মি. জেনসনকেই জিগ্যেস করবেন।'

'কবে ফিরবে ও?'

'ঠিক জানি না। হয়ত মাস দুয়েক লাগবে।'

'দু মাস?' বিস্ময়-রহস্য যুগপৎ খেলে গেল রিক্সের চোখে, 'অথচ ওর বউ এখানে পড়ে রইল! ব্যাপারটা কী?'

'দেখুন, আমার কাজ আছে।' বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আপনার কিছু দরকার থাকলে তাড়াতাড়ি বলুন।'

'কার্লের সঙ্গে আমায় দেখা করা ভীষণ জরুরি—ওর ঠিকানাটা আমাকে দাও।'

'ঠিকানা আমি জানি না।'

'তাহলে মিসেস জেনসন নিশ্চয়ই বলতে পারবেন, হুঁ?'

'বলছি না, ঠিকানা আমরা জানি না। শুধু জানি, তিনি অ্যারিজোনায় গেছেন।'

'আমরা!' রিক্সের চোখে মুখে ব্যঙ্গের কৌতুক নেচে উঠল, 'এর মধ্যেই 'আমরা'! কার্ল যে বোকা তা জানতাম, কিন্তু এতবড় গর্দভ, তা তো ভাবিনি! নাঃ, তোমার ভাই বুদ্ধি আছে। ওজনদার আস্লি মাল চিনতে তোমার জুড়ি নেই।' জিভটা ঠোঁটের উপর একবার বুলিয়ে নিল রিক্স, শেয়ালের চাউনি নিয়ে হাসল, 'যাকগে, ওসব তোমাদের ব্যাপার তোমরা বুঝবে—কার্লের ঠিকানাটা শুধু আমাকে দাও। আমার পেনসনের কাগজে ওর সই দরকার। সবসময় কার্লই ওটা সই করে। তাই ওর সই না হলে পেনসনের টাকা পাওয়া যাবে না।'

'তার আমি কি করতে পারি? ঠিকানা জানা থাকলে আপনাকে আগেই দিয়ে দিতাম, একবারের বেশি দুবার বলতে হত না। মি. জেনসন না ফেরা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে।'

রিক্স টুপি খুলে মাথায় হাত বোলাল—চোখের মণি অচল, অনড়। কুকুরটাও অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগল।

'তার মানে দু-মাস অপেক্ষা করতে হবে?—তা, এতদিন কি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকব?'

'সে আমি কি জানি, হাওয়া খাবেন কি জল খাবেন!' রাগে বিরক্তিতে অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বরকে সংযত করে বললাম, 'এ ক দিন একটা কাজ-টাজও তো করতে পারেন!'

'তোমার কাছ থেকে কোন উপদেশ শুনতে আমি আসিনি, খোকা!' দাঁত কিড়মিড় করে উঠল রিক্স, 'আমার হার্টের অসুখ আছে। কোনরকম কাজ করা ডাক্তারের বারণ—তাহলে ঠিকানা লোলাও জানে না?'

'কতবার আপনাকে বলতে হবে! আমরা কেউই জানি না।'

রিক্স ঝুঁকে পড়ে কুকুরটার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। হঠাৎ যেন জবাব খুঁজে পেয়ে চোখ তুলে তাকাল, 'মনে কর যদি সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যায়? যদি লোলা অসুস্থ হয়ে পড়ে? ধর, এই পেট্রল পাম্পে যদি আগুন লাগে, তাহলে? কখন কার্লকে নিশ্চয়ই খবর দেবে? জরুরী প্রয়োজনে খবর দেওয়ার জন্যে কার্ল নিশ্চয়ই একটা ঠিকানা দিয়ে গেছে?'

'না! মিসেস জেনসনও অসুস্থ হচ্ছেন না, আর এখানে আগুনও লাগছে না! অতএব ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো! আমার কাজ আছে।'

'কিন্তু সই না পেলে পেনসনের টাকা তো পাব না!' ভাঙা ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বরে রিক্স যেন আবেদন জানাল।

দিয়ে দিই না গোটা কয়েক ডলার, ব্যাটার হাত থেকে যদি নিষ্কৃতি পাওয়া যায়?—কিন্তু নাঃ, আজ যদি টাকা দিই, তবে রিক্স যেরকম নাছোড়বান্দা, রোজ এসে টাকার জন্য ঘ্যানঘ্যান করবে। ভাগিয়ে দেওয়াই ভালো।

'যাও, যাও—কেটে পড়! আর ঝামেলা করো না।' একটু বেশিই রুক্ষ হলাম।

তারপর স্টেশন-ওয়াগনটার কাছে ফিরে গিয়ে ডিস্ট্রিবিউটর হেডটা আটকে বনেট বন্ধ করে দিলাম।

'মিসেস জেনসন কখন ফিরবে?'

'বলতে পারছি না—তবে মনে হয় দেরি হবে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। অবশেষে রিক্সের ভাঙা স্বর কানে এল, 'আমাকে কুড়িটা ডলার ধার দিতে পারবে?'

'টাকা তো আর আমার নয়, সে ইচ্ছেমতো ধার দেব! যাও, আর বিরক্ত করো না।'

কিন্তু রিক্সের নড়বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

উবু হয়ে বসে রেঞ্চ দিয়ে গাড়িটার একটা চাকা খুলতে শুরু করলাম। চাকাটায় একটু টাল থাকায় গাড়ি চালাবার সময় স্টিয়ারিং কাঁপে, তাই—

'ভাবছি অ্যারিজোনা পুলিশকে খবর দেব। ওরা হয়ত কার্লের ঠিকানা খুঁজে বের করতে পরবে।'

একটা শক্ত নাট প্রাণপণ শক্তিতে খোলার চেষ্টা করছিলাম, রেঞ্চটা নাটের গা থেকে পিছলে যেতেই সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। রিক্স বলে কি!

ও কিন্তু কথাগুলো অত্যন্ত সাধারণভাবেই বলেছে। হয়তো তেমন কিছু ভেবে বলেনি। কিন্তু পুলিশ যদি রিক্সের কথায় সত্যি সত্যি জেনসনের খোঁজ শুরু করে দেয়! তাহলেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে! মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। সব-কিছু যেন গুলিয়ে যেতে লাগল।

'তাই কর!' গলারস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করলাম, 'পুলিশ দিয়ে খোঁজ করাচ্ছ শুনলে মি. জেনসন হয়তো বেশি খুশি হবেন—হয়তো তোমার কাগজে একটার জায়গায় দুটো সই করে দেবেন!'

ছড়ে-যাওয়া আঙুলটা চুষতে চুষতে রিক্সের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

'তা কি আর করব! তুমি যখন কার্লের ঠিকানা জানই না, তখন এ ছাড়া আর উপায় কি! কার্ল যা খুশি ভাবে ভাবুক, ওর সই আমাকে পেতেই হবে।—তবে আমার কি মনে হয় জান? লোলা হয়ত জানে। তোমার কাছে চেপে গেছে। লোলা ফিরলে ওকে বলো। শেষ পর্যন্ত ও যদি ঠিকানা না-ই দেয়, তবে অ্যারিজোনা পুলিশকেই জানাব। কার্লকে খুঁজে বের করতে ওদের বেশি সময় লাগবে না।'

এবার রিক্সের দিকে ঘুরে তাকালাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে—মিসেস জেনসন ফিরলে তাঁকে বলব। আমি যতদূর জানি—ঠিকানা তিনিও জানেন না,—তবু একবার জিগ্যেস করব।'

রিক্সের মতো লোককে একথা বলা মানে, হার স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু কি করব? কোন পুলিশ অফিসার এখানে এসে জেনসনের খোঁজ করবে, একথা ভাবলেই হাত পা অসাড় হয়ে আসছে।

আমার কথায় রিক্স হাসল। ধূর্ত শেয়ালের হাসি, 'তাই বলো। আমি কাল রাতে আবার আসব। ঠিকানাটা জোগাড় করে রেখো কিন্তু—'

রিক্স ওর কুকুরটাকে নিয়ে গাড়িতে ফিরে চলল।

ওরা চলে যেতেই ভীষণ ক্লান্ত লাগল নিজেকে। তাড়াতাড়ি চাকাটা সারিয়ে রেস্তোরাঁয় গেলাম। একটা গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে, চুমুক দিলাম। রিক্সের কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

হুইস্কি শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগলাম। সত্যি, মহা বিপদে ফেলল এই বুড়ো শকুনটা!

অ্যারিজোনা পুলিশ কি রিক্সের চিঠির কোন গুরুত্ব দেবে? হয়তো দেবে না। কিন্তু ও যদি জানায়, জেনসন উধাও, আর—তার স্ত্রী ওর কর্মচারীর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে, তাহলে? অনেক সময় এরকম সামান্য খবর পেয়েই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ওরা যদি জেনসনকে অ্যারিজোনায় খুঁজে না পায়, তাহলে নির্ঘাত এখানে লোক পাঠাবে। তারপর এখানে এসে আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠি জানতে চাইবে—অর্থাৎ আমার চিতা সাজাবে।

নাঃ, যেভাবে হোক, রিক্সের মুখ বন্ধ করতেই হবে। এবং তার একমাত্র পথ ওকে টাকা দেওয়া। এভাবে টাকা দিয়ে হয়ত মাস দুয়েক ওকে ঠকিয়ে রাখা যাবে। তারপর? জেনসন যে অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে ভেগে পড়েছে, সেকথা কি ও বিশ্বাস করবে? উঁহু—রিক্স যেরকম স্বভাবের লোক, নিঃসন্দেহে চিঠিটা দেখতে চাইবে। কিন্তু চিঠিটা জাল বলে কি বুঝতে পারবে? মনে হয় চিনে ফেলার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ ওর পেনসনের কাগজে সবসময় জেনসনই সই করত! সুতরাং ও সহজেই বুঝতে পারবে চিঠিটা জেনসনের লেখা নয়। স্রেফ জালিয়াতি! তারপর!—

যতই ভাবছি, পরিস্থিতি ততই জটিল মনে হচ্ছে। রিক্সের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে বুঝে শুনে প্রতিটি পা ফেলতে হবে। হঠাৎ সাময়িক উত্তেজনাবশে কিছু করে বসা ঠিক হবে না।

লোলার সঙ্গে এ নিয়ে একটা আলোচনা করা দরকার। কারণ জর্জ রিক্স আমাদের দুজনেরই শত্রু।

রাত দশটায় লোলা যখন ফিরল, তখনও রিক্সকে ঠেকাবার কোন সমাধান আমি খুঁজে পাইনি।

রান্নাঘরে কাজ করছিলাম। লোলার গাড়ির আওয়াজে বাইরে এলাম। গাড়ির থেকে নেমেই ও হনহন করে বাংলোর দিকে হেঁটে চলল। ছুটে ওর পাশে গিয়ে হাজির হলাম, ‘তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।’

কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই ও দরজা খুলে বাংলোয় ঢুকে পড়ল। পিছন পিছন আমিও ঢুকলাম। লোলা ঘাড় ফেরাল, ওর সবুজ চোখজোড়ায় যেন সবুজ আগুন ঠিকরে বেরোল, ‘বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!’

‘তাই নাকি! কপট কৌতুকে ওর দিকে তাকালাম, ‘তোমার পেয়ারের দোস্ত—রিক্স—আজ সকালে এখানে এসেছিল যে!’

লোলা ভীষণভাবে চমকে উঠল। ওর মুখের রেখা কঠিন হল। রাগের বদলে চোখে ফুটে উঠল একটা সতর্ক ভাব। আমি নির্বিকারভাবে বসবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। লক্ষ্য করলাম, কার্পেটের উপর যে রক্তের দাগ ছিল, সেটা লোলা পরিষ্কার করে ফেলেছে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখি ও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। টুপিটা মাথা থেকে খুলে, ও চুলের ভেতর আঙুল চালাল। সবুজ পোশাক আর লাল চুল—দুয়ে মিলিয়ে ওকে দেখাচ্ছে দারুণ!

‘রিক্স মি. জেনসনের খোঁজ করছিল। ওর পেনসনের কাগজে তার সই দরকার—তাই কার্লের ঠিকানা চাইছিল।’

লোলা নির্বিকার—যেন শুনতে হয় তাই শুনছে।

‘ঠিকানা জানি না বলার পর ও বলেছে, অ্যারিজোনা পুলিশকে জেনসনের খোঁজ করতে বলবে। কারণ তাঁর সই না হলে রিক্স পেনসনের টাকা পাবে না।’

লোলা এবার একটু চিন্তিত হয়েছে মনে হল। ও দরজা বন্ধ করে আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে এসে বসল।

‘তোমার এই মাথামোটা বুদ্ধির জন্যেই এ অবস্থা হয়েছে!’ ও চেঁচিয়ে উঠল, ‘এখন বোঝ ঠ্যালা!’

‘ষাঁড়ের মতো চেঁচিও না। রিক্স আমাদের দুজনেরই শত্রু। ও কাল রাতে আবার আসবে বলেছে। এর মধ্যেই আমাদের ভেবে ঠিক করতে হবে রিক্সকে নিয়ে কি করব।’

লোলা শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরাল, নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, ‘এতে ভাববার কী আছে? সিন্দুকটা খুলে তোমার টাকা নিয়ে তুমি ভেগে পড় বাকি টাকাটা নিয়ে আমিও কেটে পড়ব। রিক্স এসে দেখবে, আমরা কেউ নেই।’

‘বাঃ, চমৎকার বুদ্ধি! কে বলে তোমার বুদ্ধি মাথামোটা!’ অধৈর্য হয়ে খেঁকিয়ে উঠলাম, ‘কিন্তু ভেবে দেখছ কি, কোন লোক পেট্রল নিতে এসে যদি দেখে জায়গাটা খালি তবে কী হবে? রিক্স যখন দেখতে আমরা কেউ নেই, ও কি পুলিশে খবর দেবে না মনে করছ? আর তখনই আমাদের পেছনে ফেউ লাগবে।’

‘জায়গাটা বিক্রি করে দিলে কেমন হয়?’

ওর নির্বুদ্ধিতায় মাথায় রক্ত চড়ে গেল, ‘এ কি তোমার বাপের জায়গা, বেচে দেবে? তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, জেনসন মৃত। প্রমাণ করতে হবে সে উইল করে জায়গাটা তোমাকে দিয়ে গেছে। পারবে প্রমাণ করতে? তখন আর জানতে কারো বাকি থাকবে না, কার্লকে তুমি খুন করেছ!’

‘না না—ওকে আমি খুন করিনি! আচমকা গুলি বেরিয়ে গিয়ে—’

‘পুলিশকে তাই বলে দেখ কি হয়!’

লোলার দু-হাতের চেটো চেয়ারের হাতলদুটোকে নিষ্ফল আক্রোশে নিষ্পেষিত করতে লাগল। ওর মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, ও হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে, কি ফাঁদে আমরা জড়িয়ে পড়েছি।

‘তাহলে তুমি এখানে থাক, আর সিন্দুক খুলে আমার টাকা আমাকে দিয়ে দাও— আমি চলে যাব। কেউ জিগ্যেস করলে বলো, আমি অ্যারিজোনায় কার্লের কাছে গেছি—না ফেরা পর্যন্ত এই ‘পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এর দায়িত্ব তোমার ওপরেই রয়েছে।’

‘তুমি কি ভেবেছ রিক্সের মতো লোক সে-কথা বিশ্বাস করবে? প্রথমে জেনসন উধাও হল, তারপর তুমি—পেট্রল-পাম্পে আমি একা। ও সোজা পুলিশকে গিয়ে বলবে, আমি তোমাদের দুজনকে খুন করে এখনকার মালিক হয়ে বসেছি। রিক্সের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও, ওরা তদন্ত করতে এখানে আসবেই। তারপর হয়তো জানতে পারবে আমার পরিচয়—খুঁজে পাবে জেনসনের মৃতদেহ।’

লোলা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, ‘কী! তুমি কার্লকে এখানে কবর দিয়েছ? পাগলামোর একটা সীমা থাকা দরকার!’

‘তা ছাড়া আর কোথায় কবর দেব?—তুমি কি আমাকে সাহায্য করেছিলে? ভেবেছিলে, এই তিনমণী লাশটাকে আমি একা স্টেশন-ওয়াগনে তুলে নিয়ে যাব? চমৎকার! কার্লকে আমি গুমটিঘরে পুঁতে ফেলেছি। পুলিশ যদি রিক্সের কথায় এখানে এসে খোঁড়াখুড়ি শুরু করে দেয়, তবে নির্ঘাত ওর দেহ খুঁজে পাবে।’

লোলা তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ‘তার মানে! তোমার সঙ্গে আমাকে এখানে চিরদিন থাকতে হবে?’

‘চিরদিন কিনা জানি না, তবে থাকতে হবে।’ দৃঢ়স্বরে জবাব দিলাম, ‘এ ছাড়া আমাদের আর-কোন পথ নেই।’

‘তুমি থাকলে থাক, আমি এখানে এক মুহূর্তও থাকছি না।’ লোলা চেয়ারের হাতলে এক ঘুষি বসিয়ে দিল, ‘অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। এখুনি আমার টাকা আমাকে দিয়ে দাও।’

হাত বাড়িয়ে সিন্দুকটাকে দেখালাম, ‘তাহলে যাও, আর দেরি করছ কেন? সিন্দুক খুলে টাকা নিয়ে চলে যাও!—তবে আমার কথাগুলো আর-একটু ভেবে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে, এ ছাড়া আমাদের আর পথ নেই।’

বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। লোলা চেয়ারেই বসে রইল—চোখে আতঙ্ক আর ঘৃণা নিয়ে।

রাত বারোটা পর্যন্ত পাম্পের কাছে বসে রইলাম। রিক্সের চিন্তাকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না। চেয়ে দেখি বাংলোর আলো জ্বলছে, অর্থাৎ লোলার মনেও একই ভাবনা। অবশেষে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ঘরে ফিরে গেলাম। হাতমুখ ধুয়ে, জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু বুঝলাম ঘুমোবার চেষ্টা নিরর্থক।

হঠাৎ ঘরের দরজা খোলার মৃদু শব্দে চমকে উঠলাম। রিক্সের চিন্তা মুহূর্তে মন থেকে মিলিয়ে গেল। কাঠ হয়ে শুয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইলাম—

দরজা-পথে ঘরে এসে ঢুকল এক ছায়ামূর্তি। জানালা দিয়ে ঠিকরে-পড়া চাঁদের আলোয় তাকে চিনতে পারলাম—লোলা!

ওর গায়ে সবুজ সিল্কের চাদর। চাঁদর রুপোলী আলো সেটা গায়ে পড়ে পিছলে যাচ্ছে। লোলা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার পাশে বসল। ওর চাপা ফিসফিস স্বর কানে এল, ‘শেট, যদি আমাদের একসঙ্গেই

থাকতে হবে, তবে আর মিছিমিছি শত্রুতা করে লাভ কী?'

ও আমার দেহের উপর ঝুঁকে এল—আমার মুখের উপর নামিয়ে আনল ওর মুখ—ওর তৃষ্ণার্ত ঠোঁট ডুবিয়ে দিল আমার ঠোঁটে—

নয়

সকালের সোনা-রোদ সরাসরি চোখে এসে পড়তেই ঘুম ভাঙল। শরীরে এক বিচিত্র অবসাদ। আড়মোড়া ভেঙে, মাথা তুলে বিছানার পাশে-রাখা ঘড়ির দিকে তাকালাম—ছ-টা বেজে কুড়ি মিনিট। লোলা কখন চলে গেছে জানি না, কিন্তু ওর সেন্টের নেশা-ধরানো মিষ্টি গন্ধ এখনও বিছানায় মিশে রয়েছে।

আমাদের যখন একসঙ্গেই থাকতে হবে, তখন আর শত্রুতা করে লাভ কী?

লোলার কথাগুলো মনে পড়ায় হাসি পেল। না মিসেস লোলা জেনসন, শেট কারসনকে আপনি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। আপনার বড়লোক হওয়ার সুখ-স্বপ্ন ওই সিন্দুকের ভিতর যেমন বন্ধ আছে—তেমনি থাকবে। শেট আর যাই হোক, বোকা নয়।

বিচানা ছেড়ে বাথরুমে গেলাম। দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে জামা-কাপড় পরে নিলাম। আজ সকালে লোলার মনোভাব কিরকম আছে, জানা দরকার। সুতরাং আর দেরি না করে পা বাড়ালাম রেস্তোরাঁর দিকে।

কাউন্টার পার হয়ে রান্নাঘরের দরজায় হাত রেখে আস্তে চাপ দিলাম। না, অন্যান্য দিনের মতো দরজা আজ বন্ধ নয়। ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল কর্মরত লোলাকে। ও কাজ করার সাদা গাউনটা পরে ডিমের ওমলেট করতে ব্যস্ত। পায়ের শব্দে ও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, 'ও, হুজুরের ঘুম তাহলে ভেঙেছে! আমি তো ভাবছিলাম, আজ সারাটা দিনই বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমোবে!'

আস্তে আস্তে ওর পিছনে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, কাছে টেনে নিলাম, মুখ ডুবিয়ে দিলাম ওর আগুন-রঙা চুলের বন্যায়।

'এই, এই—এ কি হচ্ছে! তোমার ওমলেট নষ্ট হয়ে যাবে যে!' কিন্তু মুখ সরিয়ে নেবার জন্য ও একটুও ব্যস্ত হল না। বরং নিজেকে এলিয়ে দিল আমার গায়ে, 'কাল রাতের জন্যে তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করেছ?'

ওকে কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড় করালাম, হাসলাম, 'তাহলে আরও একবার আমাকে রাগ করতে দাও।' এক ঝটকায় ওকে টেনে নিলাম আমার বুকে, ঠোঁট নামিয়ে আনলাম ওর ঠোঁটের উপর। অনুভব করলাম ওর হৃদস্পন্দন, ওর যৌবনের উষ্ণস্পর্শ। লোলার আঙুল খেলা করে বেড়াতে লাগল আমার চুলে।

একসময়ে আমার বাঁধন ছাড়িয়ে ও প্রাতরাশের আয়োজন করতে লাগল। একটা চেয়ারে বসে লক্ষ্য করছিলাম লোলাকে। কিরকম সুপটু হাতে ও একটার পর একটা কাজ করে চলেছে।

প্রাতরাশ তৈরি শেষ করে লোলা খাবারের প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিল, 'কফিটা নিজে কাপে ঢেলে নাও। তারপর ও আমার মুখোমুখি বসে একটা সিগারেট ধরাল। ওর চোখের দৃষ্টি আজ আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত—সম্পূর্ণ নতুন।

'শেট, প্রথম থেকেই তোমার সঙ্গে আমি খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। কিন্তু কাল রাতেই আমার মত পালটেছে। ভেবে দেখলাম, কার্ল মারা যাবার পর আমরা যেভাবে এতদিন কাটিয়েছি, তার কোন মানে হয় না। বিশেষত—তুমি যখন একজন সুপুরুষ আর—' একটু থামল লোলা, 'কোন মেয়ের জীবনে তোমার মতো পুরুষের সঙ্গলাভ-নিঃসন্দেহে একটা অভিজ্ঞতা। তুমি বরং তোমার জিনিসপত্র নিয়ে বাংলোয় চলে এসো—এখন আলাদা থেকে লাভ কী?'

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করলাম। মৃত জেনসনের ধোঁয়াটে মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু সেটা মন থেকে সরিয়ে ফেলে লোলার দিকে তাকালাম, 'ঠিকই বলেছ—তুমি তো জান, প্রথমদিন থেকেই তুমি আমার

ঘুম কেড়ে নিয়েছ। তা ছাড়া, গত রাতের পর আলাদা থাকা কি আমার সাধ্যে কুলোবে?'

লোলা মিষ্টি করে হাসল, মুখ নামাল লজ্জায়।

বাইরে থেকে ভেসে এল কোন ট্রাকের শব্দ—পর পর দুবার তার হর্ন বেজে উঠল।

'আমি দেখছি।' লোলা উঠে দাঁড়াল, 'তুমি খেয়ে নাও।' ও রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া শেষ হতেই আমার মন সক্রিয় হয়ে উঠল। বৎস কারসন, সাবধান! লোলার অভিনয়ের ফাঁদে খবরদার পা দিওনা—ক্রূর সাপিনীর এ এক নতুন অভিসন্ধি!

কিন্তু অবচেতন মনে একটা ক্ষীণ আশা উঁকি মারছিল—হয়তো ও সত্যিই আমাকে ভালোবাসে।

এমন সময় লোলা রান্নাঘরে ফিরে এল। চোখেমুখে সামান্য পরিশ্রান্ত ভাব, কিন্তু ঠোঁটে মোহিনী হাসি। ও আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, 'রিক্সের কথা কিছু ভেবেছ? ও তো রাত্তিরে আবার আসবে—'

'ওর জন্যে আমি একটুও ভাবছি না। কিছু টাকা দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—আর আসবে না।'

'তাই কি?— রিক্স যেরকম চরিত্রের লোক, তাতে মনে হয়, একবার টাকার গন্ধ পেলেই ও রোজ আসবে।'

লোলা ঘাড় নাড়ল, 'কিছু ভেবো না, রিক্সকে সামলানোর ভার আমার।'

'কিন্তু সাবধান থেকো, ব্যাটা গণ্ডগোল করতে পারে।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

গত ক-দিনের অসহ্য আবহাওয়া বর্তমানে অনেকটা সহনীয় হয়ে উঠেছে। মরুভূমির হাওয়ার আগের মতোই অনুভূত হচ্ছে শীতল আমেজ। গাড়ি-ট্রাকের যাতায়াত অনেক বেড়ে গেছে। 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' আবার হয়ে উঠেছে কর্মচঞ্চল।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও, দু-এক মুহূর্তের অবসরে রান্নাঘরে গিয়ে লোলার উষ্ণ সান্নিধ্য অনুভব করেছি। প্রতিবারই ওকে আগের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়া বলে মনে হয়েছে। কাজের মাঝে ওকে বিরক্ত করার জন্য শুনতে হয়েছে কপট অনুযোগ, কিন্তু কোনবারই আমাকে ও নিরাশ করেনি।—তবুও কেন জানি না, ও যে অভিনয় করছে, এ ধারণাটা আমার মনে আরও বদ্ধমূল হয়েছে।

সন্ধে সাতটার সময় যানবাহন চলাচল একেবারে কমে এল। অতএব মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে গেলাম রান্নাঘরে।

লোলা ভীল কাটলেটগুলো সাজিয়ে রাখছিল—আমি ঢুকতেই ঘুরে দাঁড়াল, আবার এখানে এসেছ! কী চাই?'

কোন জবাব না দিয়ে ওকে সোজা বুকে টেনে নিলাম।

'এই, ভালো হবে না বলছি। কী করছ, ছাড়—' ও আমার বাঁধন ছাড়িয়ে মুক্ত হবার চেষ্টা করল—যেন একটা তুলতুলে নরম পালকে ঢাকা পাখি তার ছোট্ট ডানা ঝটপট করছে।

আমিও ওকে জাপটে ধরে রইলাম, 'ছাড়ব না। দেখি তুমি কেমন করে ছাড়াও—' আমাদের এই একান্ত ব্যস্ততার মুহূর্তে একটা হাল্কা শব্দ কানে এল—রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দ! চমকে উঠে এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালাম। কিন্তু এতক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে—আমরা দুজনেই দাঁড়িয়ে রিক্স। ও হাসছে—ধূর্ত-বিষাক্ত হাসি কুৎসিত মুখের চেহারা হয়ে উঠেছে ভয়াল-কুটিল! বুঝতে আর বাকি রইল না, ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছে। ইস! রিক্স এই সময়ে আসবে জেনেও কি বোকার মতো কাজই না করেছি! লোলার দিকে তাকালাম। কিন্তু ও এতটুকু বিচলিত হয়নি। মুখ ভাবলেশহীন, চোখের ভাষায় এক নীরব প্রশ্ন।

মনের অপরাধবোধ সম্ভবত প্রতিফলিত হয়েছিল আমার মুখের দর্পণে। কারণ রিক্স কৌতূহলভরে আমাকে একবার দেখল, তারপর ফিরে তাকাল লোলার দিকে, 'তোমাদের বিরক্ত করার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল

না। বলেছিলাম এ-সময়ে আসব, তাই এসেছি।'

আমার ঠোঁটদুটো কেউ যেন সেলাই করে আটকে দিয়েছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঘামছি—দেখছি রিক্সকে।

'কী ব্যাপার, জর্জ?' লোলার স্বর একেবারে স্বাভাবিক, 'এ সময়ে কী দরকার?'

রিক্সের ক্ষুদে চোখজোড়া আমাদের মুখের উপর খেলে বেড়াতে লাগল, 'আমি যে এ সময়ে আসব, তা বলেনি?' আঙুল দিয়ে আমাকে দেখাল সে।

লোলা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

'কার্লের কোন খবর পেয়েছ? আমার পেনসনের কাগজে ওর সই দরকার।'

'না, এখনও পাইনি। হয়তো ওখানে গিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুমি তো এক কাজ করতে পার—কোন উকিল বা ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে দিয়ে তোমার কাগজে সই করাতে পার।'

রিক্স আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করল, 'উহুঁ, তাতে হবে না। কার্লের সই না হলে, ওরা টাকা আটকে দেবে। আমার তাহলে চলবে কী করে?'

লোলা কাঁধ ঝাঁকাল, 'কি আর করা যাবে, কার্ল তো নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা দিয়ে যায়নি। ও না ফেরা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষাই করতে হবে।'

লোলার স্থির নির্বিকার দৃষ্টির কাছে রিক্স যেন অস্বস্তি বোধ করল। যে-কথাগুলো বলবে, সেগুলো হয়তো মনে মনে আর-একবার ভেবে নিল।

'তাহলে অ্যারিজোনা পুলিশকে লিখে জাননোই ভালো। কারণ পেনসনের কাগজে কার্লের সই না হলে আমার চলবে না।'

কথাগুলো বলার সময় ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোলাকে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু লোলার মুখে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখে একটু হতাশ হল।

'ইচ্ছে হলে তাই কর, তাতে আমার কিছু যাবে-আসবে না। তবে কার্ল অ্যারিজোনায় হয়তো না-ও থাকতে পারে। একবার কোলোরাডো যাবে বলছিল—কে জানে!' লোলা টেবিলে হেলান দিয়ে মাথার চুলে হাত চালাতে লাগল, 'তা এ নিয়ে এত ঝামেলা করার কি আছে, জর্জ? আমার মনে হয়, কোন ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে দিলেই সে সই করে দেবে।—অবশ্য যদি তোমার টাকার খুব প্রয়োজন থাকে, তো বল, দু-পাঁচ ডলার না হয় ধারই দেওয়া যাবে।'

লোলা এত সহজ আর স্বাভাবিকভাবে ধারের প্রসঙ্গ তোলায়, রিক্স সন্দেহ করার কোন সুযোগ পেল না। আমিও হয়তো এত সুন্দরভাবে রিক্সকে বোকা বানাতে পারতাম না।

'কত?' দ্বিধাগ্রস্ত মনে রিক্স জানতে চাইল। কিন্তু ওর অতি-আগ্রহের সুরটা লোলার কান এড়াল না।

'অত বেশি ব্যস্ত হয়ো না, জর্জ।' ঘৃণাভরে ও উত্তর দিল, 'বড়জোর ডলার দশেক দিতে পারি।'

'রিক্স যেন আশাহত হল, 'ওতে কি হবে! আমারও তো খরচ-খরচা আছে। অন্তত বিশ ডলার পেলে ভালো হত।'

'তোমার টাকার খাঁই কোনদিন কমবে না, জর্জ। সুযোগ পেলেই খালি নিংড়ে নেবার চেষ্টা কর।' ও রিক্সকে কাটিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে ও ফিরে এল—হাতে তিনটে ডলারের নোট। নোট তিনটে লোলা রিক্সের হাতে গুঁজে দিল, 'নাও, ধর—। এই শেষ, এর চেয়ে বেশি আমার কাছ থেকে আর পাবে না অতএব, শুধু শুধু আর এস না। তোমাকে টাকা দিয়েছি শুনলে কার্ল হয়তো অসন্তুষ্ট হবে।'

রিক্স টাকাগুলো চটপট পকেটে ভরে ফেলল, 'লোলা, তুমি বড় নির্দয়।' ও দাঁত বের করে হাসল, 'আমি যে তোমার স্বামীদেবতা নই, সেজন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যেই কার্ল

ওর ভুল বুঝতে পারবে। তারপর চোখের জলে বুক ভাসাবে, অ্যাঁ!' রিক্স শেয়ালের মতো খিকখিক করে হেসে উঠল।

'বাজে কথা না বলে কেটে পড়। কার্লের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। লোলার স্বরে কাঠিন্য, 'ভবিষ্যতে আর এদিকে মাড়িয়ো না।'

'হুঁ, দুয়ে গুঞ্জন তিনে হাট! না, তোমাদের প্রেমগুঞ্জনে আর বাধা দেব না। তবে একটু সাবধানে থেকো, লোলা। কার্ল হয়তো একটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করবে না।' রিক্স ওর চোখজোড়া আমার মুখের উপর একবার বুলিয়ে নিল।

লোলা ঘুরে তাকাল আমার দিকে, 'একে লাথি মেরে বের করে দাও, জ্যাক—অনেকক্ষণ ওর বকবকানি সহ্য করছি।'

আমি রিক্সের দিকে এগোতেই ও ঘুরে দৌড় লাগাল।

ওর গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করলাম। তারপর লোলা টেবিলের কাছে গিয়ে আবার কাজে মন দিল।

'রিক্স নিশ্চয়ই আমাদের দেখেছে।' ওকে বললাম।

'তো হয়েছে কী? বলেছি না, আমিই ওকে সামলাব—তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

'টাকার জন্যে ও আবার আসবে, দেখো।'

কাটলেটগুলো লোলা প্লেটে সাজিয়ে রাখতে লাগল, 'ওহ্ হো! বলছি না, ও নিয়ে ভেব না। আসুক না জর্জ, আমি তো আছি।'

একদিন দুদিন করে দু-সপ্তাহ কেটে গেল, রিক্স আর এল না। কিন্তু ও না এলে কি হবে, এ দু-সপ্তাহে কম করে একশ লোকের কাছে জেনসনের অনুপস্থিতির জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছে। দু-একজন সামান্য সন্দেহ প্রকাশ করলেও, অ্যারিজোনায় যাওয়ার গল্পটা মোটামুটি সকলেই বিশ্বাস করেছে। কয়েকজন একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকেছে। তাদের চোখে একই নীরব প্রশ্ন ঃ 'কি বাবা, জেনসনের বউকে নিয়ে ফষ্টিনস্টি শুরু করনি তো?' মনে মনে অস্বস্তি হলেও, প্রকাশ্যে সহজ হবার চেষ্টা করেছি সবিনয়ে জানিয়েছি আমি এখানকার কর্মচারী মাত্র। অবশ্য তাতে কোন ফল হয়েছে কিনা বলতে পারি না।

রোজ রাত একটায় রেস্তোরাঁ বন্ধ করে আমি লোলা শুতে যাই বাংলোয়। মাঝেমাঝে জেনসনের কথা ভেবে অস্বস্তি হয়। ওরই বিছানায় ওরই বউয়ের সঙ্গে শুয়ে আছি দেখলে সে কি ভাবত কে জানে! কিন্তু লোলার দুর্নিবার আকর্ষণের কাছে এসব চিন্তা ধুয়ে-মুছে বিলীন হয়ে যায়। ওকে সোহাগে আদরে জড়িয়ে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলি। সমস্ত পৃথিবী কেন্দ্রীভূত হয় আমাদের—একান্ত আমাদের অস্তিত্বে।

একসময় পূর্ণ পরিতৃপ্তির অবসাদ নিয়ে ক্লান্ত দেহে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকি। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় মায়াময় পরিবেশে আরও একবার মনে পড়ে কবরে শুয়ে-থাকা জেনসনের কথা। তখন নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হয়। কিন্তু লোলা? কই, মুহূর্তের জন্যও তো ওকে অপরাধবোধের শিকার হতে দেখিনি! বরং ওর ভাবসাব দেখে মনে হয়, কার্ল জেনসন নামে ব্যক্তিপূর্ণ পুরুষটি ওর স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে—তার একদা-অস্তিত্ব আজ ওর কাছে নেহাতই অবাস্তব।

তবে এই দু-সপ্তাহে একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি। সেটা হল—লোলাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। যেভাবে আমরা দিনের পর দিন কাটিয়েছি, তাতে হয়তো এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। যদিও লোলাকে দেখার প্রথম দিন থেকেই অনুভব করেছিলাম ওর প্রতি অনিবার্য দুর্দম আকর্ষণ। কিন্তু এও মনে হয়েছিল—সেটা নিতান্তই নারীর যৌবনের প্রতি পুরুষের যে চিরন্তন লিপ্সা, তারই তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। কামনা-বাসনার শেষ পর্যায়ে ঘিরে সুখী-সংসরের সুখ-স্বপ্ন দেখি। তা ছাড়া ওকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রতি আমার সন্দেহ-সতর্ক ভাবটা অনিবার্যভাবে ক্রমশই ফিরে হয়ে এসেছে। কখনো কখনো

আচ্ছন্ন মনকে বিবেকের কশাঘাতে সচেতন করেছি—সাবধান! মনে রেখ কারসন, তুমি সাপ নিয়ে খেলছ! কিন্তু বৃথাই। পরমুহূর্তেই ওর যৌবনের সাজানো ডালিতে নিজের সত্তাকে নিঃশেষে অর্পণ করেছি।

লোলা কিন্তু একবারের জন্যও সিন্দুকের কথা তোলেনি। টাকার কথাও যেন একেবারে ভুলে গেছে। মনে মনে আশ্বস্ত হয়েছি, বিশ্বাসও অনেকটা বেড়েছে। শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে, লোলাও আমাকে সমান ভালোবাসে।

অতীতের সব কথা ভুলে গিয়ে চিরটা জীবন কি আমরা এভাবে কাটিয়ে দিতে পারি না?

এমনি এক মিষ্টি সকাল। বিছানায় আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি। জানালা দিয়ে চোখে পড়ছে পাহাড়ের সারি, ভোরের সিঁদুর-রাঙা সূর্য—হঠাৎ লোলা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, শেট, কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে একজন লোক রাখলে কেমন হয়? আমরা বেশ মাঝেমাঝে ছুটি নিয়ে ওয়েন্টওয়ার্থে বেড়াতে যেতে পারি—'

প্রস্তাবটা নিঃসন্দেহে লোভনীয়, কিন্ত একই সঙ্গে বিপজ্জনক। আলস্যে আড়মোড়া ভেঙে ওর দিকে তাকালাম, 'তা হয় না, লোলা। ওয়েন্টওয়ার্থে আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গেলে, লোকে নানান কথা বলবে। —না, এখনও আমাদের মাস দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে। জেনসন যে আর ফিরছে না, সে-গল্পটা রটিয়ে দেওয়ার পর লোক রাখার কথা ভাবা যাবে।'

'এখানে এভাবে থাকতে আমার ভালো লাগছে না।'

'আর কিছুদিন কষ্ট কর—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

লোলা বিছানা থেকে নেমে, এগিয়ে গিয়ে সিল্কের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিল। পাশ ফিরে শুয়ে ওকে লক্ষ্য করছিলাম। চোখাচোখি হতেই ও হাসল, 'ঠিক আছে তোমার কথাই থাক আর কিছুদিন না হয় অপেক্ষাই করা যাবে।' হঠাৎ কি মনে পড়ায় আমায় বলল, 'শেট, তুমি আজ ওয়েন্টওয়ার্থে যেতে পারবে? অনেক জিনিসপত্র কেনার আছে। আমিই যেতাম, কিন্তু ফ্রুট-পাই তৈরি নিয়ে ব্যস্ত থাকব বলে যেতে পারছি না। তুমিই না হয় ঘুরে এস।—আমি পাম্পগুলোর দিকেও খেয়াল রাখব— কোন অসুবিধে হবে না।'

আরেকটু হলেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতাম আর কি! আচমকা এক সন্দেহের ঝাপটায় সচেতন হয়ে উঠলাম। আমাকে সরানোর জন্য এটা কি লোলার কোন নতুন মতলব? হয়তো আমাকে ওয়েন্টওয়ার্থে পাঠিয়ে, ট্রপিক স্প্রিংসে ফোন করে কোন সিন্দুক সারানোর লোক ডেকে আনবে—তাকে দিয়ে সিন্দুক খোলাবে। তারপর আমি ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ফিরতে ফিরতে টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে।

ওর দিকে তাকালাম। নির্বিকারভাবে ও চুল আঁচড়াচ্ছে, আনমনে গুনগুন করছে কোন গানের কলি। কিন্তু তার মানে এই নয়, ও উদ্দেশ্যহীনভাবে কথাগুলো বলেছে। কারণ রিক্সের সঙ্গে কথা বলার সময় ওর মুখে লক্ষ্য করেছি এই একই নির্বিকার ভাব।

গলার স্বরকে অত্যন্ত স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে জবাব দিলাম, 'আমার ওয়েন্টওয়ার্থে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না, লোলা। ওখানে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে—কেউ আমাকে চিনে ফেলতে পারে।—তার চেয়ে বরং তুমিই যাও, আমি এদিকটা দেখাশোনা করব। সেটাই মনে হয় নিরাপদ হবে।'

লোলার মুখের ভাবে একটা পরিবর্তন আশা করেছিলাম, কিন্তু আমার সন্দেহের সমর্থনে কোন প্রতিক্রিয়াই ওর মুখে লক্ষ্য করলাম না। ও আমার কথায় কাঁধ ঝাঁকাল, চিরুনিটা নামিয়ে রাখল, 'ঠিক আছে, তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর।' ও পায়ে পায়ে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, 'শেট, সত্যিই কি ওয়েন্টওয়ার্থে যাওয়া তোমার পক্ষে বিপজ্জনক?'

'তা জানি না, তবে আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাইছি না।'

'তাহলে না যাওয়াই ভালো। তোমার ভালোমন্দ কিছু একটা হোক, তা আমি চাইব না।'

'শুনে সুখী হলাম।'

'ঠাট্টা নয় শেট, সত্যি বলছি।' লোলা সলজ্জ হাসি হাসল, 'তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।'

আনন্দে বিছানা থেকে নেমে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, ‘সত্যি? এতদিন তোমার মুখ থেকে শুধু এই কথাটাই শুনতে চেয়েছি, লোলা।’

ও আঙুল দিয়ে আমার বুকের দাগ কাটছিল, হেসে ঘাড় নাড়ল, ‘হ্যাঁ, সত্যি। জীবনে কোন পুরুষকে নিয়ে সুখী হব, তা ভাবিনি। কিন্তু তুমি সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছ।—এ জায়গায় থাকতে আমার ভালো লাগছে না, শেট—আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। সারাটা দিন শুধু কাজ আর কাজ! কোথাও যে বেড়াতে-টেড়াতে যাব, তারও একটু উপায় নেই।’

‘আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধর, লোলা—তারপর আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। এখানে থাকতে ভালো কি আমারও লাগছে? কিন্তু এখুনি এ জায়গা ছাড়লে বিপদের সম্ভাবনা আছে যে! তা ছাড়া, জায়গাটা যে বিক্রি করে দেব, তারও তো উপায় নেই!’

লোলা আমার বাহুর বাঁধন খুলে হঠাৎ সরে দাঁড়াল, ‘যাই, ফ্রুট-পাইগুলো এখনই শুরু না করলে, পরে আবার দেরি হয়ে যাবে।’ ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

জামা কাপড় পরতে পরতে ভাবতে লাগলাম—লোলা আমাকে ভালোবাসে। ও নিজের মুখে বলেছে। আজ আমার আনন্দের দিন—লোলা আমাকে ভালোবাসে।

ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই ওকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম।

রান্নাঘরে গিয়ে কফি তৈরি করে চুমুক দিলাম। লোলা ফ্রুট-পাই নিয়ে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ ডাকল, ‘শেট—’ ও ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল, ‘এরপর কী করবে কিছু ঠিক করেছ?’

‘হ্যাঁ। এসব ঝামেলা মিটে গেলে প্রথমেই তোমাকে আমি বিয়ে করছি—‘না’ বললেও শুনছি না।’

ও হাসল, ‘না’ বলতে আমার বয়ে গেছে।—কিন্তু কার্ল যে মৃত, সেটা তো আগে প্রমাণ করতে হবে!’

‘সেটা প্রমাণ করতে গেলে বিপদ আছে।—নাঃ, যে-কোন উপায়ে আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কীভাবে, তা এখনও ভেবে পাচ্ছি না। যদি একবার এখান থেকে পালাতে পারি, তবে আর চিন্তা নেই। —আচ্ছা, ফ্লোরিডায় আমাদের একটা পেট্রল-পাম্প খুললে কেমন হয়?’

‘ভালোই হবে।—তার মানে সিন্দুকের টাকাগুলো কাজে লাগানো যাবে, কি বলো?’

এতদিন পর এই প্রথম ও টাকার কথা উচ্চারণ করল। খুব সহজভাবে কথাটা বললেও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। কিন্তু কোনরকম অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। বরং ওর দৃষ্টি নিষ্পাপ বলেই মনে হল।

‘হ্যাঁ, তাই তো করব। তা ছাড়া উপায় কি?’ ওর কথা সমর্থন করলাম।

‘খুব ভালো হবে, তাই না শেট?’ লোলার সবুজ চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল, ‘কেউ থাকবে না, শুধু তুমি আর আমি। আমি কিন্তু বেশিদিন অপেক্ষা করব না বলে রাখছি।’ আদরমাখানো স্বরে ও বলে উঠল।

‘হুঁ, প্রথমে আমাদের এ জায়গাটা বেচতে হবে—। কিন্তু কীভাবে!’ আত্মগতভাবে বললাম।

‘যেভাবে হোক!’

এমন সময় একটা ট্রাকের শব্দ পেয়ে বাইরে গেলাম। আর কাজে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে লোলার সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগই পেলাম না।

একসময় দেখি, লোলা অপরূপ সাজে সেজে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ‘আমি চললাম, দুপুরের দিকে ফিরব। ফ্রুটপাইগুলো ঠিক করে রাখতে ভুলো না যেন।’ ও গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে হাতের কাজ সেরে রেস্তোরাঁয় গেলাম।

লোলা টাকার উল্লেখ করার বেশ খুশিই হয়েছি। ওর সম্বন্ধে যেটুকু অস্বস্তি-অবিশ্বাস ছিল, তাও মন থেকে মিলিয়ে গেছে। ও যে আমার সঙ্গে অভিনয় করছে না, সেটা ভেবে ভালো লাগল। কিন্তু এই ‘পয়েন্ট অব নো রিটার্ন’-এর হাত থেকে মুক্তি পাই কেমন করে? লোকের মনে সন্দেহ না জাগিয়ে, কীভাবে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তাই ভাবতে লাগলাম।

কিন্তু যত ভাবছি, সমস্যাটা ততই যেন জটিল হয়ে উঠছে। ভাবতে ভাবতে একসময় নিষ্ঠুর সত্যের মতো উপলব্ধি করলাম, আমাদের অবস্থা মাকড়সার জালে আটকানো মাছির মতো। মুক্তির কোন পথই আমাদের সামনে খোলা নেই। নিশ্চিন্তে, নিরাপদে থাকতে গেলে, সারাটা জীবন আমাদের এখানেই কাটাতে হবে। 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন'কে ছেড়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এসব ভাবনায়, কখন একসময় উত্তেজিত হয়ে খাবার-ঘরে পায়চারি শুরু করে দিয়েছি, হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে চমক ভাঙল। জানালা দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল রিক্সের ঝরঝরে গাড়িটা। রিক্স গাড়ি থেকে নেমে গুমটিঘরের দিকে এগোল। পিছন পিছন গুটিগুটি পায়ে চলল ওর কুকুরটা।

এতদিন বাদে রিক্সকে দেখে চমকে উঠলাম। ও কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কে জানে! হঠাৎ মনে পড়ল, গুমটিঘরেই পোঁতা রয়েছে জেনসনের দেহ! মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ছুটলাম গুমটিঘরের দিকে। বুকের ভিতর যেন দামামা বাজতে শুরু করেছে। রিক্স অথবা ওর কুকুর যদি খুঁজে পায় কার্লের দেহ!

গিয়ে দেখি, রিক্স গুমটিঘরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে যন্ত্রপাতিগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে। কুকুরটাও যেন ওর পায়ে লেগে রয়েছে। আমাকে দেখেই কুকুরটা কুঁকড়ে গেল। সুড়সুড় করে রিক্সের পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়ল।

'কী চাই?' গলার স্বরকে যতটা সম্ভব রুক্ষ এবং কঠোর করলাম।

রিক্স থমকে দাঁড়াল। কুকুরটাকে এক লাথিতে সরিয়ে দিয়ে আড়চোখে তাকাল, 'কার্ল কোন খবর-টবর দিয়েছে?'

'না।'

'লোলা কোথায়?'

'তিনি ওয়েন্টওয়ার্থে গেছেন। কী চাই তোমার?'

'রিক্সের কুকুরটা হঠাৎ উৎসুক হয়ে, ঘাড় ফিরিয়ে কাজ করার টেবিলটার দিকে তাকাল। তারপর ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে চলল জেনসনের কবরের দিকে। সীমাহীন আগ্রহে ওখানকার মাটি শুঁকতে লাগল। মাঝে মাঝে পা দিয়ে আঁচড়াতে চেষ্টা করল।

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল, হৃৎপিণ্ড যেন আচমকা হোঁচট খেল!

রিক্স কুকুরটাকে লক্ষ্য না করেই বলল, 'আমার কিছু টাকার দরকার। পেনসনের টাকা এখনও পায়নি।'

'আমাকে ওসব কথা বলে কোন লাভ নেই।' আমার কিন্তু পড়ে আছে হতচ্ছাড়া কুকুরটার দিকে।

কুকুরটা তখন মাটি আঁচড়াতে শুরু করেছে। মাটি স্বাভাবিকভাবেই আলগা হওয়ায়, আঁচড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসতে লাগল। কুকুরটাও উৎসাহের সঙ্গে থাবা দিয়ে আরও পূর্ণোদ্যমে আঁচড়াতে শুরু করল।

রিক্স হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে কুকুরটাকে দেখল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল, 'আরে, ব্যাপার কী! আগে কোনদিন সীজারকে এরকম অদ্ভুত কাজ করতে তো দেখিনি।' ও এগিয়ে গিয়ে সীজারের পেটে ক্যাঁৎ করে এক লাথি কষিয়ে দিল। সীজার কেঁউ কেঁউ করতে করতে, ছিটকে গিয়ে পড়ল গুমটিঘরের দরজার কাছে।

রিক্স আবার আমার কাছে ফিরে এল, 'আমার এখনে কপর্দকহীন অবস্থা। কিছু টাকা ধার দিতে পারবে? পেনসনের টাকা পেলেই শোধ করে দেব।'

রিক্সের কথা বলার সুযোগে সীজার সন্তর্পণে আবার এগিয়ে এল। আড়চোখে রিক্সের দিকে লক্ষ্য রেখে আবার আঁচড়াতে শুরু করল।

'আচ্ছা, কুকুর তো!' একটা বড় কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে সীজারকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুড়ে মারলাম। কুকুরটা ঘ্যাঁক করে একটা চাপা চিৎকার করে দরজার দিকে পালাল।

রিক্সের চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল, 'একটা বোবা জানোয়ারকে ওভাবে মারতে তোমার লজ্জা করে না!'

'বেরোও এখান থেকে! তোমার এই হতচ্ছাড়া কুত্তাকে নিয়ে এখুনি কেটে পড়ো!' দাঁত খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠলাম।

রিক্স কিন্তু আমার কথা কানেই তোলেনি। ও তখন সীজারের খোঁড়া গর্তের দিকে চেয়ে আছে—সারা মুখে একটা হতবুদ্ধি ভাব।

'তুমি কি এখানে কিছু পুঁতেছ!'

কেমন যেন শীত-শীত করতে লাগল—সারা মুখে ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম—কোনরকমে মুখে হাত বোলালাম, 'কিচ্ছু পুঁতিনি।—যাও, যাও, এখন কেটে পড়ো!'

আমার কথা কানে তোলা তো দূরের কথা, রিক্স আস্তে আস্তে গর্তটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ওর শকুন-চোখজোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে।'

'দেখে মনে হচ্ছে, এ জায়গাটা আগে কেউ খুঁড়েছে!' রিক্স ওর নোংরা লিকলিকে আঙুলগুলো আলগা মাটিতে ডুবিয়ে দিলে। কুকুরটা যেন সমর্থন পেয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল, আবার আঁচড়াতে শুরু করল।

অধৈর্য হাতের এক ধাক্কায় রিক্স কুকুরটাকে সরিয়ে দিল, আপনমনেই বলে উঠল, 'কার্ল হয়তো ওর জমানো টাকা এখানেই লুকিয়ে রেখেছে। নাঃ, ব্যাটা সত্যিকারের বোকার চূড়ান্ত! এভাবে কেউ টাকা লুকোয়!—যাকগে, তবু একবার দেখা যাক।' রিক্স আমার দিকে ফিরল, 'বেলচা আছে?'

আমার হাত-পা যেন ভয়ে পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চাইল। রিক্সের দিকে এক পা এক করে এগিয়ে গেলাম। আমার মুখের ভাবে রিক্স ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে পিছোতে লাগল, 'আরে আরে, এতে রাগ করার কি আছে?' পিছতে পিছতে আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল রিক্স। কুকুরটাও ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিছোতে লাগল।

'হঠাৎ মনে হল, তাই বললাম। এর জন্যে কিছু মনে করো না।'

'বেরোও! আর কোনদিন এখানে আসবার চেষ্টা করলে ঠ্যাঙ ভেঙে দেব!' চেঁচিয়ে ওকে সাবধান করলাম, 'যাও—বেরোও!'

'পাঁচটা ডলার ধার দিতে পারবে?' রিক্স ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। রোদের তেজ এর মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। মরুভূমির বালি-মেশানো গরম হাওয়া চোখে মুখে এসে ঝাপটা মারছে।

'একটা পয়সাও তুমি পাবে না।' ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চললাম, 'গাড়িতে উঠে সোজা কেটে পড়।'

পিছোতে পিছোতে রিক্স ওর গাড়ির কাছে পৌঁছল। গাড়ির দরজায় হাত রেখে ও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, আড়চোখে ঘৃণাভরা চাউনি নিয়ে তাকাল আমার দিকে, 'আচ্ছা, তুমি তাহলে সোজা করার মানুষ নয়!' ওর গলায় যেন বিষ ঝরে পড়ল, 'শেষ পর্যন্ত পুলিশেই খবর দিতে হবে দেখছি। ওদের বলব কার্লের খোঁজ করতে। নয়তো, তুমি আর ওই বেশ্যাটা যেভাবে লেপটালেপটি, ঘা-ঘষাঘষি শুরু করেছ—'

অন্ধক্রোধে রিক্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার ডান হাতের ঘুষি সপাটে গিয়ে আছড়ে পড়ল ওর চোয়ালে। রিক্স ছিটকে গিয়ে পড়ল বালির উপর। আমি তখন রাগে উন্মাদ। পাম্পের কাছে যখন যে একটা ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে, দেখতেই পাইনি। রিক্সকে মারতে দেখে ড্রাইভারটা চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, কী হচ্ছে?'

সংবিৎ ফিরে পেয়ে নিজেকে সংযত করলাম। ড্রাইভারটা না এলে এই বুড়ো শকুনটাকে আজ রামঠ্যাঙানি দিতাম।

রিক্সের দুরবস্থা দেখে কুকুরটা একলাফে গাড়িতে উঠে বসল। জুলজুল করে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল।

'কী দোস্ত। বুড়ো পেয়ে খুব প্যাঁদাচ্ছ?' ড্রাইভারটা ট্রাক থেকে নেমে এল, 'একটা সমবয়েসী জোয়ানের সঙ্গে লড়তে, তো বুঝতাম!'

ইচ্ছে হল, দিই ব্যাটার নাকে একখানা বসিয়ে! কিন্তু তাতে ব্যবসার ক্ষতি হবে ভেবে নিজেকে সামলে নিলাম। দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াতেই, রিক্স ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে কোনরকমে উঠে দাঁড়ালাম। টলতে টলতে গাড়িতে গিয়ে উঠল। বাঁ হাতে আহত চোয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে গাড়িতে স্টার্ট দিল। আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করতে লাগল।

পকেটের মানি-ব্যাগ থেকে একটা দশ ডলার নোট বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম, 'ঠিক আছে। নাও, ধর—এদিকে আর এসো না।'

রিক্স কাঁপা হাতে ওটা নিল। তারপর ওটাকে হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে ছুড়ে মারল আমার মুখের উপর। ঘৃণাভরে থুতু ছেটাল মাটিতে, 'আজকের কথা আমি ভুলব না।' রাগে, ঘৃণায় ওর মুখ বীভৎস হয়ে উঠল, 'আমি সোজা পুলিশে যাচ্ছি। ওরাই তোমার খবর নেবে।'

অ্যাকসিলারেটরে জোরে চাপ দিয়ে ক্লাচ ছাড়তেই গাড়িটা এক ঝটকায় ছুটে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় আরও একবার আগুনঝরা চোখে ও আমাকে দেখল।

সেই মুহূর্তে বুঝলাম, একটা ভীষণ ভুল করে ফেলেছি। রিক্সকে মারা আমার উচিত হয়নি। ভেবেছিলাম দশ ডলার দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ওর মতো মেরুদণ্ডহীন লোক যে ওভাবে টাকাটা মুখের উপর ছুড়ে মারবে, ভাবতেই পারিনি।

নিচু হয়ে নোটটা তুলে, আবার ব্যাগে ভরলাম। রিক্স-আতঙ্ক মনের মধ্যে আরও চেপে বসল।

দাঁড়িয়ে-থাকা ট্রাকটায় তেল দিলাম। ড্রাইভারটা দাম দেবার সময় অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না।

ট্রাকটা চলে যাওয়ার পর গুমটিঘরে গিয়ে টেবিলটা সরালাম। মাটি দিয়ে গর্তটা ভরাট করে, একগাদা পুরনো লোহালক্কড় এনে এর উপরে জমা করলাম। কারণ কুকুরটা আবার এসে জায়গাটা আঁচড়াক, তা আমি চাই না। আধঘণ্টা বাদে কাজ শেষ করে খাবারঘরে গেলাম।

রিক্স যে এবার পুলিশেই যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে কি পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করার আগেই কেটে পড়ব? কিন্তু কীভাবে?

ভেবে ভেবে কোন পথ পেলাম না। হঠাৎ জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি, একটা জরাজীর্ণ লিংকন গাড়ি পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজের সমস্যায় এত ব্যস্ত ছিলাম, কখন যে ওটা এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালও করিনি। খাবারঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে থাকা লোকটিকে যেন চেনা-চেনা ঠেকল। সে গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তার পরনে একটা পুরনো ময়লা স্যুট। মাথায় জীর্ণ টুপি। লোকটি মুখের উপর টুপির ছায়া পড়ায়, তাকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু সে আরও কয়েক পা এগিয়ে আসতেই, তাকে চিনতে পারলাম। মুহূর্তে স্তব্ধ হল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন —কিন্তু পরক্ষণেই ছুটে চলল পাগলা ঘোড়ার মতো উদ্দাম গতিতে—ধকধকধক—

আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আমার বন্ধু রয় ট্রেসি!

দশ

আমি আর রয়—দুজনে পরস্পরকে দেখামাত্রই চিনতে পারলাম। নিমেষে ও থমকে দাঁড়াল। এই হঠাৎ দেখার বিস্ময়কে ওর চোখে যেন মেনে নিতে পারছে না। ওর মুখ রক্তহীন, বিবর্ণ।

কতক্ষণ যে ওইভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, একসময় রয়ই প্রথমে সংবিৎ ফিরে পেল। ওর মুখের বিবর্ণ ভাবটা কেটে গিয়ে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য—ঠোঁটের কোনায় ফিরে এল সেই অতি-পরিচিত হাসি। ও দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে জাপটে ধরল।

আমাদের তখন আর কথা বলার শক্তি নেই। এক প্রচণ্ড আনন্দ-উল্লাসের অনুভূতি যেন আমাদের কণ্ঠরোধ করল।

একসময় আমাকে ছেড়ে দিয়ে রয় সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'শেট! তুই—তুই এখানে! আমি কি ভুল দেখছি?'

ঠিক সেই মুহূর্তেই উপলব্ধি করলাম, রয়কে আমি কতটা ভালোবাসি। এতদিন ওর অনুপস্থিতিতে আমার বুকটা যেন খালি ছিল। এই অবাধ্য মনটাকে কত কষ্ট করেই না রয়ের কথা ভুলিয়ে রেখেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, রয় আমার জীবনের কতখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। ওকে কাছে পেয়ে সাময়িকভাবে লোলার কথাও ভুলে গেলাম। ওর কাঁধে এক চাপড় মেরে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। কপট তিরস্কারের সুরে বললাম, 'শালা, সিন্দুকের বাচ্চা! কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন?'

আমার হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে ও আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। শেষে অস্ফুটে বলল, 'কিন্তু শেট, তুই এখানে কি করছিস? আমি তো ভেবেছিলাম তুই কোন শহরে কেটে পড়েছিস!'

'পুলিশও তাই ভাবছে।' কথা বলতে বলতে আনন্দে আমার চোখ সজল হয়ে উঠল। ওকে হাত ধরে রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে চললাম, 'আগে চল, একটু গলা ভেজানো যাক।—কিন্তু তুই এখানে কোত্থেকে এলি?'

'লিটল ক্রীক—শালা একেবারে জঘন্য জায়গা! সে যাকগে—বললি না তো, তুই এখানে কি করছিস?

খাবারঘরে ঢুকে কাউন্টারের কাছে দুটো টুল নিয়ে আমরা বসলাম। রয় ঘরটার চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল।

দুটো গেলাসে হুইস্কি আর সোডা মিশিয়ে রয়ের দিকে একটা এগিয়ে দিলাম। অন্যটায় নিজে চুমুক দিয়ে বললাম, 'তুই জানতে চাইছিস এখানে আমি কী করছি?'

মাঝপথে কথা থামিয়ে একটু ভাবলাম—রয়কে সব বলাটা কি ঠিক হবে? উহুঁ, আপাতত কিছু না জানানোই ভালো। অতএব সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে একটা জবাব দিলাম, 'আমি এখানে চাকরি করছি। তা ছাড়া, গা ঢাকা দেবার পক্ষে জায়গাটা বেশ নিরাপদ।'

'নিরাপদ যে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তুই মেক্সিকো বা ক্যানাডায় গেলে, সেটা কি আরও ভালো হত না?'

'ভাই বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। টাকা কোথায়, যে যাব? এখানে যে টিঁকে আছি তাই আমার সাতপুরুষের ভাগ্যি!'

'এ জায়গাটা তাহলে সত্যিই নিরাপদ বলছিস?'

'হ্যাঁ। কারণ, যে-ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছি, তাতে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হতে পারে না।'

রয় আমার কাঁধে আলতো করে হাত রাখল, 'ফানওয়ার্থ থেকে তোর পালানোর কথা আমি কাগজে পড়েছি। তোর সাহস আছে বলতে হবে! এ ক-মাস সবসময় খালি তোর কথাই ভেবেছি। কোনদিন ভাবতেই পারিনি, তোর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে!'

ওর দিকে চেয়ে হাসলাম, 'সেটা আমিও ভাবিনি।'

রয় হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে আমার হাত চেপে ধরল, 'শেট, তোকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। তুই আমার জন্যে যা করেছিস, তার কোন তুলনা হয় না। তুই যদি ওভাবে—'

'ওসব কথা বাদ দে। ওরকম হলে তুইও আমার জন্যে তাই করতিস।'

রয় হাঁফ ছাড়ল, 'ওফ! তোকে যখন ওরা ধরল, আমি তো ভাবলাম তুই বোধ হয় আমার কথা বলেই দিবি। কিন্তু—না, শেট, তুই-ই আমার বন্ধুর মতো বন্ধু।'

'সে তোর আর দোষ কি! নিজের বোকামির জন্যেই তো আমি ধরা পড়লাম। তোর কথা শুনলে কি আর এ অবস্থা হত? তা ছাড়া দেখলাম, আমি যেখানে একাই ধরা পড়েছি, সেখানে তোকে টেনে এনে আর লাভ কী! আসল কথা, তখন ভয়ে আমার মাথার ঠিক ছিল না।'

রয় এক চুমুক পুরো হুইস্কিটা গলায় ঢেলে দিল, ‘শালা—ভয় কি আমিই কম পেয়েছিলাম? ওঃ কোনরকমে পালিয়ে বেঁচেছি!—সত্যি, কেন যে ওই হতচ্ছাড়া মতলবটা মাথায় এসেছিল। দিনের দিন খালি আফসোস করেছি—কেন কুপারের ফ্ল্যাটে গেলাম! সে যাকগে—এখন কি করছিস বল্? আর এখানেই বা কেমন করে এলি?’

রয় ওর খালি গেলাসটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। গেলাসটা ভর্তি করে ওর হাতে তুলে দিলাম। ও দু-চার ঢোঁকে হুইস্কিটা শেষ করে হাত দিয়ে মুখ মুছল, ‘এখন আমাকে সেলসম্যান হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, শেট। অর্থাৎ লরেন্স কোম্পানি এখন কোনরকমে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে! ফ্রাঙ্কলিন থেকে আরম্ভ করে সব বড়কর্তারাই সন্দেহ করছে—কুপারের ব্যাপারটায় তোর সঙ্গে আমিও জড়িয়ে ছিলাম। আর তার ওপর এক শালা আবার বলে বসেছে, পাঁচশো ডলারের দেনায় আমি নাকি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। ব্যস, ফ্রাঙ্কলিন আমায় ডেকে বলল, আমার আর সিন্দুক-টিন্দুক সারানোর দরকার নেই। তার চেয়ে, যেসব খদ্দেরের পুরনো লরেন্স সিন্দুক আছে, তাদের ধরে ধরে নতুন সিন্দুক গছানোর কাজটা আমি নাকি ভালোই পারব। এবং তাতে নাকি আমার অভিজ্ঞতাও বাড়বে। তারপরেই আমার হাতে খদ্দেরদের নামের ইয়া বড় একটা লিস্ট ধরিয়ে দিল, আর দিল কিছু লম্বা-চওড়া উপদেশ। শা—লা!—অ্যাদ্দিন ধরে ঘুরে ঘুরে জুতোয় শুকতলা খইয়ে ফেললাম, তবু কোন ব্যাটা একটা নতুন সিন্দুক নিল না। আশ্চর্য মাইরি!’

রয় পকেট থেকে একটা লম্বা কাগজের টুকরো বের করল, ‘এই তো—“পয়েন্ট অব নো রিটার্ন”—মালিক—কার্ল জেনসন। তাই তো?’

‘হ্যাঁ।’

‘এখন আমার কাজ হল মি. জেনসনকে পটিয়ে-পাটিয়ে একটা নতুন সিন্দুক গছানো—আচ্ছা, এই জেনসন লোকটাকে, তোর মনিব নাকি?’

বাইরে থেকে একটা ক্যাডিলাকের হর্ন কানে আসায় উঠে পড়লাম, ‘তুই একটু বোস, আমি এখুনি আসছি।’

রয়ের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য রেহাই পেয়ে মনে মনে খুশিই হলাম। ওকে কতটা কি বলব না-বলব, সেটা ভাববার কিছুটা সময় পাওয়া যাবে।

ক্যাডিলাক গাড়িটায় তেল ভরতে ভরতে চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলাম, রয়কে সবকিছু খোলাখুলি বলাটা ঠিক হবে না—বিশেষ করে জেনসনের খুনের কথা। সেটা লোলার ব্যাপার, লোলাই বুঝবে। তার চেয়ে বরং সবাইকে যে গল্পটা বলেছি, ওকে তাই বলব। সেটাই নিরাপদ হবে।

কাজ শেষ করে আবার রেস্তোরাঁয় ফিরে গেলাম।

রয় সিগারেট ধরিয়ে খাবারঘরে পায়চারি করছিল, আমাকে ঢুকতে দেখেই থমকে দাঁড়াল, ‘তোকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে, শেট। এরকম একটা চমৎকার জায়গায় তুই চাকরি পেলি কেমন করে? নাঃ, তুই ভাগ্যবান বলতে হবে!’

‘যতটা চমৎকার ভাবছিস, ততটা না হলেও, জায়গাটা খারাপ নয়।—হ্যাঁ, ভালো কথা, তুই জেনসনের কথা জানতে চাইছিলি? সে এখানে নেই—ব্যবসার কাজে অ্যারিজোনা গেছে। কবে ফিরবে কিছু বলে যায়নি।’

‘যাঃ শালা!’ হতাশায় ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রয়, ‘তাহলে অ্যাদ্দুর এসে কোন লাভই হল না? তা তুই একবার মিসেস জেনসনেকে বলে দেখ না, তিনি হয়ত নতুন সিন্দুকের অর্ডার দিতে পারেন!’

‘উহুঁ—কোন আশাই নেই। এখানে মি. জেনসনের কথা ছাড়া কেউ এক পা চলে না। তোর কপাল ফুটো—কী আর করবি!’

রয় হাত বাড়িয়ে কাউন্টারের উপর রাখা ছাইদানে সিগারেটের টুকরোটা গুঁজে দিল, 'তাহলে তোকে একটা কথা বলা দরকার, শেট। একটু আগেই তোকে বলেছি গত দুমাসে একটা সিন্দুকও আমি বেচতে পারিনি। এতএব, যখনই আমি কোম্পানিতে ফিরে যাব, সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাকে রাস্তা দেখাবে। কারণ, শুধু মুখ দেখবার জন্যে ওরা আমাকে রাখেনি। অর্থাৎ চাকরি খতম!' রয় বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল।

'এতে তোর ভাবনার কী আছে? অন্য-কোন সিন্দুক কোম্পানি তোর মতো কারিগর পেলে একেবারে লুফে নেবে। তুই "হেওয়ার্ডসে" চলে যা না। ওদের কোম্পানির সিন্দুক লরেন্স কোম্পানির থেকে অনেক বেশি বিক্রি হয়।

রয় মাথা নাড়ল, 'উহুঁ, হেডয়ার্ডস কেন, কোন সিন্দুক কোম্পানিই আমাকে কলকে দেবে না। ওরা জানতে চাইবে, কেন আমি চাকরি ছাড়লাম। তখন শালা ফ্রাঙ্কলিন ওদের স-ব বলে দেবে। বলবে, আমি ঠিক বিশ্বস্ত কর্মচারী নই—ব্যস, হয়ে গেল! চাকরি না পাওয়ার পক্ষে এই কথা ক-টাই যথেষ্ট!'

একটু অবাক হয়ে রয়ের দিকে তাকালাম, 'তার মানে? ফ্রাঙ্কলিন তো আর প্রমাণ করতে পারছে না কুপারের ব্যাপারটায় তুই জড়িয়ে ছিলি!'

'প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই। ফ্রাঙ্কলিনের কথাকেই ওরা বেদবাক্য বলে মনে করবে। আর সঙ্গে সঙ্গে হেডয়ার্ডস থেকে অর্ধচন্দ্র।'

'তাহলে কি করবি ভাবছিস?'

রয় ঠোঁট উলটে কাঁধ নাচাল, 'কি জানি, কিছু তো বুঝে উঠতে পারছি না। সিন্দুকের কাজ ছাড়া আর-কোন কাজই আমি জানি না। তা ছাড়া, বয়েসও তো পঁয়ত্রিশ হল এই বয়েসে নতুন চাকরিই বা কে দেবে?' কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘড়ি দেখল রয়, 'আরে, একটা বাজে! অ্যাই, কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা কর মাইরি—ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

আজ কি কি রান্না করেছি, ওকে জানালাম। এই সময় দুজন ট্রাক ড্রাইভার এসে খাবারের অর্ডার দিল। রান্নাঘরের গিয়ে তাদের খাবার তৈরি করছি, রয়ের গলা কানে, 'শেট, ফ্রায়েড চিকেন থাকলে আমাকে তাই দে।'

'ঠিক আছে, বোস—একটু পরেই নিয়ে আসছি। আগে খেয়ে তারপর বলিস, কি জানিস! আমি বাজি ফেলতে পারি, আগে কখনও এরকম রান্না তুই খাসনি।'

'সবই বুঝলাম বাবা—কিন্তু আর দেরি করিস না তাহলে ক্ষিদের চোটে টেবিল চেয়ার কামড়াতে শুরু করব!' নিজের রসিকতায় ও নিজেই হেসে উঠল, 'শালা, সেই কখন থেকে না খেয়ে আছি।'

কাজ করতে করতে মাঝে মাঝেই জানলা দিয়ে বাইরে দেখছি—লোলা এল কিনা। এতক্ষণে তো ওর ফিরে আসার কথা। কেন এত দেরি হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

যখন রয়ের জন্য প্লেটে ফ্রয়েড চিকেন সাজিয়ে নিয়ে আসছি, দেখলাম দূরের বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে লোলার মার্কারি।

খাবারের প্লেটটা এনে রয়ের সামনে রাখলাম, 'মিসেস জেনসন আসছেন।' তারপর গলার স্বরকে অপেক্ষাকৃত নিচু করলাম, 'এখানে আমার নাম শেট কারসন নয়—শেট প্যাটমোর। ভুলিস না যেন!'

রয় ছোটবেলা থেকেই আমাকে শেট নামে ডেকে অভ্যস্ত। তাই জ্যাক প্যাটমোর বললেও, ও হয়তো ভুল করে শেট নামেই আমাকে ডেকে বসবে। তার তা শুনে লোলা যদি অবাক না হয়, তাহলে ও ভাববে, লোলা আমার আসল পরিচয় জেনেও আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছে। এবং এতে রয় নির্ঘাত সন্দেহ করে বসবে। হয়তো বুঝতে পারবে জেনসনের উধাও হওয়ার পিছনে আমাদের হাত আছে। এইসব ভেবেই এই নামটা বললাম।

রয় ঘাড় নেড়ে চোখ টিপল, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, মি. শেট প্যাটমোর। আমার কোন ভুল হবে না।'

রেস্তোরাঁর পিছন দিকে এসে লোলা গাড়ি থামাল। একটু পরেই, রান্নাঘরের পিছন দিকে যে খিড়কি দরজা আছে, সেটা খোলার শব্দ পেলাম। রয়কে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে গেলাম রান্নাঘরে।

'আমার ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল, এদিকে সবকিছু ঠিক আছে তো?' রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল লোলা। রোদে একটানা গাড়ি চালানোর ফলে ওর মুখ হয়ে উঠেছে রক্তাভ।

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে—কোন অসুবিধে হয়নি।' ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর গালে ছোট্ট করে চুমু খেলাম, 'তবে একটা ব্যাপার হয়েছে, লোলা। আমার এক ছোটবেলাকার বন্ধু আজ হঠাৎ এখানে এসে হাজির হয়েছে। কার্লের সঙ্গে ওর কিছু ব্যবসার কথাবার্তা ছিল। ওকে বলেছি, কার্ল অ্যারিজোনা থেকে মাস দুয়েকের আগে ফিরছে না।'

লোলা যেন চমকে উঠল, 'তোমার বন্ধু? কিন্তু ও যদি পুলিশে তোমার কথা—'

'না, না। সে-সবের কোন ভয় নেই। বলছি না, আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।'

একসময় খাবার ঘর থেকে, কাউন্টারের উপর অধৈর্যভাবে টোকা মারার শব্দ কানে এল।

'দাঁড়াও—দেখে আসি, কে ডাকছে। পরে বরং গাড়ি থেকে সব মালপত্র নামানো যাবে।' লোলার লোভনীয় সঙ্গ ত্যাগ করে খাবার ঘরে ফিরে এলাম।

দেখি, কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একজন মোটাসোটা বয়স্ক লোক। পরনে ফিকে বাদামী রঙের স্যুট। টুপিহীন মাথায় চুলের স্বল্পতা চোখে পড়ছে। সারা মুখে একটা পরিশ্রান্ত ভাব।

'জনা বিশেক লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা হবে?' আমাকে ঢুকতে দেখে লোকটি প্রশ্ণ করল।

'নিশ্চয়ই হবে তাঁদের ভেতরে নিয়ে আসুন।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ল পাম্পের কাছে দাঁড়ানো একটা যাত্রীবাহী বাস। মোটা লোকটির নির্দেশে বাস থেকে যাত্রীরা একে একে নেমে আসতে লাগল।

চট করে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মারলাম। লোলাকে আসন্ন ভিড়ের কথা জানিয়ে, তাড়াতাড়ি হাত চালাতে নির্দেশ দিলাম। ও হেসে ঘাড় নাড়ল।

কাউন্টারের কাছে ফিরে আসতে-না-আসতেই খাবার ঘর খদ্দেরে ভরে গেল। শুরু হল কাজ আর কাজ। একে দম নেবার সময় পাওয়া যাচ্ছে না, তার উপর কয়েক ট্রাক তেল নেবার জন্য অনবরত হর্ন দিতে লাগল।

রয়ের তখন খাওয়া-দাওয়া শেষ। ও বসে বসে দেখছিল, আমি খদ্দেরদের চাপে পড়ে কিরকম হিমসিম খাচ্ছি। হঠাৎই টুল ছেড়ে ও আমার কাছে এগিয়ে এল, 'আমি সাহায্য করলে তোর আপত্তি আছে? বল্ তো বাইরে গিয়ে ট্রাকগুলোকে পেট্রল দিই।'

'তাহলে তো আমার অনেক সুবিধে হয়।' খুচরো পয়সা-ভরা থলেটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম, 'পাম্পের মিটারেই দাম লেখা আছে দেখতে পাবি—কোন অসুবিধে হবে না।'

থলেটা নিয়ে রয় পাম্পের দিকে চলে গেল।

দেড়টি ঘণ্টা টানা ব্যস্ত থাকার পর কাজের চাপ হালকা হল। যাত্রীদের নিয়ে বাস চলে গেল। এতক্ষণ কাজের ভিড়ে রয়ের কথা আমার মনেই ছিল না। এখন হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পাম্পের কাছে এখনও তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। রয় একমনে তাদের উইন্ডস্ক্রীন পরিষ্কার করছে।

রান্নাঘর ছেড়ে লোলা যে কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ্যই করিনি। ও রয়কে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। একসময় আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'শেট, এ লোকটা কে? তোমার সেই বন্ধু নাকি?'

'হ্যাঁ, আমার বন্ধু রয় ট্রেসি।' জানালা দিয়ে আমি তখনও রয়কে দেখছি, 'কাজের চাপ দেখে নিজে থেকেই সাহায্য করতে চাইল, তাই—বেশ ভালোই কাজ করছে কী বলো?' বন্ধু-গর্বে গর্বিত হয়ে লোলার দিকে

চেয়ে হাসলাম।

'হুঁ—' লোলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল, যার শুনে চোখ ফেরাতে গিয়েও থমকে গেলাম। খুঁটিয়ে লোলাকে দেখতে লাগলাম। ও কিন্তু তখনও একইভাবে জানালা দিয়ে চেয়ে আছে—রয়কে দেখছে।

হঠাৎ ওর সবুজ চোখ কোন-এক কুটিল চিন্তায় কুঁচকে উঠল, 'তোমার বন্ধু কি এখানে কাজ করবে বলেছে, শেট? তাহলে ওকে রাখলে কেমন হয়? তুমিই তো বলছিলে, আমাদের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী দরকার।'

ওকে জড়িয়ে ধরে আস্তে চাপ দিলাম, 'আমিও তোমাকে ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, লোলা। রয় আমার ভাইয়ের মতো, আর খুবই বিশ্বাসী। ওকে তো আগেই বলেছি জেনসন এখানে নেই। এখন জানিয়ে দিলেই হবে, কার্ল অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে ভোগে পড়েছে। ও কোন সন্দেহই করবে না।—কিন্তু রয় কি এই নির্জন জায়গায় থাকতে চাইবে?'

'সেটা ওকে বলেই দেখ!' লোলা রয়ের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দিল।

লোলার কাঁধে হাত রেখে হাসলাম, 'তবে একটা কথা বলতে পারি, লোলা—তোমার দিকে রয় কখনোই হাত বাড়াবে না। উনিশ বছর বয়সে ওর বউ পালানোর পর থেকে, ও কোন মেয়েকেই সহ্য করতে পারে না।'

'এই, রয় আসছে। এলে ওকে জিগ্যেস করো থাকবে কিনা।' রয়কে আসতে দেখে চাপা স্বরে লোলা বলল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রয় খাবার ঘরে এসে ঢুকল। লোলাকে দেখেই ও থমকে দাঁড়াল—অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। অন্য কেউ লোলার দিকে এভাবে চেয়ে থাকলে হয়ত অস্বস্তি বোধ করতাম। কিন্তু রয়কে আমি চিনি—তাই হেসে ওর সঙ্গে লোলার পরিচয় করিয়ে দিলাম, 'রয়, ইনিই মিসেস জেনসন। লোলা, এ আমার বন্ধু—রয় ট্রেসি।'

'যে কাজের চাপ পড়েছিল! তুমি সাহায্য না করলে হয়তো ভীষণ অসুবিধেয় পড়তাম।' লোলা রয়ের দিকে চেয়ে হাসল, 'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

'ও কিছু নয়।' রয় হেসে লোলার হাসি ফিরিয়ে দিল, 'সত্যি, মিসেস জেনসন, এই জায়গাটা ভারি চমৎকার!'

'জায়গাটা সত্যিই আপনার ভালো লেগেছে?'

'নিশ্চয়ই! না হলে আর বলছি?'

'তাহলে এখানে থেকেই যা না।' সুযোগ বুঝে রয়কে বললাম, 'রাস্তার ওপারে একটা ঘর আছে, ওখানে থাকতে পারিস। আর সপ্তাহে চল্লিশ ডলার করে মাইনে পাবি। কি রে, রাজি?'

রয় আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে লোলার দিকে তাকাল। মূর্খের ধূর্ত হাসিটাকে আরও ধূর্ত করল, 'আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে আর আপত্তি করি কেন, মিসেস জেনসন?'

'রাজি না হওয়ার কি আছে?' এই তো সেদিন শেটকে বলছিলাম, আমাদের একজন লোকের দরকার।'

'তাহলে থাকব।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে রয় হাসল।

এমন সময় একটা ফোর্ড স্টেশন-ওয়াগন একরাশ ধুলো উড়িয়ে পাম্পের কাছে এসে থামল। সেটাকে একনজর দেখে নিয়ে রয় আমার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল, 'কী স্যর, বলেন তো এই গাড়িটাকে দিয়েই আমার চাকরি শুরু করি?'

ওর কপট ঠাট্টার সুরে হাসলাম, 'এত তাড়াতাড়ির কিছু নেই। লোলার সঙ্গে আলাপ-সাপাল কর, জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখ্, তারপর কাজ শুরু করবি।—এ গাড়িটা আমিই দেখছি।'

খাবার ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে লোলাকে বললাম, 'ভালো করে ওর যত্ন-আত্তি করো—সেই সুকল থেকে ও আমার বন্ধু শুধু বন্ধু কেন, একেবারে ভাইয়ের মতো।'

রয় হেসে আমার পাঁজরে এক খোঁচা মারল, 'ঠিক বলেছিস।' ও ফিরে তাকাল লোলার দিকে—ওর চোখে চোখ রাখল, 'একেবারে ভাইয়ের মতো!'

রাত দশটায় গাড়ি-ট্রাকের ভিড় কমলে আমরা খেতে বসলাম। ডিনার টেবিলের একদিকে আমি আর লোলা। আমাদের মুখোমুখি, টেবিলের অপরদিকে বসেছে রয়। রয়ের উপস্থিতি আমার কাছে কিছুটা অস্বস্তির কারণ হলেও লোলাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হল। নতুন চাকরির আনন্দে রয় উদ্বেলিত খেতে খেতে অনর্গল বকবক করছে।

'জায়গাটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে শেট! কে ভেবেছিল বল্, এভাবে হুট করে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা লোভনীয় চাকরি পেয়ে যাব। ঘুরে ঘুরে সিন্দুক বেচার চেয়ে এখানে চাকরি করা অনেক ভালো।'

লোলা খেতে-খেতে থমকে রয়ের দিকে তাকাল, 'তুমি বুঝি সিন্দুক কোম্পানিতে কাজ করতে?'

'আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না, মিসেস জেনসন,' রয় দাঁত বের করে হাসল, 'সিন্দুকের লাইনে আমার আর শেটের চেয়ে ভালো কারিগর বেশি নেই।'

কথা শেষ করে আমার দিকে ফিরল সমর্থনের আশায়, 'কি রে, মিথ্যে বলছি?'

'না, মানে—মোটামুটি আর কি! এই সিন্দুক-লাইনে আমাদের চেয়েও বাজে কারিগর অনেক দেখেছি।'

'জানেন মিসেস জেনসন, আমি আর শেট একই দিনে, একই কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলাম। অবশ্য ও আমার চেয়ে অনেক ভালো কারিগর, তবে সিন্দুকের তালার ব্যাপারে ওর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি। কিন্তু ওকে নিয়ে মুশকিল হল, ও বড্ড বেশি সাধুপুরুষ। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত ও শুধু আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেই গেছে। সবসময়ে আমিই ওকে ঝামেলায় জড়িয়েছি, আর শেষ পর্যন্ত ও-ই আমাকে বাঁচিয়েছে।'

'এখানে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয় নেই, রয়।' শীতল স্বরে ওকে বললাম, 'দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আমার তাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই,' রয়ের মুখের ভাব হঠাৎই গম্ভীর মনে হল, 'কিন্তু মি. জেনসন ফিরে এসে আমাকে দেখলে কি বলবেন?' ও লোলার দিকে তাকাল, 'মিসেস জেনসন, চাকরিটা স্থায়ী হলেই ভালো হয়।'

'কার্ল ফিরবে বলে আমার মনে হয় না।' লোলার বিষণ্ণ ঘরের পরিবেশ মুহূর্তে ভারী হয়ে উঠল, 'আর যদিও বা ফিরে আসে, তোমাকে দেখলে খুশিই হবে।'

রয় চমকে মুখ তুলে তাকাল লোলার দিকে, 'মি. জেনসন ফিরবেন না? কি বলছেন আপনি!' ও একপলক আমাকে দেখল, তারপর আমার চোখ ফেরাল লোলার দিকে, 'কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি, মিসেস জেনসন?'

'হ্যাঁ, সাধারণত যা হয়, তাই।' কথার পিঠে কথা বলার ভঙ্গিতে লোলা জবাব দিল, 'আমি কাউকে এখনও বলিনি। চিঠিতে কার্ল পরিষ্কার করে না লিখলেও, আমার মনে হয়, ও আর ফিরবে না। অ্যারিজোনায় গিয়ে কার্ল এমন আর-একটা মেয়ের সন্ধান পেয়েছে, যাকে ওর আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালো লেগেছে।' কথা শেষ করে লোলা মাথা নিচু করল, কাঁটা-চামচটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

রয় হঠাৎ যেন অস্বস্তিবোধ করল, 'আমি দুঃখিত, মিসেস জেনসন—'

লোলা মুখ তুলে হাসল, 'এতে দুঃখিত হওয়ার কী আছে—' ও হাত রাখল আমার হাতে, 'এখন আমি আর শেট—' লোলা মাঝপথেই থামল, আমার হাতে আস্তে চাপ দিল, 'কার্ল যে শেটকে এখানে রেখে

গেছে, তাতেই আমি খুশি। আর-কিছু আমার চাই না।'

রয় আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে মাথা নাড়ল, 'শেট, তোর ভাগ্য সত্যিই অসাধারণ!'

'তাই তো দেখছি।' ঠাট্টার সুরে জবাব দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'চল্, তোকে তোর ঘর দেখিয়ে দিই।'

রয় খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল, 'এত চমৎকার রান্নার জন্যে ধন্যবাদ, মিসেস জেনসন।'

লোলা রয়ের দিকে চেয়ে হাসল, 'আমাকে লোলা বলেই ডাকবে। এখানে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে নাম ধরেই ডাকি তার ওপর তুমি আবার শেটের বন্ধু।'

'তাই সই। বল তো প্লেট ধোবার ব্যাপারে সাহায্য করি—হুঁ?'

'নাঃ, তার কোন দরকার নেই। ও আমি একাই পারব। তুমি বরং শেটের সঙ্গেই যাও।'

চাঁদের আলোয় ভেজা বালির রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম।

'খুকিখানা পেয়েছিস জববর! তোর জন্যে আমার সত্যিই আনন্দ হচ্ছে, শেট। এখনও ভেবে দেখ, আমি থাকাতে তোর কোন অসুবিধে হবে না তো।'

'একটুও না, তাছাড়া, সারাটা দিন ধরে একটা মেয়ের সঙ্গে কাটাতে ভালো লাগে? গল্প ইয়ার্কি করবার জন্যে কারও সঙ্গ চাই তো।'

রাস্তার ওপারে পৌঁছে ঘরের দরজা খুলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

'এ যে সাংঘাতিক কাণ্ড দেখছি! শালা, টেলিভিসন পর্যন্ত রয়েছে!' রয় ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেল। তারপর ঘরের জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা জেনসনের বাংলোর দিকে তাকাল, 'তুই কি এখন ওখানে থাকিস?'

'হ্যাঁ। তা ছাড়া কোথায় থাকব?' হেসে জবাব দিলাম।

'হুঁ, মেয়েদের ব্যাপারে তুই মাইরি গুরুদেব! আমার বাবা ওসব আসে না—' রয় ওর মালপত্রের ব্যাগটা একটা চেয়ারে নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল, 'এই জেনসন লোকটা দেখছি নিতান্তই বোকার চূড়ান্ত। নয়তো এরকম একটা জায়গা ছেড়ে চলে যায়! আর তাও কিনা সামান্য একটা মেয়ের জন্যে! নাঃ, আমার মাথায় শালা কিছুই ঢুকছে না। ওই মেয়েটার কাছে জেনসন এমন কি পেল বল্ তো, যা লোলার নেই?'

'আমার মনে হয়, কার্ল কোন মোটাসোটা সমবয়সী বুড়ির প্রেমে পড়েছে। লোলা ওর চেয়ে বিশ বছরের ছোট হওয়ায় ওদের একদম বনিবনা হত না।'

রয় সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল। তারপর ফুরফুর করে একটানা ধোঁয়া ছাড়ল, 'তাহলে তো একটা সহজ উপায়ই ছিল। লোলাকে ভাগিয়ে দিয়ে জেনসন নিজেই এখানে থাকতে পারত! আমি হলে অন্তত তাই করতাম।'

রয়কে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি। ও আর যাই হোক, বোকা নয়। ব্যাপার-স্যাপার দেখে ওর সন্দেহ হয়েছে, তা বুঝতে পেরে সতর্ক হলাম। যেভাবে হোক ওকে বিশ্বাস করাতেই হবে। না হলে ও হয়ত আসল ব্যাপারটাই ধরে ফেলবে—জেনসন আর বেঁচে নেই!

'ভাগিয়ে দেব বললেই হল? অত সোজা নয় রে, রয়! আর লোলাই বা নিজের পাওনা ছাড়বে কেন?'

ওর সন্দেহাতুর চোখ আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, 'জেনসন গেছে কদ্দিন হল?'

'মাসখানেক হবে।'

'এর মধ্যে লোলা ওর কাছ থেকে কোন চিঠিপত্তর পেয়েছে?'

'উহুঁ।'

'তাহলে জেনসন যে ওখানে গিয়ে অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছে, সে-সম্বন্ধে লোল নিশ্চিত হল কেমন করে?'

‘ও কার্লকে অনেকদিন ধরে জানে—সে যে ওখানে গিয়ে অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে, সে-বিষয়ে লোলা নিঃসন্দেহ।’

রয় মাথা নাড়ল, ‘কিন্তু জেনসন যদি হঠাৎ ফিরে আসে? তোকে আর লোলাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে?’

‘জেনসন আর ফিরবে না, রয়।’ আমার গলায় সিদ্ধান্তের সুর।

রয় চমকে মুখ তুলে আমাকে দেখল। তারপর আবার চোখ ফেরাল অন্যদিকে, ‘তুই যে ঝামেলায় জড়িয়ে আছিস, সে-কথা লোলাকে বলেছিস?’

উত্তর দিতে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম। কি উত্তর দেব এ প্রশ্নের? লোলা আমার সম্বন্ধে সবই জানে, তা কি বলব? কিছুক্ষণ চিন্তার পর ঠিক করলাম, রয়কে একথা জানানোর কোন বিপদ নেই। হাজার হলেও ও আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। তাই সম্মতি জানিয়ে জবাব দিলাম, ‘হ্যাঁ, বলেছি।’

আমার উত্তরে রয় একটুও অবাক হল না। হয়তো এই উত্তরই ও আশা করেছিল।

রয় একমনে ওর ব্যাগ খালি করে জিনিসপত্রগুলো বিছানার উপর ছড়িয়ে রাখতে লাগল, ‘এ জায়গাটাকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে, তুই রাজা হয়ে যাবি। সপ্তাহে কি রকম আমদানি হয়, শেট?’

জেনসন মারা যাবার পর থেকে সাপ্তাহিক আয় একেবারে কমে গেছে। কারণ, ওর পুরোনো লোহালক্কড়ের ব্যবসা থেকেই একটা মোটা টাকা আসত। আর এই লোহালক্কড়ের ব্যাপারে আমি আর লোলা সমান দিগগজ। তাই কার্ল মারা যাবার পরই লোহালক্কড়ের ব্যবসা একেবারে মুখ থুমড়ে পড়েছে। বর্তমানে আমাদের ভরসা রেস্তোরাঁ, পেট্রল এবং গাড়ি মেরামত। কিন্তু হলে কি হবে, যা আশা করেছিলাম, আয়-পত্তর তার ঢের কম হয়। টেনেটুনে সপ্তাহে মাত্র শ-দুয়েক ডলার লাভ হয়। সে-টাকাটা আমি আর লোলা ভাগাভাগি করে নিই। অর্ধেক আমার, আর বাকী অর্ধেক ওর।

জেনসন মারা যাবার পর, ওর সিন্দুকে আমার জমানো টাকা ঠিক যেমন ছিল তেমনই আছে। ওতে আর হাত দিইনি, কারণ টাকাটা খরচ করবই বা কিসে? তাই এখনও প্রতি সপ্তাহে, আমার ভাগের একশো ডলার ওই সিন্দুকেই জমিয়ে রাখি। লোলা ওর ভাগের টাকাটা দিয়ে কি করে জানিও না, জিগ্যেসও করি না।

‘কীরে শেঠ, বললি না তো আমদানি কেমন হয়?’

রয়ের কথায় আমার চমক ভাঙল। ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে সাত-তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, ‘তুই যত ভাবছিস, তত নয়। এই—শ-দুয়েক আসে আর কি?’

রয় হতাশায় মুখ ব্যাজার করল, ‘কী বলছিস তুই! এত কম!—আমি তো ভেবেছিলাম দু-শ ডলারের বেশি।’ ও পায়ে পায়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরেটায় একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ‘ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারালে, এরকম একটা জায়গাকে কাজে লাগিয়ে মোটা টাকা আমদানি করা যায়।’

‘উহুঁ—সেরকম কোন আশা নেই। এই বিশাল মরুভূমির মাঝে, এই হতচ্ছাড়া জায়গা কি কাজেই বা লাগবে?’

‘আরে, মরুভূমির মাঝে বলেই তো বলছি!’ রয় উৎসাহভরে আমার দিকে তাকাল, ‘কোন ব্যবসার ব্যাপারে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর যে হতে পারে না, এটুকু তুই বুঝতে পারছিস না?’

‘তার মানে, কী ব্যবসা?’

‘তুই কি এই নির্জন শ্মশানেই চিরজীবন পড়ে থাকতে চাস, শেট? ছোটবেলা থেকেই আমরা সবসময় ভেবে এসেছি কি করে বড়লোক হব, দুটো পয়সার মুখ দেখব!—তাই তো বললাম, এ-জায়গাটা কাজে লাগাতে পারলে তুই রাজা হয়ে যাবি।’ রয় ফিরে এসে আমার মুখোমুখি বসল।

বিছানায় বসে ভুরু কুঁচকে রয়ের দিকে তাকালাম, ‘কী কাজে? খুলে বল্।’

‘এই—ধ্র—মেক্সিকো চেড়ে যারা পালাতে চায়, তাদের হেলিকপ্টারে করে এখানে নিয়ে আসা যায়। এ জায়গাটা তাদের ভালোই লাগবে। আর আমরাও মাথাপিছু দু-শ ডলার করে মোটা টাকা খিঁচতে পারব!’

‘রয়, তুই যদি মাস দুয়েক ফার্নওয়ার্থে থাকতিস, তবে আর এ-ধরনের কথা বলতিস না।’ শান্ত স্বরে ওকে বললাম।

রয় মাথার চুলে হাত চালিয়ে নির্লজ্জের মতো হাসল। কিছুটা অস্বস্তিভরেই বলল, ‘সে-কথা ঠিক, শেট। তোর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কুপারের এই কাজটা আমরা ঠিকভাবে করতে পারিনি। বোকার মতো, মাত্র দুদিনের অনুসন্ধানেই কাজে নেমে পড়েছি। আমাদের উচিত ছিল, অন্তত এক সপ্তাহ কুপারের গতিবিধি লক্ষ্য করা। ওর সমস্ত ভাব-গতিক জেনে, তারপর আসল কাজে হাত দেওয়া—কিন্তু কোথায় কি? নিজেদের দোষেই আমরা বিপদে পড়লাম।’

‘ওসব দুদিন-ফুদিন নয়। কাজটা আমাদের করাই উচিত হয়নি। নিজেরাই বিপদ ডেকে এনে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছি—তুই না হলেও অন্তপক্ষে আমি তোকে সোজাসুজি জানিয়ে দেওয়াই ভালো, রয়—আর-কোন ঝামেলায় আমি নিজেকে জড়াতে চাই না।’

‘সে আমি বুঝতে পারছি, শেট, কিন্তু বড়লোক হওয়ার আশা ছাড়তে আমি রাজি নই। আজ হোক, কাল হোক, বেশ কিছু টাকা আমার চাই-ই চাই।’

‘সেই ‘‘বেশ কিছু টাকা’’ যে এখান থেকে পাবি না, সে-বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাকিস।’

রয়ের সেই বিশেষ হাসিটি তখনও ওর ঠোঁটে লেগে রয়েছে, ‘আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে। কোন ঝামেলার তোকে আর জড়াচ্ছি না।’

রয় উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা ড্রয়ার খুলে কতকগুলো শার্ট, প্যান্ট তাতে রাখল। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকাল, ‘শেট, সত্যিই কি তোর আর বড়লোক হওয়ার সাধ নেই?’

‘না, রয়—ফার্নওয়ার্থের দাওয়াই খেয়ে সে-সাধ আমার মিটে গেছে। তুই খেলে তোরও যেত!’

‘শুনেছি, ওরা নাকি কয়েদীদের কাছে খুব নৃশংস ব্যবহার করে—’ গোটাকয়েক রুমাল বিছানা থেকে তুলে দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খুলল। কিন্তু সেগুলো রাখতে গিয়েই তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, রয়, ‘আরে! এটা কী?’

ওর কথার সুরে চমকে উঠলাম। অশান্ত হৃৎপিণ্ড যেন ধাক্কা খেল এক অদৃশ্য কাচের দেওয়ালে, ‘কীসের কথার বলছিস?’ দুরু দুরু বুকে প্রশ্ন করলাম। তাহলে কি রয়—?

আমার আশঙ্কা যে মিথ্যে নয়, পরমুহূর্তেই তার প্রমাণ পেলাম। রয় .৪৫ কোল্ট রিভলভারটা ততক্ষণে ড্রয়ার থেকে বের করে ফেলেছে যে রিভলভারের গুলিতে মারা গেছে কার্ল জেনসন।

চোখের সামনে গোটা পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল। ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মস্তিষ্কের প্রতিটি চিন্তা-কোষ—কী জবাব দেব ওকে?

সেই ঘটনার পর রিভলভারটা লোলার কাছ থেকে নিয়ে, পরে কখন যে ওই ড্রয়ারটায় রেখে দিয়েছিলাম, মনেও নেই। এতদিন ওটার কথা একেবারেই ভুলে ছিলাম। কিন্তু এখন? কি বলব রয়কে! একটা সরীসৃপ যেন আস্তে আস্তে শিরদাঁড়া বেয়ে উঠতে লাগল।

হঠাৎ ইচ্ছে হল, একলাফে রয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলভারটা কেড়ে নিই, কিন্তু অনেক কষ্টে দমন করে কোনরকমে জবাব দিলাম, ‘ওঃ, ওটা জেনসনের রিভলভার। ও চলে যাবার পর, একদিন রিভলভারটা পেয়ে এই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম।’ যতটা সম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করলাম।

রয় নিষ্পলক চোখে রিভলভারটার দিকে তাকিয়ে ছিল। গুলি ভরার সিলিন্ডারটা ও আঙুল দিয়ে ঘোরাল। রিভলভারের নলটা নাকের কাছে এনে শুকল, ‘খুব সম্প্রতি এটা থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে দেখছি।’ ও ম্যাগাজিন খুলে খালি কার্তুজের খোলটা বের করে বিছানায় উপর ফেলল, ‘দেখেছিস?—তুই জানতিস না এটা থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে?’—হুঁ—গুলিটা ছোড়া হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি দেখছি।’ আত্মগতভাবে শেষ কথাগুলো বলে, রয় ওর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরল আমার চোখে, ‘এই গুলিতে কে মারা গেছে, শেট?’

বহু কষ্টে ওর চোখে চোখ রাখলাম। অপরাধবোধের ছায়াকে মুখের আয়না থেকে সরিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, 'কেউ মারা যায়নি রয়। জেনসন এটা দিয়ে চিল শিকার করত। হয়তো গুলি করার পর রিভলভারটা পরিষ্কার করতে ভুলে গেছে।'

'.৪৫ রিভলভার দিয়ে কেউ যে পাখি শিকার করে, তা তো জানতাম না!' রয় রিভলভারটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল, 'তাহলে জেনসনের টিপ বলতে হবে।'

'গুলি করত, এই পর্যন্ত। কোনদিন কোন চিলের গায়ে লাগাতে তো দেখিনি।' এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে রিভলভারটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখলাম, 'যাকগে, অনেক দেরি হয়ে গেল—আমি চলি। তোর সব-কিছু ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।' রয়ের গলায় কেমন যেন একটা নিষ্প্রাণ সুর। কিছুটা অস্বস্তিবোধ করলাম।

'আজ রাতে কে জাগছে, শেঠ?' রয় হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'আমি। কিন্তু কাল রাতে তোর ডিউটি। আমরা দুজনেই পালা করে চালাব, কী বলিস?'

'হুঁ। —শেট, আমার সৌভাগ্যকে আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। কি অদ্ভুতভাবেই না তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই না?'

ওর কাঁধে হাত রাখলাম, 'সৌভাগ্য তো আমারও। আমিও কি জানতাম, তোর সঙ্গে এতদিন পরে আবার এভাবে দেখা হবে? নে, শুয়ে পড়্—' পা বাড়ালাম দরজার দিকে।

'শেট!'

থমকে দাঁড়ালাম।

ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল রয়ের স্থির চোখজোড়ায়। ও একমনে চোয়ালে হাত বোলাচ্ছে।

'কি বলছিস বল্।'

'.৪৫টা পরিষ্কার করে রাখিস। যে-বন্দুকে বারুদের গন্ধ লেগে থাকে, সে বন্দুককে কখনও বিশ্বাস নেই!'

ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম, 'ঠিকই বলেছিস। আচ্ছা—চলি।

'ভালোভাবে থেকো, দোস্ত!' রয়ের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতেরই লক্ষ্য করলাম—রেস্তোরাঁয় কোন আলো নেই, কিন্তু বাংলোয় লোলার ঘরে আলো জ্বলছে। সুতরাং বাংলোর দিকে এগোলাম।

লোলা বিছানায় বসে পা থেকে মোজা খুলছিল। পরনে সানদো অন্তর্বাস ও নাইলনের প্যান্টিস। আমি ঘরে ঢুকতেই ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে একবার দেখল, তারপর আবার মোজা খোলায় মন দিল।

'ওঃ, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।' লোলা হাই তুলল। তারপর মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'শেট, তোমার বন্ধুকে আমার ভালো লেগেছে।'

'তা লাগবারই কথা। কারণ, রয় আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে টেবিলের একদম উপরের ড্রয়ারটায় রাখলাম। লোলা আমার দিকে পিছন ফিরে থাকায় কিছু দেখতে পেল না। ঠিক করলাম, কালই রিভলভারটা পরিষ্কার করে রাখব।

ড্রয়ার বন্ধ করে লোলাকে বললাম, 'আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকলে দিনগুলো বেশ ভালোই কাটবে। তবে একটা কথা কি জান, রয় মেয়েদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও কৌতূহলী নয়। মাঝে-মাঝে ভারি অবাক লাগে। সেই যে একবার উনিশ বছর বয়েসে ওর বউ পালাল—ব্যস, ওই শেষ! তারপর থেকে রয়কে কোন মেয়ের দিকে তাকাতে পর্যন্ত দেখিনি।'

লোলা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অবশিষ্ট জামাকাপড় ছেড়ে রাত্রিবাস পরতে লাগল, 'শেট, পৃথিবীতে এমন কোন পুরুষ নেই, যে মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না—সেটা শুধু নির্ভর করে, কি রকম মেয়ে, তার ওপর।' লোলার কথায় যে একটা ঔদ্ধত্যের সুর লুকিয়ে আছে, সেটা আমার কান এড়াল না।

'লোলা, রয়কে আমি তিরিশ বছর ধরে জানি। আজ পর্যন্ত মাত্র একটি মেয়ের প্রতিই ও আকৃষ্ট হয়েছিল। সে ওর বউ। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই সেসব আকর্ষণ-টাকর্ষণ ধুয়ে-মুছে মিলিয়ে গেছে।'

লোলা বিছানায় শুয়ে পড়ল, 'তাহলে ওর বউ নিশ্চয়ই তেমন সুন্দরী ছিল না—' অ্যামেজে হাত ছাড়িয়ে ও হাই তুলল, 'উ—ম্—ম্! তুমি একটা বাজলেই চলে এসো, কেমন?'

'হ্যাঁ।' ঝুকে পড়ে ওকে চুমু খেলাম, 'চুপচাপ ঘুমোও। আমি ফিরে এসে তোমাকে আর জাগাব না—।'

'সেই ভালো। আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।' লোলা চাদর টেনে নিল বুক পর্যন্ত, তারপর আমার দিকে চেয়ে হাসল, 'ওহো, আমার তো মনেই নেই। সকালে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

কেউ যেন পাঁজরে এক লাথি বসিয়ে দিল। রিক্স! রিক্সের কথা তো একেবারে ভুলেই গেছি! রয়কে নিয়ে আনন্দে এত মেরে ছিলাম, ঐ বুড়ো শকুনটার কথা আমার মনেই পড়েনি।

লোলা আমার মুখের ভাবে চমকে উঠে বসল, 'কী হয়েছে, শেট?'

'রিক্স আজ সকালে এসেছিল। ওর গায়ে হাত তুলতে ও আমাকে বাধ্য করেছে।'

'তুমি—তুমি ওকে মেরেছ?' লোলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'তা ছাড়া আর-কোন উপায় ছিল না।'

লোলা উত্তেজনায় আমার হাত চেপে ধরল, 'আমাকে সব খুলে বল। রিক্স কি করেছিল?'

ওকে সব খুলে বললাম।

এক হাতে চাদরটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে, লোলা একমনে শুনতে লাগল। ওর সবুজ চোখজোড়া ভয়ে উত্তেজনায় বিস্ফারিত। সারা শরীর চাবুকের মতো টান-টান।

'ওকে দশ ডলার দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা ও আমার মুখের ওপর ছুড়ে মেরেছে। বলেছে, ও এবার পুলিশেই যাবে।'

লোলা আশ্বস্ত হয়ে ধপাস করে আবার শুয়ে পড়ল, 'কোন ভয় নেই, শেট—রিক্স পুলিশে যাবে না। আর গেলেও পুলিশ ওর কথা বিশ্বাস করবে না। ওরা রিক্সকে ভালোভাবেই চেনে।'

'সেটা হলেই ভালো।'

'কিন্তু তুমি ওকে মারতে গেলে কেন?'

'বুঝতে পারছি, ওকে মারাটা ঠিক হয়নি, কিন্তু কি করব—!'

'যাকগে, ও নিয়ে আর চিন্তা করো না। পুলিশের কাছে গেলে, ওরা রিক্সকে সোজা তাড়িয়ে দেবে।'

লোলাকে কপালে চুমু খেলাম, 'শুয়ে পড়ো, সোনা—আমি কাজ সেরে একটার মধ্যেই ফিরে আসব।'

'কাল রাতে কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। রয়কে বলো রাতে কাজ করতে।'

হেসে ওর রেশম-নরম চুলে হাত চালালাম, 'যথা আজ্ঞা, মহারানী!'

এগার

পরদিন সকাল প্রাতরাশ খাবার সময় রয়কে রিক্সের কথা জানালাম।

'ওর কাছ থেকে সাবধানে থাকিস। শালা এক নম্বরের বিচ্ছু—যখন-তখন হুটহাট্ করে এখানে ঢুকে পড়ে। এই তো কালই এসেছিল—একেবারে, অসহ্য। কাল তো রাগের মাথায় ব্যাটাকে মারধোর দিয়ে ফেলেছি। তারপর ও বলেছে, পুলিশে খবর দেবে—দিক্‌গে!'

রয় চমকে মুখ তুলে তাকাল, 'পুলিশ? তার মানে!'

'রিক্স একদিন আমাকে আর লোলাকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলে। জেনসন যে অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে সটকে পড়েছে, সে খবর ও জানে না। তাই এখন ও কার্লকে খুঁজে বের করতে চায়—ওর পেনসনের কাগজে কি সব সই-টইয়ের ঝামেলা আছে—তাছাড়া রিক্স আমাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখে না।'

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল রয়। খাবার ঘরে শুধু আমরা দুজন—লোলা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। রয় অ্যাশট্রেতে ছাই ঝেড়ে আমার দিকে ফিরল, 'তাহলে লোলা ওকে বলছে না কেন, জেনসন আর ফিরবে না?'

'প্রথমত, সেটা রিক্সকে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আর দ্বিতীয়ত, বললেও রিক্স সে-কথা বিশ্বাস করবে না।'

'হুঁ—' রয় চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল, 'কিন্তু শেট, এটা কিছুতেই আমার মগজে ঢুকছে না যে একটা লোক কি করে এমন সুন্দরী বউ, আর এরকম একটা জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে! নাঃ, জেনসন ব্যাটা বোকার হদ্দ!'

'হ্যাঁ,—শোন্—যা বলছিলাম—আমরা যখন থাকব না, তখন যদি রিক্স এখানে আসে, সোজা তাড়িয়ে দিবি। এখান থেকে কোন জিনিস নিয়ে যেতে দিবি না—বুঝলি?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু রিক্স পুলিশে যাবে বলেছে? অদ্ভুত তো!'

রয় কি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে?

'না না—পুলিশে ও যাবে বলে মনে হয় না। আর যদিও বা যায়, পুলিশ ওর কোন কথাতেই কান দেবে না।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'যাকগে—আয়, ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলা যাক। প্রত্যেকদিন সকালে এটা লোলাই পরিষ্কার করে, কিন্তু, এখন তুই এসেছিস—' রয়ের দিকে চেয়ে হাসলাম, 'তাই লোলা এখনও ঘুমোচ্ছে—'

খাবার ঘর ঝাঁড়-পোঁচ করতে করতে রয় বলল, 'শেট, ফার্নওয়ার্থ থেকে তুই কেমন করে পালালি বল্ তো? কাগজে লিখেছিস, তুই-ই হলি একমাত্র কয়েদী যে ফার্নওয়ার্থ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে।—বল্ না, পালালি কেমন করে?'

রয় উৎসুক চোখে আমার দিকে তাকাল।

ওকে ধীরে ধীরে জানালাম আমার পালানোর ইতিহাস।

ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করে রয় একমনে শুনতে লাগল। ওর মুখ দেখে মনে হল, এই অবিশ্বাস্য কাহিনীকে ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। মাঝে-মাঝে অস্ফুট স্বরে বিস্ময়ও প্রকাশ করল।

আমার কথা শেষ হতেই ও আমাকে জাপটে ধরল, 'শালা! তোর সাহস আছে বলতে হবে! আমি হলে এই সর্বনেশে কুকুরগুলোর ধারেকাছেও ঘেঁষতাম না। আশ্চর্য, কী করে যে পালালি! একবার ভয়ও করল না?'

'ফার্নওয়ার্থ থেকে পালাবার জন্যে কুকুর কেন, বাঘের মুখোমুখি হতেও কোন কয়েদী পেছপা হবে না। মোদ্দা কথা, ফার্নওয়ার্থে আমি আর ফিরছি না। তার চেয়ে আমার মৃত্যুও ভালো।'

কথা বলতে বলতে হয়তো একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। সেটা লক্ষ্য করে রয় বলল, 'এখন আর তোর ভয়ের কোন কারণ নেই। এখানে তোর খোঁজ করার কথা পুলিশের মনেও আসবে না।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

হঠাৎ জানালা দিয়ে বাংলোর দরজায় চোখ পড়তেই, দেখলাম লোলাকে। ও রেস্তোরাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। পরনে সেই চোলি, আর একটা খাটো প্যান্ট। মাথার একরাশ তাম্রাভ চুল একটা সবুজ ফিতে দিয়ে অগোছালোভাবে বাঁধা।

ওকে দেখামাত্রই কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করলাম। কারণ, সেদিন বারণ করার পর থেকে লোলা এই পোশাকে আর বাইরে বেরোয় না। তাহলে আজ কেন?—ও বুঝেছি, 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন'-এ যেই একজন অপরিচিত পুরুষের আগমন ঘটেছে, অমনি লোলা ওর ভরা যৌবনের পসরা সাজিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আড়চোখে রয়কে দেখলাম। ও কিন্তু লোলাকে দেখেনি, তখনও একমনে কাউন্টার পরিষ্কার করছে।

লোলা চটুল হাসিতে চোখ নাচিয়ে খাবার ঘরে এসে ঢুকল। এক কথায় যাকে বলে নাটকীয় আবির্ভাব।

‘কী ব্যাপার? সকাল হতে-না-হতেই আমার কর্মচারীরা কাজে লেগে গেছে।’

আমি একদৃষ্টে রয়কে লক্ষ্য করছিলাম। ও কাজ করতে করতে থমকাল, চোখ তুলে তাকাল লোলার দিকে। ও তখন দরজার গায়ে হেলান দিয়ে স্থির চোখে রয়ের দিকে চেয়ে আছে।

লোলা আজ যেন আরও বেশি উচ্ছল হয়ে উঠেছে। রয়ের চোখের সামনে নিজেকে করে তুলেছে অনেক বেশি লোভনীয়।

কিন্তু রয়ের মুখের ভাবে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হল না। ও শূন্যদৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপরই মাথা ঝুঁকিয়ে আবার কাজে মন দিল। নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল, ‘তাই নাকি! আমরা খিদমতগার, আর তুমি কি?’

রয়ের অপ্রত্যাশিত রুক্ষ জবাবে লোলার মুখ থমথমে হয়ে উঠল—যেন আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস। কারণ ও রয়ের থেকে এ ধরনের জবাব কখনোই আশা করেনি। হয়ত ভেবেছিল, ওর এই উচ্ছল বালিকা-সুলভ ব্যবহার রয়ের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করবে। কিন্তু যখন দেখল, ওর যৌবনের আকর্ষণ রয়ের উপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করেনি, তখন স্বভাবতই রুদ্ধ আক্রোশে মাথা খুঁড়েছে লোলার অপমানিত, আহত নারীত্ব।

আমার মন থেকে অস্বস্তির ভাবটা কেটে গেল। লোলার অবস্থা দেখে মুখ ফিরিয়ে হাসলাম। নাঃ, রয় সেই একই আছে—এতটুকু বদলায়নি। ওর জীবনে নারীর ভূমিকা এখনও সবার শেষে।

লোলা চুপচাপ রান্নাঘরের দিকে এগোল। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছে একবার ঘাড় ফিরিয়ে রয়কে দেখল। রয় তখনও সেই একই ভাবে কাজ করে চলেছে, আর আপনমনেই হালকা সুরে শিস দিচ্ছে। রয় লোলার দিকে পিছন ফিরে থাকায় ওর মুখের ভাব দেখতে পেল না। কিন্তু লোলা রান্নাঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করতেই ওর মুখ ফিরিয়ে একবার রান্নাঘরের দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল, ‘শালা, রমণীর মন দেবা না জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ! কোনদিন কোন মেয়েকে সন্তুষ্ট হতে দেখলাম না, মাইরি!’

‘আমারই দোষ।’ হেসে রয়কে বললাম, ‘আমিই তোর কথা ওকে বলেছি। বলেছি যে মেয়েদের সম্বন্ধে তুই এতটুকু কৌতূহলী নোস। ব্যস, লোলা তো কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। বলে, এ নাকি হতেই পারে না।’

‘এবার বোধ হয় বিশ্বাস করবে।’ রয় হেসে জবাব দিল।

এমন সময় বাইরে থেকে একটা ট্রাকের শব্দ কানে এল। ড্রাইভারের হর্ন দেবার ধরন শুনে বুঝলাম, তার প্রয়োজনটা জরুরী। রয় কাউন্টার পরিষ্কার করার কাপড়টা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল, ‘তুই থাক, আমিই যাচ্ছি।’

ও বেরিয়ে যেতেই রান্নাঘরে গেলাম।

লোলা মুখ গোমড়া করে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যেই ও কাজ করার গাউনটা পরে নিয়েছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই বলল, ‘শেট, আজ রাতে আমরা সিনেমায় যাব। রয় এখানে দেখাশোনা করবে, কোন অসুবিধে হবে না। বারটার শো দেখে, রাত তিনটের মধ্যেই আমরা আসতে পারব, কী বলো?’

একটু ইতস্তত করলাম। আমাদের দুজনের একসঙ্গে ওয়েন্টওয়ার্থে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

‘লোলা, আমার মনে হয়, আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা প্রয়োজন—’

‘তার মানে?’ চট করে ঘুরে তাকাল লোলা—মুখের ভাব কঠিন।

‘না, বলছিলাম—জেনসন যে অ্যারিজোনায় গিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে ভিড়ে গেছে, সে-গল্পটা এখনও তো কেউ জানে না—তাই ভাবছিলাম, লোকে আগে গল্পটা শুনুক, তারপর আমরা একসঙ্গে যেখানে-সেখানে ঘুরব—কারুর কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু তার আগে আমাদের দুজনের—’

আমার কথা শেষ হতে-না হতেই লোলা মুখঝামটা দিয়ে উঠল, 'তোমার ওই এক কথা শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। আজ রাতে আমি সিনেমায় যাব, এবং তুমিও আমার সঙ্গে যাচ্ছ—ব্যস!'

'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছ, যাব, বারোটার শো তো, কেউ যে আমাদের দেখে ফেলবে সে-সম্ভবনা কম।'

'দেখে ফেললেই বা—আমাদের তাতে বয়েই গেল!' লোলার কণ্ঠস্বরে অধৈর্য।

'কিন্তু তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ লোলা, কার্লকে আমরা এখানেই করব দিয়েছি। যদি সন্দেহের বশে পুলিশ এখানে আসে, তাহলে—'

'যদি পুলিশ এখানে আসে! যদি কার্লের দেহ খুঁজে পায়! যদি আমাদের সন্দেহ করে—' লোলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর, 'তার মানে বাকি জীবনটা আমাকে পুলিশের ভয়ে ভয়েই কাটাতে হবে এই তো তোমার বক্তব্য?

'তোমার যা খুশি বলো। তোমাকে তো আর ফার্নওয়ার্থে যেতে হয়নি!'

এমন সময় রয় এসে ঢুকল রান্নাঘরে।

রয়কে দেখেই লোলা বলল, 'রয়, আমি আর শেট রাতে সিনেমায় যাচ্ছি। তুমি একা সব সামলাতে পারবে তো?'

রয় একবার আমার দিকে তাকাল, হয়তো একটু অবাকও হল, কিন্তু মুখে সে-কথা প্রকাশ করল না, 'না না,—আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

লোলা ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার কাজে মন দিল।

রয় এবার আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'শেট, এক মিনিট বাইরে আয় তো—আমার গাড়িটা একটু দেখবি। শালা গাড়িটার সব ক-টা প্লাগই খারাপ হয়ে গেছে। তুই তো জানিস, গাড়ির ইঞ্জিনের ব্যাপার-ট্যাপার আমার মাথায় একদম ঢোকে না!'

'এবার একটু গাড়ির কাজ শেখ্। মনে কর, আমি আর লোলা বেড়াতে গেলাম, আর একটা গাড়ি ব্রেকডাউনের কাজ এসে পড়ল—তখন কী করবি?'

রয় হাসল, 'সে আগে আসুক তো, তখন দেখা যাবে। চল্, গাড়িটা দেখবি চল—'

রয় রান্নাঘরের দরজার দিকে এগোল। ওর পিছন পিছন আমিও চললাম। কিন্তু রান্নাঘরের দরজা খুলেই ও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাপারটা আচমকা ঘটে যাওয়ায় নিজেকে সামলাবার আর সময় পেলাম না। সোজা ওর গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেলাম।

'দ্যাখ, কে আসছে!' চাপা উত্তেজিত স্বরে রয় বলে উঠল।

রয়ের কাঁধের উপর দিয়ে তাকালাম। রান্নাঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে খাবার ঘরের জানলা। আর সেই জানলা দিয়ে বেশ দেখতে পেলাম বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটাকে।

গাড়ির আরোহী দুজনের পরনেই কালো স্যুট এবং স্টেটসন হ্যাট। দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মোটাসোটা লোকটা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল—থলথলে, পেটমোটা জলহস্তীর মতো চেহারা। তার কোটের উপর বুকের কাছে লাগানো রয়েছে একটা রুপোর। তারা প্রখর সূর্যের আলো সেই তারার গায়ে পড়ে ঠিকরে পড়ছে।

গাড়ি থেকে নামার সময়, লোকটার কোটটা একটু ফাঁক হতেই চোখে পড়ল তার কোমরের বেল্টে আঁটা .৪৫ রিভলভারটা।

'পুলিশ!' রয় চাপাস্বরে ফিসফিস করল।

ততক্ষণে আমিও সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা বরফ শীতল স্রোত বয়ে গেল। পুলিশ কেন? তাহলে কী—

পাগলের মতো ঘুরে তাকালাম লোলার দিকে। অদ্ভুত মনে হলেও, সেই মুহূর্তে একটা আশ্চর্য ভয়ার্ত অনুভূতি আমার মনকে ছেয়ে ফেলল। মনে হল, এই আসন্ন বিপদ থেকে একমাত্র লোলাই আমাকে উদ্ধার করতে পারবে—আর কেউ নয়। ক্ষিপ্র পায়ে লোলার কাছে এগিয়ে গেলাম, 'লোলা, শেরিফ এখানে আসছে!'

লোলা এক টুকরো কাপড় নিয়ে হাত মুছতে লাগল, 'কোনভয় নেই, শেট। শেরিফের সঙ্গে আমিই কথা বলেছি।'

লোলার ব্যবহারে অবাক হয়ে গেলাম। ও এত শান্ত, সহজ, নির্বিকার ভাবে কথাগুলো বলল, যে বিশ্বাসই হতে চায় না।

অবশ্য শেরিফের আগমনে লোলার ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। ভয়টা আমার—কারণ ফার্নওয়ার্থ থেকে আমিই পালিয়ে এসেছি, লোলা নয়। আর ধরা পড়লে আমাকেই ফার্নওয়াথে ফিরে যেতে হবে। অশরীরী এক আতঙ্ক আমার হৃৎপিণ্ডকে সজোরে আঁকড়ে ধরল।

আমাকে এবং রয়কে পাশ কাটিয়ে লোলা ঘরে গেল। ও চলে যেতেই রান্নাঘরে দরজাটা আস্তে বন্ধ করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল লোলার অকম্পিত কণ্ঠস্বর, 'কী ব্যাপার, শেরিফ? হঠাৎ এই অবেলায় কী মনে করে?'

রান্নাঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে শুনে চললাম। ভয়ে আমার হাত-পা তখন ঘেমে উঠেছে। রয়ও দেওয়ালে কান পেতে ওদের কথাবার্তা শুনছে, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে আমাকে দেখছে।

এবার কানে এল শেরিফের স্পষ্ট ভরাট কণ্ঠস্বর, 'কেমন আছেন মিসেস? বহু দিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল—'

উত্তরে লোলার অস্পষ্ট স্বর শুনতে পেলাম, 'আছি একরম—'

'মি. জেনসনকে একটু ডেকে দিন তো—কয়েকটা কথা আছে।'

'কার্ল তো এখানে নেই, বাইরে গেছে।' লোলার স্বর অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক। কল্পনার চোখে যেন দেখতে পেলাম, শেরিফের মুখোমুখি লোলা দাঁড়িয়ে আছে—সবুজ চোখে শূন্য নিষ্পাপ দৃষ্টি। অভিব্যক্তিহীনমার্কা শেরিফের পক্ষে তো নয়ই। কিন্তু কেন জানি না, শেরিফের দেখার পর থেকে কিছুতেই সহজ হতে পারছি না।

'মি. জেনসন এখানে নেই?' লোলার কথায় শেরিফ অবাক হয়েছেন মনে হল, 'আশ্চর্য ব্যাপার! মি. জেনসন কোনদিন এ জায়গা ছেড়ে গেছেন বলে তো আমার মনে পড়ে না!—আচ্ছা, কোথায় গেছেন বলুন তো?'

'কী জানি কোথায় গেছে!' লোলার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল নিস্পৃহ অবহেলার সুর, 'বলে তো গিয়েছিল, কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করবে। হয়তো অ্যারিজোনা কিংবা কোলোরাডোয় আছে—ঠিক জানি না। ও তো গিয়ে পর্যন্ত একটা চিঠিও দেয়নি।'

'কবে ফিরবে, সে-সম্বন্ধে কিছু বলে গেছে?'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর কানে এল লোহার শীতল স্পষ্ট উত্তর, 'আমার তো মনে হয় কার্ল আর ফিরবে না!'

শেরিফের মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ফিরবে না? কী বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলছি। কার্ল আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

অনেকক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই। বুঝলাম, শেরিফ তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে লোলার মুখের দিকে চেয়ে আছেন—ওর কথার সত্যতা যাচাই করছেন। আর লোলাও মুখে পরে রয়েছে শূন্য করুণ দৃষ্টির মুখোশ যা ভেদ করে ওর মনোভাব বোঝা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

এবার রয়ের দিকে তাকালাম। রয়ও আমার মতোই উদগ্রীব হয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। আমার চোখে চোখ পড়তেই ও ভ্রূকুটি করে মাথা নাড়ল।

এবার শুনলাম, শেরিফ একটু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলছেন, 'ও, তাই নাকি?—কিন্তু মিসেস জেনসন, আপনি কি করে বুঝলেন, মি: জেনসন আপনাকে—'

শেরিফকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে লোলা বলে উঠল, 'কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে, এ-ঘটনা তো আজ নতুন নয়!' লোলার কণ্ঠস্বর এবার ধারালো হয়ে উঠল, 'কিন্তু এসবে আপনার কি দরকার বলুন তো, শেরিফ? কার্ল কি করল না করল, সে আমি বুঝব—আপনি এতে নাক গলাচ্ছেন কেন?'

শেরিফ বোধ হয় একটু থতিয়ে গেলেন। কারণ কানে এল তাঁর অস্বস্তিভরা কণ্ঠস্বর, 'আমি দুঃখিত, মিসেস জেনসন। মি. জেনসন যে আপনার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে পারেন, তা আমার মনেও আসেনি তাই আপনাকে জিগ্যেস করছিলাম—'

'না, এতে কার্লের খুব একটা দোষ নেই—দোষ আমারই। কারণ, ওর মতো বয়স্ক লোককে বিয়ে করে আমি খুব ভুল করেছি। বিয়ের পর থেকেই ওর সঙ্গে আমার বনিবনা হত না। এতদিন যে আমরা কি করে একসঙ্গে কাটালাম, ভাবতেই অবাক লাগছে—তবে কার্ল আমাকে এ জায়গাটা দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে। না হলে, আমাকে হয়তো না খেয়েই মরতে হত!—কিন্তু কার্লের সঙ্গে আপনার কী দরকার তা তো বললেন না, শেরিফ? অবশ্য আমাকে বলতে যদি আপনার অসুবিধে না থাকে—'

শেরিফ সশব্দে গলা ঝাড়লেন, 'আপনার এখানে জ্যাক প্যাটমোর নামে একটা লোক কাজ করে শুনলাম—?'

ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি একটা হাতিয়ারের সন্ধানে রান্নাঘরের চারদিকে একবার চোখ বোলালাম। মাংস কাটার ছুরিটা টেবিলের উপরেই পড়েছিল। চটকরে হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিলাম। যা ঘটে ঘটুক—ফার্নওয়ার্থে আমি কিছুতেই যাব না! ওই জলহস্তী শেরিফ ব্যাটা যদি ভেবে থাকে, আমাকে জ্যান্ত গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে, তবে ভীষণ ভুল করবে!

রয় আমাকে ছুরিটা তুলতে দেখেই ইশারায় বারণ করল। দেখলাম, বিপদের আশঙ্কায় ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে। আমার মুখের ভাবে ও বোধ হয় বুঝতে পারল, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি কিছুতেই ধরা দেব না। কিন্তু শেরিফের রিভলভারের কথা চিন্তা করেই ও আমাকে নিরস্ত করতে চাইল। কিন্তু একবার বুঝল না আমার মনের অবস্থা বুঝল না, ফার্নওয়ার্থের চেয়ে যে-কোন মৃত্যু আমার কাছে শ্রেয়।

এবার শুনতে পেলাম লোলার উত্তর, 'প্যাটমোর? হ্যাঁ, ও এখানে কাজ করে। কার্ল যাবার আগে ওকে এখানে চাকরিতে ঢুকিয়ে ছিল—আর আমার কাজের সাহায্যের জন্যে একজন লোক তো এমনিতেই দরকার, তাই ওকে আর ছাড়াইনি—।'

'ও—। আচ্ছা, ওকে একবার ডাকুন তো। ওর সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'তা বেশ তো—দেখুন, ও বোধহয় গুমটিঘরে রয়েছে—' লোলার স্বর অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বাভাবিক। সম্ভবত আমাদের শোনবার জন্যই।

রয় নিঃশব্দে আমার কাছে এগিয়ে এল, ফিসফিস করে বলল, 'তুই এখানে থাক, আমি দেখছি।'

'মনে রাখিস, জ্যাক প্যাটমোর—শেট নয়।'

ও আমাকে আশ্বাস দিয়ে পিঠে আস্তে করে চাপড় মারল, 'কোন ভয় নেই।'

কথা শেষ করে রয় রান্নাঘরের খিড়কি-দরজার দিকে এগোল। দরজা খুলে বাইরের গরম বালির উপর দিয়ে রয় গুমটিঘরের দিকে হেঁটে চলল।

লোলা তখন শেরিফকে বলছে, 'যান, জ্যাকের সঙ্গে কথা বলে দেখুন। আমি আপনাকে বাধা দেবার কে!'

'হ্যাঁ, দেখছি।' শেরিফের পায়ের শব্দ দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

এমন সময় লোলা বলে উঠল, 'রিক্স কি প্যাটমোরের নামে আপনাকে কিছু বলেছে, শেরিফ?'

'হ্যাঁ—কেন বলুন তো?' শেরিফ থমকে দাঁড়ালেন।

'কী বলেছে? প্যাটমোর ওকে মেরেছে?'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর শেরিফের জবাব কানে এল, 'হ্যাঁ।'

লোলার স্বর এবার রুক্ষ হল, 'প্যাটমোর কেন ওকে মেরেছে, সে-কথা জর্জ আপনাকে বলেছে?'

'না। রিক্স বলছিল, এই প্যাটমোর লোকটা নাকি অকারণেই ওকে মেরেছে। তা ছাড়া প্যাটমোরের স্বভাব-চরিত্রও খুব—'

'তাহলে আসল কারণটা রিক্স আপনাকে বলেনি। প্যাটমোর কেন ওকে মেরেছে জানেন? রিক্স আমাকে বেশ্যা বলেছে বলে।' লোলার কণ্ঠে অভিযোগের রূঢ় সুর, 'প্যাটমোরের জায়গায় যদি আপনি হতেন, তবে আপনিও রিক্সকে মারতেন, তাই না?'

শেরিফ কাশলেন, একটু আমতা-আমতা করে বললেন, 'হ্যাঁ—তবে আসল কথা কী জানেন, রিক্সের কথা আমি যে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি, তা নয়—'

এমন সময় খাবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। পরক্ষণেই কানে এল রয়ের গলা, 'সুপ্রভাত, শেরিফ।'

'তোমার নামই জ্যাক প্যাটমোর?'

'হ্যাঁ—কী হয়েছে?'

দরজার গায়ে কান পেতে একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগলাম ওদের কথোপথন। এর পর শেরিফ রয়কে কি প্রশ্ন করবেন কে জানে!

কিন্তু শেরিফের পক্ষে কেবল রিক্সের বর্ণনা শুনে রয়কে চিনে ফেলা অত্যন্ত কঠিন হবে। কারণ বর্তমানে গোঁফ রাখার ফলে, আমার এবং রয়ের চেহারা দাঁড়িয়েছে প্রায়ই এক রকম। সুতরাং রয়কে প্যাটমোর বলে ভুল করা শেরিফের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

শেরিফ তাঁর জলদ-গম্ভীর স্বরে রয়কে প্রশ্ন করলেন, 'রিক্স বলছিল, তুমি নাকি ওকে মেরেছ—সত্যি নাকি?'

লোলা অত্যন্ত চতুরভাবে রয়কে ঘটনার সূত্র ধরিয়ে দিল। শেরিফের কথা শেষ হতে-না-হতেই ও বলে উঠল, 'এইমাত্র শেরিফকে বলছিলাম, রিক্স আমাকে বেশ্যা বলে গালাগাল দিয়েছে বলেই তুমি ওকে মেরেছ।'

'হ্যাঁ, মেরেছি।' রয় হালকা স্বরে জবাব দিল, 'এবং আর একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, শেরিফ—রিক্স যদি আবার এখানে কোনদিন আসে, তাহলে শুধু যে ওকে মারবই তা নয়, ঠ্যাঙদুটো পর্যন্ত ভেঙে দেব।'

শেরিফ হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বললেন, 'এখানে চাকরিতে ঢোকার আগে তুমি কোথায় থাকতে প্যাটমোর?'

মাংসকাটা ছুরির বাঁটে আমার পাঁচ আঙুল সজোরে চেপে বসল। দাঁতে দাঁত চেপে রুদ্ধশ্বাসে চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু রয় বেশ ব্যঙ্গের সুরেই জবাব দিল, 'ওকভিল, ক্যালিফোর্নিয়া। শুনুন শেরিফ, আমাদের গ্রামে কোন ভদ্রঘরের মেয়েকে রিক্সের মতো কোন ছুঁচো যদি গালাগাল দেয়, তবে আমরা তা সহ্য করি না। যদি

প্রয়োজন মনে করেন, আপনি আমার হাতের ছাপ নিতে পারেন—'

'হয়েছে, হয়েছে—তোমাকে আর বেশি চালাক সাজতে হবে না।' বিরক্তস্বরে শেরিফ রয়কে বাধা দিলেন, 'এ অঞ্চলে কোন নতুন লোক এলে, তার সম্বন্ধে আমার খবর রাখা দরকার বলেই জিগ্যেস করছি।'

লোলা সঙ্গে সঙ্গে অযাচিতভাবে বলে উঠল, 'লোহালক্কড়ের ব্যবসার মাধ্যমে কার্লের সঙ্গে প্যাটমোরের পরিচয় হয়। তারপর কার্লই ওকে এখানে নিয়ে আসে।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শেরিফ উত্তর দিলেন, 'সবই মানলাম, কিন্তু প্যাটমোর, তুমি একটু সাবধানে থেক। একটু ঘুষি খরচা করার আগে দশবার ভেব, বুঝলে?'

'আপনি তাহলে রিক্সকেও বলে দেবেন—একটা কথা বলার আগে যেন একশবার ভাবে!' একটু রুক্ষ স্বরেই রয় জবাব দিলেন।

'ঠিক আছে, রিক্সকে আমি সাবধান করে দেব।'

'ওকে আরও বলবেন, এদিকে যেন আর না আসে। জর্জ সবসময়েই খালি টাকার জন্যে আমাকে জ্বালাতন করে।' লোলা বিরক্তস্বরে বলল।

'হ্যাঁ, আমি জানি। মি. জেনসনও আমাকে অনেকবার এই কথা বলেছিলেন—রিক্স নাকি টাকার জন্যে দিনরাত তাঁকে জ্বালাতন করে—'

অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর শেরিফের সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে এল, 'মি. জেনসন আপনাকে ছেড়ে চলে গেছেন শুনে আমি আন্তরিক দুঃখিত, মিসেস জেনসন—' একটু কাশলেন শেরিফ, 'আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই মি. জেনসন তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন—'

কিন্তু লোলার নিস্পৃহ স্বর শেরিফকে নিরাশ করল, 'সে নিয়ে আপনারা আর ভেবে কি করবেন। কার্ল যদি আমাকে ছেড়ে সুখে থাকতে পারে, তো আমিও পারব।'

'সে তো খুব ভালো কথা।' কিন্তু শেরিফের কথার সুরে তা মনে হল না, 'তবে মি. জেনসন যে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবেন, ভাবতেই পারিনি—শুনেছি এখানেই নাকি তাঁর জন্ম হয়েছিল—'

এতক্ষণ ধরে শেরিফের কথা শুনে শুনে লোলা বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, কারণ শেরিফের কপট সহানুভূতির উত্তরে ও ধারালো স্বরে জবাব দিল, 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে, শেরিফ? কিছু কিছু মেয়ে আছে, যারা পুরুষদের সহজেই, বোকা বানাতে পারে। তার ওপর কার্ল যেরকম নির্বোধ—ভাবছি, এখানে আর বেশি দিন থাকব না। কিছু টাকাপয়সা জমলেই এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব। এর মধ্যে কার্ল যদি খবর-টবর দেয়, তো ভালো। ওকে জানাব এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তাতেও যদি ও না ফেরে, তবে এই 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন' বিক্রি করে আমি চলে যাব। মোটের ওপর, এখানে আমি আর বেশিদিন থাকছি না।'

'হ্যাঁ,—সত্যিই তো। আপনার স্বামী যদি আর না ফেরেন, তবে একা-একা দিন কাটাতে আপনার খারাপ তো লাগবারই কথা। তার ওপর এ জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন।

'ঠিকই বলেছেন।' লোলা শেরিফের কথায় সায় দিল। তারপর শেরিফের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বলল, 'অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল, শেরিফ। সময় সুবিধে পেলেই এদিকে চলে আসবেন—'

শেরিফ লোলার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বললেন, 'হ্যাঁ—সময় তেমন পাই না। তবে আপনার কোন দরকার পড়লেই আমাকে খবর দেবেন, মিসেস জেনসন—কোন দ্বিধা করবেন না।'

'ধন্যবাদ।'

শেরিফের ভারী পায়ের শব্দ দরজার দিকে এগোল, 'চলি প্যাটমোর—'

'আবার দেখা হবে, শেরিফ।' রয় উত্তর দিল।

তারপর কানে এল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। ক্রমশ সে-শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

মাংস-কাটা ছুরিটা টেবিলে নামিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলাম। ভয় ও উত্তেজনা কেটে গিয়ে অনেকটা স্বস্তি ফিরে পেলাম।

একটু পরেই লোলা আর রয় রান্নাঘরে এসে ঢুকল।

'তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস।' আনন্দে রয়ের হাত চেপে ধরলাম, 'তুই না থাকলে আজ কি যে হত—'

'তুমি মিছিমিছি ভয় করছিলে,' লোলা অধৈর্যভাবে বলে উঠল, 'তোমাকে তো বলেছিলাম, শেরিফকে আমিই সামলাব—'

রয় আমার পক্ষে নিয়ে উত্তর দিল, 'তা হোক। আমি যদি শেট হতাম, তবে আমিও ভয় পেতাম। তা ছাড়া শেটের ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল।'

'ওঃ, তোমরা পুরুষেরা দেখছি সব সমান!' লোলা এগিয়ে গিয়ে মুরগিগুলোর দিকে আবার মনোযোগ দিল।

রয় মুচকি হেসে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'সত্যি রয়, তোর জন্যই আজ এই বিপদের হাত থেকে—'

রয় থমকে ঘুরে তাকাল, 'তুই এমনভাবে বলছিস, যেন তুই আমার জন্য কোনদিন কিছু করিসনি।—আরে শালা, কৃতজ্ঞতাবোধ বলেওতো কিছু একটা আছে!'

ও চলে যেতেই লোলার কাছে গেলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ ওকে লক্ষ্য করলাম তারপর বললাম, 'আজ রাতে আমার আর সিনেমায় যাওয়া হবে না, লোলা।'

লোলা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে ফিরে তাকাল, 'তার মানে?'

'আমি আজ আর ওয়েন্টওয়ার্থে যাব না।'

'কেন?'

'বুঝতেই তো পারছ! শেরিফ যদি হঠাৎ আমাদের দেখে ফেলেন, তবে?' ওর নির্বুদ্ধিতার আমার ভীষণ রাগ হল, 'শেরিফ এখন জানেন রয়ই প্যাটমোর। তাহলে, তার সঙ্গে দেখা হলে আমার পরিচয় কি দেব?'

'তার সঙ্গে দেখা যে হবেই, একথা তুমি ভাবছ কেন?'

'কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে আমি নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাই না—এবং তুমি সেটা ভালোভাবেই জান।'

'তাতে কী হয়েছে? ওই পেটমোটা শেরিফটার সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে তুমি ওয়েন্টওয়ার্থে যাবে না? এর কোন মানে হয়?'

'তুমি বুঝতে পারছ না—শেরিফের মাথায় যদি একবার ঢোকে, এখানে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে, তাহলে বিপর্যয়ের কিছু বাকি থাকবে না।' গলার স্বর নীচু করে লোলাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'মনে কর, যদি ও জেনসনের দেহ খুঁজে পায়? তখন তুমি কি করবে? পারবে এমন নিশ্চিন্ত থাকতে?—আমি জানি তুমি পারবে না—কারণ জেনসনকে তুমি গুলি করেছ।'

'তাই বুঝি? তোমার ওই শেরিফ সেটা প্রমাণ করতে পারবে?'

অবাক চোখে লোলার দিকে চেয়ে রইলাম। মনে মনে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করলাম। লোলা বলে কী!

'যাকগে, এসব কথা এখন বাদ দাও। আমরা দুজনেই যখন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি, তখন দুজনেই সাবধান থাকতে হবে। তুমি চাইলেও কোন ঝুঁকি আমি নিতে পারব না।'

লোলা নিস্পৃহভাবে ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে আবার কাজে মন দিল, 'ঠিক আছে—আমি তাহলে একাই যাব।'

ওর কথার একটা চাপা অভিমান লক্ষ্য করলাম। তাই এগিয়ে গিয়ে ওকে কাছে টেনে নিলাম, ‘রাগ করো না, লক্ষ্মীটি—কেন বুঝতে পারছ না—’

লোলা আমার হাত ছাড়িয়ে নিল, ‘কাজের সময় বিরক্ত করো না। তোমার কোন কাজ না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে।’

‘ঠিক আছে, তোমার যা খুশি তাই কর।’

লোলা মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল—ওর সবুজ চোখদুটো যেন পাথরে খোদাই করা—বরফের মতো শীতল, নিষ্প্রাণ। ‘শেট, আজ রাতে বাংলোয় আমি একা থাকতে চাই। তুমি রয়ের ঘরে গিয়ে থেকো।’

‘শোন, লোলা—’

‘আমি কি বলছি, তা আশা করি বুঝতে পারছ? তুমি হয়তো ভুলে গেছ, আমিই এ জায়গাটার মালিক—তুমি নও। রয়ের সঙ্গে তোমার যখন এতই বন্ধুত্ব, তো যাও—ওর কাছে গিয়েই রাত কাটাও।’

লোলার চোখের তারায় অতলান্ত ঘৃণার ছায়া। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। বিশ্বাসই হতে চাইল না, লোলা আমাকে এই কথাগুলো বলছে।

‘ঠিক আছে, আমাকে যদি তোমার এত অসহ্যই মনে হয়, তবে—’

‘আর বিরক্ত করো না—যাও। কোন পুরুষত্বহীন কাপুরুষের সঙ্গে আমি রাত কাটাতে চাই না। যাও, রয়ের সঙ্গে গল্প কর গিয়ে।’

রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। সশব্দে বন্ধ করে দিলাম ঘরের দরজা।

লোলার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার শেষ হল সেই দিনই। কিন্তু আশ্চর্য, রয়ের সদাহাস্যময় উপস্থিতি আমাকে ভুলিয়ে দিল এই বিচ্ছেদের কথা। লোলার সঙ্গ আমার কাছে আর আগের মতো অপরিহার্য ঠেকল না। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতি রাতে যখনই বাংলোয় গেছি, অনুভব করেছি জেনসনের অশরীরী অপস্থিতি। লোলার মোহময় সান্নিধ্য আর তত ভালো লাগেনি। জেনসনের বিছানায় শোওয়ামাত্রই মনে হয়েছে, যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি। কিন্তু পরক্ষণেই লোলার উষ্ণ আলিঙ্গনে পারিপার্শ্বিক পৃথিবী লুপ্ত হয়েছে মনের আকাশ থেকে। তবু রোজ রাতে বাংলোয় ঢুকবার সময় কখনও কখনও মনে হয়েছে, ফিরে যাই।

সুতরাং, লোলার সিদ্ধান্ত একরকম আমাকে খুশিই করল। জিনিসপত্র সব বাংলো থেকে সরিয়ে রয়ের ঘরে নিয়ে তুললাম। ও আমার অবস্থা দেখে ঠাট্টা করতে ছাড়ল না, ‘কিরে, আবার তাহলে পুনর্মূষিক ভব?—সত্যি, মেয়েদের মন বুঝে ওঠা ভীষণ কষ্টকর। এখন বুঝতে পারছি, জেনসন কেন লোলাকে ছেড়ে কেটে পড়েছে। মাইরি, এরকম খাণ্ডারণী বউকে নিয়ে ঘর করা মুশকিল।—শালা, আমি একা আছি—বেশ আছি।’

সারাটা দিন লোলা মুখ গোমড়া করে রইল। আমার সঙ্গে একটা কথাও বলল না। বেলা দশটার সময় ও গাড়ি নিয়ে ওয়েন্টওয়ার্থে চলে গেল। লোলা চলে যাওয়ার পর বাংলো থেকে আমার অবশিষ্ট জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এলাম। কাজ করতে করতে মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি। ভেবেছি, দু-এক দিনেই লোলা ওর ভুল বুঝতে পারবে—আমার কাছে আবার ফিরে আসবে।

রয় বাইরে একটা গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাংলোয় আমি একাই ছিলাম। হঠাৎ .৪৫ রিভলভারটার কথা মনে পড়ায় ড্রয়ারের কাছে গেলাম। একদম উপরের ড্রয়ারটা খুলতেই চমকে উঠলাম। চোখের সামনে যেন একটা কালো পর্দা নেমে এল। কোন এক অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিলাম।

.৪৫ রিভলভারটা ড্রয়ারে নেই।

একমাত্র লোলা ছাড়া ওটা কেই বা নেবে! সুতরাং সারা ঘর আঁতিপাঁতি করে খুঁজলাম। যেন রিভলভারটার উপরেই নির্ভর করছে আমার জীবনমরণ।

সারা বাংলো তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওটার সন্ধান পেলাম না। রিভলভারটা যেন সম্পূর্ণ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু রিভলভারটায় লোলার কি প্রয়োজন! নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবেই কি ও .৪৫টা সরিয়েছে!

বাকিদিনটুকু ও রিভলভারের চিন্তাতেই কেটে গেল। কাজ করতে করতে খালি ভেবেছি .৪৫টার কথা। খুঁজেছি ওটাকে সরানোর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ—কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়েছে। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে লোলার ঘৃণাভরা কুটিল চোখ। মনে হয়েছে, আমাদের অন্তরঙ্গতার দিনগুলো মিথ্যে স্বপ্ন। লোলা ওর চতুর অভিনয়ে আমাকে বোকা বানিয়েছে।

রাত একটা পর্যন্ত রয়ের সঙ্গে বাইরে কাটালাম। কিন্তু লোলার ফিরবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। অবশেষে কিছুটা হতাশ হয়েই রয়কে নিয়ে ঘরে ফিরে চললাম।

আমার বিছানা ঠিক জানালার পাশে। রাত প্রায় তিনটের সময় একটা গাড়ির শব্দ কানে আসায় জানালা দিয়ে উঁকি মারলাম। দেখি লোলার মার্কারি বাইরে বালির উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর লোলা শ্লথ পায়ে ফিরে চলেছে বাংলোয়। একবার ইচ্ছে হল, বাংলোয় গিয়ে রিভলভারের কথাটা ওকে জিগ্যেস করি—কিন্তু কি ভেবে সে ইচ্ছে ত্যাগ করলাম, কাল সকালেই ওকে রিভলভার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করব। আবার শুয়ে পড়লাম, কিন্তু রাতে ঘুম এল না।

পরদিন সকালে লোলা যখন খাবার ঘরে এল, তখন এগারোটা বাজে। রয় আলুর খোসা ছাড়ানোয় ব্যস্ত ছিল, আর আমি গত রাতে এঁটো প্লেটগুলো ধুয়ে রাখছিলাম। লোলা গম্ভীরমুখে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। রয়ের দিকে চেয়ে একবার হাসল। আমাকে যেন দেখেও দেখল না।

রয় আমাকে লক্ষ্য করে মুচকি হেসে চোখ টিপল। তারপর হাতের কাজ ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াল—চোখের একটা ইশারা করে এগিয়ে চলল দরজার দিকে। রয় চলে যেতেই লোলাকে প্রশ্ণ করলাম, ‘রিভলভারটা কোথায়?’

লোলা স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল,‘ওটা আমি লুকিয়ে ফেলেছি।’

‘কোথায়?’

‘ওয়েন্টওয়ার্থে সাবার পথে রাস্তার পুঁতে ফেলেছি।—কেন, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে?’

লোলা মিথ্যে বলছে কি সত্যি বলছে কে জানে!

‘কেন— পুঁতে ফেলেছ কেন?

‘তোমার তো কারণটা বোঝা উচিত, শেট। পুলিশ যদি রিভলভারটা খুঁজে পেত, তাহলে কি আমাকে ছেড়ে দিত মনে করছ? ওরা সহজেই বুঝতে পারত, ঐ রিভলভারের গুলিতেই কার্ল মারা গেছে, তাই না?’

লোলার কথাগুলো পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে। বার বার মনে হচ্ছে, ও হয়তো মিথ্যে বলছে।

‘আর—শেট, আমি আর একটা কথা ভাবছিলাম—’

‘কী কথা?’

‘এখন তোমার বন্ধু রয় তো এখানে রয়েছে, সুতরাং এ জায়গা দেখাশোনা করতে তোমার আর অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তাই ঠিক করেছি, আমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব।’

‘সেটা কী ঠিক হবে?’

‘কেন, ঠিক না হওয়ার কী আছে? তোমাকে তো আমি প্রথম থেকেই বলেছি, এখানে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। এতদিন কোন লোক না পাওয়ায় তোমাকে একা রেখে যেতে পারিনি। কিন্তু এখন রয় এসেছে। সুতরাং, তোমার আর অসুবিধে হওয়ার কথা নয়—’

‘শেরিফ যখন শুনবে, তুমি এ জায়গা ছেড়ে চলে গেছ, তখন কি সন্দেহ করবে ভেবে দেখেছ?’

‘কিছুই সন্দেহ করবে না। তুমি ওকে বলবে, আমি কার্লের কাছে গেছি। আর এখানকার দেখাশোনার ভার তোমার আর রয়ের ওপরেই রয়েছে।’

‘তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, লোলা। এখানকার প্রতিটি পুলিশ-ফাঁড়িতে আমার চেহারার বিবরণ—এমন কি ফটো পর্যন্ত রয়েছে। তুমি চলে গেলে আমার পক্ষে নিরাপদে থাকা অসম্ভব। অতএব, এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া তোমার হবে না।’

লোলার চোখজোড়া হায়েনার মতো জ্বলজ্বল করে উঠল, ‘কার্লের সিন্দুক তোমাকে খুলতেই হবে, শেট—কারণ আমার টাকা আমি চাই। টাকা পেলেই, আমি এ সপ্তাহের শেষে ‘‘পয়েন্ট অব নো রিটার্ন’’ ছেড়ে চলে যাব। দেখি কে আমাকে আটকায়!’

‘ওসবে কোন লাভ হবে না, লোলা। তিনটে কারণে এ জায়গা ছেড়ে তোমার যাওয়া চলবে না। প্রথমত, এখানে সবসময় আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে। তুমি চলে গেলে সবাই মনে করবে রয় একাই এ জায়গা দেখাশোনা করছে। আর তাতে শেরিফ যদি সন্দেহ করে বসে, তবে অবাক হবার কিছুই নেই। তারপর শেরিফ এসে আমাকে দেখলেই ষোলকলা পূর্ণ হবে। দ্বিতীয়ত জেনসনের মৃতদেহ আশেপাশেই কবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ যদি খোঁড়াখুঁড়ি করে সে মৃতদেহ খুঁজে পায়, তবে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তোমাকে জেলে নিয়ে ঘানি ঘোরাতে হবে। কারণ কার্লকে গুলি যখন তুমিই করেছ, তার ফলও তোমাকেই ভোগ করতে হবে। আর তৃতীয়ত, সিন্দুক আমি খুলছি না—এবং টাকাও তুমি পাবে না। কারণ, টাকা পেয়ে গেলেই তুমি আমার বিপদ ডেকে আনবে। হয়তো পুলিশকে বলবে, জেনসনকে আমিই খুন করেছি। কিন্তু এ-কথাটা তুমি যাতে পুলিশকে না বলতে পার, সেদিকে আমি বিশেষ যত্ন নেব, বুঝেছ।’

আমার উত্তরের প্রতিটি শব্দ মিছরির ছুরির মতো লোলার গায়ে কেটে বসল। ভেবেছিলাম, রাগে হতাশায় অন্ধ হয়ে ও হয়তো ভীষণ কিছু একটা করে বসবে। কিন্তু লোলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল গায়ের রং ফ্যাকাশে, চোখে অন্ধকারের ছায়া, মুখে কষ্টকৃত প্রশান্তির ভাব।

‘এ ব্যাপারে এই কি তোমার শেষ কথা, শেট?’ শান্ত স্বরে লোলা প্রশ্ন করল। ওর চোখের দৃষ্টি আমার চোখে স্থির।

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো। তিন-তিনটে বছর এই হতচ্ছাড়া জায়গায় আমি পড়ে থেকেছি—ধৈর্য ধরে সুযোগের অপেক্ষা করেছি। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে আমি পারব। অধৈর্য হওয়ার মতো ছেলেমানুষ আমি নই। এ জায়গা ছেড়ে চলে আমি যাবই—আর যখন যাব, তখন তোমার হয়তো দুঃখ হবে পরিণতির কথা ভেবে। হয়তো মনে হবে, আমাকে এখন যেতে দিলেই ভালো করতে—’

‘তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, লোলা? তবে শোন, রয় যে কার্লের সিন্দুক খুলতে পারবে না, তা নয়। কিন্তু ভুলক্রমেও ওকে দিয়ে সিন্দুক খোলানোর কথা চিন্তা করো না। কারণ, রয় যদি সিন্দুক খুলে দেখে ওতে কি আছে, তবে সব টাকা ও-ই নিয়ে নেবে। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্তে থেক। ভেব না, ও তোমার যৌবনের মায়াজালে ধরা দেবে। তা যদি হত, তবে আমি রয়কে এখানে চাকরি দিতাম না। ওকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি। মেয়েদের উপস্থিতিই রয়ের কাছে অসহ্য এবং বিরক্তিকর। তুমিও তো বারকয়েক চেষ্টা করে দেখেছ, কোন লাভ হয়েছে কি? রয়ের জীবনে সবচেয়ে প্রথমে যার স্থান, তা হল টাকা। সিন্দুক খুলে টাকাগুলো দেখলেই ও তোমাকে খুন করবে। তারপর সমস্ত টাকা নিয়ে চলে যাবে। ও টাকা তুমি আর কোনদিন পাবে না। অতএব, তোমার যদি এতই টাকার প্রয়োজন থাকে, তবে যাও—রয়কে সিন্দুক খুলতে বলো।’

কথা শেষ করে বাইরে পা বাড়ালাম। লোলা তখনও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে।

রয় বাইরে পাম্পের কাছটা ঝাঁট দিচ্ছিল, আমাকে আসতে দেখেই মুখ তুলে দেঁতো হাসি হাসল, 'কীরে, মানভঞ্জন-পালা শেষ হল?'

'উহুঁ। লোলা বড় কঠিন ঠাঁই।' আমি নতুনভাবে, রয়কে দেখতে লাগলাম। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম—সত্যিই কি রয়কে বিশ্বাস করা চলে! ও যদি এতদিনকার সংযম ভুলে লোলার যৌবনের ফাঁদে পা দেয়! কিন্তু ওর নির্বিকার, কঠোর ভাব আমাকে আশ্বস্ত করল। মনে হল রয়কে আমি বিশ্বাস করতে পারি।

'মেয়েদের সঙ্গে কখন নরম ব্যবহার করবি না, শেট। তাহলেই ওরা পেয়ে বসবে। শুধু শুধু একটা মেয়ের জন্য তুই নিজে কষ্ট পাবি। ছেড়ে দে, ও নিয়ে আর ভাবিস না। লোলার সঙ্গে তোর যদি বনিবনা না হয়, তো অন্য মেয়ে দেখ। বাজারে মেয়ের অভাব নেই।'

'তুই ঠিকই বলেছিস, রয়—তবে আমার কি মনে হয় জানিস? এবার লোলা হয়তো তোর সঙ্গে ভাব জামাবার চেষ্টা করবে। তোমাকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম। দেখিস, সাবধানে থাকিস।'

রয় হেসে উঠল, 'ভীষণ মজার ব্যাপার তো! ঠিক আছে, আসুক লোলা। এ থেকে ওর বিশেষ সুবিধে হবে না। তুই তো আমাকে জানিস—কিন্তু ওর উদ্দেশ্যটা কি বল্ তো? আমার সঙ্গে ভাব জমিয়ে, তোকে উল্লু বানাবার চেষ্টা? না অন্য কিছু?'

একবার মনে হল, রয়কে সিন্দুকের কথা বলে দিই। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ইচ্ছে ত্যাগ করলাম। কারণ, রয় যদি একবার জানতে পারে সিন্দুকে কি আছে, তবে ওর পক্ষে স্থির থাকা মুশকিল হবে। হয়তো সিন্দুক খোলার জন্য আমাকেই চাপ দেবে। আর যাই করি, সিন্দুক আমি খুলছি না!

'সম্ভবত আমাকে একটু ঈর্ষাকাতর করে তুলতে চায়—অন্য কিছু নয়।'

রয় আপনমনেই মাথা নাড়ল, 'ওঃ, মেয়েদের পক্ষে সব সম্ভব!'

পর পর তিনটে দিন লোলা একাই কাটাল। আমার সঙ্গে কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ করে দিল। কিন্তু আমার তাতে একটুও অসুবিধে হল না। কারণ, এখন রয়ই হল আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

রোজ রাতে বাইরের উঠোনে আমরা তাস খেলে সময় কাটাতাম। মাঝে-মাঝে দরকার পড়লে খেলা ছেড়ে উঠে গিয়ে গাড়িতে তেল-মোবিল দিয়ে আসতাম। তারপর ফিরে এসে আবার শুরু করতাম। খেলাটা নিরামিষ না হলেও, টাকা-পয়সার লেনদেন ঠিক তখনই হত না। একটুকরো সাদা কাগজে আমরা পরস্পরের দেখাপাওনার হিসেব টুকে রাখতাম।

একেই রয় আমার চেয়ে ভালো খেলে, তার উপরে ভালো তাস পড়ায় ও রোজই জেতে। চারদিনের দিন রাতে খেলার সময় ও হঠাৎ ঠাট্টার সুরে বলল, 'শেট, এর মধ্যেই তোর পাঁচশো ডলার দেনা হয়ে গেছে। এখন থেকে সাবধান না হলে কিন্তু বিপদে পড়বি।'

'ভয় নেই, টাকা ঠিক পেয়ে যাবি।' ওর দিকে চেয়ে হাসলাম, 'আপাতত খেলায় মন দে। নয়তো বেশিক্ষণ আর জিততে পারবি না।'

'জানিস, আমি এই পাঁচশো ডলার পেলে কী করব? তাস ভাঁজতে ভাঁজতে রয় বলল, 'সামনের সপ্তাহেই রেস শুরু হচ্ছে। একটা দারুণ ঘোড়া ওই রেসে দৌড়চ্ছে। ওটার পেছনে যদি এই পাঁচশো ডলার লাগাতে পারি, তবে আমার পাঁচ হাজার ডলার আমদানি ঠেকায় কে!' উত্তেজনায় রয় শিস দিয়ে উঠল, 'চিরকাল আমি একটা বড়সড় দাঁও মারার আশঙ্কায় অপেক্ষা করেছি। এতদিনে বোধ হয় আর আমার সে আশা পূর্ণ হবে।'

আমার মনে পড়ল সিন্দুকের পড়ে-থাকা এক লাখ ডলারের কথা। রয় যদি ওই টাকার কথা জানত, তবে কি ভাবত কে জানে।

'মনে কর তুই এত টাকা পেলি। তারপর ওই টাকা দিয়ে কী করবি?'

রয় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, 'সেসব আমি অনেক আগেই ভেবে রেখেছি, শেট। পাঁচ হাজার ডলার পেলে আমি একটা নামী ক্যামেরা-কোম্পানির অংশীদার হয়ে যেতে পারব। সেই প্রতিষ্ঠানের মালিকের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আছে। তার বর্তমানে আর কিছু মূলধনের প্রয়োজন।—আর আমি যদি হাজার পনেরো ডলার দিতে পারি, তো একাই মালিক হয়ে বসতে পারব। ওফ শেফ, যদি হাজার পনেরো ডলার পেতাম।

'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ও-সব ক্যামেরার ব্যবসা-ট্যাবসা করে কখনও কেউ বড়লোক হতে পারেনি—পারবেও না। বিশেষ করে ওই সামান্য পুঁজি নিয়ে।'

'আমি ঠাট্টা করছি না, শেট। সত্যি বলছি, পাঁচ হাজার ডলারে বিশেষ সুবিধে হবে না—কিন্তু পঞ্চাশ হাজার পেলে আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

রয়ের কথায় চেয়ারে নড়েচড়ে বসলাম। অস্বস্তিভরে জবাব দিলাম, 'পঞ্চাশ হাজার ডলার! অত টাকা কোত্থেকে পাবি, শুনি?—ও-সব আজগুবি চিন্তা ভুলে যা।'

'ইচ্ছে করলে ছ-মাসেই আমরা টাকাটা যোগাড় করতে পারি, শেট।' রয় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার চোখে চোখ রাখল, 'তোকে যে-ব্যবসার কথা বলেছিলাম, মনে আছে?—আমরা হেলিকপ্টারে করে সেইসব লোকদের এখানে নিয়ে আসব। তারপর এখান থেকে তাদের ট্রপিকা স্প্রিংস আর ওয়েন্টওয়ার্থে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। তাহলে আর দেখতে হচ্ছে না। দু-দিনের আমরা লাল হয়ে যাব।'

'রয়, মনে আমার আছে। কিন্তু আমার উত্তরটা বোধহয় তোর মনে নেই।' দৃঢ়স্বরে রয়কে জানালাম, 'কোন ঝামেলায় আমি নিজেকে আর জড়াতে চাই না। তোর যদি এখানে ভালো না লাগে, তো খোলাখুলি বল্। তুই থাকাতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তুই যা চাইছিস, তা আমি এখানে হতে দেব না। তোকে অন্য জায়গা দেখতে হবে।'

রয় তাস বাঁটতে শুরু করল। ও মুখ নীচু করে তাস দিতে থাকায় ওর মুখের ভাব দেখতে পেলাম না কিন্তু কানে এল ওর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'সেটা তোর খুশি। তবে আমাকে বেশ কিছু টাকা জোগাড় করতেই হবে। এ ছাড়া বড়লোক হওয়ার আর তো উপায় দেখছি না। হয়তো আরও কিছুদিন এখানে থাকতে পারি, কিন্তু তার বেশি নয়—অনন্তকাল ধরে আমি এখানে পড়ে থাকতে পারব না। কিছু টাকা রোজগারের উপায় আমাকে যে করে হোক বের করতেই হবে।'

'বোকার মতো কাজ করিস না!' তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলাম, 'তুই প্রথমবারের মতো আবার বিপদে পড়বি। এখানে তোর অসুবিধেটা কী? নিজের খুশিমতো কাজ করছিস, থাকছিস, খাচ্ছিস—কেউ কোন কথা বলতে আসছে না। কথায় বলে না, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়! তোর টাকার লোভ বড় বেশি। যদি একবার ফার্নওয়ার্থ থেকে ঘুরে আসতিস—'

'সে-কথা আমি জানি শেট।' আমাকে হাত তুলে বাধা দিল রয়, 'কিন্তু ফার্নওয়ার্থে তোকে যেতে হত না। তুই সেদিন বোকার মতো রাস্তার দিকে ছুটেছিলি বলেই—'

'বাদ দে ওসব কথা। যদি খেলার ইচ্ছে থাকে তো খেল।'

আমরা আরও কয়েক দান খেললাম। খেলার প্রতি রয়ের মনোযোগ না থাকায় শেষ দান ক-টা আমিই জিতলাম। বেশ বুঝলাম রয় তখনও সেই ব্যবসার কথাই ভাবছে। একসময় হঠাৎ ও হাতের তাস টেবিলের উপর ফেলে দিল, 'ছেড়ে দে, আজ আর খেলব না। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, যাই শুয়ে পড়ি গিয়ে।'

আজ রাতে কাজ করার দায়িত্ব আমার। কিন্তু অন্যান্য দিন রয় সবসময় আমার কাছেই থাকে। গাড়ির ভিড় কমলে আমরা একসঙ্গেই শুতে যাই। কিন্তু আজ এই প্রথম একা শুতে যাচ্ছে।

ওকে মনের কথা না জানিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বললাম, 'ঠিক আছে—যা।'

রয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল, 'সকালে আবার দেখা হবে, শেট। আমি চললাম।'

রয় হেঁটে চলল ওর ঘরের দিকে। চুপচাপ বসে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। একটু পরেই ওর ঘরের আলো জ্বলে উঠল। চোখ ফিরিয়ে দেখি, বাংলোয় লোলার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

দুটো আলোকিত জানালা আমার কাছে বয়ে নিয়ে এল এক অনুচ্চারিত ইঙ্গিত। মনে হল, রয় হঠাৎ আমার বিপক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ও যেন আমাকে একা ফেলে রেখে হাত মিলিয়েছে লোলার সঙ্গে। মনে হল এই 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এ আমি বড় একা—বড় নিঃসঙ্গ।

বার

রয় সম্বন্ধে আমার রাতের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, পরদিন সকালেই সেটা বুঝতে পারলাম। কারণ দেখলাম, ওর ব্যবহার আবার সেই আগের মতোই হাসি খুশি ও উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

গতকাল ওর সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ও আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কাল সারারাত শুয়ে শুয়ে রয় হয়তো এই ব্যবসার কথাই ভেবেছে শেষে হয়তো বুঝেছে আমার কথাই ঠিক—ওসব ঝামেলার জড়িয়ে আখেরে কোন লাভ হবে না।

রোজকার মতো আজও সন্ধেবেলা আমরা তাস নিয়ে বসলাম। নিজেদের মধ্যে হার-জিত নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করলাম। গতদিনের আলোচনা বাদ দিয়ে অন্য সবরকম আলোচনাই হল। রয়ও দেখলাম সে-কথা একেবারেই ভুলে গেছে।

রয় আবার ওর পুরনো হাসি-খুশি মেজাজ ফিরে পাওয়ার অনেকটা স্বস্তিবোধ করলাম। তাছাড়া নিশ্চিন্ত হওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। তা হল, আমার প্রতি লোলার ব্যবহার আবার ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠেছে। সারাদিনে বার দুয়েক ও আমার সঙ্গে কথা বলেছে—যদিও পুরোপুরি ব্যবসা-সংক্রান্ত কথা—তবু কথা যে বলেছে, এতেই আমি খুশি।

রাত প্রায় দশটার সময় লোলা বাইরের বারান্দায় এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল আমাদের তাস খেলা।

ওকে দেখেই আহ্বান জানালাম, 'চলে এসো, লোলা। একটা চেয়ার নিয়ে বসে যাও।'

'না, শুধু শুধু তাস খেলে আর সময় নষ্ট করব না। আমি শুতে চললাম। কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে। ওয়েন্টওয়ার্থে গিয়ে অনেক কেনাকাটা করার আছে। তোমাদের মধ্যে একজন যদি আমাদের সঙ্গে যাও তো ভালো হয়।'

একটু অবাক হলাম। কারণ, এ পর্যন্ত কেনাকাটার ব্যাপারগুলো লোলা একাই সেরেছে। তাই আজ ওর এই অনুরোধে মনে সন্দেহের দোলা লাগল। এর পিছনে লোলার কী কোন উদ্দেশ্য আছে?—কে জানে!

আমার ইতস্তত করার সুযোগে রয় বলে উঠল, 'তোর যদি অসুবিধে থাকে, তো বল্—আমিই না হয় যাব। এখানে এসে থেকে আজ পর্যন্ত কোনদিনও তো কোথাও গেলাম না। ওয়েন্টওয়ার্থে গেলে আমার সুবিধেই হবে। কিছু জিনিসপত্র কেনার আছে—কিনে আনতে পারব। কী বলিস?'

আমি চমকে রয়ের দিকে তাকালাম। ও একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। লাইটারের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর মুখ। কিন্তু সে-মুখের ভাব নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, অভিব্যক্তিহীন। তাহলে কি এই অস্বস্তি নিতান্তই আমার দুর্বল মনের কল্পনা?

'ঠিক আছে, যাবি তো যা না। তবে দুপুরের আগেই ফিরে আসিস। নয়তো আমি একা সামলাতে পারব না।'

'আমি কিন্তু সকাল আটটায় বেরোয়। শুভ রাত্রি।' বিদায় জানিয়ে লোলা বাংলোয় ফিরে চলল।'

'গোটাকয়েক জামা, আর একজোড়া জুতো আমাকে কিনতে হবে,' হাতের তাসে চোখ বোলাতে বোলাতে রয় বলল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মন থেকে মিলিয়ে গেল সন্দেহের ছায়া। সত্যিই তো, আজ পর্যন্ত রয় একদিনের জন্যও কোথাও যায়নি। তা ছাড়া জামা-জুতোর প্রয়োজন তো প্রত্যেকেরই হতে পারে। কিন্তু তবু মনে হল, লোলার সঙ্গে ও না গেলেই পারত।

লোলার সঙ্গে রয়ের যাওয়াটাকে আমি কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিতে পারছি না। কারণ আমি নিশ্চিত, সুযোগ পেলেই লোলা ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করবে তার উপর এখান থেকে ওয়েন্টওয়ার্থে যাবার কুড়ি মাইল রাস্তা লোলা চুপচাপ বসে কাটাবে বলে তো মনে হয় না!

'আরে, ঘাবড়াস না।' রয় হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুর এক চাপড় মারল, 'আমি জানি, তুই কি ভাবছিস। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাক, লোলা আমার সঙ্গে বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না।'

কাষ্ঠহাসি হেসে জবাব দিলাম, 'না না—এতে ভাববার কী আছে।'

মুখে একথা বললেও, পরদিন সকালে যখন দেখলাম রয় আর লোলা মার্কারি নিয়ে রওনা হচ্ছে, তখন আর একবার নিঃসঙ্গতাবোধ আমাকে আঁকড়ে ধরল। মনের কোনায় ঘুরতে লাগল একই সন্দেহ, একই আশঙ্কা।

এসব চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্টেশন-ওয়াগানের ইঞ্জিন নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু তবু কি স্থির হয় আমার অশান্ত মন! লোলা ও রয়ের চিন্তা ছাড়া আর-কোন কথা আমার মনেও আসছে না। শেষে আমার অবস্থাও কী হবে সেই একচক্ষু হরিণের মতো!

এই সময় একটা বড় ট্রাক তেল নেবার পাম্পগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল। ট্রাকে সার বেঁধে সাজানো বড় বড় কাঠের প্যাকিং বাক্স। ট্রাক-চালক একজন মোটাসোটা বয়স্ক লোক। মাথায় সোনালী চুলের কোথাও কোথাও শুভ্রতার আভাস। ভারী মুখমণ্ডল রোদের তাপে রক্তবর্ণ। মাথায় একটা স্টেটসন হ্যাট।

ট্যাঙ্কে তেল দিচ্ছি, ড্রাইভারটা হঠাৎ ট্রাক থেকে নেমে এল। একটা ময়লা রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে লোকটা কৌতূহলভরে আমার দিকে তাকাল, 'তুমি বোধহয় এখানে নতুন এসেছ, তাই না?—জেনসন গেল কোথায়?'

লক্ষ্য করলাম, জেনসনের মতো এ লোকটাও সুইডেনের অধিবাসী। সুতরাং, এ যদি জেনসনের বন্ধুও হয়, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। তাই, খুব সতর্কভাবে ওকে জেনসনের অ্যারিজোনা যাওয়ার গল্পটা শোনালাম।

কী কারণে জানি না, লোকটা এই গল্পটা ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করল না। ওর মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠল, চোখদুটো হয়ে উঠল সংকীর্ণ।

'জেনসন কোনদিন এ জায়গা ছেড়ে গেছে বলে তো মনে পড়ে না। জান, গত বিশ বছর ধরে আমি এ রাস্তায় নিয়মিত যাতায়াত করি। যতবারই গেছি, কার্লের সঙ্গে প্রতিবারই আমার দেখা হয়েছে।—অ্যাজিজোনায় নতুন পেট্রল-পাম্প খুলে ওর যে কি সুবিধে হবে কে জানে!—তাহলে কি ও আর এখানে ফিরবে না?'

'হ্যাঁ, ফিরবেন। এখানকার সব-কিছুগোছগাছ করার জন্য তাকে একবার আসতে হবে।'

'ওর বউ কি ওর সঙ্গে গেছে?'

'না, এখন উনিই এসব দেখাশোনা করছেন। আর আমি তাকে সাহায্য করি।'

পেট্রল-ট্যাঙ্কের ঢাকনা লাগাচ্ছি, লোকটা হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কার্লের বউয়ের পরিচিত কেউ?'

'না, আমি এখানে চাকরি করি। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'না—বলছিলাম—জেনসনের বউয়ের স্বভাব-চরিত্র খুব একটা ভালো নয়। যখন প্রথম মেয়েটাকে দেখলাম যে জেনসনকে বিয়ে করে এখানে বসে আছে—তোমাকে কি বলব ভাই, ভীষণ অবাক হয়ে

গেলাম। কারণ মেয়েটাকে আমি আগে থেকেই চিনি।' লোকটা ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট তৈরি করতে লাগল। আমি হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, যাতে ওর একটা কথাও আমার কান না এড়ায়। লোকটা ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল, 'বছর পাঁচেক আগেকার কথা। তখন মেয়েটা কারসন সিটিতে থাকত। ফ্রাঙ্ক ফিনি নামে একটা লোককে ও বিয়ে করেছিল। ফিনি একটা গাড়ির কারখানা দেখাশোনা করত, আর সেই সঙ্গে একটা স্ন্যাক-বারের ম্যানেজারও ছিল। জান, শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল?'

রুদ্ধশ্বাসে লোকটার কথা শুনতে লাগলাম। কারণ লোলার অতীত ইতিহাস বর্তমানে আমার কাছে অমূল্য।

'একদিন ফিনিকে স্ন্যাক-বারে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। ওর ডান হাতে ধরা ছিল একটা রিভলভার। আর মাথাটা ফেটে চুরমার হয়ে সারা মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে। লোলার বক্তব্য—ও নাকি ওপরের ঘরে কাজে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় নিচের তলা থেকে রিভলভারের নিকট শব্দ ওর কানে আসে। তারপর ও নীচে এসে দেখে, ফিনি মরে পড়ে রয়েছে। কাউন্টারের ওপর যে ক্যাশবাক্স ছিল, দেখা গেল তা থেকে প্রায় দু হাজার ডলার অদৃশ্য হয়েছে। সকলের মোটামুটি ধারণা হল ফিনি প্রায় ক্যাশবাক্স থেকে দোকানের টাকা সরাত। তাই জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। যা হোক, সেই হারিয়ে-যাওয়া টাকাগুলো আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু পুলিশের ধারণা, সে-টাকাটা নাকি লোলাই নিয়েছিল। অথচ তার সপক্ষে কোন প্রমাণই ওরা দাখিল করতে পারল না। একজন অফিসার সন্দেহ করল, লোলাই হয়ত ফিনিকে গুলি করেছে। কারণ, ওরা নাকি প্রায়ই এটা-সেটা নিয়ে তুমুল ঝগড়া করত। কিন্তু সেটাও প্রমাণ করতে পারল না। এ ঘটনার কিছু দিন পরে লোলা কারসন সিটি ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেল।—তাহলেই বুঝে দেখ, যখন দেখলাম ও এখানে এসে জেনসনের মতো একজন লোককে বিয়ে করে বসেছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ অবাক হলাম!'

'আশ্চর্য আমি তো কিছুই জানতাম না!' চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে ওকে বললাম।

'না জানবারই কথা। লোলা তো আর এ গল্প ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে না। আশা করি জেনসন ভালোই আছে। —আচ্ছা ভাই, ও সত্যি সত্যি অ্যারিজোনাতে আছে তো?'

হঠাৎ কেমন শীত-শীত করে উঠল। লোকটা বলে কী! এ যে দেখছি রিক্সের থেকেও বিপজ্জনক!

'হ্যাঁ, উনি অ্যারিজোনাতে ভালোই আছেন।' অসীম চেষ্টায় ওর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির মোকাবিলা করলাম, 'এই তো সেদিনই মি. জেনসনের একটা চিঠি এসেছে। লিখেছেন নতুন পেট্রল-পাম্প নিয়ে উনি বেশ ভালোই আছেন। হয়তো সামনের বারই আপনার সঙ্গে মি. জেনসনের দেখা হবে।'

লোকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, 'জেনসন ভালো আছে শুনে খুশি হলাম, ভাই। নয়তো, তুমি প্রথমেই যখন বললে জেনসন এখানেই নেই, আমি তো ভাবলাম—মানে—ও হয়তো মারাই গেছে। যাক, ও ভালো আছে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।'

আমি তখন ঘামতে শুরু করেছি। কোনরকমে ওকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, ফিনিকে যে ওর স্ত্রী—মানে মিসেস জেনসন—গুলি করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই না?'

লোকটা হঠাৎ কেমন অস্বস্তি বোধ করল, 'না, তা নেই—কিন্তু এ নিয়ে অনেক কথা উঠেছিল।'

'কিন্তু আমি যতদূর জানি, মি. জেনসন মিসেস জেনসনকে নিয়ে বেশ সুখেই আছেন। আপনার এই কথাগুলো মি. জেনসনের কানে গেলে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হবেন। অতএব, এ নিয়ে আর বেশি আলোচনা না করাই ভালো।'

'জেনসন তাহলে ওর বউকে নিয়ে সুখে আছে বলছ?' লোকটা যেন আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারল না।

'কেন, আপনার কি অবিশ্বাস হচ্ছে?'

'না—মানে—যাকগে, আমার কথার কথায় কিছু মনে করবেন না। মিসেস জেনসনকে চিনি বলেই এত কথা বললাম। জেনসনের কাছে এসব কথা আবার বলো না যেন!'

কথা শেষ করে লোকটা তেলের দাম বাবদ কয়েকটা নোট আমার দিকে এগিয়ে ধরল। টাকাগুলো পকেটে রেখে বললাম, 'পাগল নাকি। এসব কথা মি. জেনসনের কানে গেলে বিপদ আছে?'

লোকটা ট্রাকে উঠে সশব্দে দরজা বন্ধ করল। তারপর পূর্ণ-গতিতে ট্রাক ছুটিয়ে দিল। যাবার সময় ওর মুখের ভাবে বুঝলাম, আমাকে লোলা-সম্বন্ধীয় কথাগুলো বলার জন্য ও এখন আফসোস করছে।

কিন্তু লোকটার বলে-যাওয়া কথাগুলো আমাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল।

ছুটন্ত ট্রাকটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। মনের মধ্যে বয়ে চলল চিন্তার ঝড়। তাহলে লোলা আগেওএকবার বিয়ে করেছে! ওর স্বামী মারা গেছে রিভলভারের গুলিতে! আর সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে দু-হাজার ডলার! এ কথা ভাবতেই হৃৎপিণ্ডটা কে যেন খামচে ধরল। জেনসনও তো মারা গেছে রিভলভারের গুলিতে! আর আমি যদি সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে না দিতাম, তাহলে হয়তো অদৃশ্য হত ওই এক লাখ ডলার।

এই ঘটনাদুটোর মধ্যে কি কোন যোগসূত্র আছে? রেস্তোরাঁর বারান্দায় গিয়ে বসলাম। একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে টের পেলাম, আমার হাত ভীষণভাবে থরথর করে কাঁপছে।

সন্দেহ-আতঙ্কের সুতোয় মনটা দুলতে লাগল পেণ্ডুলামের মতো।

ঐ ট্রাক-ড্রাইভারের কথা যদি সত্যি হয়, তবে কারসন সিটির পুলিশ লোলাকে শুধু টাকা চুরির জন্যই সন্দেহ করেনি—ফিনিকে খুন করার জন্যও সন্দেহ করেছে। তার মানে—

ছ-টা শব্দ বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল মনের পর্দায়।

তাহলে কি জেনসনকে লোলা খুন করেছে?

মনকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম ভয়াবহ রাতের দৃশ্যে। সব-কিছু আবার যেন আমার চোখের সামনে নিখুঁতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল পরিষ্কার দেখতে পেলাম, লোলা রিভলভার উঁচিয়ে বসবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তেজনায় ওর বুক উঠছে নামছে। তারপরই শুনতে পেলাম লোলার সেই অবিশ্বাস্য কর্কশ শাসানি। মনে পড়ল, জেনসনের উঠে দাঁড়ানোর কথা। রাগে চোখমুখ লাল করে ও লোলার দিকে এগোতে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার যেন শুনতে পেলাম সিন্দুকের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ—লোলার সেই হিংস্র দৃষ্টি—রিভলভারের বিকট আওয়াজ।—

এতদিন ধরে ভেবে এসেছি ঃ সিন্দুকের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে লোলা চমকে ওঠায়, ট্রিগারে আচমকা চাপ পড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। আর তাতেই জেনসন মারা গেছে—এক আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।

এখন ওই লোকটার কথা শোনার পর সব আবার নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলাম।

ট্রিগারে আচমকা চাপ পড়ে? সত্যিই কি তাই?

সিগারেটের বাকিটুকু ফেলে দিলাম। হাতের উলটোপিঠ দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে যেতেই পরিষ্কার বুঝলাম, আমি ভয় পেয়েছি!

এখন এই 'আচমকা' শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে জেনসনের মৃত্যুরহস্যের চাবিকাঠি।

প্রথম স্বামীকে খুনের ব্যাপারে পুলিশ লোলাকে সন্দেহ করেছিল—তাহলে কি জেনসনকে লোলা নৃশংসভাবে খুন করেছে!

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর-কিছু মনে হয় না। ব্যাপারটা যদি সত্যি সত্যি খুনই হয়, তাহলে তো অনায়াসেই খুনের দায়টা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারত! তারপর—হঠাৎ একটা বিচিত্র সম্ভাবনা আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি ওলটপালট করে দিল। হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হল মুহূর্তের জন্য!

সেদিন লোলা যখন রিভলভার হাতে ঘরে এসে ঢোকে, তখন সিন্দুকের দরজা খোলাই ছিল। তাহলে কি লোলার উদ্দেশ্য ছিল জেনসনের পর আমাকে গুলি করে সিন্দুকের টাকা গুছিয়ে নেওয়া? হয়তো আগে থেকেই ও সব-কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছিল।

লোলার গুলিতে আমি আর জেনসন মারা গেলে পর, ও হয়তো টাকাগুলো লুকিয়ে ফেলে পুলিশে খবর দিত। তারপর পুলিশ এলে পরে, ফ্রাঙ্ক ফিনির সময় যেরকম গল্প শুনিয়েছিল, এবারও সে-রকম কিছু একটা শোনাত। বলত, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সিন্দুক খুলছিলাম, এমন সময় ও আর জেনসন এসে আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। আমি তখন কোন পথ না পেয়ে জেনসনকে খুন করেছি। তারপর লোলা অসমসাহসিকতায় পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমার কাছ থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আমাকে গুলি করেছে।

ওয়েন্টওয়ার্থের এই পেটমোটা শেরিফটা লোলার এই কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করত। কারণ, আমার আসল পরিচয় জানার পর তায় মনে আর কোনরকম সন্দেহ থাকত না।

কিন্তু লোলার এই নিখুঁত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাওয়ার একটাই যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। তা হল, জেনসনকে গুলি করামাত্রই আমি সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সেই মুহূর্তেই লোলা বুঝতে পেরেছিল, ও যদি আমাকে গুলি করে, তবে সিন্দুক চিরকাল বন্ধই থেকে যাবে। কারণ আমি ছাড়া সিন্দুক খোলার লোক এই পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এ আর নেই। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ও এমন অভিনয় করেছে, যেন আচমকা গুলি বেরিয়ে জেনসন মারা গেছে। তারপরই লোলা যখন বুঝতে পারল, ব্ল্যাকমেল করে আমাকে দিয়ে সিন্দুক খোলানো যাবে না, তখন ও অন্য রাস্তা ধরল। এমন ভাব দেখাল, যেন ও আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু আমি ওর ফাঁদে পা দিইনি।

আর যখনই ও টের পেয়েছে, এই ‘পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এ সিন্দুক খোলার লোক আর আমি একা নই, তখনই আমার প্রতি ওর ব্যবহার হয়ে উঠে রূঢ় এবং নির্বিকার। কারণ, এখন আর আমার প্রয়োজন নেই যেহেতু রয়ও সিন্দুক খুলতে জানে। তাই লোলা এখন রয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছে।

এত চিন্তার পর আমি নিশ্চিন্ত হলাম, লোলার রিভলভার লুকিয়ে ফেলার গল্পটা সর্বৈব মিথ্যে। জেনসনের .৪৫ বর্তমানে লোলার কাছে, একথা ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে এল।

তার মানে আমার এবং রয়ের—দুজনের জীবনই বিপন্ন। লোলা হয়তো রয়কে যা-হোক করে রাজী করিয়ে সিন্দুক খোলাবে। তারপর নির্বিকারচিত্তে ওকে খুন করবে। হয়তো আমাকেও আর জীবিত রাখবে না। পুলিশকে ও সেই একই গল্প শোনাবে—শুধু জেনসনের বদলে রয়ের নামটা বসিয়ে দেবে। আবার সব-কিছু ওর পরিকল্পনামাফিক ঘটতে থাকবে।

নাঃ, এর একটা বিহিত করা দরকার। স্বীকার করছি, পুরো ব্যাপারটা আমার আন্দাজ ছাড়া আর-কিছু নয়। সেই ড্রাইভারটার কথা শোনার পরই এসব উদ্ভট চিন্তা এসে আমার মনে বাধা বেঁধেছে। হয়তো খোঁজ নিলে দেখা যাবে, ফিনি সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করেছে, এবং জেনসনের মৃত্যুটাও দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি যেতে চাইছি না। কারণ লোলার সেই রক্তলোলুপ হিংস্র দৃষ্টি—সেটা তো আর মিথ্যে নয়!

লোলাকে জব্দ করার একটামাত্র উপায় আছে। তা হল, সিন্দুক থেকে সমস্ত টাকা অন্য কোথাও সরিয়ে সিন্দুক খোলা রেখে দেওয়া। তাহলে সেই খোলা সিন্দুক দেখলেই লোলা বুঝতে পারবে, রয়কে কব্জা করে বা আমাকে খুন করে ওর কোন লাভ হবে না।

কিন্তু ওই টাকাগুলো লুকোবার জন্য আমাকে প্রথমেই ভালো দেখে একটা জায়গা খুঁজতে হবে। হাতঘড়িতে চোখ রাখলাম দশটা বেজে দশ মিনিট। অর্থাৎ ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ওদের ফিরতে এখনও ঘণ্টা আড়াই বাকি, সুতরাং, টাকাগুলো লুকোবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম,

টাকাগুলো সিন্দুক থেকে নিয়ে জনসনের সঙ্গেই কবর দেব। তাতে লোলা যদিও বা লুকনো টাকার সন্ধান পায়, তাহলেও শান্তিতে সে-টাকা ভোগ করতে পারবে না। টাকার সঙ্গে সঙ্গে ওকে খুঁড়ে তুলতে হবে জেনসনের গলিত বিকৃত মৃতদেহ।

কিন্তু এই পরিকল্পনাকে কার্যকর রূপ দেবার আগেই এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। বারান্দা ছেড়ে বাংলোর দিকে এগোচ্ছি, চোখে পড়ল একটা ট্রাক ওয়েন্টওয়ার্থের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। তার পিছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা পুরনো প্যাকার্ড গাড়ি। বুঝলাম, এবার এই বিকল প্যাকার্ডের পিছনেই আমার সময়ের শ্রাদ্ধ হবে। এবং ঠিক তাই হল।

প্যাকার্ডের ড্রাইভার অত্যন্ত খিটখিটে স্বরে জানাল, তার গাড়ি এখুনি ঠিক করে দিতে হবে। নয়তো, ট্রপিকা স্প্রিংসে পৌঁছতে তার দেরি হয়ে যাবে।

নাছোড়বান্দা ড্রাইভারটার পাল্লায় পড়ে ওই ঝরঝরে প্যাকার্ডের পিছনে লাগতে হল।

দুপুরবেলা রয় আর লোলা যখন ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ফিরে এল, তখনও আমি ওই হাতচ্ছাড়া প্যাকার্ডের সঙ্গে রেঞ্চ নিয়ে ধস্তাধস্তি করছি।

এভাবে কেটে গেল তিন দিন তিন রাত। কিন্তু এর মধ্যে একবারও সিন্দুকের কাছে যাওয়ার সুযোগ পেলাম না।

লোলা সর্বদাই আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। রাতে আমি আর রয় যখনই তাস খেলতে বসি, ও বাংলোয় চলে যায়। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। সুতরাং, সিন্দুক যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গেল।

লোলা আজকাল আমার সঙ্গে কথা বলে ঠিকই, কিন্তু ওর নিস্পৃহ ব্যবহার সব সময় আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এমনভাবে ও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, যাতে আমার বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি, আমাদের আগের সম্পর্ক আর কোনদিনই আমরা ফিরে পাব না। অতীতের অন্তরঙ্গতার সূত্র ছিঁড়ে গিয়ে আমাদের মাঝখানে গড়ে উঠেছে এক সুদৃঢ় দ্বন্দ্বের পাঁচিল।

প্রথম প্রথম অসুবিধে হলেও অস্বস্তিকর পরিবেশকে আমি মেনে নিলাম। এবং কয়েক দিনের মধ্যেই অনুভব করলাম, লোলাকে স্পর্শ করতেও আমার প্রচণ্ড অনীহা। সত্যকে অস্বীকার যদি না করি, তাহলে বলতে বাধা নেই, লোলাকে আমি ঘৃণা করি।

সবসময় ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম। যদি একবারও আমার অনুমানের সপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। কিন্তু বৃথাই। লোলার চলনে বলনে মুহূর্তের জন্যও কখনও প্রকাশ পেল না, ও আমাকে নৃশংসভাবে খুন করতে চায়। সুতরাং, অনিশ্চয়তার দোলায় দুলতে লাগলাম।

রয়কেও আমি বহুভাবে লক্ষ্য করেছি। ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ফেরার পর লোলার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা বুঝতে চেয়েছি। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাকে হতাশ হতে হয়েছে।

এক-একসময়ে হঠাৎ মনে হয়েছে, রয়কে সব কথা খুলে বলি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি মনে করে চুপ করে গেছি। কেন জানি না মনে হয়েছে, সিন্দুকে এক লাখ ডলার আছে শুনলেই রয়ের বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তারপর ওকে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল হবে। সুতরাং মুখ বুজে দিন কাটাতে লাগলাম। এখন এই কঠিন সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় রয় ও লোলার অনুপস্থিতি। তাই বসে বসে দিন গুনতে লাগলাম, কবে লোলা রয়ের সঙ্গে ওয়েন্টওয়ার্থে যাবে—আমাকে এই 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন-এ রেখে যাবে সম্পূর্ণ একা!

প্রায় এক সপ্তাহ পরে এল সেই প্রতীক্ষিত সুযোগ।

একদিন সন্ধ্যায় খাবার ঘরে আমি আর রয় কাজে ব্যস্ত, এমন সময় লোলা ঘরে এসে ঢুকল, 'ওয়েন্টওয়ার্থে ব্রিজিত বার্দোর একটা ভালো ছবি এসেছে। আমি আজ রাতে দেখতে যাব। তোমরা কেউ যাবে?'

রয় ঘাড় নাড়ল, ‘উহুঁ—আমি আবার মারপিটের ছবি ছাড়া দেখি না।’

ভেবে দেখলাম, এই সুযোগ। এখন যদি কোনরকমে রয়কে লোলার সঙ্গে যেতে রাজি করাতে পারি, তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। কারণ ওয়েন্টওয়ার্থে সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে ওদের রাত তিনটে হয়ে যাবে। আর ওই সময়ের মধ্যেই আমি সিন্দুক থেকে টাকাগুলো সরিয়ে গুমটিঘরে পুঁতে ফেলব। রাত বারোটার পর এমনিতেই গাড়ি আর ট্রাকের ভিড় কমে আসে। সুতরাং, ওই সামান্য কাজটুকু সেরে ফেলতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। তাই রয়কে বললাম, ‘তুই লোলার সঙ্গে যা না। এমনিতেই আজ রাতে আমার কাজ করার কথা তাছাড়া আরও কয়েকটা মেরামতের কাজও সেরে ফেলতে পারব। ছবিতে মারপিট না হয় নাই থাকল, ব্রিজিত বার্দোকে তো দেখতে পাবি?’

রয় অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। ও হয়তো ভেবেছিল, আমিই লোলার সঙ্গে যাব।

‘না—ভাবছিলাম আজ একটু তাস-টাস খেলব।’ ইতস্তত করে রয় জবাব দিল।

‘কিন্তু এই কুড়ি মাইল গাড়ি চালিয়ে লোলা একেবারে একা ওয়েন্টওয়ার্থে যাবে—তাই বলছিলাম—’

লক্ষ্য করলাম, লোলা একদৃষ্টে আমাকে দেখছে। ভয় হল, ও বোধহয় আমার উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছে। কিন্তু আমি মরিয়া। যে করে হোক, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাকে করতেই হবে। কারণ, এরকম সুবর্ণসুযোগ মানুষের জীবনে বার বার আসে না।

লোলা আমাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ বলে উঠল, ‘ঠিক আছে, তোমাদের যখন যাবার ইচ্ছে নেই, তখন আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমি একাই চললাম।’

রয় লোলার দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসল, ‘আচ্ছা—তোমার কথাই থাক। চল, কি ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে—বান্দা হাজির।’ রয় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল। লোলা প্রত্যুত্তরে হেসে পা বাড়াল বাংলোর দিকে।

সাড়ে ন’টা বাজতে-না-বাজতেই লোলা সেজেগুজে বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। ওর পরনে একটা দুধ-সাদা পোশাক। আগে কোনদিন ওকে এ পোশাক পরতে দেখিনি।

লোলা যেন আজ প্রাণভরে সেজেছে। ওর রূপযৌবনের সমস্ত ছলাকলা প্রকট করে ও এগিয়ে চলল মার্কারির দিকে। ওর ভাবসাব দেখে বুকের মধ্যে বেজে উঠল বিপদের সংকেত—মনে নেমে এল অস্বস্তির ছায়া।

লোলা ওর স্বভাবসিদ্ধ ছন্দে এগিয়ে গিয়ে রয়ের পাশে উঠে বসল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রয় আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল, ‘শেট, আমি কিন্তু যেতে চাইনি। নেহাত তুই বললি বলে—’ লোলাকে আড়াল করে চোখ টিপল রয়।

রয়ের মন্তব্য আমার কানে বাজাল। কারণ ওর চরিত্রের সঙ্গে এ ধরনের কথা ঠিক খাপ খায় না—কিন্তু ওর কথা আমি গায়েই মাখলাম না। মিষ্টি করে জবাব দিলাম, ‘আশা করি সময়টা তোর ভালোই কাটবে।’

আমি ভালোভাবেই জানি না, যদি একবার সিন্দুকের টাকাটা পরিকল্পনামতো লুকিয়ে ফেলতে পারি, তবে লোলা আর রয়—দু-জনেই থাকবে আমার বুড়ো আঙুলের তলায়—সম্পূর্ণ আমার আজ্ঞাধীন।

লোলা গাড়িতে বসে আমাকে লক্ষ্য করছিল, ব্যঙ্গের সুরে জবাব দিল, ‘সে-বিষয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি শুধু ঠিকমতো চারদিকে খেয়াল রেখ।’

রয় গীয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়তেই ছুটে চলল লোলার মার্কারি। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা গেল গাড়ির পিছনে লাল আলো। শেষে তাও মিলিয়ে গেল মরুভূমির অন্ধকারে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর রওনা দিলাম বাংলোর দিকে। মনে মনে একটু যে ভয় না পেলাম, তা নয়। কারণ, কাজটাকে যতটা সহজ ভাবছি, হয়ত তত সহজ নয়—কে জানে!

বাংলোর কাছে পৌঁছেই লক্ষ্য করলাম সদর দরজা বন্ধ। ঠেলাঠেলি করেও যখন খুলল না, বুঝলাম দরজায় লোলা তালা দিয়ে গেছে। সুতরাং গুমটিঘরের দিকে চললাম একটুকরো তারের সন্ধানে।

তারের মাথাটা সামান্য বাঁকিয়ে চাবির ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। সেকেন্ড দুয়েকের চেষ্টাতেই খুলে গেল বাংলোর দরজা। বসবার ঘরে পৌঁছে সিন্দুকের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলাম। গত কয়েক সপ্তাহের অভ্যাসে বর্তমানে সিন্দুক খুলতে আমার বড়জোর মিনিট তিনেক লাগে। কিন্তু আজ সময় কিছু বেশি লাগল—সম্ভবত আমার মানসিক উৎকণ্ঠাই তার জন্য দায়ী।

সিন্দুকের দরজা খোলামাত্রই নির্মম রসভঙ্গের মতো কানে এল কোন গাড়ির হর্নের শব্দ। উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখি, পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা হলদে ক্যাডিলাক।

অতএব কম্বিনেশন ডায়াল ঘুরিয়ে, সিন্দুক বন্ধ করে বাইরে এলাম। কিছুটা হতাশ হয়েই গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

এই যে গাড়ি আসতে শুরু করল, ব্যস—সিন্দুক সিন্দুকের জায়গাতেই পড়ে রইল, আর আমি অক্লান্তভাবে খেটে চললাম।

আমি কিন্তু এতে অবাক হয়নি। এই সময়টা রোজই গাড়ি ও ট্রাকের ভিড় থাকে। কিন্তু সে শুধু রাত বারোটা পর্যন্ত। তার পরই গাড়ির ভিড় কমে আসে। অর্থাৎ, তখনও আমার হাতে তিন ঘণ্টা সময় থাকবে। এই সময়ের মধ্যে বেশ নির্বিঘ্নেই কাজ সারতে পারব।

প্রায় বারোটা নাগাদ গাড়ি-চালাচল একেবারে কমে এল। বারান্দায় বসে পরবর্তী গাড়ির অপেক্ষায় রইলাম। চাঁদের আলোয় ধোয়া আঁকাবাঁকা রাস্তা যতদূর চোখ যায় সম্পূর্ণ নির্জন—কোন গাড়ির হেডলাইটও চোখে পড়ছে না। অতএব নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাংলোর দিকে এগোতে যাব, চোখে পড়ল দূরাগত কোন গাড়ির হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো। এতক্ষণ প্রতীক্ষার পর এই গাড়িটার আলো চোখে পড়তেই অধৈর্য হয়ে উঠলাম। কিছুটা বিরক্ত হয়ে পাম্পের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জানতাম, এই হতচ্ছাড়া গাড়িটা যে-কোন কারণেই হোক এখানে থামবেই। এবং আমার ধারণাকে নির্ভুল প্রমাণিত করে গাড়িটা পাম্পের সামনে এসে দাঁড়াল।

গাড়িটা একটা পুরোনো মডেলের বুইক। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এতটা রাস্তা আসার ফলে বুইকের সারা গায়ে ধুলোর আস্তরণ। গাড়ির আরোহী দুজনের একজন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে তাকাল।

লোকটার বয়স প্রায় আমার মতোই। মাথায় কালো টুপি, পরনে কালো জামা, আর একটা সাদা টাই। হনু বের করা লম্বাটে ভাবলেশহীন মুখ। ক্ষুদে ক্ষুদে কাল চোখজোড়া যেন নিষ্প্রাণ দু-টুকরো কাচ।

তার স্থূলকায় সঙ্গীকে দেখে মেক্সিকোর অধিবাসী বলেই মনে হল। তার গায়ের রঙ রোদে পোড়া—তামাটে। ঠোঁটের উপর লম্বা টানা গোঁফ। পরনে তেলচিটে ময়লা স্যুট। মাথায় মেক্সিকান হ্যাট—চামড়ার ফিতেদুটো চিবুকের নীচে গিঁট দেওয়া।

কেন জানি না, লোকদুটোকে দেখেই ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলাম। ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান—সাবধান!'

এতদিন পরে হঠাৎই আবিষ্কার করলাম, 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' সত্যিই বড় নির্জন—এবং এখানে আমি সম্পূর্ণ একা।

মোটা লোকটা আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু তার সঙ্গী গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল। হয়তো দেখল, এখানে আমি ছাড়া আর-কেউ আছে কিনা।

পাম্পের গা থেকে তেল দেবার পাইপটা খুলে নিলাম, 'ক লিটার দেব?'

'দশ।' মোটা লোকটা নির্বিকার সুরে জবাব দিল। কিন্তু উত্তর দেবার সময় ওর সতর্ক দৃষ্টি সাদা টাই-পরা লোকটাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

ট্যাঙ্কে তেল ঢালতে ঢালতে সাদা টাই-পরা লোকটার দিকে আড়চোখে তাকালাম। সে তখন গাড়ি ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক চাইছে, যেন কারুর খোঁজ করছে। লোকটা মাথা থেকে টুপি খুলে নিজেকে হাওয়া করতে লাগল। ওর মাথার বাদামী চুল ঘামে ভিজে টাকের সঙ্গে লেপটে আছে।

নিছক কথা বলার জন্যই বললাম, 'ওঃ, আজ ভীষণ গরম পড়েছে—একেবারে অসহ্য!'

লোকদুটো জবাব দিল না। আমার উপস্থিতি ওদের কাছে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হল।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, এ লোকদুটো হয়তো রেস্তোরাঁর ক্যাশ লুট করতে এসেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্য একটা চিন্তা দশমনী হাতুড়ির মতো আমার মস্তিষ্কে আঘাত করল। যদি ওরা বাংলোয় গিয়ে সিন্দুকটা খুঁজে পায়! যদি লুঠ করে সিন্দুকের সমস্ত টাকা!

সাদা টাই-পরা লোকটা কোট থেকে একটা পিন খুলে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল। অনুভব করলাম, ওর ক্ষুদে ক্ষুদে অভিব্যক্তিহীন চোখজোড়া আমার ওপরেই নিবদ্ধ—কিন্তু আমার মুখে নেয়, নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে আমার উন্মুক্ত গলার দিকে। ভয়ে শিউরে উঠলাম।

'কী হে, তুমিই এখানকার মালিক নাকি?' হালকা সুরে আচমকা প্রশ্ন করল সাদা-টাই, 'একা থাক, না বউ-ছেলেমেয়ে আছে?'

প্রশ্নটা অত্যন্ত নির্দোষ এবং সাধারণ। যে-কোন খদ্দেরই এ ধরনের প্রশ্ণ করতে পারে। কিন্ত লোকটার টেনে টেনে কথা বলার সুরে কেন যেন ভয় পেলাম।

'না, আমি এখানে চাকরি করি।' পাম্পের মিটারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জবাব দিলাম, 'মালিক এবং তাঁর আর একজন কর্মচারী একটু বাইরে গেছেন। এখুনি এসে পড়বেন। ওঁদের আসার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে—'

লোকটা এবার পিন দিয়ে মাড়ি খোঁচাতে লাগল। তারপর পিনটা চুষে পরিষ্কার করে আবার কোটের গায়ে আটকে রাখল।

আমি তেল দেওয়া শেষ করে বালতি থেকে ভিজে স্পঞ্জটা তুলে নিলাম। এগিয়ে গিয়ে গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীন মুছতে লাগলাম।

কাজ করতে থাকলেও আমার দৃষ্টি কিন্তু সর্বদাই লোকদুটোর দিকে।

বন্ধ বাথরুমে স্নানরত অবস্থায় বুকে হেঁটে এগিয়ে-আসা কোন সাপকে লোকে যেভাবে লক্ষ্য করে, ঠিক সেভাবে ওদের চালচলন লক্ষ্য করতে লাগলাম।

'সল, চলো কিছু খাওয়া যাক।' সাদা-টাই তার মোটা সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলল। তারপর আমার দিকে ফিরল, 'খাওয়ার মতো কি কি আছে বল দেখি?'

'এত রাতে শুধু স্যান্ডউইচ ছাড়া আর-কিছুই নেই।'

'দুর দুর, শুধু স্যান্ডউইচে কী হবে? ভারী কিছু চাই—আমাদের ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকালাম—বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। অর্থাৎ লোলাকে ফিরতে এখনও ঘণ্টা আড়াই বাকি। সুতরাং, এ লোকদুটোর হাত থেকে আর নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।

নিরুপায় হয়ে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। সল এবং সাদা-টাই সতর্ক পা ফেলে আমাকে অনুসরণ করল।

খাবার ঘরে ঢুকেই ওরা থমকে দাঁড়াল, ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

'তুমি কি এখানে একা নাকি?' সাদা-টাই জানতে চাইল।

বুঝলাম মিথ্যে বলে লাভ নেই। কারণ, ওরা একটু ঘুরেফিরে দেখলেই জানতে পারবে, আমি এখানে একা কী দোকা। সুতরাং সত্যি কথাই বললাম, 'হ্যাঁ।'

'এবারে খাওয়া-দাওয়া করা যাক।—কী আছে?'

‘যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, তবে ফ্রায়েড চিকেনের ব্যবস্থা করতে পারি।’

সল আমাকে অতিক্রম করে কাউন্টার পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল। রান্নাঘরের দরজা খুলে ভিতরে উঁকি মারল। কিন্তু একটু পরেই ও ফিরে এল। সাদা-টাইকে উদ্দেশ করে মাথা নেড়ে জানাল, রান্নাঘরে কেউ নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝলাম, আমি বিপদে পড়েছি।

সাদা-টাই পায়ে পায়ে দেওয়ালে-গাঁথা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল। টেলিফোন ডায়ালের ওপর আঙুলের টোকা মরল, ‘তোমার এখানে টেলিফোন কি একটাই?’

‘হ্যাঁ।’ হাতদুটো ভাঁজ করে বুকের কাছে রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ, সামান্যতম নড়াচাড়াও বিপদ ডেকে আনতে পারে, তা আমার অজানা ছিল না।

লোকটা টেলিফোনের রিসিভারটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে এক হ্যাঁকচা টান মারল। সিরিভারটা তার ছিঁড়ে দেওয়াল থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে এল। সাদা-টাই সরীসৃপের মতো স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগল, ‘যাও, ফ্রায়েড চিকেনের ব্যবস্থা করো গিয়ে। সল, তুমিও ওর সঙ্গে যাও—ওর দিকে নজর রেখো।’

রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালাম। কানে অনুসরণরত সলের গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। ফ্রাইং প্যানে মুরগি চাপিয়ে সলকে প্রশ্ন করলাম, ‘কী ব্যাপার—তোমরা কী চাও?’

‘ভয় পেও না, দোস্ত।’ সল এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর রাখল। ওর পাঁচ আঙুল রিভলভারের বাঁটের গায়ে খেলে বেড়াতে লাগল ‘চুপচাপ কাজ করে যাও।’

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর সল আবার মুখ খলল, ‘তোমার এ জায়গাটা ভালো লাগে? একা একা থাকতে খারাপ লাগে না?’

‘অভ্যেস হয়ে গেছে।’ ঠোঁট শুকিয়ে আসার অস্পষ্টভাবে জবাব দিলাম। বুকের কাঁপুনি হঠাৎ যেন আরও বেড়ে গেল।

‘বিয়ে করেছ?’

‘উহুঁ।’

‘তাহলে একা রাত কাটাও কেমন করে—যাঁ।’

‘এই—চলে যায়।’

এমন সময় সাদা-টাই এসে রান্নাঘরে ঢুকল। ওর হাতে এক প্লেট স্যান্ডউইচ। সম্ভবত খাবার ঘরের আলমারি থেকে তুলে নিয়েছে।

‘এই নাও, সল। খেয়ে দেখ, খুব মিষ্টি খাবার। সাদা-টাইয়ের মুখ স্যান্ডউইচে ঠাসা। তাই ওর কথাগুলো কেমন যেন অস্পষ্ট শোনাল, ‘খোকার দিকে লক্ষ্য রেখো। দেখ যেন উল্টো-পাল্টা কিছু করে না বসে। আমি একবার চারপাশটা ঘুরে দেখে আসি।’ কথা শেষ করে সাদা-টাই রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সল প্লেট থেকে একজোড়া স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে মুখে পুরে বলল, ‘এডি এমনিতে খুব ভালো লোক। তবে রিভলভারের ট্রিগার দেখলেই ওর ভীষণ টিপতে ইচ্ছে করে। সুতরাং, ওর সঙ্গে সমঝে ব্যবহার করো! নয়তো—’

সলের কথার কোন জবাব দিলাম না। তাছাড়া জবাব দেবই বা কি! কিন্তু আমার কোণঠাসা মন ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সলকে কায়দা করতে আমাকে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। ওর ওই থলথলে চেহারা নিয়ে ও আমার সঙ্গে যুঝে উঠতে পারব বলে মনে হয় না। সুতরাং, একবার যদি ওকে কাবু করতে ফেলতে পারি, তবে এডির সঙ্গে আমার লড়াই হবে সমানে সমানে।

ভেবে দেখলাম, যদি সাহস করে সল আর এডির মোকাবিলা করতে পারি, তবে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী রয় ও লোলা ফিরে আসার আগেই সিন্দুকের টাকাটা সরিয়ে ফেলতে পারব।

'ক্যাশে টাকা-পয়সা কীরকম আছে?' সল হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'বেশি নেই। আজ বিকেলেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া হয়ে গেছে।'

তাই নাকি? তাহলে তো ভারি চিন্তার কথা!'

একমুহূর্তে চুপ করে থেকে বলল, 'টাকাপয়সা তো নানা জায়গা থেকে আমদানিই হয়। তাহলে আমাকে কি ধাপ্পা দিচ্ছ নাকি?— চটপট বলে ফেল দেখি, রূপচাঁদগুলো কোথায় ছুপে রেখেছ?'

'ক্যাশবাক্সে একশো-ডলার আছে—ওটাই সব।'

উহুঁ, অত কম টাকায় তো চলবে না। আরও কিছু ব্যবস্থা করতে পার তো বল, নইলে তোমার প্রাণ-পাখি ডানা মেলবে।'

দুটো খালি প্লেট নিয়ে টেবিলে রাখলাম। উত্তেজনায় শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততম হয়ে উঠল। এই মোটাটাকে টিট করতে হলে এটাই উপযুক্ত সময়।

গরম ফ্রায়েড চিকেনসুদ্ধ ফ্রাইং প্যানটা তুলে নিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম, 'ক্যাশের টাকা ছাড়া পেট্রল বিক্রির পঞ্চাশ ডলার আছে। সত্যি বলছি, এ ছাড়া আর-কোন টাকা-পয়সা নেই।'

সল ধীরেসুস্থে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল। শিকারীর চোখে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল। আমি ফ্রাইং প্যান থেকে ভাজা মুরগিগুলো প্লেটে রাখার জন্য প্রস্তুত হলাম।

'ওই দেড়শো ডলারে কিছু হবে না দোস্ত, আরও জোগাড় করার ব্যবস্থা করো। এডির সঙ্গে প্যাঁচ খেলার চেষ্টা করলে তার ফল ভালো হবে না।'

সলের কথা শেষ হতে না হতেই ফ্রাইং প্যানের গরম মুরগিগুলো সজোরে ছুড়ে দিলাম ওর মুখে। এক বিকট চিৎকার করে সল টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। গরম তেল ছড়িয়ে পড়ল ওর চোখেমুখে, ভাজা মুরগির কিছু অংশ ওর টুপির উপর, আর বাকিটা ওর কোটের গায়ে লেগে মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

সল এক হাতে মুখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে কোমর থেকে রিভলভারটা বের করার চেষ্টা করতে লাগল। আর দেরি না করে ফ্রাইং প্যানটা ঘুরিয়ে সপাটে বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। সে আঘাতে সল আরও কয়েক পা পিছিয়ে কোনরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। ওর এক হাত তখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে .৪৫ রিভলভারের বাঁট।

ফ্রাইং প্যানের আর এক আঘাতেই সল মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা চাপা গোঙানি।

সলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর রিভলভারটা বের করে নিলাম। কিন্তু এর পরেও ও উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগল। সুতরাং বিনা দ্বিধায় .৪৫-এর বাঁট দিয়ে সজোরে ওর মাথায় আঘাত করলাম। এবারে ও চোখ উল্টে , হাত-পা ছাড়িয়ে আবার মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

ওর রিভলভারটা শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে কানে এল খাবার ঘরের দরজা খোলার মৃদু শব্দ। আর দেরি না করে বিদ্যুৎ বেগে ছুটলাম আলোর সুইচ লক্ষ্য করে। সুইচ অফ করতেই একরাশ অন্ধকারে ভরে গেল ছোট্ট রান্নাঘরটা।

বুঝলাম, এডিকে কাবু করা এতটা সহজ হবে না। কারণ এডি পেশাদার খুনে। তবু আশার কথা, আমিও নিরস্ত্র নই।

সুতরাং রিভলভার বাগিয়ে ধরে অন্ধকার রান্নাঘরে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম।

'সল—?'

অন্ধকারে ভেসে এল এডির সতর্ক ফিসফিসে কণ্ঠস্বর।

খুব সাবধানে হালকা পায়ে এগিয়ে গেলাম রান্নাঘরের খিড়কি-দরজার কাছে। জীবনে কোনদিন পিস্তল ব্যবহার করিনি। তাই .৪৫ রিভলভারটা আমার হাতে বেখাপ্পা ঠেকতে লাগল। কিন্তু তা হলেও মনে যেটুকু সাহস, আশা-ভরসা তা কেবল ওই পিস্তলটার জন্যই।

এমন সময় খাবার ঘরে আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। কানে এল কাঠের পাটাতনে পা ফেলার খসখস শব্দ।

'সল, তুমি কোথায়?'

খিড়কি-দরজায় হাত রেখে আস্তে চাপ দিলাম। কয়েকদিন সেই কব্জাগুলোতে তেল দেওয়ায়, দরজা খোলার সময় কোন শব্দ হল না।

দরজা খুলতেই কানে এল সলের চাপা গোঙানি, এবং সেই সঙ্গে ওর নড়াচড়ার শব্দ। নাঃ, সলের মাথাটা দেখছি লোহার তৈরি! ভেবেছিলাম, অন্তত ঘণ্টাখানেক ও অজ্ঞান হয়ে থাকবে আর সেই সময়ে এডির সঙ্গে আমার বোঝাপড়া শেষ হবে। কিন্তু এখন দেখছি সমূহ বিপদ। এড়ির ব্যবস্থা যদি চটপট না করতে পারি, তাহলে সল জেগে উঠবে। আর, তারপর ওরা দুজনে মিলে ধীরেসুস্থে আমাকে শেষ করবে।

খিড়কি-দরজা পুরোটা খুলতেই অনুভব করলাম মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাসের ঝাপটা। ভেবে দেখলাম, বাইরে বেরোতে পারলে এডির সঙ্গে মোকাবিলা করতে আমার অনেক সুবিধে হবে। তাই .৪৫টা রান্নাঘরের দরজার দিকে কোনরকমে তাক করে পায়ে পায়ে পিছোতে লাগলাম।

হঠাৎ চোখে পড়ল বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো নীল আগুনের রেখা আর তার পরমুহূর্তেই রিভলভারের কান ফাটানো বীভৎস শব্দ। একটা গরম সীসের টুকরো 'সুইস' শব্দ তুলে আমার রগ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ভয়ে আমার সারা শরীর ঘেমে উঠল। হৃৎপিণ্ডের গতি হয়ে উঠল দুর্বার—ঢিপ—ঢিপ—ঢিপ—ঢিপ

এক লাফে তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বালির উপর। মুহূর্তের মধ্যে আত্মগোপন করলাম অন্ধকারের আশ্রয়ে।

এডির লক্ষ্য যে এতটা নির্ভুল, তা আশা করিনি।

হৃৎপিণ্ডের অশান্ত স্পন্দনকে একমাত্র সঙ্গী করে অন্ধকারে অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু চারদিকের বরফ-শীতল নিস্তব্ধতা পরিবেশকে আরও ভয়াবহ করে তুলল।

আস্তে আস্তে মাথা তুলে ওয়েন্টওয়ার্থের রাস্তার দিকে তাকালাম। কিন্তু সে ক্ষীণ আশাতেও ছাই পড়ল—চাঁদের আলোয় আলোকিত রাস্তা শুভ্র বিতানের মতোই নিষ্কলঙ্ক। সে-নির্জনতাকে চুরমার করে এগিয়ে আসছে না কোন গাড়ির হেডলাইট। পরিস্থিতি যেন আমাকে বারবার জানিয়ে দিচ্ছে, আমি একা। এই বিপদের মুহূর্তে কেউ এগিয়ে আসবে না আমাকে সাহায্য করতে। সম্পূর্ণ নিজের উপরেই আমাকে নির্ভর করতে হবে।

সামনের পাম্পগুলো চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গুমটিঘর, রেস্তোরাঁ আর বাংলোর চারদিকে অন্ধকারে জমাট আস্তরণ। যেভাবে হোক আমাকে বাংলোয় পৌঁছতেই হবে। অর্থাৎ পার হতে হবে সামনের আলোকিত উঠোনটুকু।

রেস্তোরাঁর দেওয়াল ঘেঁষে পায়ে পায়ে পিছোতে লাগলাম। অন্ধকারে আড়াল থেকে বাংলোর যতটা কাছে যাওয়ার সম্ভব এগিয়ে গেলাম।

এমন সময় নরম স্বরে কেউ বলে উঠল, 'ওহে খোকা, পিস্তল ফেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এস। শুধু শুধু কেন নিজের বিপদ ডেকে আনছ।

অন্ধকারে কণ্ঠস্বরের উৎসস্থল ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। কিন্তু এডির সাদা টাইয়ের ঝিলিক মুহূর্তের জন্য চোখে পড়তেই গুলি করার একটা দুর্দম ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসল। কিন্তু পরক্ষণেই সে-নির্বুদ্ধিতার পরিণতির কথা চিন্তা করে নিরস্ত হলাম। কারণ এডি অত্যন্ত চতুর। ও জানে, আমি বোকার মতো ওকে লক্ষ্য করে গুলি করব, আর আমার পিস্তলের কৃশানু সংকেত ওকে জানিয়ে দেবে আমি কোথায় লুকিয়ে আছি।

আমি যদিও বা ফসকাই, এডি যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত। সুতরাং ওর ফাদে পা না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। অন্ধকারের মধ্যেই দেখতে চেষ্টা করলাম এডির সাদা টাই, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

ভীষণ ভয় পেলেও স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি আমি তখনও হারায়নি। তাই যখন আরও একবার কানে এল এডির নেশা-ধরানোর হালকা স্বর, আমি যেমন বসে ছিলাম তেমনি রইলাম। কিন্তু মনে হল, এডির কণ্ঠস্বর যেন আরও অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এডি যদি কোনরকমে একবার বুঝতে পারে আমি কোথায় লুকিয়ে আছি, তাহলে আমাকে খুন করতে ও এতটুকু দ্বিধা করবে না।

খুব সাবধানে বালিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। বুকে হেঁটে এগোতে যেতেই হাতে ঠেকল একটা পাথরের টুকরো। অতি সপ্তর্পণে ওটা তুলে নিয়ে বিপরীত দিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলাম। পাথরটা রেস্তোরাঁর দেওয়ালে গিয়ে সশব্দে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ-ধাঁধানো নীল আলো, আর পিস্তলের বিকট গর্জন—মাথার ইঞ্চিখানেক উপর দিয়ে বাতাস কেটে শিস তুলে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। যদি বালির উপর শুয়ে না থাকতাম, তাহলে সলের কথামতো হয়তো ওই গুলিতেই আমার প্রাণ-পাখি ডানা মেলত।

এবারে বুঝলাম, এডিকে আমি কত ভুল বুঝেছি। কারণ, ও পাথরের শব্দ শুনে সেদিকে গুলি না করে, তার বিপরীত দিকে—অর্থাৎ আমাকে লক্ষ্য করেই গুলি করেছে। এডির দীর্ঘদিনের পেশাদারী অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করে যে কী ভীষণ ভুল করেছি, তা এখন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম।

পিস্তলের আলোটা ঝলসে উঠেছে ঠিক খিড়কি-দরজার কাছ থেকে। কিন্তু আমি রিভলভার তুলতে গিয়েই থমকে গেলাম। কারণ এডি আমাকে গুলি করার পরমুহূর্তেই সিঁড়ির পিছনে বালির উপর লাফ দিল। দেখতে না পেলেও, ধপ করে শব্দ হওয়ার ব্যাপারটা অনুমান করতে অসুবিধে হল না। বুঝলাম, এডি গুঁড়ি মেরে আক্রমণোদ্যত জাগুয়ারের মতো সিঁড়ির ধাপের আড়ালে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

খুব সাবধানে নিঃশব্দে পিছোতে শুরু করলাম। প্রতিমুহূর্তেই আশা করতে লাগলাম, এখুনি হয়তো শুনতে পাব পিস্তলের গর্জন অনুভব করব বুলেটের নিঃশ্বাস।

এই সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎই এডিকে দেখতে পেলাম।

আমার কাছ থেকে গজ পনেরো দূরে চোখে পড়ল অন্ধকারে ওর সাদা টাইয়ের ঝিলিক। কোন পেশাদার বন্দুকবাজের পক্ষে সাদা টাই পরা নেহাতই অবিবেচনার কাজ। এরকম একটা স্থূল লক্ষ্য আমার মতো একজন আনাড়ীও যে অনায়াসে ভেদ করবে সে-বিষয়ে এডির তো সন্দেহ থাকার কথা নয়। তাহলে কি প্রতিপক্ষকে অবহেলা করার দরুণই এডির এই চরম অসাবধানতা।

সপ্তর্পণে একটু একটু করে রিভলভার শক্ত করে ধরে এডির ঝাপসা সাদা টাইয়ের উপর তাক করলাম। অস্থির ভয়ার্ত আঙুল ট্রিগারের উপর ক্রমশ চেপে বসতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে আসতেই ট্রিগারের উপর হালকা হয়ে এল আঙুলের চাপ।

যদি এডি আমার গুলিতে মারা যায়? কী হবে তাহলে?

ভাবতে অবাক লাগল, এই নিদারুণ সংকটময় মুহূর্তেও কী অদ্ভুতভাবেই না বিভিন্ন সম্ভাবনার বিশদ বিবরণ ভেসে উঠল মনের পর্দায়!

যদি এডিকে আমি খুন করি, তাহলে লাশটা লুকোব কোথায়? তাছাড়া, রান্নাঘরের মেঝেতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে সল। ওরও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত সলকেও একেবারে শেষ করতে হবে। তারপর!

এডি আর সলের কথা জানিয়ে পুলিশে খবর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এবারে আর রয় আমার পরিচয় নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেই ধরা পড়ে যাবে, এডি আর সলের মৃত্যুর সময় রয় এবং লোলা দুজনেই ওয়েস্টওয়ার্থে ছিল। তখন পুলিশ জানতে চাইবে এডি এবং

সলের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? সুতরাং, আমাকেই অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে ওরা সোজা ফার্নওয়ার্থে চালান দেবে। কোন কথাই শুনতে চাইবে না।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে রিভলভার নামিয়ে নিলাম। এবং সেটাই হল আমার চরম নির্বুদ্ধিতা।

কারণ, রিভলভার নামানোর এই সামান্য নড়াচাড়া এডির শিকারী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না।

আগুনের ঝলক আর রিভলভারের গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বুকে অনুভব করলাম এক প্রচণ্ড ধাক্কা। সারা শরীর বাঁশ পাতার মতো থরথর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু কোন যন্ত্রণাই অনুভব করলাম না। শুধু মনে হল, আমার মস্তিষ্কের ভিতর কেউ যেন একটা সুইচ অফ করে দিয়েছে, আর তারই ফলস্বরূপ নির্বাপিত হয়েছে কোন শক্তির উৎস শরীরের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হয়েছে অকেজো।

বালির উপর মুখ থুবড়ে পড়তেই অনুভব করলাম উষ্ণ উত্তাপ। দু-হাতে ধরা রিভলভারটা যেন অকস্মাৎ ময়দানবের প্রাসাদের মতোই ভারী ঠেকল। শত চেষ্টায়ও আর ধরে রাখতে পারলাম না।

রিভলভারটা হাত থেকে স্খলিত হয়ে বালিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছুঁচলো জুতোর কঠিন অগ্রভাগ সপাটে এসে আছড়ে পড়ল আমার পাঁজরে।

মনে হল, একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তার উত্তাপে আমার ভিতরটা পর্যন্ত পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে রক্তসমুদ্রের বিশাল ঢেউ যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে তার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসতে লাগল। চিৎকার করতে গিয়ে টের পলাম, সে-ক্ষমতাও আমি হারিয়েছি।

ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ উদ্দাম গতিতে ছুটে চলল বিপরীত দিকে—অন্ধকার চোখের সামনে ফিরে এল অতীতের সেই দৃশ্য—

কুপারের বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে আমি উন্মাদের মতো দৌড়চ্ছি। নিচে আসতেই আবার সেই দ্বাররক্ষীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি। তারপরই দেখলাম, আমি বৃষ্টি-ভেজা রাস্তা ধরে ছুটে চলেছি। পিছনে ধুপধাপ করে দৌড়ে আসছে সেই কালান্তক পুলিশটা—হঠাৎ কানে এল গুলির শব্দ—পরমুহূর্তেই এক প্রচণ্ড ধাক্কা—মুখ থুবড়ে রাস্তার পড়তেই টের পেলাম বৃষ্টির ফোঁটা ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে আমার চোখে-মুখে—আঃ—

পরে রয়ের কাছেই সমস্ত ঘটনা শুনেছিলাম। ওয়েন্টওয়ার্থ থেকে ফিরে এসে ওরা লক্ষ্য করে 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা। তাই দেখে রয়ের মনে কেমন যেন সন্দেহ হয়। ও আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করতে থাকে। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই বাইরে বালির উপর রয় আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করে। প্রথমে ও ভেবেছিল, আমি হয়তো আর বেঁচে নেই। কিন্তু পরে আমার অবস্থা বুঝতে পেরে, ও আর লোলা মিলে আমাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে আসে—রয়ের বিছানায় শুইয়ে দেয়। তার কিছু পরেই নাকি আমার জ্ঞান ফিরে আসে।

জ্ঞান যখন ফিরল, দেখি রয় আমার দেহের উপর ঝুঁকে রয়েছে। ওর মুখ ভয়ে সাদা হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। রয়ের ঠিক পিছনেই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে লোলা। উত্তেজনায় ওর মুখের রেখা কঠিন—চোখের তারায় কৌতূহল।

আস্তে পাশ ফেরার চেষ্টা করতেই বুঝলাম, সে শক্তিও আমার নেই।

আমাকে চোখ মেলাতে দেখেই লোলা রয়ের পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে এল। ঝুঁকে পড়ল আমার মুখের উপর—কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছিল, শেট? কে তোমার এ অবস্থা করেছে?'

শত চেষ্টাতেও আমার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না।

রয় আমার অবস্থা দেখে লোলাকে নিরস্ত করল, 'থাক, লোলা। ও এখন বিশ্রাম করুক। তুমি যাও আমি ওর পাশে বসছি।'

আমি আবার ভেসে চললাম অন্ধকারের রাজ্যে। একরাশ কালো অন্ধকার যেন উন্মত্ত আক্রোশে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। মনে হল, এই বোধহয় শেষ অন্ধকার—জীবনের ওপিঠ—মৃত্যু! কিন্তু আশ্চর্য, এই মৃত্যুভয় আমার মনে আশঙ্কার পরিবর্তে এনে দিল এক বিচিত্র প্রশান্তি। চেতনার সীমারেখা পার হতেই যন্ত্রণার রেশ ক্রমশ ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল। জমাট অন্ধকারের বিশাল টুকরো এসে আশ্রয় নিল দুচোখের পাতায়—

দ্বিতীয় বার চোখ মেলতেই জানালা দিয়ে ঠিকরে-আসা সোনালী রোদে কেমন অস্বস্তি বোধ করলাম। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর তাকিয়ে দেখি রয় তখনও আমার পাশেই বসে আছে। চোখের চিন্তাকুল দৃষ্টি আমার মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ। কিন্তু লোলাকে কোথাও দেখলাম না। সম্ভবত ও বাংলোয় ফিরে গেছে।

‘এখন কেমন আছিস?’ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রয় প্রশ্ন করল।

‘ভালোই।’

মনে হল, এই একটা শব্দ উচ্চারণ করতে শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে। নিজেকে এত দুর্বল লাগল, যেন দু-পাখার ভর করে অসীম শূন্যের দিকে ভেসে চলেছি। খাট, ঘর—সব যেন আস্তে আস্তে দুলছে—দুলছে—

‘শোন্ শেট,’ রয় খুব ধীরে অথচ স্পষ্ট করে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করল, ‘তোর শরীরের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। তাই আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু লোলা বারণ করল। ও বলল, তোর নাকি ডাক্তারের দরকার হবে না?’

‘লোলা ঠিক বলেছে, রয়।’ আপ্রাণ চেষ্টায় ক্ষীণস্বরে জবাব দিলাম।

‘কিন্তু আমার মনে হয়, ডাক্তার না ডাকলে যে-কোন সময় তোর কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।’ রয়ের কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন মনে হল, ‘আমার যথাসাধ্য আমি করেছি, শেট, কিন্তু আমি তো আর ডাক্তার নই!’

শরীর দুর্বল হলেও আমার চিন্তাশক্তি কিন্তু আচ্ছন্ন হয়নি। ডাক্তার ডাকার পরিণতি আমার অজানা নেই। ডাক্তার এসে যখনই দেখবে, আমি রিভলভারের গুলিতে আহত হয়েছি, তখনই সে পুলিশে খবর দেবে অর্থাৎ সেই ফার্নওয়ার্থ!

এমন সময় জানালা দিয়ে ভেসে এল হর্নের তীক্ষ্ণ শব্দ।

আপনমনেই গজগজ করতে করতে রয় উঠে দাঁড়াল, ‘শালা, এই ট্রাক-ড্রাইভারগুলো দেখছি আমাকে পাগল করে ছাড়বে! তুই শুয়ে থাক শেট, আমি এখুনি আসছি।’

চোখ বুঝে শুয়ে রইলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ছিলাম জানি না, হঠাৎ এক মৃদু শব্দে চমকে চোখ মেললাম। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ। দেখি, আমার মুখের ঝুঁকে রয়েছে লোলা।

‘শেট, কারা তোমাকে গুলি করেছে?’

‘দুজন লোক ওদের কাছে রিভলভার ছিল,’ অস্পষ্টস্বরে জবাব দিলাম।

লোলা মাথা আরও নামিয়ে আমার ঠোঁটের কাছে ঝুঁকে এল, ‘তুমি চেন ওদের?’

‘না—আগে কোনদিন দেখিনি।’

‘ওরা সিন্দুক খোলেনি তো, শেট?’

অতিকষ্টে চোখ ফিরিয়ে লোলার দিকে তাকালাম। ওকে আর আগের লোলা বলে চেনাই যায় না। গাল ভেঙে গেছে চোখের কোলে কালি এই ক-দিনে লোলার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। ওর ঠোঁটের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম সূর্যের পড়ন্ত আলোয় চকচক করছে। মুখ কাগজের মতো ফ্যাকাশে সাদা।

‘জানি না খুলেছে কিনা।’

বিছানায় শুয়ে সেই বিচিত্র শূন্যতার অনুভূতি সিন্দুকের চিন্তা আমার মন থেকে একেবারে মুছে দিল।

‘ওরা কি সিন্দুকের কথা জিগ্যেস করেছিল?’ লোলার স্বর উৎকণ্ঠায় কাঁপছে।

‘উহুঁ—’

‘শেট, সিন্দুকটা বাইরে থেকে বন্ধই আছে দেখে মনে হচ্ছে না ওটা কেউ খুলেছিল। কিন্তু তবু আমার নিশ্চিতভাবে জানা দরকার। যদি ওরা টাকাগুলো নিয়ে সিন্দুক বন্ধ করে দিয়ে থাকে, তাহলে?—শেট—শেট, আর একবার ভালো করে ভেবে দেখ!’ উত্তেজনায় লোলার সুডৌল স্তন সাদা গাউনের নিচে একবার উঠছে—একবার নামছে। সিন্দুকের চিন্তায় ও একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে।

আমার মনে পড়ল এডির কথা। এডির মতো পেশাদার লোক যদি সিন্দুকটা খুঁজে পেয়ে থাকে, তবে সেটা খুলতে ওর বেশি সময় লাগবার কথা নয়। কারণ সিন্দুক সম্বন্ধে সামান্যতম অভিজ্ঞতা যার আছে, সে-ই এক তুড়িতে ওই সিন্দুক খুলে ফেলবে।

‘জানি না। সিন্দুকটা দেখে থাকলে হয়তো নিতে পারে—।’

কথা বলার পরিশ্রমে মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল। আবার যেন ভেসে চললাম সেই শূন্যতার মধ্যে দিয়ে।

‘আমার জানা দরকার, শেট। সিন্দুকটা কী করে খুলতে হয় আমাকে বলে দাও।’

লোলার ফ্যাকাশে মুখে লোভ, উৎকণ্ঠার ছায়া—ওর ঘর্মাক্ত মুখ ঝুঁকে রয়েছে আমার মুখের উপর। নাকে আসছে ওর ঘামের গন্ধ। ওর কথাগুলো যেন শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনির মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘর ভরে ফেলল—আমাকে বলে দাও, আমাকে বলে দাও, আমাকে বলে দাও—

চোখের সামনে এসে দাঁড়াল সেই অন্ধকার, আমাকে ঘিরে ধরল চারদিক থেকে। ভেসে এল লোলার কণ্ঠস্বর, ‘বলো শেট—চুপ করে থেকো না। সিন্দুকটা কি করে খুলতে হয়, আমাকে বলে দাও। শেট—শেট—!’

লোলার স্বর, রয়ের ঘর—আর অস্তায়মান সূর্যের ম্লান আলোয় আলোকিত জানালা—সব-কিছুর সামনে কে যেন হঠাৎ টেনে দিল এক নিকষ কালো পর্দা।

জীবন-মৃত্যুর অনিশ্চয়তার দোলায় কেটে গেল তিনটে দিন। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শুধু শুধু আর পঙ্গু হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিনি। সব-কিছু ছেড়ে দিয়েছি ভবিতব্যের হাতে।

রয় যদি জীবনপণ করে এভাবে আমার সেবা না করত, তাহলে হয়তো এই তিনটে সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্যও আমার হত না। রাত নেই, দিন নেই—সব সময় রয় বসে থেকেছে আমার পাশে। জ্বরের সময় সারারাত ও আইস-ব্যাগ নিয়ে বসেছিল আমার মাথার কাছে। এক সেকেণ্ডের জন্যও দু-চোখের পাতা এক করিনি।

জ্বরে যখন গা পুড়ে যাচ্ছে, যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখছি, এমন সময় দেখলাম, আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কার্ল জেনসন। বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সে আমাকে দেখছে। যেমন দেখেছিল খোলা সিন্দুকের সামনে আমাকে আবিষ্কার করার পর। আমি জেনসনকে কি যেন বলতে গেলাম, কিন্তু ঠোঁট কেঁপে উঠলেও, হল না কোন শব্দের সৃষ্টি। আমার কথা বলার নীরব প্রয়াসকে অবহেলা করে জেনসন মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

পরে রয়ের কাছে শুনেছিলাম, সেই সময়েই নাকি আমার অবস্থা চরমে উঠেছিল। এমনকি রয়ও আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরই কোন-এক অলৌকিক শক্তিবলে আমার অবস্থা আবার ভালোর দিকে মোড় নিল। ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগলাম।

সাত দিনের দিন ফিরে পেলাম কথা বলার শক্তি। তখন রয়ের সঙ্গে এডি এবং সলের ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

কথা শেষ হলে রয় বলল, ‘ওরা ক্যাশ-বাক্স আর পেট্রল বিক্রির টাকা, সমস্ত ঝেড়ে পুঁছে নিয়ে গেছে। এমন কি খাবারগুলো পর্যন্ত বাদ দেয়নি।’

আবার মনে পড়ল সিন্দুকের কথা। এডি কি সিন্দুকটাকে রেহাই দিয়ে গেছে? কে জানে—

কিন্তু রয়কে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলাম না।

‘তোর আর-কোন ভয় নেই, শেট—এবারে তুই ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠবি। নেহাত কপালজোরে এ যাত্রা বেঁচে গেছিস। রয়ের শীর্ণ মুখে বিবর্ণ হাসির আভাস। এ ক-দিনের অনিদ্রায় ওর চোখ লাল—চোখের কোলে কালি।

‘এবারেও সেই তোর জন্যই বেঁচে উঠলাম, রয়। আমাকে দু-দুবার বাঁচিয়ে তুই আগের সমস্ত ঋণ শোধ করে দিলি। তোকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না—’

‘থাম্ শালা, থাম্—ঢের হয়েছে!’ কপট তিরস্কারের সুরে আমাকে বাধা দিল রয়, ‘কী আমার ভারি ইয়ে, তার আবার—। এ ক-টা দিন ভীষণ পরিশ্রম গেছে মাইরি। একবার তোকে দেখছি, আর একবার বাইরে গিয়ে গাড়িগুলোকে তেলমোবিল গেলাচ্ছি। ওফ—একটু ঘুমোতে পর্যন্ত পারিনি! দেখি, আজ একটা লম্বা ঘুম লাগাতে হবে।’

আট দিন আট রাত আমি অসহায়ভাবে বিছানায় পড়ে ছিলাম। কিন্তু লোলা একবারের জন্যেও আমার কাছে আসেনি। জানি না, এ ক-দিনে রয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

‘লোলার সঙ্গে তোর চলছে কেমন?’ ঠাট্টাচ্ছলে রয়কে প্রশ্ন করলাম।

ও নিস্পৃহভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, ‘ওর সঙ্গে তো বলতে গেলে দেখাই হয় না।—কি করে হবে বল্ না, দিন-রাত তো তোর কাছেই পড়ে আছি!’

রয়ের জবাব দেবার ধরন দেখে বুঝলাম, ও মিথ্যে বলছে। এমনকি আমার দিকে তাকাতে পর্যন্ত ওর বিবেকে বাধছে।

‘আমি তোকে বারবার সাবধান করেছি, রয়। লোলা সাপিনীর মতো খল—ওকে তুই এখনও চিনিসনি।’

‘নিশ্চিন্ত থাক্। লোলা যাই করুক না কেন, আমার কাছে বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না।’

কিছুক্ষণ আমরা পরস্পরের চোখে চোখ রাখলাম। হয়তো বোঝবার চেষ্টা করলাম একে অপরের অন্তরের কথা। একসময় রয়ই হঠাৎ প্রশ্ন করল, ‘শেট, সত্যি করে বল্ তো, জেনসনের আসলে কী হয়েছে?’

যদি না বুঝতাম, লোলাও ওর রূপযৌবনের প্রভাবে রয়কে আচ্ছন্ন করেছে, তাহলে হয়তো রয়ের কাছে জেনসন-নিরুদ্দেশ-রহস্য ফাঁস করতাম না। কিন্তু এখন যে করে হোক রয়কে নিরস্ত করার জন্য আমি মরিয়া। লোলার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে আমি আনবই—তা সে যেভাবেই হোক। তাই ওকে সত্যিই কথাই বললাম, ‘লোলা কার্লকে খুন করেছে—আর আমি বোকার মতো লোলার কথায় রাজি হয়ে সেই মৃতদেহটা করব দিয়েছি।’

একথা বলামাত্রই রয়ের চোখে ফিরে এল নির্বিকার শূন্য দৃষ্টি। পরিষ্কার বুঝলাম, আমার বক্তব্য ওর একেবারেই মনঃপূত হয়নি। অর্থাৎ, লোলা-বিরোধী কোন কথা শুনতে ও বিন্দুমাত্র রাজি নয়।

‘ জেনসনের আগে লোলা আরও একটা বিয়ে করেছিল,’ রয়ের উপেক্ষাকে অগ্রাহ্য করেই বলে চললাম, ‘এবং সেই স্বামীকেও লোলা নৃশংশভাবে খুন করেছিল। তুই সাবধান থাকিস, রয়, লোলার রক্তে মিশে আছে খুন করার নেশা। প্রয়োজন হলে তোকে খুন করতেও ওর হাত এতটুকু কাঁপবে না।’

‘কী উল্টোপাল্টা বকছিস?’ রয় আমার মুখের কাছে ঝুঁকে এল। বিস্ময়ে ওর চোখ বিস্ফারিত। চোয়ালে রেখা কঠিন।

‘যা বলছি, ঠিকই বলছি। তোকে আমি সব খুলে বলতে চাই, যাতে তুই সময় মতো সাবধান হতে পারিস।’

রয় উঠে দাঁড়াল, 'এসব বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই—আমি চললাম।'

'আমি তোকে তোর ভালোর জন্য বলছি, রয়। লোলাকে আমি যতখানি চিনি, তুই তা চিনিস না।'

রয় দরজার দিকে পা বাড়াল, 'যাই, ওদিকে আবার হাতের কাজ ফেলে এসেছি— বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। তুই চুপচাপ শুয়ে পড়, এসব নিয়ে আর ভাবিস না, কথা শেষ করে রয় আর দেরি করল না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

যাক, ওকে যে আগে থাকতে সাবধান করে দিতে পেরেছি, তাতেই আমার সান্ত্বনা। আমাকে আর জেনসনকে লোলা যত সহজে বোকা বানিয়েছে, রয়ের বেলায় ব্যাপারটা ততটা সহজ হবে না। কারণ, এখন থেকে রয়ও যথেষ্ট সাবধান হবে—লোলার প্রতি সবসময় লক্ষ্য রাখবে।

কিন্তু তখনও বুঝিনি, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে, রয়কে সাবধান করার আর প্রয়োজন নেই। কারণ, পরদিন রাতেই আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম।

আমার অসুখের পর থেকে রয় শোবার ঘরটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে রাত কাটাত। সম্ভবত আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই। কিন্তু জেনসনের মৃত্যুর কথা রয়কে খুলে বলার পরই আমাদের মাঝে গড়ে উঠেছে এক অদৃশ্য পাঁচিল। জানতাম, আমাদের মনের এই দূরত্ব পরস্পরকে চিরকাল দূরেই সরিয়ে রাখবে। আমাদের বোঝাপড়ার নিটোল ছন্দ সেই মুহূর্ত থেকেই বেসুর হয়ে গেছে। রয়ের নির্বিকার, অভিব্যক্তিহীন মুখভাবে সেটা আরও বেশি করে বুঝতে পারি। কিন্তু তার চেয়েও অস্বস্তিকর ঠেকে এই ঘরের পরিবেশ।

লোলার কথা নিয়ে আমরা কখনও আলোচনা করি না। কিন্তু মাঝেমাঝেই জানালা দিয়ে দেখি, রেস্তোরাঁ থেকে বাংলোর দিকে হেঁটে যায়। অথচ ভুলেও কোনদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি।

সেদিন রাত প্রায় এগারোটা বাজতেই দেখি, লোলা বাংলোয় ফিরে চলেছে। তার একটু পরেই নিভে গেল বাংলোর আলো। কিন্তু রেস্তোরাঁর আলো তখনও জ্বলছে—অর্থাৎ রয় এখনও কাজে ব্যস্ত।

রাত প্রায় বারোটার সময় রয় আলো নিভিয়ে রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর রেস্তোরাঁ বন্ধ করে ঘরে এল। বাইরে বসবার ঘরে ওর চলাফেরার শব্দ পেলাম। একটু পরেই ও হঠাৎ আমার ঘরের দরজা খুলে উঁকি মারল। কিন্তু আমাকে জেগে থাকতে দেখে কেমন থতিয়ে গেল, 'শেট—মানে তোর কোন দরকার হলে আমাকে ডাকিস। আমি পাশের ঘরেই আছি—একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি।'

বুঝলাম, এ ক-দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রয়ের আজ ঘুমোনো একান্ত প্রয়োজন। তাই ওকে বললাম, তেমন দরকার আমার হবে না। ও যেন নিশ্চিন্তমনেই ঘুমোয়।

রয় চলে যেতেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

জানি না রাত তখন কত হবে, হঠাৎ কানে এল শোবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ। অন্ধকারে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কানে এল রায়ের চাপা কণ্ঠস্বর, 'শেট, তুই কি ঘুমিয়ে পড়েছিস?'

কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। অন্ধকারে চোখে পড়ল দরজায় দাঁড়ানো রয়ের ছায়ামূর্তি।

ওর কথা বলার হাল্কা ফিসফিসে কণ্ঠস্বর আমাকে ভাবিয়ে তুলল। তাহলে কি?—

নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলাম। একটু পরেই শুনলাম দরজা বন্ধ করার মৃদু শব্দ। বুঝলাম, রয় ঘর থেকে চলে গেছে।

সব-কিছু জেনেশুনেও মনেপ্রাণে চাইলাম, আমার অনুমান যেন মিথ্যে হয়। রয় সম্বন্ধে আমার ধারণা যে এই অসুস্থ চিন্তার কলঙ্কিত না হয়। কিন্তু জানি, নিজেকে স্তোক দিয়ে লাভ নেই। কারণ, বাস্তবকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার কেন, এ পৃথিবীতে কারুরই নেই!

একে একে গড়িয়ে চলল এক-একটি উৎকণ্ঠাময় মুহূর্ত। জানালা দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম উঠোনের দিকে। একটু পরেই রয় অন্ধকার ছায়ার আশ্রয় ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে অথচ ক্ষিপ্রপায়ে এগিয়ে

চলল বাংলোর দিকে। যেতে যেতে একবার ও ঘুরে তাকাল, দেখল আমার ঘরের দিকে—কিন্তু পরমুহূর্তেই বাংলোর দরজা খুলে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

আমার বোঝা উচিত ছিল, একটানা এই আট রাত লোলা শুধু শুধু নষ্ট করেনি। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে রয়কে বোকা বানিয়েছে। আর, সঙ্গকামনায় চঞ্চল রয়, সে-প্রলোভনকে উপেক্ষা করতে পারেনি। সুতরাং ওকে দোষ দিয়ে লাভ কি!

অন্ধকারে শুয়ে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। ঈর্ষার বদলে অনুভব করলাম আতঙ্কের অস্তিত্ব। লোলা একবার যখন রয়কে কব্জা করেছে, তখন ওকে দিয়ে সিন্দুক লোলা খোলাবেই। তারপর ও রয়কে খুন করবে।—না, এ বিষয়ে এতটুকু সংশয়-সন্দেহ আমার মনে নেই।

রয়ের পর আমাকেও লোলার শিকার হতে হবে। তারপর টাকাগুলো জায়গা মতো লুকিয়ে ফেলে ও খবর দেব সেই শেরিফকে। পায়জামা পরে বিছানায় শোওয়া অবস্থায় আমার মৃত্যুর ব্যাখ্যা ও কি দেবে, ভেবে পেলাম না। তার উপর পুলিশ এসে দেখবে, আমি আগে থেকেই এডির গুলিতে আহত হয়ে অসুস্থ ছিলাম।

কিন্তু লোলা এতে থমকাবে বলে ভাবলে ভীষণ ভুল হবে। এই আট দিনেও হয়তো জুতসই একটা গল্পও তৈরি করে ফেলেছে—আমার এবং রয়ের মৃত্যুর ব্যাখ্যা হিসেবে। এডি এবং সলের চেহারার বর্ণনা আমি রয়কে দিয়েছি।

ইতিমধ্যে লোলা হয়তো সেই বিবরণ রয়ের থেকে জেনে নিয়েছে। পরে পুলিশ এলে ও বলবে, এই এডি এবং সলই আমাকে আর রয়কে খুন করেছে। আর সেই সময়ে লোলা নিজে ওয়েন্টওয়ার্থে ছিল। সুতরাং সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

লোলার স্বরূপ আমি জানি—ওর অসাধ্য কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।

বুকের যন্ত্রণা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানান চিন্তায় ভেসে চললাম। কিন্তু চোখজোড়া বাংলোর দরজায় নিবদ্ধ। রাত প্রায় দুটো নাগাদ রয় বাংলোর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে ঘরের দিকে আসতে লাগল।

নিঃশব্দে বসবার ঘরে এসে ঢুকল রয়। একই সঙ্গে আমিও হাত বাড়ালাম আলোর সুইচের দিকে। রয় আমার ঘরের দরজা খুলতেই আলো জ্বেলে দিলাম।

আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ও স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। ওর পরনে গেঞ্জি, পায়জামা। পায়ে জুতো বা চটি পর্যন্ত নেই।

‘আমি তোকে জাগাতে চাইনি, শেট। দেখলাম, তুই ঠিকমতো ঘুমোচ্ছিস কিনা।’

‘আয়, ভেতরে আয়। তোর সঙ্গে কথা আছে।’

রয়ের চোখে অস্বস্তির ছায়া কেঁপে উঠল, ‘না রে, এখন নয়। রাত প্রায় শেষ হতে চলল—একটা ঘুম দিয়ে নিই।’

‘তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে, রয়।’ আমার কথার সুরে রয় চমকে উঠল, এগিয়ে এসে আমার পাশে বসে ও একটি সিগারেট ধরাল, ‘বল্, কী বলবি।’

‘লোলা তোকে তাহলে শেষ পর্যন্ত ফাঁদে ফেলেছে, হুঁ?’

রয় কোন জবাব দিল না। হাতের সিগারেটে একটা গভীর টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। ধোঁয়ার পর্দার ওপিঠ থেকে ভেসে এল ওর কর্কশ কণ্ঠস্বর, ‘শেট, তোর শরীর ভালো নেই। এসব আজেবাজে ভাবনা ছেড়ে শুয়ে পড়। কাল সকালে কথা হবে—আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।’

‘আমি অসুস্থ ঠিক কথা। কিন্তু তা বলে ভাবিস না আমি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছি। আমার কথায় তুই যদি এখন থেকেই সাবধান না হোস, তবে তোর নিজের কবর তুই নিজেই খুঁড়বি। কিন্তু তুই আমার কথার জবাব দিল না তো?’

রয়ের অভিব্যক্তিহীন মুখে ফুটে উঠল একটা হিংস্র ভাব। নিজের বুকে আঙুলের টোকা মেরে ও বলল, 'কোন মেয়ের ফাঁদে এই রয় ট্রেসি কোনদিন পা দেয়নি—দেবেও না।'

'তুই কি নিজেকে স্তোক দিয়ে ভোলাতে চাইছিস। নাকি আমাকে নেহাত বোকা ঠাউরেছিস?'

আমার কাটা-কাটা কথা রয়ের মোটেই ভালো লাগল না। অধৈর্য হয়ে ও বলে উঠল, 'ঠিক আছে, তুই যখন না শুনেই ছাড়বি না—লোলার ফাঁদে আমি যে পা দিয়েছি, তা নয়—ওর দান আমি গ্রহণ করেছি বলতে পারিস্। এ বান্দাকে ফাঁদে ফেলা এত সহজ নয়।'

'লোলা কি তোকে কোন সিন্দুক খুলতে বলেছে?'

রয়ের ভুরু কুঁচকে উঠল সংশয়ভরা চোখে ও আমার দিকে তাকাল, 'সিন্দুক! কীসের সিন্দুক!'

'জেনসনের সিন্দুক।' ধীর স্বরে জবাব দিলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখভাব লক্ষ্য করতে লাগলাম।

রয় হতভম্ব চোখে চেয়ে রইল। চিন্তান্বিতভাবে মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, 'এমন কি আছে জেনসনের সিন্দুকে যে—?'

'তোকে খুলতে বলেছে কিনা বল্!'

রয়ের মুখ দেখে বুঝলাম, লোলা এখনও ওকে সে-কথা বলেনি। আমার উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস আর স্বাভাবিক হল। যাক, অন্তত এবারে লোলা আমাকে হারাতে পারবে না। আগেই রয়কে আমি সাবধান করে দেব।

'না, লোলা সে-রকম কথা তো কিছু বলেনি।' অবাক হয়ে জবাব দিল রয়।

'এখনও বলেনি—তবে বলবে। সে-বিষয়ে তুই নিশ্চিত থাকতে পারিস।'

রয় অধৈর্য হয়ে হাতের একটা ভঙ্গি করল, 'কী এত ধানাই-পানাই করছিস?' আসল কথাটা খুলে বল্ দেখি!

'শোন্ তাহলে জেনসনের সিন্দুকে একটা এমন একটা জিনিস আছে, যেটা না হলে লোলার চলবে না। আর সেটা পাওয়ার জন্য হেন কাজ নেই যে লোলা করতে রাজি নয়—এমন কি খুন করতেও ওর বিবেকে বাধবে না।

'ওই জিনিসটার জন্যই ও জেনসনকে খুন করেছে ভয় দেখিয়ে আমাকে দিয়েও সিন্দুক খোলাতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। আর এখন যেই তোকে হাতের কাছে পেয়েছে, ওমনি ওর কাজ শুরু হয়ে গেছে। লোলা জানে তুই সিন্দুক খুলতে জানিস তাই তোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছে। তোকে দিয়ে যে করে হোক সিন্দুক খুলিয়ে, ও তোকে খুন করবে।

'জানি, ব্যাপারটা তোর কাছে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ঠেকছে, কিন্তু এর প্রতিটি বর্ণ সত্যি। যে-মেয়ে ইতিমধ্যেই দু-দুটো খুন করেছে, তার কাছে আর একটা খুন করা কিছুই নয়! জেনসনকে খুন করার দিন আমাকেও খুন করত। শুধু অল্পের জন্য বেঁচে গেছি! আমার কথা বিশ্বাস কর—ওই সিন্দুকটা তুই কিছুতেই খুলিস না!'

কথা বলার পরিশ্রমে আমার সারা শরীর ঘেমে উঠল। বুকের যন্ত্রণায় নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসবে। আশা আর নিরাশার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে রয়কে লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিন্তু ওর অভিব্যক্তিহীন মুখে নিস্পৃহতার মুখোশ। শুধু চোখের তারায় ঈষৎ কালো ছায়া। অধৈর্য হয়ে ও প্রশ্ন করল, 'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? সিন্দুকে কি এমন আছে যে লোলার সেটা না হলে চলবে না?'

সিন্দুকে যে এক লাখ ডলার আছে, সে-কথা ওকে বলার মতো বুদ্ধিভ্রংশ তখনও আমার হয়নি। তাই একটা বিশ্বাসযোগ্য কাল্পনিক গল্প ওকে শুনিয়ে দিলাম, 'তোকে তো আগেই বলেছি, ওর প্রথম স্বামীকে খুন করার ব্যাপারে পুলিশ লোলাকে সন্দেহ করেছিল। এবং সে-সন্দেহ একেবারে মিথ্যে নয়। তাই লোলাকে বিয়ে করার আগে জেনসন ওকে দিয়ে ফিনির খুনের একটা স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়। তারপর নিজের নিরাপত্তার খাতিরে জেনসন সেটা সিন্দুকে বন্ধ করে রাখে। স্বীকারোক্তি লেখা সেই কাগজটা আমি দেখেছি

—বিশ্বাস কর লোলা জানে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ও সে কাগজটা হাতে পাচ্ছে, ততক্ষণ ওর জীবন বিপন্ন। যে-কোন সময় পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করতে পারে। পারে খুনের দায়ে চালান দিতে।'

রয় ঘাড়ে হাত বুলিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'শেট, তুই কি এগুলো সব বানিয়ে বলছিস, না সত্যি?'

'এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়, রয়। সেদিন জেনসনকে গুলি করার পর লোলা আমাকেও খুন করত। কিন্তু ও দ্বিতীয় বার ট্রিগার টেপার আগেই আমি সিন্দুকের দরজাটা বন্ধ করে দিই। ও জানত, আমার সাহায্য ছাড়া ওর পক্ষে সিন্দুক খোলা অসম্ভব তাই এতদিন আমাকে জিইয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন অবস্থা হয়ে উঠেছে আরও জটিল'—তুই যে সিন্দুক খুলতে জানিস সেটা জানার পর থেকেই লোলা আরও তৎপর হয়ে উঠেছে। ও জানে এখন আর আমার প্রয়োজন নেই।—সিন্দুকটা তুই কিছুতেই খুলিস না, রয়—আমার কথা শোন!'

'তোর কথামতো লোলা যদি তোকে খুনই করতে চাইবে, তাহলে এতদিন ওর সঙ্গে রাত কাটালি কেমন করে?'

রয় যে এ প্রশ্ন তুলবে তা জানতাম। কারণ কোন সুস্থমস্তিষ্ক সাধারণ মানুষের পক্ষেই এ প্রশ্ন করা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

'এর উত্তর খুব সোজা।' সহজ স্বরে রয়কে বললাম, 'লোলা জানত, যতদিন সিন্দুক বন্ধ আছে, ততদিন ওর পক্ষে আমার কোন ক্ষতি করা সম্ভব নয়। তাই আমাকে ওর দলে টানতে চেয়েছে। জেনসন মারা যাবার পর পাঁচটা সপ্তাহ আমরা চুপচাপ, একা একা কাটিয়েছি। তারপর একদিন রাতে লোলা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হল—তারপর যা হবার তাই হল ঠিক তোর বেলা যেমনটা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, তার আগে সে-রকম কোন চেষ্টাই আমি করিনি।'

হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে কথা শেষ করলাম। অনুভব করলাম মেরুদণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়া ঘামের শীতল স্রোত।

রয় বোধহয় আমার অবস্থা বুঝতে পারল। তাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল আমার কাছে, 'কীরে, কী হল তোর?—নে, চুপচাপ শুয়ে পড়্। একে তোর শরীর ভালো নয়, তার ওপর শুধু শুধু উত্তেজিত হয়ে পড়ছিস।'

আমি রয়ের হাত চেয়ে ধরলাম, 'যদি তুই সিন্দুকটা খুলিস, তাহলে আমরা কেউই লোলার হাত থেকে রেহাই পাব না! আমি তোকে বারবার বলে রাখছি, রয়—সিন্দুক খোলা মানে নিজেদের মৃত্যুকে ডেনে আনা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—ঠিক আছে। কিছু তুই মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস, শেট। লোলা সিন্দুক খোলার বিষয়ে এখনও আমাকে কিছুই বলেনি।'

ক্লান্ত দেহে বিছানার গা এলিয়ে দিলাম। অবসাদে চোখ বুঝে এল। আমার কর্তব্য আমি করেছি। রয়কে খোলাখুলি সব জানিয়ে সাবধান করে দিয়েছি। এখন বাকিটা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে মনে হয়, এবারের যুদ্ধে লোলা পরাজিত হবে। কিন্তু সে শুধু আশা ছাড়া আর-কিছু নয়; যে-আশা অন্ধ, যে আশা কুহকিনী।

সে-রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত রয় আমার পাশেই বসে রইল।

পরদিন সকলে যখন ঘুম ভাঙল, তখন টেবিল-ঘড়িতে দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট। একটানা লম্বা বিশ্রামের পর নিজেকে অনেক সবল মনে হল। মাথাটাও যেন আগের চেয়ে হালকা ঠেকল। কিন্তু বুঝলাম, উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা এখনও আমার হয়নি। পরে বেলার দিকে রয় এসে আমার দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিল। ও চুপচাপ থাকায় আমিও কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন করলাম না। কিন্তু জানতাম, সিন্দুকের ব্যাপারটা আমাদের দু-জনের মনকেই ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠেছি।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলল আরও একটা দিন। জানালার ধারে শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম বাইরের কর্মচাঞ্চল্য। লোলা আর রয় পরিশ্রম করে চলেছে অক্লান্তভাবে। রেস্তোরাঁ খদ্দেরের ভিড়ে জমজমাট।

রাত প্রায় দশটায় সময় হাতের কাজ হালকা হতেই রয় আমার ঘরে এল—হাতে এক বাটি স্যুপ। 'শালা, দিন গেল বটে একটা!' বাটিটা আমার হাতে দিয়ে ও পরিশ্রান্তভাবে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, 'তুই তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ কোট।'

'হ্যাঁ, আর ক-টা দিন সবুর কর।' ম্লান-হাসিতে মুখ ভরিয়ে জবাব দিলাম।

হঠাৎ রয়ের চোখে কেমন অস্বস্তিকর ভাব লক্ষ্য করলাম। নাকে একবার হাত বুলিয়ে ও বলে উঠল, 'একটু আগে খাবার সময় লোলা সিন্দুকের কথা বলেছে। জিগ্যেস করেছে একটা লরেন্স সিন্দুক আমি খুলতে পারব কিনা।'

আমার হাত কেঁপে গিয়ে খানিকটা স্যুপ বিছানায় চলকে পড়ল, 'লোলা তাহলে সিন্দুকের কথা তোকে বলেছে?'

'হ্যাঁ। তারপর আমি বললাম যে সিন্দুকটা না দেখা পর্যন্ত আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

আমার বুকের ভিতর তখন শুরু হয়ে গেছে তুমুল আলোড়ন। শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, 'তারপর?'

'তারপর একটা ট্রাক-ড্রাইভার এসে পড়ায় আর কথা বলার সুযোগ হয়নি।'

'তোকে আবারও বলছি রয়, সিন্দুকটা যতক্ষণ বন্ধ আছে, ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। কিন্তু—'

'জানি তুই কি বলবি।' আমাকে হাত তুলে বাধা দিল রয়, 'এতই যদি তোর ভয়, তাহলে জেনসনের সেই রিভলভারটা আমাকে দে না কেন?'

'রিভলভারটার আমার কাছে আর নেই। ওটা লোলা হাতিয়েছে।'

রয় ভীষণভাবে চমকে উঠল। কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

' লোলা আমাকে বলেছে, রিভলভারটা ও ওয়েন্টওয়ার্থের রাস্তায় পুঁতে ফেলেছে—কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম।'

'হুঁ—' চিন্তিতভাবে রয় জবাব দিল। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'যাক, এখনও পর্যন্ত যখন সিন্দুকটা আমাকে খুলতে বলেনি, তখন এসব ভেবে লাভ কি?'

'আমি জানি লোলা বলবে। তখন আরও একবার আমার কথাগুলো ভেবে দেখিস।' এরপর ও-বিষয়ে আমাদের আর কথা হল না।

পরবর্তী চারটে দিন সাধারণভাবেই কেটে গেল। রয় আমাকে বলেছে, লোলা এখনও ওকে সিন্দুক খোলার কথা বলেনি। জানি না, সত্যি কি না মিথ্যে!

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেও, বিছানা ছেড়ে নামার শক্তি এখনও আমার হয়নি। তবে সান্ত্বনার কথা, রয় আজকাল আর বাংলোয় শুতে যায় না। কেন জানি না, এতে আমি অনেকটা স্বস্তি বোধ করি। রয়ের এই হঠাৎ-উদাসীনতার কারণ সম্ভবত লোলার প্রতি ওর প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক। অর্থাৎ আমার কথা ওর মনে ধরেছে ঃ লোলা যে দু-দুটো খুন করেছে, সে-বিষয়ে রয়ের মনে আর সংশয় নেই।

কিন্তু পাঁচ দিনের দিন রাত তিনটের সময় আচমকা ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি, বাংলোর বসবার ঘরের আলো জ্বলছে। বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। বার কয়েক ঢোক গিলে রয়ের নাম ধরে আস্তে আস্তে ডাকলাম। কিন্তু কোন উত্তর নেই। অর্থাৎ রয় এখন বাংলোর বসবার ঘরে—সেখানে ওর সঙ্গে রয়েছে লোলা, আর সেই অভিশপ্ত সিন্দুক!

মনে হলে বিছানা ছেড়ে এখনই ছুটে যাই বাংলোয় কিন্তু জানি, আমার এই অসুস্থ দেহ নিয়ে তা সম্ভব নয়। সুতরাং নির্নিমেষে বসবার ঘরের আলোকিত জানালার দিকে চেয়ে গুনতে লাগলাম হৃৎপিণ্ডের উন্মত্ত স্পন্দন।

রাত প্রায় চারটের সময় বাংলো আলো নিভে গেল। এবং তার একটু পরেই রয় বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। সোজা হেঁটে আসতে লাগল ঘরের দিকে।

সদর-দরজা খোলার শব্দ হতেই চাপাস্বরে রয়কে ডাকলাম। একটু পরেই আমার ঘরের দরজা খুলে গেল।' ভেসে এল রয়ের গলা, 'আলো জ্বালাস না। আলো দেখতে পাবে।'

অন্ধকারের আস্তরণ ভেদ করে রয়কে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই নজরে এল না। 'এতক্ষণ কি করছিল বাংলোয়?'

'লোলা আমাকে সিন্দুকটা দেখিয়ে খুলতে বলছিল। আমি বললাম, এটা খুব পুরোনো মডেলের—আমার পক্ষে খোলা সম্ভব নয়।'

আমার বুক ভেদ বেরিয়ে এল স্বস্তির নিশ্বাস। 'তারপর কী হল?'

'লোলা বলল, কম্বিনেশন নম্বর ছাড়া অন্য কোনভাবে হয়তো ওটা খোলা সম্ভব। সিন্দুকের দরজাটা ডিনামাটই দিয়ে উড়িয়ে দিলে কেমন হয়। তখন আমি বললাম, সেটা বিপজ্জনক হবে। তাছাড়া ডিনামাইট ব্যবহারে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই।'

'ও তোর কথা বিশ্বাস করল?'

'কেন করবে না? আমি এমনভাবে বলেছি—'

'সিন্দুকে কি আছে, কেন ও সিন্দুক খুলতে চায়, সে-বিষয়ে তোকে কিছু বলেছে?' আমার উদগ্র কৌতূহল আর বাধ মানতে চাইছে না। অশান্ত তরঙ্গের মতোই আছড়ে পড়ছে মনের ভিতর।

'হ্যাঁ, বলেছে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রয় বলল, সিন্দুকে নাকি প্রচুর টাকা আছে, সিন্দুক খুললে লোলা আমাকেও সে-টাকার ভাগ দেবে বলেছে।' আরও কিছুক্ষণ নীরবতার পর রয় মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, 'শেট, সত্যিই কি সিন্দুকে টাকা আছে?'

এক্ষেত্রে ওকে সত্যি কথা বলা মানে সর্বনাশ ডেকে আনা। সুতরাং বাধ্য হয়েই মিথ্যে বললাম, 'আছে, তবে মাত্র তিনশো ডলার। জেনসন দুঃসময়ের সঞ্চয় হিসেবে এই টাকাটা সিন্দুকে জমিয়ে রেখেছিল। কিন্তু লোলা ওই তিনশো ডলারের জন্য নয়, ও চায় সেই স্বীকারোক্তি লেখা কাগজটা।'

'কিন্তু ও যে বলল সিন্দুকে প্রায় এক লাখ ডলার আছে?' রয়ের মুখে বিস্ময়ের ছায়া।

'লোলা মিথ্যে কথা বলছে। তোকে দিয়ে সিন্দুকটা খোলানোর জন্য ও এই টাকার টোন ফেলেছে।'

'হুঁ—' চিন্তান্বিতভাবে রয় জবাব দিল, 'তাই যদি হয়, তাহলে লোলাকে হতাশ হতে হবে।' শেষদিকে ওর গলায় স্বর কঠিন মনে হল।

পরদিন সকালে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিলাম। দেখছিলাম পাম্পের কাছে কর্ম-ব্যস্ত রয়কে। এমনসময় কানে এল দরজা খোলার শব্দ। চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখি, লোলা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। উত্তেজনায় ওর শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর। সবুজ চোখজোড়া স্থিরভাবে আমারই দিকে চেয়ে আছে।

আজকের লোলাকে চিনতে আমার কষ্ট হল।

কোথায় ওর সেই সুললিত কোমল যৌবন? তার বদলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে শীর্ণ চেহারার একটি অপরিচিতা মেয়ে। মুখের রেখা কঠিন। গাল ভেঙে চোয়ালের হাড় হয়ে উঠেছে প্রকট। কোটরাগত চোখের কোলে কালি। এ ক-দিনে ওর শরীরের উপর যেন বয়ে গেছে এক প্রচণ্ড মানসিক ঝড়।

লোলা ওর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে রইল। না, আর সব-কিছু অচেনা লাগলেও লোলার এই সাপিনী-সবুজ চোখ আমার অনেকদিনের চেনা।

'কী করে সিন্দুক খুলতে হয় আমাকে বলে দাও।' কর্কশ-কাঁপা গলায় লোলা বলে উঠল, যদি না বল তাহলে আমি এখুনি পুলিশে ফোন করব। তোমাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই ফার্নওয়ার্থে।'

কিন্তু লোলা জানে না ব্ল্যাকমেলের ভয় আমি আর এখন করি না। ভাগ্যচক্রে রঙের তাস এখন আমার হাতে।

'তবে আর দেরি করছ কেন? যাও, পুলিশে খবর দাও। ওই এক লাখ ডলারের আশা তুমি আর করো না। তাছাড়া, পুলিশকে আমিও বলে দেব জেনসনের মৃতদেহ কোথায় লুকোনো আছে। ভেব না, পুলিশ আমার কথা অবিশ্বাস করবে, আর তোমার কথায় সায় দেবে। কারণ তুমিও তো আর ধোয়া তুলসীপাতাটি নও! ওদের যদি জানিয়ে দিই ফ্র্যাঙ্ক ফিনির কথা, তাহলে তোমাকে আর রক্ষা পেতে হবে না!'

আমার শেষ কথাটা লোলাকে ভীষণভাবে আঘাত করল। ওর শরীরটা পলকে যেন পাথর হয়ে গেল। হঠাৎ পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল লোলা। কিন্তু দরজার গায়ে ধাক্কা লাগতেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা চাপা আর্তচিৎকার। অন্ধ-আতঙ্কের নিবিড় ছাড়া কেঁপে উঠল ওর সবুজ চোখে।

'ফ্র্যাঙ্ক সম্বন্ধে তুমি কি জান!' আগুনঝরা চোখে জানতে চাইল লোলা।

'আর-কিছু না জানলেও, তুমি যে ওকে খুন করেছ, তা জানি। মিথ্যে রাগ দেখিয়ে লাভ নেই, লোলা। দুজনেই এখন ফাদে জড়িয়ে পড়েছি। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, বাকি দিন ক-টা আমাদের এভাবেই একসঙ্গে কাটাতে হবে। এছাড়া আর কোন পথ আমাদের নেই। সেই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রেখ। জেনসনের সিন্দুকটা যেমন আছে, তেমনই থাকবে। কেউই ওটা খুলতে যাচ্ছে না। রয়কে আমি তোমার সম্বন্ধে সব কথা জানিয়ে সাবধান করে দিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া, সিন্দুক কি করে খুলতে হয়, তাও জানে না ও। সুতরাং, শুধু শুধুই তুমি রয়ের পেছনে সময় আর বুদ্ধি খরচা করছ।'

বহুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল লোলা। জ্বলন্ত সবুজ চোখে শুধুই ঘৃণা। তারপর একসময় ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল! যাবার সময় খুলে রেখে গেল ঘরের দরজা।

এই পরাজয়কে সাময়িকভাবে মেনে নিলেও লোলা আমাকে সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। আহত নাগিনীর মতোই ও হয়ে উঠেছে ক্রূর, প্রতিহিংসাপরায়ণ। সতর্ক না থাকলে যে-কোন মুহূর্তেই লোলা চরম আঘাত হানবে।

মানসিক অস্বস্তি ও উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে এর পরের দুটো দিন নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। কিন্তু তৃতীয় দিনের দিন রয় হঠাৎ আমাকে এসে বলল, লোলা ওয়েন্টওয়ার্থে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল বিপদের রক্তর-সংকেত। 'তার মানে ও তোকে এখানে রেখে যাচ্ছে?' রয়ের দিকে সন্দেহভরা চোখে তাকালাম। রয় অস্বস্তিভরে কাঁধ ঝাঁকাল, 'তুই তো জানিস, লোলা সিনেমা দেখতে ভীষণ ভালোবাসে। ও আমাকেও যেতে বলেছিল, কিন্তু তোকে এই অবস্থায় একা ফেলে রেখে আমি কী করে যাই বল? তাছাড়া, জায়গাটা দেখাশোনা করার জন্যও তো একজনের থাকা দরকার—।'

'নিজেকে ছলনা করার চেষ্টা করিস না, রয়। তুই ভালোভাবেই জানিস, লোলা সিনেমায় যাচ্ছে না। তোর সামনে টোপ ফেলে তোকে সেটা গেলবার একটা সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে।'

রয় অধৈর্যভাবে হাত নাড়ল, 'কী আবোল-তাবোল বকছিস? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? একটু থেমে ও আবার বলল, 'শেট, তুই সত্যি সত্যি কি ভাবছিস বল্ তো?'

'লোলা তোকে বলেছে, সিন্দুকে অনেক টাকা আছে, কেমন? এতদিনে ও বুঝে গেছে, এই দুনিয়ায় টাকাই তোর কাছে সব। সুতরাং তোর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ও তোকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। লোলা জানে, ও সিনেমায় যাওয়ামাত্রই তুই সিন্দুক খুলতে চেষ্টা করবি। তাই ও সিনেমায় যাওয়ার ছল করে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকবে। তারপর হঠাৎ ফিরে এসে লোলা খোলা-সিন্দুকসুদ্ধ তোকে হাতেনাতে ধরে ফেলবে। বুঝতেই পারছিস, তোকে বোকা বানিয়ে কার্যোদ্ধার করার এই একটাই মাত্র পথ আছে! তাই লোলা মরিয়া হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায়। এত সহজে ও হার মানতে রাজি নয়।'

‘তোকে তো বলেছি শেট, সিন্দুক আমি খুলছি না।’

‘ভালো কথা। তবে লোলা সিনেমায় যাওয়ার পরও যেন কথাটা মনে থাকে।’

রাত দশটার কিছু পরেই দেখি লোলা মার্কারির দিকে এগিয়ে চলেছে, আর রেস্তোরাঁর কাছ থেকে ওকে লক্ষ্য করছে রয়। লোলা গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পরও রয় কোমরে হাত দিয়ে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, ওর মুখ উত্তেজনায় কঠিন। স্থির দুই চোখে ও তাকিয়ে আছে মার্কারির মিলিয়ে-আসা লাল আলোর দিকে। শেষে বালিয়াড়ির আড়ালে সে আলো মিলিয়ে গেলেও রেস্তোরাঁয় ফিরে চলল।

রয় রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। জানালা দিয়ে চেয়ে রইলাম আকাশের দিকে। আসন্ন কোন দুর্ঘটনার প্রতীক্ষায় সময় গুনে চললাম। একটা আবছা শীতল অনুভূতি আমাকে ঘিরে ধরল। যেন কানে কানে বলল, এই আমার জীবনের শেষ রাত। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলাম জীবন-পথের শেষ মাইলস্টোনের পাশে পরিশ্রান্ত দেহে, অবসন্ন মনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ওপারের চিরশান্তির জগৎ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

মানসচক্ষে পরিষ্কার দেখতে পেলাম, রান্নাঘরে পায়চারিরত চঞ্চল রয়কে। ওর বিচক্ষণ, লোভাতুর মন অত্যন্ত সতর্কভাবে আমার আর লোলার কথাগুলো বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখছে। সত্যিই কি এক লাখ ডলার আছে জেনসনের সিন্দুকে? নাকি রয়েছে শুধু লোলার স্বীকারোক্তি লেখা কাগজটা? ওকে দিয়ে সিন্দুক খোলানোর জন্যই কি আজ রাতে লোলা ফাঁদ পেতে গেছে?

এইসব জটিল সমস্যা সমাধানের দুরূহ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রয়ের সুযোগসন্ধানী মন। এইভাবে এক ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু কিছুই ঘটল না। সময় আর কাটতেই চায় না। ঘড়ির কাঁটা যেন এগিয়ে চলেছে শম্বুক গতিতে।

একসময় হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা ট্রাক এদিকে এগিয়ে আসছে। ট্রাকটা ধীরে ধীরে পাম্পের কাছে এসে থামল।

গাড়ির শব্দে রয় রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। ট্রাকের ট্যাঙ্কে তেল ঢালতে ঢালতে দু-একটা কথাও বলল ড্রাইভারটার সঙ্গে। তারপর তেলের দাম মিটিয়ে লোকটা ট্রাক ছেড়ে দিল।

বুঝলাম, এই সেই সংকটময় মুহূর্ত। রয়ের দ্বিধাগ্রস্ত মন এই মুহূর্তেই নেমে এক চরম সিদ্ধান্ত। হঠাৎ বুকের মধ্যে যেন দুন্দুভি বেজে উঠল। গলাটা কেমন যেন শুকনো ঠেকল। রয় পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে ওয়েন্টওয়ার্থের পাহাড়ী রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করেও যখন কোন গাড়ির হেডলাইট ওর নজরে পড়ল না, তখন ও দ্রুতপায়ে হেঁটে চলল বাংলোর দিকে।

ওর অসীম অর্থলিপ্সা লোলার প্রলোভনকে এড়াতে পারল না। বুঝলাম, রয় টোপ গিলেছে। ও এখন যাচ্ছে সেই অভিশপ্ত সিন্দুক খুলতে।

বাংলোর দরজার কাছে পৌঁছে রয় একটু থামল। ও নিশ্চয়ই আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। কারণ মিনিটখানেক কি-সব খুটখাট করেই বাংলোর দরজা খুলে ফেলল। তারপর পিছনে এক পলক নজর বুলিয়ে বাংলোয় ঢুকে পড়ল।

কিন্তু একটু পরেই ও আবার বেরিয়ে এল। বাংলোর দরজায় দাঁড়িয়ে ওয়েনন্টওয়ার্থের আঁকাবাঁকা রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। সম্ভবত দেখছে, লোলা ফিরে আসছে কিনা! তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ঢুকে পড়ল বাংলোয়।

রয়ের এই অতিরিক্ত সাবধানতায় আমার হাসি পেল। লোলাকে ও এখনও ঠিক চিনতে পারেনি। ফিরে লোলা আসবেই, এবং সম্পূর্ণ রয়ের অজ্ঞাতে।

একটু পরেই বাংলোর বসবার ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

সিন্দুক খুলতে রয়ের হয়তো মিনিট চারেক লাগবে। তারপরই ও বুঝতে পারবে লোলার কথাই সত্যি। দেখবে, সিন্দুকে সাজানো রয়েছে এক লাখ ডলার। না, এখন আর ওকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। আমার যথাসাধ্য আমি করেছি। কিন্তু এই তাসের জুয়ায় শেষ পর্যন্ত আমি লোলার কাছে হেরে গেছি।

এমন সময় লোলাকে দেখতে পেলাম। রয় রেস্তোরাঁয় ঢুকবার পরেই ও হয়তো গাড়ি থামিয়েছে পাহাড়ি রাস্তায়। তারপর হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে অতি সন্তর্পণে ফিরে এসেছে 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন'-এ। নাঃ, লোলার দক্ষতার প্রশংসা করতেই হবে! কারণ আমি সারাক্ষণই জানালা দিয়ে চেয়েছিলাম বাইরের রাস্তায়। কিন্তু ওকে ফিরে আসতে বা গাড়ি থামাতে আমিও দেখিনি।

কিন্তু ওই তো লোলা বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলেছে বাংলোর দিকে। চন্দ্রালোকে আলোকিত বালির উঠোনটুকু পার হওয়ার সময় দেখলাম ওর সবুজ পোশাক। জেনসনকে খুন করার সময়ও ওর পরনে এই একই পোশাক ছিল। হয়তো এই সবুজের আড়ালেই লুকিয়ে আছে রয়ের মৃত্যুসঙ্কেত!

শেষ পর্যন্ত লোলার ফাঁদে রয় ধরাই পড়ল।

যেন দেখতে পেলাম সিন্দুকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে-থাকা রয়কে। ও হতভম্ব হয়ে চেয়ে রয়েছে থাকে থাকে সাজানো এক লাখ ডলারের দিকে। ওই অবস্থায় বসবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ ওর কানেও ঢুকবে না। তারপরই লোলা ওকে খুন করবে। না, এ-বিষয়ে আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। রয় এখন জানে না মৃত্যু গুড়ি মেরে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে চলেছে। বসবার ঘর এখন লোলার কাছ থেকে আর মাত্র কয়েক গজ দূরে।

আর সহ্য করতে পারলাম না। এক ঝটকায় গায়ের চাদর ছুড়ে ফেলে বিছানায় উঠে বসলাম। টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। মাথাটা অসম্ভব ভারী ঠেকল। দরজার হাতলে ভর দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলছে। কিন্তু আমার তখন ওসব ভাববার সময় নেই। মনের মধ্যে শুধু একটাই চিন্তা—বাংলোয় গিয়ে যে করে হোক রয়কে বাঁচাতে হবে।

কোনরকমে দরজা খুলে বসবার ঘরে এলাম। সদর-দরজা খুলে বাইরে বালিতে পা রাখতেই বুকের কাছটা কেমন উষ্ণ, ভিজে ঠেকল। বুঝলাম, পুরোনো ক্ষত থেকে আবার রক্তস্রাব শুরু হয়েছে। কিন্তু সেসব গ্রহ্য না করে পা বাড়ালাম। কিন্তু লোলাকে বাইরে কোথাও দেখলাম না। তাইলে কি?

হাঁপাতে হাঁপাতে, টলতে টলতে এগিয়ে চললাম বাংলোর দিকে। আমার বুক, পেট ঊরু তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সর্পিল রেখায় গা বেয়ে এগিয়ে চলেছে রক্তের উষ্ণ ধারা। কিন্তু আমি না থেমে এগিয়ে চললাম।

বাংলোর দরজার কাছে পৌঁছতেই কানে এল রিভলভারের চাপা গম্ভীর শব্দ। হৃৎপিণ্ড ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়ল বুকের ভিতর। ভিজে চড়ুইয়ের মতো কাঁপতে লাগলো থরথর করে। সেই সঙ্গে গুরুভার কিছু পতনের শব্দে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে এক ধাক্কায় খুলে ফললাম বাংলোর ভেজানো দরজা। টলতে টলতে বসবার ঘরে ঢুকলাম।

দেখি, রয় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে—ওর হাতের মুঠোয় জেনসনের .৪৫ রিভলবারটা। সিন্দুকের দরজা হাট করে খোলা। পরিষ্কার নজরে পড়ছে থরে থরে সাজানো নোটের বান্ডিলগুলো। রয়ের পায়ের কাছে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে লোলা। ওর কপালের বিশ্রী কালো ফুটোটা জানিয়ে দিচ্ছে রয়ের নির্ভুল লক্ষ্যভেদের কথা।

লোলা যে বেঁচে নেই, এ-কথাটা বুঝতে আমার দেরি হল না। কারণ, কপাল ওইরকম বীভৎস ফুটো নিয়ে কেউ কখনও বেঁচে থাকতে পারে না।

আমি আর রয় পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। ওর মুখ রক্তহীন, পাণ্ডুর, নাকের উপর জমে-ওঠা ঘামের ফোঁটা ঘরের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে।

'তুই ঠিক বলেছিলি, শেট।' ভাঙা ফিসফিসে স্বরে রয় বলে উঠল, 'তুই যদি আগে থাকতে আমাকে সাবধান করে না দিতিস, তাহলে এখানে লোলার জায়গায় আমিই পড়ে থাকতাম।

হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার হাত-পা সব শক্তির অভাবে শিথিল হয়ে আসছে। কোনরকমে গিয়ে একটা চেয়ার গা এগিয়ে দিলাম। আমার গেঞ্জি, পায়জামা, সব রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। বুকের ব্যান্ডেজের কাছটায় কেমন একটা কালচে ভাব। রয় নির্বাক হয়ে লোলার মৃতদেহের দিকে চেয়ে রইল। আমিও যে ঘরে উপস্থিত রয়েছি সে-কথা ও যেন ভুলেই গেল।

'রয়, আমাদের পালাতে হবে!' বুকের রক্তে-ভেজা ব্যান্ডেজ দু-হাতে চেপে ধরলাম, 'শিগগির গাড়িটাকে বাংলোর কাছে নিয়ে যায়! পুলিশ এসে গেলে আমরা বিপদে পড়ে যাব! নে, টাকাগুলো চটপট গুছিয়ে নে! এখনও সময় আছে!'

রয় ঘড় ফিরিয়ে একবার খোলা সিন্দুকের দিকে তাকাল, তারপর আচ্ছন্ন স্বরে বলে চলল, 'লোলা, ঘরে ঢুকতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কাছ থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি ওখে খুন করতে চাইনি।'

'যা গাড়িটা নিয়ে আয়! শিগগির! আমাদের যে করে হোক পালাতে হবে!' কথাগুলো আমার নিজের কানেই কেমন অস্পষ্ট ঠেকল। যেন বহুদূর থেকে কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে। রক্তপাতের পরিণতি হিসেবে চোখজোড়া শ্রান্তিতে বুঝে আসতে চাইল।

'হুঁ, যাচ্ছি।' বলে রয় সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গেল। এক হাতে টেবিলক্লথটা টেনে নিয়ে নোটের বান্ডিলগুলো তার উপর রাখতে লাগল।

'রয়, আমার ব্যান্ডেজটা একটু ঠিক করে দে আর কোটটা নিয়ে এসে আমার গায়ে জড়িয়ে দে। নয়তো এভাবে রক্ত পরেই হয়তো মারা যব।'

রয় ফিরে তাকাল আমার দিকে। ওর মুখে এমন একটা অদ্ভুত ভাব, যা আমি আগে কোনদিন দেখিনি। রয়কে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হল।

টাকাগুলো টেবিলক্লথ দিয়ে বেঁধে ও উঠে দাঁড়াল। কর্কশ লোভাতুর স্বরে বলে উঠল, 'তুই আর কদ্দিন বাঁচবি বলে তোর ধারণা, শেট? এখন আর তোর কোন দাম নেই। তুই চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছিস। আর এই টাকা নিয়ে আমি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারব—যেভাবে চিরকাল আমি বাঁচতে চেয়েছি। গাড়িতে তোকে জায়গা দিতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত, শেট। না—না ওমনি করে আমার দিকে তাকাস না। তুই কি ভাবছিস তোর দাম এক লাখ ডলারের চেয়েও বেশি? উহুঁ এই পৃথিবীতে কোন মানুষের দামই এক লাখ ডলারের চেয়ে বেশি নয়।' রয় টাকার পুঁটলিটা আমার চোখের সামনে বারকয়েক ঝাঁকাল, 'তুই-ই তো সেদিন বলেছিলি, তোকে দু-বার বাঁচিয়ে তোর সব ঋণ আমি শোধ করে দিয়েছি, তাই তো? অতএব এবারে আমি চললাম। পরে আবার বলিস না যেন, রয় নিষ্ঠুর, রয় অকৃতজ্ঞ!'

হঠাৎ আমার উত্তেজিত মন ভীষণ শান্ত হয়ে পড়ল। রয়কে একটুও বাধা দেবার চেষ্টা করলাম না। জানালা দিয়ে দেখলাম, মার্কারির হেডলাইট জ্বলে উঠল। তারপর গাড়িটা মোড় দিয়ে ছুটে চলল পাহাড়ের দিকে! যে-পাহাড়ের ওপারেই রয়েছে আমার কল্পনায় আশ্রয়স্থল—ট্রপিকা স্প্রিংস।

চোখ নামিয়ে লোলার দিকে তাকালাম। অসহায়ভাবে ও মেঝেতে শুয়ে—সারা মুখ রক্তাক্ত। চোখ-মুখ আতঙ্কে বিকৃত। ভাবতে অবাক লাগল, এই কুৎসিত, ভয়ঙ্কর মেয়েটার শরীরে আমি আমার প্রেমকে জলাঞ্জলি দিয়েছি।

চেয়ারের হাতল দুটো সজোরে আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলে নিলাম। শরীরের সব শক্তি মিলিয়ে গিয়ে চোখে নেমে আসছে নিঃসীম অন্ধকার। জানি, আজ নয় কাল, কেউ-না-কেউ আসবে এই 'পয়েন্ট অফ নো

রিটার্ন-এ। দেখতে পাবে এই ঘরের আলো। তারপর জানালায় উঁকি দিয়ে আবিষ্কার করবে আমাকে আর লোলাকে।

যদি ততক্ষণ বেঁচে না থাকি তো চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু যদি ওরা আমাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে বাঁচিয়ে তোলে, তাহলে আবার ফার্নওয়ার্থ!

ওরা বিশ্বাস করবে না, লোলাকে আমি খুন করিনি! আমাকেই জেনসনের মৃত্যুর জন্য দায়ী করবে! ভুলেও ভাববে না রয়ের কথা, লোলার কথা।

সুতরাং বুকভরা আশা নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় রইলাম। আসুক সেই চির অন্ধকার, আমার কপালে এঁকে দিক মৃত্যুর স্নেহ-চুম্বন। সেই হবে আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

আশ্চর্যভাবেই হঠাৎ এল হারিয়ে-যাওয়া অতীতের স্মৃতি। জীবনের এই প্রথম মনে পড়ল মায়ের কথা, মনে পড়ল আমাদের ছোট্ট বাড়িটার কথা—কিন্তু রয়ের কথা মনে পড়তেই ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল। আমাদের ছোটবেলার সেই খুশির দিনগুলো আরও একবার ভেসে উঠল আর হঠাৎই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল নিদারুণ বাস্তবের কঠিন আঘাতে। ছেলেবেলার রয় আর আজকের রয়, এই দুয়ের মধ্যে কি বিশাল ব্যবধান! বুকের যন্ত্রণা যেন আরও বেড়ে উঠল। শুনতে পাচ্ছি মৃত্যুর হালকা পায়ের ছন্দ—সে যেন এগিয়ে আসছে নিঃশব্দ চরণে—আসছে—সে আসছে—সে আসছে।

কাম ইজি—গো ইজি

আলোছায়ার খেলা

আগাথা ক্রিস্টি



প্রথম পরিচ্ছেদ

১

১৭৮২ সালে ক্যাপ্টেন রজার অ্যাংমারিং যখন লেদারকোম্ব উপসাগরে এক দ্বীপে একটি বাড়ি তৈরি করলেন, তখন সেটাকে তাঁর খামখেয়ালিপনার চূড়ান্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিলো। তাঁর মতো একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে, নদী-বয়ে-যাওয়া, সবুজ-ঘাসে-ছাওয়া কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে একটা প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরি করাটাই ছিলো বেশি স্বাভাবিক।

কিন্তু ক্যাপ্টেন রজার অ্যাংমারিং-এর পরম ভালোবাসা ছিলো একটিমাত্র জিনিসের প্রতি—সমুদ্র। সুতরাং প্রয়োজন অনুয়ায়ী বেশ শক্ত কাঠামোয় তিনি বাড়িটা তৈরি করলেন, চঞ্চল বাতাস ও গাঙচিল অধ্যুষিত ছোট্ট পাথুরে অন্তরীপের ওপর—জোয়ারে সময় সেটা মুল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো।

তিনি বিয়ে করেননি, সমুদ্রই ছিলো তাঁর প্রথম ও শেষ সঙ্গিনী, এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই বাড়ি এবং দ্বীপের মালিক হলেন তাঁর দূরসম্পর্কে এক ভাই। সেই ভাই এবং তাঁর বংশধরেরা এই সম্পত্তি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালেন না। তাঁদের নিজেদের জমি-জমা ক্রমশ কমে আসছিলো এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের অবস্থা ক্রমে যেতে লাগলো খারাপের দিকে।

অবশেষে ১৯২২ সালে ‘সমুদ্রতীরে-অবসর যাপনের’ সৌখিন রীতি যখন প্রচলিত হলো এবং গ্রীষ্মকালেও ডেভন ও কর্নওয়াল উপকূলের আর অসহ্য বলে মনে হলো না, আর্থার অ্যাংমারিং আবিষ্কার করলেন, তাঁর বিশাল অসুবিধাজনক জর্জীয় বাড়ি আর বিক্রি হবার নয়, কিন্তু সমুদ্রচারী ক্যাপ্টেন রজারের সংগ্রহ করা অন্যান্য সম্পত্তির বিনিময়ে তিনি ভালো দামই পেলেন।

সুদৃঢ় বাড়িটাকে পরিবর্ধনের পর সাজিয়ে তোলা হলো। মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপ পর্যন্ত তৈরি হলো একটা কংক্রিটের সেতু। পরিকল্পনা-মাফিক দ্বীপের সর্বত্র তৈরি হলো ‘মনোরম পথ’ ও অবসর যাপনের নিভৃত স্থান।’ তৈরি হলো দুটো টেনিস কোর্ট, ভেলা ও স্প্রীং-পাটাতনে সাজানো সৈকতের দিকে নেমে আসা খোলা চত্বর। জলি রজার হোটেল স্মাগলার্স দ্বীপ, লেদারকোম্ব উপসাগর একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করলো বিজয়ীর ভঙ্গিতে। এবং জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (সেই সঙ্গে ইস্টারে ছোট্ট মরসুমেও) জলি রজার হোটেলে সাধারণ তিলধারণের জায়গা থাকতো না। ১৯৩৪-এ হোটেলের উন্নয়নকল্পে একটা পানশালা, একটা বড় খাবার-ঘর ও কয়েকটা অতিরিক্ত কলঘর তৈরি করা হলো। মাথাপিছু থাকার খরচও গেলো বেড়ে।

লোকে বলতো, ‘লেদারকোম্ব উপসাগরে কখনও গেছেন? একটা দ্বীপের মতো জায়গায় ভীষণ ভালো একটা হোটেল আছে। খুব আরামের জায়গা, কোন উটকো লোক বা শ্যারাব্যাং-গাড়ির ঝামেলা নেই। রান্নাবান্না আর তদারকি চমৎকার। ওখানে আপনার যাওয়া উচিত।’

এবং সত্যিই লোকে যেতো।

২

বর্তমানে একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি (অন্তত তাঁর নিজের মতো) জলি রজারে বাস করছেন। একটি আধুনিক ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে তিনি অলস দৃষ্টি মেলে দিয়েছেন সামনের সমুদ্রতীরের দিকে। পরনের তাঁর দুধ-সাদা ধবধবে স্যুট, মাথার পানামা টুপি চোখের ওপর নামানো; গোঁফজোড়া বাঁকানো রাজকীয় পদ্ধতি।

হোটেলের দিক থেকে সিমেন্ট বাঁধানো একাধিক চত্বর ঢালু হয়ে নেমে এসেছে সমুদ্রতীরের দিকে। সামনের বেলাভূমিতে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে রবার ও ক্যাম্বিশের নৌকো, পলিথিনের বল, খেলনা এবং কয়েকটা ভসিকা। তীর থেকে বিভিন্ন দূরত্বে চোখে পড়ছে তিনটি ভেলা ও একটা দীর্ঘ স্প্রীং-পাটাতন। সমুদ্র-স্নানার্থীদের কয়েকজন স্নান করছেন, কেউ বা সৈকতে শরীর মেলে সূর্যস্নানে ব্যস্ত, আর কেউ কেউ শরীরে বুলিয়ে চলেছেন তেলের প্রলেপ।

স্নানবিমুখ অতিথিরা বসে রয়েছেন বেলাভূমিসংলগ্ন খোলা বারান্দায়, তাঁদের কথাবার্তা প্রধানত আবহাওয়া, সৈকতের দৃশ্য, প্রাত্যাহিক সংবাদপত্রের খবর এবং অন্য যে-কোন আলোচনাসাপেক্ষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিলো।

পোয়ারের বাঁ দিক থেকে মিসেস গার্ডেনারের অবিশ্রান্ত একঘেয়ে কথাবার্তার স্রোত ভেসে আসছে। কিন্তু মিসেস গার্ডেনারের কর্মব্যস্ত হাত এক মুহূর্তের জন্যেও বিচলিত হচ্ছে না। তাঁর কথার স্রোত এবং উল বোনার কাঁটা অভিজ্ঞতালব্ধ দক্ষতায় একই সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে। তাঁর ঠিক পেছনেই একটা দোলনা-চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে আছেন তাঁর স্বামী, ওডেল. সি. গার্ডেনার; মাথার টুপিটা টেনে নামানো তাঁর নাকের ওপর, এবং কোনরকম অনুমতি অথবা উৎসাহ পেলেই তিনি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে সরব হচ্ছেন।

পোয়ারোর ডান পাশে বসে মিস ব্রুস্টার। তাঁর মাথার চুল ধূসর; মুখমণ্ডলের গড়নে প্রকৃত সহিষ্ণুতার ছাপ; শরীরের গঠন অনেকটা অ্যাথলিটদের মতো। থেকে থেকে তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর শোনা যাচ্ছে, যেন কোন পমেরেনিয়ান কুকুরের যতিহীন তীক্ষ্ণ চিৎকারকে কোন শিকারি হাউন্ডকর্কশ ধমকের সাহায্যে বাধা দিতে চেষ্টা করছে।

মিসেস গার্ডেনার তখন বলে চলেছেন, 'আর সেই জন্যেই মিঃ গার্ডেনারকে আমি বললাম, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা খুব ভালো, আমি বললাম, এবং যে-কোন জায়গা আমি তন্ন তন্ন করে ঘুরে দেখতে চাই। এমনিতে, আমি বললাম, গোটা ইংল্যান্ডটা আমরা মোটামুটি ঘুরে দেখেছি আর এখন আমি যা চাই তা হলো সমুদ্রের কাছাকাছি কোন শান্ত পরিবেশে গিয়ে নিছক বিশ্রাম করতে। আমি তাই বলেছি, বলিনি, ওডেল? শুদ্ধ বিশ্রাম। বেশ বুঝতে পারি, আমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন, আমি ওকে বলেছি। তাই না ওডেল?'

মিঃ গার্ডেনার তাঁর টুপির নিচ থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, সোনা।'

মিসস গার্ডেনার বিনা বিলম্বে তাঁর কাহিনি পশ্চাদ্ধাবনে মনোনিবেশ করলেন।

'আর সেই কারণেই, যখন আমি 'কুক'-এর মিঃ কেলসাকো একথা জানালাম, তিনি যেচে আমাদের বেড়ানোর সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি না থাকলে আমরা যে কি করে কি করতাম, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!—যাকগে, যা বলছিলাম মিঃ কেলসোকে এ জায়গাটার কথা বলামাত্রই তিনি বললেন, এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। নির্জন, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, সঙ্গে পরিচর্যার সুব্যবস্থা; সব দিক থেকেই জলি রজার অন্য সব হোটেলের চেয়ে আলাদা। অবশেষে মিঃ গার্ডেনারের তখন জল-কলের ব্যবস্থার কথা জানতে চেয়েছিলেন। কারণ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, মিঃ গার্ডেনারের এক বোন একবার এই জাতীয় একটি অতিথিশালায় দিন কয়েকের জন্য ছিলেন, কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, সেখানকার কলঘরে অবস্থা ছিলো নিতান্তই গ্রামের মতো—মাটির তৈরি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের 'নির্জন, সুন্দর' জায়গা সম্পর্কে মিঃ গার্ডেনার একটু সন্দেহপ্রবণ, তাই না, ওর্ডেল?'

'নিশ্চয়ই, সোনা।' বললেন মিঃ গার্ডেনার।

'কিন্তু মিঃ কেলসো সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের আশ্বাস দিলেন। বললেন, জল-কলের ব্যবস্থা একেবারে আধুনিক এবং রান্না অত্যন্ত চমৎকার। এখন দেখছি, সে কথা সত্যি। আর আমি সবচেয়ে যেটা পছন্দ করি, তা হলো সময়ানুবর্তিতা—বুঝতেই তো পারছেন কি বলতে চাইছি। তাছাড়া এলাকাটা ছোট হওয়ার প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের আলাপ পরিচয়ের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ইংরেজদের যদি কোন দোষ থেকে থাকে তা হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় বছর দুয়েকের পুরোনো না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা একটু আলগা থাকতে চায়। অবশ্য তার পরে তাঁদের অন্তরঙ্গতার জুড়ি মেলা ভার। মিঃ কেলেসো আরও বললেন, নানা ধরনের বিচিত্র সব মানুষ এসে ভিড় করে এই স্মাগলার্স দ্বীপে, এবং সে কথা যে মিথ্যে নয়, এখন দেখতে পাচ্ছি। আপনি রয়েছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, আর রয়েছেন মিস ডানলি। ওহ্! আপনার আসল পরিচয় পেয়ে আমরা তো পালকের ঘায়ে মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা—তাই না, ওডেল?'

'হ্যাঁ, সোনা।'

‘সত্যি!’ সামান্য সুযোগ পেয়েই সরব হলেন মিস ব্রুস্টার, ‘কি রোমাঞ্চকর ব্যাপার, তাই না মঁসিয়ে পোয়ারো?’

ক্ষীণ প্রতিবাদে হাত তুললেন এরকুল পোয়ারো। কিন্তু সে প্রতিবাদ নিছক ভদ্রতাবশেই। মিসেস গার্ডেনার সাবলীলভাবে এগিয়ে চললেন।

‘জানেন, মঁসিয়ে পোয়ারো কর্নেলিয়া রবসনের কাছে আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু শুনেছি, গত মে মাসে আমি এবং মিঃ গার্ডেনার ব্যাডেনহফে ছিলাম, সেই সময়েই কর্নেলিয়া মিশরের ব্যাপারটা আমাদের বলেছে—যখন লিনেট রিজওয়ে খুন হয়।* ও বলেছে, আপনি যেভাবে ঘটনাটার সমাধান করেছেন, তা এক কথায় অপূর্ব আর সেই থেকেই আপনাকে দেখবার জন্যে আমি একেবারে পাগল, তাই না, ওডেল?’

‘হ্যাঁ সোনা।’

‘তারপর ধরুন মিস ডার্নলির কথা। আমার বেশির ভাগ জামাকাপড়ই। ‘রোজ মন্ড’ থেকে কেনা—আর উনিই তো রোজ মন্ডের মালিক, তাই না? ওঁর দোকানের পোশাকগুলোর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। গত রাতে আমি যে পোশাকটা পরেছিলাম সেটাও তো ওঁরই দোকান থেকে কেনা। সব দিক দিয়েই মেয়েটিকে আমার ভীষণ ভালো লাগে।’

মিস ব্রুস্টারে পেছন থেকে মেজর ব্যারী, যিনি তাঁর বিস্ফারিত চোখ স্নানার্থীদের ওপরে নিবদ্ধ রেখে বসেছিলেন, গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করলেন, মেয়েটির চেহারায় বিশেষত্ব আছে!’

মিসেস গার্ডেনার উল বোনার কাঁটা সশব্দে সচল হলো।

‘একটা কথা আমি স্বীকার না করে পারবো না, মঁসিয়ে পোয়ারো আপনাকে এখানে দেখে আমি ভীষণ অবাক হয়েছি। সেই সঙ্গে রোমাঞ্চিতও যে হইনি তা নয়। মিঃ গার্ডেনারও সে কথা জানেন। আমার যেন হঠাৎই মনে হলে, আপনি এখানে এসেছেন নিতান্তই আপনার—পোশার প্রয়োজনে, আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি? এমনিতে আমার অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর, মিঃ গার্ডেনারও আপনাকে সেই কথাই বলবেন, আর যে-কোন ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত হওয়াটাকে আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি না। দেখুন—’

মিঃ গার্ডেনার গলা-খাঁকারি দিয়ে উঠলেন, বললেন, ‘দেখতেই পাচ্ছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, মিসেস গার্ডেনারের চোখ সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি প্রখর।’

এরকুল পোয়ারোর দু’হাত শূন্যে বিক্ষিপ্ত হলো।

‘আমাকে অন্তত একবার আশ্বাস দেবার সুযোগ দিন, মাদাম—আমি এখানে আপনাদের মতোই ছুটি কাটাতে; আনন্দ করতে—এসেছি, কোন অপরাধের কথা আমি এখন চিন্তাও করছি না।’

মিস ব্রুস্টার সংক্ষিপ্ত রুক্ষ স্বরে মন্তব্য করলেন, ‘স্মাগলার্স দ্বীপে কোন ‘দেহ’ নেই।’

এরকুল পোয়ারো বললেন, ‘কিন্তু সে কথা পুরোপুরি সত্যি নয়।’ তিনি আঙুল তুলে নির্দেশ করলেন নিচের বেলাভূমির দিকে, ‘ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, সারি সারি শুয়ে থাকা শরীরগুলো। ওগুলো কি? মোটেই পুরুষ কিংবা মহিলা নয়। ওদের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই। ওরা শুধুই দেহ!’

মেজর ব্যারী সপ্রশংস সুরে বললেন, ‘ওদের মধ্যে কয়েকটা মেয়ের চেহারা দেখবার মতো! যদিও একটু রোগার দিকে।’

পোয়ারো জোরালো কণ্ঠে বললেন, ‘সুন্দর চেহারা মানছি, কিন্তু কি আবেদন আছে এর? কি রহস্য আছে? আমি, আমি বৃদ্ধ সেকেলে লোক। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন বড়জোর গোড়ালিটুকু দেখা যেতো। সফেন সেমিজের সামান্য আভাস লুব্ধ করার মতো। পায়ের গোছের মসৃণ স্ফীতি—হাঁটু—মোজা বাঁধার ফিতে—’

‘দুষ্টু, দুষ্টু।’ কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন মেজর ব্যারী।

‘আজকাল আমরা যে সব পোশাক পরি, তা অনেক বেশি মনোজ্ঞ।’ মিস ব্রুস্টার বললেন।

'নিশ্চয়ই মঁসিয়ে পোয়ারো', বললেন মিসেস গার্ডেনার, 'আমার তো মনে হয়, জানেন, যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করে। একসঙ্গে মিলে হৈ-হৈ করে বেড়ায়, আর ওরা—মানে, ওরা—'মুখের রক্তিম আভাসে মিসেস গার্ডেনারের মনের পরিচয় পাওয়া গেলো, 'ওরা এই মেলামেশার ফলাফলের কথা একেবারেই চিন্তা করে না, বুঝতেই তো পারছেন?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।' এরকুল পোয়ারো বললেন, 'রীতিমতো দুঃখের কথা।'

'দুঃখের কথা?' মিসেস গার্ডেনার তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন।

সমস্ত সুখকল্পনা, সমস্ত রহস্যের অপমৃত্যু—দুঃখেরী কথা নয়? আজকাল সব কিছুরই মানদণ্ড নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।' তিনি হাত তুলে অর্ধশায়িত দেহগুলোর দিকে নির্দেশ করলেন, 'ওই শরীর গুলো এই মুহূর্তে আমাকে প্যারিসের 'লাশ-রাখা-ঘর'-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো।' মিসেস গার্ডেনার অস্বস্তি-অনুযোগের সুরে বলে উঠলেন।

'দেহ পাথরে ওপর সাজানো—অনেকটা মাংসের দোকানের মতো।'

'কিন্তু, মঁসিয়ে পোয়ারো, এ বড্ড কষ্টকল্পিত, তাই না?'

এরকূল পোয়ারো স্বীকার করলেন।

'হ্যাঁ—হয়তো।'

'তা হলেও,' মিসেস গার্ডেনার দ্রুত হাতে বুনতে শুরু করলেন, 'একটা বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে সব মেয়েরা এভাবে খালি গায়ে রোদে শুয়ে থাকে, তাদের হাতে পায়ে অতিরিক্ত লোম জন্মাতে বাধ্য। আমি সেই কথাই বলেছি আমার মেয়ে আইরীনকে, মঁসিয়ে পোয়ারো। আইরীনকে বলেছি, তুমি যদি এভাবে খালি গায়ে রোদে শুয়ে থাকো, তাহলে তোমার সারা শরীরে লোমে ছেয়ে যাবে, হাতে লোক হবে, পায়ে লোম হবে, বুকে লোম হবে, আর তখন তোমাকে কিরকম দেখাবে বলো তো? আমি ওকে বলেছি। বলিনি ওডেল?'

'হ্যাঁ, সোনা।' বললেন মিঃ গার্ডেনার।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। সম্ভবত আইরীনের চূড়ান্ত বিপর্যস্ত চেহারাটা তাঁরা মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করছিলেন।

মিসেস গার্ডেনার এবার তাঁর সেলাই গুছিয়ে নিলেন, বললেন, 'তাই ভাবছি—'

মিঃ গার্ডেনার বললেন, 'কি হলো, সোনা?'

তিনি দোলনা চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন এবং হাত বাড়িয়ে মিসেস গার্ডেনারের কাছ থেকে সেলাই ও সেলাইয়ের বইটা নিলেন। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'মিস ব্রুস্টার, আসবেন নাকি, একসঙ্গে বসে একটু গলা ভেজানো যাক?'

'না, এখন নয়, ধন্যবাদ।'

গার্ডেনারা হোটেলের দিকে এগিয়ে চললেন।

মিস ব্রুস্টার বললেন, 'মার্কিন স্বামীরা দারুণ চমৎকার।'

৩

মিসেস গার্ডেনারের শূন্যস্থান পূরণ করলেন ধর্মযাজক স্টিফেন লেন।

তাঁর পঞ্চাশস্পর্শী দীর্ঘকায় শরীরে সতেজ আভাস সুস্পষ্ট। মুখের রঙ তামাটে, পরনের গাঢ় ধূসর প্যান্টে অবসরসুলভ অগোছালো ছাপ।

তিনি উৎসাহভরে বললেন, 'চমৎকার জায়গা। লেদারকোম্ব উপসাগর থেকে হারফোর্ড পর্যন্ত গিয়েছিলাম, আর ফেরার সময় পাহাড়ি রাস্তা ধরে ফিরে এলাম।'

‘আজকের দিনে হেঁটে বেড়ানো পরিশ্রমের কাজ।’ বললেন মেজর ব্যারী। হাঁটাহাঁটি তিনি একদম পছন্দ করেন না।

‘ভালো ব্যায়াম।’ মিস ব্রুস্টার বললেন, ‘এখনও আমার নৌকো নিয়ে বেরোনো হলো না। পেটের পেশীর পক্ষে নৌকো চালানোর চেয়ে ভালো ব্যায়াম নেই।’

পোয়ারোর বিষণ্ণ দৃষ্টি ধীরে ধীরে নেমে এলো নিজের স্ফীত মধ্যদেশের দিকে।

মিস ব্রুস্টার সেটা লক্ষ্য করে সান্ত্বনার সুরে বললেন, ‘রোজ যদি নৌকো নিয়ে বেরোন, তাহলে আপনার ওই ভুঁড়ি দিন কয়েকের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে, মঁসিয়ে পোয়ারো।’

‘মাপ করবেন, মাদামোয়াজেল, নৌকো জিনিসটাকে আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি।’

‘ছোট নৌকো?’

‘উঁহু, বড়-ছোট সব রকমের নৌকো।’ চোখ বুজে শিউরে উঠলেন তিনি, ‘সমুদ্রের দুলনি মোটেই সুখের নয়।’

‘কি বললেন। সমুদ্র আজ পুকুরে মতো শান্ত।’

পোয়ারো প্রত্যয়ের সুরে উত্তর দিলেন, ‘শান্ত সমুদ্র বলে সত্যি কিছু নেই, মাদমোয়াজেল। সর্বদা, সব সময়, সেখানে রয়েছে আলোড়ন।’

‘যদি আমাকে জিগ্যেস করেন, তাহলে বলবো সমুদ্র-রোগের দশ ভাগের ন’ভাগই হচ্ছে স্নায়ুর ব্যাপার।’ বললেন মেজর ব্যারী।

‘এই তো,’ সামান্য হেসে ধর্মযাজক বললেন, ‘একজন অভিজ্ঞ নাবিকের কথা শুনুন—ঠিক বলেছি তো, মেজর?’

‘একবারই মাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম—ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার সময়। সমুদ্র-রোগ জিনিসটাকে মনে একেবারেই আমল দেবেন না, এই হলো আমার মত।’

‘সমুদ্র-রোগ ভারী, অদ্ভুত।’ আনমনা সুরে বললেন মিস ব্রুস্টার, ‘সবার না হয়ে এ রোগ কারো কারো হয় কেন? এ ভারি অন্যায়। নিজের স্বাস্থ্যের ওপর তো কারো হাত নেই। রীতিমতো রুগ্ন চেহারার লোকও দক্ষ নাবিক হয়। একজন আমাকে বলেছিলেন, এ রোগের সঙ্গে নাকি শিরদাঁড়ায় কি একটা যোগ আছে। আবার অনেকে দেখি—উঁচু জায়গা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আমি নিজেও ওই দলের, কিন্তু মিসেস রেডফার্নের অবস্থা আরও খারাপ। এই তো সেদিন হারফোর্ডের পাহাড়ি পথে হঠাৎ মাথা ঘুরে গিয়ে তিনি আমাকে জড়িয়েই ধরলেন। তাঁর মুখেই শুনেছি, একেবার মিলান গীর্জা থেকে নামার পথে মাঝ-সিঁড়িতে তিনি আটকে পড়েছিলেন। ওঠার সময় কোনরকম চিন্তা না করেই উঠে গেছেন, কিন্তু নামার সময়েই হয়েছে বিপদ।’

‘তাহলে পিক্সি কোভে নামার মইটা তাঁর ব্যবহার না করাই উচিত।’ মন্তব্য করলেন স্টিফেন লেন।

মিস ব্রুস্টার একটা মুখভঙ্গী করলেন।

‘ওটাকে আমিও ভয় করি। অবশ্য ছোটদের পক্ষে মইটা ঠিক আছে। কাওয়ান আর মাস্টারম্যানদের ছেলেরা তো ওটা বেয়ে দৌড়ে ওঠা-নামা করতে ভালোবাসে।’

লেন বললেন, ‘ওই যে, মিসেস রেডফার্ন স্নান সেরে ফিরে আসছেন।’

মিস ব্রস্টার মন্তব্য করলেন, ‘ওঁকে মঁসিয়ে পোয়ারোর পছন্দ হওয়া উচিত। উনি সূর্যস্নান করেন না।’

তরুণী মিসস রেডফার্ন তখন মাথা থেকে রবারের টুপিটা খুলে চুল ঝাড়ছিলো। ওর মাথার চুল ছাই-রঙা এবং ত্বকের রঙ চুলের সঙ্গে মানানসই মৃত-পাণ্ডুর। হাত ও পায়ের রঙ অত্যন্ত সাদা।

কর্কশ চাপা হাসিতে মুখ খুললেন মেজর ব্যারী, ‘অন্যান্যদের তুলনায় রোদে একটু কম ভাজা হয়েছেন, তাই না?’

একটা দীর্ঘ স্নান-পোশাকে নিজেকে আবৃত করে ক্রিস্টিন রেডফার্ন বেলাভূমি ধরে এগিয়ে এলো ওঁদের দিকে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো।

ওর সুন্দর মুখে গম্ভীর ছায়া। সুন্দর, তবে বিরুদ্ধ অর্থে, এবং হাত-পায়ের গড়ন ছোট হলেও নিখুঁত।

ওঁদের দিকে চেয়ে হাসলো ক্রিস্টিন, স্নান-পোশাকটাকে শরীরে ভালো করে জড়িয়ে ওঁদের পাশে এসে বসলো।

মিস ব্রুস্টার বললেন, 'আপনি মঁসিয়ে পোয়ারোর মূল্যবান প্রশংসা অর্জন করেছেন। যার সূর্যস্নান করে তাদের তিনি একদম পছন্দ করেন না। বলছেন, তাদের অনেকটা কসাইয়ের দোকানে সাজানো মাংসের মতো দেখায়—।'

ক্রিস্টিন রেডফার্ন বিষণ্ণভাবে হাসলো, বললো, 'যদি সত্যি সূর্যস্নান করতে পারতাম! কিন্তু তাতে আমার গায়ের রঙ বাদামি হয় না, শুধু ফোস্কা পড়ে, আর সারা হাতে বিশ্রী ফোঁটা ফোঁটা দাগ পড়ে যায়।'

'মিসেস গার্ডেনারের আইরীনের মতো সারা গায়ে চুল গজানোর চেয়ে তবু ভালো।' মিস ব্রুস্টার বললেন। ক্রিস্টিনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে তিনি বলে চললেন, 'মিসেস গার্ডেনার আজ সকালে দারুণ মেজাজে ছিলেন। একেবারে এক নাগাড়ে চালিয়ে গেছেন। 'তাই না, ওডেল?' 'হ্যাঁ, সোনা।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি ওঁর সঙ্গে একটু চালাকি করলে পারতেন। কেন করলেন না? বললেন, না কেন, আপনি এখানে একটা নৃশংস খুনের সমাধান করতে এসেছেন, আর সেই উন্মাদ হত্যাকারীকে নিঃসন্দেহে হোটেলের অতিথিদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে?'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'তিনি হয়তো সেটা বিশ্বাস করে বসতেন।'

মেজর ব্যারী সশব্দ নিঃশ্বাসে হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, 'নির্ঘাত বিশ্বাস করতেন।'

এমিলি ব্রুস্টার বললেন, 'না, আমার মনে হয় না, মিসেস গার্ডেনারের মতো মানুষও এখানে ঘটেছে এমন কোন খুনের কথা বিশ্বাস করতেন। কারণ, এটা ঠিক সে ধরনের জায়গা নয় যেখানে আপনি মৃতদেহ পাবেন।'

পোয়ারো চেয়ারে সামান্য নড়েচড়ে বসলেন। প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বললেন, 'কিন্তু কেন নয়, মাদমোয়াজেল? এই স্মাগলার্স দ্বীপে আপনার ভাষায় 'মৃতদেহ' পাওয়ার কোন অসুবিধেটা আপনি দেখলেন?'

এমিলি ব্রুস্টার বললেন, 'কি জানি, আমার মনে হয়, কতকগুলো জায়গা খুনের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়। এটা সেরকম জায়গা নয়, যেখানে—' নিজের বক্তব্যকে পরিষ্কার করে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে চুপ করে গেলেন তিনি।

'জায়গাটা স্বপ্নময়, মানছি।' সম্মতি জানালেন এরকুল পোয়ারো, 'এখানে রয়েছে শান্তি। রয়েছে উজ্জ্বল কিরণ, গভীর নীল সমুদ্র। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মিস ব্রুস্টার পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অশুভ শক্তির ছায়া।'

ধর্মযাজক লেন চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি। তাঁর গভীর নীল চোখ চকচক করে উঠলো।

মিস ব্রুস্টার কাঁধ ঝাঁকালেন।

'ও, হ্যাঁ, সে কথা মিথ্যে নয়, কিন্তু তবুও—'

'কিন্তু তবুও আপনার মনে হচ্ছে, এ জায়গাটা কোন অপরাধ সংঘটিত হবার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়? আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, মাদমোয়াজেল।'

'মানব-চরিত্রের কথা বোধ হয়?'

'হ্যাঁ, সেটাই প্রথম এবং শেষ কথা। কিন্তু সে কথা আমি বলতে চাইনি। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, যে এখানে প্রত্যেকেই ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন।'

এমিলি ব্রুস্টার বিহ্বল চোখে তাকালেন তাঁর দিকে।

'ঠিক বুঝলাম না।'

এরকুল পোয়ারো করুণার হাসি হাসলেন। শূন্যে তর্জনী নাচিয়ে বোঝাতে চাইলেন তাঁর বক্তব্যের ইঙ্গিত।

'মনে করা যাক, আপনার কোন শত্রু আছে। এখন, আপনি যদি তাঁর বাড়িতে, অফিসে বা রাস্তায় তাঁকে খোঁজ করেন, তাহলে আপনাকে যথেষ্ট উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে। কৈফিয়ৎ দিতে হবে আপনাকে। কিন্তু এখানে, এই সমুদ্রতীরে উপস্থিতির জন্য কাউকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আপনি লেদারকোম্ব উপসাগরে এসেছেন—কেন? উত্তর অতি সহজ। এখন আগস্ট মাসে—লোকে এই আগস্ট মাসেই ছুটি কাটাতে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যায়। সুতরাং আপনার এখানে আসাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক মিঃ লেন ও মেজর ব্যারীর এখানে আসা, অথবা মিসস রেডফার্ন ও তাঁর স্বামীর এখানে বেড়াতে আসা। কারণ আগস্ট মাসে সমুদ্রতীরে ছুটি কাটাতে আসাটা ইংল্যান্ডের রীতি।'

'হ্যাঁ, আপনার কথা অস্বীকার করা যায় না।' স্বীকার করলেন মিস ব্রুস্টার, 'কিন্তু গার্ডেনারদের সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? ওরা তো মার্কিনিয়।'

পোয়ারো মৃদু হাসলেন।

'মিসেস গার্ডেনারও বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করেন, তিনি নিজেই আমাদের বলেছেন। যেহেতু তিনি গোটা ইংল্যান্ডটা ঘুরে দেখেছেন, সেহেতু এই সমুদ্রতীরে তাঁর সপ্তাদুয়েক কাটানো উচিত—অন্য কোন কারণে না হলেও অন্তত ভালো টুরিস্ট হিসেবে। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখতে ভালোবাসেন।'

মিসেস রেডফার্ন অস্ফুট স্বরে বললো, 'আপনিও তো মানুষ দেখতে ভালোবাসেন, তাই না?'

'মাদাম, সে কথা আমি স্বীকার করি। আমি মানুষ দেখতে ভালোবাসি!'

ও চিন্তিত সুরে বললো, 'আপনি—অনেক বেশি দেখতে পান।'

৪

কিছুক্ষণ নীরবতা। স্টিফেন লেন সশব্দে গলা-খাঁকারি দিয়ে অপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এইমাত্র যে কথাগুলো আপনি বললেন, সে সম্পর্কে আমি একটু কৌতূহলী। আপনি বলেছেন, পৃথিবীর সর্বত্রই অপরাধ সংঘটিত হয়। আপনার এই কথাগুলোর সঙ্গে বাইবেলের 'হিক্লিসিয়াস্তেস' অধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতির বিশেষ মিল রয়েছে।' এক মুহূর্তে থামলেন তিনি। তারপর স্পষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'সত্য, মানুষের প্রতিটি পুত্রের হৃদয় অপরাধ-বাসনায় পরিপূর্ণ এবং জীবৎকালে অপ্রকৃতিস্থতা তাদের হৃদয়ের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।' তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ধর্মীয় দীপ্তিতে, 'আপনার মুখে এ কথা শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আজকাল অশুভ শক্তিতে কেউই বিশ্বাস করে না। এটাকে বড়জোর শুভর বিপরীত হিসাবে বিচার করা হয় মাত্র। লোকে বলে, অসৎ কাজ তারাই করে যায়া অজ্ঞ—বুদ্ধিজ্ঞানে যারা অসম্পূর্ণ—যাদের দোষারোপ করার বদলে করুণা করা উচিত।... কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, অশুভ শক্তির অস্তিত্ব আছে। এটা বাস্তব সত্য। আমি যেমন শুভতে বিশ্বাস করি তেমনি বিশ্বাস করি, তেমনি বিশ্বাস করি অশুভে। এর প্রভাব আছে, আছে নিজস্ব ক্ষমতা। পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত এর রাজত্ব!'

তিনি থামলেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে তিনি হঠাৎ ক্ষমাপ্রার্থীর দৃষ্টিতে তাকালেন।

'দুঃখিত। একটু আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম।'

পোয়ারো শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনার বক্তব্যের অর্থ আমি বুঝতে পারছি। আপনার সঙ্গে আমি আংশিকভাবে একমত। অশুভের রাজত্ব সারা পৃথিবীতে রয়েছে এবং তার স্বরূপ আমাদের অজানা থাকে

না।'

মেজর ব্যারী গলা-খাঁকারি দিলেন।

'ভারতবর্ষের কয়েকজন ফকিরও এ ধরনের কথা বলেছিলেন।'

সুদীর্ঘ ভারতীয় কাহিনীর প্রতি তাঁর সর্বনাশা প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রত্যেকের সাবধান হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দিনই জলি রজারে কাটিয়েছেন মেজর ব্যারী। সুতরাং, মিস ব্রুস্টার ও মিসেস রেডফার্ন দুজনেই বক্তব্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

'ওই যে আপনার স্বামী সাঁতরে ফিরে আসছেন, তাই না, মিসেস রেডফার্ন? ওঁর হাত টানার ভঙ্গী দেখবার মতো। ভীষণ ভালো সাঁতারু আপনার স্বামী।'

প্রায় একই সঙ্গে বললো মিসেস রেডফার্ন! ওই দেখুন! লাল রঙের পাল দেওয়া কি সুন্দর ছোট্ট একটা নৌকো! ওটা তো মিঃ ব্ল্যাটের, তাই না?'

লাল পালের নৌকোটা তখন উপসাগরের সীমানা অতিক্রম করছে।

মেজর ব্যারী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, 'আজব পছন্দ, লাল-রঙা-পাল, কিন্তু ফকির-কাহিনী আতঙ্ক এরানো গেলো।

এইমাত্র যে যুবকটি সাঁতরে পাড়ে এসে পৌঁছেছে এরকুল পোয়ারো সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকে দেখছিলেন। প্যাট্রিক রেডফার্ন মানুষের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দীর্ঘকায় তামাটে শরীর। প্রশস্ত কাঁধ, সুগঠিত সঙ্কীর্ণ ঊরু। তাকে ঘিরে রয়েছে একটা সংক্রামক হাসিখুশি আনন্দের ঢেউ—একটা সহজাত সারল্য, যা তাকে সমস্ত মহিলা ও অধিকাংশ পুরুষের কাছে করে তুলেছে প্রিয়।

সৈকতে দাঁড়িয়ে শরীরে জল ঝাড়ছিলো সে; খুশিতে হাত নেড়ে ইশারা করলো স্ত্রীর দিকে।

প্রতি ইশারা ফিরিয়ে দিলো, ক্রিস্টিন, ডেকে উঠলো, 'এখানে এসো প্যাট।'

'আসছি।'

বালিতে পড়ে থাকা তোয়ালেটা তুলে নিয়ে সৈকত ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলো প্যাট্রিক।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন মহিলা হোটেলের দিক থেকে তাঁদের অতিক্রম করে নেমে গেলো বেলাভূমির দিকে।

তার উপস্থিতিতে ছিলো নাটকীয় আবির্ভাবের সমস্ত বৈশিষ্ট্য।

উপরন্তু, তার চলার ছন্দ জানিয়ে দিচ্ছে, এ তার অজানা নয়। আত্ম-সচেতনভাব আপাতদৃষ্টিতে সেখানে অদৃশ্য। এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক, তার উপস্থিতির নাটকীয় প্রভাব তার কাছে নতুন কিছু নয়।

সে তন্বী ও দীর্ঘকায়। পরনে সাধারণ পিঠখোলা সাদা সাঁতারে পোশাক, এবং তার শরীরে উন্মুক্ত প্রতিটি অংশে সূর্যস্নানের সুষম ব্রোঞ্চ-প্রলেপ। কোন ভাস্কর্যের মতোই নিখুঁত তার গড়ন। উজ্জ্বল আগুন রঙ চুল ঘাড়ের কাছে এসে নিয়েছে ঘনিষ্ঠ অন্তর্মুখী বাঁক। মুখমণ্ডলে সামান্য কাঠিন্য, তিরিশটা বছর এসে আবার বিদায় নিলে যা চোখে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে সেখানে টানা, এবং এক চৈনিক স্থৈর্য ছড়িয়ে রয়েছে সারা সুখে। মাথায় তার যমজ-সবুজ পিচবোর্ডের এক স্বপ্নময় চীনে টুপি।

মহিলাটির মধ্যে এমন কিছু একটা ছিলো, যা সৈকতে উপস্থিত অন্যান্য মহিলাদের করে দিলো তুচ্ছ ও নিষ্প্রভ। এবং সমান অনিবার্যতায় উপস্থিত প্রতিটি পুরুষের চোখে আকর্ষিত হয়ে গেঁথে গেলো তার শরীরে।

এরকুল পোয়ারোর চোখ পুরোপুরি খুলে গেলো, তাঁর গোঁফজোড়া নেচে উঠলো নীরব প্রশংসায়, মেজর ব্যারী সোজা হয়ে বসলেন, এবং তাঁর বিস্ফারিত চোখ আরও বিস্ফারিত হলো। পোয়ারোর বাঁ দিকে ধর্মযাজক স্টিফেন লেন সশব্দে গভীর শ্বাস নিলে এবং তাঁর শরীরের প্রতিটি পেশী হয়ে উঠলো কঠিন।

মেজর ব্যারী কর্কশ ফিসফিস স্বরে বললেন, 'আর্লেনা স্টুয়ার্ট (মার্শালকে বিয়ে করার আগে ওঁর নাম তাই ছিলো) অভিনয় ছেড়ে দেবার আগে ওঁর শেষ নাটক 'কাম অ্যান্ড গো' আমি দেখেছিলাম। দেখবার মতোই

চেহারা বটে, কি বলেন?'

ক্রিস্টিন রেডফার্ন ধীরে স্বরে বললো। ওর কণ্ঠে শীতলতার পরশ, 'ও সুন্দরী—সত্যি। তবে ওকে দেখে—পশু বলে মনে হয়!'

এমিলি ব্রুস্টাব আচমকা বলে উঠলেন, 'এইমাত্র আপনি অশুভ শক্তির কথা বলছিলেন, মঁসিয়ে পোয়ারো। আমরা ধারণা এই মেয়েটা সেই অশুভ শক্তির মানবী রূপ। ওর মধে এতটুকুও 'ভালো'র ছোঁয়া নেই। ঘটনাচক্রে ওর সম্পর্ক অনেক কিছুই আমি জানি।'

মেজর ব্যারী স্মৃতি রোমন্থনের সুরে বললেন, 'সিমলার একটি মেয়ের কথা আমার মনে পড়ছে। ওর মাথার চুলও ছিলো লাল। জনৈক নিম্নপদস্থ সৈনিকের বউ ছিলো মেয়েটা। যদি জানতে চান ও সেখানে কোন অশান্তির সৃষ্টি করেছিলো কিনা, তাহলে বলবো, হ্যাঁ, করেছিলো। পুরুষেরা ওর জন্য পাগল হয়ে যেতো। স্বাভাবিক কারণেই, অন্যান্য মহিলারা সুযোগ পেলে ওর চোখ উপড়ে নিতে ছাড়তো না। মেয়েটা বহু সংসার ছারখার করে দিয়েছিলো।'

তিনি স্মৃতিচারণের চাপা হাসি হাসলেন।

'স্বামীটা ছিল শান্তশিষ্ট চমৎকার মানুষ। বউকে প্রায় পুজোই করতো। ওর কোন অন্যায় সে দেখতে পেতো না—অথবা, দেখেও না দেখার ভান করতো।'

তীব্র আবেগভরা চাপা স্বরে স্টিফেন লেন বললেন, 'এই ধরনের মেয়েরা সমাজের পক্ষে ভীষণ—ভীষণ ক্ষতিকর—'

থামলেন তিনি।

আর্লেনা স্টুয়ার্ট ইতিমধ্যে জলের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে: দুজন যুবক, সবেমাত্র কৈশোরের সীমারেখা পেরিয়েছে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে ওর দিকে। তাদের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও।

ওর দৃষ্টি যুবক দুজনকে অতিক্রম করে পড়লো সৈকত ধরে এগিয়ে আসা প্যাট্রিক রেডফার্নের দিকে।

এরকুল পোয়ারো ভাবলেন, ব্যাপারটা যেন অনেকটা কম্পাসের কাঁটা পর্যবেক্ষণ করার মতো। প্যাট্রিক রেডফার্নের গতিপথের বিচ্যুতি ঘটলো, তার পা-জোড়া দিক পরিবর্তন করলো। চুম্বক-বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী কম্পাসের কাঁটা সর্বদা উত্তরমুখী হবেই। প্যাট্রিক রেডফার্নের পা তাকে নিয়ে এলো আর্লেনা স্টুয়ার্টের কাছে।

প্যাট্রিকের দিকে তাকিয়ে ও তখন অল্প অল্প হাসছে। তারপর ঢেউয়ের পাশাপাশি পা ফেলে ধীরে ধীরে সৈকত ধরে ও এগিয়ে চললো। প্যাট্রিক রেডফোর্ন ওর সঙ্গ নিলো। একটা পাথরের পাশে শরীর এলিয়ে শুয়ে পড়লো ও। রেডফার্ন বসলো ও-পাশে।

আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে হোটেলে ঢুকে পড়লো ক্রিস্টিন রেডফান!

৫

ও চলে যাবার পর একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ক্ষণেকের জন্য জমাট বেঁধে রইলো।

তারপর এমিলি ব্রুস্টার বললেন, 'সত্যি, খুব খারাপ লাগে। ও ভীষণ ভালো মেয়ে। মাত্র বছর কয়েক হলো ওদের বিয়ে হয়েছে।'

'যে মেয়েটার কথা আমি বলছিলাম,' বললেন মেজর ব্যারী, 'সিমলার মেয়েটা। ও বেশ কয়েকটা সত্যিকারের সুখের বিয়ে বিগড়ে দিয়েছিলো। দুঃখের কথা, কি বলেন?'

'এক ধরনের মেয়ে আছে,' বললেন, মিস ব্রুস্টার, 'যারা পরে সংসার ভেঙে দিতে ভালোবাসে।' মিনিট কয়েক থেমে তিনি যোগ করলেন, 'প্যাট্রিক রেডফার্ন এক নম্বরের বোকা।'

এরকুল পোয়ারা নীরব রইলেন। তিনি একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন বেলাভূমির দিকে, কিন্তু প্যাট্রিক রেডফার্ন বা আর্লেনা স্টুয়ার্ট তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

মিস ব্রুস্টার বললেন, 'আচ্ছা, আমি বরং যাই নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।' তিনি বিদায় নিলেন।

মেজর ব্যারী ঘুরে তাকালেন পোয়ারোর দিকে। তাঁর বিস্ফারিত চোখে চাপা উত্তেজনা ও কৌতূহল।

'বলুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, কি এত ভাবছেন? আপনি তো কই মুখ খুললেন না? এই অপ্সরাটি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? জব্বর চিজ?'

পোয়ারো বললেন, 'হয়তো তাই।'

'ঝেড়ে কাশুন, মশাই। আপনাদের ফরাসীদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি!'

পোয়ারো শীতল স্বরে বললেন, 'আমি ফরাসী নই!'

'তা বলে এ কথা বলবেন না, সুন্দরী মেয়েরা আপনার নজর কাড়ে না! ওঁকে দেখে কি মনে হয় আপনার, হুঁ?'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'উনি মোটেই তরুণী নন।'

'তাতে কি আসে যায়? একজন মহিলার চোহারা দেখে যা মনে হয়, তাঁর বয়েস ঠিক তাই! ওঁর চেহারার কোন গলতি নেই।'

এরকুল পোয়ারো সম্মতির মাথা নাড়লেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, উনি সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্যই শেষ কথা নয়। সৈকতে উপস্থিত প্রত্যেকে একজন বাদে যে তাঁর দিকে তাকিয়েছে, তার কারণ সৌন্দর্য নয়।'

'ওটাই একমাত্র কারণ, মশাই,' বললেন মেজর, 'ওটাই একমাত্র কারণ।'

তারপর হঠাৎ কৌতূহলী কণ্ঠে তিনি বললেন, 'কিন্তু সেই তখন থেকেই একদৃষ্টে আপনি কি দেখছেন বলুন তো?'

এরকুল পোয়ারো উত্তর দিলেন, 'আমি তাকিয়ে আছি ব্যতিক্রমটির দিকে। সেই একমাত্র মানুষটির দিকে যিনি ভদ্রমহিলা যাওয়ার সময় চোখ তুলে তাকাননি।'

পোয়ারোর দৃষ্টিতে অনুসরণ করে সেই ব্যতিক্রমটির দিকে তাকালেন মেজর ব্যারী। ভদ্রলোকের বয়েস প্রায় চল্লিশ, শান্ত সুন্দর মুখশ্রী, মাথায় হালকা রঙের চুল, গায়ের রঙ তামাটে। ঠোঁটে তাঁর ধূমায়িত পাইপ, চোখের নজর হাতের 'দি টাইম্‌স্'এ নিবদ্ধ।

'ওঃ, উনি!' মেজর ব্যারী বললেন, 'উনিই হলেন আমাদের স্বামীদেবতা মশাই। ক্যাপ্টেন মার্শাল।'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'হ্যাঁ, জানি।'

মেজর চাপা হাসি হাসলেন। তিনি নিজে অবিবাহিত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে যে কোন 'স্বামী'র ভূমিকা মাত্র তিন রকমের—'প্রতিবন্ধক', 'অসুবিধে সৃষ্টিকারী', অথবা 'রক্ষাকর্তা'।

তিনি বললেন, 'দেখে মনে হয় চমৎকার লোক। শান্তশিষ্ট। আমার 'টাইমস্' 'টা দিয়ে গেলো কিনা কে জানে?'

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি পা বাড়ালেন হোটেলের দিকে।

পোয়ারো ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে স্টিফেন লেনের দিকে তাকালেন।

স্টিফেন লেন আর্লেনা মার্শাল ও প্যাট্রিক রেডফার্নকে লক্ষ্য করছিলেন হঠাৎই তিনি ফিরে তাকালেন পোয়ারোর দিকে। তাঁর দু চোখে ঝিলিক মারলো বিতৃষ্ণার তীব্র আলো।

তিনি বললেন, 'এই মেয়েছেলেটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শয়তান বাসা বেঁধেছে। আপনার কি এতে কোন সন্দেহ আছে?'

পোয়ারো ধীরে স্বরে উত্তর দিলেন, 'এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া শক্ত।'

স্টিফেন লেন বললেন, 'কিন্তু আশ্চর্য মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনি কি বাতাসে এর উপস্থিতি টের পাচ্ছেন না? আপনার চারপাশে? অশুভের উপস্থিতি?'

ধীরে মাথা দুলিয়ে নীরব সম্মতি জানালেন এরকুল পোয়ারো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

যখন রোজামন্ড ডানলি এসে পোয়ারের পাশে বসলো, তখন মনের খুশিকে তিনি গোপন করার চেষ্টা করলেন না।

অন্যান্য মহিলাদের মতো রোজামন্ড ডানলিনকেও তিনি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন সে কথা পোয়ারো কখনও অস্বীকার করেননি। ওর স্বাতন্ত্র্য, শরীরে কমনীয় সেষ্ঠব চলার গর্বিত সতর্ক ভঙ্গী তাঁর ভালো লাগে। তাঁর ভালো লাগে ওর মেঘ-কালো চুলের সাবলীল ঝর্না এবং ঠোঁটের হাসিতে ছোট্ট শ্লেষের আভাস।

ওর পরনে গাঢ় নীল পোশাক, তার মাঝে ইতস্তত শুভ্রতার ছোঁয়া। প্রথম দৃষ্টিতে পোশাকটা সাধারণ মনে হলেও তাঁর বৈচিত্র পোয়ারোর নজর এড়ালো না। রোজামন্ড ডার্নলির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ‘রোজমান্ড লিমিটেড’ লন্ডনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোশাক তৈরি প্রতিষ্ঠান।

রোজামন্ড বললো, ‘এখানে আমার একদম ভালো লাগছে না। ভাবছি, এত জায়গা থাকতে এখানেই বা কেন বেড়াতে এলাম।

‘হ্যাঁ, বছর দুয়েক আগে, ঈস্টারের ছুটিতে। তখন এখানে এত লোকজন ছিলো না।’

এরকুল পোয়ারো চোখ ফেরালেন ওর দিকে। শান্ত স্বরে বললেন, ‘আপনাকে ভাবিয়ে তোলার মতো কিছু একটা হয়েছে, তাই না?’

ও নীরবে সম্মতি জানালো, পা দোলাতে লাগলো ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে তাকালো চঞ্চল পায়ের দিকে, তারপর বললে, ‘আমি একটা প্রেতাত্মার মুখোমুখি হয়েছি। সেটাই আমার চিন্তার কারণ।’

‘প্রেতাত্মা, মাদমোয়াজেল?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিসের প্রেতাত্মা? কার প্রেতাত্মা?’

‘ওহ, আমার নিজেরই।’

পোয়ারো শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘সে প্রেতাত্মা কি আপনাকে দুঃখ দিয়েছে?’

ভীষণ দুঃখ। সে আমাকে নিয়ে গেছে আমার অতীতে, জানেন...’

ও আনমনাভাবে থামলো, তারপর বললে, ‘একবার ভাবুন তো আমার ছোটবেলার কথা। নাঃ, আপনি পারবেন না। আপনি তো আর ইংরেজ নন।’

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, ‘আপনার শৈশব বুঝি পুরোপুরি ইংরেজ পরিবেশে কেটেছে?’

‘হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ইংরেজ পরিবেশে। সেই সবুজ গ্রাম—বিশাল জীর্ণ বাড়ি—ঘোড়া, কুকুর—বৃষ্টিতে পথ হাঁটা—শুকনো ডালপালায় আগুন জ্বালানো—বাগানের আপেল গাছ—বরাবরে অর্থাভাব—পুরনো, ছেঁড়া পোশাক—সান্ধ্য পোশাক, বা বছরের পর বছর ধরে চলতো—একটা অবহেলিত বাগান—যেখানে শরৎকালে মাইকেলম্যাস ডেইজিরা চোখ-ধাঁধানো নিশানের মতো হাজির হতো...’

পোয়ারো মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘আর আপনি সেই অতীতে ফিরে যেতে চান?’

রোজামন্ড মাথা নাড়লো, বললো, ‘কেউ ফিরে যেতে পারে না, পারে? সেটা—কখনও হয় না। কিন্তু ফিরে যেতে পারলে আমি খুশি হতাম—অন্য কোন ভাবে।’

পোয়ারো বললেন, ‘তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।’

রোজামন্ড সশব্দে হাসলো।

‘সে তো আমারও আছে!’

পোয়ারো বললেন, ‘আমরা যখন ছোট ছিলাম (এবং সে মাদমোয়াজেল, সত্যিই বহুদিন আগের কথা) তখন একটা খেলা ছিলো। তার নাম, ‘তুমি যদি “তুমি” না হতে চাও, তবে কি হতে চাও?’ এর উত্তর ছোট

মেয়েলি অ্যালবামে লিখে রাখা হতো। অ্যামবামগুলো ছিলো নীল চামড়ায় বাঁধানো, ধারগুলো সোনালী পাতে মোড়া। এর উত্তরটা কিন্তু সহজ নয়, মাদমোয়াজেল।'

রোজামন্ড বললো, হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা। কারণ সেটা একটা বিরাট ঝুঁকি। কেউই বোধহয় মুসোলিনী বা রানী এলিজাবেথ হতে চাইবে না। আর নিজস্ব বন্ধুবান্ধবের কথা যদি বলেন, তাহলে বলবো, তাদের সম্পর্কে আমরা বড্ড বেশি জানি। মনে আছে, একবার এক চমৎকার দম্পতির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো। ওঁদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার এত উচ্ছল, এত সুন্দর, আর বিয়ের বহু বছর পরেও নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক এত ভালো ছিলো যে আমি মহিলাটিকে রীতিমতো ঈর্ষা করতাম। ওঁর সঙ্গে স্বইচ্ছায় জায়গা বদল করতে আমি রাজি ছিলাম। পরে আমাকে কে যেন বললো, জনান্তিকে ওঁরা নাকি এগারো বছর ধরে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলেন না।'

ও সশব্দে হাসলো।

'এতেই বোঝা যায় যে কারো সম্পর্কে সঠিক কেউ বলতে পারে না, তাই না?'

মুহূর্ত কয়েক-নীরবতার পর পোয়ারো বললেন, 'অনেকেই কিন্তু আপনাকে ঈর্ষা করবে মাদমোয়াজেল।'

রোজমন্ড ডার্নলি শীতল স্বরে জবাব দিলো, 'ওহ, হ্যাঁ। স্বাভাবিকভাবেই।'

চিন্তায় ওর কপালে ভাঁজ পড়লো, ঠোঁটের বক্রতায় ফুটে উঠলো শ্লেষের হাসি।

'হ্যাঁ, আমি সত্যিই সার্থক কোন মহিলার এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। আমি সফল সৃজনশীল কোন শিল্পীর মতো তৃপ্তির আনন্দ পাই। জামা-কাপড়ের নকশা করতে আমি সত্যি খুব ভালোবাসি। এবং সেই সঙ্গে সফল কোন ব্যবসায়ীর আর্থিক পরিতৃপ্তি। আমার অবস্থা ভালো, স্বাস্থ্য ভালো, মুখশ্রী মোটামুটি, আর জিভের ধার তেমন বেশি নয়।'

ও একটু থামলো। বিস্তৃত হলো ওর হাসি।

'অবশ্য আমার কোন স্বামী নেই! ওই একটা জায়গাতেই আমি হেরে গেছি, তাই না মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো মন-রাখা সুরে জবাব দিলেন, 'মাদমোয়াজেল, আপনি যদি অবিবাহিত হয়ে থাকেন, তার কারণ আমাদের পুরুষদের কেউই আপনাকে তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি। আপনি নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছেন নিজস্ব পছন্দ থেকেই, প্রয়োজনের জন্য নয়।'

'রোজামন্ড ডার্নলি বললো, 'কিন্তু তবুও অন্য সব পুরুষদের মতো আপনিও হয়তো মনে মনে বিশ্বাস করেন, স্বামী-পুত্র ছাড়া কোন স্ত্রীলোকই পূর্ণতা পায় না।'

পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকালেন।

বিয়ে করা এবং সন্তানের মা হওয়া, সেটা সাধারণ স্ত্রীলোকের জন্য। আপনার মতো খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এমন মহিলা শ'য়ে একটা—আরও বেশি, হাজারে একটা দেখা যায়।'

রোজামন্ড বিস্তৃত হাসলো।

'কিন্তু তবুও, আমি একটা বিচ্ছিরি আইবুড়ি ছাড়া কিছু নয়! কেন জানি না, আজকাল সব সময় এই কথাটাই আমার মনে হয়। একটা ছাপোষা শান্ত জোয়ান স্বামী আর একপাল আঁচলধরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমি হয়তো বেশি সুখী হতাম। কথাটা সত্যি, তাই না?'

পোয়ারো কাঁধা ঝাঁকালেন।

'আপনি যখন বলছেন, মাদমোয়াজেল তখন সত্যি!'

রোজামণ্ড সরবে হেসে উঠলো, ওর ভারসাম্য যেন আবার ফিরে এলো। একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখলো ও।

'মহিলাদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, তা আপনি ভালোই জানেন, মঁসিয়ে পোয়ারো। এখন ইচ্ছে করছে, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মহিলাদের প্রতিষ্ঠার পক্ষে আপনার সঙ্গে আবার তর্ক জুড়ে দিই। অবশ্য

এখন আমি যেভাবে আছি, বেশ সুখেই আছি—তা আমি ভালোভাবেই জানি।'

'সুতরাং, বাগানের—নাকি বলবো এই সৈকতের?—সমস্ত ফুলই সুন্দর, মাদমোয়াজেল।'

'ঠিক বলেছেন।'

পোয়ারো এবার তাঁর সিগারেট কেস বের করলেন। অতি সন্তর্পণে তুলে নিলেন একটা ছোট্ট সিগারেট—নিতান্তই ধূমপানের প্রতি করুণাবশে।

সর্পিল ধোঁয়ার সূক্ষ্ম পর্দার দিকে রহস্যময় চোখ মেলে মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলেন পোয়ারো, 'তাহলে মিঃ—উহুঁ, ক্যাপ্টেন মার্শাল আপনার একজন পুরনো বন্ধু, মাদমোয়াজেল?'

রোজমন্ড সোজা হয়ে বসলো। বললো, 'কিন্তু আপনি সে কথা জানলেন কি করে? ওহ্ কেন্ বোধহয় বলে থাকবে।'

পোয়ারো মাথা নাড়ালেন।

'কেউ আমাকে কোন কথা বলেননি। শত হলেও মাদমোয়াজেল, আমি একজন গোয়েন্দা। এক্ষেত্রে এটাই ছিলো যুক্তিসঙ্গত একমাত্র স্পষ্ট সিদ্ধান্ত।

রোজমণ্ড ডার্নলি বললো, 'কই, আমি তো বুঝতে পারছি না?'

'কিন্তু ভেবে দেখুন।' ক্ষুদে মানুষটি হাত নেড়ে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেন, 'আপনি এখানে এসেছেন এক সপ্তাহ। আপনি প্রাণবন্ত, হাসিখুশি উচ্ছল। আজ, হঠাৎ আপনি বলছেন প্রেতাত্মার কথা, বলছেন, পুরনো দিনের কথা। কি এমন ঘটলো? গত কয়েকদিনে নতুন কেউ এখানে আসেননি, শুধু কাল রাত্রে এসেছেন ক্যাপ্টেন মার্শাল, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে। আর আজ এই পরিবর্তন! সুতরাং এটা অত্যন্ত স্পষ্ট।'

রোজমন্ড ডার্নলি বললো, 'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি! কেনেথ মার্শাল আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। মার্শালরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতো। কেন্ আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতো আমার চেয়ে চার বছরে বড় হলেও সমবয়েসীর মতো মিশতো। বহুদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা নেই। তা কম করে—বছর পনেরো তো হবেই।'

পোয়ারোর কণ্ঠে ভেসে উঠলো গভীর চিন্তার সুর।

'পনেরো বছর বড় সুদীর্ঘ সময়।'

রোজমন্ড মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর এরকুল পোয়ারো বললেন, 'ক্যাপ্টেন মার্শাল দরদী মানুষ কি বলেন?'

রোজামন্ড উষ্ণ স্বরে বললো, 'কেন খুব ভালো। সবচেয়ে ভালো লোকদের একজন। ভীষণ শান্ত আর চাপা স্বভাবের মানুষ ও। আমার মতে, ওর একমাত্র দোষ হলো আজেবাজে বিয়ে করার ঝোঁক।'

গভীর সমব্যথীর সুরে বললেন পোয়ারো, 'হুঁ—'

রোজামন্ড ডার্নলি বলে চললো, মেয়েদের ব্যাপারে কেনেথটা একেবারে বোকা—এক নম্বরের বোকা! মাটিংডেল মামলাটা আপনার মনে আছে?'

পোয়ারোর ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো।

মার্টিংডেল? মার্টিংডেল? আর্সেনিক, তাই না?'

'হ্যাঁ। সতেরো-আঠারো বছর আগের ঘটনা। স্বামীকে খুন করার অপরাধে ভদ্রমহিলাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো।'

'এবং ভদ্রলোক নিয়মিত আর্সেনিক খেতেন এ কথা প্রমাণিত হওয়ার পর তাঁর স্ত্রীকে মুক্তি দেওয়া হয়?'

'ঠিক তাই। আর ছাড়া পাওয়ার পর কেন মেয়েটাকে বিয়ে করে বসলো। সাধারণত এই ধরনের বোকার মতো কাজই ও করে থাকে।'

এরকুল পোয়ারো মৃদু স্বরে বললেন, 'কিন্তু মেয়েটি যদি নির্দোষ হয়ে থাকে?'

রোজামন্ড অধৈর্য সুরে বললো, ‘হ্যাঁ আমার ধারণা, সে নির্দোষ ছিলো। সঠিক কেউ জানে না। কিন্তু বিয়ে করার মতো প্রচুর মেয়ে পৃথিবীতে রয়েছে, আপনাকে যে কষ্ট করে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে, তার কোন মানে নেই।’

পোয়ারো নীরব রইলেন। হয়তো তিনি জানতেন, নীরব থাকলে রোজমন্ড ডার্নলি ওর কথা বলে যাবে। ও তাই করলো।

‘অবশ্য, তখন কেনের বয়েস খুব কম ছিলো—সবে একুশ। বউকে ও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। লিন্ডার জন্মের সময় ওর বউ মারা গেলো—ওদের বিয়ের ঠিক এক বছর পর। স্ত্রীর মৃত্যুতে কেন ভীষণ ভাবে ভেঙে পড়েছিলো। এরপর ও হৈ-চৈ করে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দেয়—হয়তো সেই দুঃখ ভুলবার জন্যে।’

ও একটু থামলো।

‘আর তারপরেই ঘটলো এই আর্লেনা স্টুয়ার্টের ব্যাপার। তখন আর্লেনা রিভ্যুতে ছিলো। সেখানে কডরিংটন বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা চলছিলো। আর্লেনা স্টুয়াটের জন্যেই লেডি কডরিংটন তাঁর স্বামীকে ডিভোর্স করেন। লোকে বলে, লর্ড কডরিংটন ওর জন্যে একেবারে মজে গিয়েছিলেন। সবাই ভেবেছিলো, আদালতের চূড়ান্ত রায় বেরোলেই ওরা বিয়ে করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হলো না। লর্ড কডরিংটন সরাসরি ওকে পাশ কাটালেন। যদ্দুর মনে পড়ে, আর্লেনা প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অপরাধে তাঁর নামে মামলা ঠুকেছিলো। যাই হোক, তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর হৈ-চৈ হয়েছিলো। বোকা—এক নম্বরের বোকা।’

এরকুল পোয়ারো মৃদু স্বরে বললেন, ‘কোন পুরুষকে এ ধরনের বোকামির জন্য ক্ষমা করা যায়—মিস স্টুয়ার্ট অসামান্য সুন্দরী, মাদমোয়াজেল।’

‘হ্যাঁ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বছর তিনেক আগে ওকে নিয়ে হলো আর এক কেলেঙ্কারি। স্যার রজার আরস্কিন মারা যাওয়ার সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আর্লেনাকে দিয়ে গেলেন। আমার ধারণা ছিলো, আর কিছু না হোক, এই ব্যাপারটাই কেনের চোখ খুলে দেবে।’

‘তাই কি হয়নি?’

রোজামন্ড ডার্নলি কাঁধ ঝাঁকালেন।

‘বললাম তো, ওর সঙ্গে আমার বহু বছর দেখা নেই। অবশ্য, লোকে বলে, ব্যাপারটাকে ও ভীষণ ঠাণ্ডা মেজাজে নিয়েছিলো। কিন্তু কেন, সেটাই আমার জানতে ইচ্ছে করে। ও কি ওর স্ত্রীকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে?’

‘হয়তো অন্য কোন কারণ থাকতে পারে।’

হ্যাঁ। অহঙ্কার! সব ব্যাপারেই নির্বিকার থাকা! জানি না, নিজের স্ত্রীর সম্পর্কে সত্যি সত্যি ওর কি ধারণা। আমি কেন, কেউ জানে না।’

‘আর মিসেস মার্শাল? নিজের স্বামী সম্পর্কে তাঁর কি ধারণা?’

রোজামণ্ড স্থির চোখে চেয়ে রইলো পোয়ারোর দিকে।

ও বললো, আর্লেনা? ও পৃথিবীর সেরা স্বর্ণসন্ধানী। আর সেই সঙ্গে একটি নরখাদক বাঘিনী? যদি পুরুষের পোশাকে যে কোন বস্তু ওর একশো গজের মধ্যে আসে, তাহলে তখনই শুরু হয় ওর নতুন খেলা। ও ওই ধরনের মেয়ে।’

পোয়ারো পূর্ণ সম্মতি জানিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন।

‘হ্যাঁ,’ তিনি বললেন, ‘আপনার কথা মিথ্যে নয়...মিসেস মার্শালের চোখ শুধু একটা জিনিসই খুঁজে বেড়ায়—পুরুষ।’

রোজামন্ড বললো, ‘আপাতত ওর নজর পড়েছে প্যাট্রিক রেডফার্নের ওপর। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ—আর, একটু সোজা ধরনের— ; নিজের স্ত্রীকে তিনি ভালোবাসেন এবং তথাকথিত কলির কেষ্ট নন। ঠিক এই

ধরনের পুরুষরাই আর্লেনার প্রিয় খাদ্য। মিসেস বেডফার্নকে আমার ভালো লাগে—তাঁর বিবর্ণ চেহারায় একটা নিজস্ব সৌন্দন্দর্য আছে—কিন্তু আমার মনে হয় না, নরখাদক বাঘিনী আর্লেনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনি পেরে উঠবেন।'

পোয়ারো বললেন, 'না, আপনি ঠিকই বলেছেন।'

তাঁর মুখমণ্ডলে যন্ত্রণার ছায়া।

রোজমন্ড বলল, 'যতদূর জানি, ক্রিস্টিন রেডফার্ন ইস্কুলের দিদিমণি ছিলেন। তিনি সেই ধরনের মহিলা, যাঁরা বিশ্বাস করেন, মনের ওপর ঘটনার প্রভাব থাকে। খুব শীগগিরই তিনি এক কঠিন আঘাত পাবেন।'

পোয়ারো বিহ্বলভাবে মাথা নাড়লেন।

উঠে দাঁড়ালো রোজামণ্ড, বললো, 'কি বিশ্রী পরিস্থিতি বলুন তো!' তারপর ও অনিশ্চিত সুরে যোগ করলো, 'এ ব্যাপারে কারো অন্তত কিছু করা উচিত।'

২

শোবার ঘরে আয়নায় নিজের মুখমণ্ডল শান্তভাবে জরীপ করছিলে না লিন্ডা মার্শাল। নিজের মুখ ভীষণ অপছন্দ হলো ওর। এই মুহূর্তে সে মুখের অধিকাংশে হাড ও বিন্দু বিন্দু দাগের উপস্থিত প্রকট বলে মনে হলো ওর কাছে। ও বিরক্তভাবে লক্ষ্য করলো ওর একরাশ নরম বাদামী চুল (ইঁদুর, মনে মনে বলল ও), সবুজ ধূসর চোখ, গালের উঁচু হাড় ও চিবুকের দীর্ঘ উদ্ধত রেখা। ওর মুখ দাঁত হয়তো ততটা খারাপ নয়—কিন্তু দাঁতের সৌন্দর্য কি আসে যায়? আর নাকের পাশে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে ওটা কি কোন দাগ?

নিশ্চিন্ত হয়ে ও সিদ্ধান্ত নিলো, ওটা কোন দাগ নয়। ও আপন মনেই ভাবলো, ষোলো বছরে পা দেওয়া খুব বিচ্ছিরি—ভীষণ বিচ্ছিরি।'

এ সময়ে নিজের সত্যিকারে অবস্থাটা কেউ বুঝতে পারে না। লিন্ডা এখন কোন ছোট্ট অশ্বশাবকের মতো হতবুদ্ধি ও শজারুর মতোই স্পর্শবিরূপ। নিজের অগোছালো অবস্থা সম্পর্কে ও প্রতিটি মুহূর্তে সচেতন; ও জানে, প্রতিটি মুহূর্তে দ্বিধাগ্রস্ত ওর মন। স্কুলের দিনগুলো এত খারাপ ছিলো না। কিন্তু এখন ও স্কুল ছেড়ে এসেছে। এর পর ও কি করবে তা সঠিক কেউ জানে বলে মনে হয় না। ওর বাবা ভাসা ভাসা ভাবে বলছিলেন সামনের শীতে ওকে প্যারিসে পাঠিয়ে দেবার কথা। লিন্ডা প্যারিস যেতে চায় না—কিন্তু বাড়িতে থাকতেও ওর ভালো লাগে না। এর আগে কোনদিন ও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেনি, আর্লেনাকে ও কি ভীষণ অপছন্দ করে।

লিন্ডার কচি মুখ টান টান হলো উত্তেজনায়, সবুজ চোখজোড়া হয়ে উঠলো কঠিন।

আর্লেনা...।

ও আপনার মনেই ভাবলো, 'ও একটা পশু—একটা পশু...।'

সৎমা। সৎমা থাকাটাই ভীষণ বিচ্ছিরি, সবাই তাই বলে। এবং কথাটা সত্যি। আলেনা যে ওর সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে তা নয়। বেশির ভাগ সময় লিন্ডাকে ও খেয়ালই করে না। যখন করে তখন ওর চোখে, কথায়, থাকে, এক অবজ্ঞাভরা কৌতুক। আর্লেনার নিখুঁত চালচলন লিন্ডার কিশোরীসুলভ বিশৃঙ্খল অবস্থাকে করে তোলে আরও বেশি প্রকট। আর্লেনা আশেপাশে থাকলে, যে কেউই নিজেকে ভীষণ অপরিণত অমার্জিত ভেবে লজ্জা পায়।

কিন্তু শুধু তাই নয়। না, শুধুমাত্র তাই নয়।

মনের আনাচে-কানাচে খাপছাড়াভাবে হাতড়ে চললো লিন্ডা। মনের বিভিন্ন ভাবকে আলাদা করে বেছে নিয়ে তাদের নামকরণে তেমন অভ্যস্ত নয় ও। কি যেন একটা করে আর্লেনা—মানুষগুলোকে—বাড়িটাকে—

'ও খারাপ,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবলো, লিন্ডা, 'ও ভীষণ, ভীষণ খারাপ।'

কিন্তু এখানেই থামলে চলবে না।—নিছক নৈতিক উন্নাসিকতায় নাক সিঁটকে ওকে মন থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না।

মানুষগুলোকে ও কি যেন করে। বাবা—বাবা এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম...

ব্যাপারটা অবাক হয়ে ভাবলো ও। বাবা ওকে স্কুল থেকে ফিরিয়ে নিতে আসছেন। বাবা ওকে নিয়ে যাচ্ছেন জাহাজে করে বেড়াতে। এবং সেই বাবা, বাড়িতে আর্লেনার সঙ্গে যেন—যেন নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেন। এবং তাঁর মন সেখানে থাকে না।

লিন্ডা ভাবলো, 'আর এইভাবেই চলবে। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস। এ আমার কাছে অসহ্য।'

জীবনের ওর সামনে দীর্ঘায়িত হলো—অন্তবিহীন—আর্লেনার উপস্থিতিতে অন্ধকার ও বিষাক্ত একরাশ দিনের মিছিলে। ওর শিশুসুলভ মনে সময় সম্পর্কে এখনও কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। লিন্ডার কাছে এক-একটা বছর যেন মনে হয় অনন্তকাল।

আর্লেনার প্রতি ঘৃণা এক বিশাল কালো জ্বলন্ত ঢেউ উথলে উঠলো ওর মনে। ও ভাবলো, 'ওকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করে। ইস! যদি ও মরে যেতো...!'

আয়নার ওপরে চোখ তুলে ও তাকালো দূরে সমুদ্রের দিকে।

এ জায়গাটা সত্যিই চমৎকার। অথবা চমৎকার হতে পারতো। মনোরম সমুদ্রতীর, নির্জন উপকূল। আর পায়ে চলার বিচিত্র আঁকাবাঁকা পথ। অজানা জায়গা আবিষ্কারের আনন্দ। এবং একা একা গিয়ে খুশিমতো হুল্লোড় করার কত জায়গা। এছাড়া গুহা আছে, কাওয়ানদের ছেলেরা ওকে তাই বলছিলো।

লিন্ডা ভাবলো, 'শুধু যদি আর্লেনা এখান থেকে চলে যেতো, তাহলে আমি আনন্দ করতে পারতাম।'

ওর মনে ফিরে গেলো সেই বিকেলে, যেদিন ওরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলো। মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপে আসাটা হয়েছিলো বেশ মজার। কংক্রীটের সেতুটা তখন জোয়ারে জলে ডুবে ছিলো ওরা এসেছিলো নৌকো করে। হোটেলটাকে দেখে কেমন রোমাঞ্চকর এবং অদ্ভুত মনে হয়েছিলো লিন্ডার। আর তারপর, সামনের খোলা চত্বরে বসে থাকা একজন লম্বা তামাটে চেহারার মহিলা ওদের দেখে লাফিয়ে উঠেছেন বলেছেন, 'আরে, কেনেথ!'

এবং ওর বাবা, ভীষণ অবাক চোখে তাকিয়ে বিস্মিতভাবে বলে উঠেছেন, 'রোজামন্ড!'

ও সিদ্ধান্ত নিলো, রোজামন্ডকে ও মেনে নিতে পেরেছে। রোজমন্ড, ও ভাবলো, বেশ বুদ্ধিমতী। আর ওর চুল কত সুন্দর—যেন ওর চেহারার সঙ্গে মানিয়েই তৈরি—বেশির ভাগ লোকের চুলই তাদের চেহারার বেমানান হয়। এছাড়া ওর পোশাকও চমৎকার। আর ও মুখে সর্বদাই কেমন এক অদ্ভুত খুশি—যেন সেই খুশির লক্ষ্য রোজামণ্ড নিজে, অন্য কেউ নয়। রোজমন্ড, ওর সঙ্গে, লিন্ডার সঙ্গে, সুন্দর ব্যবহার করেছে। কখনও আজেবাজে কথা বলেনি। ('আজেবাজে' শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে লিন্ডার একরাশ বিভিন্ন অপছন্দ) আর রোজামন্ড কখনো এমন ভাব করেনি যাতে মনে হয় লিন্ডাকে ও বোকা ভাবছে। সত্যি কথা বলতে কি, লিন্ডাকে, সত্যিকারে মানুষ মনে করেই ওর সঙ্গে কথা বলেছে রোজামন্ড। এত কম সময়ে লিন্ডার নিজেকে সত্যিকারে মানুষ বলে মনে হয় যে কেউ ওকে সে মর্যাদা দিলে ও তার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

বাবাকে দেখে মনে হয়েছে, মিস ডার্নলিকে দেখে তিনি খুশি হয়েছেন।

আশ্চর্য তাঁকে দেখে মনে হয়েছে সম্পূণ অন্য মানুষ, যেন মুহূর্তে বদলে গেছেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছে লিন্ডা অনেক ভেবে ঠিক করলো—হ্যাঁ, যেন তাঁর বয়েস অনেক কমে গেছে! তিনি সরবে হেসে উঠেছেন—এক অদ্ভুত বালকসুলভ হাসি। এখন লিন্ডার হঠাৎ মনে পড়লো বাবাকে সে খুব কম সময়েই হাসতে দেখেছে।

ও কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লো। যেন ও এক ঝলক দেখতে পেয়েছে সম্পূর্ণ অন্য একজন মানুষকে। ও ভাবলো, 'আমার বয়েসে বাবা কি রকম ছিলো কে জানে...।'

কিন্তু সে ভাবনা অনেক শক্ত। ও হাল ছেড়ে দিলো।

একটা নতুন চিন্তা ঝলসে উঠলো ওর মনে।

যদি ওরা এখানে এসে মিস ডার্নলির দেখা পেতো—শুধু ও আর বাবা—তাহলে কি মজাটাই না হতো।

কিছুক্ষণের জন্য খুলে গেলো কল্পনার দরজা, ফুটে উঠলো এক কল্পদৃশ্য। বাবা, ছোট ছেলের মতো হাসছেন, মিস ডার্নলি, আর ও নিজে—সঙ্গে এই দ্বীপের সমস্ত মজা, আনন্দ সমুদ্রস্নান—গুহা।

আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্ধকারে ঢেউ।

আর্লেনা। আর্লেনা সঙ্গে থাকলে কারও পক্ষেই আনন্দ করা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? কে জানে, তবে অন্তত ওর পক্ষে, লিন্ডার পক্ষে, সম্ভব নয়। কে সুখী হতে পারে, যদি এমন কেউ কাছাকাছি থাকে যাকে সে—ঘৃণা করে? হ্যাঁ, ঘৃণা। আর্লেনাকে ও ঘৃণা করে।

অত্যন্ত ধীরে ঘৃণার সেই কালো জ্বলন্ত ঢেউ আবার উথলে উঠলো।

লিন্ডার মুখ হয়ে গেলো ফ্যাকাশে। ওর ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হলো। ওর চোখের তারা তীক্ষ্ণ হয়ে এলো। এবং ওর আঙুলগুলো ক্রমশ কঠিন হয়ে আঁকড়ে ধরলো বাতাস...।

৩

স্ত্রীর ঘরে দরজায় টোকা মারলেন কেনেথ মার্শাল। ওর সাড়া পেতেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি।

আর্লেনা তখন শেষবারের মতো নিজের সাজগোজ দেখে নিচ্ছিলো। ওর পরনে চোখ-ধাঁধানো সবুজ পোশাক—অনেকটা মৎস্যকন্যার মতো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পাতায় ও ম্যাস্কারা লাগাচ্ছিল, বললো, 'ও—তুমি!'

'হ্যাঁ। দেখতে এলাম তোমার হলো কিনা।'

'আর এক মিনিট।'

কেনেথ মার্শাল ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন জানলার কাছে। তাকালেন সমুদ্রের দিকে। তাঁর মুখমণ্ডল, বরাবরের মতোই, অভিব্যক্তিহীন। সেই সঙ্গে শান্ত এবং স্বাভাবিক।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আর্লেনা?'

'উঁ—?'

'রেডফার্নকে তুমি আগে থেকে চিনতে, তাই না?'

আর্লেনা সহজভাবেই জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, সোনা। কোন একটা ককটেল পার্টিতে যেন দেখা হয়েছিলো। ওকে আমাকে বেশ ভালো লেগেছিলো।'

'আমারও সেইরকম ধারণা। তুমি কি জানতে যে সে এবং তার স্ত্রী এখানে বেড়াতে আসছে?'

আর্লেনা মেলে ধরলো ওর গভীর আয়ত চোখ।

'ওঃ, না, সোনা। সেইজন্যেই তো ভীষণ অবাক হয়ে গেছি।'

কেনেথ মার্শাল শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম, হয়তো সেটা জানতে বলেই এ জায়গাটার কথা তোমার মাথায় এসেছে। আমরা যাতে এখানেই আসি, সেজন্যে তুমি বরাবরই একটু বেশি আগ্রহ দেখিয়েছো।'

আর্লেনা ম্যাস্কারা নামিয়ে রাখলো, ঘুরে তাকালো স্বামীর দিকে। হাসলো নেশাধরানো নরম হাসি। বলল, 'এ জায়গাটার কথা কে যেন আমাকে বলেছিলো। সম্ভবত রোজান্ডরা। ওরা বলেছিলো, জায়গাটা ভীষণ চমৎকার—আর সুন্দর। কেন, তোমার ভালো লাগছে না?'

কেনেথ মার্শাল বললেন, 'কি জানি, জানি না।'

‘ওঃ কেন তুমি তো সমুদ্রে স্নান করতে আর ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতে। এখানে তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।’

‘বেশ বুঝতে পারছি, জায়গাটা তোমার অন্তত ভালোই লাগবে।’

আর্লেনার আয়ত চোখ আরও বিস্তৃত হলো। অনিশ্চিত দৃষ্টিতে ও তাকালো কেনেথ মার্শালের দিকে।

কেনেথ মার্শাল বললেন, ‘আমার মনে হয়, আসলে ব্যাপারটা হলো, তুমি রেডফার্নকে আগেই জানিয়েছো যে তুমি এখানে আসছো।’

আর্লেনা বললো, কেনেথ সোনা, তুমি এরকম করে কথা বলছো কেন?’

কেনেথ মার্শাল বললেন, ‘শোনো আর্লেনা। তুমি কি ধরনের মেয়ে আমি জানি। তাই বলছি, রেডফার্নরা মোটামুটি সুখী স্বামী-স্ত্রী। ছেলেটা সত্যিই ওর বউকে ভালোবাসে। তুমি কি চাও ওদের এই সুখের সম্পর্কে চিড় ধরুক?’

আর্লেনা বলল, ‘আমাকে দোষ দেওয়াটা তোমার ঠিক হচ্ছে না, কেন। আমি তো কিছু করিনি—কিছুই করিনি। আমি কি করতে পারি, যদি—’

আর্লেনার কথার খেই ধরে প্রশ্ন করলেন কেনেথ মার্শাল, ‘যদি কি?’

আর্লেনার চোখের পাতায় কাঁপন ধরলো।

‘অবশ্য, আমি জানি, পুরুষরা আমাকে দেখলে পাগল হয়ে যায়। কিন্তু সেটা তো আমার দোষ নয়। ওদের অমনি হয়।’

‘তাহলে তুমি স্বীকার করছো, রেডফার্ন তোমার জন্য পাগল?’

আর্লেনা অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলো, ‘সেটা নিছকই ওর বোকামি।’

ও এক পা এগিয়ে গেলো স্বামীর দিকে।

‘কিন্তু তুমি তো জানো, কেন, তুমি ছাড়া আর কারো কথা আমি ভাবি না?’

কৃষ্ণাভ চোখের পাতার ফাঁকে কেনেথ মার্শালের চোখে তাকালো আর্লেনা।

সে দৃষ্টি এক কথায় বিস্ময়কর—যা খুব কম পুরুষই প্রতিরোধ করতে পারে।

কেনেথ মার্শাল গম্ভীরভাবে চোখ নামালেন আর্লেনার চোখে। তাঁর মুখ অভিব্যক্তিহীন। কণ্ঠস্বর শান্ত। তিনি বললেন, ‘আমার ধারণা, তোমাকে আমি বেশ ভালোভাবেই চিনি, আলেনা...’

৪

হোটেলের দক্ষিণ দিকে বেরোলেই আপনার চোখে পড়বে সামনে বিস্তৃত বাঁধানো উঠোন, আর তার নিচেই সমুদ্রতীর। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ছোট পাহাড়টার কোল ঘেঁষে আরও একটা পথ দ্বীপকে ঘিরে এগিয়ে গেছে। সেই পথ ধরে কিছুটা গেলে কয়েক ধাপ সিঁড়ি আপনাকে নামিয়ে নিয়ে যাবে পাহাড়ের পাথর কেটে তৈরি কতকগুলো কৃত্রিম কুঠুরীর দিকে। হোটেল থেকে প্রচারিত দ্বীপের মানচিত্রে এই জায়গাটাকে ‘সানি লেজ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃত্রিম গুহাগুলোর ভেতরে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে কতকগুলো বেদী—বসার জন্য।

নৈশভোজের ঠিক পরেই প্যাট্রিক রেডফার্ন ও তার স্ত্রী এসে বসলো—এই রকমই একটা গুহায়। রাতের স্পষ্ট আকাশে চোখে পড়েছে উজ্জ্বল চাঁদ।

কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ রইলো।

অবশেষে প্যাট্রিক রেডফার্ন মুখ খুললো, ‘আজকের রাতটা খুব সুন্দর তাই না ক্রিস্টিন?’

‘হুঁ —’

ওর কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত আভাস পেয়ে প্যাট্রিক অস্বস্তি বোধ করলো। ওর দিকে না তাকিয়েই সে চুপচাপ বসে রইলো।

ক্রিস্টিন ওর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি জানতে যে ওই মেয়েটা এখানে আসছে?'

প্যাট্রিক চমকে ঘুরে তাকালো, বললো, 'তার মানে?'

'আমার তো মনে হয়, মানেটা বেশ ভালো বুঝতে পারছো!'

'শোনো, ক্রিস্টিন—জানি না, হঠাৎ তোমার কি হয়েছে—'

বাধা দিলো ক্রিস্টিন। ও স্বরে আবেগের স্পর্শ, ও শরীর কাঁপচে।

'আমার কি হয়েছে? আমার কিছু হয়নি, হয়েছে তোমার।'

'আমার কিছু হয়নি—'

'ও—প্যাট্রিক! কিছু একটা হয়েছে! তুমি এখানে আসার জন্যে প্রথম থেকে জোর করেছিলে। আমার কোন কথা কানে তোলনি। আমি টিন্টাজেলে আবার যেতে চেয়েছিলাম—সেখানে আমাদরে হানিমুন কেটেছিলো। কিন্তু তুমি এখানে আসার জন্যে একেবারে গোঁ ধরে ছিলে।'

হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? এ জায়গাটা অত্যন্ত চমৎকার।'

'হয়তো। কিন্তু তুমি এখানে আসতে চেয়েছিলে যেহেতু ও এখানে আসছে।'

'ও? ও মানে?'

'মিসেস মার্শাল। তুমি—তুমি ওর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছো।'

'ভগবানের দোহাই, ক্রিস্টিন, বোকার মতো কথা বলো না। কাউকে ঈর্ষা করা তো তোমার স্বভাব নয়!'

প্যাট্রিকের স্বরে উন্মক্ত ক্রোধের অনিশ্চিত সুর, এবং তার তীব্রতা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি।

ক্রিস্টিন বললো, 'আমরা কত সুখী ছিলাম।'

'সুখী? নিশ্চয়ই আমরা সুখী ছিলাম! আর এখনও আছি। কিন্তু আমাকে কোন মেয়ের সঙ্গে দুটো কথা বলতে দেখলেই তুমি যদি এমনি খুঁচিয়ে ঝগড়া করো, তাহলে আর বেশি দিন সুখে থাকা বোধহয় সম্ভব হবে না।'

'না, তা নয়।'

'হ্যাঁ, তাই। বিয়ের পর কোন পুরুষের অন্য লোকেদের সঙ্গে—ইয়ে—বন্ধুত্ব হওয়াটা নেহাৎই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে এ ধরনের সন্দেহজনক মনোভাবে মোটেই ঠিক নয়। আমি কোন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই তুমি ধরে নিচ্ছো আমি তার প্রেমে পড়েছি—'

সে থামলো, তারপর কাঁধ ঝাঁকালো।

ক্রিস্টিন রেডফার্ন বললো, 'তুমি সত্যিই ওর প্রেমে পড়েছো...'

'ওঃ, বোকামো কোরো না, ক্রিস্টিন! আমি—আমি ওর সঙ্গে ভালো করে কথাই পর্যন্ত বলিনি।'

'মিথ্যে কথা।'

'ভগবানের দোহাই পথে দেখা হওয়া প্রতিটি সুন্দরী মেয়েকে ঘিরে আমাকে সন্দেহ করার এ স্বভাব তুমি ছাড়ো।'

ক্রিস্টিন রেডফার্ন বলল, 'ও নিছকই একটা সুন্দরী মেয়ে নয়! ও—ও অন্য রকম। ও একটা নষ্ট মেয়েছেলে!। ও তোমার ক্ষতি করবে, প্যাট্রিক। আমার কথা শোনো,এসব ছেড়ে দাও। চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।'

প্যাট্রিক রেডফার্নের উদ্ধত চিবুকে ফুটে উঠলো বিদ্রোহী ভাব। বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি তরুণ দেখালো তাকে। প্রতিবাদের সুরে সে বলে উঠলো, 'একটু ভেবেচিন্তে কথা বলো, ক্রিস্টিন। আর—আর এ নিয়ে ঝগড়া কোরো না'

'আমি তো ঝগড়া করছি না।'

'তাহলে একটু সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ করো। এসো, হোটেলে ফিরে যাওয়া যাক।'

প্যাট্রিক উঠে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে ক্রিস্টিন রেডফার্ন উঠে দাঁড়ালো।

ও বললো, ‘আচ্ছা চলো...’

পাশের কুঠুরীতে বসে গভীর দুঃখে মাথা নাড়লেন এরকুল পোয়ারো।

অন্য কেউ হয়তো সাধারণ ভদ্রতাবোধেই এই ব্যক্তিগত কথাবার্তার শ্রবণ-সীমার বাইরে নিজেকে সরিয়ে নিতেন, কিন্তু এরকুল পোয়ারো নয়। এ ধরনের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ বিবেকহীন।

‘তাছাড়া—’ পরে কোন একদিন তিনি তাঁর বন্ধু হেস্টিংসের কাছে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন, ‘ওই ঘটনার সঙ্গে একটা খুনের প্রশ্ন জড়িয়ে ছিলো।’

হেস্টিংস অবাক চোখে চেয়ে থেকে বলেছেন, ‘কিন্তু তখনও তো খুনটা হয়নি।’

এরকুল পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, ‘না হয়নি। কিন্তু বন্ধু সেই মুহূর্তে আমি তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছিলাম।’

‘তাহলে তুমি সেটা রুখলে না কেন?’

তখন এরকুল পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, যে কথা তিনি আগে মিশরেও একবার বলেছেন, যে যদি কোন মানুষ খুন করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তবে তাকে বাধা দেওয়া নেহাৎ সহজ কাজ নয়। পরবর্তী ঘটনার জন্য তিনি নিজেকে কখনও দোষারোপ করেননি। কারণ তাঁর মতে খুনটা ছিলো অনিবার্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

‘গার্ল কোভ’ -এর ওপরে নরম ঘাসে ছাওয়া সমতলে পাশাপাশি বসেছিলেন রোজামন্ড ডার্নলি ও কেনেথ মার্শাল। দ্বীপের পূর্বদিকে অবস্থিত এই গোল কোভ। নির্জনে স্নান করতে ভোরের দিকে লোকে এখানে আসে।

রোজামন্ড বলল, ‘লোকজনের সঙ্গ ছেড়ে নির্জনে কাটাতে বেশ ভালো লাগে।’

নিচু স্বরে বিড়বিড় করলেন মার্শাল, ‘ম্-ম্-হুঁ।

উপুড় হয়ে ছোট ছোট ঘাসের গন্ধ নিলেন তিনি।

‘আ-হ—চমৎকার গন্ধ! শিপলির সেই মাঠগুলোর কথা মনে পড়ে?’

‘পড়ে।’

‘দিনগুলো কি সুন্দর ছিলো।’

‘হুঁ।’

‘তুমি বেশি বদলাওনি, রোজামন্ড।’

‘হ্যাঁ, বদলে গেছি। অনেক বদলে গেছি।”

‘এখন তোমার অনেক নাম হয়েছে, অনেক টাকা-পয়সা হয়েছে, কিন্তু তুমি সেই পুরনো রোজামন্ডই আছো।’

রোজমন্ড মৃদুস্বরে বলল, ‘যদি তাই থাকতে পারতাম—’

‘তার মানে?’

‘কিছু না। ভাবতে দুঃখ হয়, কেনেথ, যে ছোটবেলাকার সুন্দর স্বভাব উঁচু আদর্শ, কোনটাই আমরা চিরকাল ধরে রাখতে পারি না, তাই না?’

‘তোমার স্বভাব যে কোনকালে সুন্দর ছিলো, তার পরিচয় অন্তত আমি পাইনি, বৎসে। মাঝে মাঝেই যেভাবে রেগে উঠতে তুমি? একদিন তো রাগে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার গলাই টিপে ধরেছিলে।’

রোজমণ্ড সশব্দে হাসলো, যেদিন টোবিক নিয়ে আমরা ভোঁদর ধরতে গিয়েছিলাম, সে দিনটা তোমার মনে আছে?...’

অতীত অভিযানের স্মৃতিচারণে এভাবেই কেটে গেলো বেশ কিছু সময়।

অবশেষে নেমে এলো কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

রোজামন্ডের আঙুল ওর ব্যাগের ফিতে নিয়ে খেলা করতে লাগলো। অবশেষে ও বললে, ‘কেনেথ?’

‘উঁ—’ কেনেথ মার্শালের উত্তর এলো অস্পষ্ট স্বরে। তিনি তখনও নরম ঘাসে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে আছেন।

‘যদি আমি এমন কিছু বলি, যা হয়তো পুরোপুরিই অনধিকার চর্চা, তাহলে কি তুমি আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না?’

কেনেথ মার্শাল ঘুরে উঠে বসলেন।

‘আমার মনে হয় না,’ তিনি আন্তরিক সুরেই বললেন, ‘যে তোমার কোন কথাকে আমি কখনও অনধিকার চর্চা বলে-ভাবতে পারি। তুমি তো জানো, তোমার সে অধিকার আছে।’

রোজামন্ড নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে কেনেথে মার্শালের শেষ কথাগুলোর অর্থ মেনে নিলো। ও শুধু গোপন করলো এই মুহূর্তে পাওয়া ওর ক্ষণিকের সুখটুকু।

‘কেনেথ, তোমার স্ত্রীর কাছে তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইছো না কেন?’

কেনেথ মার্শালের মুখমণ্ডলে পরিবর্তন এলো। খুশি খুশি অভিব্যক্তিটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে নেমে এলো কঠিনতার ছোঁয়া। পকেট থেকে পাইপ বের করে তিনি নিঃশব্দে তামাক ভরতে লাগলেন।

রোজামন্ড বললো, ‘তোমাকে আঘাত দিয়ে থাকলে দুঃখিত।’
তিনি শান্ত স্বরে বললেন, ‘না, আঘাত তুমি আমাকে দাওনি।’
‘তাহলে, কেন তা করছো না?’
‘ও তুমি বুঝবে না, রোজামন্ড—’
‘তুমি কি ওকে খুব ভালোবাসো?’
‘এটা শুধু ভালোবাসাবাসির প্রশ্ন নয়। আমি ওকে বিয়ে করেছি।’
‘জানি। কিন্তু ওর—ওর অনেক বদনাম আছে।’
সতর্ক হাতে তামাক ঠুকতে ঠুকতে কথাটা কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি।
‘কি জানি, হয়তো আছে।’
‘তুমি ওকে ডিভোর্স করতে পারো, কেন।’
রোজামন্ড সোনা, এ নিয়ে তোমার মাথা না ঘামানোই ভালো। পুরুষেরা ওকে দেখে জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলে বলে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই, যে ওর ও ওই একই অবস্থা হয়।’
রোজামন্ড মুখের মতো একটা জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেলো। তারপর বললে, ‘তবে এমন একটা ব্যবস্থা করো যাতে ও তোমাকে ডিভোর্স করে—যদি তুমি সে ভাবেই চাও।’
‘তা বোধহয় সম্ভব নয়।’
‘কিন্তু তোমাকে পারতেই হবে, কেন। আমি ঠাট্টা করে বলছি না। তোমার মেয়ের কথাটাও ভাবতে হবে।’
‘লিন্ডা?’
‘হ্যাঁ, লিন্ডা।’
‘এর সঙ্গে লিন্ডার কি সম্পর্ক?’
লিন্ডার পক্ষে আর্লেনা মোটেই ভালো নয়। আমার ধারণা, লিন্ডা আজকাল অনেক কিছু বেশ বুঝতে পারে।’
কেনেথ মার্শাল দেশলাই জ্বেলে পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন, ধোঁয়া ছাড়বার ফাঁকে তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, সে কথা মিথ্যে নয়। আমারও মনে হয় আর্লেনা ও লিন্ডা ঠিক মানিয়ে চলতে পারছে না। একটা ছোট মেয়ের পক্ষে এটা ভালো নয়। সেই জন্যেই আমার দুশ্চিন্তা হয়।’
রোজামন্ড বললো, ‘লিন্ডাকে আমার খুব ভালো লাগে। ওর মধ্যে ভালো লাগার মতো কি যেন একটা আছে।’
কেনেথ বললেন, ‘ও ঠিক ওর মায়ের মতো। সব কিছু ভীষণ গভীরভাবে নেয়, যেমন রুথ নিতো।’
রোজামন্ড বললো, এরপরে কি তোমার মনে হয় না, আর্লেনাকে তোমার ত্যাগ করা উচিত?’
‘বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা সাজিয়ে?’
‘হ্যাঁ। আজকাল সবাই তাই করে।’
আকস্মিক রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন, কেনেথ মার্শাল, ‘হ্যাঁ করে, আর ঠিক ওই জিনিসটাই আমি সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করি।’
‘ঘেন্না করো?’ ও ভীষণ চমকে গেলো।
‘হ্যাঁ। জীবন যেন আজকাল বড় খেলো হয়ে গেছে। যদি কোন জিনিস নিয়ে পরে সেটা ভালো না লাগে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ত্যাগ করতে আজ আর কোন বাধা নেই! আশ্চর্য! মানুষের মনে বিশ্বাস বস্তুটা অন্তত থাকা উচিত। তুমি যদি কোন মেয়েকে বিয়ে করে তার ভরণপোষণের ভার নাও, তাহলে সেই কর্তব্য পালনের দায়িত্ব একমাত্র তোমার। কারণ, তুমিই এ খেলা শুরু করেছো। সহজ বিয়ে এবং আরও সহজ বিবাহ-বিচ্ছেদে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আর্লেনা আমার স্ত্রী, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা।’

রোজামন্ড সামনে ঝুঁকে এলো, নিচু স্বরে বললো, 'তাহলে ব্যাপারটা তোমার কাছে অনেকটা সেইরকম? 'যতদিন না মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন করে?'

কেনেথ মার্শাল মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

রোজমণ্ড বলল, 'ও!'

২

একটি সঙ্কীর্ণ সর্পিল পথ ধরে লেদারকোম্ব উপসাগরে ফেরার পথে একটা বাঁকের মুখে মিসেস রেডফার্নকে আর একটু হলেই চাপা দিচ্ছিলেন হোরেস ব্ল্যাট।

ক্রিস্টিন রাস্তার পাশে সারি দেওয়া ঝোপের গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই সশব্দে ব্রেক কষে সানবীম থামালেন মিঃ ব্ল্যাট।

'এই যে!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন মিঃ ব্ল্যাট।

মিঃ ব্ল্যাট বিশাল চেহারার পুরুষ। মুখের রঙে লালচে আভাস। হালকা লাল চুলের আস্তরণ তাঁর চকচকে টাককে বৃত্তাকার পথে ঘিরে রেখেছে।

ঘটনাচক্র তাঁকে যে জায়গাতেই নিয়ে যাক না কেন, সে জায়গার মধ্যমণি হয়ে থাকার ইচ্ছেটাই মিঃ ব্ল্যাটের একমাত্র উচ্চাশা। তাঁর মতে, বেশ সোচ্চারেই তিনি এ মত প্রকাশ করেছেন, জলি রজার হোটেলের কিঞ্চিৎ আনন্দ-সঞ্জীবনীসুধার প্রয়োজন আছে। কোন ঘটনাস্থলে তিনি যখনই উপস্থিত হন, তখন সেখানকার অন্যান্য লোকেরা যে বিচিত্র পদ্ধতিতে ক্রমশ দ্রবীভূত এবং অদৃশ্য করে ফেলে তাতে তাঁর রীতিমতো অবাক লাগে।

'আরেকটুকু হলেই আপনাকে স্ট্রবেরীর আচার বানিয়ে ফেলেছিলাম, কি বলেন?' খুশির সুরে বললেন, মিঃ ব্ল্যাট।

ক্রিস্টিন জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, সে আর বলতে'

'ঝটপট উঠে আসুন।' মিঃ ব্ল্যাট বললেন।'

'না, ধন্যবাদ—আমার হাঁটতে ভালোই লাগছে।'

'যত্তো সব!' বললেন, মিঃ ব্ল্যাট, 'তাহলে গাড়ির জন্ম হয়েছে কি করতে?'

নিরুপায় হয়েই গাড়িতে উঠলো ক্রিস্টিন রেডফার্ন।

আচমকা ব্রেক কষে রোখার ফলে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, মিঃ ব্ল্যাট বোতাম টিপে তাকে আবার চালু করলেন।

মিঃ ব্ল্যাট প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এখানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কেন বলুন তো? উহুঁ, এ ঠিক নয়, অন্তত আপনার মতো সুন্দরী মেয়ের পক্ষে।'

ক্রিস্টিন তাড়াতাড়ি বললে, 'এমনিই। একা থাকতে আমার ভালো লাগে।'

মিঃ ব্ল্যাট কনুই দিয়ে ওকে প্রচণ্ড এক খোঁচা মারলেন, এবং একই সঙ্গে গাড়িটা নিয়ে আর একটু হলে পাশের ঝোপে ধাক্কা মারছিলেন।

'মেয়েরা সবসময় ওই কথাই বলে!' তিনি বললেন, 'ওদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। আসলে ওটা ওদের মনের কথা নয়। এই যে আমাদের জলি রজার হোটেল, ওটাকে ঘষে মেজে একটু চাঙ্গা করে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নামের সঙ্গে চরিত্রের কোন মিল নেই। কোন প্রাণ নেই। শুধু একগাদা বাজে লোক এসে হোটেলটায় ভিড় করেছে। প্রথমেই ধরুন, ওই একপাল বাচ্চা-কাচ্চা, আর নীরস বুড়োবুড়িগুলো। এছাড়া রয়েছে ভারতবর্ষ ঘুরে আসা ওই বিরক্তিকর বুড়োটা, আমাদের শরীর সাধক পাদ্রী সাহেব,

ঘ্যানঘ্যানে মার্কিনগুলো আর ওই অদ্ভুত গোঁফওয়ালা বিদেশীটা—ওর গোঁফ দেখলেই আমার হাসি পায়। মনে হয়, লোকটা নির্ঘাত নাপিত-টাপিত না হয়ে যায় না।'

ক্রিস্টিন মাথা নাড়ালো।

'উহুঁ, উনি একজন গোয়েন্দা।'

মিঃ ব্ল্যাটের গাড়ি আবারও অল্পের জন্য সংঘর্ষের হাত থেকে রেহাই পেলো।

'পোয়ান্দা? আপনি বলতে চান উনি এখন ছদ্মবেশে রয়েছেন?'

ক্রিস্টিন হালকাভাবে হাসলো।

ও বললো, 'না, না, ওঁকে দেখতেই ওইরকম। ওঁর নাম এরকুল পোয়ারো। আপনি নিশ্চয়ই ওঁর নাম শুনে থাকবেন।'

মিঃ ব্ল্যাট বললেন, 'নামটা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। ওহ্ হ্যাঁ, ভদ্রলোকের নাম আমি শুনেছি। কিন্তু আমার ধারণা ছিলো তিনি মারা গেছেন...। যাই বলুন, এরকম গোঁফওয়ালা গোয়েন্দার মরে যাওয়াই উচিত। তা উনি এখানে এসেছেন কি মতলবে?'

'কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন নি—এমনিই ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন।'

'হুঁ—হতে পারে।' মিঃ ব্ল্যাটকে এ ব্যাপারে বেশ সন্দিহান বলে মনে হলো, 'লোকটা একটু কাঠখোট্টা ধরনের, তাই না?'

'হ্যা, মানে—' কিস্টিন ইতস্তত করে বললো, 'একটু অদ্ভুত ধরনের বলতে পারেন।'

'আমার কথা হলো', মিঃ ব্ল্যাট বললেন, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কি ঘুমিয়ে রয়েছে? এসব কাজে ইংরেজ ছাড়া আর কাউকে আমি ভরসা করি না।'

পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে বিজয়ীর ভঙ্গীতে ঘনঘন হর্ন বাজিয়ে মিঃ ব্ল্যাট তাঁর সানবীমকে জলি রজারের গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিলেন; গ্যারেজটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের কারণে, হোটেলের ঠিক বিপরীত দিকে, মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত।

৩

যে ছোট দোকানটা লেদারকোম্ব উপসাগরের অতিথিদের প্রয়োজন মেটায় সেই দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলো লিন্ডা মার্শান। দোকানের একটা অংশ জুড়ে রয়েছে সারি সারি বই সাজানো কতকগুলো বইয়ের তাক। দু'পেনির বিনিময়ে অতিথিরা এই বই পড়তে নিতে পারেন। বইগুলোর নতুনতম সংস্করণটি অন্তত দশ বছরের পুরনো, কয়েকটা বিশ বছর আগেকার, আর বাকিগুলো আরও পুরনো।

লিন্ডা দ্বিধাগ্রস্তভাবে প্রথমে একটা, তারপর আর একটা বই নামালো তাক থেকে, এক পলক উল্টোপাল্টে দেখলো বই দুটো, ওর মনে হলো 'দি ফোর ফেদার্স' অথবা 'ভাইঝি ভার্সা', কোনটাই ওর পড়তে ভালো লাগবে না। তাই ও ছোটখাটো বাদামি মলাটের আর একটা বই নামিয়ে নিলো।

সময় গড়িয়ে চললো...

হঠাৎ পেছন থেকে ক্রিস্টিন রেডফার্নের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই চমকে উঠলো লিন্ডা, নিমেষের মধ্যে বইটাকে আবার তাকে গুঁজে রাখলো।

'কি বই পড়ছো, লিন্ডা?'

লিন্ডা তাড়াতাড়ি জবাব দিলো, 'না, কিছু না। একটা ভালো বই খুজছি।'

ও এবার ভালো করে না দেখেই টেনে বার করলো 'দি ম্যারেজ অফ উইলিয়াম অ্যাশ' বইটা এবং বিব্রতভাবে দুপেনি হাতড়াতে এগিয়ে গেলো কাউন্টারের দিকে।

ক্রিস্টিন বললো, মিঃ ব্ল্যাট এইমাত্র আমাকে পৌঁছে দিলেন—অবশ্য তার আগে আমাকে প্রায় চাপাই দিয়েছিলেন। ভেবে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে সেতুটা পার হাওয়া আমার সাহসে কুলোবে না,

তাই কিছু কেনাকাটা করার আছে বলে চলে এসেছি।'

লিন্ডা বলল, 'ভদ্রলোক বড় সাংঘাতিক, তাই না? সব সময় খালি টাকার গরম দেখানো আর যতসব বীভৎস রসিকতা করেন।'

ক্রিস্টিন বললে, 'বেচারা! ওঁর জন্যে দুঃখ হয়।'

লিন্ডা কিন্তু একমত হতে পারলো না। মিঃ ব্ল্যাটের জন্য দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ ও খুঁজে পেল না। ও বয়েসে কিশোর এবং নির্মম।

ক্রিস্টিন রেডফার্নের সঙ্গে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এলো লিন্ডা, ঢালু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল, কংক্রিটের সেতুর দিকে।

নিজের চিন্তায় লিন্ডা তখন ব্যস্ত। ক্রিস্টিন রেডফার্নকে ওর ভালো লাগে। ওর মতে সারা দ্বীপে রোজমন্ড ডার্নলি এবং ক্রিস্টিন, এই দুজনকেই কেমন সহ্য করা যায়। প্রথমত, ওরা কেউই লিন্ডার সঙ্গে বেশি কথা বলে না। এবং এই মুহূর্তেও ক্রিস্টিন নীরবে ওর পাশে পাশে হাঁটছে। এটাই বুদ্ধিমতীর পরিচয়, লিন্ডা ভাবলো। যদি সত্যিই তেমন কিছু বলার না থাকে তাহলে শুধু শুধু বকবক করার দরকারটা কি?

নিজের সমস্যার জটিলতায় কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেলো ও।

তারপর হঠাৎই একসময় ও বললো, 'মিসেস রেডফার্ন, আপনার কখনও মনে হয়নি, এখানে সবকিছু এত বিশ্রী—এত ভয়ঙ্কর যেন ঠিক ফেটে পড়ার মতো...?'

কথাগুলো প্রায় হাস্যকর, কিন্তু লিন্ডার চিন্তা-কুটিল কঠিন মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। ক্রিস্টিন রেডফার্ন অনিশ্চিত অবুঝ চোখে ওর দিকে তাকালো, কিন্তু উপহাস করার মতো কিছু ওর নজরে পড়লো না।

ওর শ্বাস প্রশ্বাস স্তব্ধ হলো মুহূর্তের জন্য।

ও বললো, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে হয়েছে ঠিক এই জিনিসটাই...'

৪

মিঃ ব্ল্যাট বললেন, 'তাহলে আপনিই মশাই সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা, অ্যাঁ?

ওঁরা বসেছিলেন জলি রজারের পানশালায়, মিঃ ব্ল্যাটের প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্রে।

এরকুল পোয়ারো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নাতিবিনীত ভঙ্গীতে ব্ল্যাটের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন।

মিঃ ব্ল্যাট বলে চললেন, 'এখানে আপনি কি জন্যে এসেছেন কোন কাজে?'

'না, না। আমারও তো মাঝে মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন। এমনি ছুটিতে বেড়াতে এসেছি।'

মিঃ ব্ল্যাট চোখ টিপলেন।

'আপনি তো মশাই ওই কথাই বলবেন, তাই না?'

পোয়ারো জবাব দিলেন, বিনা প্রয়োজনে মিথ্যে বলে লাভ কি।'

হোরেস ব্ল্যাট বললেন, 'ওঃ হো! বলেই ফেলুন না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছ থেকে আপনি অন্তত নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি যা শুনি, সব সেরেফ হজম করে ফেলি! বহু বছর আগেই এ বিদ্যেটা মশাই রপ্ত করেছি। তা যদি না পারতাম, তাহলে আমার আজকের এই অবস্থায় পৌঁছতে পারতাম না। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই কি রকম জানেন—খালি বকবক বক, যা শোনে তা উগরে না দিতে পারলে যেন স্বস্তি পায় না। অবশ্য আপনাদের পেশায় তো আর এ জিনিসটাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না! অতএব সেই কারণেই আপনাকে ভান করতে হবে যে আপনি এখানে শুধু ছুটি কাটাতেই এসেছেন, অন্য কোন কারণে নয়।'

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি এর উল্টোটাই বা ভাবছেন কেন?'

মিঃ ব্ল্যাট আবারও চোখ টিপলেন, বললেন, 'আমি মশায় ঘোড়েল লোক। চেহারা দেখেই চরিত্র বুঝতে পারি। আপনার মতো লোকের পক্ষে "দাভিল', "লা টোকে" অথবা "জুয়ান-লা-প্রিন্স"-এ যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিলো। অর্থাৎ যে জায়গাগুলোর সঙ্গে আপনার—কি যেন বলে?—আত্মিক যোগ থাকা সম্ভব।

পোয়ারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলেন তিনি। কুয়াশাঘেরা দ্বীপে শুরু হয়েছে অঝোর বর্ষণ। তিনি বললেন, 'সম্ভবত আপনার কথাই ঠিক। সেখানে অন্তত বর্ষার আবহাওয়ায় সময় কাটানোর বিভিন্ন আয়োজন রয়েছে।

'যথা, আমার প্রিয় জুয়ার আড্ডা!' বললেন মিঃ ব্ল্যাট, 'জানেন, আমার জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটে গেছে কঠোর পরিশ্রমে। বেড়াবার বা ফুর্তি করবার, কোনটারই সময় পাইনি। চেয়েছিলাম সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা—আজ তো পেয়েছি। এখন আমি যা মন চায় করতে পারি। আমার টাকার দাম কারও চেয়ে কিছু কম নয়। গত কয়েক বছরে অন্তত কিছু কিছু সুখ আনন্দ যে আমি চেখে দেখেছি, এটুকু আপনাকে বলতে পারি।'

পোয়ারো অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'ও, তাই নাকি?'

'জানি না, এখানে আমি কেন এলাম—' মিঃ ব্ল্যাট বলে চললেন।

পোয়ারো মন্তব্য করলেন, 'সে কথা ভেবে আমিও অবাক হয়েছি।'

'অ্যাঁ, কি বললেন?'

পোয়ারো অর্থপূর্ণভাবে হাত নাড়লেন।

'কিঞ্চিৎ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যে আমরও নেই তা নয়। আমার বিশ্বাস, পছন্দের প্রশ্ন উঠলে, আপনি সহজেই এ জায়গার চেয়ে "দ্যভিল" অথবা "বিয়্যারিৎস"কে বেছে নিতেন।'

'আর তার বদলে আমরা দুজনেই এসে হাজির হয়েছি এখানে।'

কর্কশ স্বরে হেসে উঠলেন মিঃ ব্ল্যাট।

'সত্যিই ভেবে পাই না, এখানে কেন এলাম।' তিনি আনমনা ভাবেই বলে চললেন, 'আমার মনে হয়, এ জায়গাটার নামের সঙ্গে কেমন একটা অলীক গন্ধ জড়িয়ে ছিলো। জলি রজার হোটেল, স্মাগলার্স দ্বীপ। এগুলো যেন আপনাকে চঞ্চল করে তোলে, ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দেয়, তাই না? জলদস্যু চোরাচালান, এই সব।'

অপ্রতিভভাবে হাসলেন তিনি, 'ছোটবেলা থেকে নৌকো নিয়ে প্রচুর ঘুরে বেড়িয়েছি। অবশ্য একদিকটায় নয়। পূর্ব উপকূল অঞ্চলে। আশ্চর্য, এ এমনই এক নেশা, যা কখনও পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা যায় না। ইচ্ছে করলে সাজানো-গোছানো একটা প্রমোদতরীও কিনে ফেলতে পারতাম, কিন্তু ও জিনিসটা ঠিক আমার মনে ধরে না। তার চেয়ে আমার ছোট পালতোলা নৌকোয় ভেসে বেরিয়ে মজা আছে। রেডফার্নও নৌকো বাইতে ভালোবাসে। বার দুয়েক আমার সঙ্গেও বেরিয়েছে। এখন তো ওর পাত্তাই পাওয়া যায় না—দিনরাত খালি মার্শালের লালচুলো বউটার পেছনে ঘুরঘুর করছে।'

একটু থামলেন ব্ল্যাট। তারপর গলা নামিয়ে বলে চললেন, 'হোটেলের বেশির ভাগ লোকই তো মশাই রসকষহীন শুকনো মাল! ওই মধ্যে মিসেস মার্শালের কাছেই যা একটু প্রাণের ছোঁয়া পাওয়া যায়। আমার ধারণা বউয়ের পেছনে দেখাশোনা করতেই মার্শালের গোটা দিনটা পার হয়ে যায় মিসেস যখন অভিনয়-জগতে ছিলেন তখন তাঁর নামে সবরকম গপ্পো চালু ছিলো—এবং এখনো আছে। ওঁকে দেখলে পুরুষদের মাথার আর ঠিক থাকে না। দেখবেন, এই নিয়েই এখানে একটা কেলেঙ্কারি হবে।'

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, 'কি কেলেঙ্কারি?'

হোরেস ব্ল্যাট উত্তর দিলেন, 'সেটা অবস্থার ওপর নির্ভর করছে। মার্শালকে দেখে আমার অন্তত মনে হয়, সে একটু অদ্ভুত মেজাজের লোক। সত্যি কথা বলতে কি, "মনে হয় নয়'' আমি ভালোভাবেই জানি। কারণ তার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আমার কানে এসেছে। এ ধরনের শান্ত কম কথার লোক আমি আগেও দেখেছি। মুখ দেখে এদের মনের ভাব কখনও জানা যায় না। রেডফার্নের সাবধান থাকা উচিত—'

তাঁর বক্তব্যের নায়কের পানশালায় প্রবেশ করতে দেখে মাঝপথেই থেমে গেলেন তিনি। তারপর অপ্রতিভ উঁচু স্বরে আলোচনার খেই ধরলেন, 'আর আপনাকে যা বলছিলাম, এখানকার সমুদ্রে নৌকা চালিয়ে সত্যিই

মজা আছে। আরে, রেডফার্ন যে, এক গেলাস করে হয়ে যাক? কি খাবেন বলুন? ড্রাই মার্টিনি? আচ্ছা মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি?

পোয়ারো মাথা নেড়ে অসম্মত্তি প্রকাশ করলেন।

প্যাট্রিক রেডফার্ন বসলো, বললো, 'নৌকো চালানোর কথা বলছিলেন? পৃথিবীতে এর চেয়ে মজার নেশা আর নেই। ইচ্ছে হয়, এর পেছনে আরও বেশিসময় কাটিয়ে দিতে। ছোটবেলায় বেশির ভাগ সময় তো এখানকার উপকূলে নৌকো নিয়েই কাটিয়ে দিতাম।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনি তাহলে এইদিকটা ভালোভাবেই চেনেন?'

'তা বলতে পারেন। এ হোটেল তৈরি হবার আগে থেকেই এ জায়গাটা আমার চেনা। তখন লেদারকোম্ব উপসাগরে পুরনো আমলের একটা পোড়ো বাড়ি আর কয়েক ঘর জেলে ছাড়া এ দ্বীপে কেউ ছিলো না।'

'একটা বাড়ি ছিলো এখানে?'

'হ্যাঁ, বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত এক পোড়ো বাড়ি। বলতে গেলে প্রায় ধ্বংসাবশেষই বলা যায়। তখন নানারকম সব গল্প চালু ছিলো যে ওই বাড়ি থেকে পিক্সির গুহায় যাওয়ার নাকি অনেকগুলো গুপ্ত পথ আছে। এখনও মনে পড়ে, আমার সব সময় সেই গুপ্ত পথ খুঁজে বেড়াতাম।'

হোরেস ব্ল্যাটের হাতে ধরা গেলাস কেঁপে উঠলো, ছলকে পড়লো পানীয়। শাপ-শাপান্ত করে রুমাল দিয়ে ভেজা জায়গাটা মুছে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এই পিক্সির গুহাটা কি জিনিস?'

প্যাট্রিক বললো, 'ও, আপনি জানেন না? ওটা পিক্সি কোভে আছে। গুহায় ঢোকবার পথটা কিন্তু চট করে খুঁজে পাবেন না। এক কোণে স্তূপাকারে রাখা একগাদা পাথরের মাঝে লুকানো রয়েছে পথটা। শুধু লম্বা একটা সরু ফাটল। একজন কোনরকমে কাত হয়ে ঢুকতে পারে। ভেতরে ওটা ক্রমশ চওড়া হয়ে বেশ বড়সড় একটা গুহার সৃষ্টি করেছে। বুঝতেই তো পারছেন, ছোট ছেলেদের কাছে সেটা কিরকম মজার জিনিস ছিলো। একজন বুড়ো জেলে আমাকে ওটা দেখিয়ে দিয়েছিলো। আজকাল এখানকার জেলেরাও ওটার খবর জানে না। এই তো সেদিন একজনকে জিগ্যেস করলাম, জাযগাটাকে পিক্সি কোভ কেন বলা হয়—তা সে কোন জবাবই দিতে পারলো না।'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'আমি কিন্তু এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এই পিক্সিটা কি জিনিস?'

প্যাট্রিক রেডফার্ন বললো, 'একে আপনি খাস ডেভনশায়ারে চীজ বলতে পারেন। শীপস্টরের জলাভূমিতে একটা পিক্সির গুহা আছে। পিক্সির জন্যে উপহার হিসেবে লোকে সেখানে একটা করে আলপিন রেখে আসে। পিক্সি হলো এক ধরনের আত্মা, যা জলাভূমিতে বসবাস করে।'

এরাকুল পোয়ারো বললেন, 'হুঁ বেশ কৌতূহলের ব্যাপার।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন বলে উঠলো, 'ডার্টমুরে এই পিক্সি নিয়ে এখনও অনেক কিংবদন্তী চালু আছে। সেখানে অনেক পাহাড়ের চূড়ায় পিক্সি আছে বলে মনে করা হয়। শুনেছি কুয়াশা-ঘেরা রাতে দেরি করে বাড়ি ফেরার পর কৃষকেরা এখনও অনুযোগ করে যে পিক্সি তাদের পথ ভুলিয়ে দিয়েছিলো।'

হোরেস ব্ল্যাট বললেন, 'তার মানে, যখন তারা দু-এক বোতল চড়িয়ে টং হয়ে থাকে?'

প্যাট্রিক হাসলো।

'এছাড়া সাধারণ বুদ্ধিতে এর আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে, বলুন?'

ব্ল্যাট হাতঘড়িতে চোখ রাখলেন, বললেন, 'আমি এবার চলি ডিনার সারতে। মোটের ওপর, রেডফার্ন যা-ই বলুন পিক্সিদের চেয়ে জলদস্যুদের আমি ঢের বেশি পছন্দ করি।'

তিনি বেরিয়ে যেতেই প্যাট্রিক রেডফার্ন সশব্দে হেসে বললো, 'সত্যি বলছি, পিক্সির পাল্লায় পড়লে ভদ্রলোকের কি হাল হয় সেটা আমার দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করে!'

পোয়ারো আত্মগতভাবে মন্তব্য করলেন, 'একজন কঠোর সংগ্রামী ব্যবসায়ীর পক্ষে মঁসিয়ে ব্ল্যাটের চিন্তাধারা একটু বেশি মাত্রায় কল্পনাবিলাসী।'

রেডফার্ন বললো, 'তার কারণ ভদ্রলোক অর্ধশিক্ষিত। অন্তত আমার স্ত্রী তাই বলে। ভদ্রলোক এখনও কি সব বই পড়েন, দেখুন! শুধু রহস্য-রোমাঞ্চ আর কাউবয়দের কাহিনী।'

পোয়ারো বললেন, অর্থাৎ, আপনি বলতে চান তাঁর মন এখনও ছোট ছেলের মতো?'

'কেন, আপনার কি তা মনে হয় না?'

'আমি? আমি ওকে কতটুকুই বা জানি।'

'সে তো আমিও জানি না। কেবল বারকয়েক তাঁর সঙ্গে নৌকো নিয়ে বেরিয়েছি—কিন্তু দেখলাম তিনি সঙ্গীসাথী খুব একটা পছন্দ করেন না। একা একা থাকতেই ভালোবাসেন।'

'ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগছে। এটা তাঁর ডাঙার ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিপরীত।'

রেডফার্ন সশব্দে হাসলো, বললো, 'জানি। ওঁর কাছ থেকে সর্বদা শত হস্তেন থাকতে আমাদের রীতিমতো অসুবিধায় পড়তে হয়। এ জায়গাটাকে 'ম্যারগেট' এবং 'লা টোকে'র মাঝামাঝি কিছুতে তৈরি করতে পারলে তিনি খুশি হন।'

কয়েক মিনিট পোয়ারো নীরব রইলেন। তিনি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীর হাস্যময় মুখমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তারপর আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বলে বসলেন, 'আমার মনে হয়, মঁসিয়ে রেডফার্ন, আপনি জীবনকে উপভোগ করতে ভালোবাসেন।'

প্যাট্রিক অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো।

'নিশ্চয়ই ভালোবাসি। কেন বাসবো না?'

'সত্যিই তো, কেন বাসবেন না।' পোয়ারো সমর্থন করলেন, 'এ জন্যে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'এবং এই প্রসঙ্গে, একজন বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে, অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে, আপনাকে আমি একটা ছোট্ট উপদেশ দিতে সাহস করছি।'

'বলুন?'

'আমার পুলিশ-বাহিনি জনৈক বিচক্ষণ বন্ধু বহু বছর আগে আমাকে বলেছিলেন, 'ভাই এরকুল, জীবনে যদি শান্তি চাও তাহলে স্ত্রীলোকদের এড়িয়ে চলবে।'

প্যাট্রিক রেডফান বললো, 'তা যদি বলেন, তাহলে আমার ক্ষেত্রে আপনার একটু দেরি হয়ে গেছে। আপনি তো জানেন, আমি বিবাহিত।'

'হ্যাঁ, জানি। আপনার স্ত্রী একজন মর্জিত রুচির সুন্দরী মহিলা। আমার ধারণা, তিনি আপনাকে যথেষ্ট ভালোবাসেন।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন তীব্র স্বরে বলে উঠলো, 'আমিও ওকে যথেষ্ট ভালোবাসি।'

'যাক', বললেন, এরকুল পোয়ারো, 'এ কথা শুনে বড় সুখী হলাম।'

প্যাট্রিক অকস্মাৎ রাগে ফেটে পড়লো, 'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'নারী ছলনাময়ী।' পোয়ারো চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, 'তাঁদের সম্পর্কে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। জীবনকে জটিল করে তুলতে ওঁরা পারদর্শিনী। এবং ইংরেজরা তাঁদের প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে বড় অদ্ভুতভাবে আচরণ করে। মঁসিয়ে রেডফার্ন, এখানে আপনার আসাটা যদি এতই জরুরি ছিলো তাহলে, কোন্ সুবাদে আপনি স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে এলেন?'

রেডফার্ন রাগী সুরে বললো, 'আপনি কি বলেছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এরকুল পোয়ারো শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছেন। মোহাচ্ছন্ন কোন পুরুষের সঙ্গে তর্ক করার মতো নির্বোধ আমি নই। আমি শুধু আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

'ও আপনি তাহলে ওই বেহদ্দ মেয়েছেলেগুলোর কথা শুনেছেন। মিসেস গার্ডেনার, ওই ব্রুস্টার মেয়েটা—দিনরাত জিভ চালানো ছাড়া ওদের আর কোন কাজ নেই। যেহেতু একটা মেয়েকে দেখতে সুন্দর ব্যস্ অমনি ওরা তাকে ঘিরে নোংরা গালগল্প নিয়ে মুখিয়ে উঠেছে।'

এরকূল পোয়ারো উঠে দাঁড়ালেন। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'সত্যিই কি আপনার এখনও এসব করার বয়েস আছে?'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে পানশালা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন পোয়ারো। প্যাট্রিক রেডফার্ন আগুনঝরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো তাঁর গমনপথের দিকে।

৫

খাবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে হল ঘরে এসে থমকে দাঁড়ালেন এরকুল পোয়ারো। ঘরে সব ক'টা দরজাই খোলা—রাতের এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে অনধিকার প্রবেশ করলো ঘরে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘন কুয়াশাও এখন মিলিয়ে গেছে। আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা ঝলমলে রাতে।

পাহাড়ের কিনারায় ওর প্রিয় আসনে ক্রিস্টিন রেডফার্নকে আবিষ্কার করলেন এরকুল পোয়ারো। তিনি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আপনি ভিজে আসনে বসেছেন, মাদাম। এখানে আপনার বসা ঠিক নয়—ঠান্ডা লাগবে।'

"উহুঁ, কিচ্ছু হবে না। আর হলেই বা কি যায় আসে?'

'আপনি তো আর অবুঝ শিশু নন, মাদাম! আপনি একজন শিক্ষিত মহিলা। আপনার অন্তত সবকিছু বুঝে শুনে করা উচিত!'

শীতল স্বরে উত্তর দিলো ও, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, ঠাণ্ডায় আমার কিছু হয় না!'

পোয়ারো বললেন, 'আজকের দিনটা ছিলো বৃষ্টি-ভেজা দিন। ঝড় উঠে ছিলো, এসেছিলো বর্ষা, ঘনকুয়াশা আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে সাময়িকভাবে করে দিয়েছিলো অন্ধ... কিন্তু এখন? কুয়াশা মিলিয়ে গেছে, আকাশ আবার আগের মতোই পরিষ্কার এবং তারারা চিকমিক করে জ্বলছে। জীবনও অনেকটা এইরকম, মাদাম।'

ক্রিস্টিন চাপা স্বরে বললো, 'জানেন, এখানে আমার সবচেয়ে অসহ্য লাগে কোন জিনিসটা?

'কি, মাদাম?'

'দয়া!'

ওর তীক্ষ্ণ স্বরে শব্দটা যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়লো।

ও বলে চললে, 'আপনারা ভাবেন, আমি কিছু বুঝি না? কিছু দেখি না? সবাই সর্বক্ষণ বলে বেড়াচ্ছে, 'বেচারা মিসেস রেডফার্ন—ইস, ওকে দেখলে কষ্ট হয়।' অর্থাৎ আমার অবস্থা দেখে তাঁদের করুণা হচ্ছে। আর, ঠিক এই জিনিসটাই আমি সহ্য করতে পারি না।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে অতি সাবধানে পাথরের আসনে বিছিয়ে দিলেন পোয়ারো, বসলেন। তারপর তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখলেন, 'আপনার কথা একেবারে মিথ্যে নয়।'

'ওই মেয়েটা—' মাঝপথেই থেমে গেলো ক্রিস্টিন।

পোয়ারো গম্ভীর স্বরে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে কয়েকটা কথা বলি, মাদাম? যে কথা আকাশের ওই উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মতোই সত্যি? এই পৃথিবীর আর্লেনা স্টুয়ার্টরা—অথবা আর্লেনা মার্শালরা—কখনও ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।

ক্রিস্টিন রেডফার্ন বললো, 'বাজে কথা।'

'উঁহু—সত্যি, আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি। তাদের রাজত্ব হয় ক্ষণস্থায়ী, শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে। মনে সত্যিকারের স্থায়ী দাগ কাটেন একমাত্র তাঁরাই যাঁদের মধ্যে প্রশংসনীয় গুণ আছে, আছে বুদ্ধি।'

ঘৃণাভরা স্বরে ক্রিস্টিন বললো, 'আপনি কি ভাবেন পুরুষেরা গুণ বুদ্ধি—এসবের কোন গুরুত্ব দেয়?'

পোয়ারো শান্ত স্বরে বললেন, নিশ্চয়ই দেয়।'

ক্রিস্টিন সংক্ষেপে হাসলো, বললো, 'আমি কিন্তু একমত হতে পারলাম না।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসেন, মাদাম। আমি জানি।'

'আপনার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। আমি তাঁকে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি।'

হঠাৎই ভেঙে পড়লো ক্রিস্টিন। পোয়ারোর কাঁধে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো ও।

ও বলে উঠলো, 'আমি আর সইতে পারছি না... আর সইতে পারছি না...'

পোয়রো ওর পিঠে হাতে রেখে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। আশ্বাসের সুরে বললেন, 'ধৈর্য ধরুন, মাদাম... শুধু একটু ধৈর্য ধরুন।'

অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে ও উঠে বসলো। রুমালে চোখ মুছে রুদ্ধ স্বরে বললো, 'মসিয়ে পোয়ারো, আপনি এখন যান। আমি—আমি একটু একা থাকতে চাই।'

পোয়ারো সে অনুরোধ রাখলেন। ক্রিস্টিনকে একা রেখে আঁকাবাঁকা পথ ধরে তিনি ফিরে চললেন হোটেলের দিকে।

হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎই তাঁর কানে চাপা কথাবার্তার শব্দ।

পথ ছেড়ে পাশে কিছুটা এগোতেই তিনি দেখলেন, ঝোপের সারির মাঝে একটা ফাঁকা অংশে পাশাপাশি বসে আছে আর্লেনা মার্শাল ও প্যাট্রিক রেডফার্ন।

তিনি শুনতে পেলেন পুরুষটির আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর, 'আর্লেনা, তোমার জন্যে আমি সবকিছু ভুলে বসে আছি—তুমি আমাকে—আমাকে পাগল করে দিয়েছো... কিন্তু তুমি কি আমার জন্যে একটুও ভাবো না, আমাকে ভালোবাসো না, বলো?'

পোয়ারো আর্লেনা মার্শালের মুখমণ্ডল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন—তাঁর মনে হলো, যেন কোন বেড়াল আদরে উত্তাপে বসে সুখ অনভব করছে—সে ভঙ্গীর সঙ্গে মানুষের চেয়ে পশুর সাদৃশ্য অনেক বেশি। আর্লেনার হালকা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'নিশ্চয়ই, প্যাট্রিক সোনা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি তো জানো...'

পোয়ারো এই প্রথম তাঁর অপশ্রবণে ক্ষান্তি দিলেন। সরু ঢালু পথ ধরে আবার ফিরে চললেন হোটেলের দিকে।

মাঝপথে হঠাৎ একজন তাঁর সঙ্গ নিলেন। তিনি ক্যাপ্টেন মার্শাল।

মার্শাল বললেন, চমৎকার রাত, কি বলেন? বিশেষ করে ওরকম একটা জঘন্য দিনের পর।' তিনি চোখ তুলে তাকালেন আকাশের দিকে, 'মনে হচ্ছে, কালকের আবহাওয়া ভালো থাকবে।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

২৫শে আগস্টের সকাল বয়ে নিয়ে এলো উজ্জ্বল নির্মেঘ দিনের আশ্বাস। এমন সুন্দর সকাল কোন চূড়ান্ত অলসকেও বিছানা ছাড়তে লোভ দেখায়।

জলি রজারের অনেকেই আজ সকাল সকাল উঠেছেন।

সাজের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বাদামী রঙের মোটা বাঁধানো বইটা খোলা অবস্থাতেই উপুড় করে রাখলো লিন্ডা। তারপর তাকালো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। সকাল এখন আটটা।

ওর ঠোঁট জোড়ায় এক অদ্ভুত দৃঢ়তা, চোখের তারা স্বাভাবিকের চেয়ে ঈষৎ সঙ্কুচিত।

ও রুদ্ধশ্বাসে উচ্চারণ করলো, 'আমাকে পারতেই হবে...'

পাজামা ছেড়ে সাঁতারের পোশাক পরে নিলো লিন্ডা। তার ওপরে পরলো স্নানের ঢোলা পোশাক। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা ধরে চলতে শুরু করলো ও। বারান্দার শেষে একটা দরজা খুলতেই দেখা গেলো একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে নিচের পাথুরে জমিতে। সেখান থেকে একটা ঝোলানো লোহার মই নেমে গেছে সমুদ্রের জলে। প্রাত্যহিক প্রাতরাশ সেরে নেবার আগে হোটেলের যে সব অতিথিরা একটু শরীর ভিজিয়ে নিতে চান, তাঁরাই সময় সংক্ষেপ করার জন্য প্রধান সৈকতে না গিয়ে এ মইটা ব্যবহার করেন।

লিন্ডা যখন বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, তখন ও মুখোমুখি হলো ওর বাবা সঙ্গে, তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলেন। ওকে দেখে বললেন, 'আজ সকাল সকাল উঠেছ দেখছি। স্নান করতে যাচ্ছো বুঝি?'

লিন্ডা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

ওরা পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো।

কিন্তু ঝোলানো মইয়ের দিকে না এগিয়ে হোটেলকে ঘিরে বাঁ পাশ দিয়ে যে পথটা কংক্রিটের সেতুর দিকে চলে গেছে, সে পথ ধরলো লিন্ডা। জোয়ারের কারণে সেতু এখন জলের নিচে, কিন্তু অতিথিদের পারাপারে নেকোটা কাছেই পাড়ে বাঁধা রয়েছে। ওটার দায়িত্ব যাঁর ওপর, তাঁকে কাছাকাছি কোথাও দেখা গেলো না। লিন্ডা নৌকোয় উঠে বাঁধন খুলে নৌকো ছেড়ে দিলো।

ওপারে পৌঁছে, পাড়ে নৌকো বেঁধে ও ঢালু পথ বেয়ে এগিয়ে চললো... হোটেলের গ্যারেজ ছাড়িয়ে থামলো এসে ছোট দোকানটার কাছে।

দোকানের মহিলাটি তখন সবেমাত্র দোকান খুলে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করেছে। লিন্ডাকে দেখে সে রীতিমতো অবাক হলো।

'আপনি আজ খুব সকাল সকাল উঠেছেন, মিস।'

লিন্ডা স্নান-পোশাকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো কিছু টাকা। তারপর কেনাকাটার মন দিলো।

২

লিন্ডা যখন ফিরে এলো তখন ক্রিস্টিন রেডফার্ন ওর ঘরে দাঁড়িয়ে।

'ও, এই তো!' বিস্মিত সুরে বললো ক্রিস্টিন, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো এখনও ঘুম থেকে ওঠোনি।'

'না, স্নান করতে গিয়েছিলাম।' লিন্ডা বললো।

ওর হাতের প্যাকেটটা লক্ষ্য করলো ক্রিস্টিন, একটু অবাক হয়ে বললো, 'পিয়ন আজ বেশ তাড়াতাড়িই ডাক বিলি করে গেছে দেখছি।'

লিন্ডা চমকে উঠলো। ওর স্বভাবসিদ্ধ অগোছালো প্রকৃতির জন্য কাগজের প্যাকেটটা ওর হাত ফস্কে পড়ে গেলো মেঝেতে। পলকা সুতোটা ছিঁড়ে গিয়ে ভেতরে কয়েকটা জিনিস গড়িয়ে পড়লো বাইরে।

ক্রিস্টিনের চোখে ফুটে উঠলো বিস্ময়।

'তুমি মোমবাতি কিনেছো কিসের জন্যে?'

কিন্তু লিন্ডার সৌভাগ্যবশত ক্রিস্টিন ওর উত্তরের অপেক্ষা করলো না। ওকে সাহায্য করতে মেঝে থেকে জিনিসগুলো তুলতে তুলতে বলে চললো, 'জানতে এসেছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে গাল কোভে যাবে কি না? আমি আজ সেখানে ছবি আঁকতে যাবো।'

লিন্ডা বিনাদ্বিধায় সম্মতি জানালো।

গত কয়েকদিনে ও একাধিকবারই ক্রিস্টিনকে ওর চিত্রাঙ্কন-অভিযানে সঙ্গ দিয়েছে।শিল্পী হিসেবে ক্রিস্টিন খুব উঁচুদরের না হলেও লিন্ডার ধারণা, সম্ভবত এই ছবি আঁকার কপট অজুহাতই ওর অহঙ্কারকে এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কারণ ওর স্বামী দিনের বেশিরভাগ সময়ই আর্লেনা মার্শালের সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেয়।

লিন্ডা দিনের পর দিন ক্রমশ খিটখিটে এবং বদ-মেজাজী হয়ে পড়ছে। ক্রিস্টিনের সঙ্গে সময় কাটাতে ওর ভালো লাগে, কারণ ক্রিস্টিন ছবি আঁকার সময় গভীর মনোযোগে ডুবে থাকে, এবং অত্যন্ত কম কথা বলে। তাতে লিন্ডা একরকম নিঃসঙ্গ তার স্বাদ অনুভব করে, অথচ ওর মনের মধ্যে থাকে কারও সঙ্গ লাভের এক অদ্ভুত আকুলতা। ওদের পরস্পরের প্রতি কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম সহানুভূতির যোগ রয়েছে, সম্ভবত বিশেষ একজনকে সমানভাবে অপছন্দ করার মধ্যেই এর কারণ লুকিয়ে আছে।

ক্রিস্টিন বললো, 'বারোটায় আমি টেনিস খেলতে যাবো, তাই একটু তাড়াতাড়ি বেরোলেই ভালো হয়। ধরো, সাড়ে দশটা?'

'ঠিক আছে, আমি তৈরি হয়ে থাকবো। হলঘরেই তাহলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

৩

অত্যন্ত দেরিতে প্রাতরাশ সেরে রোজামন্ড ডার্নলি খাবার ঘর ছেড়ে শ্লথ পায়ে বেরোতেই সিঁড়ি বেয়ে ত্বরিত নেমে আসা লিন্ডার সঙ্গে ওর ধাক্কা লাগলো।

'ওহ্—দুঃখিত, মিস ডার্নলি।'

রোজামন্ড বলল, 'চমৎকার সকাল, তাই না? গতকালের পর এরকম একটা দিন বিশ্বাসই করা যায় না।'

'ঠিক বলেছেন। আমি মিসেস রেডফার্নের সঙ্গে গাল কোভে যাচ্ছি। সাড়ে দশটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা। ভাবছিলাম, হয়তো দেরিই হয়ে গেলো।'

'না, না—এখন সবে দশটা পঁচিশ।'

'যাক—তাহলে নিশ্চিন্ত।'

লিন্ডাকে একটু হাঁপাতে দেখে রোজামণ্ড উৎসুক হয়ে তাকালো ওর দিকে।

'তোমার জ্বর হয়নি তো, লিন্ডা?'

লিন্ডার চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল এবং ওর দু গালে লালচে আভা বেশ স্পষ্ট।

'কই—না তো। আমার কখনও জ্বর হয় না।'

রোজমন্ড হেসে বললো, 'আজকের দিনটা এত সুন্দর যে আমি বিছানায় বসে প্রাতরাশ খাওয়ার পুরনো অভ্যেস ছেড়ে সটান নিয়ে চলে এসেছি। এবং বীরপুরুষের মতোই খাওয়ার টেবিলে ডিম ও বেকনের মুখোমুখি হয়েছি।'

'হ্যাঁ—গতকালের পর আজকের দিনটা সত্যি অপূর্ব। আর সকালের দিকে গাল কোভে খুব ভালো লাগে। আমি গিয়ে একরাশ তেল মেখে খোলা রোদে শুয়ে থাকবো—'

রোজামন্ড বললো, 'হ্যাঁ, গাল কোভে সকালের দিকে ভালো লাগে। তাছাড়া জায়গাটা এখানকার সৈকতের তুলনায় অনেক শান্ত নির্জন।'

লিন্ডা লাজুক স্বরে বলল, 'আপনিও চলুন না।'

রোজামণ্ড মাথা নাড়লো। বললো, 'না, আজ কতকগুলো অন্য কাজ আছে।'

ক্রিস্টিন রেডফার্ন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে।

ওর পরনে আবহাওয়া উপযোগী লম্বা হাতার ঢোলা পোশাক: সবুজ কাপড়ের ওপর হলদে কাজ করা। ওর গায়ের ফ্যাকাশে পাণ্ডুর রঙের সঙ্গে সবুজ এবং হলদে রঙটাই যে সবচেয়ে বেশি বেমানান, সে কথা বলার জন্য রোজামণ্ডের জিভ নিসপিস করিতে লাগলো। পোশাক সম্পর্কে কোন বোধশক্তি নেই, এমন কাউকে দেখলে রোজামন্ডের ভীষণ অস্বস্তি হয়।

ও ভাবলো, 'যদি এই মেয়েটাকে আমি মনের মতো করে সাজাতে পারতাম, তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই ওর স্বামী সচেতন হয়ে ঠিক ওর দিকে নজর দিতো। আর্লেনা বোকা হতে পারে, কিন্তু ও জানে নিজেকে কিভাবে সাজাতে হয়।'

তারপর লিন্ডাকে ও বলল, 'আশা করি সময়টা তোমার ভালই কাটবে। আমি একটা বই নিয়ে সানি লেজ-এর দিকে, যাচ্ছি।'

৪

এরকুল পোয়ারো যথারীতি তাঁর ঘরে বসেই কফি ও রোল সহকারে প্রাতরাশ সারলেন।

সকালের সৌন্দর্য তাঁকে অভ্যাস-নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হোটেল ছাড়তে বাধ্য করলো। তিনি যখন সমুদ্রতীরে নেমে এলেন, তখন সবে দশটা—এখানে তাঁর দৈনন্দিন উপস্থিতির সময় হতে তখনও অন্তত আধ ঘণ্টা দেরি। শুধু একজন ছাড়া বেলাভূমিতে আর কাউকে তাঁর নজরে পড়লো না।

সেই একজন আর্লেনা মার্শাল।

আর্লেনার পরনে ওর প্রিয় সাদা সাঁতারের পোশাক, মাথায় সবুজ টুপি। ও একটা সাদা কাঠের ভেলাকে জলে ভাসানোর চেষ্টা করছিলো। পোয়ারো নির্দ্বিধায় ওকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলেন এবং পরোপকারিতার পুরস্কারস্বরূপ নিজের ধবধবে সাদা জুতো জোড়াকে সমুদ্রের জলে স্নান করালেন।

আর্লেনা ওর নিজস্ব তির্যক দৃষ্টিতে পোয়ারোকে ধন্যবাদ জানালো।

ভেলায় চড়ে এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে আর্লেনা তাঁকে ডাকলো, 'মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো তৎপর ভঙ্গিতে নিমেষে জলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

'মাদাম!'

আর্লেনা বললো, 'আমার জন্যে একটা কাজ করবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

ও পোয়ারোর দিকে চেয়ে হাসলো। তারপর মৃদু স্বরে বললো, 'কাউকে বলবেন না আমি কোথায় আছি।' ওর চোখে অন্তর-স্পর্শ করা দৃষ্টি, 'নইলে প্রত্যেকেই আমার পেছু নেবে। আমি আজ একটু একা থাকতে চাই।'

নিপুণ হাতে বৈঠা বেয়ে এগিয়ে চললো আর্লেনা।

পোয়ারো সমুদ্রতীর ছেড়ে উঠে এলেন। আপনমনেই বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'উহুঁ, একেবারেই অসম্ভব! আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

আর্লেনা স্টুয়ার্ট, যদি মঞ্চের নামেই ওকে সম্বোধন করা যায়, জীবনে কখনও একা থাকতে চেয়েছে কিনা সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অভিজ্ঞ এরকুল পোয়ারো সহজেই এর আসল কারণ অনুমান করলেন। আর্লেনা মার্শাল নিঃসন্দেহে কারও সঙ্গে দেখা করতে চলেছে, এবং কার সঙ্গে সে বিষয়েও পোয়ারোর মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে।

কিন্তু মনে মনে ভাবলেও নিজের অনুমানকে ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে দেখলেন পোয়ারো।

কারণ সাদা ভেলাটা যেই পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হলো, তখনই তাঁর নজরে পড়লো, প্যাট্রিক রেডফার্ন লম্বা পা ফেলে হোটেলের দিক থেকে সমুদ্রতীরের দিকে নেমে আসছে—এবং তার ঠিক পেছনেই আসছেন কেনেথ মার্শাল।

মার্শাল পোয়ারোকে দেখে ঈষৎ মাথা নোয়ালেন, 'সুপ্রভাত, মঁসিয়ে পোয়ারো। আমার স্ত্রীকে দেখেছেন?'

পোয়ারো অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদের মতো জবাব দিলেন, 'মাদাম তাহলে আজ সকালে উঠেছেন?'

মার্শাল বললেন, 'ওকে ওর ঘরে দেখলাম না।' তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালেন, 'চমৎকার দিন। এখনই স্নানটা সেরে ফেলি। ফিরে গিয়ে আবার একগাদা কাগজ টাইপ করতে হবে।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন অপেক্ষাকৃত চাপা দৃষ্টিতে সমুদ্রতীরের দু-পাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। তারপর পোয়ারোর পাশে বসে তার প্রেমিকার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

পোয়ারো বললেন, 'আর মাদাম রেডফার্ন? তিনিও কি ভোরে উঠেছেন?'

প্যাট্রির জবাব দিলো, ক্রিস্টিন? ও ছবি আঁকতে বেরোবে। ইদানীং দেখছি ওর ছবি আঁকার ঝোঁক বেড়ে গেছে।'

প্যাট্রিক রেডফার্নের সুর অধৈর্য, এবং স্পষ্টই বোঝা গেলো তার মন পড়ে রয়েছে অন্য কোথাও। সময় যতই যেতে লাগলো, আর্লেনার জন্য তার অসহিষ্ণু ভাব ততই প্রকট হতে লাগলো। কোন পায়ের শব্দ শোনামাত্রই সে উৎসুক হয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখছে, হোটেলের দিক থেকে কে আসছে।

কিন্তু শুধু হতাশার পর হতাশা।

প্রথমে এলেন মিঃ এবং মিসেস গার্ডেনার—সেলাই ও সেলাইয়ের বইয়ে সুসজ্জিত হয়ে। তারপর এলেন মিস ব্রুস্টার।

মিসেস গার্ডেনার তাঁর চেয়ারে গুছিয়ে বসলেন। তারপর যথারীতি অসীম উৎসাহে বুনতে শুরু করলেন—সেই সঙ্গে শুরু হলো তাঁর কথার স্রোত।

'আচ্ছা, মঁসিয়ে পোয়ারো, ব্যাপারটা কি? সমুদ্রতীর আজ এত ফাঁকা লাগছে? সব গেলো কোথায়?'

পোয়ারো বললেন, 'মাস্টারম্যান ও কাওয়ানরা বাচ্চাকাচ্ছা সমেত দুটি পরিবারই সারাদিনব্যাপী নৌকো-বিহারে বেরিয়েছে।'

'ও, সেই জন্যেই আজ এত চুপচাপ লাগছে, হাসিহাসি চেঁচামেচি করার জন্য ওরা তো আর নেই। আর মাত্র একজনই দেখছি স্নান করছেন, ক্যাপ্টেন মার্শাল।'

মার্শাল তাঁর সাঁতার শেষ করে পাড়ে এলেন, তোয়ালে দুলিয়ে সৈকত ছেড়ে উঠে এলেন ওপরে।

আজ সমুদ্রের জল চমৎকার।' তিনি বললেন, 'কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, ওদিকে একগাদা কাজ পড়ে রয়েছে। না গিয়ে উপায় নেই।'

'আজকের মতো চমৎকার দিনেও আপনার কাজ রয়েছে, ক্যাপ্টেন মার্শাল? তাহলে তো সত্যিই দুর্ভাগ্য বলতে হয়। উঃ, গতকাল কি বিশ্রীই না একটা দিন গেছে! আমি মিঃ গার্ডেনারকে বলেছিলাম যে রোজই যদি এইরকম বৃষ্টি-বাদলা চলতে থাকে তাহলে আমাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। কারণ এইরকম কুয়াশা ঢাকা পরিবেশে আমার কেমন যেন মনমরা লাগে, আর একটা অদ্ভুত ভাব মনকে ঘিরে থাকে। আপনি হয়তো জানেন না, ছোটবেলা থেকেই আবহাওয়া আর পরিবেশের প্রতি আমি যথেষ্ট সংবেদনশীল। মাঝে মাঝে আমার মনে হতো, আমি শুধু চিৎকার করে যাই এবং বুঝতেই পারছেন, মা-বাবার কাছে এটা একটা সমস্যাই হয়ে উঠতো। কিন্তু আমার মা খুব ভালো ছিলো। মা বাবাকে বলতো, 'সিনক্লেয়ার, বাচ্চাটার যদি সত্যিই চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়, তাহলে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। এই চিৎকার করেই ও ও মনের ভাব প্রকাশ করতে চাইছে।' এবং স্বাভাবিকভাবেই আমার বাবা এ নিয়ে আর দ্বিমত করতো না। এমনিতে বাবা মায়ের অত্যন্ত অনুগত ছিলো। মা যা বলতো বিনাদ্বিধায় তাই করতো।

তারা সত্যিই সুখী দম্পতি ছিলো, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিঃ গার্ডেনারও আমার সঙ্গে একমত হবেন। তারা-এক কথায় ছিলো অসাধারণ স্বামী-স্ত্রী, ছিলো না, ওডেল?'

'হ্যাঁ, সোনা।' বললেন, মিঃ গার্ডেনার।

'আপনার মেয়ে কোথায়, ক্যাপ্টেন মার্শাল?'

'লিন্ডা? কি জানি, জানি না। হয়তো দ্বীপের এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'জানেন, ক্যাপ্টেন মার্শাল, মেয়েটাকে আমার দুর্বল আর রোগা বলে মনে হয়। ওকে ভালো মতো খাওয়া-দাওয়া করানো দরকার। আর খুব দরদ দিয়ে যত্ন আত্তি করা দরকার।'

কেনেথ মার্শাল সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিলেন, 'লিন্ডা ঠিক আছে।'

কথা শেষ করে তিনি পা বাড়ালেন হোটেলের দিকে।

প্যাট্রিক রেডফার্ন জলে নামলো না। সে অলসভাবে হোটেলের দিকে চেয়ে বসে রইলো। তার মুখমণ্ডলে নেমে এসেছে হতাশা ও অভিমানের কালো ছায়া।

মিস ব্রুস্টার যখন এসেছেন, তাঁকে দেখে বেশ প্রাণবন্ত এবং হাসিখুশি বলেই মনে হয়েছে।

আজকের কথাবার্তা অনেকটা সেদিন সকালেই মতোই চলতে লাগলো। মিসেস গার্ডেনারের শান্ত একঘেয়ে শব্দস্রোতকে কাটা কাটা তীক্ষ্ম মন্তব্যে যতিচিহ্নিত করতে চাইছেন মিস ব্রুস্টার।

শেষে একসময় মিস ব্রুস্টার মন্তব্য করলেন, সমুদ্রতীর আজ একটু নির্জন মনে হচ্ছে। সবাই কি বেড়াতে-টেড়াতে গেছে নাকি?'

মিসেস গার্ডেনার বললেন, 'এই তো আজ সকালেই আমি মিঃ গার্ডেনারকে বলছিলাম, আমাদের ''ডাটমুরে'' অবশ্যই একবার বেড়াতে যাওয়া দরকার। এমনিতেই জায়গাটা বেশ কাছে, তার ওপর ওখানকার পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার। আমার তো অপরাধীদের সেই কয়েদখানাটা দেখবার খুব ইচ্ছে—কি নাম যেন—'প্রিন্সটাউন', তাই না? আমার মনে হয়, আজই সব ব্যবস্থাপত্র সেরে কাল ডার্টমুরে রওনা দিলে ভালো হয়, কি বলো ওডেল?'

মিঃ গার্ডেনার বললেন, 'হ্যাঁ, সোনা।'

এরকুল পোয়ারো মিস ব্রস্টারকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি কি এখন স্নান করতে নামবেন, মাদামোয়াজেল?'

'নাঃ, আমি স্নানের পালা প্রাতরাশের আগেই সেরে নিয়েছি। সেই সময় একজন পরোপকারী ব্যক্তি একটা শিশি আর একটু হলেই আমার মাথায় বসিয়ে দিয়েছিলো। বোধহয় হোটেলের কোন জানলা দিয়ে বাইরে সমুদ্রে ছুড়ে দিয়ে থাকবে।'

'উহুঁ, এ ধরনের ছুড়ে ফেলার অভ্যেস রীতিমতো বিপজ্জনক।' বললেন, মিসেস গার্ডেনার, 'একবার আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু টুথপেস্টের টিন মাথায় পড়ে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো—একটা বাড়ির পঁয়ত্রিশ তলার জানলা দিয়ে কেউ ওটাকে ছুড়ে ফেলেছিলো। ভাবুন, কিরকম সাংঘাতিক! এর জন্য আমার বন্ধুর অনেক ক্ষতি হয়।' তিনি এবার তাঁর উলের ভাণ্ডার হাতড়াতে লাগলেন, 'ওডেল মনে হচ্ছে উলের বলটা আমি ফেলে এসেছি। ওটা শোবার ঘরে টেবিলের দ্বিতীয় কি তৃতীয় টানাতে আছে—একবার দ্যাকখো তো—'

'হ্যাঁ, সোনা—দেখছি।'

মিঃ গার্ডেনার অনুগতভাবে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অনুসন্ধানের কাজে রওনা হলেন।

পোয়ারো বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর সাদা জুতো জোড়া পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এমিলি ব্রুস্টার বললেন, 'আপনি কি জুতো পরেই জলে নেমেছিলেন নাকি, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো মৃদু স্বরে বললেন, 'অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করার ফল—'

এমিলি ব্রুস্টার গলার স্বরকে খাদে নামিয়ে বললেন, 'আমাদের ''শ্রীমতী'' কোথায়? তাকে এখনও দেখছি না?'

মিসেস গার্ডেনার তাঁর সেলাই থেকে চোখ তুলে প্যাট্রিক রেডফার্নের দিকে তাকালেন। তাকে লক্ষ্য করতে করতে চাপা স্বরে বললেন, 'ওকে দেখে ঠিক থমথমে মেঘ বলে মনে হচ্ছে।—ওঃ, এই পুরো ব্যাপার আমার এত বিশ্রী লাগছে—! ক্যাপ্টেন মার্শাল এ বিষয়ে কি ভাবেন কে জানে। ভদ্রলোক এত চমৎকার শান্ত মানুষ—একজন সত্যিকারে ইংরেজ এবং বিনয়ী। কোন বিষয়ে তিনি কি ভাবেন, তা আপনি টেরও পাবেন না।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন উঠে দাঁড়িয়ে সমুদ্রতীরে পায়চারি করতে লাগলো।

মিসেস গার্ডেনার বিড়বিড় করলেন, 'ঠিক যেন একটা বাঘ।'

তিনজোড়া চোখ রেডফার্নকে লক্ষ্য করতে লাগলো। তাঁদের পর্যবেক্ষণ তাকে যেন অস্বস্তিতে ফেললো। তার মুখভাব এখন শুধু গম্ভীর নয়, তাতে এসে মিশেছে চাপা ক্রোধের কালো ছায়া। যেন এখুনি একটা বিস্ফোরণ ঘটবে।

এই থমথমে আবহাওয়ায় তাঁদের কানে এলো মূল ভূখণ্ড থেকে ভেসে আসা ঘণ্টার হালকা শব্দ।

এমিলি ব্রুস্টার মৃদু স্বরে বললেন, 'পূব দিক থেকে তাহলে আবার হাওয়া বইছে। এখানে গির্জার ঘণ্টা শুনতে পাওয়াটা একটা সুলক্ষণ।'

মিঃ গার্ডেনার বেগুনি উলের বল দিয়ে ফেরা পর্যন্ত কেউ আর কোন কথা বললেন না।

'কি ব্যাপার ওডেল, এত দেরি হলো?'

'দুঃখিত, সোনা, কিন্তু এটা টেবিলের কোন টানাতেই ছিলো না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষে আলমারির তাকে পেলাম।'

'ও—। কিন্তু আশ্চর্য, আমার ধারণা ছিলো এটা আমি টেবিলের টানাতেই রেখেছি। সত্যি, আমার সেভাগ্যই বলতে হবে যে কখনও কোন আদালতে সাক্ষী দিতে আমার ডাক পড়েনি। সেখানে কোন কথা ঠিকমতো মনে করতে না পারলে অস্বস্তি আর চিন্তায় আমি হয়তো মরেই যেতাম।'

মিঃ গার্ডেনার বললেন, 'মিসেস গার্ডেনার অত্যন্ত নীতিবোধসম্পন্ন মহিলা।'

৫

আরও প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে প্যাট্রিক রেডফার্ন মুখ খুললো, 'মিস ব্রুস্টার, নৌকো নিয়ে আজ বেরোবেন না? আমি সঙ্গে গেলে আপনার আপত্তি আছে?'

'আপত্তি? বরং অত্যন্ত খুশি হবো।' আন্তরিক সুরে বললেন, মিস ব্রুস্টার।

'তাহলে চলুন, আজ গোটা দ্বীপটাকে একটা চক্কর দিয়ে আসা যাক।' রেডফার্ন প্রস্তাব করলো।

'হাতে অত সময় পাওয়া যাবে কি?' মিস ব্রুস্টার ঘড়ি দেখলেন, 'ও—হ্যাঁ, এখনও সাড়ে এগারোটাই বাজে নি। চলুন, আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়া যাক।'

ওরা নেমে চললো সমুদ্রের কিনারার দিকে।

প্যাট্রিক রেডফার্নই প্রথম বৈঠার কাছে বসলো। সে সবল হাতে বৈঠা বাইতে লাগলো। নৌকো গতিবেগ নিয়ে চলতে শুরু করলো।

এমিলি ব্রুস্টার প্রশংসার সুরে বললেন, 'দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত এভাবে বাইতে পারেন কিনা।'

রেডফার্ন মিস ব্রুস্টারের চোখে তাকিয়ে হাসলো। তার মানসিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়ে গেছে।

'যখন আমরা নৌকো নিয়ে ফিরবো, ততক্ষণে দেখবেন আমার গায়ে এক গাদা ফোস্কা গজিয়ে গেছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে নেমে আসা কালো চুল স্বস্থানে ফেরত পাঠালো রেডফার্ন, 'ওঃ, আজকের দিনটার

তুলনা হয় না! ইংল্যান্ডে যদি কখনও একটা চমৎকার গ্রীষ্মের দিন পান, তাহলে তার চেয়ে ভালো আর কিছু হয় না।'

এমিলি ব্রুস্টার একটু রুক্ষ স্বরেই জবাব দিলেন, 'ইংল্যান্ডের সবকিছুই ভালো। পৃথিবীতে থাকবার মতো জায়গা ওই একটাই আছে।'

'ঠিক বলেছেন।'

ওরা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পশ্চিমে মোড় নিয়ে এগিয়ে চললো। বাইতে বাইতেই হঠাৎই চোখ তুলে তাকালো রেডফার্ন।

'সানি লেজ-এ আর কেউ গেছে নাকি? হুঁ, একটা ছাতা দেখতে পাচ্ছি। কে হতে পারে, তাই ভাবছি।'

এমিলি ব্রুস্টার বললেন, 'মনে হয়, মিস ডার্নলি। ওরকম জাপানি ছাতা ওঁর একটা আছে।'

ওরা উপকূল ধরে নৌকো বেয়ে চললো। ওদের বাঁ দিকে উন্মুক্ত সমুদ্র।

এমিলি ব্রুস্টার বললেন, 'আমাদের উলটো দিক ধরে যাওয়া উচিত ছিলো। এদিকে স্রোতের বিরুদ্ধে বাইতে হচ্ছে।'

'না, এদিকে স্রোত তেমন বেশি নেই। আমি তো এখানে সাঁতারও কেটেছি, স্রোতের টান কখনও টের পাইনি। তাছাড়া ওদিক দিয়ে আমরা যেতে পারতাম না, কারণ সেতুটা এ সময় জলের ওপরেই থাকবে।'

'সেটা অবশ্য ঢেউয়ের ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু সকলে বলে পিক্সি কোভে স্নান করতে নামলে বেশি দূরে সাঁতরে যাওয়া বিপজ্জনক।'

প্যাট্রিক এখনও সমান উদ্যমে বৈঠা বাইছে। এবং একই সঙ্গে বেশ মনোযোগ সহকারে সে পাহাড়ের কোলে প্রতিটি অংশে অনুসন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ এমিলি ব্রুস্টার ভাবলেন, 'ও নিশ্চয়ই মিসেস মার্শালের খোঁজ করছে। সেই জন্যেই ও আমার সঙ্গে নৌকো করে আসতে চেয়েছে। আজ সারা সকালে আর্লেনার দেখা পাওয়া যায়নি এবং ওর অনুপস্থিতির কারণ ভেবে ভেবে প্যাট্রিক এখন রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়েছে। সম্ভবত সব জেনে শুনেই আর্লেনা এই ছল করছে; ওর প্রতি প্যাট্রিকের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার নিঃসন্দেহে এ এক নতুন চাল।'

পিক্সি কোভের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রে বেরিয়ে আসা পাথুরে অংশটার কাছে ওরা বাঁক নিলো। পিক্সি কোভ জায়গাটা বেশি বড় নয়। এখানকার বেলাভূমিতে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র পাথরের টুকরো। পাহাড়ের কিছু অংশ গাড়ি বারান্দার মতো ঝুলে রয়েছে বেলাভূমির ওপর। উত্তর-পশ্চিমে মুখ করে অবস্থিত এই ছোট জায়গাটা পিকনিকের প্রয়োজনে অনেকের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। মাথার ওপরে পাথরের আড়াল থাকার জন্য সকালের দিকে সূর্যের কিরণ এখানে এসে পৌঁছয় না, এবং সেই কারণেই এ সময়ে কেউ এদিক প্রায় আসে না বললেই চলে।

কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে বেলাভূমিতে একজনকে দেখা গেলো।

প্যাট্রিক রেডফার্নের কর্মরত হাত ক্ষণিকের জন্য নিশ্চল হলো, তারপর আবার বাইতে শুরু করলো।

সে স্বাভাবিক এবং সহজ সুরে বললো, 'আরে, কে ওখানে?'

মিস ব্রুস্টার নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিলেন, 'দেখে তো মিসেস মার্শাল বলেই মনে হচ্ছে।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন যেন হঠাৎই খেয়াল হয়েছে এমন সুরে অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ—সত্যিই তো।'

সুতরাং তার নৌকো চালানোর গতি পরিবর্তিত হলো। তীর অভিমুখে নৌকো এগিয়ে চললো।

এমিলি ব্রুস্টার ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চাইলেন, 'আমরা কি এখানে পাড়ে নামবো?'

প্যাট্রিক রেডফার্ন চটপট জবাব দিলো, 'ক্ষতি কি। হাতে এখনও প্রচুর সময় আছে।'

সে মিস ব্রুস্টারের চোখে নিষ্পলকে তাকালো। তার দৃষ্টিতে যেন সরল আকুতি ঝরে পড়লো, অনেকটা প্রভুভক্ত কোন কুকুরের নীরব মিনতির মতো। মিস ব্রুস্টার মুখ ফুটে আর কিছু বলতে পারলেন না। তিনি

মনে মনে ভাবলেন, 'হায় বেচারা, প্রেমে ও একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় কি। সময় হলেই ও এটা কাটিয়ে উঠবে।'

নৌকো তরতর করে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো পাড়ের দিকে।

আর্লেনা মার্শাল নুড়ি-ছাওয়া বেলাভূমিতে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। ওর হাত দুটো দু-পাশে বিস্তৃত। সাদা ভেলাটাও অদূরেই চোখে পড়লো।

কিছু একটা এমিলি ব্রুস্টারকে অস্বস্তিতে ফেললো। যেন তার অত্যন্ত পরিচিত স্বাভাবিক কোন দৃশ্যের দিকে তিনি চেয়ে আছেন, অথচ তার কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি রয়েছে।

আরও প্রায় মিনিট কয়েক পরে অসঙ্গতিটা তাঁর নজরে পড়লো।

আর্লেনা মার্শালের শুয়ে থাকার ভঙ্গী কোন সূর্যস্নানার্থীর শুয়ে থাকার ভঙ্গীর মতোই নিখুঁত। হোটেলের সামনের সৈকতে ওকে প্রায়ই এই একই ভঙ্গীতে শুয়ে থাকতে দেখা গেছে: ব্রোঞ্জ রঙের শরীর সূর্যপিপাসায় টানটান, আর সবুজ পিচবোর্ডের টুপিটা ওর মাথা ও ঘাড় প্রখর সূর্যকিরণ থেকে রক্ষা করছে।

কিন্তু পিক্সি কোভের বেলাভূমিতে সূর্যকিরণের এতটুকু আভাসমাত্র নেই, এবং আগামী কয়েক ঘণ্টাতেই থাকবে না। ওপরে ঝুলন্ত পাথরের আড়াল সকালের সূর্যকে বেলাভূমি থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত করেছে। আশঙ্কার এক অদ্ভুত ইশারা এমিলি ব্রুস্টারের মনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করলো।

ওদের নৌকো এসে থামলো বেলাভূমির পাথুরে কিনারায়। প্যাট্রিক রেডফার্ন চেঁচিয়ে ডাকলো, 'এই আর্লেনা—'

এবং তখন এমিলি ব্রুস্টারের ভিত্তিহীন আশঙ্কা একটা নির্দিষ্ট রূপ নিলো। কারণ রেডফার্নের আহ্বানে শায়িত কোনও চাঞ্চল্য দেখা গেলো না, এলো না কোন উত্তর।

প্যাট্রিক রেডফার্নের মুখের আকস্মিক পরিবর্তনটা এমিলির চোখে পড়লো। সে এক লাফে নৌকো থেকে নামলো, এমিলি ব্রুস্টারও তাকে অনুসরণ করলেন। নৌকোটাকে টেনে পাড়ে তুললো দুজনে, তারপর বেলাভূমি ধরে এগিয়ে চললো পাহাড়ের কোলে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা নিরুত্তর শুভ্র দেহটার দিকে।

প্যাট্রিক রেডফার্নই প্রথমে এসে পৌঁছলো, এবং তার ঠিক পেছনেই মিস ব্রুস্টার।

তিনি দেখলেন, যেন স্বপ্নে দেখার মতো, একটা ব্রোঞ্জ রঙের শরীরে সাদা পিঠ-খোলা সাঁতার পোশাক—সবুজ টুপির সীমানা ছাড়িয়ে বেড়িয়ে আসা লাল চুলের গুচ্ছ—দেখলেন আরও একটা জিনিস—বিস্তৃত দু'বাহুর অদ্ভুত, অস্বাভাবিক অবস্থান। সেই মুহূর্তে তিনি অনুভব করলেন, দেহটা ঠিক স্বইচ্ছায় শায়িত নয়, বরং কেউ যেন অবহেলাভরে ওটাকে ছুঁড়ে দিয়েছে উন্মুক্ত বেলাভূমিতে...

তিনি শুনতে পেলেন প্যাট্রিকের কণ্ঠস্বর—নিছকই এক আতঙ্কবিকৃত ফিসফিসে স্বর। সে হাঁটু ভেঙে বসলো নিথর দেহটার পাশে—স্পর্শ করলো একটা হাত—বাহু...

চাপা ফিসফিসে শব্দে তার স্বর কেঁপে উঠলো, 'হায় ভগবান! ও মারা গেছে...'

এবং তারপর, সে সবুজ টুপিটা সামান্য তুলে ঘাড়ের কাছে উঁকি মারলো, '...কেউ ওকে গলা টিপে খুন করেছে... ওঃ ভগবান!'

৬

সেটা এমনই এক মুহূর্ত, যে মুহূর্তে সময় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক অদ্ভুত অপ্রাকৃত অনুভূতির সঙ্গে এমিলি ব্রুস্টার শুনতে পেলেন নিজের কণ্ঠস্বর, 'আমাদের কোন কিছুতেই হাত দেওয়া ঠিক হবে না... অন্তত যতক্ষণ না পুলিশ আসছে।'

যান্ত্রিকভাবে ভেসে এলো রেডফার্নের উত্তর, 'না—না, আপনি ঠিকই বলেছেন।' তারপর গভীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট ফিসফিস স্বরে সে বললো, 'কিন্তু কে? কে? কে আর্লেনার এ অবস্থা করলো? ওকে কেউ—ওকে কেউ খুন করতে পারে না? এ মিথ্যে—সব মিথ্যে!'

এমিলি ব্রুস্টার উত্তর খুঁজে না পেয়ে নীরবে মাথা নাড়লেন।

তাঁর কানে এলো রেডফার্নের আচমকা গভীর শ্বাস টানার শব্দ—শুনতে পেলেন তার ক্রোধে উত্তেজিত সংযত স্বর, 'ওঃ, ভগবান, যে এ কাজ করেছে, সেই শয়তানটাকে যদি একবার হাতের মুঠোয় পেতাম!'

এমিলি ব্রুস্টার শিউরে উঠলেন। তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠলো কোন পাথরে আড়ালে লুকিয়ে ওঁৎ পেতে বসে থাকা কোন হত্যাকারীর ছবি। তিনি শুনতে পেলেন অনিশ্চয়তায় ভরা নিজের কণ্ঠস্বর, 'যেই এ কাজ করে থাকুক, সে কি আর এখানে বসে আছে? আমাদের পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। অবশ্য' তিনি সামান্য ইতস্তত করলেন, 'আমাদের একজনের মৃতদেহের কাছে থাকা দরকার—'

প্যাট্রিক রেডফার্ন বলল, 'আমি থাকছি।'

এমিলি ব্রুস্টার স্বস্তির ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি সেই ধরনের মহিলা নন, যাঁরা নিজেদের ভয় পাওয়ার কথা কখনও স্বীকার করেন, কিন্তু বেলাভূমিতে আশেপাশে কোন উন্মাদ হত্যাকারীর উপস্থিতির ক্ষীণ সম্ভাবনা নিয়ে, তাঁকে একা থাকতে হবে না দেখে তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

তিনি বললেন, 'সেই ভালো। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো। আমি নৌকো নিয়েই যাচ্ছি, ওর মই বেয়ে ওপরে ওঠা আমার কর্ম নয়। লেদারকোম্ব উপসাগরের কাছাকাছি একজন কনস্টেবল আছে, তাকেই খবর দিচ্ছি।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন যান্ত্রিক স্বরে বিড়বিড় করলো, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ—আপনি যা ভালো বোঝেন।'

সুপটু হাতে নৌকো বেয়ে এগিয়ে চললেন এমিলি ব্রুস্টার। যেতে যেতেই দেখলেন, প্যাট্রিক ঝুঁকে পড়লো মৃতদেহের পাশে, দু'হাতে মুখ ঢাকলো। তার ভঙ্গীতে এমন একটা সর্বহারা হতাশার ভাব ছিলো যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি প্যাট্রিকের জন্য দুঃখ অনুভব করলেন। তাকে দেখে মনে হলো, যেন কোন অনুগত কুকুর তার প্রিয় প্রভুর মৃতদেহের পাশে অপলকে বসে আছে। কিন্তু তবুও মিস ব্রুস্টারের সরল স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁকে নীরবে বললো, 'ওর এবং ওর স্ত্রী ভালোর জন্য—মার্শাল ও তাঁর মেয়ের জন্যে—এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারতো না। কিন্তু আমার মনে হয় না, ও কখনও সেদিক থেকে ব্যাপারটাকে চিন্তা করে দেখবে,... বেচারা!'

এমিলি ব্রুস্টার সেই ধরনের মহিলা, যাঁরা প্রয়োজনে সর্বদা তৎপর হতে পারেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

ইন্সপেক্টর কলগেট পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর্লেনার মৃতদেহ নিয়ে পুলিশ-সার্জনের পরীক্ষা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। প্যাট্রিক রেডফার্ন ও এমিলি ব্রুস্টার একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে।

ডাঃ নীসডন হাঁটু ভেঙে বসেছিলেন, অভ্যস্ত ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, 'শ্বাস রোধ করে খুন করে হয়েছে—এবং নিঃসন্দেহে একজোড়া শক্ত সবল হাতের কাজ। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে না, বাধা দেবার খুব একটা চেষ্টা করেছিলেন।'

এমিলি ব্রুস্টার মৃতদেহের মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন। নীলাভ রক্তিম যন্ত্রণাবিকৃত মুখমণ্ডলের বীভৎসতা কল্পনা করা যায় না।

ইন্সপেক্টর কলগেট প্রশ্ন করলেন, 'ক'টার সময় মারা গেছেন বলে মনে হয়, ডাক্তার?'

নীসডন অস্বস্তিভরে জবাব দিলেন, 'ওর সম্পর্কে আরও কিছু না জেনে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ অনেকগুলো ব্যাপারে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে।... আচ্ছা, এখন বাজে পৌনে একটা; আপনারা ক'টার সময় মৃতদেহ আবিষ্কার করেন?'

প্যাট্রিক রেডফার্ন, শেষ প্রশ্নটা যাকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে, অস্পষ্টভাবে বললো, 'বোধহয় বারোটার কিছু আগে। ঠিক বলতে পারছি না।'

এমিলি ব্রুস্টার বললেন, 'যখন আমরা বুঝলাম মিসেস মার্শাল মারা গেছেন, তখন ঠিক পৌনে বারোটা বাজে।'

'ও—। আচ্ছা, আপনারা তো এখানে নৌকো করে এসেছিলেন; যখন আপনারা দূর থেকে ওঁকে এখানে পড়ে থাকতে দেবেন তখন ক'টা বাজে?'

এমিলি ব্রুস্টার কিছুক্ষণ ভাবলেন।

'ধরুন তার প্রায় মিনিট পাঁচ-ছয় আগে আমরা পাথরের বাঁকটা ঘুরেছি।' তিনি ফিরলেন রেডফার্নের দিকে, 'আপনার কি মনে হয়?'

প্যাট্রিক রেডফার্ন অনিশ্চিত সুরে বলল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওই রকমই হবে; আমরাও তাই মনে হয়।'

নীসডন নিচু গলায় পাশে দাঁড়ানো ইন্সপেক্টরকে প্রশ্ন করলেন, 'ইনিই কি মৃত মহিলার স্বামী?... ও, তাহলে আমারও ভুল হয়েছে। ভদ্রলোক দেখছি রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন। সেই জন্যই ভাবছিলাম হয়তো স্বামী হলেও হতে পারেন।'

তিনি এবার অপেক্ষাকৃত উঁচু স্বরে বললেন, 'তাহলে ধরা যাক, মোটামুটি বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিটের সময় আপনারা ওঁকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। আমার মনে হয় না, তার খুব একটা আগে ইনি মারা গেছেন ঃ হয়তো ওই সময় থেকে এগারোটা—কিংবা খুব বেশি পৌনে এগারোটার মধ্যে।'

সশব্দে নোটবই বন্ধ করে মুখ তুলে তাকালেন ইন্সপেক্টর।

'ধন্যবাদ।' তিনি বললেন, 'এতে আমাদের অনেক সাহায্য হবে। বিশেষ করে খুনের সময়টাকে যখন খুব অল্প পরিসরে বাঁধা গেছে—বলতে গেলে এক ঘণ্টার কম।'

এবার তিনি ফিরলেন মিস ব্রুস্টারের দিকে।

'যাক এ পর্যন্ত সবকিছু তাহলে পরিষ্কার। আপনি হলেন মিস এমিলি ব্রুস্টার এবং ইনি মিঃ প্যাট্রিক রেডফার্ন আপনারা দুজনেই বর্তমানে জলি রজার হোটেলে রয়েছেন। এই মৃত মহিলাকে আপনারা দুজনেই বর্তমানে জলি রজার হোটেলে রয়েছেন। এই মৃত মহিলাকে আপনারা সেই হোটেলেরই অতিথি—এবং জনৈক ক্যাপ্টেন মার্শালের স্ত্রী বলে সনাক্ত করছেন।'

এমিলি ব্রুস্টার নিঃশব্দে মাথা কেড়ে সম্মতি জানালেন।

‘তাহলে, আমার মনে হয়,’ বললেন ইন্সপেক্টর কলগেট, ‘এখন আমাদের হোটেলে ফিরে যাওয়াই ভালো।’

তিনি ইশারায় একজন কনেস্টবলকে ডাকলেন।

‘হক্স, তুমি এখানে থাকো—আর কাউকে এখানে আসতে দেবে না। আমি একটু পরেই ফিলিপসকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

২

‘সত্যি বলছি।’ বললেন কর্নেল ওয়েস্টন, ‘আপনাকে এখানে দেখবো আশাই করিনি!’

পুলিশ-প্রধানের অভিবাদের উত্তরে যথাযোগ্য ভঙ্গীতে প্রত্যাভিবাদন জানালেন এরকুল পোয়ারো। মৃদুস্বরে বললেন, ‘হুঁ—সেন্ট লু-র সেই ঘটনার পর বহু বছর কেটে গেছে।’

‘তা হলেও ঘটনা আমার এখনও মনে আছে।’ বললেন ওয়েস্টন, ‘আমার জীবনের সে এক বিরাট বিস্ময়। যে জিনিসটা আমি আজও ভুলতে পারিনি, তা হলো সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারটায় আপনি যেভাবে আমাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। পুরোপুরি বেনিয়মী অদ্ভুত আপনার পদ্ধতি! এক কথায় অবিশ্বাস্য!’

‘কিন্তু তা হলে তার ফল কি ভালো হয়নি কর্নেল?’ পোয়ারো বললেন।

‘হ্যাঁ, হয়তো হয়েছে। তবে আমার ধারণা নিয়মমাফিক পথেই আমরা সেখানে পৌঁছতে পারতাম।’

‘হয়তো পারতেন।’ পোয়ারো অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদের মতো সমর্থন জানালেন।

‘আর এখানে এসে আর একটা খুনের জটিল পরিবেশে আপনাকে আবিষ্কার করলাম।’ পুলিশ-প্রধান বললেন, ‘এটা নিয়ে তেমন কিছু ভেবেছেন?’

পোয়ারো ধীরে ধীরে জবাব দিলেন, ‘ঠিকমতো কিছু ভাবিনি—কিন্তু ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।’

‘তা আমাদের একটু-আধটু সাহায্য করছেন তো?’

‘আপনি সে অনুমতি দিচ্ছেন?’

মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে আমাদের সঙ্গে পেলে ভীষণ খুশি হবো। এ ব্যাপারে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতে তুলে দেবো কিনা, সে সিদ্ধান্ত নেবার মতো যথেষ্ট খবর এখনও আমরা পাইনি। এমনিতে দেখে মনে হচ্ছে, একটা সীমিত এলাকার মধ্যেই আমাদের খুনীকে খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু আবার এদিকে দেখুন—হোটেলে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের কেউ স্থানীয় বাসিন্দা নন। সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে গেলে এবং খুন করার পেছনে তাঁদের উদ্দেশ্যের সন্ধান করতে গেলে লন্ডনে আপনাকে যেতেই হবে।’

পোয়ারো বললেন, ‘হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।’

‘সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে মৃত মহিলাটিকে শেষ কে দেখেছেন?’ বললেন ওয়েস্টন, পরিচারিকা সকাল ন’টায় মিসেস মার্শালকে তাঁর প্রাতরাশ পৌঁছে দেয়। তারপর, প্রায় দশটা নাগাদ, একতলার দপ্তরে বসে থাকা মেয়েটি তাঁকে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে।’

‘বন্ধু, ওয়েস্টান,’ পোয়ারো বললেন, ‘সম্ভবত আমি আপনার প্রার্থিত ব্যক্তি।’

‘আপনি তাঁকে আজ সকালে দেখেছেন? ক’টার সময়?’

‘দশটা বেজে পাঁচ মিনিটে। আমি তখন সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে ভেলা ভাসাতে সাহায্য করছিলাম।’

‘এবং তিনি ভেলায় চড়ে চলে গেলেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘একা?’

‘একা।’

'কোনদিকে গেলেন সেটা কি আপনি খেয়াল করেছেন?'

'ডানদিকে মোড় ঘুরে তিনি পাহাড়ের আড়ালে চলে যান।'

'তা মানে পিক্সি কোভের দিকে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তখন সময় কত ছিলো?'

'আমি বলবো, তিনি সমুদ্রতীর ছেড়ে রওনা হন ঠিক সওয়া দশটায়।'

ওয়েস্টান কিছুক্ষণ ভাবলেন।

'হুঁ—মোটামুটি সব মিলে যাচ্ছে। ভেলায় চড়ে পিক্সি কোভে পৌঁছতে তাঁর কতক্ষণ লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'আমি? আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। নৌকো বা ভেলায় চড়ায় আমি ঘোর বিরোধী। তবুও মনে হয়, আধ ঘণ্টার বেশি লাগা উচিত নয়।'

'আমারও তাই ধরাণা।' কর্নেল বললেন, 'অবশ্য যদি তিনি স্বাভাবিকভাবে তাড়াহুড়ো না করে ভেলা চালিয়ে থাকেন। আর তাই যদি হয়, তাহলে পৌনে এগারোটা নাগাদ তিনি পিক্সি কোভে পৌঁছেছেন—হুঁ, সবই মোটামুটি খাপ খেয়ে যাচ্ছে।'

'ক'টার সময় তিনি মারা গেছেন বলে আপনাদের ডাক্তার মনে করেন?'

'ওহ, নীডসন কখনও নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব বা ঝুঁকি নেয় না। সে বড় সাবধানী লোক। তার মতো খুনটা খুব বেশি হলে পৌনে এগারোটার আগে হয়নি।'

পোয়ারো নীরবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'আরও একটা ছোট্ট ঘটনা আমার উল্লেখ করা উচিত। চলে যাওয়ার সময় মিসেস মার্শাল আমাকে অনুরোধ করেন, আমি যে তাঁকে দেখেছি, সে কথা যেন কাউকে না বলি।'

ওয়েস্টন একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'হুম—ব্যাপারটা ভাবার মতো, তাই না?'

পোয়ারো অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছিলো।'

ওয়েস্টান বার কয়েক গোঁফে মোচড় দিলেন। বললেন, 'আচ্ছা, মঁসিয়ে পোয়ারো, একটা কথা। আপনার অভিজ্ঞতা সাধারণের চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। বলতে পারেন মিসেস মার্শাল ঠিক কি ধরনের মহিলা ছিলেন?'

একটা হালকা হাসির ছোঁয়া পোয়ারোর ঠোঁটে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি এখনও কিছু শোনেননি?'

পুলিস-প্রধান নীরস কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'শুনেছি। তবে তার সবটাই অন্যান্য মহিলাদের বক্তব্য। সুতরাং বুঝতেই পারছেন—। তাই আমি জানতে চাই সে সব বক্তব্যের কতটুকু সত্যি? রেডফার্নের সঙ্গে মিসেস মার্শালের সত্যিই কি কোন 'ইয়ে' চলছিলো?'

'এব্যাপারে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ।'

'রেডফার্ন তাহলে মিসেস মার্শালকে অনুসরণ করেই এই দ্বীপে এসে হাজির হয়েছে বলতে চান?'

'সে রকম ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'

'আর ভদ্রমহিলার স্বামী? তিনি কি এ ঘটনার কথা জানতেন? কি ভাবতেন তিনি এ বিষয়ে?'

পোয়ারো ধীর স্বরে বললেন, 'ক্যাপ্টেন মাশার্ল কি ভাবেন বা উপলব্ধি করেন তা অনুমান করা নেহাত সহজ নয়। তিনি সেই ধরনের মানুষ, যাঁরা নিজেদের মনের ভাবকে কখনও বাইরে প্রকাশ করেন না।'

ওয়েস্টান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'কিন্তু তা হলেও মন বলে তো তার একটা পদার্থ আছে!'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, বললেন, 'হাঁ, তা হয়তো আছে।'

৩

পুলিশ-প্রধান ওয়েস্টান তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কুশলী পদ্ধতিতে মিসেস ক্যাসল-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

মিসেস ক্যাসল জলি রজার হোটেলের এক এবং একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী। তাঁর চল্লিশোর্ধ্ব শরীরে বক্ষদেশে অস্বাভাবিক স্ফীত, মাথায় একরাশ ঘোর লাল চুল রীতিমতো দৃষ্টি বিকর্ষক এবং তাঁর কথা বলার ভঙ্গী অপ্রত্যাশিতরকম পরিমার্জিত।

তিনি বলছিলেন, 'এইরকম একটা ঘটনা আমার হোটেলে ঘটতে পারে, আশ্চর্য! এটা বরাবরই পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত জায়গা, এ আমি হলফ করে বলতে পারি! যে সব লোকেরা এখানে আসে তারা এ-তো ভদ্র, এ-তো চমৎকার, যে তার কোন তুলনা হয় না। কোনরকম কেলেঙ্কারি লেশমাত্রও এখানে নেই—বুঝতেই তো পারছেন, কি বলতে চাইছি। সেন্ট লু-র ওই বড় বড় হোটেলগুলোর মতো কোন জঘন্য ব্যাপার এখানে হয় না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিসেস ক্যাসল,' কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'কিন্তু অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত—ইয়ে, গৃহস্থ বাড়িতেও তো দুর্ঘটনা ঘটে—'

'আশা করি ইন্সপেক্টর কলগেটও আমার কথায় মত দেবেন—' পেশাদারী নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি নিয়ে অদূরে উপবিষ্ট ইন্সপেক্টরের দিকে সনির্বন্ধ দৃষ্টিতে এক পলক তাকালেন মিসস ক্যাসল, 'ব্যবসার অনুমতিপত্রের ব্যাপারে আমি খুব সাবধান এবং মনোযোগী। আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন বেআইনি কাজ আমি করিনি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—' বললেন ওয়েস্টন, 'আমরা আপনাকে কোনরকম দোষ দিচ্ছি না, মিসেস ক্যাসল।'

'কিন্তু তবুও একটা নামকরা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ নিঃসন্দেহে নিন্দের ব্যাপার।' উত্তেজিত শ্বাসপ্রশ্বাসে মিসেস ক্যাসেলের সুবিশাল বক্ষদেশ আন্দোলিত হলো, 'ওঃ, যখনই আমি ভাবি হাঁ করে তাকিয়ে থাকা এই এলাকার লোকগুলোর কথা! অবশ্য, একমাত্র হোটেলের অতিথিরা ছাড়া বাইরে কোন লোককে দ্বীপে ঢুকতে দেওয়া হয় না—কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা নির্ঘাত ওপারে এসে ভীড় করবে, আর আমার—আমার হোটেলের দিকে আঙুল উঁচিয়ে নিজেদের মধ্যে সব নোংরা আলোচনা করবে—এ আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি।'

তিনি সে দৃশ্যের কথা ভেবে শিউরে উঠলেন।

ইন্সপেক্টর কলগেট অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে আলোচনার মোড় ঘোরাবার সুযোগ পেয়ে বলে উঠলেন, 'এইমাত্র আপনি যে কথাটা তুললেন, অর্থাৎ দ্বীপটাকে সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্তে রাখার ব্যাপারটা, সে সম্পর্কে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি বাইরের লোকদের দ্বীপে ঢুকতে বাধা দেন কি করে?'

ও ব্যাপারে আমি খুউব সাবধান থাকি।'

'হ্যাঁ, তা বুঝলাম—কিন্তু কি ভাবে তাদের আটকান? মানে, কি দিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখেন? কারণ গ্রীষ্মকালে ভ্রমণকারীরা এখানকার প্রায় প্রতিটি জায়গাই মাছির মতো ছেয়ে ফেলে।'

মিসেস ক্যাসল আরও একবার শিউরে উঠলেন, বললেন, 'এ সব দোষই হলো বেড়াবার জন্যে তৈরি ওই আ-ঢাকা শ্যারাবাং গাড়িগুলোর। আমি দেখেছি, এক সঙ্গে ওইরকম আ-ঠেরোটা গাড়ি লেদারকোম্ব উপসাগরের নৌকোঘাটার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একবার ভাবুন আঠারোটা। হুঁঃ খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই, একটা শ্যারাবাং গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হলো।'

'সে না হয় মানলাম, কিন্তু এই দ্বীপে আসতে তাদের আপনি বাধা দেন কি করে?' কলগেট মনে হলো তাঁর ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন।

'সে জন্যে অনেকগুলো নোটিস লাগানো আছে। আর তাছাড়া জোয়ারের সময় আমরা তো এমনিতেই একেবারে আলাদা হয়ে পড়ি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ভাটার সময়?'

অতঃপর মিসেস ক্যাসল সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন। সেতুটা দ্বীপের প্রান্তে যেখানে এসে মিশেছে, সেখানে একটা বড় দরজা আছে। তাতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। 'জলি রজার হোটেল; নিজস্ব এলাকা। হোটেল ব্যতীত অন্য কোথাও বহিরাগতের প্রবেশ নিষেধ।' এবং এই দরজার দুপাশে পাহাড়ের পাথর খাড়া নেমে গেছে সমুদ্রে সুতরাং কারও পক্ষে সে প্রাচীর বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

'কিন্তু যে কেউ তো নৌকো বেয়ে দ্বীপের পাশ দিয়ে পিক্সি অথবা গাল কোভে সহজেই পৌঁছতে পারে? আপনি তো তাদের আর আটকাতে পারছেন না। তাছাড়া, সমুদ্রতীরে জোয়ার এবং ভাটার সময় জলে দুই প্রান্তের মাঝখানে বেলাভূমির যে অংশ, সেখানে বাইরের লোকদের প্রবেশের অধিকার আছে। সে অধিকারেও আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।'

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব হলেও জানা গেলো, কার্যক্ষেত্রে এ ঘটনা প্রায় ঘটে না বললেই চলে। লেদারকোম্ব উপসাগরের নৌকোঘাটায় নৌকো ভাড়া পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু সেখান থেকে এই দ্বীপের দূরত্ব অনেক। তাছাড়া লেদারকোম্ব উপসাগরের পোতাশ্রয় ছাড়িয়ে সমুদ্রের একটু ভেতরে এলেই অস্বাভাবিক জোরালো স্রোতের মুখোমুখি হতে হয়।

গাল কোভ এবং পিক্সি কোভে নামার লোহার মইয়ের পাশেও যথারীতি বিজ্ঞপ্তি লাগানো আছে। মিসেস ক্যাসল আরও জানালেন জর্জ অথবা উইলিয়াম মূল ভুখণ্ডের নিকটতম বেলাভূমির যে অংশ, সেখানে প্রায় সর্বক্ষণই নজর রাখে।

'এই জর্জ এবং উইলিয়াম কারা?'

জর্জ সারাদিন বেলাভূমির তদারকিতে থাকে, ও নজর রাখে স্নানের পোশাক এবং রঙিন ভেলাগুলোর দিকে। আর উইলিয়াম এখানকার মালি। রাস্তাঘাটের দেখাশোনা, টেনিস কোর্টের ঘর কাটা—এ সবই ওর কাজ।'

কর্নেল ওয়েস্টন অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'যাক, একটা ব্যাপার তাহলে এখন মোটামুটি পরিষ্কার। বাইরে থেকে কারও পক্ষে দ্বীপে আসা একেবারে অসম্ভব না হলেও এটুকু অন্তত বলা যায় যেই আসুক না কেন, তাকে একটা ঝুঁকি নিতে হবে—অন্য কারও নজরে তার উপস্থিতি ধরা পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি। আমরা জর্জ এবং উইলিয়ামের সঙ্গে এ বিষয়ে এখুনি একবার কথা বলতে চাই।

মিসেস ক্যাসল বললেন, 'এখানে বেড়াতে আসা উটকো লোকদের আমি মোটেও পাত্তা দিই না—সব সময় খালি হৈ-হৈ করব, আর কমলালেবু খোসা থেকে শুরু করে সিগারেটের খালি বাক্স পর্যন্ত স-ব রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে ফেলে রেখে যাবে, কিন্তু তবুও এ কথা কখনও ভাবিনি, ওদের কেউ কখনও খুন করতে পারে। সত্যি! ব্যাপারটা এত বিশ্রী যে ভাষায় বলা যায় না। মিসেস মার্শালের মতো একজন ভদ্রমহিলা শেষে কিনা খুন হলেন? আর সবচেয়ে যেটা খারাপ লেগেছে, তা হলো যেভাবে তাঁকে খুন করা হয়েছে—ইয়ে, মানে,—গলা টিপে...'

শেষ দুটো শব্দে মিসেস ক্যাসল তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও উচ্চারণ করলেন।

ইন্সপেক্টর কলগেট তাঁকে প্রবোধ দিলেন , হ্যাঁ, ব্যাপারটা যে বিশ্রী তাতে সন্দেহ নেই।'

'আর খবরের কাগজগুলো আর এক উৎপাত। ভেবে দেখুন, আমার হোটেলের সুনাম নিয়ে ওরা কাগজে-কাগজে কিরকম ছিনিমিনি খেলবে!'

মৃদু হেসে কলগেট বললেন, 'তবে এক দিন দিয়ে সেটা আপনার হোটেলের বিজ্ঞাপনের কাজ করবে।'

মিসেস ক্যাসল আচমকা গম্ভীর হলেন, স্ফীত বক্ষদেশ আন্দোলন সহকারে উঠে দাঁড়ালেন। বরফ-শীতল স্বরে জবাব দিলেন তিনি, এ ধরনের বিজ্ঞাপনের আমি পরোয়া করি না, মিঃ কলগেট।'

কর্নেল ওয়েস্টন এবার কথা বললেন, আচ্ছা, মিসেস ক্যাসল, 'আপনাকে যে বলেছিলাম হোটেলের বর্তমান অতিথিদের নামের একটা তালিকা তৈরি করতে, করেছেন?'

'হ্যাঁ, স্যার—করেছি।'

কর্নেল ওয়েস্টন হোটেলের অতিথি-তালিকার খাতার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর পলকের জন্য চোখ তুলে তাকালেন মিসেস ক্যাসলের অফিস-ঘরে উপস্থিত চতুর্থ ব্যক্তি, এরকুল পোয়ারোর দিকে।

'দেখুন, এখানে হয়তো আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।' মিসেস ক্যাসেলকে লক্ষ্য করে বললেন ওয়েস্টন। তিনি নীরবে নামের তালিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

'হোটেলে চাকরবাকর ক'জন আছে?'

মিসেস ক্যাসল একটা দ্বিতীয় তালিকা বের করলেন।

'চারজন পরিচারিকা, একজন প্রধান পরিচারক—অ্যালবার্ট এবং তার অধীনের তিনজন পরিচারক। এছাড়া 'বার' এ থাকে হেনরি; উইলিয়াম অতিথিদের জুতো-চটির পরিচর্যার দিকে নজর রাখে, আর সবশেষে রাঁধুনি, ও তার সাহায্যের জন্য দুজন কর্মচারী—ব্যস্ এই সব।'

'পরিচারকরা কিরকম লোক?'

'ওদের মধ্যে অ্যালবার্ট প্লিমাউথের ভিনসেন্ট হোটেল ছেড়ে আমার এখানে এসে কাজ নেয়। সেখানে ও বছর কয়েক ছিলো। আর ওর তদারকিতে যে তিনজন কাজ করে, তারা তিন বছর ধরে আমার এখানে চাকরি করছে—ওদের মধ্যে একজন আবার চার বছর পুরনো। ওরা অত্যন্ত ভদ্র এবং চমৎকার ছেলে। আর হেনরি তো হোটেলের শুরু থেকেই এখানে রয়েছে।—বলতে গেলে ও নিজেই এখন একটা প্রতিষ্ঠান।'

ওয়েস্টন মাথা নাড়লেন। কলগেটকে বললেন, 'সন্দেহজনক কিছু নেই বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্য তুমি তোমার নিয়মমাফিক ওদের সম্পর্কে খোঁজখবরের কাজ চালিয়ে যাবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ, মিসেস ক্যাসল।'

'তাহলে আপনাদের আর কোন প্রশ্ন নেই?'

'না, আপাতত নেই।'

মিসেস ক্যাসল তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ওয়েস্টন বললেন, 'আমাদের প্রথম কাজ হবে ক্যাপ্টেন মার্শালের সঙ্গে কথা বলা।

৪

কেনেথ মার্শাল শান্ত ভঙ্গীতে বসে তাঁর প্রতি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে ঈষৎ কাঠিন্যের আভাস ছাড়া তাঁর মুখভাব বরাবরের মতোই নির্লিপ্ত। এখন, এই মুহূর্তে জানালা দিয়ে ঠিকরে আসা সোনা রোদের আলোয় তাঁকে দেখে বোঝা যায় তিনি সুদর্শন। মুখের প্রতিটি তীক্ষ্ণ রেখা, অবিচলিত নীল চোখ, দৃঢ়সংবদ্ধ ঠোঁট বুঝি তারই ইঙ্গিত বহন করছে। তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা অথচ আন্তরিক।

কর্নেল ওয়েস্টন বলছিলেন, 'এ ঘটনা যে আপনাকে কতখানি আঘাত করেছে তা আমি বুঝি, ক্যাপ্টেন মার্শাল। কিন্তু আপনি আমার অবস্থাটাও একবার ভেবে দেখুন—যত তাড়াতাড়ি এই খুন সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারবো আমাদের ততই সুবিধে হবে।'

মার্শাল মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কর্তব্য তো আপনাদের করতেই হবে। বলুন, কি জানতে চান।'

মিসেস মার্শাল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের বিয়ে হয়েছিলো কতদিন?'

'চার বছরের সামান্য কিছু বেশি।'

'বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর নাম কি ছিলো?'

'হেলেন স্টার্ট। তবে ওর অভিনয়-জগতের নাম ছিলো আর্লেনা স্টুয়ার্ট।

'তিনি অভিনেত্রী ছিলেন?'

‘হ্যাঁ। রিভ্যুতে বেশ কয়েকটা নাটকেও অভিনয় করেছে।’

‘বিয়ের পর তিনি কি অভিনয় ছেড়ে দেন?’

‘উহুঁ। বিয়ের পরেও ও অভিনয় করতে থাকে। বলতে গেলে মাত্র বছর দেড়েক হলো ও অভিনয়-জগৎ থেকে পুরোপুরি অবসর নিয়েছিলো।’

‘এই অবসর গ্রহণের কি বিশেষ কোন কারণ ছিলো?’

কেনেথ মার্শালকে দেখে মনে হলো, তিনি প্রশ্নটা একটু ভাবছেন।

তারপর বললেন, ‘না। ও শুধু বলেছিলো, অভিনয় করতে করতে ও হাঁপিয়ে উঠেছে—তাই একটু বিশ্রাম চায়।’

‘ও—তাহলে আপনার কোন বিশেষ—ইচ্ছের প্রতি অনুগত্য দেখিয়ে তিনি এ কাজ করেননি?’

মার্শাল ভুরু তুলে তাকালেন।

‘না, না—’

‘বিয়ের পরে তাঁর অভিনয় করাটাকে আপনি তাহলে মেনেই নিয়েছিলেন?’

মার্শালের ঠোঁটে হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

‘ও অভিনয় ছেড়ে দিলে আমি হয়তো খুশিই হতাম—সে কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু তা নিয়ে আমি কখনও উচ্চবাচ্য করিনি।’

‘এ জন্যে আপনাদের মধ্যে কখনও কোনরকম মতবিরোধ হয়নি?’

‘একেবারেই না। তার কারণ আমার স্ত্রী-স্বাধীনতায় আমি কখনও হস্তক্ষেপ করিনি।’

এবং এই বিয়েতে আপনারা সুখী ছিলেন?’

শীতল স্বরে জবাব দিলেন কেনেথ মার্শাল, ‘নিশ্চয়ই ছিলাম।’

কর্নেল ওয়েস্টন মিনিটখানেক নীরব রইলেন। তারপর বললেন, ‘ক্যাপ্টেন মার্শাল, আপনার স্ত্রীকে কার পক্ষে খুন করা সম্ভব সে বিষয়ে কি আপনার কোন ধারণা আছে?’

বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না করে তিনি উত্তর দিলেন, ‘না।’

‘তাঁর কি কোন শত্রু ছিলো?’

‘হয়তো ছিলো।’

‘হ্যাঁ?’

মার্শাল তাড়াতাড়ি বলে চললেন, ‘আমাকে ভুল বুঝবেন না, স্যার। আমার স্ত্রী একজন অভিনেত্রী ছিলো, এবং অত্যন্ত সুন্দরীও ছিলো সে। এই কারণেই অনেকের হিংসা ঈর্ষার শিকার হতে হয়েছিলো ওকে। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন রকম সমালোচনা হতো—অন্যান্য মহিলারা ওর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতো—মোটের ওপর ওকে ঘিরে একটা ঘৃণা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষপূর্ণ আবহাওয়া সব সময় থমথম করতো। কিন্তু তার মানেই এই নয় যে তাদের মধ্যে কারও পক্ষে ওকে এরকম নৃশংসভাবে খুন করা সম্ভব।’

এরকুল পোয়ারো এই প্রথম মুখ খুললেন, বললেন, ‘আপনি তাহলে বলতে চান, মঁসিয়ে, যে আপনার স্ত্রীর শত্রুরা প্রধানত, অথবা সকলেই মহিলা ছিলেন?’

কেনেথ মার্শাল পোয়ারের দিকে তাকালেন, বললেন, ‘হ্যাঁ—তাই।’

পুলিশ-প্রধান বললেন, ‘আপনি এমন কোন পুরুষের কথা জানেন না, যার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর শত্রুতা ছিলো?’

‘না।’

‘এ হোটেলের কারো সঙ্গে কি তাঁর পুরানো আলাপ ছিলো?’

'যদ্দুর জানি, মিঃ রেডফার্নের সঙ্গে কোন এক ককটেল পার্টিতে ওর আলাপ হয়েছিলো। এছাড়া আর কারো সঙ্গে পুরনো আলাপ-পরিচয় ছিলো কিনা বলতে পারি না।'

ওয়েস্টন কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। বিষয়টা নিয়ে আলোচনার আরও গভীরে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা ভাবতে লাগলেন, অবশেষে তিনি বিপরীত সিদ্ধান্তই নিলেন। বললেন, 'এবার আজ সকালের কথায় আসা যাক। আপনার স্ত্রীকে আপনি শেষ কখন দেখেন?'

মার্শাল মিনিটখানেট চিন্তা করে বললেন, 'নিচে প্রাতরাশ সারতে যাওয়ার সময় আমি একবার ওর ঘরে গিয়েছিলাম—'

'মাপ করবেন, আপনারা কি আলাদা ঘরে থাকতেন?'

'হ্যাঁ।'

'তখন ক'টা বাজে?'

'ন'টার কাছাকাছি তো হবেই।'

'তখন তিনি কি করছিলেন?'

'ওর চিঠিপত্র খুলে দেখছিলো।'

'তার সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিলো?'

'বিশেষ কোন কথা হয়নি। শুধু পারস্পরিক সুপ্রভাত জানানো—এবং আজকের দিনটা চমৎকার এই সব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিলো।'

তাঁর চালচলন আপনার কিরকম মনে হয়েছিলো? কোনরকম অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেননি?'

'উহুঁ—বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে।'

'তাঁকে দেখে উত্তেজিত, অথবা মনমরা, অথবা মানসিক দিক দিয়ে কোনরকম বিচলিত মনে হয়েছিলো?'

'না, আমার অন্তত তা নজরে পড়েনি।'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'তিনি কি চিঠিপত্রের বিষয়বস্তুর কথা একবারও উল্লেখ করেছিলেন?'

মার্শালের ঠোঁটে আবারও ফুটে উঠলো হালকা হাসির রেখা। তিনি বললেন, "যতদূর আমার মনে পড়ছে, ও বলেছিলো সবক'টা চিঠিই নাকি রসিদ-সংক্রান্ত।'

'আপনার স্ত্রী আজ বিছানায় বসেই প্রাতরাশ সারেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কি রোজই তাই করতেন?'

'হ্যাঁ, এটা ওর বরাবরের অভ্যেস।'

পোয়ারো আবার প্রশ্ন করলেন, 'সাধারণত তিনি কখন নিচে নামতেন?'

'এই—দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে—তবে বেশিরভাগ দিনই এগারোটা নাগাদ।

পোয়ারো বলে চললেন, 'সেক্ষেত্রে, তিনি যদি কখনও ঠিক দশটায় নিচে নামেন, তাহলে সেটাকে কি আপনি অস্বাভাবিক ভেবে আশ্চর্য হবেন?'

'হ্যাঁ, হবো। কারণ অত সকালে আর্লেনা কখনও নিচে নামে না।'

'কিন্তু আজ তিনি নেমেছিলেন। হঠাৎ তাঁর এই নিয়মভঙ্গের পেছনে কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়, ক্যাপ্টেন মার্শাল?'

মার্শাল নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিলেন, 'সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও আমার নেই। হয়তো আজকের সুন্দর আবহাওয়াই ওর অনিয়মের কারণ—'

আপনি তাঁকে ঘরে না পেয়ে অবাক হয়েছিলেন?'

কেনেথ মার্শাল চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন, বললেন, 'প্রাতরাশের পর আমি ওর ঘরে গিয়েছিলাম। দেখলাম, ঘর খালি। তাই একটু অবাক হয়েছিলাম।'

'আর তারপরই আপনি সমুদ্রতীরে আসেন এবং আমাকে প্রশ্ন করেন, আপনার স্ত্রীকে আমি দেখেছি কি না?'

'ওহ—হ্যাঁ!' কণ্ঠস্বরে সামান্য জোর দিয়ে তিনি আরও বললেন, 'এবং আপনি বলেন যে ওকে আপনি দেখেননি...'

পোয়ারোর নিষ্পাপ চোখে অস্বস্তির কোনরকম ছায়া পড়লো না। তিনি অলস ভঙ্গীতে তাঁর উজ্জ্বল, দর্শনীয় গোঁফে সস্নেহে আঙুল বোলাতে লাগলেন।

ওয়েস্টন প্রশ্ন করলেন, 'আপনার স্ত্রীর খোঁজ করার পেছনে আপনার কি কোন বিশেষ কারণ ছিলো?'

মার্শাল তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরলেন পুলিশ-প্রধানের দিকে। বললেন, 'না, শুধু এই কথা ভেবেই অবাক হয়েছিলাম যে এত সকালে ও কোথায় যেতে পারে—তার বেশি কিছু নয়।'

ওয়েস্টন কয়েক মুহূর্তে নীরব রইলেন। চেয়ারটাকে সামান্য টেনে বসলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সামান্য নিচু গ্রামে নেমে এলো। তিনি বললেন, 'ক্যাপ্টেন মার্শাল, আপনি একটু আগেই বলেছেন যে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মিঃ প্যাট্রিক রেডফার্নের পূর্বপরিচয় ছিলো। এখন প্রশ্ন হলো, আপনার স্ত্রী মিঃ রেডফার্নকে কতখানি জানতেন?'

কেনেথ মার্শাল বললেন, 'সামান্য ধূমপান করলে আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।' তিনি পকেট হাতড়াতে লাগলেন, এই যাঃ! নিশ্চয়ই পাইপটা অন্য কোথাও ফেলে এসেছি!'

পোয়ারো তাঁর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন। মার্শাল সেটা গ্রহণ করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আপনি রেডফার্নের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমার স্ত্রী আমাকে বলেছিলো, কোন এক ককটেল পার্টিতে নাকি ওর সঙ্গে রেডফার্নের প্রথম আলাপ হয়।'

'ও—মিঃ রেডফার্ন তাহলে আকস্মিকভাবেই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হন?'

'আমার অন্তত তাই বিশ্বাস।'

'কিন্তু তারপর—' একটু থামলেন পুলিশ-প্রধান, 'আমার ধারণা, সেই পরিচয় ক্রমশ এক অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়.'

মার্শাল সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্নস্বরে জবাব দিলেন, 'আপনি বুঝি তাই ভাবেন? কে আপনাকে বলেছে একথা?'

'এটাই তো হোটেলের এক এবং একমাত্র গুজব।'

পলকের জন্য মার্শালের চোখ ফিরলো এরকুল পোয়ারোর দিকে। ক্রোধের এক শীতল দীপ্তি নিয়ে চোখজোড়া জরিপ করলো পোয়ারোকে। তারপর তিনি বললেন, 'হোটেলের গুজব সাধারণত একরাশ মিথ্যে রটনা ছাড়া আর কিছু নয়!'

'হয়তো তাই। কিন্তু আমি যা শুনেছি, তাতে মনে হয় মিঃ রেডফার্ন এবং আপনার স্ত্রী এই গুজব রটনার স্বপক্ষে বেশ কিছু সূত্র জুগিয়েছিলেন।'

'যথা?'

'তাঁরা বেশিরভাগ সময়ই একসঙ্গে থাকতেন।'

'এটাই একমাত্র কারণ?'

'আপনি নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করেন না?'

'সত্যিই হলেও হতে পারে। তবে তেমনভাবে আমার নজরে কখনও পড়েনি।'

'আপনি মিঃ রেডফার্নের সঙ্গে আপনার স্ত্রীর—ইয়ে বন্ধুত্বে কখনও—কিছু মনে করবেন না, ক্যাপ্টেন মার্শাল—বাধা দেননি?'

'নিজেকে স্ত্রীর আচার-আচরণে সমালোচনা করা আমার স্বভাব নয়।'

'আপনি তাহলে এ নিয়ে কোনরকম প্রতিবাদ বা আপত্তি করেননি?'

'নিশ্চয়ই না।'

'ব্যাপারটা একটা কেলেঙ্কারি পর্যায়ে যাচ্ছে দেখেও আপনি চুপচাপ ছিলেন?'

কেনেথ মার্শাল শীতল কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমি পরের চরকায় তেল দেওয়া পছন্দ করি না, এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে এই একই মনোভাব আশা করি। আর, গুজব অথবা পরচর্চামূলক মুখরোচক খবরে আমার তেমন আগ্রহ নেই।'

'আশা করি একথা আপন অস্বীকার করবেন না যে মিঃ রেডফার্ন আপনার স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন?'

'হয়তো ছিলো, ঠিক জানি না। আমার স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলো। সুতরাং বেশির ভাগ পুরুষই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তো।'

কিন্তু আপনাকে বোঝানো হয়েছিলো যে ব্যাপারটা গুরুত্ব দেবার মতো তেমন কিছু নয়?'

'বিশ্বাস করুন, এ নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি।'

'কিন্তু মনে করুন, এমন কোন সাক্ষী যদি আমাদের হাতে থাকে, যে শপথ করে বলবে, তাঁদের সম্পর্কে বন্ধুত্বের সীমানা ছাড়িয়ে চরম অন্তরঙ্গ পর্যায়ে এগিয়েছিলো?'

মার্শালের নীল চোখ আবার স্থির হলো পোয়ারোর চোখে। তাঁর সদা অভিব্যক্তিহীন মুখমণ্ডলে ক্ষণেকের জন্য ভেসে উঠলো অপছন্দের ছায়া।

মার্শাল বললেন, 'আপনি যদি সে সব গাল-গপ্পো বিশ্বাস করতে চান, করুন। আমার স্ত্রী মৃতা; ওর পক্ষে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করা এখন আর সম্ভব নয়।

'আপনি বলতে চান, ব্যক্তিগতভাবে এ সবে আপনি বিশ্বাস করেন না?'

মার্শালের ভুরুতে এই সর্বপ্রথম লক্ষিত হলো স্বেদবিন্দুর ছোঁয়া। তিনি বললেন, 'এ ধরনের গাল-গপ্পে বিশ্বাস করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই।'

তিনি বলে চললেন, 'আপনারা কি ক্রমশ প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছেন না? আমার মনে হয়, এই খুনের সঙ্গে আমার নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সম্পর্ক নিছকই অবান্তর।'

অন্য দুজন কোন উত্তর দেবারই আগেই এরকুল পোয়ারো বলে উঠলেন, 'আপনি ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারছেন না, ক্যাপ্টেন মার্শাল। খুনের চেয়ে চরম বাস্তব পৃথিবীতে আর কিছু নেই। দশটার মধ্যে অন্তত নটা ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নিহত ব্যক্তির চরিত্র এবং তাঁর পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই খুনের প্রথম এবং প্রধান কারণ নিহিত রয়েছে। যেহেতু নিহত ব্যক্তির স্বভাব চরিত্রে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিলো, শুধু সেই কারণেই তাঁকে হত্যাকারীর শিকার হতে হলো। সুতরাং যতক্ষণ না আমরা সম্পূর্ণভাবে জানতে পারছি আর্লেনা মার্শাল ঠিক কি ধরনের মহিলা ছিলেন, ততক্ষণ আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতেই পারবো না ঠিক কোন ধরনের বক্তৃয়র পক্ষে তাঁকে খুন করা সম্ভব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমাদের প্রশ্নের গুরুত্ব আপনার কাছে স্পষ্ট হবে।'

মার্শাল ফিরলেন পুলিশ-প্রধানের দিকে। বললেন, 'আপনারও কি একই মত?'

ওয়েস্টন একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ—একরকম তাই—'

মার্শাল ছোট্ট করে হাসলেন।

'ভেবেছিলাম আপনি হয়তো একমত হবেন না। কারণ এই চরিত্র-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলোকে আমি মঁসিয়ে পোয়ারোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলেই জানতাম।'

পোয়ারো সহাস্যে জবাব দিলেন, 'তাহলে আপনি নিজেকে অন্তত এই কথা ভেবে অভিনন্দন জানাতে পারেন, ক্যাপ্টেন মার্শাল, যে আমাকে সাহায্য করার মতো কিছুই আপনি এখনও বলেননি।'

'তার মানে?'

'আপনার স্ত্রীর সম্পর্কে আপনি আমাদের কতটুকু বলেছেন? কিছুই না! যেটুকু বলেছেন, তা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষের এমনিতেই নজরে পড়ে। অর্থাৎ আপনার স্ত্রী সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া মহিলা ছিলেন। এর চেয়ে বেশি কিছু আপনি আমাদের বলেছেন কি?'

কেনেথ মার্শাল কাঁধ ঝাঁকালেন। শুধু বললেন, 'আপনার অভিযোগ সম্পূর্ণ অর্থহীন।'

তিনি পুলিশ-প্রধানের দিকে তাকালেন, একটু জোর দিয়েই বললেন, 'আপনি আমার কাছে আর কিছু জানতে চান?'

'হ্যাঁ ক্যাপ্টেন মার্শাল—আজ সকালে আপনার গতিবিধির কথা।'

কেনেথ মার্শাল সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন। তিনি নিঃসন্দেহে এ প্রশ্নটাই আশা করছিলেন।

তিনি বলতে শুরু করলেন, রোজকার মতো সকাল নটায় আমি প্রাতরাশ সারতে নিচে যাই এবং খবরের কাগজ পড়ি। পরে আমার স্ত্রী-ঘরে গিয়ে দেখি ও ঘরে নেই—সে কথা তো আপনাদের আগেই বলেছি। সমুদ্রতীরে এসে মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে আমার দেখা হয়; আমি তাঁকে আমার স্ত্রী কথা জিগ্যেস করি। তারপর সংক্ষেপে স্নান সেরে আবার হোটেলে ফিরে আসি। তখন ক'টা হবে?... এই—এগারোটা বাজতে কুড়ির মতো—। হ্যাঁ, সময়টা আমার সঠিক মনে আছে, কারণ ফিরে এসেই হোটেলের দেওয়াল ঘড়িটা আমার প্রথম নজরে পড়ে: তখন এগারোটা বাজতে ঠিক কুড়ি মিনিট বাকি ছিলো। ওপরের ঘরে দেখি পরিচারিকা ঘর তদারকির কাজ তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। তাকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে বলে আমি আবার নিচে নেমে আসি, বার-এ হেনরীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে এগারোটা বাজতে দশ মিনিটের সময় আবার ঘরে ফিরে যাই। আমার কতকগুলো জরুরি চিঠি টাইপ করার ছিলো। সেগুলোকে সকালের ডাকেই পোস্ট করবো বলে আর সময় নষ্ট না করে টাইপরাইটার নিয়ে বসে পড়ি। বারোটা বাজতে দশে কাজ শেষ করে আমি টেনিস খেলার পোশাক পরে নিই, কারণ বারোটায় আমাদের টেনিস খেলার কথা ছিলো। আমরা আগের দিনই টেনিস কোর্ট বুক করে রেখেছিলাম—'

'আমরা মানে কারা।?'

মিসেস রেডফার্ন, মিস ডার্নলি, মিঃ গার্ডেনার এবং আমি। বেলা বারোটার সময় আমি টেনিস কোর্টে হাজির হই। মিস ডার্নলি ও মিঃ গার্ডেনার আমার আগেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু মিসেস রেডফার্ন আসতে কয়েক মিনিট দেরি করেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক আমরা খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তারপর হোটেলে ফিরে আসতেই আমি—আমি—খবরটা পাই।'

ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন মার্শাল। এবারে নিছক রুটিনমাফিক একটা প্রশ্ন করবো—আপনি যে এগারোটা বাজতে দশ থেকে বারোটা বাজতে দশ পর্যন্ত আপনার ঘরে বসে টাইপ করছিলেন, এ বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারে এমন কি কেউ আছে?'

কেনেথ মার্শালের ঠোঁটে ফুটে উঠলো হাসির রেখা। তিনি বললেন, 'আপনি কি সন্দেহ করছেন যে আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি?... দাঁড়ান, একটু ভাবতে দিন। পরিচারিকাটি তখন অন্যান্য ঘর ঝাঁড়পোঁছ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। সুতরাং সে নিশ্চয়ই টাইপরাইটারের শব্দ শুনে থাকবে। তাছাড়া চিঠিগুলো তো আমার কাছে রয়েছেই আর ডাকে দেওয়া হয়ে ওঠেনি। আমার মনে হয়, আমার বক্তব্যের সমর্থনে ও চিঠিগুলোই পর্যাপ্ত প্রমাণ।'

পকেট থেকে তিনি চিঠি তিনটি বের করলেন। চিঠিগুলোতে ঠিকানা লেখা থাকলেও ডাকটিকিট লাগানো হয়নি। তিনি বললেন, 'প্রসঙ্গত বলি, এই চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু একান্ত গোপনীয়। কিন্তু খুনের মামলায় পুলিশের বিবেচনার ওপর ভরসা রেখে এগুলো আপনাদের হাতে তুলে দিতে আমি বাধ্য। এ চিঠিগুলোর আমার বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিবৃতি ও তাদের সঠিক অঙ্ক লেখা রয়েছ। আমার মনে হয়, যদি

আপনারা এ চিঠিগুলো আপনাদের কোন লোককে দিয়ে টাইপ করান, তাহলে তার পক্ষেও এক ঘণ্টার খুব একটা কম সময়ে এগুলো শেষ করে ওঠা সম্ভব হবে না।'

তিনি একটু থামলেন।

'আশা করি এবারে সন্তুষ্ট হয়েছেন?'

ওয়েস্টন মসৃণ স্বরে জবাব দিলেন, 'এটা কোন সন্দেহের প্রশ্ন নয়, ক্যাপ্টের মার্শাল। এ দ্বীপে উপস্থিত প্রত্যেককেই আজ সকাল পৌনে এগারোটা থেকে এগারোটা চল্লিশ পর্যন্ত তাঁদের গতিবিধির জন্যে পুলিশের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

"হু-তা তো নিশ্চয়ই—'

'আর একটা কথা, ক্যাপ্টেন মার্শাল—' ওয়েস্টন বললেন, 'আপনার স্ত্রীর নিজস্ব কোন বিষয় সম্পত্তি থেকে থাকলে সেগুলো তাঁর কিভাবে ভাগ করে যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?'

'আপনি কি কোন উইলের কথা বলছেন? আমার মনে হয় না ও কোন উইল-টুইল করে গেছে।'

'কিন্তু সেটা তো শুধুই আপনার অনুমান—'

'ওর সলিসিটর ছিলো 'বাকেট, মার্কেট অ্যান্ড অ্যাপলগুড', বেডফোর্ড স্কোয়ার। ওর সমস্ত অভিনয়-সংক্রান্ত চুক্তিগুলো তারাই দেখাশোনা করতো। কিন্তু আমি যদ্দুর জানি ও কখনও কোন উইল করেনি। একবার ও আমাকে বলেছিলো, এইসব উইল-টুইল করার কথা শুনলে ওর জ্বর আসে।'

'সে ক্ষেত্রে স্বামী হিসেবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব তাহলে আপনার ওপরেই বর্তাচ্ছে?'

হ্যাঁ, সেরকমই তো মনে হচ্ছে।'

'তাঁর কাছাকাছি কোন আত্মীয়-স্বজর ছিলো?'

'সম্ভভত না। আর থাকলেও তাদের কথা ও আমাকে কখনও জানায়নি। শুনেছি, ছোটবেলাতেই ওর মা বাবা দুজনেই মারা যায়—ওর আর কোন ভাই বা বোন নেই।'

'সে যাই হোক, রেখে যাওয়ার মতো তেমন বিষয়-সম্পত্তি তাহলে আপনার স্ত্রীর ছিলো না?'

কেনেথ মার্শাল শীতল স্বরে জবাব দিলেন, বরং ঠিক তার উলটো। মাত্র বছর দুয়েক আগে, ওর এক পুরনো বন্ধু স্যার রবার্ট আরস্কিন মারা যান, এবং তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তিনি আর্লেনাকেই উইল করে দিয়ে যান। সে সম্পত্তির আর্থিক মুল্য, আমার অনুমান, প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।'

ইন্সপেক্টর কলগেট চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো এক তৎপর প্রতিক্রিয়া। এ পর্যন্ত তিনি একেবারেই নীরব ছিলেন, এবার প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনার স্ত্রী একজন ধনী মহিলা ছিলেন, ক্যাপ্টের মার্শাল?'

কেনেথ মার্শাল কাঁধ ঝাঁকালেন, 'হ্যাঁ, তা হয়তো ছিলো।'

আর তা সত্ত্বেও আপনি বলতে চান তিনি কোন উইল করে যাননি?'

'আপনারা ওর সলিসিটরদের প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ও কোন উইল করেনি। এটাকে ও অমঙ্গলসূচক কাজ বলে মনে করতো।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর মার্শাল যোগ করলেন, 'আপনার আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে?'

ওয়েস্টন মাথা নাড়লেন, মনে হয় না—কি, কলগেট? না, আপাতত প্রশ্নের পালা শেষ। ক্যাপ্টেন মার্শাল, আপনার এই আকস্মিক ক্ষতিতে আমি আরও একবার আপনাকে সমবেদনা জানাচ্ছি।'

মার্শালের চোখের পাতা কেঁপে উঠলো। আচমকা সুরে তিনি জবাব দিলেন, 'ওহ্—ধন্যবাদ।'

তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

৫

উপস্থিত তিনজন পরস্পরে দিকে তাকালেন।

ওয়েস্টন বললেন, 'ঠান্ডা মাথার মক্কেল। সহজে ধরা দেবার পাত্র নয়, তাই না? তোমার কি মনে হয় কলগেট?'

ইন্সপেক্টর অনিশ্চিত ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন।

'বলা শক্ত। তিনি সে ধরনের লোক নন যাঁরা নিজেদের মনের ভাব অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেন। এবং এ ধরনের লোকেরা সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জুরীদের সহানুভূতিকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এই কারণে একাধিকবার তাঁদের ওপরই কিঞ্চিৎ অবিচারও করা হয়েছে। অনেক সময় তাঁদের মনের ভেতরে চিন্তা ও সমস্যার তুমুল আলোড়ন উঠলেও তাঁরা মুখের পর্দার সে মানসিকতার প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলতে পারেন না—সোজা কোথায়, অভিব্যক্তি প্রকাশে তাঁরা সম্পূর্ণ অক্ষম। ঠিক এই ধরনের স্বভাবের জন্যেই ওয়ালেসের বিরুদ্ধে জুরীরা 'অপরাধী' রায় দিতে বাধ্য হয়। তাঁদের এই রায় সাক্ষ্য-নির্ভর ছিলো না। তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারেননি, কোন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে হারিয়ে এত সহজ ও শান্তভাবে ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারেন।'

ওয়েস্টন ফিরলেন পোয়ারোর দিকে।

'আপনি কি বলেন, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

এরকুল পোয়ারো হাত তুলে একটা ভঙ্গী করলেন। বললেন, 'কি-ই বা বলা সম্ভব। ক্যাপ্টেন মার্শাল হলেন অবরুদ্ধ সিন্দুক—আবদ্ধ শুক্তি। তিনি নিজের ভূমিকা ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছেন। তিনি কিছুই শোনেননি, কিছুই দেখেননি, এবং কিছুই জানেন না!'

'তবে খুনের উদ্দেশ্য হিসেবে অনেকগুলো কারণ আমাদের সামনে রয়েছে।' বললেন কলগেট, 'প্রথমত রয়েছে ঈর্ষা, আর রয়েছে মিসেস মার্শালের রেখে যাওয়া প্রচুর অর্থ—এ দুটোয় যে কোনটাই খুনের জোরালো কারণ হতে পারে। অবশ্য এমনিতেই স্ত্রীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্বামীই প্রথম এবং প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি, তাকে সন্দেহ করার কথাটাই সর্বাগ্রে আমাদের মনে আসে সুতরাং যদি আমরা জানতে পারি যে ক্যাপ্টেন মার্শাল নিজের স্ত্রীর ব্যভিচারের কথা সবই জানতেন, তাহলে ;'

পোয়ারো বাধা দিলেন, বললেন, 'আমার মনে হয় তিনি তা জানতেন।'

'আপনার এ ধারণার কারণ?'

'কারণ, গতরাত্রে আমি সানি লেজ-এ মিসেস রেডফার্নের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেখান থেকে হোটেলে ফিরে আসার পথে আমি ওদের দুজনকে—মানে মিসেস মার্শাল ও প্যাট্রিক রেডফার্নকে দেখতে পাই। এবং তার কয়েক সেকেন্ড পরেই ক্যাপ্টেন মার্শালের সঙ্গে আমার আচমকা সাক্ষাৎ হয়। তাঁর মুখমণ্ডল যথারীতি অভিব্যক্তিশূন্য, অচঞ্চল ও কঠিন। কিন্তু তাঁর ওই চেষ্টাকৃত অভিব্যক্তিশূন্যতা আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তিনিও ওদের দেখতে পেয়েছেন, সে সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহের আর লেশমাত্র ছিলো না!'

কলগেট সন্দেহসূচকভাবে একটা গম্ভীর শব্দ করলেন।

তিনি বললেন, 'ও—তাহলে আপনার যদি সেইরকম মনে হয় থাকে—'

'মনে হওয়া' নয়, আমি নিঃসন্দেহ! কিন্তু তার থেকে কতটুকুই বা আমরা জানতে পারছি? কেনেথ মার্শাল নিজের স্ত্রী সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কি ভাবতেন তা আমরা এখনও জানি না।'

কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'স্ত্রীর মৃত্যুকে তিনি বড় সহজভাবে নিয়েছেন।'

পোয়ারো অতৃপ্তভাবে মাথা নাড়লেন।

ইন্সপেক্টর কলগেট বললেন, 'কখনও কখনও এই সব আপাত-শান্ত লোকেরা ভেতরে ভেতরে ভীষণ উগ্র হয়। তাঁদের সমস্ত আবেগ, অনুভূতি দিনের পর দিন মনে আবদ্ধ থাকে বলেই চূড়ান্ত বিস্ফোরণটা হয় ভয়ঙ্কর। ক্যাপ্টেন মার্শাল হয়তো তাঁর স্ত্রীকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন—আর সেই জন্যেই ছিলেন অস্বাভাবিক রকম ঈর্ষাপরায়ণ। কিন্তু সে অনুভূতি বাইরে প্রকাশ করার মতো লোক তিনি নন।'

পোয়ারো ধীর স্বরে বললেন, 'হয়তো সম্ভব। কারণ আমাদের এ ক্যাপ্টেন মার্শাল বড় অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে। যেমন রয়েছে তাঁর অ্যালিবাই সম্পর্কে।'

'টাইপরাইটার-অ্যালিবাই!' শব্দ করে হাসলেন ওয়েস্টন, 'এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি কলগেট?'

ইন্সপেক্টর কলগেটের উজ্জ্বল চোখজোড়া ঈষৎ সঙ্কুচিত হলো। তিনি বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, স্যার অ্যালিবাইটা আমাকে মোটামুটি সন্তুষ্টই করেছে। কারণ ওটা বেশি রকম নিখুঁত তো নয়ই, বরং বলতে পারেন—স্বাভাবিক। যদি আমরা জানতে পারি যে সেই পরিচারিকাটি তখন কাছাকাছিই ছিলো এবং টাইপরাইটার চলার শব্দ শুনতে পেয়েছিলো, তাহলে আমার মনে হয় এই অ্যালিবাই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এবং নিরুপায় হয়েই নজর দিতে হবে অন্যদিকে।'

'হুম!' বললেন, কর্নেল ওয়েস্টন, 'কিন্তু নজরটা তুমি দেবে কোন দিকে?'

৬

প্রায় মিনিটখানেক ধরে ওঁরা তিনজন প্রশ্নটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন।

অবশেষে ইন্সপেক্টর কলগেটই স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। তিনি বললেন, 'গোটা সমস্যাটা এখন নেমে এসেছে একটা প্রশ্নে—কাজটা কি কোন বাইরের লোকের, না হোটেলের কোন অতিথির? মনে রাখবেন, আমি চাকর-বাকরদেরও সন্দেহের আওতা থেকে পুরোপুরি বাদ দিচ্ছি না, তবে আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে ওদের কোন ভূমিকা নেই। উহুঁ—এ কাজ হয় হোটেলের কোন অতিথির, নয় বাইরে কোন লোকের; এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নেই। ব্যাপারটা এইভাবে দেখা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তাছাড়া, সবচেয়ে প্রথম আসে—খুনের উদ্দেশ্য। এখানে সেটা স্ববৈশিষ্ট্যে বতর্মান : আর্থিক লাভ। মিসেস মার্শালের এই আকস্মিক মৃত্যুতে একমাত্র লাভবান হচ্ছেন তাঁর স্বামী, আপাতদৃষ্টিতে অন্তত তাই মনে হচ্ছে। এ ছাড়া আর কি উদ্দেশ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি? প্রথম এবং প্রধান—ঈর্ষা। ঘটনার দিকে সরাসরি চোখ রেখে আমার মনে হয়, যদি কখনও নিছক প্রেমঘটিত ঈর্ষার কারণে কোনও খুন হয়ে থাকে, তাহলে এটাই সেই একমাত্র উদাহরণ (পোয়ারোর দিকে ফিরে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করলেন কলগেট)।'

পোয়ারো চোখ তুলে তাকালেন ঘরে আভ্যন্তরীণ ছাদের দিকে। মৃদু স্বরে বললেন, 'মানুষের মনের অসংখ্য আবেগের প্রকৃত চরিত্র কজন জানে—'

ইন্সপেক্টর কলগেট বলে চললেন, ভদ্রমহিলার স্বামী তো কিছুতেই স্বীকার করলেন না যা তাঁর স্ত্রীর কোন শত্রু ছিলো—সত্যিকারের শত্রু। কিন্তু সেকথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি বলবো, মিসেস মার্শালের মতো মহিলার প্রচুর শত্রু থাকাটাই স্বাভাবিক—চরম শত্রু। আপনি কি বলেন, স্যর?'

পোয়ারো বিনা দ্বিধায় জবাব দিলেন, 'আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আর্লেনা মার্শালের শত্রু থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার এই শত্রুতত্ত্বকে ভিত্তি করে বেশিদূরে আমরা এগোতে পারবো না। কারণ, আপনি তো জানেন ইন্সপেক্টর, আর্লেনা মার্শালের শত্রুরা সর্বদাই মহিলারা।'

কর্নেল ওয়েস্টন সম্মতিসূচক একটা গম্ভীর শব্দ করে বললেন, 'আপনার কথাটায় যুক্তি আছে। এই দ্বীপের মিসেস মার্শালের একমাত্র শত্রু ছিলো মহিলারা—'

পোয়ারো বলে চললেন, 'এবং আমার মনে হয়, এই খুনটা কোন মহিলারা পক্ষে করা সম্ভব। আপনাদের ডাক্তারি সাক্ষ্য কি বলছে?'

ওয়েস্টন সেই বিচিত্র শব্দ সহকারে জবাব দিলেন, 'মিসেস মার্শাল যে কোন পুরুষের হাতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন যে বিষয়ে নীসডনের মনে কোন সন্দেহ নেই, বিশাল, শক্তিশালী একজোড়া হাতের কঠিন নিষ্পেষণ। অবশ্য, এও হয়তো সম্ভব যে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন কোন ক্রীড়াবিদ মহিলাই এ মৃত্যুর জন্যে দায়ী—কিন্তু আমার মতে, সেটা একটু কষ্টকল্পনা এবং অস্বাভাবিক।'

পোয়ারো মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালেন।

'ঠিক তাই। চায়ের কাপে আর্সেনিক—বিষাক্ত চকোলেটের বাক্স কিংবা ছুরি—এমন কি পিস্তল পর্যন্ত আমি এগোতে রাজি আছি—কিন্তু শ্বাসরোধ করে হত্যা? অসম্ভব। আমাদের প্রার্থিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কোন পুরুষ।'

'কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের সমস্যা হয়ে পড়ছে আরও জটিল।' তিনি বলে চললেন, 'আর্লেনা মার্শালকে অপসারিত করে নিজেদের পথ নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছেন এমন ব্যক্তি মাত্র দুজন উপস্থিত আছেন এই হোটেলে—কিন্তু তাঁরা দুজনেই মহিলা।'

কর্নেল ওয়েস্টন প্রশ্ন করলেন, 'তার মধ্যে একজন নিশ্চয়ই মিসেস রেডফার্ন?'

'হ্যাঁ। মিসেস রেডফার্ন হয়তো আর্লেনা স্টুয়ার্টকে হত্যা করতে মনস্থির করেছিলেন। ধরে নেওয়া যাক, তার যথেষ্ট কারণও ছিলো। আমার মনে হয়, মিসেস রেডর্ফানের মতো মহিলার পক্ষে খুন করাটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ তাঁর চরিত্র-বিরোধী। তাঁর সমস্ত মানসিক অশান্তি ও ঈর্ষার কথা মনে রেখেও আমি বলবো তিনি আবেগ তাড়িত মহিলা নন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে তিনি অনুরক্ত এবং একান্ত-নিষ্ঠ উদ্দাম আসক্তিতে বিশ্বাসী নন। একটু আগেই আমি যে কথা বললাম—চায়ের কাপে আর্সেনিক, হয়তো সম্ভব—কিন্তু শ্বাসরোধ করে হত্যা, সম্পূর্ণ অসম্ভব! তাছাড়া দৈহিক গঠনের দিক থেকেও এ খুন মিসেস রেডফার্নের পক্ষে করা সম্ভব নয়—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আপনারাও হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, তাঁর হাত এবং পায়ের গড়ন সাধারণের তুলনায় বেশ ছোট।'

ওয়েস্টন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। বললেন, 'না, এ কোন মহিলার কর্ম নয়। আমাদের প্রার্থিত আসামী নিঃসন্দেহে পুরুষ।'

ইন্সপেক্টর কলগেট শব্দ করে কাশলেন।

'আমি একটা সম্ভাব্য সমাধান আপনাদের সামনে রাখতে চাই, স্যর ধরে নেওয়া যাক, এই মিঃ রেডফার্নের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে জনৈক পুরুষের সঙ্গে মিসেস মার্শালের একটু ইয়ে টিয়ে ছিলো, ধরা যাক, তার নাম 'এক্স'। মিঃ রেডফার্ন রঙ্গ মঞ্চে প্রবেশ করা মাত্রই মিসেস মার্শাল এই 'এক্স' কে সবিনয় বিদায় দিলেন। সুতরাং 'এক্স' ঈর্ষা এবং অপমানের জ্বালায় উন্মাদ হয়ে উঠলো। সে তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে অনুসরণ করে এলো এই অঞ্চলে। স্থানীয় কোন বাড়িতে বসে সুযোগের অপেক্ষায় রইলো। অবশেষে সে এলো এই দ্বীপে, এবং তার অপমানের প্রতিশোধ নিলো। এমনটা ঘটলেও ঘটতে পারে।'

'তা পারে।' জবাব দিলেন ওয়েস্টন, এবং 'তোমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তাহলে ব্যাপারটা প্রমাণ করতে কোন অসুবিধা হবে না। এই মিঃ 'এক্স' কি পায়ে হেঁটে দ্বীপে এসেছেন, না নৌকোয়, এটাই সবচেয়ে প্রথমে আমাদের জানতে হবে। আমার কাছে দ্বিতীয় পন্থাটাই বেশি সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে। আর তাই যদি হয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে নৌকো ভাড়া করেছে। এ ব্যাপারে তুমি একটু খোঁজ খবর নাও।'

ওয়েস্টন ফিরে তাকালেন পোয়ারোর দিকে, 'কলগেটের এই ধারণা সম্পর্কে আপনার কি মত?'

পোয়ারো ধীর স্বরে বললেন, 'এতে হত্যাকারীকে সুযোগ এবং সম্ভাবনার ওপর বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে। আর তাছাড়া—ইন্সপেক্টরের কাল্পনিক কাহিনিতে অন্তত এক জায়গায় একটা ভুল থেকে যাচ্ছে। কারণ এই ঈর্ষা এবং অপমানের জ্বালায় উন্মত্ত লোকটিকে আমি ঠিক কল্পনায় আনতে পারছি না...'

কলগেট বললেন, 'কিন্তু স্যর, মিসেস মার্শালের জন্যে পাগল হওয়ার মতো লোকের অভাব এখানে নেই। এই রেডফার্নকে দেখুন না—'

'হ্যাঁ, মানছি... কিন্তু তবুও—'

কলগেট সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো।
তিনি বললেন, 'কোথাও এমন কিছু একটা রয়েছে, যেটা আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে...'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

কর্নেল ওয়েস্টন হোটেলের অতিথি তালিকার খাতার ওপর ঝুঁকে ছিলেন তিনি সশব্দ উচ্চারণে পড়তে লাগলেন :

'মেজর এবং মিসেস কাওয়ান,
মিস পামেলা কাওয়ান,
মাস্টার রবার্ট কাওয়ান,
মাস্টার ইভান কাওয়ান।
রাইড্যালস মাউন্ট লেদারহেড।
মিঃ এবং মিসেস মাস্টারম্যান,
মিঃ এডওয়ার্ড মাস্টারম্যান,
মিস জেনিফার মাস্টারম্যান,
মিঃ রয় মাস্টারম্যান,
মাস্টার ফ্রেডরিক মাস্টারম্যান,
৫. মার্লবোরো অ্যাভিনিউ, লন্ডন, এন ডব্লিউ।
মিঃ এবং মিসেস গার্ডেনার,
ন্যু-ইয়র্ক,
মিঃ এবং মিসেস রেডফার্ন,
ক্রসগেটস সেলডন প্রিন্সেস, রিসবোরো।
মেজর ব্যারী,
১৮, কারডন স্ট্রিট, সেন্ট জেমস, লন্ডন এস ডব্লিউ১।
মিঃ হোরেস ব্ল্যাট,
৫, পিকাসর্জিল স্ট্রিট, লন্ডন, ই. সি, ২।
মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো,
হোয়াটিহ্যাভেন, ম্যানসনস, লন্ডন ডব্লিউ, ১।
মিস রোজামন্ড ডার্নলি
৮, কার্ডিগান কোর্ট, ডব্লিউ, ১।
মিস এমিলি ব্রুস্টার,
সাউথ গেটস, সানবেরী-অন-টেমস।
রেভারেন্ড স্টিফেন লেন,
লন্ডন
ক্যাপ্টেন এবং মিসেস মার্শাল
মিস লিন্ডা মার্শাল
৭৩, আপকট ম্যানসনস, লন্ডন এস, ডব্লিউ, ৭।'

ওয়েস্টন থামলেন।

ইন্সপেক্টর কলগেট বললেন, 'আমার মনে হয় স্যর, প্রথম দুটো পরিবারকে আমরা স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারি। কারণ মিসেস ক্যাসল, বলেছেন মাস্টারম্যান। এবং কাওয়ানরা নাকি প্রতি গ্রীষ্মেই ওঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে বেড়াতে আসেন। আজ সকালে ওঁরা দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে দিনভর

নৌকোভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন। সকাল ন'টার কিছু পরেই ওঁরা রওনা হন। অ্যানড্রু ব্যাস্টন নামে একজন লোক ওঁদের নৌকো করে নিয়ে যায়। তাকে জিগ্যেস করলেই আমরা মিসেস ক্যাসল-এর কথা যাচাই করে নিতে পারবো। কিন্তু আমার মনে হয়, সন্দেহের আওতা থেকে ওঁদের আমরা অনায়াসে বাদ দিতে পারি।'

ওয়েস্টন মাথা নোয়ালেন।

'আমারও তাই ধারণা। যে ক'জনকে পারা যায় এভাবেই আমরা বাদ দেবো। অবশিষ্টদের কারও সম্পর্কে আপনি কোন ইঙ্গিত দিতে পারেন, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো বললেন, 'ভাসা ভাসা ভাবে নিশ্চয়ই দেওয়া সম্ভব। গার্ডেনার মধ্যবয়স্ক বিবাহিত দম্পতি; আচরণে হাসিখুশি এবং ভ্রমণবিলাসী। আলাপ-আলোচনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শ্রীমতী গার্ডেনার একাই পালন করেন। তাঁর এই আধিপত্যকে মিঃ গার্ডেনার নীরবে মেনে নিয়েছেন। তিনি টেনিস গলফ খেলতে ভালোবাসেন, কখনও একান্ত সঙ্গী হিসেবে পেলে তাঁর অসামান্য রসবোধ আমার কাছে হয়ে ওঠে এক আকর্ষণ।'

'সুতরাং, নজরে পড়ার মতো অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

'এরপর ধরুন রেডফার্নদের—। মিঃ রেডফার্ন বয়েসে তরুণ মহিলাদের কাছে প্রলোভনের বস্তু অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু, ভালো টেনিস খেলোয়াড় ও প্রথম শ্রেণীর নাচিয়ে। তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে আমি আগেই আপনাকে বলেছি। তিনি শান্ত প্রকৃতির মহিলা: তাঁর বহিরঙ্গের বিবর্ণতার মধ্যে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তিনি, আমার মনে হয়, তাঁর স্বামীর প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত। তাঁর মধ্যে এমন একটা জিনিস রয়েছে যা আর্লেনা মার্শালের ছিলো না।'

'যথা?'

'বুদ্ধি—'

ইন্সপেক্টর কলগেট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'মোহের প্রশ্ন যখন আসে, তখন বুদ্ধির কোন গুরুত্ব সেখানে থাকে বলে আমার মনে হয় না, স্যার।'

'হয়তো থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস মিসেস মার্শাল সম্পর্কে মোহচ্ছন্ন হলেও মিঃ রেডফার্ন প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্ত্রীকেই ভালোবাসেন।'

'সেটা হতে পারে, স্যার। কারণ মিঃ রেডফার্নের এ জাতীয় পদস্খলন হয়তো এই প্রথম নয়—'

পোয়ারো অস্ফুট স্বরে বললেন, 'এটাই তো সবচেয়ে দুঃখের কথা! স্ত্রীরা এই সরল সত্যি কথাটাই সহজে বিশ্বাস করতে পারেন না!'

একটু থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন 'মেজর ব্যারী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। নারী-সৌন্দর্যের পূজারী দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর কাহিনীর কথক।'

ইন্সপেক্টর কলগেট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আর বলার প্রয়োজন নেই। এ ধরনের কিছু লোকের সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশত আমারও পরিচয় হয়েছে, স্যর!'

মিঃ হোরেস ব্ল্যাট। আপাতদৃষ্টিতে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি। কথা বলেন প্রচুর—তবে নিজের সম্পর্কেই। সকলের বন্ধুত্বই তাঁর কাম্য। এবং তার পরিণতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কারণ কেউই তাঁকে তেমন একটা পছন্দ করেন না। এছাড়া আর একটা ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত রাতে আমাকে তাঁর একরাশ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। তখন আমার মনে হয়েছে, মিঃ ব্ল্যাট বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। তাঁর যে কোথাও কোন একটা গোলমাল রয়েছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

এক মুহূর্ত থামলেন তিনি। তারপর ভিন্ন স্বরে পুনরায় শুরু করলেন, 'এরপর আসছেন মিস রোজামণ্ড ডার্নলি তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম রোজামন্ড লিমিটেড। তিনি একজন বিখ্যাত পোশাক-বিশেষজ্ঞ। তাঁর সম্পর্কে আর বিশেষ কি বলা যায়? মোটের ওপর মিস ডার্নলির বুদ্ধি, সৌন্দর্য ও চটক—সবই আছে। এবং

তাঁর সৌন্দর্যের আকর্ষণী ক্ষমতাকে অস্বীকার করা খুবই কঠিন।' একটু থেমে তিনি আবার যোগ করলেন, সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি ক্যাপ্টেন মার্শালের একজন পুরনো বন্ধু।'

ওয়েস্টন চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন।

'বলেন কি? তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। যদিও মাঝে বেশ কয়েক বছর তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

ওয়েস্টন প্রশ্ন করলেন, 'মিস ডানর্লি কি জানতেন যে ক্যাপ্টেন মার্শাল এখানে বেড়াতে আসছেন?'

'তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, জানতেন না।'

পোয়ারো কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, এরপর কে আসছেন? মিস ব্রুস্টার। তাঁর সম্পর্কে আমি কিঞ্চিৎ আশঙ্কিত।' তিনি ধীরে মাথা নাড়লেন, 'তাঁর কণ্ঠস্বর পুরুষ-সদৃশ। আচরণে রূঢ় হলেও আন্তরিকতার অভাব নেই। নৌকা বাইতে ভালোবাসেন এবং গলফ খেলায় পারদর্শিনী।' একটু থামলেন তিনি তারপর বললেন, অবশ্য আমার মনে হয়, সব মিলিয়ে তিনি একজন সহৃদয় মহিলা।'

ওয়েস্টন বললেন, 'সুতরাং এরপর বাকি রইলেন ধর্মযাজক স্টিফেন লেন। কে এই ধর্মযাজক স্টিফেন লেন?'

'এ ক্ষেত্রে একটা কথাই আমি বলতে পারি; ধর্মযাজক লেন এক প্রচণ্ড স্নায়ুবিক চাপের মধ্যে রয়েছেন। এছাড়া, আমার মতে, তিনি একজন ধর্মান্ধ ব্যক্তি।'

ইন্সপেক্টর কলগেট সংক্ষিপ্ত করলেন, 'ও—এই ধরনের লোক!'

ওয়েস্টন বললেন, 'ব্যস, আমাদের লিস্ট শেষ!' তিনি তাকালেন পোয়ারোর দিকে, 'কিন্তু বন্ধুবর, আপনাকে যেন বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে?'

পোয়ারো জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। কারণ আজ সকালে মিসেস মার্শাল যখন ভেলা নিয়ে রওনা হন এবং আমাকে অনুরোধ করেন তাঁর উপস্থিতির কথা কাউকে না জানাতে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই আমার মন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আমার মনে হয়েছিলো প্যাট্রিক রেডফার্নের সঙ্গে মিসেস মার্শালের অন্তরঙ্গতা তাঁর এবং তাঁর স্বামীর মধ্যে এক অশান্ত জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ভেবেছিলাম, তিনি সম্ভবত প্যাট্রিক রেডফার্নের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, এবং তিনি চান না তাঁর সেই গতিবিধি সম্পর্কে তাঁর স্বামী অবহিত হোক।'

তিনি থামলেন। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য।

'কিন্তু, এখন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন, আমার ভুলটা হয়েছিলো সেইখানেই। কারণ, তিনি চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরে ক্যাপ্টেন মার্শালের সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হন ঠিকই, এবং আমাকে প্রশ্ন করেন তাঁর স্ত্রীকে আমি দেখেছি কিনা, কিন্তু প্রায় একই সঙ্গে প্যাট্রিক রেডফার্নও ঘটনাস্থলে হাজির হয়—এবং অত্যন্ত প্রকট ও নির্লজ্জভাবে মিসেস মার্শালের অনুসন্ধান করতে থাকে। সুতরাং, বন্ধুগণ, এই মুহূর্তে আমি নিজেকেই প্রশ্ন করছি, আজ সকালে আর্লেনা মার্শাল তাহলে কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?'

ইন্সপেক্টর কলগেট বললেন, 'আপনার বক্তব্য আমার ধারণাকেই পুরোপুরি সমর্থন করছে, মঁসিয়ে পোয়ারো। লন্ডন অথবা অন্য কোন জায়াগা থেকে আসা জনৈক অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির সঙ্গেই মিসেস মার্শাল—'

এরকুল পোয়ারো প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'কিন্তু, বন্ধু, আপনার অভিমত অনুযায়ী এই কাল্পনিক ব্যক্তির সঙ্গে আর্লেনা মার্শালের সম্পর্ক ইতিমধ্যেই ছিন্ন হয়েছে। সুতরাং এরপরেও তিনি এতোটা ঝুঁকি এবং শ্রম স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, এটা ভাবতে কষ্ট হয়।'

ইন্সপেক্টর কলগেট মাথা নাড়লেন, বললেন, 'তাহলে আপনি কাকে সন্দেহ করছেন?'

সেটাই তো আমি এখনও আন্দাজ করে উঠতে পারছি না। একটু আগেই আমরা হোটেলের অতিথি-তালিকা পড়ে শেষ করেছি। দেখেছি তাঁদের সকলেই প্রায় মধ্যবয়স্ক নীরস প্রকৃতির। তাঁদের কাউকে কি

প্যাট্রিক রেডফার্নের চেয়ে বেশি গুরুত্ব মিসেস মার্শাল দেবে? উহুঁ—সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি একজনের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাতের আয়োজন করেছিলেন—এবং সেই একজন প্যাট্রিক রেডফার্ন নন।'

ওয়েস্টন মৃদু স্বরে বলে উঠলেন, 'আপনার কি মনে হয়, মিসেস মার্শাল আপন খেয়ালে একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন?'

পোয়ারো প্রতিবাদ জানিয়ে আরও একবার মাথা নাড়লেন।

'বন্ধু', বললেন পোয়ারো, 'আপনার কথা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে মৃত মহিলার সঙ্গে পরিচয়ের সে ভাগ্য আপনার হয়নি। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ব্রুমেল অথবা নিউটনের মতো মানুষ—এই দুজনের ক্ষেত্রে 'আরোপিত নিঃসঙ্গ বন্দী জীবন'-এর তাৎপর্যের যে পার্থক্য, তা নিয়ে জনৈক ব্যক্তি একদা এক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। নিঃসঙ্গতার জগতে আলেনা মার্শালের স্থান নেই, বন্ধু। পুরুষের প্রশংসা সর্বদা আলোকিত মঞ্চেই তাঁর চিরকালের অধিষ্ঠান। সুতরাং আজ সকালে তিনি কারো না কারো সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি?'

২

কর্নেল ওয়েস্টন দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আপাতত এসব তত্ত্ব-আলোচনা থাক। এ নিয়ে আমরা পরেও ভাববার অনেক সময় পাবো। এখন যেটা প্রয়োজন, তা হলো জবানবন্দিগুলো সেরে নেওয়া। কারণ প্রত্যেকের গতিবিধির একটা লিখিত বিবৃতি পেলে আমাদের কাজের অনেক সুবিধে হবে। প্রথমে তাহলে মার্শালের মেয়েটিকেই ডাকা যাক। সে হয়তো আমাদের কোন জরুরি খবর দিলেও দিতে পারে।'

দরজার টোকা মেরে নিজের উপস্থিতি জানালো লিন্ডা মার্শাল, অগোছালো ভঙ্গীতে ঘরে পা রাখলো। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত লয়ে বইছে, দু চোখের তারা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বিস্তৃত। লিন্ডাকে দেখে কোন হতকচিত অশ্বশাবকের কথাই প্রথমে মনে আসে।ওর প্রতি অদ্ভুত স্নেহের আবেগ অনুভব করলেন কর্নেল ওয়েস্টন।

তিনি ভাবলেন ঃ 'বেচারি মেয়েটা—এই তো কচি বয়েস! নিশ্চয়ই এ ঘটনায় ভীষণ মানসিক আঘাত পেয়েছে।'

তিনি একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আশ্বাসের সুরে বললেন, 'আপনাকে এ অবস্থায় বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মিস লিন্ডা, তাই তো?'

'হ্যাঁ। লিন্ডা।'

ওর কণ্ঠস্বরে শ্বাস টেনে শব্দ উচ্চারণের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অধিকাংশ স্কুলের মেয়েদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ওয়েস্টনের সামনে, টেবিলের ওপর অসহায় ভঙ্গীতে রক্ষিত লিন্ডার হাড়সর্বস্ব, রক্তিম, দীর্ঘ আকৃতির করুণ হাত দুটো। তিনি ভাবলেন ঃ 'এ ধরনের ঘটনায় কোন কিশোরীর কখনোই জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।'

তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠলো আশ্বাসের কোমল সুর, 'এ সব দেখে আপনার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, মিস লিন্ডা। আমরা শুধু চাই, আপনি যদি এমন কিছু জেনে থাকেন যা আমাদের প্রয়োজন আসতে পারে, তাহলে সেটুকু আমাদের খুলে বলুন—ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।'

লিন্ডা বলল, 'তার মানে—আর্লেনা সম্পর্কে।'

'হ্যাঁ। আজ সকালে আপনি কি তাঁকে একবারও দেখেছেন?'

অসহায় মেয়েটি মাথা নাড়লো।

'না। কারণ আর্লেনা বরাবরই একটু বেলায় নিচে নামে। তাছাড়া বিছানায় বসে প্রাতরাশ সারা ওর পুরনো অভ্যেস।'

'আর আপনি, মাদমোয়াজেল?' এরকুল পোয়ারো বললেন।

'ও, আমি উঠে পড়ি। বদ্ধ ঘরে বিছানায় বসে প্রাতরাশ খেতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।'

ওয়েস্টন বললেন, 'আজ সকালে উঠে আপনি কি কি করেছেন, সেটা আমাদের খুলে বলবেন?'

'হ্যাঁ, প্রথমে আমি স্নান সেরে নিই। তারপর প্রাতরাশ সেরে মিসেস রেডফার্নের সঙ্গে গাল কোভে যাই।'

'কটার সময় আপনারা রওনা হয়েছিলেন?' ওয়েস্টন প্রশ্ন করলেন।

'মিসেস রেডফার্ন বলেছিলেন, তিনি আমার জন্যে নিচের হলঘরে সাড়ে দশটায় অপেক্ষা করবেন। আমার মনে হচ্ছিলো, হয়তো দেরি করে ফেলেছি—কিন্তু না, তা হয়নি। সাড়ে দশটার মিনিট তিনেক আগেই আমরা রওনা হই—'

পোয়ারো বললেন, 'গাল কোভে গিয়ে আপনারা কি করলেন?'

'আমি গিয়ে সোজা তেল মেখে সূর্যস্নানে মনোযোগ দিই, আর মিসেস রেডফার্ন আপন মনে ছবি আঁকতে থাকেন। তারপর, আরও পরে, আমি সমুদ্রে নামি স্নান করতে, আর ক্রিস্টিন হোটেলে ফিরে যান টেনিস খেলার জন্য পোশাক পালটে প্রস্তুত হতে।'

ওয়েস্টন গলার স্বরকে যথাসম্ভব সহজ ও স্বাভাবিক রেখে প্রশ্ন করলেন, 'সেই সময়টা আপনার মনে আছে।'

'কখন, যখন মিসেস রেডফার্ন হোটেলে ফিরে যান?—পৌনে বারোটা।'

'আপনার ঠিক মনে আছে—পৌনে বারোটা?'

লিন্ডা চোখ বড় করে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে আছে। আমি ঘড়ি দেখেছিলাম।'

'যে ঘড়িটা আপনি এখন পরে আছেন?'

লিন্ডা চোখ নামিয়ে তাকালো হাতের দিকে।

'হ্যাঁ—'

ওয়েস্টন বললেন, 'ঘড়িটা একবার দেখতে পারি?'

লিন্ডা ওর মণিবন্ধ এগিয়ে ধরলো। তিনি নিজের হাতঘড়ি ও হোটেলের দেওয়াল ঘড়ির সঙ্গে ওর ঘড়িটা মিলিয়ে দেখলেন। তারপর হেসে বললেন, 'সেকেন্ড পর্যন্ত নির্ভুল...আচ্ছা—মিসেস রেডফার্ন চলে যাওয়ার পর আপনি তাহলে স্নান করতে নামেন?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর হোটেলে ফিরলেন কখন?'

'প্রায় একটা নাগাদ। আর—আর ফিরে এসে শুনলাম—আর্লেনা—আর্লেনা মারা গেছে...'

ওর স্বর শেষ দিকে কেমন বদলে গেলো।

কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'আশা করি সৎমায়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে আপনার—ইয়ে—কোন অসুবিধা হতো না?'

কোন উত্তর না দিয়ে প্রায় মিনিটখানেক লিন্ডা কর্নেল ওয়েস্টনের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'না হতো না।'

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি তাঁকে পছন্দ করতেন মাদমোয়াজেল?'

'হ্যাঁ করতাম।' বলল লিন্ডা। একটু থেমে আবার যোগ করলো, 'আর্লেনা আমার সঙ্গে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করতো।'

ওয়েস্টন অস্বস্তিপূর্ণ ঈষৎ সুরে বললেন, 'তাহলে চিরাচরিত 'নিষ্ঠুর সৎমা' তিনি ছিলেন না, অ্যাঁ?'

লিন্ডা নির্বিকারভাবেই মাথা নাড়লো।

'ভালো কথা। খুব ভালো কথা।' বললেন, ওয়েস্টন, 'কখনও কখনও, জানেন, ঈর্ষা ইত্যাদির কারণে সংসারে নানারকম অশান্তি দেখা দেয়। ধরুন, মেয়ে এবং বাপের মধ্যে হয়তো মধুর সম্পর্ক রয়েছে, সুতরাং বাবা নতুন বিয়ে-করা বউকে নিয়ে মেতে উঠলে মেয়ে একটু-আধটু বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ হলেও হতে পারে? তা সেরকম কিছু নিশ্চয়ই আপনার ক্ষেত্রে হয়নি?'

লিন্ডা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। তারপর স্পষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে জবাব দিলো, 'না হয়নি।'

ওয়েস্টন বললেন, 'আমার ধারণা, আপনার বাবা ইদানীং তাঁর স্ত্রীকে নিয়েই একটু বেশি—ইয়ে—ব্যস্ত ছিলেন...'

লিন্ডা শুধু বললো, 'আমি ঠিক জানি না,'

ওয়েস্টন বলে চললেন, 'আপনাকে যেমন বললাম, সব রকমের অশান্তিই সংসারে আসতে পারে... মানে —ঝগড়া, কথা কাটাকাটি—এই ব্যাপার আর কি। স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্কে যদি তিক্ততা আসে, তাহলে তাঁদের মেয়ের কাছে পরিস্থিতিটা ভীষণ অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। সে ধরনের কিছু কি এ ক্ষেত্রে হয়েছিলো?'

লিন্ডা স্পষ্ট স্বরে বলল, 'আপনি কি জানতে চাইছেন বাবা এবং আর্লেনা ঝগড়া করতো কি না?'

'হ্যাঁ—মানে—'

ওয়েস্টন আপন মনেই ভাবলেন : কি বিশ্রী ব্যাপার—একটা বাচ্চা মেয়েকে তার বাবার সম্পর্কে এই ধরনের প্রশ্ন করা—! লোকে যে কেন পুলিশের চাকরি নেয়! কিন্তু ছাই এ প্রশ্ন না করেও তো উপায় নেই!'

লিন্ডা নিশ্চিত স্বরে জবাব দিলো, 'না। বাবা কখনও কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না। তার স্বভাবই ওরকম নয়।'

ওয়েস্টন বললেন, 'মিস লিন্ডা, এবার আপনাকে যে প্রশ্নটা করবো, খুব ভেবেচিন্তে উত্তর দিন। আপনার সৎমাকে কে খুন করতে পারে এ সম্পর্কে আপনার কি কোন ধারণা আছে? এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু কি আপনি শুনেছেন অথবা জানেন?'

প্রায় এক মিনিট লিন্ডা নীরব রইলো। ওকে দেখে মনে হলো, খুব শান্তভাবে মনে মনে প্রশ্নটাকে ও বিবেচনা করে দেখেছে। অবশেষে ও মুখ খুললো, 'না,আর্লেনাকে কে খুন করতে চেয়েছে, জানি না'—একটু থেমে আবার যোগ করলো, 'অবশ্য মিসেস রেডফার্ন ছাড়া।'

ওয়েস্টন বললেন, অর্থাৎ, আপনার ধারণা মিসেস রেডফার্ন আপনার সৎমাকে খুন করতে চাইতেন? কেন?'

লিন্ডা বলল, 'কারণ তাঁর স্বামী আর্লেনার প্রেমে পড়েছিলেন। অবশ্য আমি বলছি না তিনি সত্যি সত্যি ওঁকে খুন করতে চাইতেন। মানে—তাঁর হয়তো মনে হতো আর্লেনা মরে গেলে খুব ভালো হয়—এই চিন্তা আর সত্যি সত্যি খুন করার নিশ্চয়ই এক জিনিস নয়, তাই কি?'

পোয়ারো নম্র স্বরে বললেন, 'না—মোটেও এক জিনিস নয়।'

লিন্ডা মাথা ঝুঁকিয়ে সমর্থন জানালো পোয়ারোর বক্তব্যকে। এক অদ্ভুত বিক্ষুব্ধ আবেগ ওর মুখমণ্ডলে ছায়া ফেলে গেলো। ও বললো, 'আর তাছাড়া, মিসেস রেডফার্নের পক্ষে এ ধরনের কাজ করা—মানে, কাউকে খুন করা সম্ভব নয়। কারণ, তিনি তেমন—ইয়ে—উগ্র প্রকৃতির নন, মানে—আমি বোধহয় ঠিক আপনাদের বোঝাতে পারছি না।'

ওয়েস্টন এবং পোয়ারো আশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন। দ্বিতীয়জন বললেন, 'আপনাদের কথা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, মাদমোয়াজেল লিন্ডা, এবং আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি সে ধরনের মহিলা নন, যাঁরা—আপনাদের প্রবাদ অনুযায়ী—অল্পেতেই 'রক্ত দর্শন' করেন। তিনি কখনোই—' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন পোয়ারো; অতি সন্তর্পণে শব্দ চয়ন করে বলে চললেন, '—মানসিক আবেগসঞ্জাত কোন ঝঞ্ঝায় বিচলিত হবেন না—যদিও তিনি দেখেন, তাঁর চোখের সামনে জীবন ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে

আসছে—সর্বদা ভেসে বেড়াচ্ছে একটা ঘৃণ্য মায়াবী মুখমণ্ডল, সুগঠিত শুভ্র গ্রীবা—অথবা হয়তো অনুভব করেছেন নিজের আক্রোশে মুষ্টিবদ্ধ হাত—এবং নরম শরীরে মরণ-স্পর্শে আকাঙ্ক্ষায় তাদের আকুল লিপ্সা। উহুঁ তা সত্ত্বেও তিনি বিচলিত হবেন না—'

পোয়ারো থামলেন।

লিন্ডা এক ঝটকায় টেবিলের কাছ থেকে সরে যেতে চাইলো। কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করলো, 'আমি তাহলে এখন যাই? আপনাদের কি আর কিছু জিগ্যেস করার আছে?'

কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ—নিশ্চয়ই যাবেন। আপনার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, মিস লিন্ডা।

তিনি উঠে এসে লিন্ডার জন্য দরজা খুলে ধরলেন। তারপর ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। একটা সিগারেট ধরালেন।'

'ওফ—' হাঁফ ছাড়লেন কর্নেল ওয়েস্টন, 'বড় বিশ্রী জিনিস, আমাদের এই পুলিশের চাকরি। বিশ্বাস করুণ মেয়েটাকে ওর বাবা এবং সৎমায়ের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করার সময় নিজেকে ভীষণ ছোটলোক মনে হচ্ছিল। বলতে গেলে ওকে যেন সরাসরি অনুরোধ করা হচ্ছে ওর বাবা গলায় ফাঁসির দড়িটা পরিয়ে দেবার জন্যে! অথচ এ কাজ না করেও তো উপায় নেই। খুন সব সময়েই খুন। আর এক্ষেত্রে লিন্ডাই একমাত্র ব্যক্তি যার পক্ষে সমস্ত ঘটনার প্রকৃত চরিত্র জানা সম্ভব। অবশ্য সে ব্যাপারে ও আমাদের তেমন কিছু বলতে না পারায় আমি একদিক দিয়ে খুশিই হয়েছি—'

পোয়ারো বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও সেইরকমই অনুমান করেছিলাম।'

অস্বস্তিভরে কাশলেন ওয়েস্টন। বললেন, প্রসঙ্গত বলি, মঁসিয়ে পোয়ারো, শেষ দিকে আপনি ওর সঙ্গে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছেন—অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। বিশেষ করে ওই আক্রোশে গলা টিপে ধরার লিপ্সার ব্যাপারটা। একটা অল্পবয়েসি মেয়েকে এ ধরনের কথা বলে প্রভাবিত করাটা বোধহয় ঠিক নয়।'

এরকুল পোয়ারো চিন্তাকুল চোখে তাঁর দিকে তাকালেন। বললেন, 'তাহলে আপনার ধারণা, আমার কথা ওকে প্রভাবিত করেছে?'

'হ্যাঁ। কেন, আপনার কি তাই মনে হয় না? এবারে একটু ঝেড়ে কাশুন দেখি!'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

ওয়েস্টন বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে প্রসঙ্গের পরিবর্তন করলেন। বললেন, 'মোটের ওপর ওর কাছ থেকে খুব কম কথাই আমরা জানতে পেরেছি। শুধু রেডফার্ন মহিলাটির একটা পুরোপুরি অ্যালিবাই পাওয়া গেলো, এই যা। ওরা যদি সাড়ে দশটা থেকে পৌনে বারোটা পর্যন্ত একসঙ্গে থেকে থাকে, তাহলে ক্রিস্টিন রেডফার্নকে সন্দেহের আওতা থেকে সরাসরি বাদ দিতে হয়। অর্থাৎ সন্দেহভাজন, ঈর্ষাপরায়ণ স্ত্রীর সসম্মানে নিষ্ক্রমণ।'

পোয়ারো বললেন, 'মিসেস রেডফার্নকে সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আরও জোরালো কারণ আমাদের হাতে রয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে কাউকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি শান্ত প্রকৃতির মহিলা, সহজে ধৈর্য হারান না। তাঁর কাছ থেকে গভীর অনুরাগ এবং অবিচল দৃঢ়তা আশা করা যায়, কিন্তু উষ্ণ রক্তপ্রসূত যে আবেগ এবং ক্রোধ, তা সম্পূর্ণ তাঁর চরিত্রের বিপরীত। উপরন্তু, তাঁর হাতের গড়ন অস্বাভাবিকরকম হালকা এবং ছোট।'

কলগেট বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। মিসেস রেডফার্নকে আমরা স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারি। কারণ ডাঃ নীসডন বলেছেন, যে দুটো হাতের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মিসেস মার্শাল মারা গেছেন, তাদের গড়ন মোটেই হালকা এবং ছোট নয়।'

ওয়েস্টন বললেন, 'তাহলে রেডফার্নদের ডাকা যাক। আশা করি মিঃ রেডফার্ন এতক্ষণে অনেকটা সামলে উঠেছেন।'

৩

প্যাট্রিক রেডফার্ন ইতিমধ্যে পুরোপুরি সামলে উঠেছে। তার কোটরগত চোখ, পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে তারুণ্যের ভাব সহসা প্রকট হয়ে উঠলেও ব্যবহারে সে এখন স্থৈর্য ফিরে পেয়েছে।

'আপনিই মিঃ প্যাট্রিক রেডফার্ন, ঠিকানা ক্রসগেটস, সেলডন প্রিন্সেস রিজবোরো?'

'হ্যাঁ—'

'মিসেস মার্শালের সঙ্গে আপনার পরিচয় কতদিনের?'

প্যাট্রিক রেডফার্ন প্রথমে একটু ইতস্তত করলো, তারপর জবাব দিলো, তিন মাসের—'

ওয়েস্টন বলে চললেন, 'ক্যাপ্টেন মার্শাল আমাদের বলেছেন, একটা ককটেল পার্টিতেই নাকি মিসেস মার্শালের সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ হয়। কথাটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ—প্রথম পরিচয় আমাদের ওইভাবেই।'

ওয়েস্টন বললেন, 'ক্যাপ্টেন মার্শাল কথা প্রসঙ্গে এরকম ইঙ্গিতই দিয়েছেন যে এখানে আসার আগে আপনার দুজনের ঘনিষ্ঠতা তেমন গভীর হয়নি—আশা করি কথাটা সত্যি, মিঃ রেডফার্ণ?'

আবারও প্রায় মিনিট খানেক ইতস্তত করলো প্যাট্রিক রেডফার্ন। তারপর বললো, 'হ্যাঁ—পুরোপুরি না হলেও আংশিক। কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, আর্লেনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আমার প্রায়ই হতো।'

'ক্যাপ্টেন মার্শালের অজান্তেই?'

রেডফার্নের মুখে রক্তিম আভাস পলকের জন্যে ঢেউ খেলে গেল। সে বললো, 'তিনি জানতেন কি জানতেন না তা আমি বলতে পারছি না।'

এবার পোয়ারো কথা বললেন। তিনি মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'আশা করি আপনার স্ত্রীও এ সম্পর্কে কিছু জানতেন না—?'

'যদ্দূর মনে পড়ছে, আমি ওকে কথায় কথায় একদিন বলেছিলাম, বিখ্যাত আর্লেনা স্টুয়ার্টের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।'

পোয়ারো সহজে সন্তুষ্ট হলেন না।

'কিন্তু আপনাদের ঘন ঘন মেলামেশার কথা নিশ্চয়ই তিনি জানতেন না?'

'কি জানি, হয়তো জানতো না।'

ওয়েস্টন বললেন, 'আপনাদের এই দ্বীপে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা কি আগে থাকতেই সাজানো ছিলো?'

রেডফার্ন মিনিটকয়েক নীরব রইলো। তারপর কাঁধ ঝাঁকালো।

'দেখুন—'বললো সে, 'আমার মনে হয়, আজ নয় কাল ব্যাপারটা জানাজানি হবেই। সুতরাং আপনাদের সঙ্গে ছলনা করে লাভ নেই। আর্লেনার জন্যে আমার বিচারবুদ্ধি, হিতাহিতজ্ঞান, সবই যেন লোপ পেয়েছিলো—আমাকে পাগল বলুন, মোহাচ্ছন্ন বলুন, আমার কোন আপত্তি নেই। ও চেয়েছিলো আমিও এই দ্বীপে বেড়াতে আসি, প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করলেও শেষে আমি রাজি হই। আমি—আমি—ওর অনুরোধে যে কোন কাজ করতেই প্রস্তুত ছিলাম; পুরুষদের ওপর ওর প্রভাব ছিলো এতই মারাত্মক।'

এরকুল পোয়ারো অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আপনি তাঁর চরিত্রের খুব স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন, মঁসিয়ে রেডফার্ন। তিনি ছিলেন পুরুষের কাছে চিরন্তন আকর্ষণের বস্তু-রুপোলি জলকন্যার মতো। এসম্পর্কে আমার কোন দ্বিমত নেই।'

প্যাট্রিক রেডফার্ণ তিক্তস্বরে বললো, 'পুরুষদের মধ্যে বিশেষ প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলতে ওর জুড়ি ছিলো না।' তারপর অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে বলে চললো, 'আপনাদের সঙ্গে আমি কিন্তু খোলাখুলি আলোচনা করছি—

আর কোন কিছু আমি লুকোতেও চাই না। তাতে লাভই বা কি? হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আর্লনা আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। ও আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতো কি না—তা জানি না। তবে ভালোবাসার ভানটুকু অন্তত করতো। ও সেই ধরনের মেয়ে, যারা কোন পুরুষের দেহ-মন জয় করার পর তার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। ও জানতো, আমি ওর প্রভাবে সম্পূর্ণ অন্ধ। আজ সকালে, পিক্সি কোভের সৈকতে, আমি যখন ওর মৃতদেহ আবিষ্কার করি তখন মনে হয়েছিলো যেন—' সে থামলো, '—যেন আমার মাথায় সারা আকাশ ভেঙে পড়েছে। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি—হয়ে গেছি স্তম্ভিত।'

পোয়ারো সামনে ঝুঁকে এলেন, 'আর এখন?'

প্যাট্রিক রেডফার্ণ স্থির চোখে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো।—বললো, 'যা সত্যি, সবই আপনাদের বললাম। এখন আমি জানতে জানতে চাই—এর কতটুকু আপনারা প্রকাশ্যে আনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন? কারণ আর্লেনার মৃত্যুর সঙ্গে এ সবের তো আর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোন যোগাযোগ নেই! আর এ ব্যাপারে যদি প্রকাশ্যে আলোচিত হয়, তাহলে আমার স্ত্রী ভীষন কষ্ট পাবে।

'ওহ্ হ্যাঁ—আমি জানি,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো প্যাট্রিক, 'আপনারা ভাবছেন, এতদিন স্ত্রীর খেয়াল আমার কোথায় ছিলো! হয়তো এ অভিযোগ একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু আসলে আমার স্ত্রীকে আমি খুব ভালোবাসি—যদিও এ কথা শুনে আপনারা আমাকে নিকৃষ্ট চরিত্রের ভন্ড বলেই ভাববেন, কিন্তু তবুও, বিশ্বাস করুন, ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। আর অন্য ব্যাপারটা—' কাঁধ ঝাঁকালো রেডফার্ন, 'ওটা নিছকই একটা পাগলামো-পুরুষেরা মাঝে মাঝে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় নির্বোধের মতো যে সব ভুল করে বসে, সেইরকম একটা ভুল! তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু ক্রিস্টিন আমার কাছে সম্পূর্ণ আলাদা। ওই আমার কাছে একমাত্র সত্যি। ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও, মনে মনে আমি জানি, ওই একমাত্র মানুষ যার গুরুত্ব আমার কাছে সবচেয়ে বেশি। 'রেডফার্ণ থামলো-দীর্ঘশ্বাস ফেলশো-এবং অপেক্ষাকৃত করুণ কণ্ঠে বললো, 'এ কথাগুলো যদি আপনাদের বিশ্বাস করাতে পারতাম!'

এরকুল পোয়ারো সামনে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন, 'কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। সত্যিই বিশ্বাস করি!'

প্যাট্রিক রেডফার্ন কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকালো। বললো, 'ধন্যবাদ।'

কর্নেল ওয়েস্টন সশব্দে গলা খাঁকারি দিলেন। বললেন, 'একটু আপনাকে কথা দিতে পারি, মিঃ রেডফার্ন যে অবান্তর প্রসঙ্গে আমরাও কখনও যাবো না। এই খুনের সঙ্গে মিসেস মার্শালের প্রতি আপনার ইয়ের ব্যাপারটার যদি কোন সম্পর্ক না থেকে থাকে, তাহলে সেটাকে প্রকাশ্যে টেনে আনার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না। কিন্তু যে জিনিসটা আপনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারছেন না, সেটা হলো ইয়ে মানে, আপনাদের এ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে খুনের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। হয়তো এই দৃষ্টিকোণ থেকেই, বুঝতেই পারছেন, খুনের উদ্দেশ্যটাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন বললো, 'খুনের উদ্দেশ্য?'

ওয়েস্টন বললেন, হ্যাঁ, মিঃ রেডফার্ন, খুনের উদ্দেশ্য! ক্যাপ্টেন মার্শাল সম্ভবত আপনাদের এ ব্যাপারটার কথা জানতেন না। এখন মনে করুন, হঠাৎই যদি তিনি জানতে পেরে থাকেন?'

রেডফার্ন বললো, 'ওঃ ভগবান! আপনি বলতে চান, তিনি তখন সব দেখে শুনে তাঁর স্ত্রীকে—স্ত্রীকে খুন করেন?'

পুলিশ-প্রধান অপেক্ষাকৃত শুষ্ক স্বরে বললেন, 'কেন, কথাটা আপনার কখনও মনে হয়নি?'

রেডফার্ন মাথা নাড়লো। বলল, 'না—আশ্চর্য! কথাটা আমি কিন্তু একবারও ভাবিনি। আপনি তো জানেন মার্শাল কিরকম শান্ত স্বভাবের লোক! আমি—মানে—এটাকে ঠিক সম্ভব বলে ভাবতে পারছি না।'

ওয়েস্টন প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, তাঁর স্বামীর প্রতি মিসেস মার্শালের আচরণ কিরকম ছিলো? ব্যাপারটা তাঁর স্বামীর কানে যেতে পারে, এই ভেবে তিনি কি কখনও—মানে, অস্বস্তি—অনুভব করতেন? নাকি এ

সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন?'

রেডফার্ন ধীর স্বরে জবাব দিলো, ও একটু—একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলো। ও চাইতো না, ওর স্বামী এ নিয়ে কোনরকম সন্দেহ করুক।'

'আচ্ছা, তাঁকে দেখে কি কখনও মনে হয়েছে যে স্বামীকে ভয় করেন?'

'ভয়? উহুঁ—আমার অন্তত তা মনে হয়নি।'

পোয়ারো মৃদু অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'মাপ করবেন, মঁসিয়ে রেডফার্ন, এ প্রসঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা কখনও ওঠেনি?'

প্যাট্রিক রেডফার্ন দৃঢ় নিশ্চয়তায় মাথা নাড়লো।

'ওহ্ না, এ ধরনের কথা কখনও ওঠেনি। প্রথম ক্রিস্টিন তো ছিলই; আর তাছাড়া,আর্লেনা কখনও সে কথা ভাবেনি—আমি জানি। মার্শালকে বিয়ে করে ও পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিল। মার্শাল বলতে গেলে—একজন রইল আদমী—হঠাৎই হাসলো রেডফার্ন, জমিদার, ওই সব ব্যাপার আর কি, তাছাড়া পয়সাকড়িও আছে। ও কখনও সম্ভাব্য স্বামী হিসেবে, আমার কথা ভাবেনি। ওর অনুগামী হতভাগ্য, অপদার্থ, মোহাবিষ্ট পুরুষদের তালিকায় আমি ছিলাম সর্বশেষ সংযোজন নিছকই সময় কাটানোর কোন জিনিস। আমি প্রথম থেকেই সব জানতাম, বুঝতাম কিন্তু আশ্চর্য, তাতেও ওর প্রতি আমার আকর্ষণ কখনও কমেনি...'

তার স্বর শেষ দিকে নিচু পর্দায় নেমে মিলিয়ে গেলো। বসে বসেই কি যেন ভাবতে লাগলো সে।

ওয়েস্টন তাকে সচকিত করে বর্তমান মুহূর্তে ফিরিয়ে আনলেন।

'আচ্ছা, মিঃ রেডফার্ন, আজ সকালে কি মিসেস মার্শালের সঙ্গে আপনার দেখা করবার কথা ছিলো?'

প্যাট্রিক রেডফার্নকে দেখে কিছুটা যেন বিহ্বল মনে হলো।

সে বললো, 'না, সেরকম কোন কথা ছিলো না। সাধারণত, সকাল বেলা আমাদের সৈকতেই দেখা হতো। ভেলায় চড়ে আমরা সমুদ্রে এদিক-ওদিকে ভেসে বেড়াতাম।'

'তাহলে, আজ সকালে তাঁকে বেলাভূমিতে না দেখে আপনি কি অবাক হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, হয়ে ছিলাম—ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। ওর এই না আসার কোন কারণই ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

'তখন আপনার কি মনে হলো?'

'কি আর মনে হবে! সারাক্ষণই ভাবছিলাম, এই হয়তো ও এসে পড়বে!'

'যদি তিনি অন্য কারো সঙ্গে কোথাও দেখা করবার ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে সে একজন কে আপনি জানতেন না?'

প্যাট্রিক রেডফার্ন হতভম্ব দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো।

'মিসেস মার্শালের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ আপনি কোথায় করতেন?'

'কখনও কখনও বিকেলের দিকে গাল কোভে ওর সঙ্গে দেখা হতো। আপনি তো জানেন, বিকেলবেলা গাল কোভে সূর্যের আলো থাকে না, সুতরাং বেড়াবার লোকের ভিড় ও তখনও কম হয়। ওখানে আমরা বার কয়েক দেখা করেছি।'

'অন্য কোভটায় কখনও যাননি? পিক্সি কোভে?'

'না। কারণ পিক্সি কোভটা দ্বীপের পশ্চিমদিকে হওয়ার ফলে পড়ন্ত সূর্যের আলো সেখানে অনেকক্ষণ থাকে। নৌকো, ভেলা ইত্যাদি নিয়ে অনেকেই ওখানে বেড়াতে যান। সুতরাং নির্জনতা সেখানেই নেই। আর, সকালেই দেখা করার চেষ্টা আমরা কখনও করিনি। তাতে আমাদের অনুপস্থিতিটা সহজেই সকলের নজরে পড়তো। বিকেলে প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, হয় ঘুমোয়, নয় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, অন্য কারও খবর কেউ রাখে না।'

ওয়েস্টন নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

প্যাট্রিক রেডফার্ন বলে চললো, 'কোন কোন সুন্দর রাতে, নৈশভোজের পর, আমরা দুজনে দ্বীপের অনেক অজানা অংশে পায়চারি করে বেড়িয়েছি—'

এরকুল পোয়ারো মৃদু স্বরে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ—জানি!' এবং প্যাট্রিক রেডফার্ন চকিত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালো তাঁর দিকে।

ওয়েস্টন বললেন, 'তাহলে আজ সকালে মিসেস মার্শালের পিক্সি কোভে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে আপনি কোনরকম আলোকপাত করতে পারছেন না?'

রেডফার্ন মাথা নাড়লো। তার কণ্ঠে প্রকৃত বিহ্বল সুর ফুটে উঠলো, 'বিশ্বাস করুন, এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, ব্যাপারটা আর্লেনার স্বভাবের সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খাচ্ছে না।'

ওয়েস্টন প্রশ্ন করলেন, 'এ অঞ্চলের কাছাকাছি তাঁর কোন বন্ধুবান্ধব ছিলো?'

'আমি চিনি এমন কেউ নেই ; উহুঁ—আমার বিশ্বাস, সেরকম কেউ বোধহয় ছিলো না।'

'মিঃ রেডফার্ন, এবারে খুব ভেবেচিন্তে এই প্রশ্নটার উত্তর দিন। মিসেস মার্শালকে আপনি লন্ডনে থাকতেই চিনতেন। সুতরাং তাঁর বন্ধু-বৃত্তের অনেকের সঙ্গেই হয়তো আপনার পরিচয় রয়েছে। তাঁদের মধ্যে এমন কাউকে কি জানেন, যাঁর মনে মিসেস মার্শালের প্রতি একটা বিদ্বেষ মনোভাব ছিলো? হয়তো এমন কেউ, যাঁকে স্থানচ্যুত করে আপনি মিসেস মার্শালের মনে জায়গা করে নিয়েছেন?'

প্যাট্রিক রেডফার্ন মিনিটকয়েক ভাবলো। তারপর মাথা নাড়লো।

'না', সে বললো, সেরকম কাউকে মনে পড়ছে না।'

কর্নেল ওয়েস্টন টেবিলে টোকা মেরে সৃষ্টি করলেন দ্রুত ছন্দের। অবশেষে চঞ্চল হাত থামিয়ে বলে উঠলেন, 'সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মাত্র তিনটে সম্ভাবনাই আমাদের হাতে রয়েছে। প্রথমটা কোন অজ্ঞাতপরিচয় খুনীর—জনৈক বিকৃত মানসিকতার ব্যক্তি, যে ঘটনাচক্রে স্থানীয় অঞ্চলে উপস্থিত ছিলো, আর ''স্থানীয় অঞ্চল'' বলতে নেহাৎ ছোট জায়গা নয়।'

তাঁকে বাধা দিয়ে রেডফার্ন বলে উঠলো, 'এবং আমার বিশ্বাস, এই সম্ভাবনাটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক।'

ওয়েস্টন মাথা নাড়লেন, বললেন, 'উহুঁ, এই খুনটা ঠিক 'পড়ে পাওয়া শিকার' ধরনের নয়। বিশেষ করে, পিক্সি কোভ জায়গাটা যখন রীতিমতো দুর্গম। হয়তো সেই লোকটিকে কংক্রিটের-সেতু পার হয়ে, হোটেলের পাশ দিয়ে এসে, গোটা দ্বীপটা অতিক্রম করে, মই বেয়ে পিক্সি কোভে নামতে হয়েছে—নয়তো সে এসেছে সমুদ্রের দিক দিয়ে—নৌকো বেয়ে। এবং এই দুটোর যে কোনটাই কোন আকস্মিক খুনের পক্ষে অস্বাভাবিক।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন বললে, 'আপনি বলছিলেন, তিনটে সম্ভাবনা রয়েছে—'

'উম্—হুঁ,' পুলিশ-প্রধান বললেন, 'কারণ, প্রথম সম্ভাবনা ছাড়া এই দ্বীপের মাত্র দুজন ব্যক্তি রয়েছেন, মিসেস মার্শালকে খুনের পেছনে যাঁদের জোরালো উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমজন তাঁর স্বামী—এবং দ্বিতীয়জন আপনার স্ত্রী।'

রেডফার্ন বিস্মিত অপলক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। দেখে মনে হলো, সে যেন এ কথায় সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। সে বললো, 'আমার স্ত্রী? ক্রিস্টিন?! আপনি বলতে চান এ খুনের পেছনে ক্রিস্টিনের হাত রয়েছে।'

সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। স'ব কথা একই সঙ্গে উচ্চারণের চেষ্টায় তার জিব জড়িয়ে এলো। উত্তেজিত অসংলগ্ন স্বরে সে বলে উঠলো। 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—তাই এ রকম ভুল বকছেন! শেষ পর্যন্ত ক্রিস্টিন? যা একেবারে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য—এমন কি রীতিমতো হাস্যকর!'

ওয়েস্টন বললেন, 'কিন্তু তবুও মিঃ রেডফার্ন, ঈর্ষা বড় সাংঘাতিক জিনিস। ঈর্ষার অন্ধ মহিলারা সময়ে সময়ে নিজেদের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।'

রেডফার্ন একান্ত-আন্তরিক সুরে বলে উঠলো, 'কিন্তু ক্রিস্টিনের কথা আলাদা। ও—ও মোটেই সে ধরনের মেয়ে নয়। হয়তো ও অসুখী—মানছি। কিন্তু তাই বলে কাউকে—ওঃ ওর মধ্যে এতটুকু উগ্রভাব নেই।'

এরকুল পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন। উগ্রপ্রকৃতি। ঠিক এই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন লিন্ডা মার্শাল। এবং তখনকার মতো, এখনও তিনি এই ধারণাকে মনে মনে সমর্থন জানালেন।

'আর তাছাড়া' আস্থার সুরে বলে চললো রেডফার্ন, 'এ সন্দেহ নিতান্তই অযৌক্তিক। কারণ আর্লেনা ক্রিস্টিনের চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ শক্তিশালী ছিলো। ক্রিস্টিন একটা বিড়ালছানাকে গলা টিপে মারতে পারবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—আর্লেনার মতো শক্তসমর্থ একজনকে খুন করা তো দূরের কথা! তার ওপর পাহাড়ের গায়ের ঝোলানো ওই মইটা বেয়ে ওর পক্ষে সমুদ্রতীরে নামা কখনও সম্ভব ছিলো না। জানেন তো, ক্রিস্টিন উঁচু জায়গা একদম সইতে পরে না। তাছাড়া—ওঃ, আপনারা কেন বুঝতে পারছেন না। পুরো ব্যাপারটাই একটা অবাস্তব, উদ্ভট কল্পনা!'

কর্নেল ওয়েস্টন অপ্রয়োজনেই বারকয়েক কান চুলকোলেন। বললেন, 'হ্যাঁ—মানে, সেভাবে দেখতে গেলে সম্ভাবনাটা অবাস্তব বলেই মনে হয় বটে—সে কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সর্বপ্রথম আমাদের বিচার করতে হবে খুনের উদ্দেশ্যে।' একটু থেমে তিনি আরও যোগ করলেন, 'উদ্দেশ্য এবং সুযোগ।'

৪

রেডফার্ন ঘর ছেড়ে নিষ্ক্রান্ত হতেই পুলিশ-প্রধান মৃদু-হাসি-সহকারে মন্তব্য করলেন, তাঁর স্ত্রীর যে একটা নিশ্ছিদ্র অ্যালিবাই রয়েছে, সেটা মিঃ রেডফার্নকে জানাবার প্রয়োজন মনে করলাম না। এ সম্পর্কে কি বলেন সেটাই আমার শোনবার ইচ্ছে ছিলো। দেখলাম, ব্যাপারটা তাঁকে বেশ জোরালো ঝাঁকুনি দিয়েছেন, তাই না?'

এরকুল পোয়ারো মৃদুস্বরে বললেন, মঁসিয়ে রেডফার্ন যে সব যুক্তিতর্ক আমাদের সামনে রেখেছেন, তাদের গুরুত্ব অ্যালিবাইয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

'হ্যাঁ, সে কথা মানছি—ক্রিস্টিন এ কাজ করেননি, তাঁর পক্ষে করা সম্ভবও ছিলো না! আর আপনার কথা অনুযায়ী, দৈহিক শক্তির দিক থেকে তো একেবারেই অসম্ভব! বরং মার্শালকে আমরা সন্দেহ করতে পারি—কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তিনিও নির্দোষ।'

ইন্সপেক্টর কলগেট কাশলেন, বললেন, 'একটা কথা, স্যর—ওই অ্যালিবাইটা নিয়ে আমি তখন থেকে ভাবছি। আমার মনে হয়, তিনি যদি স্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা আগেই করে থাকেন, তাহলে চিঠিগুলো আগে থাকতে টাইপ করে রাখাটা তাঁর পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়।'

ওয়েস্টন বললেন, কথা মন্দ বলোনি, কলগেট। ব্যাপারটা আমাদের খোঁজ করে—'

ক্রিস্টিন রেডফার্ন ঘরে ঢুকতেই মাঝপথে থমকে গেলেন তিনি।

ক্রিস্টিনের আচরণ, বরাবরের মতোই, শান্ত এবং যথাযথ। ওর পরনে দুধ-সাদা টেনিস-ফ্রক এবং হালকা-নীল সোয়েটার। এই পোশাক ওর শুভ্র বিবর্ণ সৌন্দর্যকে যেন আরও গভীরভাবে প্রকাশ করেছে। তবুও আপন মনেই ভাবলেন এরকুল পোয়ারো, ক্রিস্টিনের মুখমণ্ডলে নিবুদ্ধিতা বা দুর্বলতার লেশমাত্র ছায়াও নেই। বরং সেখানে স্বপ্রাচুর্যে উপস্থিত বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, সাহস এবং শুভ বাস্তববুদ্ধি। সপ্রশংসভাবে মাথা দোলালেন পোয়ারো।

কর্নেল ওয়েস্টন ভাবলেন, 'চমৎকার মহিলা। যদিও একটু কৃশ এবং দুর্বল প্রকৃতির। তবে ওর ছেনাল কচি গর্দভ স্বামীটির তুলনায় অনেক-অনেক ভালো। অবশ্য হ্যাঁ, ছেলেটার বয়স এখনও অল্প। আর মেয়েরার পুরুষদের সাধারণত একবারই বোকা বানায়।'

তিতি বললেন, 'বসুন, মিসেস রেডফার্ন। কিছু রুটিনমাফিক কাজ যে আমাদের সারতে হয়, তা তো জানেন। যেমন, প্রত্যেককে তাঁদের সকাল বেলার গতিবিধি সম্পর্কে বিশদভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে। অবশ্য সেটা নিছকই পুলিশি নথিভুক্ত করবার জন্যে।'

ক্রিস্টিন রেডফার্ন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

ও স্বভাবসিদ্ধ শান্ত সংযত স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই—। বলুন, কোত্থেকে আমাকে শুরু করতে হবে?'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'যত শুরু থেকে পারেন, মাদাম। প্রথম বলুন, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি কি করেছেন।'

ক্রিস্টিনের ফর্সা কপালে ভাঁজ পড়লো। ও বললো, 'দাঁড়ান, একটু ভাবতে দিন। আজ সকালে প্রাতরাশ সারতে যাওয়ার পথে আমি লিন্ডা মার্শালের ঘরে গিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে গাল কোভে যাওয়ার কথা ঠিক করতে। সাড়ে দশটায় নিচের হলঘরে আমরা দেখা করবো বলে কথা হয়।'

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, 'প্রাতরাশের আগে আপনি স্নান করেননি, মাদাম?'

'না অত সকালে খুব কম সময়েই আমি স্নান করি।' হাসলো ও, 'রোদের তাপে সমুদ্র বেশ গরম না হওয়া পর্যন্ত আমি জলে নামি না। মানে—আমি একটু শীতকাতুরে।'

'কিন্তু আপনার স্বামী তো প্রাতরাশের আগেই স্নান করেন—?'

'ওহ—হ্যাঁ। বলতে গেলে রোজই।'

'আর মিসেস মার্শাল, তিনিও?'

ক্রিস্টিনের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। ওর স্বরে হয়ে উঠল শীতল ও ঝাঁঝালো। ও বললো, 'না, মিসেস মার্শাল ছিলেন সেই ধরনের মানুষ যাঁরা মাঝবেলা না পেরোলে দর্শন দেন না।'

ঈষৎ বিভ্রান্তির সুরে এরকুল পোয়ারো বললেন, 'প্রাসঙ্গিক আলোচনার বাধা দেওয়ার জন্য দুঃখিত, মাদাম। আপনি বলছিলেন, প্রথমে আপনি মিস লিন্ডা মার্শালের ঘরে যান। আচ্ছা, তখন ক'টা বাজে?'

'দাঁড়ান, ভেবে দেখি...সাড়ে আটটা—না, তার চেয়ে কিছু বেশিই হবে।'

'মিস মার্শাল কি তখন ঘুম থেকে উঠেছেন?'

'হ্যাঁ। ও কোথায় যেন বেরিয়েছিলো।'

'বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ; ফিরে এসে ও বললো, ও নাকি স্নান করতে গিয়েছিলো।'

ক্রিস্টিনের কণ্ঠস্বরে একটা ক্ষীণ অত্যন্ত ক্ষীণ—অস্বস্তির সুর ফুটে উঠলো এরকুল পোয়ারোর মুখে বিহ্বলভাব ফুটে উঠলো।

ওয়েস্টন বললেন, 'তারপর?'

'আর প্রাতরাশের পর?'

'প্রাতরাশের পর ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম আনতে ওপরে যাই, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা হোটেল ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ি।'

'মানে আপনি এবং মিস লিন্ডা?'

'হ্যাঁ।'

'তখন ক'টা বাজে?'

'আমার মনে হয়, তখন প্রায় সাড়ে দশটা হবে।'

'তারপর কি করলেন?'

'আমরা গাল কোভে যাই। দ্বীপের পূর্বদিকে, সমুদ্রের কোল ঘেঁষে যে জায়গাটা আছে। সেখানে গিয়ে আয়েস করে বসি. আমি ছবি আঁকাতে থাকি, আর লিন্ডা সূর্যস্নানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।'

গাল কোভ ছেড়ে আপনারা ফিরলেন কখন?'

'পৌনে বারোটা নাগাদ। কারণ বারোটায় আমার টেনিস খেলার কথা ছিলো, এবং স্বাভাবিকভাবেই পোশাক পালটানোর ঝঞ্ঝাটও ছিলো।'

'আপনার সঙ্গে ঘড়ি ছিলো?'

'না, সত্যি কথা বলতে কি ছিলো না। আমি লিন্ডাকেও সময় জিগ্যেস করেছিলাম।'

'ও—। তারপর?'

ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে আমি হোটেলে ফিরে আসি।'

পোয়ারো বললেন, 'আর মাদামোয়াজেল লিন্ডা?'

'লিন্ডা; ও লিন্ডা সমুদ্রে স্নান করতে নামে।'

পোয়ারো আবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি সমুদ্র থেকে অনেকটা দূরে বসেছিলেন?'

'হ্যাঁ—জোয়ার-রেখার অনেকটা ওপরে আমরা বসেছিলাম। আমি ছিলাম ঝুলন্ত পাহাড়ের ঠিক নিচে, ছায়াতে—আর লিন্ডা একটু দূরে, রোদে শুয়ে ছিলো।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনি সৈকত ছেড়ে আসার আগেই কি লিন্ডা মার্শাল জলে নেমেছিলেন?'

স্মৃতির মণিকোঠা অনুসন্ধানে ক্রিস্টিনের ভুরু কুঞ্চিত হলো। ও বললো, 'দাঁড়ান। একটু ভেবে দেখি। ও সমুদ্রতীর ধরে জলের কিনারায় ছুটে গেলো—আমি বাক্স বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালাম—হ্যাঁ, ফিরে আসার পথে আমি ওর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ শুনেছিলাম।'

'এ নিয়ে আপনার মনে কোন সন্দেহ নেই, তো মাদাম? যে সত্যিই মাদমোয়াজেল লিন্ডা জলে নেমেছিলেন?'

'হ-হ্যাঁ।'

ক্রিস্টিন বিস্ময়ে অপলকে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো।

কর্নেল ওয়েস্টনও বিহ্বল বিমূঢ় বিমূঢ় চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে। অবশেষে তিনি বললেন, 'বলে যান, মিসেস রেডফার্ন—তারপর?'

'আমি হোটেলে ফিরে খেলার পোশাক পরে টেনিস কোর্টে উপস্থিত হই। সেখানেই অন্যান্যদের সঙ্গে আমার দেখা হয়!'

'অন্যান্যরা বলতে?'

'ক্যাপ্টেন মার্শাল, মিঃ গাডেনার এবং মিস ডার্নলি। আমরা দু'সেট শেষ করে সবে তৃতীয় সেট শুরু করেছি, এমন সময় খবরটা এলো—মানে, মিসেস মার্শালের মৃত্যু সংবাদটা।'

এরকুল পোয়ারো সামনে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন, 'খবরটা শুনে আপনার কি মনে হলো মাদাম।'

'কি মনে হলো?' ওর মুখমণ্ডলে প্রশ্নটার প্রতি একটা ক্ষীণ বিতৃষ্ণার ভাব ছায়া ফেললো।'

'হ্যাঁ—'

'ক্রিস্টিন রেডফার্ন ধীর স্বরে জববা দিলো, 'খবরটা শুনে—ঘটনাটা একটা জঘন্য বীভৎস ব্যাপারে বলে মনে হয়েছিলো।'

'আপনার রুচিশীল মন একটা মানসিক বিদ্রোহ করে উঠেছিলো, সেটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ঘটনাটা শুনে আপনার কি মনে হয়েছে—ব্যক্তিগতভাবে?'

ক্রিস্টিন চকিত নয়নে তাঁর দিকে তাকালো—ওর দৃষ্টিতে সনির্বন্ধ অনুরোধের ইশারা। পোয়ারো এই নীরব ইশারায় সাড়া দিলেন। সহজ সরল স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'মাদাম, জনৈকা বুদ্ধিমতী, সুপ্রচুর শুভ বাস্তব বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি-সম্পন্না মহিলা হিসেবেই আপনাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অনুরোধ করছি। মিসেস মার্শাল, অথবা তিনি কি ধরনের মহিলা সে সম্পর্কে আপনার নিজস্ব একটা ধারণা নিশ্চয়ই একদিনে গড়ে উঠেছে?'

ক্রিস্টিন সতর্ক সুরে বলল, 'আমার মনে হয়, হোটেলে থাকাকালীন অন্যান্য অতিথিদের সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা প্রত্যেকের মনেই গড়ে ওঠে।'

'নিশ্চয়ই আর সেটাই চরম স্বাভাবিক। সুতরাং আমি জানতে চাই মাদাম, মিসেস মার্শালের এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে আপনি কি খুব অবাক হয়েছিলেন?'

ক্রিস্টিন ধীরে ধীরে বললো, 'আপনি কি বলতে চান, সেটা সম্ভবত আমি বুঝতে পেরেছি। না, অবাক হয়তো হইনি। বরং একটা আকস্মিক আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু উনি ছিলেন সেই ধরনের মহিলা—'

পোয়ারো ওর কথা শেষ করলেন, 'মিসেস মার্শাল ছিলেন সেই ধরনের মহিলা যাঁদের জীবনে এই পরিণতিই স্বাভাবিক...হ্যাঁ, মাদাম, আজ সারা সকালে এ ঘরে উচ্চারিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং চরম সত্য বক্তব্য এইটাই। সমস্ত—ইয়ে, ব্যক্তিগত এই শব্দটায় সযত্নে জোর দিলেন তিনি। আবেগপ্রবণতাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে বলুন তো, মাদাম, মৃতা মিসেস মার্শাল সম্পর্কে আপনি সত্যি সত্যি কি ভাবেন?'

ক্রিস্টিন রেডফার্ন শান্ত কণ্ঠে বললো, 'এ সব অবান্তর প্রসঙ্গে যাওয়ার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন আছে?'

'আমার মনে হয়, হ্যাঁ, আছে।'

'কিন্তু আমি কি বা বলবো?' ক্রিস্টিনের শুভ্র ত্বকে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়লো রক্তিম আভা। ওর আচরণের সর্তক ভারসাম্য শিথিল হয়ে এলো। এবং ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিলো ওর আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক চিরন্তন এক নারী। 'উনি ছিলেন সেই ধরনের মহিলা যাঁরা আমার মতে একেবারে অপদার্থ! নিজের অস্তিত্বের সমর্থনে কোন কাজই উনি করতেন না। ওঁর মন বলেও কিছু ছিলো না...বুদ্ধি তো দূরের কথা! শুধু ভাবতেন পুরুষ, পোশাক এবং প্রেম...এই তিনটে জিনিসের কথা। উনি ছিলেন সমাজের এক স্বার্থপর পরগাছা মাত্র! পুরুষের কাছে ওর আকর্ষণ ছিলো, একথা অস্বীকার করি না...আর নিঃসন্দেহে সেটাই ছিলো ওঁর এক ও একমাত্র গুণ। এবং এ ধরনের জীবনই উনি পছন্দ করতেন। সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, ওঁর এই আকস্মিক পরিণতিতে আমি ঠিক অবাক হইনি। ওঁর মতো চরিত্রের মেয়েরাই ব্ল্যাকমেল—ঈর্ষা-হিংসা—প্রভৃতি নোংরা আবেগসংক্রান্ত জঘন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। মানুষের নীচ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে ওঁর—জুড়ি ছিলো না...'

ক্রিস্টিন থামালো। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত লয়ে বইছে: ঘৃণাজনিত বিরক্তিতে ওষ্ঠ স্ফুরিত। কর্নেল ওয়েস্টনের মনে হলো, আর্লেনা স্টুয়ার্টের সঙ্গে চারিত্রিক বৈসাদৃশ্যের সম্পূর্ণতায় রেডফার্নের চেয়ে যোগ্যতর কাউকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাঁর এও মনে হলো, ক্রিস্টিন রেডফার্নের সঙ্গে বিবাহিত পুরুষের কাছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হয়তো এতই স্বচ্ছ মনে হবে যে এই পৃথিবীর আর্লেনা স্টুয়ার্টদের আকর্ষণকে সে কখনই এড়াতে পারবে না।

এবং হঠাৎই, এই চিন্তাস্রোতের মাঝে ক্রিস্টিনের উচ্চারিত একটা শব্দ তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করলো।

তিনি সামনে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন, 'মিসেস রেডফার্ন, মিসেস মার্শালের কথা বলতে গিয়ে আপনি হটাৎই 'ব্ল্যাকমেল' শব্দটার উল্লেখ করলেন কেন?'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

ক্রিস্টিন অভিব্যক্তিহীন চোখে অপলকে চেয়ে রইলো কর্নেল ওয়েস্টনের দিকে। মনে হলো তাঁর কথার নিহিত তাৎপর্য ও উপলব্ধি করতে পারেনি। ও যান্ত্রিক সুরে জবাব দিলো, 'না—মানে, কেউ সম্ভবত ওঁকে ব্ল্যাকমেল করছিলো। ওঁর মতো মেয়ের জবাব দিলো, 'না মানে, কেউ সম্ভবত ওঁকে ব্ল্যাকমেলে করছিলো। ওঁর মতো মেয়ের পক্ষেই তো ব্ল্যাকমেল হওয়াটা স্বাভাবিক।'

ব্যগ্র সুরে প্রশ্ন করলেন কর্নেল ওয়েস্টন, 'কিন্তু...আপনি কি জানেন, কেউ তাঁকে ব্ল্যাকমেল করছিলো?'

ওর গালে ছড়িয়ে পড়লো রক্তিম আভা। অপ্রতিভ স্বরে ও বলে উঠলো, 'সত্যি কথা বলতে কি, ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা আমি জানতে পারি। একদিন হঠাৎই কিছু কথা আমার কানে আসে—'

'আর একটু বিশদভাবে বললে ভালো হয়, মিসেস রেডফার্ন—'

আরও এক ঝলক রক্তিম আভা ছড়িয়ে গেলো ক্রিস্টিন রেডফার্নের মুখে। ও বললে, 'আমি—আমি কথাগুলো মোটেই শুনতে চাইনি। মানে—ব্যাপারটা বলতে গেলে নিছকই একটা দুর্ঘটনা। ঘটনাটা ঘটে দুদিন—না তিনদিন আগে, রাতে। আমরা তখন ব্রীজ খেলছিলাম।' ও ফিরলো পোয়ারোর দিকে, 'আপনার মনে আছে? আমি এবং আমার স্বামী, আর আপনি এবং মিস ডার্নলি—এই চারজনে মিলে তাস খেলছিলাম? আমি সেই দানটায় ডামি ছিলাম। ঘরে বদ্ধ আবহাওয়ায় আমার শ্বাস যেন বন্ধ হয়েও আসছিলো। তাই একটু খোলামেলা ঠান্ডা হাওয়ার লোভে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। সমুদ্রতীরে উদ্দেশ্যে নেমে চলেছি, কানে এলো কারও কণ্ঠস্বর। একটি স্বর—আর্লেনা মার্শালের, শুনেই চিনতে পেরেছি. তখন বলে চলেছে, 'আমাকে শুধু শুধু চাপ দিয়ে কোন লাভ নেই। আর টাকার যোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার স্বামী সন্দেহ করে বসবে।' আর তারপর কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, 'ওসব ছেঁদো কথায় আমি ভুলছি না। যেমন করে হোক টাকা আমার চাই।' তখন আর্লেনা মার্শাল বললেন, 'নীচ, ইতর, জানোয়ার কোথাকার!' আর লোকটা বললো, 'জানোয়ার হই আর নাই হই, দেবী, টাকা তোমাকে দিতেই হবে!'

ক্রিস্টিন একটু থামলো।

'আমি তখন হোটেলের দিকে ফিরলাম। মিনিটখানে পরেই আর্লেনা মার্শাল ঝড়ের বেগে আমাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। ওঁকে দেখে ভীষণ বিচলিত বলে মনে হলো।'

ওয়েস্টন বললেন, 'আর লোকটা? আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন?'

ক্রিস্টিন রেডফার্ন মাথা নাড়লো, বললো, 'না। সে খুব নিচু স্বরে কথা বলছিলো। তার কথাগুলো আমি কোনরকমে, অস্পষ্টভাবে শুধু শুনতে পেয়েছি মাত্র।'

'সেটা আপনার চেনা কোন লোকের গলা বলে মনে হয়নি?'

ক্রিস্টিন কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর আবার মাথা নাড়লো।

ও বললো, 'উহুঁ—ঠিক বলতে পারছি না। কারণ সে গলার স্বর খুব অস্পষ্ট এবং কর্কশ ছিলো। সে স্বর—মানে, কি বলবো?—যে কোন লোকের হতে পারে।'

কর্নেল ওয়েস্ট বললেন, ধন্যবাদ, মিসেস রেডফার্ন।'

২

ক্রিস্টিন রেডফার্ন নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর দরজা বন্ধ হতেই ইন্সপেক্টর কলগেট বললেন, 'যাক, এতক্ষণে একটু আলোর ইশারা পাওয়া গেলো।'

ওয়েস্টন বললেন, 'তোমার কি তাই মনে হচ্ছে, হুঁ?'

'হ্যাঁ, মানে, ব্যাপারটা বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ, স্যার—এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। এই হোটেলেরই কোন বাসিন্দা মৃতা মহিলাটিকে সযত্নে ব্ল্যাকমেলা করছিলো।'

পোয়ারো মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত ব্ল্যাকমেলার মোটেই নিহত হয়নি। মারা গেছে তার শিকার।'

'হুঁ, এটা একটু অস্বাভাবিক মানছি।' বললেন ইন্সপেক্টর, 'কারণ ব্ল্যাকমেলারা কখনও তাদের শিকারকে খুন করে বেড়ায় না। কিন্তু এই ঘটনা থেকে আজ সকালে মিসেস মার্শালের অদ্ভুত আচরণের একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ভেসে ওঠে। তিনি আজ সেই অজ্ঞাত ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন, এবং সঙ্গত কারণেই তিনি চাননি, এ ঘটনা তাঁর স্বামী অথবা রেডফার্ন জানতে পারুক।'

হ্যাঁ, এ থেকে ওই ব্যাপারটা অন্তত স্পষ্ট হচ্ছে।' সমর্থন জানালেন পোয়ারো।

ইন্সপেক্টর কলগেট বলে চললেন, 'আর একবার ভাবুন তো গোপন সাক্ষাৎকারে জায়গাটার কথা! উপযুক্ত কাজের উপযুক্ত স্থানই বটে। মিসেস মার্শাল তাঁর ভেলায় চড়ে ভেসে পড়লেন। এবং তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এ তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস। তিনি ডাইনে বাঁক নিয়ে পিক্সি কোভের উদ্দেশে রওনা হন, যেখানে সকালের দিকে কেউ কখনও যায় না এবং তাঁর গোপন সাক্ষাৎকারের পক্ষে এক শান্ত, সুন্দর জায়গা।'

পোয়ারো বললেন, 'হ্যাঁ, এ কথাটা আমারও মনে হয়েছিলো। জায়গাটা, আপনি যা বললেন, গোপন সাক্ষাৎকারের পক্ষে এক আদর্শ মিলনস্থল। জায়গাটা নির্জন, এবং দ্বীপের দিক থেকে ওখানে পৌঁছবার একমাত্র পথ পাহাড়ের গা থেকে ঝোলানো ইস্পাতের মইটা ব্যবহার করা, যা সকলের কর্ম নয়।—তার ওপর ঝুলন্ত পাহাড়ের ঠিক নিচে অবস্থিত হওয়ার, ওপর থেকে বেলাভূমির অধিকাংশই থেকে যায় পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য। এছাড়া, আরও একটা সুবিধে পিক্সি কোভের আছে, যেটার কথা মিঃ রেডফার্ন একদিন আমাকে বলেছিলেন। ওখানে নাকি একটা গুপ্ত গুহা আছে, যার প্রবেশ পথ খুঁজে পাওয়া নেহাৎ সহজ নয়, কিন্তু সেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে যে কেউ অতি স্বচ্ছেন্দে কারও অপেক্ষা করতে পারে।'

ওয়েস্টন বললেন, 'হ্যাঁ, পিক্সি গুহা—ওটা সম্পর্কে বেশ কিছু কথা শুনেছি বলে মনে পড়ছে।'

ইন্সপেক্টর কলগেট বললেন, 'অবশ্য বহু বছর ধরে এই গুহা প্রসঙ্গ একেবারে চাপা পড়েছিলো। জায়গাটা আমাদের একবার সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা উচিত। বলা যায় না, তেমন কোন সূত্র-টুত্র পেয়ে গেলেও পেয়ে যেতে পারি।'

ওয়েস্টন বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক, কলগেট, এ সমস্যার প্রথম অংশের সমাধান আমরা করতে পেরেছি। মিসেস মার্শাল পিক্সি কোভে কেন গিয়েছিলেন? অবশ্য, এখন দ্বিতীয় অংশের উত্তরটা আমাদের প্রয়োজন। সেখানে তিনি কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন? অনুমান করা যায়, সেই ব্যক্তি হোটেলের অতিথিদেরই একজন। তাঁদের কাউকেই প্রেমিকের ভূমিকায় ঠিক মানায় না—কিন্তু ব্ল্যাকমেলারের প্রশ্ন উঠলে অন্য কথা।'

হোটেলের অতিথি-তালিকার খাতাটা তিনি কাছে টেনে নিলেন।

'হোটেলের পরিচারক, চাকর ইত্যাদি, যাদের আমি সন্দেহভাজন বলে মনে করি না, তাদের বাদ দিলে বাকি থাকেন এঁরা : মার্কিন ভদ্রলোক গার্ডেনার, মেজর ব্যারী, মিঃ হোরেস ব্ল্যাট এবং ধর্মযাজক স্টিফেন লেন।'

ইন্সপেক্টর কলগেট বললেন, 'আমরা এই সন্দেহের পরিধিকে আরও সংক্ষিপ্ত করে আনতে পারি, স্যর। কারণ, আজ সারা সকালটা মিঃ গার্ডেনার সমুদ্রতীরেই উপস্থিত ছিলেন। তাই তো মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো উত্তর দিলে, 'শুধু মাঝে অল্প সময়ের জন্য উঠে গিয়েছিলেন, স্ত্রীর জন্য একটা উলের গোছা নিয়ে আসতে।'

কলগেট বললেন, 'ওহ, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।'

মেজর ব্যারী আজ সকাল দশটায় বেরোন, এবং ফিরে আসেন দেড়টা নাগাদ। মিঃ লেন বেরোন আরও সকালে।আটটার সময় তিনি প্রাতরাশ সারেন। বলেন, একটু 'পদব্রজে' ভ্রমণে যাচ্ছেন। মিঃ ব্ল্যাট প্রায়

রোজকার মতোই সাড়ে ন'টা নাগাদ তাঁর নৌকো নিয়ে বেরোন। এখনও পর্যন্ত তাঁরা কেউই ফেরেননি।'

'নৌকো নিয়ে বেরিয়েছেন, হুঁ?' কর্নেল ওয়েস্টনের স্বরে গভীর চিন্তায় ছোঁয়া।

ইন্সপেক্টর কলগেট সেই ইঙ্গিতে সাড়া দিয়ে বলে উঠলেন। 'আমাদের সন্দেহের কাঠামোয় এই ভদ্রলোক চমৎকার মানিয়ে যাচ্ছেন, স্যার।'

ওয়েস্টন বললেন, 'আচ্ছা, এই ব্ল্যাট ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরা একবার কথা বলে দেখবো—দেখি, আর কে কে বাকি রইলো? রোজামণ্ড ডার্নলি। আর ওই ব্রুস্টার মহিলা, যিনি রেডফার্নের সঙ্গে মিসেস মার্শালের মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। আচ্ছা, এই মহিলাটি কিরকম, কলগেট?'

বেশ বুদ্ধিমতী মহিলা, স্যার। পরিচ্ছন্ন পরিপাটি।'

'এই মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কি?'

ইন্সপেক্টর মাথা নাড়লেন।

'যতদূর জানি, এ সম্পর্কে আমাদের বলার মতো আর কোন খবর তাঁর কাছে নেই, কিন্তু তবুও আমাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া রয়েছেন ওই মার্কিন ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী।

কর্নেল ওয়েস্টন মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালেন। বললেন, 'ওঁদের সবাইকেই এখানে আসতে বলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা যাক। বলা যায় না, তেমন কোন খবর পেলেও পেয়ে যেতে পারি। আর কিছু না হোক অন্তত ওই ব্ল্যাকমেল সম্পর্কে হয়তো কিছু জানা যাবে।

৩

পরস্পরকে সঙ্গী করে মিঃ এবং মিসেস গার্ডেনার আরক্ষী-প্রধানের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই বিশদ ব্যাখ্যায় ব্যস্ত হলেন মিসেস গার্ডেনার।

'আশা করি আমাদের অবস্থাটা আপনি বুঝতে পারছেন, কর্নেল ওয়েস্টন (ওয়েস্টন তো আপনার নাম, তাই না?)' শেষোক্ত বিষয়ে সম্মতি ও আশ্বাস পেয়ে তিনি বলে চললেন, 'ঘটনার আকস্মিকতার আমি ভীষণ একটা মানসিক আঘাত পেয়েছি, আর মিঃ গার্ডেনার আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বরাবরই ভীষণ সতর্ক—'

মিঃ গার্ডেনার মাঝপথে কথা বললেন, 'মিসেস গার্ডেনার অত্যন্ত অনুভূতিশীল।'

'—তখন তিনি আমাকে বললেন, 'ক্যারি, তুমি কক্ষনো একা যাবে না; আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।' অবশ্য তার মনে এই নয় যে ব্রিটিশ পুলিশের তদন্ত পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা নেই, বরং ঠিক তার উলটো। শুনেছি, তদন্তের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুলিশের পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও উন্নত মানের, এবং আমি মনে প্রাণে তা বিশ্বাস করি, আরও বিশেষ করে যখন স্যাভয় হোটেলে আমার একটা ব্রেসলেট হারিয়ে গেলো, তখন যে ছেলেটি তদন্তের প্রয়োজনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, তার মতো সহানুভূতিপূর্ণ ভদ্র ব্যবহার আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি, আর ব্রেসলেটটাও সত্যি সত্যি হারায়নি, আমি ভুল করে কোথায় রেখেছিলাম, সব সময় তাড়াহুড়ো করার এই অসুবিধে, কোথায় কখন কি রাখি কিছুই মনে থাকে না—' মিসেস গার্ডেনার থামলেন, ধীর শ্বাস নিলেন, এবং পুনরায় সরব হলেন, 'আর আমি যা বলতে চাই, এবং আমি জানি মিঃ গার্ডেনারও আমার সঙ্গে একমত হবেন, তা হলো ব্রিটিশ পুলিশকে তদন্তে যে কোনভাবে সাহায্য করার জন্যে আমরা সর্বদাই উদগ্রীব। সুতরাং বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না করে আপনারা আমার কাছে যা জানতে চান জিগ্যেস করুন—'

কর্নেল ওয়েস্টন এই আমন্ত্রণে সারা দিয়ে মুখ খুলছিলেন, কিন্তু মিসেস গার্ডেনার কথা বলতে থাকায় সে চেষ্টায় বিরত হলেন।

'সেই কথাই আমি বলেছিলাম, তাই না, ওডেল? আর বলছিও ঠিক তাই না?'

'হ্যাঁ, সোনা, বললেন, মিঃ গার্ডেনার।

কর্নেল ওয়েস্টন ঝটিতি বলে উঠলেন, 'মিসেস গার্ডেনার, শুনলাম আপনি এবং আপনার স্বামী আজ সারা সকালটা সমুদ্রতীরেই কাটিয়েছেন?'

সম্ভবত এই প্রথম মিঃ গার্ডেনার স্ত্রীকে পরাস্ত করে প্রথমে কথা বলতে পারলেন।

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।' তিনি বললেন।

'নিশ্চয়ই, সেখানেই তো ছিলাম আমরা,' মিসেস গার্ডেনার বললেন, 'কি সুন্দর, শান্ত ছিলো আজকের সকালটা, ঠিক অন্য দিনগুলোর মতোই, হয়তো তার চেয়েও স্বাভাবিক; আশা করি বুঝতে পারছেন, কি বলতে চাইছি; আর আমরা ঘুণাক্ষরেও টের পারিনি, বাঁক পেরিয়ে ওই নির্জন সৈকতে কি কাণ্ডটাই না ঘটে চলেছে।'

'মিসেস মার্শালকে আজ সারা দিনে আপনারা কখনও দেখেছেন?'

'না—দেখিনি। আর সেইজন্যেই তো ওডেলকে বলছিলাম, মিসেস মার্শাল আজ সকালে কোথায় যেতে পারেন। আর প্রথমে খোঁজ করতে এলেন তাঁর স্বামী, তাঁরপর এলো ওই সুদর্শন ছেলেটি, মিঃ রেডফার্ন, আর সে যা অধৈর্য হয়ে পড়েছিলো কি বলবো! সৈকতে বসে প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে খালি বিরক্তভাব করছে। তখন আমি মনে মনে বললাম, নিজের অমন সুন্দরী, চমৎকার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার কি ওই সাংঘাতিক মেয়ে ছেলেটার পেছনে না দৌড়লে চলছিলো না? কারণ মেয়েটাকে আমার সাংঘাতিক বলেই মনে হতো। ওর সম্পর্কে আমার ধারণা বরাবরই ওই রকম তাই না, ওডেল?'

'হ্যাঁ, সোনা।'

'ক্যাপ্টেন মার্শালের মতো এমন চমৎকার একজন ভদ্রলোক যে কি করে এ ধরনের একটা মেয়েছেলেকে বিয়ে করে বসলেন, তা কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না—তাছাড়া তাঁর মেয়ে এখন বড় হচ্ছে, আর মেয়েদের বাড়ন্ত বয়েসের মুখে প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। মিসেস মার্শাল ঠিক সেরকম মানুষ ছিলেন না—কোন শিক্ষা-দীক্ষা নেই—আর আমি বলবো, আচরণে ঠিক পশুর মতো। ক্যাপ্টেন মার্শালের যদি সামান্যতম বাস্তব বুদ্ধি থাকতো, তাহলে তিনি মিস ডানলির মতো সুন্দরী এবং সম্মানিতা মহিলাকেই বিয়ে করতেন। একথা মানতেই হবে, যেভাবে তিনি জীবনে এগিয়ে গেছেন এবং প্রথম শ্রেণীর একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন, তা রীতিমতো প্রশংসার যোগ্য। এ কাজে বুদ্ধির প্রয়োজন—আর রোজামণ্ড ডার্নলির দিকে এক পলক তাকালেই আপনি বুঝতে পারবেন, তাঁর বুদ্ধির অভাব নেই! যে কোন কাজ পরিকল্পনামাফিক সুষ্ঠুভাবে শেষ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। আমি যে তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করি তা বলে বোঝাতে পারছি না। আর, এই তো সেদিন আমি মিঃ গার্ডেনারকে বলছিলাম, মিস ডার্নলি যে ক্যাপ্টেন মার্শালের প্রেমে অন্ধ, তা যে কোন লোকেরই চোখে পড়বে—বলেছিলাম, ক্যাপ্টেন মার্শালকে মেয়েটা ভীষণ ভালোবাসে, বলিনি, ওডেল?'

'হ্যাঁ, সোনা।'

'শুনেছি, ওঁরা নাকি ছোটবেলা থেকেই পরস্পরকে চিনতেন, আর এখন, কে বলতে পারে, ওই নোংরা মেয়েছেলেটার চিরতরে সরে যাওয়ায় ওঁদের আন্তরিক ইচ্ছে পূর্ণ হবে না! আমাকে মোটেই সংকীর্ণমনা ভাববেন না, কর্নেল ওয়েস্টন, আর এও নয় যে অভিনয় আমি অপছন্দ করি—কেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অনেকেই তো অভিনয় নিয়ে আছেন—কিন্তু মিঃ গার্ডেনারকে আমি বরাবরই বলেছি, ওই মেয়েটার মধ্যে কোথায় যে একটা অশুভ ছায়া লুকিয়ে আছে। আর এখন দেখতেই পাচ্ছেন, যে আমার কথাই ঠিক হলো।'

বিজয়ীর উল্লসিত অভিব্যক্তি নিয়ে থামলেন মিসেস গার্ডেনার।

এরকুল পোয়ারোর ঠোঁটে ফুটে উঠলো ছোট্ট হাসির রেখা। তাঁর চোখ কিছুক্ষণের জন্য অপলকে চেয়ে রইলো মিঃ গার্ডেনারের বিচক্ষণ ধূসর চোখের তারায়।

কর্নেল ওয়েস্টন মরিয়া হয়েই বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, ধন্যবাদ, মিসেস গার্ডেনার। তাহলে আপনারা কেউই এমন কিছু দেখেননি। যার সঙ্গে এই খুনের কোন সম্পর্ক আছে?'

'উহুঁ—সেরকম কিছু আমাদের নজরে পড়েছে বলে মনে হয় না।' মিঃ গার্ডেনার থেমে থেমে জবাব দিলেন, 'মিসেস মার্শাল বেশির ভাগ সময়েই রেডফার্ন ছেলেটার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন—কিন্তু সে কথা তো যে কেউ আপনাদের বলবে।'

'কিন্তু তাঁর স্বামী? আপনার কি মনে হয়, তিনি এতে অসন্তুষ্ট হতেন?'

মিঃ গার্ডেনার সতর্ক সুরে বললেন, 'ক্যাপ্টেন মার্শাল খুব চাপা স্বভাবের মানুষ। বাইরে থেকে দেখে তাঁর মনের কথা বোঝা যায় না।'

মিসেস গার্ডনার এ বক্তব্যের সমর্থনে মন্তব্য করলেন, 'হ্যাঁ, তিনি যাকে বলে একেবারে খাস ইংরেজ।'

৪

মেজর ব্যারীর ঈষৎ-বিবশ মুখমণ্ডলে বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হলো। তিনি যে সত্যি অত্যন্ত বিস্মিত এবং আতঙ্কিত, সেটা বোঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, মেজর ব্যারী, কিন্তু তা সত্ত্বেও লজ্জানম্র তৃপ্তির ছোঁয়াটুকু তাঁর অভিব্যক্তিতে গোপন থাকেনি।

তিনি তাঁর কর্কশ, সশব্দ-শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বলিত স্বরে তখন বলছিলেন, 'যে-কোনভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারলে খুশি হবো। অবশ্য ঘটনা সম্পর্কে আমি বলতে গেলে তেমন কিছু জানি না—কিছুই জানি না। পাত্র-পাত্রী কারো সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। তবে জীবনের বেশ কিছু সময় আমি একটু-আধটু ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রাচ্য অঞ্চলে অনেকদিন ছিলাম। আর এ কথা আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি, ভারতীয় কোন শৈলবাসে কিছুদিন কাটানোর পর মানব-চরিত্রের যেটুকু আপনার কাছে অজানা থাকে, জানবেন, সেটুকু জানার তেমন কোন প্রয়োজন নেই।'

তিনি থামলেন, শ্বাস নিলেন, এবং পুনরায় শুরু করলেন, 'বস্তুত এই ব্যাপারটা আমাকে সিমলার একটা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। লোকটির নাম ছিলো রবিনসন, নাকি ফ্যালকনার? সে যাই হোক, সে ছিলো ''ইস্ট উইল্টস'' অথবা ''নর্থ সারেস''-এর লোক। ঠিক মনে পড়ছে না, অবশ্য দরকারও নেই। শান্তশিষ্ট মানুষ, বুঝলেন, বইয়ের পোকা—দেখলে বলতেন, একেবারে ভিজে বেড়ালটি। একদিন সন্ধ্যায় নিজের বাংলোয় স্ত্রীকে হঠাৎ আক্রমণ করে। গলা টিপে ধরে দুহাতে। বউটা নাকি অন্য কোন একটা লোকের সঙ্গে ''ইয়ে'' চালিয়ে যাচ্ছিলো, হঠৎ সেটা সে জানতে পারে। ওঃ, আরেকটু হলেই বউটাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছিলো। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায় মেয়েটা। আমরা তো চমকে গিয়েছিলাম। কখনো ভাবিনি, লোকটার ভেতরে এত তেজ আছে!'

এরকুল পোয়ারো মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আর এই ঘটনার সঙ্গে মিসেস মার্শালের মৃত্যুর একটা সাদৃশ্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তাই তো?'

'হ্যাঁ—মানে, আমি বলতে চাইছি ওই শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টার ব্যাপারটা। অনেকটা একই রকম। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে বসা!'

পোয়ারো বললেন, 'আপনার ধারণা, ক্যাপ্টেন মার্শাল তাই করেছেন?'

'না, সে কথা আমি একবারও বলিনি।' মেজর ব্যারীর রক্তিম মুখমণ্ডল আরও রক্তিম হলো, 'মার্শাল, সম্পর্কে কোন কথাই আমি বলিনি। সে অত্যন্ত ভালোমানুষ। তার সম্পর্কে কোন কুকথা মরে গেলেও মুখে আনতে পারবো না।'

পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু, মাপ করবেন, একটু আগেই একজন প্রতারিত স্বামীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি আপনিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।'

মেজর ব্যারী বললেন, 'হ্যাঁ, মানে, আমি বলতে চাইছিলাম, মিসেস মার্শাল ছিলেন, আমার মতে, রীতিমতো গরম চীজ। কি বলেন? রেডফার্ন ছেলেটাকে একেবারে সুতোয় করে নাচাচ্ছিলেন। হয়তো এর আগে এরকম অনেকে তাঁর জীবনে গেছে এসেছে। কিন্তু মজার ব্যাপারটা কি জানেন, নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীদেবতারা বিশ্বাসে একেবারে অন্ধ! আশ্চর্য! এই জিনিসটা বরাবরই আমাকে অবাক করেছে। তাঁরা এটুকু বোঝেন, যে একটা লোক তাঁদের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত কিন্তু এটা দেখেও দেখেন না যে তাঁদের স্ত্রীরত্নটিও লোকটির প্রতি সমানভাবে অনুরক্ত! পুনায় এরকম একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। খুব সুন্দরী মেয়েটি। ওঃ, নিজের স্বামীকে কম ঝঞ্ঝাটে ফেলেনি সে—'

কিঞ্চিৎ অনিচ্ছা নিয়েই নড়েচড়ে বসলেন কর্নেল ওয়েস্টন, বললেন, 'ঠিক আছে, মেজর ব্যারী। এখন আমাদের প্রথম কাজ বিভিন্ন তথ্য যাচাই করে দেখা। আপনি তাহলে ব্যক্তিগতভবে এমন কিছু জানেন না অর্থাৎ এমন কিছু দেখেননি বা শোনেননি, যা আমাদের তদন্তে কোনরকম সাহায্য করতে পারে?'

উহুঁ, কর্নেল, সেরকম কোন তথ্য দিতে পারছি না। একদিন বিকেলে মিসেস মার্শাল এবং রেডফার্নকে গাল কোভে দেখেছিলাম—' এই পর্যন্ত বলে মেজর ব্যারী চোখ টিপলেন, সবজান্তার ভঙ্গীতে। হেসে উঠলেন চাপা কর্কশ স্বরে—'সে বড় সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু সেরকম সাক্ষ্য প্রমাণ তো আর আপনি চাইছেন না? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!'

'আজ সকালে আপনি মিসেস মার্শালকে একবারও দেখেননি?'

'সকালে কারও সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সেন্ট লু-তে গিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্য বলতে হবে। এ এমন জায়গা যেখানে মাসের পর মাস নির্বিঘ্নে কেটে যায়, আর যেদিন বিঘ্ন ঘটে সেইদিনই আমরা থাকি অনুপস্থিত।'

মেজরের কণ্ঠে একটা পৈশাচিক আক্ষেপের সুর ফুটে উঠলো।

কর্নেল ওয়েস্টন তাঁকে বক্তব্যের খেই ধরিয়ে দিলেন, 'আপনি তাহলে সেন্ট লু তে গিয়েছিলেন বলছেন?'

'হ্যাঁ, একটু টেলিফোন করার দরকার ছিলো। এখানে তো টেলিফোনের কোন ব্যবস্থা নেই, আর লেদারকোম্ব ডাকঘরে ফোনে একটু একা কথা বলার উপায় নেই!'

'আপনার ফোনের বক্তব্য কি একান্ত গোপনীয় ছিলো?'

সহাস্যে আবার চোখ টিপলেন মেজর, 'হ্যাঁ, গোপনীয় বলতে পারেন, আবার নাও বলতে পারেন। চেয়েছিলাম, আমার এক বন্ধুকে ডেকে তার মারফত একটা বিশেষ ঘোড়ার ওপর কিছু বাজী ধরতে, দুর্ভাগ্য লাইনই পেলাম না।'

'আপনি কোথা থেকে ফোন করেছিলেন?'

সেন্ট লু-র প্রধান ডাকঘর থেক। তারপর ফেরার সময় রাস্তা হারিয়ে ফেলি—যতসব জট পাকানো অলিগলি—গোটা এলাকাটা জুড়ে এঁকেবেঁকে যেন গোলধাঁধার সৃষ্টি করেছে। রাস্তা খুঁজে বার করতেই কম করে ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট হয়েছে। এটাই সম্ভবত পৃথিবীর জটিলতম হতচ্ছাড়া জায়গা! এই তো সবে আধঘণ্টা হলো ফিরেছি।'

কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'সেন্ট লু-তে কারও সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিলো কিংবা কারও সঙ্গে কথা বলেছেন?'

মেজর ব্যারী স্বভাবসিদ্ধ চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হলেন, বললেন, 'অ্যালিবাই প্রমাণ করতে বলছেন? সেরকম কিছু মনে করতে পারছি না। সেন্ট লু-তে প্রায় হাজার পঞ্চাশেক লোককে আমি দেখেছি—কিন্তু তার মানে এই নয়, তারা আমাকে মনে রাখবে।'

পুলিশ-প্রধান বললেন, 'এ ধরনের নিয়মমাফিক প্রশ্ন আমাদের করতে হয়, তা তো জানেন।'

'সে কথা ঠিক। দরকার পড়লেই খবর দেবেন। সাহায্য করতে পারলে খুশি হবো। মৃতা মহিলার চটক ছিলো। আমিও চাই, যে এ কাজ করেছে, ধরা পড়ুক। নির্জন সমুদ্র-সৈকতে হত্যাকাণ্ড—কাগজে এই

শিরোনামাই যে দেখতে পাবো, তা বাজী রেখে বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে—'

ইন্সপেক্টর কলগেটই মেজর ব্যারীর এই সাম্প্রতিক স্মৃতিচারণপর্বকে নিষ্ঠুরভাবে অঙ্কুরে বিনাশ করে তাঁকে সুকৌশলে এগিয়ে দিলেন দরজা পর্যন্ত।

ফিরে এসো তিনি বললেন, 'সেন্ট লু-তে কোন খোঁজ-খবর নেওয়া একটু কষ্টকর হবে। কারণ এখন সেখানে রীতিমতো ছুটির মরসুম চলছে।'

পুলিশ-প্রধান বললেন, 'হ্যাঁ, মেজর ব্যারীকে আমরা সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না। অবশ্য আমার ধারণা, তিনি এ ব্যাপারে তেমনভাবে জড়িয়ে নেই। এইরকম ক্লান্তিকর বাচাল বৃদ্ধ বহু দেখা যায়। সৈন্যবাহিনিতে থাকাকালীন কয়েকজনের সাক্ষাৎ আমিও পেয়েছিলাম। কিন্তু তবুও—মেজরের দিকে নজর রাখতেও হবে। কলগেট, তোমার ওপরেই সেটা ছেড়ে দিলাম। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, ক'টার সময় তিনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন, ট্যাঙ্কে তেল কতটা ছিলো—কোনকিছু বাদে দেবে না। হয়তো এও সম্ভব, কেন নির্জন জায়গায় গাড়ি রেখে তিনি দ্বীপে ফিরে আসেন এবং পিক্সি কোভে গিয়ে উপস্থিত হন। অবশ্য কাজটা তেমন যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সেক্ষেত্রে মেজরকে কারও না কারও নজরে পড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে হবে।'

কলগেট মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। বললেন, 'হ্যাঁ, বিশেষ করে আজই প্রচুর শ্যারাব্যাং গাড়ি এখানে উপস্থিত রয়েছে। আজ চমৎকার দিন। মোটামুটিভাবে সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওরা আসতে শুরু করে। অবশ্য জোয়ার ছিলো সাতটায়। আর ভাটা শুরু হবে বেলা একটায়। সুতরাং লোকেরা কংক্রিট সেতু এবং বেলাভূমিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো।'

ওয়েস্টন বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু তাঁকে সেতু পার হয়ে হোটেলের পাশ দিয়েই তো আসতে হবে!'

ঠিক পাশ দিয়ে না এসে তিনি হয়তো অন্য রাস্তাটা দিয়ে দ্বীপের ওপ্রান্তে গেছেন—'

ওয়েস্টন দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললেন, 'আমি একবারও বলছি না, লোকজনের চোখ এড়িয়ে তাঁর পক্ষে এ কাজ করা অসম্ভব। আজ হোটেলের সমস্ত অতিথিই সমুদ্রতীরে উপস্থিত ছিলেন, শুধু মিসেস রেডফানী এবং লিন্ডা মার্শাল ছাড়া যেহেতু ওরা গাল কোভে গিয়েছিলেন, আর যে রাস্তার কথা তুমি বলছো , তার প্রথম অংশটুকু হোটেলের কয়েকটা মাত্র ঘর থেকেই শুধু দেখা যায়, এবং কেউ যে সেই "বিশেষ " সময়ে জানলা দিয়ে ওই রাস্তার দিকে চেয়ে থাকবে, সে সম্ভবনা অত্যন্ত কম। সত্যি কথা বলতে কি, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, কোন লোকের পক্ষে সকলের চোখ এড়িয়ে হোটেলে এসে লাউঞ্জ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটা নেহাৎ অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না, এই বিশ্বাসের ওপর ভরসা করে তিনি এতটা ঝুঁকি নিতে পারেন না।'

কলগেট বললেন, 'তিনি হয়তো নৌকো বেয়ে ঘুর পথে পিক্সি কোভে গিয়ে থাকবেন।'

ওয়েস্টন মাথা নাড়লেন, সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এটা তবু অনেকটা যুক্তিগ্রাহ্য। যদি সমুদ্রের কিনারায় কাছাকাছি কোন নির্জন অঞ্চলে তিনি আগে থাকতেই নৌকোটা রেখে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর পক্ষে গাড়ি ছেড়ে নৌকো বেয়ে পিক্সি কোভে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়; তাঁরপর মিসেস মার্শালকে খুন করে তিনি নৌকো নিয়ে ফিরে আসেন, এবং গাড়ি নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হন ওই সেন্টুলু-তে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলার গল্প নিয়ে—এমন গল্প যা তিনি ভালোভাবেই জানেন, আমাদের পক্ষে যাচাই করা বেশ কষ্টকর হবে।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার।'

পুলিশ-প্রধান বললেন, 'সুতরাং, ব্যাপারটা আমি তোমার ওপরে ছেড়ে দিচ্ছি, কলগেট। স্থানীয় এলাকায় তন্নতন্ন করে চিরুনি চালাও। তুমি তো জানো কি করতে হবে। এখন তাহলে মিস ব্রুস্টারের সঙ্গে কথা বলা যাক।'

তাঁদের সংগৃহীত তথ্যের সঞ্চয়ে নতুন কোন প্রয়োজনীয় তথ্য উপহার দিতে সক্ষম হলেন না এমিলি ব্রুস্টার।

তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কারের কাহিনি দ্বিতীয়বার শোনার পর ওয়েস্ট বললেন, 'এছাড়া এমন কিছু আপনি জানেন না, যা আমাদের তদন্তে সাহায্য করতে পারে?'

এমিলি ব্রুস্টার সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিলেন, 'উহুঁ। এরকম একটা বীভৎস বিশ্রী ব্যাপার...। আশা করি খুব শিগগিরই আপনারা এর একটা সমাধান করতে পারবেন।'

ওয়েস্টন বললেন, 'হ্যাঁ, সেই রকমই আশা করছি।'

নিস্পৃহ, শুষ্ক স্বরে এমিলি বললেন, 'অবশ্য এর সমাধান তেমন কঠিন হওয়ার কথা নয়...'

'তার মানে? কি বলতে চান আপনি, মিস ব্রুস্টার?'

'দুঃখিত। আপনাকে গায়ে পড়ে উপদেশ দিতে চাইনি। শুধু বলতে চাইছিলাম, এ ধরনের মেয়েছেলে-সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাধান যথেষ্ট সহজ হওয়াই উচিত।'

এরকুল পোয়ারো মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনার তাই মনে হয়?'

তীব্র স্বরে জবাব দিলেন এমিলি ব্রুস্টার, 'নিশ্চয়ই মনে হয়। মৃতব্যক্তি সম্পর্কে নোংরা কথা বলা উচিত নয় ইত্যাদি নীতিবাক্য মানলেও বাস্তবকে তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। ওই মেয়েছেলেটা ছিলো পুরোপুরি নষ্ট চরিত্রের। আপনাদের তদন্তের মধ্যে যা করতে হবে, তা হলো ওর নোংরা অতীতটাকে একটু খোঁজ-খবর করে ঘেঁটে দেখা।'

এরকুল পোয়ারো নম্র স্বরে বললেন, 'আপনি তাঁকে পছন্দ করতেন না?'

'না, কারণ ওর সম্পর্কে সাধারণের চেয়ে একটু বেশিই আমি জানি।' সকলের নীরব সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে তিনি বলে চললেন, 'আমার খুড়তুতো ভাই আরস্কিনদের একজনকে বিয়ে করে। আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন, আর্লেনা বৃদ্ধ স্যার রবার্টের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে তিনি ওর প্রতি অনুরাগে অন্ধ হয়ে নিজের আত্মীয়স্বজনকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি ওই মেয়েটাকেই দিয়ে যান।'

কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'আর তাতে, তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা—ইয়ে—মানে অসন্তুষ্ট হন?'

'স্বাভাবিকভাবেই। প্রথমত আর্লেনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একটা চরম কেলেঙ্কারির সৃষ্টি করে, আর তার ওপর ওকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড উইল করে দিয়ে যাওয়ার স্পষ্টই বোঝা যায় সে কি চরিত্রের মেয়ে ছিলো। কথাগুলো হয়তো আপনাদের কাছে রূঢ় ঠেকেছে, কিন্তু আমার মতে আর্লেনা স্টুয়ার্টের মতো মেয়েদের কোন সহানুভূতি দেখানো উচিত নয়। আরও একটা ঘটনার কথা আমি বলতে পারি—একজন হতভাগ্য যুবকের কথা, আর্লেনার জন্যে শেষ পর্যন্ত যে পাগল হয়ে গিয়েছিলে—সে বরাবরই একটু ছিটগ্রস্ত ছিলো, আর স্বাভাবিকভাবেই ওর সঙ্গ ছেলেটাকে সুস্থতার বাইরে ঠেলে দিয়েছে। সে কিছু শেয়ার নিয়ে তছরুপ না কি যেন করেছিলো, শুধু ওর পেছনে খরচ করার টাকা যোগাড়ের জন্যে, আর কোনরকমে আদালতের সাজা থেকেই সে রেহাই পায়। ওই মেয়েছেলেটা যার সঙ্গে মিশেছে তাকেই নষ্ট করে ছেড়েছে। দেখুন না, কেমন করে রেডফার্ন ছেলেটার মাথাটা দিনের পর দিন চিবিয়ে খাচ্ছিলো। না, ওর মৃত্যুতে ঠিক দুঃখ প্রকাশ করতে পারছি না বলে দুঃখিত—অবশ্য, এর বদলে ও যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে বা পাহাড় থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করতো তাহলে ভালো হত। কারণ গলা টিপে খুন হওয়াটা ভীষণ বিশ্রী।'

'তাহলে আপনার ধারণা, খুনী মিসেস মার্শালের অতীত জীবনের কোন শত্রু?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'এমন কেউ, যে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপে এসেছে?'

'তাকে দেখবার লোক কোথায়? আমরা সকলেই তো সমুদ্রতীরে ছিলাম। যদ্দূর জানি মার্শাল মেয়েটা আর ক্রিস্টিন রেডফার্ন তখন গাল কোভে ছিলো। ক্যাপ্টেন মার্শাল হোটেলে, নিজের ঘরে। তাহলে খুনীকে

দেখবার জন্যে কোন কাক পক্ষীটা ছিলো বলতে পারেন? অবশ্য মিস ডার্নলি ছাড়া...'

'কেন, মিস ডার্নলি কোথায় ছিলেন?'

'হোটেলের পশ্চিম দিকের পাহাড়ের কিনারায়। জায়গাটার নাম সানি লেজ। আমি ও মিঃ রেডফার্ন তাঁকে সেখানে বসে থাকতে দেখেছি—যখন আমরা দ্বীপের গা ঘেঁষে নৌকো বেয়ে যাচ্ছিলাম।'

কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'হয়তো আপনার কথাই ঠিক, মিস ব্রুস্টার।'

'এমিলি ব্রুস্টার আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললেন, 'হয়তো নয়, আমি জানি আমার কথাই ঠিক। যখন কোন মেয়ে এরকম নৃশংস পৈশাচিকভাবে খুন হয়, তখন জানবেন, সবচেয়ে মূল্যবান সূত্রের সন্ধান সে-ই আপনাদের হাতে তুলে দেবে। মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি আমার সঙ্গে একমত্ নন?'

এরকুল পোয়ারো চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখ পড়লো এমিলি ব্রুস্টারের আত্মবিশ্বাসের ভরা ধূসর চোখে। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—আপনি এইমাত্র যা বললেন, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। নিজের মৃত্যু রহস্যের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সূত্র আর্লেনা মার্শাল নিজেই।'

মিস ব্রুস্টার তীক্ষ্ণ বললেন, 'দেখলেন তো, তাহলে?'

তিনি ঋজু বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর শীতল আত্মপ্রত্যয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টি চঞ্চলভাবে ছুঁয়ে যেতে লাগলো সবার মুখ।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন কর্নেল ওয়েস্টন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মিস ব্রুস্টার, মিসেস মার্শালের অতীত জীবনে নিহিত কোন সূত্রই আমাদের নজর এড়িয়ে যাবে না।'

এমিলি ব্রুস্টার নিষ্ক্রান্ত হলেন।

৬

ইন্সপেক্টর কলগেট টেবিলের কাছে নড়েচড়ে বসলেন, চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন, 'ভদ্রমহিলা একটু একরোখা প্রকৃতির; আর মৃতা মহিলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে ঠিক মধুর ছিলো না, সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।'

এক মিনিট নীরব থেকে তিনি আত্মগতভাবে বললেন, 'এটা একদিন দিয়ে আমাদের দুর্ভাগ্য, যে আজকের গোটা সকালের জন্যে মিস ব্রুস্টারের এক নিখুঁত অ্যালিবাই রয়েছে। আপনি কি তাঁর হাত দুটো লক্ষ্য করেছিলেন, স্যার? যে কোন পুরুষের মতো বড়সড়। তাছাড়া তাঁর শরীরের গঠনও বেশ ঋজু—আমি বলবো, অনেক পুরুষের চেয়ে তাঁর শক্তি বেশি...'

ইন্সপেক্টর থামলেন। পোয়ারোর প্রতি তাঁর দৃষ্টিতে যেন একরাশ মিনতি ঝরে পড়লো।

'আর আপনি বলছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, তিনি আজ সকালে একবারের জন্যেও বেলাভূমি ছেড়ে যাননি?'

পোয়ারো ধীর মাথা নাড়লেন, বললেন, 'প্রিয় ইন্সপেক্টর, মিস ব্রুস্টার যখন সমুদ্রতীরে আসেন, তখন মিসেস মার্শাল সম্ভবত পিক্সি কোভেই পৌঁছননি, এবং মিঃ রেডফার্নের সঙ্গে নৌকো নিয়ে বেরোবার সময় পর্যন্ত তিনি সর্বক্ষণ আমার চোখের সামনেই ছিলেন।'

কলগেট হতাশা ভরা কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে তো তাঁকেও বাদ দিতে হয়।'

এবং এই অনুসিদ্ধান্ত যথেষ্ট বিচলিত বলে মনে হলো।

৭

রোজমণ্ড ডার্নলির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বরাবরের মতো খুশির একটা উদ্বেল অনুভূতি এরকুল পোয়ারোকে দোলা দিয়ে গেলো।

এমন কি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সংক্রামিত নীরস পরিবেশেও রোজমণ্ড ওর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হলো।

কর্নেল ওয়েস্টনের মুখোমুখি বসে বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলে গম্ভীর অভিব্যক্তি ফুটিয়ে ও প্রশ্ন করলো, 'আপনারা বোধহয় আমার নাম ঠিকানা জানতে চান; রোজমণ্ড অ্যান ডার্নলি। 'রোজামণ্ড লিমিটেড' নামে ৬২২, ব্রুক স্ট্রীটে আমার একটা পোশাক তৈরি প্রতিষ্ঠান আছে।'

'ধন্যবাদ, মিস ডানলি। এবার বলুন, এমন কিছু আপনি জানেন, যা আমাদের তদন্তে সাহায্য করতে পারে?'

'উহুঁ, সেরকম কিছু জানি বলে মনে হয় না।'

'আজ সকালে আপনার গতিবিধি—'

'প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ আমি প্রাতরাশ শেষ করি। তারপর ওপরে ঘরে গিয়ে কয়েকটা বই এবং সূর্য-আচ্ছাদন নিয়ে চলে যাই সানি লেজ-এ। তখন অন্তত দশটা পঁচিশ হবে। বারোটা বাজতে দশ নাগাদ আমি হোটেলে ফিরে আসি, ঘর থেকে টেনিস রাকেট নিয়ে টেনিস কোর্টে যাই, খেলেছি প্রায় মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত।'

'আপনি তাহলে সাড়ে দশটা থেকে প্রায় বারোটা দশ পর্যন্ত ওই পাহাড়ের কিনারায় ছিলেন, অর্থাৎ হোটেল থেকে যে জায়গাটাকে সানি লেজ বলা হয়?'

'হ্যাঁ।'

'আজ সকালে মিসেস মার্শালকে একবারও দেখেছিলেন?'

'না।'

'তিনি যখন ভেলা ভাসিয়ে পিক্সি কোভের দিকে যান, তখন কি সানি লেজ থেকে আপনি তাঁকে দেখেছিলেন?'

'না। হয়তো আমি সেখানে পৌঁছবার আগেই উনি ভেলায় চড়ে জায়গাটা পার হয়ে যান।'

'সানি লেজ-এ থাকাকালীন কোন নৌকো বা ভেলা আপনার নজরে পড়েনি?'

'না, তাছাড়া আগেই তো বলেছি, আমি বই পড়ছিলাম। অবশ্য মাঝে মাঝে দু'একবার চোখ তুলে তাকিয়েছি ঠিকই, কিন্তু তখন সমুদ্রে কোন ভেলা বা নৌকো দেখিনি।'

'তাহলে মিঃ রেডফার্ন এবং মিস ব্রস্টারকেও নিশ্চয়ই আপনি যেতে দেখেননি?'

'না, দেখিনি।'

'মিঃ মার্শালের সঙ্গে তো আপনার আগে থাকতেই পরিচয় ছিলো, তাই না?'

ক্যাপ্টেন মার্শাল আমাদের পরিবারে একজন পুরনো বন্ধু। আমরা এক সময় পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। মাঝে অবশ্য বেশ কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি—অন্তত বারো বছর তো হবেই—'

'আর মিসেস মার্শাল?'

'তাঁকে আমি এই দ্বীপে এসেই প্রথম দেখি।'

ক্যাপ্টেন ও মিসেস মার্শালের মধ্যে সম্পর্ক তো ভালোই ছিলো, কি বলেন?'

'খুবই ভালো ছিলো—অন্তত আমি যদ্দুর জানি।'

'ক্যাপ্টেন মার্শাল কি স্ত্রীর প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন?'

রোজমণ্ড বলল, 'হয়তো ছিলেন—আমার পক্ষে সেটা সঠিক বলা সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন মার্শাল ব্যবহারে একটু সেকেলে প্রকৃতির—সাংসারিক দুঃখ-দুর্দশার কথা পাঁচজনকে বলে বেড়াবার মতো 'আধুনিক' তিনি নন।'

'মিসেস মার্শালকে আপনি পছন্দ করতেন, মিস ডার্নলি?'

'না।'

ছোট এক অক্ষরের শব্দটা শান্ত এবং মসৃণ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো। উচ্চারণের ভঙ্গীতে বক্তব্যের চরিত্র রইলো না—যেন একটা সহজ সত্যের নিষ্পাপ বিবৃতি।

'কারণটা জানতে পারি—?'

রোজামণ্ডের ঠোঁটে অর্ধস্ফুট হাসির ছোঁয়া রেখাপাত করলো। ও বললো, 'ইতিমধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই এটুকু আবিষ্কার করেছেন, মহিলা মহলে আর্লেনা মার্শাল তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না। মেয়েদের আসরে উনি একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন এবং মুখেও সেই বিরক্তি প্রকাশ করতেন। এত সত্ত্বেও আমি কিন্তু আর্লেনার পোশাকের প্রশংসা না করে পারছি না। পোশাক নির্বাচন এবং পরিধানের ব্যাপারে ওঁর কতকগুলো সহজ গুণ ছিলো। ওঁকে আমরা দোকানের খদ্দের হিসেবে পেলে আমি সত্যিই খুশি হতাম।'

'পোশাক-আশাকের পেছনে তিনি নিশ্চয়ই খুব খরচ করতেন?'

'নিশ্চয়ই করতেন, কারণ ওঁর নিজের তো পয়সার অভাব ছিল না, তা ছাড়া ক্যাপ্টেন মার্শালও বেশ অবস্থাপন্ন লোক—'

'একথা কি কখনও শুনেছেন, বা আপনার মনে হয়েছে মিস ডানলি, যে মিসেস মার্শালকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছিলো?'

রোজামণ্ড ডার্নলির অভিব্যক্তিপূর্ণ মুখমণ্ডলে ফুটে উঠলো তীব্র বিস্ময়। ও বললো, ব্ল্যাকমেল করছিলো? আর্লেনাকে?'

'মনে হচ্ছে, আপনি যেন বেশ অবাক হচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, বলতে পারেন, একরকম তাই। কারণ ব্যাপারটা এত বেমানান লাগছে—'

'কিন্তু অসম্ভব তো নয়!'

'না, অসম্ভব নয়। এ পৃথিবীতে সবকিছুই যে সম্ভব, সেটা ঠেকে শিখতে আমাদের বেশি সময় লাগে না, তাই না? কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই কথা ভেবে, আর্লেনাকে কোন অজুহাতে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিলো।'

'হয়তো এমন কতকগুলো বিষয় ছিলো, আমার মনে হয় যেগুলো মিসেস মার্শাল চাননি যে তাঁর স্বামীর কানে যাক।'

'ওহ-হ্যাঁ, হতে পারে—'

কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে দ্বিধার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মৃদু হাসলো রোজামণ্ড, বললে, 'আমাকে অবাক করার কারণ আশা করি বুঝতে পারছেন। মানে আর্লেনা বরাবরই ওর আচার-আচরণে একটু বেপরোয়া ছিলো। কখনই ও নিজেকে সতী সাবিত্রী বলে জাহির করার চেষ্টা করতো না।'

'তাহলে আপনার ধারণা অন্যান্য পুরুষদের সঙ্গে মিসেস মার্শালের ইয়ে, অন্তরতার কথা তাঁর স্বামী জানতেন?'

কিছুক্ষণ নীরবতা। রোজামণ্ডের কপালে চিন্তার সূক্ষ্ম রেখা। অবশেষে অনিচ্ছাভরা মৃদু স্বরে ও নৈঃশব্দ ভঙ্গ করলো, 'ব্যাপারটা কি জানেন, কি যে ধারণা করবো সেটা আমি নিজেই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বরাবরই আমার মনে হয়েছে, কেনেথ মার্শাল আর্লেনাকে আর্লেনা হিসেবেই সরাসরি মেনে নিয়েছেন। ওঁর সম্পর্কে তাঁর মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিলো না। কিন্তু কি জানি, আমার অনুমান ঠিক নাও হতে পারে।'

'হয়তো তিনি স্ত্রীকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন?'

রোজমণ্ড ঈষৎ উত্ত্যক্ত কণ্ঠে বললো, 'পুরুষেরা ভীষণ বোকা। আর কেনেথ মার্শাল তাঁর কৃত্রিম মার্জিত আচরণের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে একজন অসাংসারিক পুরুষ। সুতরাং তাঁর পক্ষে স্ত্রীকে অন্ধ বিশ্বাস করাটা কিছু অসম্ভব নয়। হয়তো তিনি ভেবেছেন, অন্যান্য পুরুষেরা তাঁর স্ত্রীর রূপমুগ্ধ ভক্ত মাত্র—তার বেশি কিছু নয়।

'তাহলে আপনি এমন কাউকে জানেন না—মানে, এমন কারো কথা শোনেননি, যাঁর পক্ষে মিসেস মার্শালের সঙ্গে শত্রুতা বা কোন আক্রোশ থাকা সম্ভব?'

রোজামণ্ড ডার্নলি হাসলো, বললো, 'হ্যাঁ জানি, শুধু মাত্র ক্ষুব্ধ স্ত্রীদেরই আর্লেনার ওপর আক্রোশ ছিলো। কিন্তু যেহেতু ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে, সেহেতু আমি ধরেই নিচ্ছি ওকে খুন করেছে কোন পুরুষ।'

'ঠিকই বলেছেন—'

রোজামণ্ড চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললো, 'না, তেমন কোন পুরুষের কথা আমি বিশেষ করে বলতে পারছি না। অবশ্য আমার পক্ষে সঠিক জানার সম্ভাবনাও কম। আপনারা বরং আর্লেনার অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কাউকে জিগ্যেস করে দেখতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, মিস ডার্নলি।'

রোজামণ্ড চেয়ারে সামান্য ঘুরে বসলো, বললো, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, কি, জিগ্যেস করার মতো কোন প্রশ্ন নেই?'

'ওর মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠা হাসিতে শ্লেষের ছোঁয়া পোয়ারোর দিকে ঝিলিক মারলো।

এরকুল পোয়োরো হাসলেন এবং মাথা নাড়লেন।

তিনি বললেন, 'না—এই মুহূর্তে কোন প্রশ্নের কথা মনে করতে পারছি না।'

রোজামণ্ড ডার্নলি উঠে দাঁড়ালো, নিষ্ক্রান্ত হলো ঘর থেকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

আর্লেনা মার্শালের শোবার ঘরে ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

দুটো বিশাল জানলা সামনের অলিন্দের সীমারেখা ছাড়িয়ে চোখ মেলে দিয়েছে সুনীল সাগরে এবং সংলগ্ন বেলাভূমির দিকে। আর্লেনা প্রসাধন টেবিলে রক্ষিত একরাশ শিশি-বোতলের বিভ্রান্তিকর জটিলতায় ঠিকরে পড়েছে সোনালী রোদ।

প্রসাধন প্রতিষ্ঠানের পরিচিত সর্বপ্রকার প্রসাধান দ্রব্য এবং অনুলেপন এখানে উপস্থিত। স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত আসবাবে পরিপূর্ণ ঘরে তিনজন পুরুষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ইন্সপেক্টর কলগেট ড্রয়ারগুলো যথাক্রমে খুলতে এবং বন্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অনতিবিলম্বে তাঁর মুখ দিয়ে একটা গম্ভীর অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো। কারণ তিনি আবিষ্কার করেছেন একগোছা ভাঁজ করা চিঠি। তিনি এবং ওয়েস্টন চিঠিগুলো পড়ে দেখতে লাগলেন।

এরকুল পোয়ারো ইতিমধ্যে এগিয়ে গেছেন পোশাকের আলমারির দিকে। দরজার একটা পাল্লা খুলতেই চোখে পড়লো রাশি রাশি বিভিন্ন আধুনিক পোশাক। পোয়ারো এবার অবশিষ্ট পাল্লাটা খুললেন। সফেন অন্তর্বাসের সমারোহ এক স্তূপের সৃষ্টি করেছে। একটা চওড়া তাকে রয়েছে অসংখ্য টুপি : গাঢ় লাল ও ফিকে হলুদ রঙের আরও দুটো কার্ডবোর্ডের সৈকত-টুপি—একটা বড় হাওয়াই ঘাসের টুপি—আরও একটা ঘন নীল কাপড়ে তৈরি, এছাড়া রয়েছে, তিন-চারটে অদ্ভুত আকারের টুপি, যেগুলোর পেছনে নিঃসন্দেহে কয়েক গিনি করে খরচ করা হয়েছে—একটা গাঢ় নীল রঙের সৈনিকের টুপি—কালো মখমলের একটা গুচ্ছ—এবং বিবর্ণ ধূসর একটা পাগড়ি।

এরকুল পোয়ারো নিশ্চল দাঁড়িয়ে পোশাকগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এক টুকরো প্রশ্রয়ের হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটে। মৃদু স্বরে মন্তব্য করলেন তিনি, 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম।'

কর্নেল ওয়েস্টন চিঠিগুলো ভাঁজ করে রাখছিলেন।

'তিনটে লিখেছে রেডফার্ন ছেলেটা,' তিনি বললেন, কবে যে ওর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে। মেয়েদের যে কখনও চিঠি লিখতে নেই, সেটা আশা করি বছর কয়েকের মধ্যেই ও ঠেকে শিখবে। মেয়েরা চিরকালই চিঠিপত্র যত্ন করে জমিয়ে রাখে, আর মুখে দিব্যি গেলে বলে সেগুলো তারা পুড়িয়ে ফেলেচে। এছাড়া আরও একটা চিঠি এখানে রয়েছে। ওই একই পদের।'

চিঠিটা তিনি পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দিলেন।

'প্রিয়তমা আর্লেনা—যদি বুঝতে আমার দুঃখ। আমি চলে যাচ্ছি সুদূর চীনদেশে—হয়তো তোমাকে আর দেখতে পাবে—না। কখনও ভাবিনি, কোন পুরুষ কোন মেয়েকে এত গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে, যেমন তোমাকে বেসেছি আমি। চেকটার জন্যে ধন্যবাদ। ওরা আমাকে সাজা থেকে এবার মুক্তি দেবে। খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। এত সবের কারণ আমি চেয়েছিলাম বড়লোক হতে—তাও তোমারই জন্যে। আমাকে ক্ষমা করবে তো? আমি চেয়েছিলাম তোমার কানে—তোমার সুন্দর নরম কানে, হীরের বন্যা বইয়ে দিতে—চেয়েছিলাম তোমার কানে—তোমার সুন্দর নরম কানে, হীরের বন্যা বইয়ে দিতে—চেয়েছিলাম দুধ-সাদা মুক্তোর মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিতে, কিন্তু লোকে বলে মুক্তোর নাকি এখন কদর নেই। তাহলে একটা বিশাল সবুজ পাল্লা, কি বলো? হ্যাঁ, তাই দেবো। একটা বিশ্বাস পান্না, শীতল এবং সবুজ প্রচ্ছন্ন আগুনে টইটম্বুর। আমাকে ভুলে যেও না যেন—জানি, ভুলবে না। তুমি আমার—চিরকালের জন্যে আমার।

বিদায়—বিদায়—বিদায়

'জে. এন'

ইন্সপেক্টর কলগেট বললেন, 'এই জে. এন। সত্যিই চীনে গিয়েছিলো কিনা খোঁজ করে দেখলে কাজ হবে। আর তা যদি না হয়, তাহলে—বুঝতেই পারছেন, সম্ভবত সে-ই আমাদের প্রার্থিত ব্যক্তি। অন্ধের মতো মহিলাটিকে ভালোবাসতো, হয়তো পুজোই করতে তারপর হঠাৎ একদিন জানতে পারলো, তাকে ঠকানো হয়েছে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, মিস ব্রুস্টার সম্ভবত এই ছেলেটির কথাই বলেছিলেন। হ্যাঁ, মনে হয়, এতে হয়তো কাজ হবে।'

এরকুল পোয়ারো মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এই চিঠিটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

পোয়ারো ঘুরে দাঁড়ালেন, অপলকে চেয়ে রইলেন ঘরস্থ আসবারের দিকে—প্রসাধন টেবিলে রাখা অসংখ্য শিশিবোতলের দিকে—খোলা পোশাকের আলমারির দিকে, এবং সবশেষে তাঁর নজর পড়লো, উদ্ধত অলস ভঙ্গীতে বিছানায় শুয়ে থাকা বড়সড় জোকার পুতুলের দিকে।

এবার ওঁরা কেনেথ মার্শালের ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঘরটা তাঁর স্ত্রীর ঘরে লাগোয়া, কিন্তু দু-ঘরে মাঝে যোগাযোগকারী কোন দরজা নেই, এবং বারান্দাও নেই। ঘরটার মুখ একই দিকে এবং দুটো জানলা আছে, তবে অনেক ছোট। দু-জানলার মাঝে দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো একটা আয়না। ডান দিকের জানলা ছাড়িয়ে ঘরের এক কোণে রয়েছে প্রসাধন-টেবিল। টেবিলে রয়েছে দুটো গজদন্তের বুরুশ, একটা পোশাক পরিষ্কারের বুরুশ এবং এক শিশি কেশ প্রসাধনের আরক। বাঁ দিকের জানলার পাশে, ঘরে অন্য প্রান্তে, রয়েছে লেখার টেবিল। একটা খোলা টাইপরাইটার টেবিলে বসানো, এবং তার পাশে স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে একরাশ কাগজ।

কলগেট ক্ষিপ্ত অভ্যস্ত ভঙ্গীতে তাঁর অনুসন্ধানের কাজ শুরু করলেন।

তিনি বললেন, 'আপাতদৃষ্টিতে সবকিছুই বেশ সহজ সরল মনে হচ্ছে। ও, এই তো সেই চিঠিটা, যেটার কথা উনি আজ সকালে বলেছিলেন। তারিখ দেওয়া আছে ২৪শে—অর্থাৎ গতকালের। আর এই যে সেই খামটা—লেদারকোম্ব বে ডাকঘরের আজ সকালের ছাপ রয়েছে। সুতরাং কারচুপির কোন প্রশ্ন নেই। এবার আমাদের জানতে হবে, এই চিঠির উত্তর তাঁর পক্ষে আগে থাকতেই তৈরি করে রাখা সম্ভব ছিলো কিনা।'

তিনি চেয়ারে বসলেন।

কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'তোমাকে কিছুক্ষণের জন্যে এ কাজে ছেড়ে যাচ্ছি। আমরা বাকি ঘরগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিই। সকাল থেকেই সবাইকে ঘরছাড়া করে নিচে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, তাঁরা ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।'

ওঁরা দুজন ঢুকলেন লিন্ডা মার্শালের ঘরে। পূর্ব দিকের পাথুরে পাহাড়ী এলাকা ছাড়িয়ে নীল সমুদ্রের দিকে চোখ মেলে দিয়েছে ঘরটা।

ওয়েস্টন ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন। মৃদু স্বরে বললেন, 'মনে হয় না এ ঘরে দেখার মতো কিছু আছে। তবে এও সম্ভব, মার্শাল হয়তো তাঁর মেয়ের ঘরে এমন কিছু লুকিয়ে রেখেছে, যা আমাদের নজরে পড়ুক সে চায় না; অবশ্য তার সম্ভাবনা কম। কারণ খুনের কোন হাতিয়ার বা অন্য কিছু সরিয়ে ফেলার ব্যাপার তো এখানে নেই। '

তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

এরকুল পোয়ারো ঘরেই রয়ে গেলেন। অগ্নি-আধারে আবিষ্কৃত কয়েকটা জিনিস তাঁকে কৌতূহলী করে তুলেছেন। খুব সদ্য কোন কিছু সেখানে পোড়ানো হয়েছে। তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন, ধৈর্য ধরে কাজ শুরু করলেন। তাঁর আবিষ্কার একটা সাদা কাগজে গুছিয়ে রাখলেন তিনি। অসম আকৃতির বিশাল এক টুকরো গলা মোম—কিছু সবুজ কাগজ অথবা পিচবোর্ডের ছিন্ন অংশ—সম্ভবত কোন ক্যালেন্ডারের, কারণ তার

সামান্য অক্ষত অংশে বড় অক্ষরে ‘৫’ লেখা, এবং চোখে পড়ছে একটু ছাপা অংশ: ‘...মহৎ কর্ম...।’ এছাড়াও রয়েছে একটা সাধারণ পিন এবং সম্ভবত কোন পশুর দগ্ধ লোম।

পোয়ারো নিখুঁত সারিতে জিনিসগুলো সাজিয়ে সেদিকে অপলকে চেয়ে রইলেন। তিনি মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলেন, ‘ “জীবন মহৎ কর্ম চিন্তায় ফল নাই, সম্পাদনে ফল আছে। “হয়তো এ কথাই লেখা ছিলো। কিন্তু এদের উদ্ভট জিনিসের অর্থ কি? আশ্চর্য!’

আর সেই মুহূর্তে ছোট্ট পিনটা হাতে নিতেই তাঁর চোখ তীক্ষ্ণ ও সবুজ হয়ে উঠলো।

অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন, তিনি, ‘হুঁ...কিন্তু এও কি সম্ভব?’

অগ্নি-আধারের কাছ থেকে উঠে দাঁড়ালেন এরকুল পোয়ারো।

সম্পূর্ণ নতুন চোখে ধীরে ঘরের চারদিকে আর একবার তিনি নজর বুলিয়ে নিলেন। মুখে থমথমে নিরুত্তাপ অভিব্যক্তি।

অগ্নি-আধারে ওপরেই শ্বেতপাথরের লম্বা তাক। তাকের বাঁ দিকে শেলফে সাজানো কয়েকটা বই। এরকুল পোয়ারো চিন্তান্বিত মুখে বইয়ের নামগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিলেন।

একটা বাইবেল, শেক্সপীয়রীয় নাটকের জরাজীর্ণ একটি সংকলন। মিসেস হামফ্রি ওয়ার্ড রচিত ‘দ্য ম্যারেজ অফ উইলিয়াম অ্যাশ’। শার্লট ইয়ং-এর লেখা, ‘দ্য ইয়াং স্টেপমাদার।’ ‘দ্য শ্রপশায়ার ল্যান্ড।’ ইলিয়ডের ‘মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল।’ বার্নাড শয়ের ‘সেন্ট জোয়ান’। মার্গারেট মিচেল-এর ‘গন উইথ দ্য উইন্ড’। আর সব শেষে ডিক্সন কার এর ‘দ্য বার্নিং কোর্ট’।

দুটো বই বের করে নিলেন পোয়ারো, দ্য ইয়াং স্টেপমাদার’ এবং ‘উইলিয়ম অ্যাশ’, বই দুটোর নামপত্রে বসানো অস্পস্ট রবার ছাপগুলো চোখ বুলিয়ে দেখলেন। বই দুটো তাকে ফিরিয়ে রাখতে গিয়েই আর একটা বই তাঁর নজরে পড়লো। অন্যান্য বইগুলোর পেছনে লুকিয়ে রাখা এই বইটি আকারে খাটো অথচ মোটা। বাদামী চামড়া দিয়ে বাঁধানো।

বইটা হাতে নিয়ে খুললেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন।

অস্ফুটস্বরে বললেন, তিনি, ‘সুতরাং, আমার ধারণাই দেখছি ঠিক... না, কোন ভুল আমার হয়নি। কিন্তু অন্য ব্যাপারটা—সেটাও কি সম্ভব?’ উহুঁ, তা সম্ভব নয়, যদি না...’

নিথর দাঁড়িয়ে রইলেন, তিনি অন্যমনস্কভাবে গোঁফে হাত বোলাতে লাগলেন, তাঁর মন তখন এই সমস্যাকে ঘিরে আলোড়ন তুলে চলেছে।

অস্পষ্ট কণ্ঠে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন তিনি, ‘যদি না...?’

২

কর্নেল ওয়েস্টন দরজায় উঁকি মারলেন।

‘কি হলো, মঁসিয়ে পোয়ারো, এখনও হয়নি?’

‘আসছি, আসছি।’ সরবে বলে উঠলেন পোয়ারো।

তিনি ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

লিন্ডার ঠিক পাশের ঘরটাই রেডফার্নদের।

ঘরটা ভালো করে দেখলেন পোয়ারো। অনিবার্যভাবেই দুটো ভিন্ন স্বাতন্ত্র্যের ছাপ তাঁর নজরে পড়লো—প্রথমটা, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্নতা, যেটা তিনি ক্রিস্টিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করলেন, এবং দ্বিতীয়টা স্পষ্ট বিশলঙ্খলা—বা প্যাট্রিকের চরিত্রানুগ। এই দুটো ভিন্ন ব্যক্তিত্বের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য কিছু তেমন ভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো না।

এর পরে ঘরটা রোজমণ্ড ডার্নলির; এবং ঘরে মালিকের ব্যক্তিত্বের কারণে এ ঘরে নিছক আনন্দেই কিছু সময় কাটিয়ে দিলেন তিনি।

বিছানার পাশে টেবিলে রাখা কয়েকটা বই ও প্রসাধন-টেবিলে সাজানো প্রসাধন সামগ্রীর ব্যয়বহুল সরলতা তিনি প্রশংসা সহকারে লক্ষ্য করলেন। এবং রোজামণ্ড ডার্নলি যে বহুমূল্য সুগন্ধী ব্যবহার করেন তার ছলনাময়ী সৌরভ তাঁর নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করলো।

রোজামণ্ড ডার্নলির ঘরে ঠিক পরেই, উত্তর প্রান্তে, একটা খোলা দরজা এবং দরজাসংলগ্ন বারান্দা। বারান্দা থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের পাথুরে জমিতে।

ওয়েস্টন বললেন, প্রাতরাশের আগে স্নান করার থাকলে সবাই এই সিঁড়িটাই ব্যবহার করে—'

এরকুল পোয়ারো চোখে কৌতূহল ঝিলিক মারলো। তিনি বাইরে এসে নিচের দিকে তাকালেন।

একটা সরু পথ গিয়ে মিশেছে পাথর কেটে তৈরি আঁকাবাঁকা কয়েক ধাপ সিঁড়িতে। সিঁড়ি শেষ হয়েছে সমুদ্রে। এছাড়া আরও একটা পথ হোটেলকে ঘিরে বাঁ দিক দিয়ে চলে গেছে।

তিনি বললেন, 'এই সিঁড়ি নেমে, বাঁ দিকের পথ ধরে যে কেউ কংক্রিটের সেতুর কাছে প্রধান রাস্তায় পৌঁছতে পারে।'

ওয়েস্টন সম্মতি জানিয়ে মাথা দোলালেন। পোয়ারোর মন্তব্যকে বিস্তারিত করলেন তিনি।

'সুতরাং হোটেলের মধ্যে দিয়ে না গিয়েও কারও পক্ষে দ্বীপের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যাওয়া সম্ভব।' তিনি আরও যোগ করলেন, 'কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন জানলা থেকে কারো নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

'কোন জানলা?'

'সবার ব্যবহারের স্নান-ঘরগুলোর দুটোর জানলা ওই দিকে—উত্তর দিকে—এ ছাড়াও আছে কর্মচারীদের স্নান-ঘর, একতলার মালপত্র রাখার ঘর। আর সবশেষে রয়েছে বিলিয়ার্ড-ঘর।

পোয়ারো সম্মতি জানালেন, বললেন, 'কিন্তু প্রথম জানলাগুলোর লাগানো আছে ঘষা কাঁচ, আর সুন্দর সকালে কেউ কখনও বিলিয়ার্ড খেলে না।'

'ঠিক তাই।'

একটু থামলেন ওয়েস্টন, তারপর বললেন, 'সুতরাং এ যদি তাঁর কাজ হয়ে থাকে, তাহলে আজ সকালে এই পথ ধরেই তিনি গিয়ছিলেন।'

'মানে ক্যাপ্টেন মার্শাল?'

'হ্যাঁ। ব্ল্যাকমেল-এর ব্যাপারটা সত্যি হোক আর নাই হোক, আমার এখনও মনে হচ্ছে, সব কিছু যেন তাঁরই দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। আর তাঁর ব্যবহার—তাঁর ব্যবহার রীতিমতো দুভাগ্যজনক।'

এরকুল পোয়ারো নীরস কণ্ঠে বললেন, 'হয়তো কিন্তু শুধুমাত্র ব্যবহারে অজুহাতে কাউকে খুনী সাব্যস্ত করা যায়।!'

ওয়েস্টন বললেন, 'তাহলে আপনার ধারণা তিনি নির্দোষ?

পোয়ারো মাথা নাড়লেন, 'না, সে কথা আমি বলবো না।'

ওয়েস্টন বললেন, 'দেখা যাক, ওই টাইপরাইটার-অ্যালিবাই থেকে কলগেট কদ্দূর কি করতে পারে। এদিকে হোটেলের যে পরিচারিকা এই অংশের দেখাশোনায় ছিলো সে জবানবন্দি দেবার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার সাক্ষ্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করতে পারে।'

পরিচারিকাটির বয়েস আনুমানিক তিরিশ। চটপটে, কর্মঠ, এবং বুদ্ধিমতী। প্রশ্নের জবাবে তার উত্তর পাওয়া গেলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

ক্যাপ্টেন মার্শাল তাঁর ঘরে উঠে পড়েন সাড়ে দশটার সামান্য পরেই। সে তখন ঘর ঝাড়পোঁছ করছিলো। তিনি তাকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে বলে চলে যান। না, সে তাঁকে ফিরে আসতে দেখেনি বটে কিন্তু একটু পরে তাঁর টাইপরাইটারের শব্দ শুনেছে। তখন এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট মতো। সেই সময়ে সে

মিঃ এবং মিসেস রেডফার্নের ঘরে কাজ করছিলো। ওই ঘরের কাজ শেষ করে সে হাত দেয় মিল ডার্নলির ঘরের বারান্দার একেবারে শেষ দিকের ঘরটা। সেখান থেকে টাইপরাইটারের শব্দ তার কানে আসেনি। মিস ডার্নলির ঘরে সে ঢোকে, যদ্দুর তার মনে পড়েছে, এগারোটার ঠিক পরেই। কারণ ঘরে ঢোকার সময় লেদারকোম্ব গীর্জার এগারোটার ঘণ্টা সে শুনতে পায়ে। সওয়া এগারোটা নাগাদ সে নিচে যায় প্রাত্যহিক চা 'জলখাবার' খেতে। তার পরে হোটেলের অন্য অংশের ঘরগুলো ঝাঁড়পোঁছ করতে বেরিয়ে পড়ে। পুলিশ প্রধানের প্রশ্নের সে উত্তরে বললো, এই অংশের ঘরগুলো সে নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে পরিষ্কার করেছে :

মিস লিন্ডা মর্শালের ঘর, দুটো সর্বসাধারণের স্নান-ঘর, মিসেস মার্শালের ঘর এবং তাঁর নিজস্ব স্নান-ঘর, মিস ডার্নলির ঘর ও স্নান-ঘর। ক্যাপ্টেন মার্শাল ও মিস মার্শালের ঘরে কোন লাগোয়া স্নান-ঘর ছিলো না।

যখন সে মিস ডার্নলির ঘর ও স্নান ঘর নিয়ে ব্যস্ত ছিলো তখন দরজার পাশ দিয়ে কারও হেঁটে যাওয়ার অথবা বারান্দায় সিঁড়ি বেয়ে কারও নামার শব্দ সে শোনেনি, অবশ্য চুপিসাড়ে কেউ হেঁটে গেলে সে পায়ের শব্দ তার পক্ষে না শোনাটাই স্বাভাবিক।

ওয়েস্টন প্রশ্ন এবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে মিসেস মার্শালের দিকে মোড় নিলো।

না, খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা মিসেস মার্শালের অভ্যাস ছিলো না।

তাই দশটা নাগাদ দরজা খোলা পেয়ে এবং মিসেস মার্শালকে ঘরে না দেখে সে, গ্ল্যাডিস-ন্যারাকট, একটু অবাকই হয়েছিলো। ব্যাপারটা রীতিমতো অস্বাভাবিক।

'মিসেস মার্শাল কি তাঁর প্রাতরাশ রোজ বিছানাতেই সারতেন?'

'ওহ্-হ্যাঁ, স্যার, রোজই। অবশ্য প্রাতরাশ বলতে সামান্য এক কাপ চা, একটু কমলালেবুর রস, ও এক টুকরো সেঁকা পাউরুটি। বেশির ভাগ মেয়েদের মতো রোগা থাকতে চাইতেন কিনা!'

না, মিসেস মার্শালের ব্যবহারে অস্বাভাবিক কিছু তার নজরে পড়েনি। বরং রোজকার মতোই স্বাভাবিক ছিলো।

এরকুল পোয়ারো মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'মিসেস মার্শাল সম্পর্কে তোমার ধারণা কি, মাদমোয়াজেল?'

গ্ল্যাডিস ন্যারাকট নির্বাকভাবে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। অবশেষে বললো, 'তার মতো বড়লোকের কথা কি আমার ছোট মুখে মানায়, আপনিই বলুন স্যার?'

'হ্যাঁ, মানায়, তুমি নইলে বলবে কে! তোমার নিজস্ব মতামত শুনতে আমরা আগ্রহী—অত্যন্ত আগ্রহী।'

গ্ল্যাডিস ঈষৎ অস্বস্তিভরা চোখে, তাকালো পুলিশ-প্রধানের দিকে। তিনি মুখ সম্মতি ও সহানুভূতি ফুটিয়ে তোলার প্রবল চেষ্টা করলেও মনে মনে তাঁর পরদেশী বন্ধুর বিচিত্র তদন্ত-পদ্ধতিতে অস্বস্তি বোধ করলেন। মুখে বললেন, 'অ্যাঁ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভয় কি—বলো।'

এই প্রথম দ্রুত কর্মদক্ষতা গ্ল্যাডিসের চরিত্রে অনুপস্থিত বলে মনে হলো ছাপা পোশাকের প্রান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করে চললো ওর হাতের আঙুলগুলো। ও বললো, 'মিসেস মার্শাল—ভদ্রমহিলা বলতে যা বোঝায় ঠিক তা ছিলেন না। মানে, ওঁকে দেখে কেমন যেন অভিনেত্রী-অভিনেত্রী মনে হতো।'

কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'তিনি অভিনেত্রী ছিলেন।'

'হ্যাঁ, স্যার, আমিও সেই কথাই বলতে চাইছি। তিনি মনের ভাব কখনও ব্যবহারে গোপন করার চেষ্টা করতেন না। যেমন ভেতরে ভেতরে শান্ত না হয়ে থাকলে তিনি কখনও শান্তভাব দেখবার জন্যে ইয়ে কষ্ট করতেন না। এই হয়তো খুশি আছেন, হাসছেন, আবার পরমুহূর্ত হয়তো কিছু খুঁজে না পেলে, বা তাঁর ডাকে সাড়া দিতে দেরি করলে, অথবা কাচা পোশাক-আশাক সময়মতো ফেরত না পেলে, অত্যন্ত খারাপ এবং নোংরা ব্যবহার করতেন। আমাদের কেউই তাঁকে ঠিক পছন্দ করতো না। কিন্তু তাঁর পোশাকগুলো ছিলো দারুণ চমৎকার, দেখতেও ছিলেন সুন্দরী—সুতরাং সকলেই যে তাঁকে শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা করবে এ আর আশ্চর্য কি!'

কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'এবার তোমাকে যে প্রশ্ন করবার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত, গ্ল্যাডিস, কিন্তু প্রশ্নটা ভীষণ জরুরী। আচ্ছা, মিসেস মার্শাল এবং তাঁর স্বামীর মধ্যে সম্পর্ক কিরকম ছিলো বলতে পারো?'

গ্ল্যাডিস ন্যারাকট মিনিটখানেক ইতস্তত করলো।

তারপর বলল, 'আপনারা নিশ্চয়ই—মানে আপনারা কি—আপনারা নিশ্চয়ই তাঁর স্বামীকে সন্দেহ করছেন না?'

এরকুল পোয়ারো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

'ওঃ, আমার? আমার তা মনে হয় না। ক্যাপ্টেন মার্শাল এত চমৎকার ভদ্রলোক। এ কাজ তিনি কখনোই করতে পারেন না—কোনমতেই না।'

কিন্তু তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত নও—তোমার কথাতেই বুঝতে পারছি।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্ল্যাডিস ন্যারাকট বলল, 'এ রকম ঘটনা কাগজে প্রায়ই বেরোয়। সাধারণত যখন ঈর্ষার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও সেরকম একটা কানাঘুষো—সকলেই তো প্রায় ওই কথা নিয়ে আলোচনা করছে—মানে, মিসেস মার্শাল আর মিঃ রেডফার্নের ব্যাপারটা নিয়ে। আর মিসেস রেডফার্ন এত শান্ত মহিলা! সত্যিই লজ্জার কথা! অবশ্য মিঃ রেডফার্নও যথেষ্ট ভদ্রলোক, কিন্তু মনে হয়, মিসেস মার্শালের মতো মহিলার কাছে কোন পুরুষই নিজেকে ধরে রাখতে পারে না—বিশেষ করে উনি যখন আবার নিজের খেয়াল-খুশিমতো চলেন।

এখানে প্রত্যেকে স্ত্রীকেই অনেক না-পসন্দ ব্যাপার সহ্য করতে হতো।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একমুহূর্ত থামলো ও, 'কিন্তু ক্যাপ্টেন মার্শালের কানে যদি ব্যাপারটা উঠে থাকে—'

কর্নেল ওয়েস্টন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে?'

গ্ল্যাডিস ন্যারাকট ধীর স্বরে বললো, 'কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে মিসেস মার্শাল এসব ঘটনা তাঁর স্বামীর কানে যাবে এই কথা ভেবে ভয় পেতেন।'

'তোমার এ ধারণার কারণ?'

'তেমন কোন জোরালো কারণ নেই, স্যার। এমনিই মনে হয়েছিলো যে—কখনও কখনও তিনি যেন তাঁর স্বামীকে—ভয় করতেন। তিনি খুব শান্ত মানুষ, কিন্তু—যাকে বলে ঠিক সহজ লোক নন।'

ওয়েস্টন বললেন, 'তাহলে এ ধারণার পেছনে স্পষ্ট কোন প্রমাণ তোমার কাছে নেই? ওঁদের কথাবার্তা থেকে সেরকম কোন আঁচ পাওনি?'

গ্ল্যাডিস ন্যারাকট আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো।

ওয়েস্টন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে চললেন, 'এবার তাহলে মিসেস মার্শালের আজ সকালে পাওয়া চিঠিপত্রের কথায় আসা যাক। এ ব্যাপারে তুমি কোন সাহায্য করতে পারো?'

'প্রায় ছটা কী সাতটা চিঠি ছিলো, স্যার। ঠিক মনে নেই।'

'তুমি সেগুলো তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, স্যার। অফিস থেকে চিঠিগুলো নিয়ে রোজকার মতো তাঁর প্রাতরাশের ট্রেতে রেখে দিই।'

'চিঠিগুলোর চেহারা একটু-আধটু তোমার মনে আছে?'

মেয়েটি মাথা নাড়লো।

'চিঠিগুলো দেখতে ছিলো সাধারণ চিঠিরই মতো। মনে হয়, তার মধ্যে কয়েকটা বিল ও ইস্তাহার ছিলো, কারণ পরে সেগুলো ছেঁড়া অবস্থায় ট্রেতে পড়ে থাকতে দেখি।'

'কি হলো সেগুলো?'

'সেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে স্যার। পুলিশ অফিসারদের একজনকে দেখে এলাম, ডাস্টবিন ঘেঁটে দেখেছেন।'

ওয়েস্টন সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

'বাজে কাগজ-ফেলার ঝুড়ির কাগজগুলো, সেগুলো কোথায় গেলো?'

'সেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

ওয়েস্টন বললেন, 'হুম—আচ্ছা—আপাতত আর কিছু জিগ্যেস করবার নেই।' তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

পোয়ারো সামনে ঝুঁকে এলেন।

'আজ সকালে মিস লিন্ডা মার্শালের ঘর পরিষ্কার করার সময় তুমি কি ফায়ারপ্লেসে কোন আগুন জ্বালানো হয়নি।'

'ফায়ার-প্লেসে কোন কিছু তোমার নজরে পড়েনি?'

'না, স্যার, ওটা পরিষ্কারই ছিলো।'

'কটার সময় তুমি ওঘর পরিষ্কার করেছো?'

'এই সওয়া ন'টা নাগাদ, স্যার, তখন মিস লিন্ডা প্রাতরাশ সারতে গেছেন!'

'তিনি কি প্রাতরাশ সেরে ওপরে ফিরে এসেছিলেন, তুমি জানো?'

'হ্যাঁ, স্যার, এসেছিলেন—প্রায় পৌনে দশটা নাগাদ।'

'তারপর কি ঘরেই ছিলেন?'

'মনে হয় ছিলেন, স্যার। কারণ সাড়ে দশটার ঠিক আগে তাঁকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসতে দেখি।'

'তুমি তাঁর ঘরে আর যাওনি?'

'না, স্যার। প্রথমবারেই কাজ সারা হয়ে গিয়েছিলো।'

পোয়ারো সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আরও একটা কথা আমি জানতে চাই। আজ সকালে প্রাতরাশের আগে কারা কারা স্নান করেছিলেন?'

'আমি শুধু এ'তলার অতিথিদের খবর আপনাকে দিতে পারি।'

হ্যাঁ, শুধু সেইটুকুই আমি জানতে চাইছি।'

'তাহলে, স্যার, আমার মনে হয়, কেবল ক্যাপ্টেন মার্শাল এবং মিঃ রেডফার্নই স্নান করেছিলেন। এটা ওঁদের রোজকার অভ্যেস।'

'তুমি তাঁদের স্নান করতে দেখেছো?'

'না স্যার, তবে তাঁদের ভিজে স্নানের পোশাক রোজকার মতোই বারান্দার রেলিং-এ ঝুলছিলো।'

'মিস লিন্ডা মার্শাল তাহলে আজ সকালে স্নান করেননি?'

'না স্যার। তাঁর সমস্ত স্নানের পোশাকই একেবারে খটখটে শুকনো ছিলো।'

'ও—' বললেন, পোয়ারো, 'এইটাই আমি জানতে চাইছিলাম।'

গ্ল্যাডিস ন্যারকট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যোগ করলো, 'কিন্তু বেশির ভাগ দিনই উনি সকালে স্নান করেন স্যার।'

'আর বাকি তিনজন, মিস ডার্নলি মিসেস রেডফার্ন আর মিসেস মার্শাল?'

'মিসেস মার্শাল কখনও করতেন না স্যার। মিস ডার্নলি দু-একবার করেছেন মনে হয়। মিসেস রেডফার্ন ও সচরাচর প্রাতরাশের আগে স্নান করেন না। তবে খুব গরম পড়লে করেন, কিন্তু আজ সকালে করেননি।'

আবারও সমর্থনে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'এ দিকের যেসব ঘর তুমি দেখাশোনা করো, তার কোনটা থেকে কোন শিশি খোয়া গেছে বলে তোমার নজরে পড়েছে?'

'শিশি, স্যার? কিসের শিশি?

'দুর্ভাগ্যবশত সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু তোমার কি নজরে পড়তো—মানে, সাধারণভাবে ব্যাপারটা কি তোমার চোখে পড়তো—যদি কোন শিশি এভাবে হঠাৎ হারিয়ে যেতো?'

গ্ল্যাডিস স্পষ্ট স্বরে জবাব দিলো, 'মিসেস মার্শালের ঘর থেকে হারালে আমার পক্ষে একেবারেই বলা সম্ভব নয়, স্যার। তাঁর ঘরে এত শিশি বোতল থাকে!'

'আর অন্যান্য ঘর থেকে?'

মিস ডার্নলির ঘরের বেলায়ও ভরসা করে বলতে পারবো না। তাঁর ঘরেও একগাদা ক্রীম আর লোশনের শিশি আছে। কিন্তু অন্য কোন ঘর থেকে কোন শিশি খোয়া গিয়ে থাকলে তা নিশ্চয়ই আমার নজরে পড়তো, স্যার। মানে, যদি সেরকমভাবে খুঁটিয়ে দেখতাম। বলতে পারেন, যদি আমাকে তেমনভাবে নজর করে দেখত বলা হতো।'

'কিন্তু ব্যাপারটা তোমার চোখে পড়েনি?'

'না, কারণ, আপনাকে যা বললাম, আমি সেরকমভাবে নজর করে দেখিনি।'

'তাহলে এখন বরং যাও, ঘরগুলো একবার ভালো করে দেখে এসো।'

'নিশ্চয়ই, স্যার।'

ছাপা পোশাকের খসখস শব্দ তুলে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। ওয়েস্টন তাকালেন পোয়ারোর দিকে। বললেন, 'এসব কি ব্যাপার?'

পোয়ারো মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আমার সুবিন্যস্ত মন তুচ্ছ কারণেই বড় বিচলিত হয়। আজ সকালে প্রাতরাশের আগে, মিস ব্রুস্টার পাথরে ঘাটের কাছাকাছি সমুদ্রে স্নান করেছিলেন; তিনি বলেছেন, ওপর থেকে একটি শিশি নাকি সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হয়, এবং খুব অল্পের জন্য সেই শিশির আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পান। সুতরাং। এবং আমার জানতে ভীষণ ইচ্ছে করছে, কে সেই শিশিটা ছুড়ে ফেলেছিলো, এবং কেন?'

'কিন্তু মশাই, যে কেউই তো শিশিটা ছুড়ে থাকতে পারে—'

'না, পারে না। প্রথমত, হোটেলের পূর্বদিকের কোন জানলা থেকেই কেবল শিশিটা ওভাবে ছুড়ে ফেলা সম্ভব—অর্থাৎ যে ঘরগুলো আমরা একটু আগেই পরীক্ষা করে দেখলাম, তাদেরই কোন জানলা থেকে। এইবার আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, যদি কোন খালি অপ্রয়োজনীয় শিশি আপনার প্রসাধন-টেবিল অথবা স্নান-ঘরে থাকে, তাহলে সেটা নিয়ে আপনি কি করবেন? উত্তরটা আমিই বলছি—সেটাকে আপনি বাজে—কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবেন। অযথা পরিশ্রম করে বারান্দায় গিয়ে সেটাকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলার মতো কষ্ট স্বীকার নিশ্চয়ই করবেন না। কারণ প্রথমত, আপনার ছুড়ে ফেলা শিশিটা আকস্মিকভাবে কাউকে আঘাত করতে পারে, আর দ্বিতীয়ত, সামান্য কারণে শ্রমস্বীকারের পরিণামটা নেহাৎই অসামান্য হয়ে পড়বে। সুতরাং, এই অসামান্য শ্রমস্বীকার আপনি তখনই করবেন যখন আপনি চাইবেন, সেই বিশেষ শিশিটা আর কারো নজরে না পড়ুক।'

ওয়েস্টন স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন, বললেন, 'চিফ ইন্সপেক্টর জ্যাপের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে কিছুদিন আগে আমার আলাপ হয়েছে। শুনেছি, তিনি নাকি প্রায়ই বলে থাকেন আপনার মনের আসধারণ কুটিলতার কোন তুলনা নেই। এই মুহূর্তে আপনি নিশ্চয়ই বলে বসবেন না, আর্লেনা মার্শালেকে মোটেই গলা টিপে খুন করা হয়নি, বরং কোন রহস্যময় শিশি থেকে কোন রহস্যময় বিষয় প্রয়োগ তাঁকে খুন করা হয়েছে?'

'না, না, ওই শিশিতে বিষ ছিলো বলে আমার মনে হয় না।'

'তাহলে কি ছিলো?'

'তা জানি না। জানি না বলেই এত কৌতূহলী হয়ে পড়ছি।'

গ্ল্যাডিস ন্যারাকট ফিরে এলো। ঈষৎ রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'আমি দুঃখিত স্যার, কোন কিছু হারিয়েছে বলে খুঁজে পেলাম না। ক্যাপ্টেন মার্শাল, মিস লিন্ডা মার্শাল, মিঃ এবং মিসেস রেডফার্নের ঘর থেকে কোন জিনিস যে খোয়া যায়নি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর মিস ডার্নলির ঘর থেকেও কিছু হারায়নি। শুধু মিসেস মার্শালের ঘরটা আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে। আগেই তো বলেছি, তাঁর ঘরে শিশি-বোতল একগাদা।'

পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকালেন, বললেন, 'ঠিক আছে। এ নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না।'

গ্ল্যাডিস ন্যারাকট বললো, 'আমাকে আর কিছু জিগ্যেস করার আছে, স্যার?'

সে উপস্থিত দুজনের দিকে যথাক্রমে তাকালো।

ওয়েস্টন বললেন, 'উহুঁ, নেই। ধন্যবাদ।'

পোয়ারো বললেন, 'ধন্যবাদ আমার তরফ থেকেও, তবে একটা কথা। আশাকরি, আমাদের বলা প্রয়োজন এমন কোন কথা—কোন কথা—তুমি বলতে ভুলে যাওনি?'

'মিসেস মার্শালের সম্বন্ধে, স্যার?'

'না, যে কোন ব্যাপার সম্পর্কে। এমন কোন ঘটনা, যা তোমার কাছে অস্বাভাবিক, অসাধারণ, রহস্যময়, অথবা একটু অদ্ভুত, কিংবা আশ্চর্য বলে মনে হয়েছে—অর্থাৎ, এমন কোন ব্যাপার, যা দেখে তুমি আপনমনেই, অথবা কোন সহকর্মীর কাছে, বলতে বাধ্য হয়েছে, ''ভারী অদ্ভুত তো!''?'

ব্যঙ্গময় বিচ্ছিন্নতায় শব্দ তিনটি উচ্চারণ করলেন পোয়ারো।

গ্ল্যাডিস বলল, 'ব্যাপারটা খুব সামান্য। নর্দমা দিয়ে স্নানের জল বয়ে যাওয়ার একটা শব্দ মাত্র। আর সত্যিই নিচতলায় এলসিকে আমি তখন বলেছিলাম যে বেলা বারোটায় কারও স্নান করার ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে।'

'কার স্নান-ঘর থেকে জলটা আসছিলো, কে স্নান করছিলো তখন?'

'সেটা আমি বলতে পারছি না, স্যার। নিচের নর্দমা দিয়ে জলটা যাওয়ার শব্দ আমরা শুনতে পেয়েছিলাম, ব্যস, আর তখনই এলসিকে আমি কথাগুলো বলেছিলাম।'

'ঠিক জানো, সেটা স্নানের জল? বেসিনে হাত ধোয়া জল নয়?'

'হ্যাঁ, স্যার, ঠিক জানি। স্নানের জল বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে কারও ভুল হয় না।'

পোয়ারো গ্ল্যাডিসের উপস্থিতির অতিরিক্ত কোন ইচ্ছে প্রকাশ না করায় তাকে প্রস্থান করার অনুমতি দেওয়া হলো।

ওয়েস্টন বললেন, 'এই স্নানের ব্যাপারটাকে আপনি নিশ্চয়ই তেমন কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না, মঁসিয়ে পোয়ারো? আমার ধারণা, এর সঙ্গে মূল ঘটনার কোন সংযোগ নেই। কারণ এ ক্ষেত্রে রক্তের দাগ-টাগ ধুয়ে ফেলার কোন ব্যাপার নেই। সেটাই হলো—' তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন।

পোয়ারো অসমাপ্ত বক্তব্যকে শেষ করলেন, 'আপনি বলবেন, সেটাই হলে গলা টিপে খুন করার সুবিধে। কোন রক্তপাত নেই, কোন অস্ত্র নেই—কোন কিছু সরিয়ে ফেলা বা লুকোবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধুমাত্র দৈহিক শক্তির—আর একটা খুনী মন!'

তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ডতায়, জীবন্ত অনুভূতির সংবেদনায়, একটু চমকে উঠলেন ওয়েস্টন।

এরকুল পোয়ারো ঈষৎ অপরাধী মুখে তার দিকে চেয়ে হাসলেন।

'না,না,' তিনি বললেন, 'স্নানের ব্যাপারটার সত্যিই হয়তো কোন গুরুত্ব নেই। স্নান তো যে কেউই করে থাকতে পারেন। টেনিস খেলতে যাওয়ার আগে মিসেস রেডফার্ন, বা ক্যাপ্টেন মার্শাল, অথবা মিস ডার্নলি যে কেউ এতে তেমন কোন সূত্র নেই।

দরজায় টোকা মেরে জনৈক পুলিশ কনস্টেবল ঘরে উঁকি দিলো।

'মিস ডার্নলি, স্যার। তিনি আপনাদের সঙ্গে মিনিটখানেকের জন্যে আবার দেখা করতে চান। বলছেন কি একটা জরুরি কথা আপনাদের বলতে ভুলে গেছেন।'

ওয়েস্টন বললেন, 'আমরা নিচে যাচ্ছি—এখুনি।'

৩

প্রথম তাঁদের দেখা হলো কলগেটের সঙ্গে। তাঁর মুখমণ্ডলে বিষন্নতার ছোঁয়া।

'এক মিনিট, স্যার।'

'সুতরাং তাঁকে অনুসরণ করে ওয়েস্টন এবং পোয়ারো উপস্থিত হলেন মিসেস ক্যাসল-এর অফিসে।

কলগেট বললেন, 'হেল্ড-এর সঙ্গে এতক্ষণ ওই টাইপরাইটারে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কোন সন্দেহ নেই। এক ঘণ্টার কমে ওটা টাইপ করা সম্ভব নয়। বরং বেশিই লাগবে, যদি চিঠির এখানে-ওখানে থেমে ভাবতে হয়। মনে হয়, ব্যাপারটার এখানেই নিষ্পত্তি হয়ে গেলো। আর এই চিঠিটা দেখুন।'

একটা চিঠি এগিয়ে ধরলেন তিনি।

'প্রিয় মার্শাল—ছুটির মাঝে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত, কিন্তু বার্লি অ্যান্ড টেন্ডারে চুক্তি নিয়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে...'

'ইতাদি ইত্যাদি', বললেন, কলগেট, 'তারিখ ২৪শে—অর্থাৎ গতকালের খামে পোস্ট অফিসের ছাপ গতকাল সন্ধ্যের, 'ই. সি. ১'-এর এবং আজ সকালের 'লেদারকোম্ব বে'-র। চিঠিতে এবং খামে একই টাইপরাইটার ব্যবহার করা হয়েছে। আর চিঠির সারমর্ম দেখে মনে হয় আগে থেকে এর উত্তর তৈরি করে রাখা মার্শালের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিলো। কারণ এ চিঠির কয়েকটা সংখ্যা থেকে মার্শালের চিঠির সংখ্যাগুলো তৈরি—পুরো ব্যাপারটা ভীষণ জটিল।'

'হুম—' ওয়েস্টন ম্রিয়মান স্বরে বললেন, 'মার্শালকে তাহলে সন্দেহের অওতা থেকে রেহাই দিতে হচ্ছে। এগবারে আমাদের অন্য দিকে নজর দিতে হবে।' একটু থেমে যোগ করলেন, তিনি, 'মিস ডার্নলির সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

রোজামণ্ড সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে ঘরে প্রবেশ করলো। ওর ঠোঁটের হাসিতে অপরাধী-চেতনার ঈষৎ ছোঁয়া।

ও বলল, অত্যন্ত দুঃখিত। হয়তো ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব দেবার মতো নয়।কিন্তু জানেনই তো, মাঝে মাঝে মানুষ কিরকম ভুলোমনা হয়ে পড়ে।'

'হ্যাঁ, বলুন, মিস ডানলি?'

একটা চেয়ার দেখিয়ে পুলিশ-প্রধানকে ওকে বসতে ইশারা করলেন।

রোজমণ্ড ওর সুষম কালো মাথা নাড়লো।

'ওহ, ব্যাপারটা খুব সামান্য, বসে বলার মতো নয়। কথাটা হলো, আমি আপনাদের বলেছিলাম যে আজ সারাটা সকাল আমি সানি লেজ-এ কাটিয়েছি। সেটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমি যে একবারের জন্যে হোটেলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলাম, সেটা বলতে একেবারেই ভুলে গেছি।'

'কটার সময়, মিস ডার্নলি?'

'সওয়া এগারোটা তো হবেই।'

'আপনি তাহলে হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন বলছেন?'

'হ্যাঁ, রোদ-চশমাটা আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম না হলেও চলবে, কিন্তু ক্রমশ চোখ ব্যথা করতে লাগলো। তাই হোটেলে গিয়ে ওটা নিয়ে আসাই ঠিক করলাম।'

'আপনি সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। অবশ্য, সত্যি বলতে কি, যাবার সময় কেনের—ক্যাপ্টেন মার্শালের ঘরে একবার উঁকি মেরেছিলাম। ওর টাইপ করার শব্দ শুনতে পেয়ে ভাবলাম, আজকের মতো একটা সুন্দর দিনে ওর ঘরে বসে টাইপ করে বোকার মতো সময়টা নষ্ট করছে ঠিক করলাম, ওকে বেরোতে বলবো।'

'তা ক্যাপ্টেন মার্শাল কি বললেন?'

রোজামণ্ড লজ্জা-লজ্জা মুখে হাসলো।

'দরজা খুলে দেখলাম, কেন এত গভীর মনোযোগে, ভুরু কুঁচকে দ্রুতহাতে টাইপ করে চলেছে যে ওকে আর বিরক্ত করলাম না, নিঃশব্দে চলে এলাম। আমার মনে হয়, ও আমাকে দেখতেও পায়নি।'

'আর এটা ঠিক—ক'টার সময় হয়েছে, মিস ডার্নলি?'

'এগারোটা বেজে প্রায় কুড়ি মিনিট নাগাদ। বেরোবার সময় হলঘরে ঘড়িটা আমার নজরে পড়েছিলো।'

৪

'অতএব ওই প্রসঙ্গে এবার পূর্ণচ্ছেদ পড়লো।' বললেন, ইন্সপেক্টর কলগেট, 'পরিচারিকা তাঁকে এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত টাইপ করতে শুনেছে। মিস ডার্নলি তাঁকে দেখেছেন এগারোটা কুড়িতে, আর মিসেস মার্শাল নিহত হন পৌনে বারোটা নাগাদ। তিনি বলেছেন, পুরো একটি ঘণ্টা ঘরে বসে টাইপ করে কাটিয়েছেন, আর এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তিনি সত্যিই ওই সময়টা ঘরে বসে টাইপ করছিলেন। সুতরাং ক্যাপ্টেন মার্শাল এখন সব সন্দেহের বাইরে।'

থামলেন তিনি, কৌতূহলী চোখে তাকালেন পোয়ারো দিকে, প্রশ্ন করলেন, 'মঁসিকে পোয়ারোকে যেন কোন কারণে চিন্তিত মনে হচ্ছে—'

পোয়ারো চিন্তাচ্ছন্ন জবাব দিলেন, 'মিস ডার্নলি কেন হঠাৎ এই অতিরিক্ত সাক্ষ্যটুকু যেচে আমাদের উপহার দিলেন, সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছি।'

ইন্সপেক্টর কলগেট তৎপর ভঙ্গীতে ঘাড় কাত করলেন।

'ব্যাপারটা কি একটু গোলমেলে ঠেকছে? মানে, নিছক, ''ভুলে যাওয়া''র ঘটনা এটা নয় বলছেন?'

মিনিট কয়েক কি ভাবলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আচ্ছা স্যার, ব্যাপারটাকে তাহলে একটু অন্যভাবে দেখা যাক। ধরে নেওয়া যাক, মিস ডার্নলি, তাঁর কথামতো, আজ সকালে সানি লেজ-এ ছিলেন না ; তাঁর গল্পটা সবৈব মিথ্যে। এবারে মনে করুন, তাঁর গল্পটা আমাদের শোনাবার পর হঠাৎই তিনি আবিষ্কার করলেন কেউ একজন তাঁকে অন্য কোথাও দেখে ফেলেছে, অথবা কোন একজন তাঁর খোঁজে সানি লেজ-এ গিয়ে সেখানে তাঁকে পায়নি। সুতরাং তিনি চট করে একটা নতুন গল্প বানিয়ে ফেললেন এবং সেটা আমাদের কাছে সবিস্তারে বিবৃত করে তাঁর অনুপস্থিতির কৈফিয়ত তৈরি করে রাখলেন আপনি হয়তো খেয়াল করে থাকবেন, তিনি বেশ সতর্কভাবেই বলেছেন, তিনি যখন ক্যাপ্টেন মার্শালের ঘরে উঁকি মারেন, তখন তিনি ওঁকে দেখতে পাননি।'

পোয়ারো অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'হুঁ, খেয়াল করেছি।'

প্রচণ্ড অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন ওয়েস্টন, 'আপনি কি বলতে চান মিস ডার্নলি এর মধ্যে জড়িয়ে আছেন। যত্তো সব উদ্ভট চিন্তা। এতে তিনি জড়াবেন কোন্ দুঃখে?'

ইন্সপেক্টর কলগেট কাশলেন, বললেন, 'ওই মার্কিন ভদ্রমহিলা, মিসেস গার্ডেনারের কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। তিনি মোটামুটি স্পষ্টই ইঙ্গিত করেছিলেন। ক্যাপ্টেন মার্শালের ওপর মিস ডার্নলির যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। সেখানেই তো খুনের উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে স্যার।'

ওয়েস্টন অধৈর্য কণ্ঠে বললেন, 'আর্লেনা মার্শাল কোন মহিলার হাতে খুন হননি। আমাদের খোঁজ করতে হবে কোন পুরুষের। সুতরাং এ মামলার পুরুষদের পেছনে আমাদের আঠার মতো লেগে থাকতে হবে।'

ইন্সপেক্টর কলগেট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক, স্যার। এই একই জায়গায় আমরা বার বার ফিরে আসছি, তাই না?'

পুলিশ-প্রধান বলে চললেন, 'বরং একজন কনস্টেবলকে দু-একটা বিষয়ের সময় খতিয়ে দেখবার কাজে লাগিয়ে দাও। হোটেল থেকে দ্বীপের অপর প্রান্তের মইটা পর্যন্ত তাকে একবার হেঁটে, একবার দৌড়ে যেতে বলো। মই দিয়ে ওঠানামার ব্যাপারটাও ওই একইরকমভাবে যাচাই করে দেখবে। আর বেলাভূমি থেকে ভেলায় চড়ে পিক্সি কোভে পৌঁছতে কতটা সময় লাগে সেটাও কাউকে দিয়ে খতিয়ে নাও।'

ইন্সপেক্টর কলগেট সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার।' আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠলো তাঁর কণ্ঠস্বরে।

পুলিশ-প্রধান বললেন, 'মনে হয় এবার পিক্সি কোভে আমার একবার যাওয়া দরকার। দেখি, ফিলিপস সেখানে কিছু পেলো কিনা। তাছাড়া পিক্সি গুহাটাও রয়েছে—যেটার কথা আমরা সকাল থেকে শুনে আসছি। দেখা দরকার, কোন পুরুষের অপেক্ষা করার কোন চিহ্ন সেখানে পাওয়া যায় কিনা। হুঁ পোয়ারো? আপনি কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।'

ওয়েস্টন বললেন, 'যদি বাইরে থেকে কেউ এ দ্বীপে এসে থাকে, তাহলে পিক্সি গুহাই হচ্ছে তার লুকোবার পক্ষে চমৎকার জায়গা—অবশ্য গুহার খবরটা যদি তার জানা থাকে। আমার তো ধারণা, স্থানীয় লোকেরা হয়তো গুহার খবরটা জানে।'

কলগেট বললেন, 'আজকালকার ছেলেমেয়েরা জানে না বলেই আমার মনে হয়। কারণ, যেদিন থেকে এই হোটেল খোলা হয় সেদিন থেকেই এই দ্বীপ এবং দ্বীপসংসলগ্ন কোভগুলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলেরা অথবা কোন পিকনিক দল কেউই সেখানে যায় না। আর হোটেলের লোকদের আপনি স্থানীয় অধিবাসী বলতে পারেন না। মিসেস ক্যাসল লন্ডনের লোক।'

ওয়েস্টন বললেন, 'রেডফার্নকে আমাদের সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। উনিই আমাদের গুহার খবরটা প্রথম দিয়েছিলেন। আর, মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি?'

এরকুল পোয়ারো ইতস্তত করলেন। তাঁর উচ্চারণে পরদেশী প্রভাব সুস্পষ্ট হলো, 'আমি? আমার অবস্থাও মিস ব্রস্টার এবং মিসেস রেডফার্নের মতো—খাড়া মই বেয়ে ওঠানামা আমার সয় না।'

ওয়েস্টন বললেন, 'আপনি তাহলে নৌকো করে যেতে পারেন।'

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এরকুল পোয়ারো, 'আমার পাকস্থলী সমুদ্রে ঠিক সুস্থ বোধ করে না।'

'কি বাজে কথা বলছেন, মশাই। সমুদ্র আজ পুকুরের মতো শান্ত। এই শেষ সময়ে আমাদের এভাবে ডোবাবেন না।'

এই ইংরেজি সনির্বন্ধ অনুরোধেও এরকুল পোয়ারোকে বিশেষ বিচলিত বলে মনে হলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় আড়াল থেকে উঁকি মারলো মিসেস ক্যাসল-এর বিশদ কেশবিন্যাস-সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত মুখমণ্ডল।

'আশা করি আপনাদের কথার মাঝখানে নাক গলিয়ে বিরক্ত করছি না,' তিনি বললেন, 'কারণ মিঃ লেন, সেই ধর্মযাজক ভদ্রলোক, এইমাত্র ফিরে এসেছেন। ভাবলাম, খবরটা হয়েতো আপনারা জানতে চাইবেন।'

'ওহ—হ্যাঁ, ধন্যবাদ, মিসেস ক্যাসল। আমরা এখুনি তাঁর সঙ্গে দেখা করছি।'

মিসেস ক্যাসল ঘরের ভেতরে কয়েক পা এগিয়ে এলেন, বললেন, 'জানি না, এটা বলার কোন দরকার আছে কি না, কিন্তু আমি শুনেছি, যে কোন ছোটখাটো জিনিসকেও এসব ব্যাপারে তুচ্ছ করা ঠিক নয়, তাই —'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন?' ওয়েস্টন অধৈর্য কণ্ঠে বললেন।

'ব্যাপারটা হচ্ছে, বেলা একটা নাগাদ একজন ভদ্রলোক ও একজন ভদ্রমহিলা এখানে এসেছিলেন। এসেছিলেন দ্বীপের ওপার থেকে। মধ্যাহ্নভোজ সারতে। তাঁদের বলা হয়েছিলো যে এখানে একটা দুঘটনা ঘটেছে, এবং এ অবস্থায় মধ্যাহ্নভোজের কোনরকম ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।'

'তাঁদের পরিচয় কিছু জনেন?'

কি করে বলবো! কোন নাম তাঁরা দেননি। দুর্ঘটনার বিবরণ শুনে কিছুটা কৌতূহল প্রকাশ করে, হতাশ হয়ে চলে গেছেন। আমি অবশ্য কোন কথাই তাঁদের বলিনি। তবে আমার মনে হয়, তাঁরা উঁচুদরের টুরিস্ট—গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন।'

ওয়েস্টন ঈষৎ রূঢ় স্বরে বললেন, 'এই সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। খবরটা তেমন দরকারী না হলেও, সব ঘটনাই—ইয়ে—মানে রাখা ভালো।'

'নিশ্চয়ই', মিসেস ক্যাসল বললেন, 'আমার কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবারে মিঃ লেনকে এ ঘরে আসতে বলুন।'

৫

স্বভাবসিদ্ধ সতেজ পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করলেন ধর্মযাজক স্টিফেন লেন।

ওয়েস্টন বললেন, 'আমি এ অঞ্চলের পুলিশ-প্রধান, মিঃ লেন। আশা করি এখানকার দুর্ঘটনার কথা আপনাকে জানানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ফিরে আসতেই ব্যাপারটা কানে এসেছে। কি ভয়ানক কি ভয়ানক—' তাঁর শরীরে হালকা কাঠামো কেঁপে উঠলো। নিচু স্বরে তিনি বললেন, 'সেই প্রথম থেকেই—যেদিন থেকে এখানে এসেছি—অশুভ শক্তির অন্তরঙ্গ উপস্থিতি আমি টের পেয়েছি—স্পষ্ট টের পেয়েছি।'

তাঁর চোখ, জ্বলন্ত একাগ্র চোখ, ফিরলো এরকুল পোয়ারোর দিকে।

তিনি বললেন, 'আপনার মনে আছে, মঁসিয়ে পোয়ারো? আমাদের দিন কয়েক আগেকার আলোচনার কথা? অশুভ শক্তির অস্তিত্ব নিয়ে?'

বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে দীর্ঘকায় কৃশ মানুষটিকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন ওয়েস্টন। মানুষটিকে বুঝে ওঠা তাঁর কাছে বেশ কষ্টকর মনে হলো। ধর্মযাজক লেনের চোখ ফিরে এলো তাঁর দিকে। ঈষৎ হেসে তিনি বললেন, 'জানি, কথাগুলো হয়তো আপনার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে। কারণ বর্তমান যুগে অশুভ শক্তিতে বিশ্বাস আমরা করি না। নরকাগ্নিকে আমরা মন থেকে নির্বাসন দিয়েছি? শয়তানে আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু জানবেন, শয়তান এবং তাঁর অনুচরেরা অতীতে যেমন শক্তিমান ছিলো, আজ, এই মুহূর্তে ,তার চেয়ে কিছু কম নেই।'

ওয়েস্টন বললেন, 'হ্যাঁ—ইয়ে—হয়তো তাই। সেটা পুরোপুরি আপনার এলাকা, মিঃ লেন। আর আমার এলাকা অনেক নিরস, বাস্তববাদী—একটা খুনের কিনারা করা।'

স্টিফেন লেন বললেন, 'বড় নিষ্ঠুর শব্দ। খুন! পৃথিবীর প্রাচীনতম পাপ—নির্মমভাবে কোন নিষ্পাপ ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙানো ...'কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন তিনি, চোখ অর্ধনিমীলিত। তারপর অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক স্বরে বললেন, 'বলুন, কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?'

'মিঃ লেন, যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে প্রথমে বলুন, আজ সারা সকালটা আপনি কিভাবে কাটিয়েছেন।
'

'বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই। বরাবরের মতো আজও আমি সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি পদব্রজে ভ্রমণে। হাঁটতে আমি ভীষণ ভালোবাসি। এখানকার গ্রামাঞ্চলের অনেকটাই আমার পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখা হয়ে গেছে। আজ গিয়েছিলাম "সেন্ট পেট্রক-ইন-দ্য কোম্ব"-এ—এখন থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূরে। আঁকাবাঁকা গলি ঘুরে ডেভনের পাহাড় উপত্যকার কোল ঘেঁষে চমৎকার হাঁটা পথ। সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই খেয়েছি। ওখানকার গীর্জটাও দেখে এলাম। সেখানে প্রাচীন

কাঁচশিল্পের টুকরো টুকরো কিছু নিদর্শন অবশিষ্ট রয়েছে ; আমাদের দুর্ভাগ্য, যে সম্পূর্ণটা নেই এছাড়া একটা সুন্দর রঙ-করা পর্দাও চোখে পড়লো।'

'ধন্যবাদ, মিঃ লেন। পথে আপনার সঙ্গে কি কারও দেখা হয়েছে?'

'দেখা হলেও কথা হয়নি। একটা গরুর গাড়ি চোখে পড়েছে, কতকগুলো ছেলেকে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখেছি, আর দেখেছি কয়েকটা গরু অবশ্য,' তিনি হাসলেন, আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ যদি চান, তাহলে বলতে পারি, গির্জার খাতায় আমি আমার নামটা লিখে এসেছি। খোঁজ করলে দেখতে পাবেন।'

'গীর্জায় কারও সঙ্গে আপনি দেখা করেননি—ধর্মযাজক অথবা কোন কর্মচারীর সঙ্গে?'

স্টিফেন লেন মাথা নাড়লেন। বললেন, 'না, সেখানে কেউ ছিলো না; আমিই ছিলাম এক এবং অদ্বিতীয় দর্শক। সেন্ট পেট্রক বড় নির্জন জায়গা। গ্রামটা গীর্জা ছাড়িয়ে আরও অন্ত আধ মাইল ভেতরে।'

কর্নেল ওসেস্টন হাসিমুখে বললেন, 'ভাববেন না যেন আমরা আপনার কথায় ইয়ে মানে সন্দেহ করছি। শুধু প্রত্যেকের বক্তব্য যাচা করে দেখা হচ্ছে। নেহাতই নিয়মমাফিক কাজ, জানেন তো। এ ধরনের ব্যাপারে পুলিশি নিয়মের এতটুকু এদিক ওদিক হবার জো নেই।'

স্টিফেন লেন শান্তস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, জানি।'

ওয়েস্টন বলে চললেন, 'এবারে পরের কথায় আসি; আপনি কি এমন কিছু জানেন না যা আমাদের তদন্তের কাজে আসবে? মৃত মহিলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য? এমন কোন সূত্র, যা খুনীকে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে? এমন কিছু, যা আপনি দেখেছেন অথবা শুনেছেন?'

স্টিফেন লেন বললেন, 'কোন কিছুই আমার কানে আসেনি। আমি আপনাদের মোটের ওপর যেটুকু বলতে পারি তা হলো এই : আর্লেনা মার্শালকে দেখামাত্রই ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সহজাত ক্ষমতায় আমি অনুভব করতে পারি তিনি অশুভশক্তির একটি উৎসবিন্দু। তিনি ছিলেন অশুভশক্তির মানবীয় রূপ। পুরুষের জীবনে নারীই সবচেয়ে বড় সহায়, বড় প্রেরণা—আবার সেই নারীই তাকে নিয়ে যেতে পারে অবনতির অন্ধকারে গহনে, নিয়ে যেতে পারে পশুর পর্যায়ে। আমাদের মৃত মহিলাটি ছিলেন ঠিক সেই প্রকৃতির। পুরুষের চরিত্রের সব ক'টি হীন নিচ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। এ ক্ষেত্রে জেজবেল এবং অ্যাহেলিবার কথাই আমার মনে পড়ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচারের দণ্ড আকস্মিকভাবে নেমে এসেছে তাঁর পাপাচারে সমাপ্তি ঘটাতে তাঁকে স্তব্ধ করতে!'

এরকুল পোয়ারো চঞ্চল হলেন, বললেন, 'বিচারের দণ্ড তাঁকে স্তব্ধ করেনি—স্তব্ধ করেছে কোন মানুষের হাত! একজোড়া মানুষের হাত তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে।'

ধর্মযাজকের হাত কাঁপাতে লাগলো। তীব্র অনুভূতিতে বাতাস আঁকড়ে ধরার অগোছালো প্রয়াস পেতে লাগলো তাঁর হাতের দশ আঙুল। চাপা অবরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'কি ভয়ঙ্কর—কি ভয়ঙ্কর—আপনার বর্ণনাও বড় নৃশংস—'

এরকুল পোয়ারো শান্ত স্বরে বললেন, 'কিন্তু এটাই সরল সত্য। আপনি বলতে পারেন, মিঃ লেন, সেই অদৃশ্য হাত দুটির মালিক কে?"

ধর্মযাজক মাথা নাড়লেন, বললেন, 'জানি না—আমি কিছুই জানি না...'

ওয়েস্টন উঠে দাঁড়ালেন, কলগেটের দিকে এক পলক তাকাতেই সংক্ষিপ্ত অনির্ণেয় ভঙ্গীতে মাথা হেলালেন কলগেট, তারপর বললেন, 'এবারে আমাদের পিক্সি কোভে একবার যাওয়ার দরকার।'

লেন বললেন, 'ওখানেই কি ব্যাপারটা ঘটেছে?'

ওয়েস্টন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

লেন বললেন, 'আ-আমি আপনাদের সঙ্গে গেলে আপত্তি আছে?'

সংক্ষিপ্ত উত্তর লেনকে নিরাশ করতে যাচ্ছিলেন, ওয়েস্টন, পোয়ারোর কথায় বাধা পেলেন।

‘নিশ্চয়ই যাবেন।’ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, পোয়ারো, ‘আপনি আমার সঙ্গে নৌকোয় চলুন, মিঃ লেন। এখুনি আমরা রওনা হবো।’

নবম পরিচ্ছেদ

১

একই দিনে দ্বিতীয়বার পিক্সি কোভ অভিমুখে নৌকো বেয়ে চললো প্যাট্রিক রেডফার্ন। নৌকোর অন্যান্য যাত্রীদের একজন এরকুল পোয়ারো, পেটে হাত চেপে বিবর্ণ মুখে বসে রয়েছেন, এবং অন্যজন স্টিফেন লেন। কর্নেল ওয়েস্টন স্থলপথে রওনা হয়েছেন। কিন্তু পথে দেরি হওয়ার তিনি নৌকোর সঙ্গে প্রায় একই সময়ে এসে উপস্থিত হলেন পিক্সি কোভের বেলাভূমিতে। একজন পুলিশ কনস্টেবল ও একজন একজন সাদা পোশাকী সার্জেন্ট আগে থেকে সেখানে উপস্থিত ছিলো। ওঁরা তিনজন নৌকো থেকে নেমে যখন ওয়েস্টনের সঙ্গে যোগ দিলেন, তখন তিনি সার্জেন্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

সার্জেন্ট ফিলিপস বললে, 'বেলাভূমির প্রতিটি অংশ আমরা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি, স্যার।'

'খুব ভালো। কিছু পেলে?'

'সমস্ত এক জায়গায় রাখা আছে, স্যার, যদি একবার এসে দেখেন—'

বিভিন্ন জিনিসের একটা ছোটখাটো সংগ্রহ সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে একখণ্ড পাথরের ওপর। একটা কাঁচি, গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের একটা খালি প্যাকেট, একইরকম পাঁচটা বোতলের ডাকনা, বেশ কয়েকটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, তিন টুকরো সুতো, খবরের কাগজের দু-একটা টুকরো, একটা ভাঙা পাইপের ধ্বংসাবশেষ, চারটে বোতাম, একটা মোরগের পায়ের হাড় এবং একটা সূর্যস্নানের তেলের খালি শিশি।

মূল্যায়নের দৃষ্টিতে জিনিসগুলোর দিকে চোখ নামিয়ে দেখলেন ওয়েস্টন।

'হুঁম' তিনি বললেন, 'আজকালকার সৈকতের যা অবস্থা তার চেয়ে ভালোই বলতে হবে! ইদানীং বেশিরভাগ লোকই সৈকতকে নিজেদের ডাস্টবিনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে! শিশির লেবেলেন রঙটা যেভাবে জ্বলে গেছে, তাতে মনে হয় এটা বেশ কিছু সময় এখানে রয়েছে—অন্যান্য জিনিসগুলোর অবস্থাও একইরকম দেখছি। অবশ্য কাঁচিটা একেবারে নতুন : পরিষ্কার ঝকঝকে। গতকাল বৃষ্টির সময়ে এটা নিশ্চয়ই এখানে ছিলো না! এটা কোত্থেকে পেলে?'

'মইয়ের ঠিক নিচেই, স্যার। এই ভাঙা পাইপটাও সেখানে ছিলো।'

'হুম, হয়তো ওঠানামা করার সময় কারো হাত থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে জিনিসগুলো কার বলে মনে হয়?'

'জানি না, স্যার। কাঁচিটা অতি সাধারণ নখ কাটার কাঁচি। আর পাইপটা ভালো জাতের গোলাপের কাঠের তৈরি—নিঃসন্দেহে দামী।'

পোয়ারো চিন্তাচ্ছন্ন অস্পষ্ট স্বরে মন্তব্য করলেন, 'ক্যাপ্টেন মার্শাল আমাদের বলেছিলেন, তাঁর পাইপটা কোথায় হারিয়ে গেছে—'

ওয়েস্টন বললেন, 'উহুঁ—মার্শাল এর মধ্যে নেই। সে ছাড়াও তো আরও অনেকে পাইপ খায়।

এরকুল পোয়ারো স্টিফেন লেনকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর হাত একবার পকেটে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এলো। সুতরাং নম্রস্বরে বললেন পোয়ারো, আপনি পাইপ ব্যবহার করেন, তাই না, মিঃ লেন?"

ধর্মযাজক চমকে উঠলেন, তাকালেন পোয়ারোর দিকে, বললেন, 'হ্যাঁ—ইয়ে পাইপ আমার বহু পুরানো বন্ধু ও সঙ্গী।' পকেটে হাত দিয়ে একটা পাইপ বের করলেন তিনি তামাক ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন।

এরকুল পোয়ারে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন শূন্যদৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রেডফার্নের কাছে। নিচু স্বরে বললেন, 'ভালোই হয়েছে—ওঁকে ওরা সরিয়ে নিয়ে গেছে—'

স্টিফেন লেন প্রশ্ন করলেন, 'মৃতদেহটা ছিলো কোথায়?'

সার্জেন্ট ফিলিপস উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, 'ঠিক যেখানটায় আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, স্যার।'

লেন ক্ষিপ্রভাবে একপাশ সরে গেলেন। পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন মুহূর্ত আগে দাঁড়িয়ে থাকা জায়গাটার দিকে।

ফিলিপস বলে চললো, 'ভেলাটা যেখানে থামানো হয়েছিলো, তা থেকে অনুমান করা যায় মিসেস মার্শাল পৌনে এগোরোটা নাগাদ এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। জোয়ার-ভাটার নিয়ম থেকেই সময়টা অনুমান করছি। আর এখন সমুদ্রের জল দূরে সরে যাওয়ায় ভেলার মুখটা একপাশে ঘুরে গেছে।'

'ফটো-টটো যা তোলার তোলা হয়ে গেছে?' ওয়েস্টন প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, স্যার।'

ওয়েস্টন ফিরলেন রেডফার্নের দিকে।

'আসুন মশাই, এবারে আপনার গুহার রাস্তাটা দেখান—'

প্যাট্রিক রেডফার্ন তখনও স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলো ধর্মযাজকের প্রথম দাঁড়ানো জায়গাটার দিকে। যেন উপুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহটা এখনও তাঁর চোখের সামনে ভাসছে।

ওয়েস্টনের কথায় তার সম্বিৎ ফিরলো। সে বললো, 'ওই তো ওখানে—'

পাহাড়ের গায়ে সুপ্রাচীন ধ্বংসাশেষের সৌন্দর্য নিয়ে জড়ো করা ছিলো একরাশ ছোটবড় পাথর; সেদিকেই এগিয়ে চললো রেডফার্ন। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটো বড় পাথরে মাঝামাঝি একটা সরু ফাটলের সামনে গিয়ে থামলো সে। বললো, 'এটাই গুহায় ঢোকার পথ।'

ওয়েস্টন বললেন, 'এটা? দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে না একটা মানুষ কোনরকমে ঢুকতে পারবে।'

'ওটা মনের ভুল একটু পরেই বুঝতে পারবেন—'

ওয়েস্টন ধীরেসুস্থে ফাটলে প্রবেশ করলেন। ফাটলটা দেখে যতটা সরু মনে হয়েছিলো ততটা নয়। ভেতরে জায়গাটা ক্রমশ চওড়া হয়ে বড়সড় গুহার আকার নিয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে অথবা ঘুরেফিরে বেড়াতে কোনরকম অসুবিধে নেই।

এরকুল পোয়ারো এবং স্টিফেন লেন পুলিশ-প্রধানকে অনুসরণ করলেন। অন্যান্যরা বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ফাটল দিয়ে আলোর রেশ ভেতরে এলেও গুহাকে আলোকিত করা পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ওয়েস্টন একটা শক্তিশালী টর্চ জ্বালিয়ে ইতস্তত দেখতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি মন্তব্য করলেন, 'বেশ জায়গা। বাইরে থেকে বোঝবারই উপায় নেই। তারপর মেঝের প্রতিটি অংশ টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

এরকুল পোয়ারো শান্তভাবে বাতাসের গন্ধ নিচ্ছিলেন।

সেটা লক্ষ্য করে ওয়েস্টন বললেন, 'বাতাস মোটামুটি বিশুদ্ধ। শ্যাওলার গন্ধ বা আঁশটে গন্ধ নেই। অবশ্য জায়গাটা জোয়ারের জলের আওতার বাইরে।'

কিন্তু পোয়ারো সূক্ষ্ম ঘ্রাণশক্তি ধরা পড়লো, বাতাস শুধু যে বিশুদ্ধ তা নয়,তার সঙ্গে মিশে আছে একটা হালকা মিষ্টি সুগন্ধ। অন্তত দুজনকে তিনি জানেন, যাঁরা এই ছলনাময়ী সুগন্ধী ব্যবহার করেন...

ওয়েস্টনের টর্চ ক্ষান্ত হয়ে থামলো। তিনি বললেন, 'অস্বাভাবিক কিছুই পড়লো না।'

মাথার ঠিক ওপরেই একটা সরু তাকের দিকে চোখে পড়লো পোয়ারোর। মৃদু স্বরে তিনি বললেন, 'ওখানে যে কিছু নেই সেটা দেখে নিলে ভালো হয় না?'

ওয়েস্টন বললেন, 'যদি কিছু থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেটা কেউ ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছে।... বলছেন যখন, দেখাই যাক।'

পোয়ারো স্টিফেন লেনকে বললেন, 'আমাদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে দীর্ঘকায় মঁসিয়ে লেন, তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে ওই তাকে যে কিছু নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে আমাদের দয়া করে আশ্বস্ত করুন।'

লেন পা উঁচু করে হাত বাড়িয়েও তাকের ভেতর পর্যন্ত নাগাল পেলেন না। তখন পাথরের গায়ে একটা ফোকরে পা দিয়ে এক হাতে তাকের কিনারা ধরে বেয়ে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এলো, 'আরে একটা বাক্স রয়েছে দেখছি।

মিনিটখানেকের মধ্যে ধর্মযাজকের আবিষ্কারকে পরখ করতে করতে তাঁরা বাইরে সূর্যালোকে পা রাখলেন।

ওয়েস্টন বললেন, 'সাবধান! প্রয়োজনের বেশি হাত দেবেন না। কোন হাতের ছাপ-টাপ থাকলেও থাকতে পারে।'

টিনের তৈরি বাক্সটার রঙ গাঢ় সবুজ। এবং তার গায়ে স্যান্ডউইচ শব্দটি লেখা রয়েছে।

সার্জেন্ট ফিলিপস বলল, 'হয়তো পিকনিক করতে এসে কেউ ফেলে গেছে।'

রুমালে ধরে বাক্সের ঢাকনা খুললো সে।

ভেতরে নুন, গোলমরিচ, রাই লেখা কয়েকটা ছোট ছোট টিনের কৌটো রয়েছে: আর রয়েছে দুটো বড় কৌটো—নিঃসন্দেহে স্যান্ডউইচ রাখবার জন্য। সার্জেন্ট ফিলিপস নুনের কৌটোর ঢাকনাটা খুলে ফেললো। ভেতরটা কানায় কানায় ভর্তি। পরে কৌটোটার ঢাকনা খুলে সে মন্তব্য করলো, হুঁ—গোলমরিচ লেখা কৌটোতেও নুন রয়েছে। দেখছি।'

রাই-এর কৌটোর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

হঠাৎ সতর্ক হলো ফিলিপস-এর আচরণ। বড় কৌটো দুটোর একটা খুললো সে। তাতেও সেই একই সাদা স্ফটিকের গুঁড়ো।

আরও সতর্ক তৎপর ভঙ্গীতে একটা আঙুল সাদা গুঁড়োয় ডুবিয়ে দিলো সার্জেন্ট ফিলিপস। আঙুলটা তুলে জিভে ঠেকালো।

তার মুখভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটলো। সে বলে উঠলো—তার কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা। 'এটা মোটে নুন নয়, স্যার। নুন হতেই পারে না! ভীষণ তেতো লাগছে। মনে হচ্ছে কোন মাদকদ্রব্য হবে।'

২

'তিন নম্বর দৃষ্টিকোণ।' প্রায় আর্তনাদের সুরে বললেন ওয়েস্টন।

ওঁরা আবার হোটেলে ফিরে এলেন।

পুলিশ-প্রধান বলতে লাগলেন, 'যদি মাদকদ্রব্য চালানের কোন দল কোন কারণে এর সঙ্গে জড়িত থেকে থাকে, তাহলে নতুন কয়েকটা সম্ভাবনার কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। প্রথমত, মৃত মহিলাটি হয়তো সেই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আপনার কি মনে হয়?'

এরকুল পোয়ারো সতর্কভাবে উত্তর দিলেন, 'অসম্ভব নয়।'

'হয়তো তাঁর মাদকদ্রব্যের নেশা ছিলো?'

অসমর্থনে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। বললেন, 'সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁর শক্তি-সাহস ছিলো অবিচল, ছিলো উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, তাছাড়া তাঁর হাতে কোন ইনজেকশানের ছুঁচের দাগ আমার নজরে পড়েনি। (অবশ্য এ থেকে স্থির নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ অনেকে শুধুমাত্র আঘ্রাণ নিয়েই এ ধরনের নেশা করে থাকেন।) না, আমার মনে হয় না তাঁর এ সব নেশা ছিলো।'

'সেক্ষেত্রে', চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন, ওয়েস্টন, তিনি হয়তো আকস্মিকভাবেই এই মাদকদ্রব্যের ব্যবসার ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন, এবং পরিণতিস্বরূপ সেই দলের লোকেরা চিরতরে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। ওই সাদা জিনিসটা যে কি সেটা এখুনি আমরা জানতে পারবো। ওটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে নীসডনের কাছে পাঠিয়েছি। যদি সত্যিই কোন মাদকদ্রব্য চালানের দল এর পেছনে থেকে থাকে, তাহলে ছোটখাটো তুচ্ছ ঘটনার তারা থেমে থাকবে না।'

দরজা খুলে মিঃ হোরেস ব্ল্যাট ঘরে প্রবেশ করতেই মাঝপথে থমকে গেলেন ওয়েস্টন।

মিঃ ব্ল্যাটের মুখমণ্ডল সূর্যতাপে রক্তাভ। তিনি কপালের ঘাম মুছছিলেন। তাঁর দরাজ কণ্ঠস্বরের তরঙ্গে ছোট্ট ঘরটা গমগম করতে লাগলো।

'এইমাত্র ফিরে এসেই খবরটা শুনলাম। আপনি পুলিশ-প্রধান? ওদের কাছেই শুনলাম আপনি এখানে আছেন। আমার নাম ব্ল্যাট—হোরেস ব্ল্যাট। কোনরকম সাহায্য করতে পারবো কিনা? মনে হয় না। সেই ভোরে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, গোটা দিনটাই বাইরে কেটেছে। আর সেই জন্যেই এমন একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা থেকে পুরোপুরি ফাঁকি পড়লাম। এরকম একটা নির্জন জায়গা যখন একটা ঘটনার মতো ঘটনা ঘটলো তখন কিনা আমি থাকলাম না। সত্যি, জীবনটাই এইরকম, কি বলেন? আরে, মঁসিয়ে পোয়ারো যে! আপনাকে তো খেয়ালই করিনি। আপনিও তাহলে এর মধ্যে রয়েছেন? অবশ্য থাকবেন না-ই বা কেন! শার্লক হোমস বনাম স্থানীয় পুলিশ—ঠিক বলিনি? হা-হা! লেসট্রেড—ওই জাতীয় সমস্ত ব্যাপার। আঃ আপনার শখের গোয়েন্দা গিরি দেখতে আমার ভালোই লাগবে।'

মিঃ ব্ল্যাট এগিয়ে এসে একটা চেয়ার অধিকার করলেন, সিগারেট কেস বের করে এগিয়ে ধরলেন ওয়েস্টনের দিকে। ওয়েস্টন সবিনয় প্রত্যাখ্যান জানালেন। ছোট্ট হাসি হেসে বললেন, 'আমি মশাই এক নম্বরের পাইপ ভক্ত।'

'আমিও তাই। সিগারেটও অবশ্যই খাই—তবে পাইপের কাছে কিস্যু না।'

কর্নেল ওয়েস্টন হঠাৎ অন্তরঙ্গ সুরে বলে উঠলেন, 'তাহলে পাইপটা ধরান না মশাই।'

হোরেস ব্ল্যাট মাথা নাড়লেন।

'এই মুহূর্তে পাইপটা সঙ্গে নেই। এবারে দয়া করে একটু ঝেড়ে কাশুন তো। এ পর্যন্ত যেটুকু আমি শুনেছি তা হলো, মিসেস মার্শালকে নাকি এ অঞ্চলের কোন বেলাভূমিতে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

'পিক্সি কোভে।' ব্ল্যাটের মুখে অপলক চোখ রেখে শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওয়েস্টন।

কিন্তু মিঃ ব্ল্যাট নিছকই উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'শুনলাম তাঁকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে?'

'ঠিক শুনেছেন।'

'ওঃ, নৃশংস—বড় নৃশংস। তবে জানবেন, মেয়েটা নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলো। ওরকম গরম ঝাঁঝালো মশলা—কি বলেন, মঁসিয়ে পোয়ারো? কাজটা কে করলো কিছু আঁচ পেলেন। নাকি প্রশ্নটা করা ঠিক উচিত হচ্ছে না?'

হালকা হাসি হেসে কর্নেল ওয়েস্টন বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মিঃ ব্ল্যাট, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশ্নগুলো আমাদেরই করবার কথা।'

মিঃ ব্ল্যাট সিগারেটসমেত হাত নাড়লেন।

'দুঃখিত—অত্যন্ত দুঃখিত, আমারই ভুল হয়েছে। বলুন, কি জানতে চান।'

'আপনি আজ সকালে নৌকো বাইতে বেরিয়েছিলেন। ক'টার সময়?

'পৌনে দশটা নাগাদ এখান থেকে বেরোই।'

'সঙ্গে কেউ ছিলো?'

'কেউ না। আমিই ছিলাম একমাত্র নিঃসঙ্গ যাত্রী।' হাসলেন ব্ল্যাট।

'কদ্দুর গিয়েছিলেন?'

সমুদ্রের তীর ধরে প্লিমাউথের দিকে। সঙ্গে খাবার ছিলো। তেমন হাওয়া না থাকায় বেশি দূর যেতে পারিনি।'

আরও দু-একটা প্রশ্নের পর ওয়েস্টন জিগ্যেস করলেন, 'এবার মার্শালদের কথায় আসি; আমাদের সাহায্যে আসতে পারে এমন কিছু ওঁদের সম্পর্কে জানেন?'

'আমার মতামত তো আপনাকে জানিয়েই দিয়েছি। এ অপরাধ প্রেম-প্রবঞ্চনার পরিণতি। তবে এটুকু হলফ করে বলতে পারি, এ কাজ আমার নয়। আমার জীবনে সুন্দরী আর্লেনার মুখ্য অথবা গৌণ কোন ভূমিকা ছিল না। মেয়েটা ওর নীল-নয়নে ছোকরাটাকে নিয়ে দিব্যি ছিলো। আর যদি জিগ্যেস করেন তাহলে বলবো, ব্যাপারটা ক্রমশ মার্শালের নজরে আসছিলো।'

'এ ধারণার সমর্থনে কোন প্রমাণ আছে?'

'দু-একবার ওকে ঘৃণাভরে চোখে রেডফার্নের দিকে তাকাতে দেখেছি। ... মার্শালকে চেনা বড় শক্ত। দেখে মনে হয় খুবই শান্ত এবং নম্র স্বভাবের—যেন সর্বক্ষণ তন্দ্রায় ডুবে আছে, কিন্তু লন্ডনে ওর খ্যাতি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ওর সম্পর্কে দু-একটা কথা আমারও কানে এসেছে। একবার তো মারপিট করার জন্যে আদালতমুখো হতে হতে বেঁচে গেছেন। তবে এটা জানবেন, ওই ফরিয়াদী লোকটা মার্শালের সঙ্গে অত্যন্ত নোংরা ব্যবহার করছিলো। মার্শাল বিশ্বাস করেছিলো। লোকটাকে আর সে মার্শালের দুর্দিনে সেই বিশ্বাসের মুখে লাথি মেরে সরে পড়েছিলো। কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় হয়েছিলো, সেটা আমিও মানি। মার্শাল রাগে অন্ধ হয়ে লোকটাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো। সেটা আমিও মানি। মার্শাল রাগে অন্ধ হয়ে লোকটাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো। লোকটা অবশ্য আদালতে আর যায়নি—ভয় পেয়েছিলো, যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসে। যতটুকু শুনেছি আপনাদের বললাম—সত্যি-মিথ্যে জানি না।'

'তাহলে আপনার ধারণা,' বললেন, পোয়ারো, ক্যাপ্টেন মার্শালের পক্ষে তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করা অসম্ভব নয়?'

'উহুঁ, মোটেই না। সে কথা আমি একবারও বলিনি। শুধু বলেছি, মার্শাল এমন ধরনের লোক যে সময়ে সময়ে হঠাৎই ক্ষেপে উঠতে পারে।'

পোয়ারো বললেন, 'মিঃ ব্ল্যাট, কতকগুলো কারণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিশ্বাস, মিসেস মার্শাল আজ সকালে পিক্সি কোভে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই 'একজন' টি কে হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

মিঃ ব্ল্যাট চোখ টিপলেন।

'মনে হয়-টয় নয়! একেবারে সঠিক বলতে পারি। রেডফার্ন!'

'না, মিঃ রেডফার্ন নন।'

মিঃ ব্ল্যাট যেন থিতিয়ে গেলেন। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'রেডফার্ন নয়? তাহলে আমি ঠিক বলতে পারছি না... মানে, আর কাউকে সেরকম মনে হচ্ছে না...'

আংশিক আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে তিনি বলে চললেন, 'আগেও বলেছি এখনও বলছি—সেই 'একজন' টি আই নই। সে সৌভাগ্য কখনও হয়নি। দাঁড়ান, ভেবে দেখি—নাঃ, গার্ডেনারে হবে না, কারণ ওর বউটা সর্বক্ষণ শ্যেনদৃষ্টিতে ওর ওপরে নজর রাখে। আর ওই বুড়ো বেতো ঘোড়া ব্যারীটা? রামোঃ! পাদ্রীসাহেবও হবেন বলে মনে হচ্ছে না। তবে মনে রাখবেন, আমাদের সম্মানিত পাদ্রীসাহেবকে প্রায়ই দেখেছি আর্লেনাকে লক্ষ্য করছেন : পুরোপুরি ধর্মীয় ঘৃণার দৃষ্টিতে, কিন্তু সেই সঙ্গে সেই ধর্মীয় চোখ মেয়েটার শরীরের চড়াই-উৎরাইগুলাকে রেহাই দেয়নি। কি বুঝলেন? শালা বেশিরভাগ পাদ্রীই এক নম্বরের ভণ্ড। গতমাসের মামলার খবরটা পড়ে ছিলেন? ধর্মযাজক আর গীঁজার দারোয়ানের মেয়ের কেলোর কীর্তি! এ সব কেচ্ছা দেখে লোকের তো চোখ খুলে যাওয়া উচিত।'

চাপা হাসিতে মুখর হলেন হোরেস ব্ল্যাট।

কর্নেল ওয়েস্টন শীতলকণ্ঠে বললেন, 'আমাদের সাহায্যে আসতে পারে এমন কিছু আপনি তাহলে জানেন না?'

মিঃ ব্ল্যাট মাথা নাড়লেন 'উঁহু,' সেরকম কিছু মনে পড়ছে না।' একটু থেমে তিনি যোগ করলেন, 'এ ধরনের একটা ব্যাপারটা নিয়ে যে বেশ তোলপাড় হবে, বুঝতে পারছি। কাগজের লোকেরা তো জায়গাটাকে একেবারে মাছির মতো ছেঁকে ধরবে। জলি রজারে যে বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিলো ভবিষ্যতে তার খুব বেশি আর অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হয় না। জলি রজারই বটে! এই না হলে আর আনন্দমুখর পরিবেশ!'

এরকুল পোয়ারো অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'এখানে ছুটির দিনগুলো আপনার ভালো লাগেনি?'

মিঃ ব্ল্যাটের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল আরো রক্তিম হলো। তিনি বললেন, 'সত্যি কথা বলতে গেলে, না, ভালো লাগেনি নৌকো বাওয়া, নিসর্গ দৃশ্য, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, অতিথিসেবা, এ সম্পর্কে কোন অভিযোগ আমার নেই—কিন্তু এ জায়গাটার মিশুকে ভাবটুকুর বড় অভাব, বুঝতেই তো পারছেন কি বলতে চাইছি। আমার কথা হলো, কারো টাকার দামই কারোর চেয়ে কম নয়। আমরা সবাই এখানে এসেছি ছুটি উপভোগ করতে, আনন্দ করতে। তাহলে একসঙ্গে মিলে সেটাই করি না কেন? তা নয়, কেবল দলাদলি, যার যার একা একা বসে আছে, দায়সারা ঠাণ্ডা গলায় সুপ্রভাত, শুভরাত্রি জানাচ্ছে—দম দেওয়া পুতুলের মতো নিষ্প্রাণ সুরে বলছে, আজকের দিনটা ভারী চমৎকার, তাই না—ওঃ অসহ্য।'

মিঃ ব্ল্যাট থামলেন—তাঁর মুখমণ্ডলে রক্তিম প্রলেপ এখন আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল।

কপালে হাত বুলিয়ে ঘাম মুছে অপরাধী সুরে তিনি বললেন, 'যাকগে, আমার কথায় কান দেবেন না। তুচ্ছ জিনিসকে আমি বড় বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলি।'

৩

এরকুল পোয়ারো মৃদু স্বরে বলে উঠলেন, 'তাহলে মিঃ ব্ল্যাট সম্পর্কে আমাদের কি মতামত?'

কর্নেল ওয়েস্টন হাসলেন, বললেন, 'আপনার কি মতামত তাই বলুন। আপনি তাঁকে বেশিদিন ধরে দেখেছেন—'

পোয়ারো কোমল সুরে বললেন, 'আপনাদের ইংরেজি ভাষায় তাঁকে বর্ণনা করার মতো প্রচুর শব্দগুচ্ছ রয়েছে। অমসৃণ হীরে। স্বগঠিত মানুষ।সমাজশীর্ষ আরোহী। তিনি হয়তো বা করুণামাত্রর পাত্র, উপহাস্যম্পদ, অথবা ফূর্তিপ্রিয় যে ভাবে আপনি দেখতে চাইবেন। এটা সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। কিন্তু আমার মনে হয়, এছাড়াও আরও একটা কিছুটা তাঁর চরিত্রে রয়েছে।'

'কি সেটা?'

এরকুল পোয়ারো ওপর দিকে নজর তুলে অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করলেন, 'আমার ধারণা, তিনি বর্তমানে অত্যন্ত বিচলিত!'

৪

ইন্সপেক্টর কলগেট বললেন, 'ওই সময়গুলো আমার যাচাই করা হয়ে গেছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে পিক্সি কোভে নামার মই পর্যন্ত পৌঁছতে তিন মিনিট। অবশ্য এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে, হোটেল থেকে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত আপনি হাঁটছেন, এবং তারপর প্রচণ্ডবেগে দৌড়চ্ছেন।'

ওয়েস্টন ভুরু উঁচিয়ে বললেন, 'আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও কম সময় লাগছে দেখছি!'

'মই বেয়ে নেমে সৈকতে পৌঁছতে এক মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড; আর ওঠবার সময় দু মিনিট। এ সবই কনস্টেবল ফ্রিণ্টের কাজ। অল্পস্বল্প খেলোয়ার বলে ওর নাম আছে। সাধারণভাবে হেঁটে গেলে, মই বেয়ে ওঠা নামা ইত্যাদি সেরে ফিরে আসতে সময় লাগবে মিনিট পনেরো মতো।'

ওয়েস্টন সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন বললেন, 'আরও একটা জিনিস আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে : পাইপের ব্যাপারটা।'

কলগেট বললেন, 'ব্ল্যাট পাইপের নেশা করেন, করেন মার্শাল এবং পাদ্রী ভদ্রলোক। রেডফার্ন পছন্দ করেন সিগারেট, মার্কিন ভদ্রলোক চুরুট। মেজর ব্যারী একেবারেই ধুমপান করেন না। মার্শালের ঘরে একটা

পাপি রয়েছে, ব্ল্যাটের ঘরে দুটো; পাদ্রীর ঘরে একটা। পরিচারিকা বলছে, মার্শালের নাকি দুটো পাইপ আছে। অন্য পারিচারিকাটি তেমন চালাক চতুর নয়। বাকি দুজনের ক'টা করে পাইপ আছে সঠিক জানে না। অনুমানে বলছে, 'ওঁদের ঘরে দু-তিনটি করে পাইপ সে পড়ে থাকতে দেখেছে।'

ওয়েস্টন সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন।

'আর কিছু?'

'হোটেল কর্মচারীদের সম্পর্কে খোঁজখবর করা হয়ে গেছে। ওদের মধ্যে কোন গলদ নেই। পানশালার পরিচারক হেনরী, তার সঙ্গে মার্শালের যে এগোরোটা বাজতে দশে দেখা হয়েছে সে কথার সমর্থন করছে। সৈকতে পরিচারক উইলিয়াম আজ সকালের বেশিরভাগ সময় হোটেল থেকে নিচের পাথরে নামার সিঁড়িটা মেরামতের কাজে ব্যস্ত ছিলো। মনে হয় না, ওর কথায় কোন ফাঁকি রয়েছে। জর্জ টেনিস কোটে দাগ কাটার কাজ সেরে খাবার ঘরে চারদিকে কতকগুলো গাছের চারা লাগায়। সেতু পার হয়ে কেউ দ্বীপে এসে থাকলে সেটা ওদের কারোরই নজরে পড়তো না।'

'জোয়ারের জল সেতুর নীচে নেমেছে কখন?'

'সাড়ে ন'টা নাগাদ, স্যার।'

'হুম—' ওয়েস্টন গোঁফে তা দিতে লাগলেন, 'তাহলে সেতু পার হয়ে সত্যিই যদি কেউ দ্বীপে এসে থাকে, আমি মোটেই অবাক হবো না। কারণ আমরা একটা নতুন সূত্র পেয়েছি কলগেট।'

তিনি গুহা থেকে স্যান্ডউইচের বাক্স আবিষ্কারে ঘটনাটা খুলে বললেন।

৫

দরজায় টোকার শব্দ হতেই ওয়েস্টন বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

আগন্তক ক্যাপ্টেন মার্শাল।

তিনি বললেন, 'কবে নাগাদ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করবো কিছু বলতে পারেন?'

'আমার মনে হয়, করোনারের বিচার পরশুদিনই শেষ হয়ে যাবে, ক্যাপ্টেন মার্শাল।'

'ধন্যবাদ।'

ইন্সপেক্টর কলগেট বললেন, 'একমিনিট স্যার, এগুলো দয়া করে নিয়ে যাবেন।'

চিঠি তিনটি ক্যাপ্টেন মার্শালের হাতে দিলেন কলগেট।

হাসলেন কেনেথ মার্শাল—হাসিতে ব্যঙ্গের ছোঁয়া।

তিনি বললেন, 'আমার টাইপ করার গতিবেগ পুলিশ-বিভাগ পরীক্ষা করে দেখছিলো বুঝি? আশা করি আমাকে সন্দেহ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে—'

কর্নেল ওয়েস্টন খুশিভরা কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন মার্শাল; আপনি আমাদের কাছ থেকে নির্দোষিতার প্রমাণপত্র পেতে পারেন। ওই কাগুজগুলো টাইপ করতে পুরোপুরি এক ঘণ্টাই লাগে। তাছাড়া, এগোরোটা বাজতে পাঁচ মিনিস পর্যন্ত হোটেলের পরিচারিকা আপনাকে টাইপ করতে শুনেছে, আর এগারোটা কুড়িতে আরও একজন সাক্ষী আপনাকে টাইপ করতে দেখেছে।'

ক্যাপ্টেন মার্শাল অস্ফুটস্বরে বললেন, 'তাই নাকি? সব কিছুই অতিরিক্ত সন্তোষজনক মনে হচ্ছে।'

'ঠিক তাই। মিস ডার্নলি এগারোটা কুড়িতে আপনার ঘরে এসেছিলেন। আপনি টাইপ করতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁকে খেয়াল করেননি।'

কেনেথ মার্শালের মুখমণ্ডল আবৃত হলো অভিব্যক্তিহীন অভিব্যক্তিতে। তিনি বললেন, 'মিস ডার্নলি বুঝি তাই বলেছেন? তিনি একটু থামলেন, 'সত্যি কথা বলতে কি তার একটু ভুল হয়েছে। আমিও তাঁকে দেখতে পেয়েছি, তবে তিনি সেটা জানেন বলে আমার মনে হয় না। সামনের আয়নায় আমি তাঁর প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম.'

পোয়ারো অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'কিন্তু আপনি টাইপ বন্ধ করেননি।'

মার্শাল সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিলেন, 'না, আমার শেষ করার তাড়া ছিলো।'

মিনিটখানেক নীরব থাকার পর হঠাৎই তিনি বলে উঠলেন, 'আর কিছু আপনাদের জানার আছে?'

'না ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন মার্শাল।'

কেনেথ মার্শাল ধন্যবাদ গ্রহণ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

'ওয়েস্টন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওই চলে যাচ্ছে আমাদের অতি প্রত্যাশিত হত্যাকারী—নিজেকে সম্পর্ণ নির্দোষ প্রতিপন্ন করে!... এই তো, নীসডন এসে পড়েছেন।'

ডাক্তারের আচার-ব্যবহারে উত্তেজনার সামান্য ছোঁয়া। তিনি বললেন, 'সাঙ্ঘাতিক যা হোক এক জিনিস পাঠিয়েছেন, মশাই।'

'কেন, কি ওটা?'

'কি ওটা? ডায়ামরফিন হাইড্রোক্লোরাইড! যে জিনিসটাকে সচরাচর হেরোইন বলা হয়ে থাকে।'

ইন্সপেক্টর কলগেট চাপা শিস দিয়ে উঠলেন বললেন, 'এবারে পায়ের তলায় শক্ত মাটির পাওয়া যাচ্ছে। এই মাদকদ্রব্যের ব্যাপারটা যে সমস্ত ঘটনার মূলে তা আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

দশম পরিচ্ছেদ

১

জনতার ছোট্ট দলটা বেরিয়ে এলো 'রেড বুল'-এর বাইরে, ইতস্তত ছড়িয়ে পড়লো। করোনান্দের সংক্ষিপ্ত বিচার আজকের মতো শেষ—মুলতুবী রাখা হয়েছে পক্ষকালের জন্য।

রোজমণ্ড ডার্নলি ক্যাপ্টেন মার্শালের সঙ্গে নিলো। ও নিচু গলায় বললো, যতটা ভেবেছিলাম সেরকম খারাপ কিছু হয়নি, কি বলো, কেন?'

তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিলেন না ক্যাপ্টেন মার্শাল। হয়তো উপস্থিত গ্রামবাসীদের নির্লজ্জ অপলক দৃষ্টি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, সচেতন ছিলেন তাদের প্রায় উদ্যত তর্জনী সম্পর্কে।

'এর কথাই তোমাকে বলছিলাম গো।' দ্যাখো, ওই যে মরা মেয়েটার স্বামী।' 'হ্যাঁ, ওই লোকটার বউটাকে কে যেন খুন করেছে।' দেখতে পাচ্ছো ওই যে যাচ্ছে...'

জ্ঞানের তীব্রতা তাঁর শ্রবণে আসার পক্ষে যথেষ্ট নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অনুভব করতে পারছিলেন তাদের উপস্থিতি, তাদের লক্ষ্যস্থল। অতীতের শাস্তি স্তম্ভের এই বোধহয় আধুনিক রূপ। ইতিপূর্বে সাংবাদিকদের মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়েছে—'কিছুই বলার নেই'—জাতীয় যে নীরবতার প্রাচীর তিনি তাঁদের কাছে গড়ে তুলেছেন তা দক্ষ হাতে চুরমার করে দিয়েছে। সেই আত্মপ্রত্যয়ী অধ্যবসায়ী তরুণেরা এমন কি যে সব সংক্ষিপ্ত শব্দ করে কোন ক্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তকে তিনি এড়াতে চেয়েছেন, সেই শব্দগুচ্ছই আজকের প্রভাতী সংবাদপ্রত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

'তাঁর স্ত্রী মৃত্যুরহস্যকে একমাত্র এ ধরনের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, কোন স্বভাব-অপরাধী ঘটনাচক্রে এই দ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলো, এ বিষয়ে তিনি একমত কিনা প্রশ্ন করা হলে ক্যাপ্টেন মার্শাল বলেন—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্লিক-ক্লিক...ক্যামেরা ঝলসে উঠেছে ক্লান্তিহীনভাবে। আর এখন, এই মুহূর্তে সেই বহু পরিচিত ছোট্ শব্দ আবার তাঁর কানে এলো। ঘুরে তাকালেন তিনি—একটি যুবক, ঠোঁটে তার হাসি, নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে খুশি-খুশিভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

রোজমণ্ড অস্ফুট কণ্ঠে বললো, ক্যাপ্টেন মার্শাল ও তাঁর জনৈক বান্ধবী বিচারে শেষে রেড বুল থেকে বেরিয়ে আসছেন।'

মার্শাল সঙ্কুচিত হলেন।

রোজমন্ড বলল, 'এড়াবার চেষ্টা করে লাভ নেই, কেন? বাস্তবের মুখোমুখি তোমাকে হতেই হবে! আমি শুধু আর্লেনার মৃত্যু কথা বলছি না—আনুষঙ্গিক সমস্ত নোংরা ব্যাপারগুলোর কথাও বলছি। দশজনের নির্লজ্জ চোখ, পরচর্চায় মুখর জিভ, কাগজের লোকেদের বোকা বোকা সাক্ষাৎকার—এসবের মুখোমুখি হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো পুরো ব্যাপারটাকে কৌতুকের চোখে দেখা। পুরনো যত বস্তাপচা শব্দে এর জবাব দিয়ে ব্যঙ্গ ভরা কুটিল ঠোঁটে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকো।'

তিনি বললেন, 'তুমি বুঝি তাই করতে?'

'হ্যাঁ।' একটু থামলো ও, 'এবং তুমি তা করবে না আমি জানি। তোমার পথ হলো বর্ণচোরা বহুরূপীর পথ। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থেকে পটভূমিতে মিলিয়ে যাওয়া। কিন্তু এখানে তোমার সে কায়দা খাটবে না, কারণ মিলিয়ে যাওয়ার মতো কোন পটভূমি এখানে নেই। এখানে সকলের চোখে তুমি ভীষণভাবে স্পষ্ট—সাদা পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা হলদে-কালো ডোরা কাটা কোন বাঘের মতো। কারণ তুমি ''নিহত-মহিলার-স্বামী''।'

'দোহাই তোমার, রোজমণ্ড!'

শান্তস্বরে বলল ও, 'তোমার ভালোর জন্যই এসব বলছি, সোনা।'

কিছুটা পথ ওঁরা নীরবে এগিয়ে গেলেন। তারপর ভিন্ন সুরে বললেন মার্শাল, জানি, রোজমণ্ড, জানি। আমাকে অতটা অকৃতজ্ঞ ভেবো না।'

ক্রমে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে এলেন ওঁরা। দূরাগত কৌতূহলী দৃষ্টি এখনও ওঁদের অনুসরণ করলেও কাছাকাছি কেউ নেই। রোজামণ্ড ডার্নলি ওর প্রথম মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলো ভিন্নভাবে, ওর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকের চেয়ে নিচু হলো, 'ওখানে সত্যি সত্যিই তেমন খারাপ কিছু হয়নি কি বলো?'

এক মুহূর্ত নীরব রইলেন তিনি, তারপর বললেন, 'কি জানি, জানি না।'

'পুলিশ কি ভাবছে?'

'ওরা স্পষ্ট করে কিছু বলছে না।'

মিনিটখানেক নীরবতার পর রোজমণ্ড বলল, 'আর আমাদের সেই ক্ষুদে মানুষটি—পোয়ারো—তিনি কি সত্যিই এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন?'

কেনেথ মার্শাল বললেন, সেদিন তো দেখে মনে হলো, পুলিশ-প্রধানের সঙ্গে আঠার মতো সর্বক্ষণ লেগে রয়েছেন।'

'সে জানি—কিন্তু তিনি কি সত্যিই কিছু করছেন?'

'আমি কি করে জানবো, রোজামণ্ড?'

চিন্তিত স্বরে বলল, ভদ্রলোকর বয়েস হয়েছে। সম্ভবত অল্পসল্প ভীমরতিগ্রস্ত।'

'হতে পারে।'

ওঁরা কংক্রীটের সেতুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। সেতুর ও প্রান্তে সূর্যালোকে আলোকিত দ্বীপটা যেন একরাশ প্রশান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

রাজামণ্ড হঠাৎই বললো, 'কখনো কখনো—সবকিছু কেমন অবাস্তব বলে মনে হয়। এই মুহূর্তে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, ওরকম একটা নৃশংস ঘটনা এখানে ঘটতে পারে...'

মার্শাল ধীরে ধীরে বললেন, 'জানি, তুমি কি বলতে চাইছো। কিন্তু প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুর। বহু জনপ্রাণীর একটি না হয় ক্রমেই গেলো। প্রকৃতির কাছে এটা এরকমই তুচ্ছ, তার বেশি কিছু নয়।'

রোজামণ্ড বলল, 'সত্যি—হয়তো এইভাবেই ব্যাপারটা আমাদরে দেখা উচিত।'

চকিত চোখে ওর দিকে তাকালেন তিনি। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'ভেবো না, রোজমণ্ড। সব ঠিক আছে। স-ব ঠিক আছে।'

২

ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে সেতুর ওপ্রান্তে এসে দাঁড়ালো লিন্ডা। ওর চলাফেরায় দ্বিধাগ্রস্ত অশ্বশাবকের আকস্মিক চঞ্চল ভঙ্গী। চোখের কোলে গভীর কালো ছায়া ও কচি মুখের সৌন্দর্যকে অনেকাংশে ম্লান করে দিয়েছে। ওষ্ঠাধারে শুষ্কতা ও রুক্ষতা প্রকটভাবে স্পষ্ট।

রুদ্ধশ্বাসে ও বললো, 'কি হলো—কি বললো ওরা?'

ওর বাবা সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, 'বিচার দু সপ্তাহের জন্য মুলতুবী রাখা হয়েছে।'

'তার মানে ওরা—ওরা এখনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি?'

'হ্যাঁ। এখনও অনেক সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন আছে।'

'কিন্তু—কিন্তু ওদের কি মনে হচ্ছে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামান্য হাসলেন মার্শাল।

'বড় অবুঝ তুমি—কে বলতে পারে ওরা কি ভাবছে? তাছাড়া 'ওরা' বলতে তুমি কার কথা বলছো? করোনারের, জুরিদের, পুলিশের, কাগজের সাংবাদিকদের নাকি লেদারকোম্ব উপসাগরে জেলেদের কথা?'

লিন্ডা আস্তে আস্তে বলল, 'মনে হয় আমি—পুলিশের কথাই বলতে চাইছি।'

মার্শাল নীরস কণ্ঠে বললেন, 'পুলিশ যাই ভাবুক না কেন, সেটা এখুনি ওরা কাউকে বলছে না।'

কথার শেষে তাঁর ঠোঁটের রেখা সূক্ষ্ম হলো, কঠিন হলো। তিনি হোটেলে প্রবেশ করলেন।

রোজামণ্ড ডার্নলিও যখন একই পদাঙ্ক অনুসরণে পা বাড়িয়েছে, লিন্ডা ডাকলো, 'রোজামণ্ড!'

রোজামণ্ড ঘুরে দাঁড়ালো। মেয়েটার অসুখী মুখমণ্ডলে নীরব কাকুতি ওর হৃদয় স্পর্শ করলো। লিন্ডার হাতে হাত রাখলো ও। তারপর হোটেলকে পেছনে রেখে সরু পথ ধরে ওরা এগিয়ে চললো, 'দ্বীপের দূরপ্রান্তের দিকে।

রোজমণ্ড শান্ত স্বরে বলল, এত বেশি ভেবো না, লিন্ডা। আমি জানি ব্যাপারটা কত নিষ্ঠুর, এবং তোমার কাছে কত বড় একটা মানসিক আঘাত—সবই জানি, কিন্তু সে নিয়ে শুধু শুধু চিন্তা করে কোন লাভ নেই। আর যে জিনিসটা সর্বক্ষণ তোমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে তা হলো ঘটনার বীভৎসতা—তার বেশি কিছু নয়। কারণ তুমি নিজেও খুব ভালোভাবে জানো, আর্লেনাকে তুমি একটুও পছন্দ করতে না।'

লিন্ডার শরীরে আকস্মিক কম্পন রোজমণ্ড অনুভব করতে পারলো, সেই সঙ্গে শুনতে পেলো মেয়েটার উত্তর।

'না, ওকে আমার মোটেও ভালো লাগত না...'

রোজামণ্ড বলে চললো, 'কারও জন্যে দুঃখ পাওয়া সম্পূর্ণ অন্য জিনিস—তাকে কখনও লুকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু মানসিক আঘাত এবং আতঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো সে বিষয়ে এতটুকু চিন্তা না করা।'

লিন্ডা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারছো না।'

'মনে তো হয় পারছি, সোনা।'

লিন্ডা মাথা ঝাঁকালো।

'না, পারছো না। তুমি একটুও বুঝতে পারছো না—আর ক্রিস্টিনও কখনও বোঝে না। তোমরা আমাকে এত ভালোবাসো, কিন্তু বুঝতে পারো না আমার মনের অবস্থাটা। তোমরা শুধু ভাবো, আমি অযথা একই জিনিস নিয়ে চিন্তা করে করে অসুস্থ হয়ে পড়ছি।'

ও একটু থামলো। তারপর বললো, 'কিন্তু আসলে মোটেই তা না। আমি যা জানি, তা যদি তুমি জানতে —'

রোজামণ্ড থমকে দাঁড়ালো। নিথর নিষ্পন্দ ওর শরীর এতটুকু কাঁপলো না—বরং কঠিন হলো। মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে রইলো ও, তারপর লিন্ডার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলো নিজের হাত।

ও বললো, 'কি জানো তুমি, লিন্ডা?"

মেয়েটা স্থির চোখে চেয়ে রইলো। তারপর মাথা ঝাঁকালো আপন মনেই বল, 'কিচ্ছু না।'

রোজামণ্ড আচমকা চেপে ধরলো ওর বাহু। চাপের তীব্রতায় ব্যথা পেলো লিন্ডা। ওর মুখমণ্ডলে ঈষৎ যন্ত্রণায় ছাপ ক্ষণিকের তরে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো।

রোজামণ্ড বললো, 'সাবধানে থেকো, লিন্ডা। খুব সাবধানে থেকো।'

ও বললো, 'আমি খুব সাবধানে থাকি—স-ব সময়।'

রোজমণ্ড জরুরি স্বরে বলল, 'শোনো, লিন্ডা, একটু আগেই তোমাকে যে কথা বললাম, এখনও আমি সেই কথাই বলবো—প্রয়োজন হলে আরও একশোবার বলবো। সমস্ত ব্যাপারটা তোমার মন থেকে মুছে ফেলো। কখনও ও নিয়ে ভেবো না। ভুলে যাও—সব ভুলে যাও... চেষ্টা করলেই তুমি পারবে। আর্লেনা মারা গেছে, কোন কিছুর বিনিময়েই ওকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না... সমস্ত ভুলে গিয়ে ভাবো তোমার ভবিষ্যতের কথা। আর সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন : মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে থাকবে।'

লিন্ডা যেন কুঁকড়ে গেলো। ও বললো, 'তুমি—তুমি তাহলে সবই জানো?'

রোজামণ্ড সতেজ কণ্ঠে বললো, 'আমি কিছুই জানি না। আমার মতে, ভবঘুরে কোন পাগল হঠাৎই এই দ্বীপে এসে আর্লেনাকে খুন করেছে। এটাই একমাত্র সম্ভাব্য সাবধান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত পুলিশকেও এ কথা মানতে হবে। কারণ সত্যিই হয়তো তাই ঘটে থাকবে। হয়তো কেন, প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটেছে!'

লিন্ডা বলল, 'যদি বাবাকে—'

রোজমণ্ড বাধা দিলো।

'ও কথা যাক।'

লিন্ডা বললো, 'একটা কথা আমাকে বলতেই হবে। আমার মাকে—'

'বলো, কি হয়েছে তোমার মায়ের?'

'মাকে—মাকে খুনের অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিলো, তাই না?'

'হ্যাঁ—'

লিন্ডা বিলম্বিত স্বরে বললে, 'আর তারপর, বাবা তাকে বিয়ে করে। এ সব দেখে শুনে মনে হয় না যে বাবা খুন করাটাকে সত্যি সত্যি তেমন অন্যায় বলে মনে করে না। অন্তত সব ক্ষেত্রে তো নয়ই।'

রোজমণ্ড তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আর কখনও এ ধরনের কথা উচ্চারণ করবে না—এমন কি আমার কাছেও! তোমার বাবার বিরুদ্ধে পুলিশের হাতে কোন প্রমাণ নেই। তাঁর অ্যালিবাই রয়েছে—এমন অ্যালিবাই যা ওরা শত চেষ্টাতেও ভাঙতে পারবে না। তোমার বাবা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

লিন্ডা ফিসফিস করে বললো, 'তাহলে কি ওরা প্রথমে ভেবেছিলো যে বাবা—?'

রোজমণ্ড চিৎকার করে উঠলো, 'ওরা কি ভেবেছিলো আমি জানি না। কিন্তু এখন ওরা জানে, তাঁর পক্ষে এ কাজ করা সম্ভম ছিলো না। বুঝতে পারছো আমার কথা? তাঁর পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব ছিলো না।'

ওর কথায় কর্তৃত্বের সুর, ওর চোখের শাসনে লিন্ডার মুখমণ্ডলে নেমে এলো নীরব বশ্যতা। মেয়েটার বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো এক সুদীর্ঘ স্পন্দিত নিঃশ্বাস।

রোজমণ্ড বলল, 'শিগগিরই এ জায়গা ছেড়ে তুমি চলে যেতে পারবে। তখন সব ভুলে যাবে—স-ব!'

আকস্মিক অপ্রত্যাশিত বিদ্রোহী সুরে বলে উঠলো লিন্ডা, 'আমি কোনদিন ভুলবো না।'

কথা শেষ করেই ও ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলো হোটেল অভিমুখে।

ওর অপসৃয়মান শরীরের দিকে অপলকে চেয়ে রইলো রোজামণ্ড।

৩

'একটা কথা আপনার কাছে আমি জানতে চাই, মাদাম—'

ক্রিস্টিন রেডফার্ন ঈষৎ আনমনা ভঙ্গীতে চোখ তুলে তাকালো পোয়ারোর দিকে। ও বললো, 'বলুন?"

এরকুল পোয়ারো ওর অন্যমনস্কতাকে তেমন গ্রাহ্য করলেন না। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিভাবে ওর চোখজোড়া পানশালার বাইরে উঠোনে পায়চারির স্বামীকে অনুসরণ করে চলেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে বিশুদ্ধ দাম্পত্য সমস্যায় বিন্দুমাত্রও কৌতূহল তাঁর নেই। তিনি চান প্রয়োজনীয় তথ্য।

তিন বললেন, 'হ্যাঁ, মাদাম, বলছি। একটা সামান্য কথা—সেদিন দৈবক্রমে বলে ফেলা আপনার একটা সামান্য কথা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।'

ক্রিস্টিন প্যাট্রিকের ওপর চোখ রেখেই বললো, 'হ্যাঁ? কি বলেছিলাম আমি?'

'পুলিশ-প্রধানের প্রশ্নের উত্তরে সেই কথাটা আপনি বলেছিলেন। আপনি বলেছেন, 'কিভাবে খুনের দিন সকালে আপনি মিস লিন্ডা মার্শালের ঘরে গিয়েছিলেন, ঘরে তাঁকে পাননি, তারপর কিভাবে তিনি ঘরে ফিরে আসেন, এবং এই সময়ে পুলিশ-প্রধান আপনাকে প্রশ্ন করেছেন মিস মার্শাল ঘর ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন।'

ক্রিস্টিন একটু অধৈর্যভাবেই বললে, 'আর আমি বলেছিলাম ও স্নান করতে গিয়েছিলো? তাই তো?'

হ্যাঁ—কিন্তু আপনি ঠিক এই কথাগুলো বলেননি, মাদাম। আপনি বলেননি 'ও স্নান করতে গিয়েছিলো।' আপনার কথাটা ছিলো, 'ও বললো, ও নাকি স্নান করতে গিয়েছিলো।'

ক্রিস্টিন বললো, 'কিন্তু সে তো একই কথা।'

'না, মাদাম, এক নয়! আপনার উত্তরের ধরন আপনার তরফে এক বিশেষ মনোভাবের ইঙ্গিত দিচ্ছে। লিন্ডা মার্শাল ঘরে এলেন—পরনে তাঁর স্নানের পোশাক, কিন্তু তা সত্ত্বেও—যে কোন কারণেই হোক, আপনার তখন মনে হয়নি তিনি স্নান করতে গিয়েছিলেন। আপনার কথাতেই এ সন্দেহে স্পষ্ট, ''ও বলল, ও নাকি স্নান করতে গিয়েছিলো।'' সুতরাং তাঁর হাবভাবে কি এমন বিশেষত্ব ছিলো—সে কি তাঁর ব্যবহার, অথবা তাঁর পরনের কোন পোশাক, অথবা এমন কোন কথা যা তিনি বলেছিলেন—যার ফলে, তিনি স্নান করতে গিয়েছিলেন শুনে আপনি যথেষ্ট অবাক হন?'

ক্রিস্টিনের মনোযোগ প্যাট্রিককে পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত হলো পোয়ারোর ওপর। ওর মুখমণ্ডলে চাপা কৌতূহল। ও বললো, 'আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। এখন মনে হচ্ছে কথাটা মিথ্যে নয়... লিন্ডা যখন বললো, ও স্নান করতে গিয়েছিলো, তখন সামান্য হলেও আমি অবাক হয়েছিলাম।'

'কিন্তু কেন, মাদাম, কেন?'

'হ্যাঁ, কেন? সেটাই তো এখন মনে করবার চেষ্টা করছি। ওহ-হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে, ওর হাতে একটা প্যাকেট ছিলো।'

'তাঁর হাতে একটা প্যাকেট ছিলো?'

'হ্যাঁ।'

'তার ভেতরে কি ছিলো আপনি জানেন না?'

'ও হ্যাঁ, জানি। সুতোটা হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছিলো। গ্রামের লোকেরা যেরকম করে বাঁধে, প্যাকেটটা সেরকম আলগা করে বাঁধা ছিলো। ভেতরে ছিলো কতকগুলো মোমবাতি। সেগুলা ছড়িয়ে পড়েছিলো মেঝেতে। আমি ওকে মোমবাতিগুলো তুলে রাখতে সাহায্য করেছিলাম।'

'হুঁ—' বললেন পোয়ারো, 'মোমবাতি...'

ক্রিস্টিন অবাক চোখে কয়েক মুহূর্ত তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললো, 'আপনাকে দেখে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে, মঁসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, 'তাঁর মোমবাতি কেনার কারণ কি মিস লিন্ডা আপনাকে বলেছিলেন?'

ক্রিস্টিনের মসৃণ কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো।

'না, যতদূর মনে পড়ছে বলেনি। তবে আমার মনে হয়, রাতে পড়াশোনো করবার জন্যেই ও মোমবাতিগুলো কিনেছিলো—হয়তো ঘরে আলোটা কমজোরী ছিলো।'

'বরং এর বিপরীতটাই সত্যিই, মাদাম। মিস মার্শালের বিছানার পাশে একটা চমৎকার বৈদ্যুতিক আলো আমার নজরে পড়েছে।'

ক্রিস্টিন বললো, 'কি জানি, তাহলে বলতে পারছি না।'

পোয়ারো বললেন, 'সুতো ছিঁড়ে মোমবাতিগুলো যখন পড়ে যায়, তখন তাঁর মুখের অবস্থা কি রকম ছিলো?'

ক্রিস্টিন ধীরে ধীরে বললে, 'ওকে কেমন—বিচলিত—হতবুদ্ধি বলে মনে হয়েছিলো?'

পোয়ারো সমর্থনে মাথা দোলালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তাঁর ঘরে কোন ক্যালেন্ডার আপনার নজরে পড়েছে?'

ক্যালেন্ডার? কিরকম ক্যালেন্ডার?'

পোয়ারো বললেন, 'সম্ভবত একটা সবুজ ক্যালেন্ডার—যার পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।'

স্মৃতি রোমন্থনে সুতীক্ষ্ণ হয়ে এলো ক্রিস্টিনের আয়ত চোখ।

'একটা সবুজ ক্যালেন্ডার—সবুজ না বলে বরং গাঢ় সবুজ বলতে পারেন। হ্যাঁ, ওরকম একটা ক্যালেন্ডার আমি দেখেছি—তবে কোথায় ঠিক মনে করতে পারছি না। হতে পারে লিন্ডার ঘরে, কিন্তু জোর দিয়ে বলতে পারছি না।'

কিন্তু ওরকম একটা জিনিস আপনি দেখেছেন, এটা সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

সম্মতিসূচকভাবে আবার মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

ক্রিস্টিন একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই বললো, 'কিন্তু আপনি কি বলতে চাইছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো? এ সবের অর্থ কি?'

উত্তরে পোয়ারো প্রকাশ করলেন বিবর্ণ-বাদামী চামড়ায় বাঁধানো ছোট বইটা। বললেন, 'এটা আগে কখনও দেখেছেন?'

হ্যাঁ—মনে হয়—মানে, সেদিন গ্রামের লাইব্রেরীতে দাঁড়িয়ে লিন্ডা এই বইটা দেখছিলো, কিন্তু আমাকে আসতে দেখেই ও বইটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে রাখে। ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অবাক লেগেছিলো—কৌতূহলও যে হয়নি তা নয়।'

ডাকিনীবিদ্যা, মায়াবিদ্যা ও লক্ষণহীন বিষের মিশ্রণপদ্ধতির বিস্তারিত ইতিহাস।

ক্রিস্টিন বললো, 'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না, এ সবের মানে কি? পোয়ারো গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এর অর্থ অনেক কিছু হতে পারে, মাদাম।'

ওর সপ্রশ্ন দৃষ্টির কোন উত্তর দেবার পরিবর্তে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আরও একটা প্রশ্ন, মাদাম—খুনের দিন সকালে টেনিস খেলতে যাবার আগে আপনি কি স্নান করেছিলেন?'

ক্রিস্টিন অপলক স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো।

'স্নান? উঁহু। এমনিতেই আমার হাতে সময় কম ছিলো, আর তাছাড়া, তখন স্নান করবার ইচ্ছেও আমার ছিলো না—টেনিস খেলার আগে তো নয়ই। পরে হয়তো করলেও করতে পারতাম।'

'হোটেলে ফিরে এসে স্নানঘরে একবারও গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, শুধু হাত-মুখ ধোবার জন্যে ব্যস।'

'স্নানের জন্য আপনি তাহলে কল খুলে রাখেননি?'

'না। আমার স্পষ্ট মনে আছে খুলিনি।'

পোয়ারো সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'এমনিই জিগ্যেস করলাম...'

৪

মিসেস গার্ডেনার যেখানে বসে একটা 'টুকরো ছবির-ধাঁধার সঙ্গে মানসিক যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, সেই টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন এরকুল পোয়ারো। ভদ্রমহিলা চোখ তুলেই চমকে উঠলেন।

'আরে, মঁসিয়ে পোয়ারো, চুপি চুপি কখন এসে দাঁড়ালেন। আমি তো টেরই পাইনি। এই মাত্র বিচার সেরে ফিরলেন বুঝি? জানেন, বিশেষ করে এ বিচারটার কথা শুনলেই আমাকে নিজেকে কিরকম দুর্বল বলে মনে হয়, কি করবো বুঝে উঠতে পারি না। সেইজন্যেই এই সমুদ্রতীরে আজ আর বসতে পারবো না। মিঃ গার্ডেনার জানেন, যখন আমার মন অস্থির থাকে, তখন তাকে শান্ত করতে এই ধাঁধার জুড়ি নেই! দেখুন তো, এই সাদা টুকরোটা কোথায় লাগবে? নির্ঘাত লোমের কম্বলটার অংশ হবে, কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না...'

অমায়িক ভঙ্গীতে পোয়ারোর হাত ভদ্রমহিলার হাত থেকে টুকরোটা তুলে নিয়ে নিলো। পোয়ারো বললেন, এটা এইখানে বসবে, মাদাম। এটা বেড়ালটার একটা অংশ।'

'হতে পারে না! ওটা তো কালো বেড়াল!'

'কালো বেড়াল, ঠিক কথা, কিন্তু লক্ষ্য করুন, ঘটনাচক্রে বেড়ালটার লেজের প্রান্তভাগ সাদা।'

'আরে, তাই তো! সত্যি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়! কিন্তু তবুও আমার ধারণা, যারা এই ধাঁধাগুলো তৈরি করে, তারা ভীষণ পাজী লোক। আমাদের ঠকানোর জন্যে কত ফন্দীই না আঁটে!'

আরও একটা টুকরো যথাস্থানে বসিয়ে তিনি বলে চললেন, 'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, গত দু-একদিন ধরে আমি আপনাকে লক্ষ্য করছি। কখন আপনি গোয়েন্দাগিরি করেন, সেইটাই আমি স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছি—অবশ্য এভাবে বললে, কথাটা কেমন নিষ্ঠুর শোনায়, যেন পুরো ব্যাপারটাই একটা খেলা—অথচ বেচারা মেয়েটা খুন হলো। ওঃ, প্রত্যেকবার এ কথা ভাবলেই আমি শিউরে উঠি। আজ সকালে মিঃ গার্ডেনারকে বলছিলাম, যে করে হোক এ জায়গা ছেড়ে আমাকে যেতেই হবে, আর এখন বিচার শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি বললেন, তাঁর ধারণা আগামীকালই আমরা রওনা হতে পারবো, এবং এটা নিঃসন্দেহে ভগবানের আশীর্বাদ। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি প্রসঙ্গে বলি, এটা আপনার কায়দা-কানুনগুলো আমার জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে—যদি একটু বুঝিয়ে বলেন, তাহলে সত্যি নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

এরকুল পোয়ারো বললেন, ব্যাপারটা অনেকটা আপনার এই ধাঁধার মতো, মাদাম। সমস্ত টুকরোগুলো প্রথমে এক জায়গায় জড়ো করতে হয়। জিনিসটা ঠিক রঙিন পাথরের কারুকার্যের মতো, বিভিন্ন রঙ, বিভিন্ন নকশা—এবং প্রতিটি অদ্ভুত আকারে ছোট্ট টুকরোকে তাদের মানানসই জায়গায় নির্ভুলভাবে বসিয়ে দিতে হয়।"

'বাঃ, বেশ মজার তো! আর আপনি বলছেনও একেবারে জলের মতো সহজ করে!'

পোয়ারো বলে চললেন, 'এবং কখনও কখনও অবস্থা হয়ে পড়ে আপনার ধাঁধার ওই টুকরোটার মতো। নিয়মমাফিক টুকরোগুলোকে হয়তো 'একটার পর একটা সাজানো হচ্ছে—রঙ অনুয়ায়ী তাদের ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন অংশ—আর ঠিক তখন বিশেষ রঙের একটা টুকরো যেটা মানিয়ে যাওয়া উচিত—ধরুন, লোমের কম্বলের সঙ্গে মানিয়ে গেলো কালো বেড়ালের লেজে।'

'সত্যি মুগ্ধ হয়ে যাবার মতো! আপনার হাতে কি এইরকম অনেক টুকরো রয়েছে, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

হ্যাঁ, মাদাম। এই হোটেলের প্রায় প্রত্যেকেই একটি করে টুকরো উপহার দিয়েছেন আমার ধাঁধার জন্য। তার মধ্যে আপনিও রয়েছেন।'

'আমি?' মিসেস গাডের্নারে কণ্ঠস্বর উত্তেজিত, তীক্ষ্ণ!

'হ্যাঁ, মাদাম, আপনার একটা মন্তব্য আমাকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে, বলা যেতে পারে রহস্যের একটা দিক আলোকিত করে দিয়েছে।'

'শুনে আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে! আর একটু খুলে বলুন না, মঁসিয়ে। পোযারো?'

'মাপ করবেন, মাদাম, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি তুলে রেখেছি শেষ দৃশ্যের জন্য।'

মিসেস গার্ডেনার আপনমনেই বললেন, 'সব ভালো যার শেষ ভালো...'

৫

ক্যাপ্টেন মার্শালের ঘরের দরজায় আলতো করে টোকা মারলেন এরকুল পোয়ারো। ভেতরে থেকে ভেসে আসছে টাইপরাইটারের শব্দ।

সংক্ষিপ্ত 'ভেতরে আসুন' শোনামাত্রই ঘরে ঢুকলেন পোয়ারো।

ক্যাপ্টেন মার্শাল তাঁর দিকে পেছন ফিরে বসে আছেন। দু-জানলার মধ্যে টেবিলে বসে টাইপ করছেন তিনি। ঘুরে তাকালেন না মার্শাল। মুখোমুখি দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় প্রতিবিম্বিত পোয়ারোর চোখে চোখ

রেখে বিরক্তির সুরে প্রশ্ন করলেন, ‘বলুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, কি চান?’

পোয়ারো তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ‘অনধিকার প্রবেশের জন্য একশোবার ক্ষমা চাইছি। আপনি ব্যস্ত আছেন?’

মার্শাল সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, ‘তা একটু আছি।’

পোয়ারো বললেন, ‘একটা ছোট্ট প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই।’

মার্শাল বললেন,’ওঃ ভগবান, প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পুলিশের প্রশ্নের উত্তর আমার দেওয়া হয়ে গেছে। সুতরাং, আর কারও প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।’

পোয়ারো বললেন, ‘আমার প্রশ্নটা অত্যন্ত সহজ। শুধু এই আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর দিন সকালে টাইপ সেরে টেনিস খেলতে যাবার আগে আপনি কি স্নান করেছিলেন?’

‘স্নান? স্নান করবো কেন? তাঁর ঘণ্টাখানেক আগেই তো আমার স্নান হয়ে গেছে।’

এরকূল পোয়ারো বললেন, ‘ধন্যবাদ, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।’

‘কিন্তু শুনুন। ইয়ে—’ দ্বিধাগ্রস্তভাবে থামলেন তিনি।

পোয়ারো নিষ্ক্রান্ত হলেন। যাবার আগে নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিলেন দরজাটা।

কেনেথ মার্শাল বললেন, ‘লোকটা নির্ঘাত পাগল!’

৬

পানশালার ঠিক বাইরেই মিঃ গার্ডেনারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো পোয়ারোর।

মিঃ গার্ডেনার দুটো ককটেল হাতে স্পস্টতই ‘টুকরো-ছবির-ধাঁধা’ নিয়ে আরামে বসে থাকা মিসেসের কাছে যাচ্ছিলেন, পোয়ারোকে দেখে অমায়িকভাবে হাসলেন।

‘আসবেন নাকি, মঁসিয়ে পোয়ারো?’

পোয়ারো মাথা নাড়লেন, বললেন, ‘করোনারের বিচার সম্পর্কে আপনার কি মতামত, মিঃ গার্ডনার?’

মিঃ গার্ডেনার গলার স্বর নিচু করলেন, বললেন, ‘দেখেশুনে তো মনে হলো, ওরা ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চিত। তবে আমার যদ্দুর ধারণা, আপনাদের পুলিশ তাদের তুরুপের তাস আস্তিনে লুকিয়ে রেখেছে।’

‘অসম্ভব নয়।’ এরকুল পোয়ারো বললেন।

মিঃ গার্ডেনারের কণ্ঠস্বর আরও নিচু হলো।

‘মিসেস গার্ডেনারকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারলে আমি বাঁচি। খুব অল্পেতেই ও বিচলিত হয়ে পড়ে, আর এই ব্যাপারটা ওকে ভীষণ উত্তেজিত করে তুলেছে। ওর স্নায়ু সহ্যক্ষমতা একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে।’

এরকূল পোয়ারো বললেন, ‘যদি অনুমতি দেন, তাহলে একটা প্রশ্ন করি মিঃ গার্ডেনার।’

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হবো, মঁসিয়ে পোয়ারো।’

এরকুল পোয়ারো বললেন, ‘আপনি অভিজ্ঞ লোক, আপনার বিচার বুদ্ধিতে আমার বিশ্বাস আছে। স্পষ্ট করে বলুন তো মিসেস মার্শাল সম্পর্কে আপনার ধারণা কি রকম ছিলো?’

বিস্ময়ে মিঃ গার্ডেনার ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বমুখী হলো। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে তিনি গলার স্বর নামিয়ে নিলেন নিচু পর্দায়।

‘কি জানেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, বিশেষ করে মেয়েমহলে ভেসে বেড়ানো কতকগুলো কথা আমার কানে এসেছে সত্যি, পোয়ারো মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালেন, ‘কিন্তু যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহলে, স্পষ্টস্পষ্টি বলবো, ওই মেয়েটা ছিলো এক নম্বরের বোকা।’

এরকুল পোয়ারোর চিন্তামগ্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'আপনার কথাটা ভেবে দেখার মতো...'

৭

রোজমণ্ড ডার্নলি বললো, 'এবার তাহলে আমার পালা, কি বলুন?'

'মানে?'

ও হাসলো।

'আগের দিন পুলিশ-প্রধান তাঁর তদন্ত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আপনি ছিলেন নীরব দর্শক। আর আজ, আমার ধারণা, আপনি আপনার নিজস্ব বেসরকারী তদন্ত শুরু করেছেন। আপনাকে আমি লক্ষ্য করেছি। প্রথমে মিসেস রেডফার্ন, তারপর লাউঞ্জের জানলা দিয়ে এক পলক দেখলাম, মিসেস গার্ডনার যেখানে তাঁর ওই বিতিকিচ্ছিরি 'টুকরো-ছবির-ধাঁধা' নিয়ে বসে আছেন, সেখানে আপনি দাঁড়িয়ে। আর এখন, আমার পালা।'

এরকুল পোয়ারো ওর পাশে বসলেন। জায়গাটা সানি লেজ। নিচের চঞ্চল সমুদ্রে গাঢ় সবুজ দ্যুতি যেন ফেটে পড়ছে। সেই সবুজ ক্রমে মিলিয়ে গেছে সমুদ্রে চোখ ধাঁধানো বিবর্ণ প্রশান্ত নীলে, তারপর দিগন্তে।

পোয়ারো বললেন, 'আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, মোদমোয়াজেল। এখানে আসার পর থেকে এই কথাটাই আমার সব সময় মনে হয়েছে। বর্তমান দুর্ঘটনা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আমার ভালোই লাগবে।'

রোজামণ্ড ডার্নলি নরম সুরে বললো, পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনি আমার মতামত জানতে চান?'

'জানতে পারলে অত্যন্ত খুশি হবো।'

রোজমণ্ড বললে, 'আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা খুবই সহজ-সরল। মেয়েটার অতীত জীবনেই এ ঘটনার মূল সূত্র লুকিয়ে আছে।'

'অতীতে? বতর্মানে নয়?'

'উহুঁ, অতীত বলতে খুব বেশি অতীতের কথা নাও হতে পারে। ব্যাপারটা আমি এভাবে দেখছি : পুরুষের কাছে আর্লেনা মার্শালের আকর্ষণ ছিলো প্রচণ্ড। আর, আমার মনে হয়, হয়তো খুব তাড়াতাড়িই ও তাদের সম্পর্কে ক্লান্তি বোধ করতো। ওর—কি বলবো?—অনুগামীদের মধ্যে এমন একজন ছিলো, যে এই ব্যবহারে তেমন খুশি হয়নি। আমাকে ভুল বুঝবেন না, মঁসিয়ে পোয়ারে, আমি এমন কারো কথা বলছি না যাকে চট করে সবার নজরে পড়বে। সম্ভবত, সাধারণ ছোটখাটো কোন মানুষ, দাম্ভিক, অনুভূতিশীল, এমন ধরনের মানুষ, যে ব্যর্থতার চিন্তায় সর্বক্ষণ মগ্ন। আমার ধারণা, সে আর্লেনার পিছু নিয়ে এখানে আসে, উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, এবং অবশেষে ওকে খুন করে।'

'আপনি বলতে চান সে বাইরের লোক, সে সেতু পার হয়ে দ্বীপে এসেছে?'

'হ্যাঁ। সম্ভবত উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় সে ওই গুহাটায় লুকিয়ে ছিলো।'

পোয়ারো অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আপনার কি মনে হয়, মিসেস মার্শাল এরকম কোন লোকের সঙ্গে দেখা করতে পিক্সি কোভে যেতেন? উহুঁ, কক্ষনো না। তিনি সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিতেন।'

রোজামণ্ড বলল, আর্লেনা হয়তো জানতো না ও সেই লোকটার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।' লোকটা হয়তো অন্য কারো নামে ওকে ডেকে পাঠিয়ে থাকবে।'

পোয়ারো অস্ফুট কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, 'সেটা সম্ভব।'

তারপর তিনি বললেন, 'কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মাদমোয়াজেল। খুনের পরিকল্পনা নিয়ে কোন মানুষ প্রকাশ্য দিবালোকে সেতু পার হয়ে হোটেল অতিক্রম করার ঝুঁকি নেবে না। কেউ হয়তো তাকে দেখে ফেলতে পারে।'

'তা পারে—কিন্তু তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমার তো মনে হয় সকলের চোখ এড়িয়ে আসাটা মোটেও অসম্ভব নয়।'

'হয়তো সম্ভব, মানলাম। কিন্তু কথা হলো, ওই সম্ভাবনার ওপর কেউ ভরসা করতে পারে না।'

রোজমণ্ড বললো, 'কিন্তু একটা জিনিস কি আপনি ভুলে যাচ্ছেন না? আবহাওয়ার কথা।'

'আবহাওয়া?'

'হ্যাঁ খুনের দিনটা ছিলো চমৎকার, কিন্তু তার আগের দিন, মনে করে দেখুন, বৃষ্টি এবং ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিলো এই দ্বীপে। তখন সকলের চোখ এড়িয়ে যে কেউ এখানে আসতে পারে। শুধু তাকে সমুদ্রতীরে গিয়ে রাতটা গুহায় কাটাতে হবে। ওই কুয়াশার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, মঁসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মিনিটকয়েক তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। তারপর বললেন, 'এইমাত্র আপনি যা বললেন তার তাৎপর্য কম নয়, মাদমোয়াজেল।'

রোজামণ্ডের মুখমণ্ডলে রক্তের উচ্ছ্বাস। ও বললো, 'আমার মত এই, সম্ভব অসম্ভব বুঝি না। এবার আপনারটা বলুন।'

'হুঁ—' বললেন, এরকুল পোয়ারো। স্থির চোখে রইলেন নিচে সমুদ্রের দিকে।

'জানেন মাদমোয়াজেল, আমি অত্যন্ত সরল মানুষ। সব সময় এই কথাটাই আমি বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি যে সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যক্তিই কোন অপরাধের নেপথ্য নায়ক। একবারে শুরুতে আমার মনে হয়েছিলো, একজনের প্রতি এই ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট।'

রোজামন্ডের স্বর কঠিন হলো। ও বললো, 'বলুন—থামলেন কেন?'

এরকুল পোয়ারো বলে চললেন, 'অথচ দেখুন, সে চিন্তার পথে আপনাদের ভাষায় একটা "ছোট প্রতিবন্ধক" রয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সেই একজনের পক্ষে এ খুন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিলো।'

রোজামণ্ডের দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ তাঁর কানে এলো।ও রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'তাই?'

এরকুল পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকালেন।

'তাহলে এখন আমরা কি করবো? সেটাই তো আমার সমস্যা।' তিনি এক মুহূর্ত থামলেন, তারপর বললেন, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

ও পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে। সতর্ক এবং তৎপর। কিন্তু যে প্রশ্ন এলো তা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

'সেদিন সকালে আপনি যখন টেনিস খেলার পোশাক পরতে আসেন, তখন কি স্নান করেছিলেন?'

রোজামণ্ড হতবুদ্ধি দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো।

'স্নান? কি বলতে চান আপনি?'

'ঠিক ওই কথাই বলতে চাই। স্নান! চীনামাটির মসৃণ সুদৃশ্য আধার, কল খুলে ভর্তি করা হয় টলটলে জল, তারপর শরীর ডুবিয়ে দেওয়া হয় সেই জলে, শেষে বেড়িয়ে এসে হুশ—হুশ—হুশ, অস্বচ্ছ জল চলে যায় পাইপ বেয়ে নিচে!'

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'উহুঁ—বরং আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'কি জানি, অতসব বুঝি না, তবে আমি স্নান করিনি।'

'হুঁ!' বললেন, পোয়ারো, 'তাহলে কেউ স্নান করেনি। বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার।'

'কিন্তু কেউ হঠাৎ স্নান করতে যাবে কেন?'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'সত্যিই তো, কেন?'

রোজামণ্ড একটু রাগতভাবেই বললো, 'এটা সম্ভবত আপনার শার্লক হোমস-মার্কা প্যাঁচ!'

এরকুল পোয়ারো হাসলেন।

তারপর শান্তভাবে বাতাসের আঘ্রাণ নিলেন।

যদি সামান্য ধৃষ্টতা প্রকাশের অপরাধ ক্ষমা করেন, মাদমোয়াজেল—'

'আপনার পক্ষে কখনই ধৃষ্টতা দেখানো সম্ভব নয়, মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি জানি।'

'সে আপনার মহানুভবতা। তাহলে দুঃসাহসের সঙ্গে আমি বলবো, যে সুগন্ধী আপনি ব্যবহার করেন তা এক কথায় অপূর্ব—এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—আছে চমৎকার ছলনাময়ী আকর্ষণ।' শূন্যে হাত নাড়লেন পোয়ারো, তারপর প্রয়োজনীয় সুরে যোগ করলেন, 'গ্যাব্রিয়েল নম্বর ৮, তাই না?'

'আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। হ্যাঁ, সব সময় এটাই আমি ব্যবহার করি।'

'মৃতা মিসেস মার্শালও এই সুগন্ধী ব্যবহার করতেন। অত্যন্ত আধুনিক জিনিস, কি বলেন? এবং দামীও বটে?'

সামান্য হেসে কাঁধ ঝাঁকালো রোজামণ্ড।

পোয়ারো বললেন, 'খুনের দিন সকালে আপনি এখানে বসে ছিলেন, মাদমোয়াজেল, যেখানে আমরা এখন বসে আছি। মিস ব্রুস্টার এবং মিঃ রেডফার্ন সমুদ্রপথে যাওয়ার সময়ে আপনাকে, অথবা অন্তত আপনার রঙিন ছাতাটাকে এখানে দেখেছিলেন। হলফ করে বলতে পারেন, মাদমোয়াজেল, যে সারা সকালে আপনি একবারের জন্যেও পিক্সি কোভে যাননি, ঢোকেননি সেই গুহাতে—বিখ্যাত পিক্সি গুহাতে?'

রোজমণ্ড ফিরে তাকালো, পোয়ারোর দিকে। চেয়ে রইলো স্থির চোখে।

শান্ত মসৃণ কণ্ঠে ও বললো, 'জানতে চাইছেন, আর্লেনা মার্শালকে আমি খুন করেছি কি না?'

'না, আমি শুধু জানতে চাইছি, পিক্সি গুহায় আপনি গিয়েছিলেন কি না?'

ওটা কোথায় তাই-ই আমি জানি না। তাছাড়া ওখানে যাবো কেন? কি কারণে?'

গ্যাব্রিয়েল নম্বর ৮ ব্যবহার করে এমন একজন খুনের দিন ওই গুহায় গিয়েছিলো, মাদমোয়াজেল।'

রোজামন্ড কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হলো।

'একটু আগে আপনিই বললেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, আর্লেনা মার্শাল গ্যাব্রিয়েল নম্বর ৮ ব্যবহার করতো। সেদিন ও পিক্সি কোভের বেলাভূমিতে গিয়েছিলো। গুহাতেও সম্ভবত ও-ই গিয়ে থাকবে।'

'কিন্ত গুহাতে তিনি কেন যাবেন? ওটা অন্ধকার, অপ্রশস্ত এবং অস্বস্তিকর জায়গা।'

রোজামণ্ড অধৈর্য স্বরে বলল, 'কারণ আমাকে জিগ্যেস করবেন না। যেহেতু ও সেখানে গিয়েছিলো, গুহায় যাওয়াটা ওর পক্ষেই বেশি স্বাভাবিক। আপনাকে তো আগেই বলেছি, সারা সকালে এ জায়গা ছেড়ে আমি কোথায়ও যাইনি।'

'শুধু একবার ছাড়া, যখন আপনি হোটেলে ক্যাপ্টেন মার্শালের ঘরে গিয়েছিলেন।' পোয়ারো ওকে মনে করিয়ে দিলেন।

'ও, হ্যাঁ। সে কথা মনে ছিলো না।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনি ভেবেছিলেন ক্যাপ্টেন মার্শাল আপনাকে দেখতে পাননি, মাদমোয়াজেল, কিন্তু আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।'

অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলো রোজমণ্ড, 'কেনেথ আমাকে দেখেছিলো? ও—ও কি তাই বলেছে?'

পোয়ারো সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

'টেবিলের মুখোমুখি ঝোলানো আয়নায় তিনি আপনাকে দেখেছিলেন মাদমোয়াজেল।'

রোজামণ্ডের শ্বাসপ্রশ্বাস স্তব্ধ হলো মুহূর্তের জন্যে। ও বললো, 'ও—বুঝেছি।'

পোয়ারোর চোখ এখন আর সমুদ্রের দিকে নেই। তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ রোজমণ্ড ডার্নলির কোলে, ওর ভাঁজ করা হাতের দিকে। দীর্ঘ আঙুলের সমন্বয়ে সুন্দর গড়নের হাত।

চকিত দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখকে অনুসরণ করলে রোজমণ্ড, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো, 'আমার হাতের দিকে এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? আপনার কি ধারণা—আপনার কি ধারণা—?'

পোয়ারো বললেন, 'আমার কি ধারণা, মাদমোয়াজেল ?'

রোজামণ্ড ডার্নলি বললো, 'না, কিছু না।'

৮

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে গাল কোভে যাবার রাস্তার শীর্ষদেশে এসে উপস্থিত হলেন এরকুল পোয়ারো। নির্জন সৈকতে কেউ একজন বসে রয়েছে। লাল জামা ও গাঢ় নীল সংক্ষিপ্ত প্যান্ট পরিহিত একটি কৃশকায় শরীর।

আঁটোসাঁটো ফ্যাশানদুরস্ত জুতো পায়ে সন্তর্পিত পদক্ষেপে বেলাভূমিতে নেমে এলেন পোয়ারো।

লিন্ডা মার্শাল চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। পোয়ারোর মনে হলো, যেন সামান্য কুঁকড়ে গেলো।

নিঃশব্দ চরণে ওর পাশে রুক্ষ নুড়ির ওপর এসে বসলেন তিনি। ওর ধুসর সবুজ চোখ ফাঁদে পড়া পশুর মতো সতর্ক সন্দিহান দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে। তীব্র বেদনার সঙ্গে পোয়ারো অনুভব করলেন, কত অনভিজ্ঞ এবং আত্মরক্ষায় কত অক্ষম এই দিশেহারা মেয়েটি।

ও বললো, 'কি ব্যাপার? কি চান?'

এরকুল পোয়ারো মিনিটকয়েক নীরব রইলেন। তারপর বললেন, সেদিন পুলিশ-প্রধানকে আপনি বলেছেন, আপনার সৎমাকে আপনি ভালোবাসতেন, এবং তিনিও আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'কথাটা সত্যি নয়—সত্যি কি মাদমোয়াজেল?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনার প্রতি ব্যবহারে তিনি হয়তো নিষ্ঠুর ছিলেন না—সে কথা আমি মানছি। কিন্তু আপনি তাঁকে পছন্দ করতেন না—উহুঁ—বরং আপনি তাঁকে অত্যন্ত অপচ্ছন্দ করতেন। এটা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।'

লিন্ডা বলল, 'হয়তো আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ও কথা বলা ঠিক নয়। ভালো দেখায় না।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'এসব আপনাকে ইস্কুল থেকে শেখানো হয়েছে?'

'একরকম তাই।'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'কোন খুনের ঘটনায় লৌকিক ভদ্রতার চেয়ে সত্যভাষণের গুরুত্ব অনেক বেশি।'

লিন্ডা বলল, 'ও কথা আপনার মুখেই মানায়—'

'হ্যাঁ, আমার মুখেই মানায় এবং সে কথাই আমি বলছি। কারণ, আর্লেনা মার্শালের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করাই আমার প্রথম ও প্রধান কাজ।'

লিন্ডা অস্ফুট স্বগত কণ্ঠে বললো, 'আমি স-ব ভুলে যেতে চাই। উঃ, কি ভয়ঙ্কর।'

পোয়ারো শান্ত স্বরে বললেন, 'কিন্তু ভুলতে আপনি পারছেন না—পারছেন কি?'

লিন্ডা বললো, 'আমার মনে হয়, কোন নৃশংস উন্মাদ ওকে খুন করেছে।'

এরকুল পোয়ারো অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'না, আমার তা মনে হয় না।'

লিন্ডার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন স্তব্ধ হলো পলকের জন্য। ও বললো, 'আপনি এমনভাবে বলছেন যেন—যেন আপনি সব জানেন ?'

পোয়ারো বললেন, হয়তো জানি।' একটু থেমে তিনি বলে চললেন। 'বিশ্বাস করবে লিন্ডা, যদি বলি, তোমার চূড়ান্ত অশান্তিতে আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো?'

লিন্ডা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'আমার কোন অশান্তি নেই: সুতরাং আপনার সাহায্যেরও প্রয়োজন নেই।'... জানি না, আপনি কি বলতে চাইছেন।'

পোয়ারো বললেন, ওর চোখে চোখ রেখে, 'আমি মোমবাতির কথা বলছি...'

আতঙ্কের শিখা দপ কর ঝলসে উঠলো লিন্ডার চোখে। ও চিৎকার করে বলল, 'আমি আপনার কথা শুনবো না। কিছুতেই শুনবো না।'

মৃগশিশুর তৎপরতায় সৈকত পার হয়ে ছুটে চললো ও। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে নিমেষে মিলিয়ে গেলো ওর চঞ্চল শরীর।

পোয়ারো ধীরে মাথা নাড়লো। তাঁর গম্ভীর মুখে দুশ্চিন্তার বিষণ্ণ ছায়া।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

ইন্সপেক্টর কলগেট পুলিশ-প্রধানের কাছে তাঁর তদন্তের বিবরণ দিচ্ছিলেন।

'একটা ঘটনা আমার নজরে এসেছে, স্যার—রীতিমতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ব্যাপারটা মিসেস মার্শালের টাকা সম্পর্কে। তাঁর আইনজ্ঞদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আমি তো বলবো, সব দেখে শুনে তাঁরা বেশ অবাক হয়ে গেছেন। ব্ল্যাকমেলের গল্পটার সমর্থনে প্রমাণ আমার হাতে এসেছে। আপনার মনে আছে, স্যার আরস্কিন পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মিসেস মার্শালকে দিয়ে গিয়েছিলেন? তা এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের মাত্র হাজার পনেরো অবশিষ্ট আছে।'

পুলিশ-প্রধান শিস দিয়ে উঠলেন।

'তাই নাকি! তাহলে বাকি টাকাগুলো গেলো কোথায়?'

'সেটাই তো আশ্চর্যের কথা, স্যার। মাঝে মাঝে কিছু কিছু সম্পত্তি মিসেস মার্শাল হাত বদল করেছেন, এবং প্রতি ক্ষেত্রেই লেনদেন হয়েছে ক্যাশ টাকা, অথবা ক্যাশ টাকার সামিল—ঋণপত্রের বিনিময়ে—অর্থাৎ সে টাকা তিনি এমন কারও হাতে তুলে দিয়েছেন, যার পরিচয় প্রকাশ পাক তিনি চাননি। নিঃসন্দেহে ব্ল্যাকমেল।'

পুলিশ-প্রধান সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

'তাই তো মনে হচ্ছে। এবং সেই ব্ল্যাকমেলার রয়েছে এই হোটেলেই। অর্থাৎ সে নিঃসন্দেহে ওই তিনজনের একজন, ওঁদের সম্পর্কে নতুন কিছু পেলে?'

'তেমন জোরালো কিছু পেয়েছি বলে মনে হয় না, স্যার। মেজর ব্যারী, তাঁর নিজের কথা অনুয়ায়ী, একজন অবসরপ্রাপ্ত ফৌজী অফিসার। থাকেন একটা ছোট ফ্ল্যাটে; আয় বলতে পেনশনের টাকা এবং কিছু কোম্পানির শেয়ারের লভ্যাংশ। কিন্তু গত বছরে কয়েক দফায় বেশ মোটা টাকা তিনি ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন।'

'চিন্তার কথা। তার কারণ হিসেবে কি বলেছেন?'

'বলেছেন, ওগুলো বাজী-জেতা টাকা। একথা সত্যি যে ছোট-বড় সবরকম রেসের মাঠে তাঁর যাতায়াত আছে। সময়ে সময়ে বাজীও ধরেন, কিন্তু তার কোন হিসেবে রাখেন না।'

পুলিশ-প্রধান সম্মতির ইঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

'এ কথা ভুল প্রমাণ করা শক্ত।' তিনি বললেন, 'তবে এটাকে একেবারে অবহেলা করলে চলবে না।'

কলগেট বলে চললেন, 'এরপর, ধর্মযাজক স্টিফেন লেন। তাঁর পরিচয়ের কোন বুজরুকি নেই—হোয়াইটরিজ, সারে-র সেন্ট হেলেনে জীবিকা একটা ছিলো—কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে বছরখানেক হলো সে জীবিকা ত্যাগ করেছেন। একই কারণে শেষ পর্যন্ত মানসিক রুগীদের এক নার্সিংহোমে তাকে যেতে হয়—সেখানে ছিলেন প্রায় এক বছর।'

'আচ্ছা।' ওয়েস্টনের কণ্ঠে কৌতূহলের ছোঁওয়া।

'হ্যাঁ স্যার। ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারে কাছ থেকে আমি যতটা সম্ভব জানতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এই ডাক্তারগুলো কি চিজ আপনি তো জানেন—ওদের কাছ থেকে কাজের কথা আদায় করা খুব কঠিন। কিন্তু আমার যদ্দুর ধারণা আমাদের মাননীয় ধর্ময়াজকের প্রধান রোগ ছিলো শয়তান সম্পর্কে এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতা—বিশেষ করে স্ত্রীলোকের বেশে উপস্থিত যে শয়তান—রক্তবর্ণ স্ত্রীলোক—ব্যবিলনের বেশ্যা।'

'হুম', বললেন, ওয়েস্টন, অতীতে এ জাতীয় খুনের কারণের যথেষ্ট নজির রয়েছে।'

'হ্যাঁ, স্যার। আমার মনে হয়, স্টিফেন লেনকে অন্তত সন্দেহ করা যেতে পারে। তাঁর চোখে নিহত মিসেস মার্শাল ছিলেন রক্তবর্ণ স্ত্রীলোকের জ্বলন্ত উদাহরণ—লাল চুল পরনের পোশাক এবং ব্যবহার সবদিক

থেকেই। সুতরাং এ ধারণা নেহাত অসম্ভব নয় যে এই অশুভ মেয়েটিকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া তিনি তাঁর একান্ত কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। যদি অবশ্য সত্যি সত্যিই তাঁর মাথা গোলমাল থেকে থাকে।'

'ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারে খাপ খাওয়ার মতো কিছু পাওনি?'

'না, স্যার। ও ব্যাপারে তাঁকে আমরা সরাসরি বাদ দিতে পারি। খুব বেশি না হলেও তাঁর নিজস্ব কিছু আয়ের রাস্তা আছে, এবং সম্প্রতি তাঁর আয়ের অঙ্ক হঠাৎ করে বেড়ে যায়নি।'

'খুনের দিন সকালে নিজের গতিবিধি সম্পর্কে যে গল্পটা তিনি বলেছিলেন, তাঁর কি হলো?'

'ওটার সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তায় কোন পাদ্রীকে দেখেছে বলে কেউই মনে করতে পারছে না। আর গীর্জার খাতার কথা যদি বলেন, ওটাতে শেষ নামটা লেখা হয়েছে তিনদিন আগে এবং দিন পনেরো খাতাটা কেউ খুলেও দেখেনি। সুতরাং, মিঃ লেন খুব সহজেই খুনের আগের দিন, অথবা, ধরুন, তার দিনদুয়েক আগে গীর্জায় গিয়ে থাকতে পারেন, এবং তখন হয়তো নিজের নামটা ২৫ শে সই করে আসেন।'

ওয়েস্টন মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালেন। বললেন, 'আর আমাদের তৃতীয় জন?'

'হোরেস ব্ল্যাট? আমার ধারণা, স্যার, ওখানে নির্ঘাত কোন গোলমাল রয়েছে। ভদ্রলোক যে আয়ের ওপর আয়কর দেন, তা তাঁর লোহার ব্যবসার আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। মনে রাখবেন, এ মক্কেল একেবারে পাঁকালমাছ। তিনি হয়তো চটপট একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খাড়া করে দেবেন। তিনি একটু-আধটু শেয়ার বাজারে যাতায়াত করেন, এবং কোন কোন দুনম্বরি ব্যবসায় তাঁর সামান্য অংশও আছে। জানি না, তাঁর কথা সত্যিও হতে পারে; তবে এ কথা স্বীকার করা যায় না যে গত কয়েক বছর ধরে অজ্ঞাত কোন উপায়ে—তিনি মাঝখানেই বেশ মোটা টাকা রোজগার করেছেন।'

'তাহলে তুমি বলতে চাইছো', বললেন ওয়েস্টন, মিঃ হোরেস ব্ল্যাট একজন পেশাদার ব্ল্যাকমেলার?'

'হয় তাই, না হলে হেরোইনের মামলায় তিনি জড়িয়ে আছেন, স্যার। চীফ ইন্সপেক্টর রিজওয়ে, যিনি এই মাদকদ্রব্য চালানের তদন্তে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম, এবং এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। মনে হচ্ছে, সম্প্রতি চোরাপথের বেশ কিছু হেরোইন এ দেশে আসছে। এ পর্যন্ত কয়েকটা চুনোপুঁটি দোকানদারের খোঁজ ওরা পেয়েছে, এবং মোটামুটি জানে, এ ব্যবসার অন্য মাথায় কে বা কারা রয়েছে। কিন্তু জিনিসটা কিভাবে শহরে আসছে সেটা এখনও ওদের মাথায় ঢুকছে না।'

ওয়েস্টন বললেন, 'জেনেই হোক বা না জেনেই হোক, হেরোইন চোরাচালানের দলে জড়িয়ে পড়ার কারণেই যদি মার্শাল মহিলার মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের উচিত হবে পুরো ব্যাপারটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতে তুলে দেওয়া। এ পাখি ওদের শিকার। হুঁ? তুমি কি বলো?'

ইন্সপেক্টর কলগেট একটু দুঃখিতভাবেই বললেন, 'হ্যাঁ, স্যার ঠিকই বলেছেন। যদি মাদকদ্রব্যের ব্যাপারী হয় তাহলে এ মামলা নিঃসন্দেহে ইয়ার্ডের।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে ওয়েস্টন বললেন, 'এটাই সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বলে মনে হচ্ছে।'

কলগেট বিষণ্ণ মুখে সম্মতি জানালেন।

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা। মার্শাল এর মধ্যে নেই—যদি এমন কতকগুলো খবর আমার হাতে এসেছিলো যেগুলো মার্শাল অ্যালিবাই অত নিখুঁত না হলে অনেক কাজে লাগতো। তাঁর ব্যবসা বর্তমানে প্রায় পাড়ে এসে ঠেকেছে। এতে মার্শালের অথবা তাঁর শরিকের দোষ নেই: গত বছরে আর্থিক সঙ্কট এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দুরবস্থাই এর জন্যে দায়ী। এবং তিনি যদ্দুর জানতেন, তাঁর স্ত্রী মারা গেলে তিনি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড পাবেন। এবং এই পঞ্চাশ হাজার তাঁর ব্যবসার বর্তমান অবস্থায় অনেক কাজে আসতো।'

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'বড় দুঃখের কথা। লোকটার দু-দুটো জোরালো খুনের উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে দিব্যি নির্দোষ প্রমাণ করে বসে রইলো।'

ওয়েস্টন হাসলেন।

'দুঃখ কোরো না, কলগেট। আমাদের কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ এখনও রয়েছে। ব্ল্যাকমেল সূত্র এবং উন্মাদ ধর্মযাজক—সমাধানের এ দুটো পথ এখনও আমাদের হাতে আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, মাদকদ্রব্য-সংক্রান্ত সমাধানটা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত।' তিনি আরও বললেন, 'আর যদি ভদ্রমহিলাকে হেরোইন-চোরাচালান দলের কেউ খুন করে থাকে, তাহলে এই চোরাচালান রহস্যের সমাধান স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পরোক্ষভাবে আমাদের সাহায্য পাবে। সুতরাং যেভাবেই হোক না কেন, আমরা যথেষ্ট কাজ দেখিয়েছি।'

অনিচ্ছাকৃত হাসির ছায়া পড়লো কলগেটের মুখে।

তিনি বললেন, 'তাহলে এ-ই সব, স্যার। ও, ভালো কথা, মিসেস মার্শালের ঘরে পাওয়া চিঠিটার সম্পর্কে একটু-আধটু খোঁজখবর করেছি। যে চিঠিটায় জে. এন, সই ছিলো। ফল কিছু হলো না। ভদ্রলোক চীনদেশে নিরাপদেই রয়েছেন। মিস ব্রুস্টার আমাদের এই মক্কেলের কথা বলছিলেন। বলতে পারেন, একেবারে অকর্মার ঢেঁকি। মিসেস মার্শালের অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কেও খোঁজ নিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও ফলাফল শূন্য। যা কিছু তলিয়ে দেখার কথা সবই আমাদের দেখা হয়ে গেছে, স্যার।'

ওয়েস্টন বললেন, 'তাহলে এখন সবই আমাদের ওপর নির্ভর করছে।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'আমাদের বেলজিয়ান বন্ধুর খবর কি? আমাকে যা যা বললে সব তাঁকে বলেছো?'

কলগেট একমুখ হাসলেন, বললেন, 'ভদ্রলোক একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ, তাই না? জানেন, পরশুদিন তিনি আমাকে কি জিগ্যেস করছিলেন? গত তিন বছর শ্বাসরোধে ঘটা প্রতিটি খুনের মামলার খুঁটিনাটি তথ্য তাঁর চাই।'

ওয়েস্টন সোজা হয়ে বসলেন।

'তাই নাকি। ও—তাহলে...' তিনি মিনিট খানেক নীরব রইলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের পাদ্রীসাহেব কবে নাগাদ ওই নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন বললেন?'

'গত ইস্টারে এক বছর আগে, স্যার।'

কর্নেল ওয়েস্টন তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিনি বললেন, 'একটা ঘটনা আমার মনে আছে—'ব্যাগশট' এর কাছাকাছি কোন অঞ্চলে একটি যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। মেয়েটা ওর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে কোথায় যেন গিয়েছিলো, তারপর আর ফিরে আসেনি। এ ছাড়াও আরও একটা ঘটনা ঘটেছিলো, যেটাকে খবরে কাগজওলা নাম দিয়েছিলো, 'নির্জন জঙ্গলের রহস্য'। যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে দুটো ঘটনাই সারের।'

তাঁর চোখ মিলিত হলো ইন্সপেক্টরে চোখে। কলগেট বললেন, 'সারে? তাহলে তো, স্যার, পুরোপুরি খাপ খেয়ে যাচ্ছে! যদি তাই হয়...'

২

দ্বীপের সর্ব্বোচ্চ শিখরে ঘাসে ছাওয়া জমিতে বসেছিলেন এরকুল পোয়ারো।

তাঁর সামান্য বাঁয়ে ইস্পাতের মইটা নেমে গেছে পিক্সি কোভে। তিনি লক্ষ্য করলেন মইয়ের শীর্ষ প্রান্তের কাছাকাছি কতকগুলো বিশাল রুক্ষ পাথর পড়ে রয়েছে; যেগুলো নিচের সৈকতে নামতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তিকে সহজেই লোকচক্ষের আড়াল করতে পারবে। পাহাড়ের ঝুলন্ত অংশের জন্য ওপর থেকে নিচের সৈকতের খুব সামান্য অংশই দেখা যায়।

এরকুল পোয়ারো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

তাঁর ‘টুকরো-ছবির ধাঁধা’র টুকরোগুলো ক্রমশ উপযুক্ত শূন্যস্থানে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে।

মনে মনে ধাঁধার প্রতিটি টুকরোকে তিনি খতিয়ে দেখলেন, পরীক্ষা করলেন স্বতন্ত্র মনোযোগে।

আর্লেনা মার্শালের মৃত্যুর দিনকয়েক আগে স্নান-সৈকতে কাটানো একটি সকাল।

ব্রীজ খেলার একটি সান্ধ্য। টেবিলে ছিলেন তিনি, প্যাট্রিক রেডফার্ন এবং রোজামণ্ড ডার্নলি। ক্রিস্টিন ডামি থাকায় বাইরে পায়চারি করতে বেরিয়েছিলেন এবং শুনতে পান কিছু কথোপকথন। সেই সময় আরামকক্ষে আর কে ছিলেন? কে ছিলেন সাময়িকভাবে অনুপস্থিতি?

খুনের আগের দিন সন্ধ্যা সমুদ্রের সামনে পাহাড়ের কিনারায় ক্রিস্টিনের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা এবং হোটেলে ফিরে আসার পথে তাঁর দেখা একটি দৃশ্য।

গ্যাব্রিয়েল নম্বর ৮।

একটি কাঁচি।

একটি ভাঙা পাইপ।

জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলা একটি শিশি।

একটি সবুজ ক্যালেন্ডার।

এক প্যাকেট মোমবাতি।

একটি আয়না এবং একটি টাইপরাইটার।

বেগুনী উলের একটি বল।

একটি মেয়ের হাতঘড়ি।

পাইপ বেয়ে স্নানের জল গড়িয়ে পড়ার শব্দ।

এই সম্পর্কহীন তথাগুলোর প্রতিটি নিজের নিজের জায়গায় খাপ খেয়ে যেতে বাধ্য। কোনরকম শিথিলতা তার মধ্যে থাকবে না।

আর তারপর, নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলো হাতে নিয়ে, তিনি ফেলবেন। পরবর্তী পদক্ষেপ, এই দ্বীপে অশুভ শক্তির উপস্থিত সম্পর্ক তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস।

অশুভ শক্তি...

হাতের টাইপ করা কাগজটার দিকে চোখ রাখলেন পোয়ারো।

নীলি পার্সন্স—‘শবহ্যামে’ এর কাছাকাছি এক নির্জন জঙ্গলে তাকে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। সেই খুনী সম্পর্কে কোন সূত্রই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

নীলি পার্সন্স?

অ্যালিস করিগান...

অ্যালিস করিগানের মৃত্যুর প্রতিটি খুঁটিনাটি তিনি গভীর মনোযোগ পড়তে লাগলেন।

৩

সমুদ্রকে সামনে রেখে শৈলশিরায় বসে থাকা এরকুল পোয়ারের দিকে এগিযে এলেন ইন্সপেক্টর কলগেট।

ইন্সপেক্টর কলগেটেকে পোয়ারো পছন্দ করেন। তাঁর দৃঢ়সংবদ্ধ মুখের রেখা, বিচক্ষণ চোখ, এবং ধীর স্থির আচরণ পোয়ারোর ভালো লাগে।

ইন্সপেক্টর কলগেট বসলেন। পোয়ারোর হাতের টাইপকরা কাগজগুলোর দিকে এক পলক দেখে তিনি বললেন, ‘ওই মামলাগুলো নিয়ে কিছু করলেন, স্যার?’

‘হ্যাঁ, ওগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি।’

কলগেট উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারলেন পাশের কৃত্রিম গুহাটায়। তারপর ফিরে আসতে বললেন, ‘সাবধানের মার নেই। আমি চাই না, আমাদের কথাবার্তায় কেউ কান পাতুক।’

পোয়ারো বললেন, 'আপনি বিচক্ষণ।'

কলগেট বললেন, 'আপনাকে বলতে বাধা নেই, মঁসিয়ে পোয়ারো, ওই মামলাগুলো সম্পর্কে আমি নিজেও একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েছি—অবশ্য আপনি ওগুলোর কথা জিগ্যেস না করলে আমি হয়তো নতুন করে আর মাথা ঘামাতাম না।' তিনি এক মুহূর্ত থামলেন, তারপর বললেন, 'বিশেষ করে একটা মামলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।'

'অ্যালিস করিগান?'

'অ্যালিস করিগান।' কিছুক্ষণ নীরবতা। এ ব্যাপারে আমি সারে পুলিশের সঙ্গে দেখা করেছি—কেসটার আগাপাশতলা জানতে চেয়ে।'

'বলুন, বন্ধু। আমার জানতে ইচ্ছে করছে—ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।'

'অত্যন্ত স্বাভাবিক। অ্যালিস করিগানকে ''ব্ল্যাকরিজ হীর্থ'' -এর ''সীজার্স গ্রোভ''-এ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়-''মালে কপ্স'', যেখানে নীলি পার্সন্সকে পাওয়া গিয়েছিলো, সেখান থেকে মাত্র মাইল দশেক দূরে—এবং এই দুটোর জায়গাই হোয়াইটরিজের বারো মাইলের মধ্যে, মিঃ লেন যেখানে ধর্মযাজক ছিলেন।'

পোয়ারো বললেন, 'অ্যালিস করিগানের মৃত্যু সম্পর্কে আরও বলুন।'

কলগেট বললেন, 'ওর মৃত্যুর সঙ্গে নীলি পার্সেন্সের মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে বলে সারে পুলিশ প্রথমে মনে করেনি। এর কারণ, ওরা খুনি হিসেবে অ্যালিসের স্বামীকেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ করে। ঠিক জানি না কেন, তবে খবরের কাগজে ভাষায় ভদ্রলোক একটু 'রহস্যময় মানুষ' ছিলেন—তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি—যেমন, তিনি আগে কোথায় ছিলেন, তাঁর পরিচয় কি, ইত্যাদি। মেয়েটা ওর বাড়ির লোকের অমতে তাঁকে বিয়ে করেছিলো, ওর নিজের জমানো কিছু টাকাপয়সা ছিলো—এবং স্বামীর নামেই ও জীবনবীমা করা ছিলো—অতএব, সন্দেহ জাগিয়ে তোলার পক্ষে এগুলো যথেষ্ট, এবং আমার ধারণা, আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন, স্যার?'

পোয়ারো সম্মতি জানালেন।

'কিন্তু গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গ উঠতেই আমাদের স্বামীদেবতাটি সন্দেহের দৃশ্যপট থেকে একেবারে মুছে গেলেন। অ্যালিসের মৃতদেহটি আবিষ্কার করেছিলো পল্লী অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ একজন শক্তসমর্থ খাটো প্যান্ট পরিহিতা যুবতী। মেয়েটি সাক্ষী হিসেবে ছিলো নিঃসন্দেহে উপযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য—ল্যাংকাশায়ারের এক স্কুলের খেলার দিদিমণি। যখন সে মৃতদেহ আবিষ্কার করে, তখন সময় দেখেছিলো সে—ঠিক সোয়া চারটে—এবং তার নিজস্ব মত হিসেবে সে জানায়, মেয়েটি খুব বেশিক্ষণ মারা যায়নি—দশ মিনিটের আগে তো নয়ই। পুলিশ সার্জন পৌনে ছ'টা নাগাদ মৃতদেহ পরীক্ষা করেন, তিনি মেয়েটির মতই সমর্থন জানান। মেয়েটি কোন কিছুতে হাত না দিয়ে সোজা পায়ে হেঁটে রওনা হয় ব্যাগশট থানার দিকে এবং সেখানেই খুনের খবরটা জানায়। এখন, তিনটে থেকে চারটে দশ পর্যন্ত এডওয়ার্ড করিগান লন্ডন থেকে আগত একটি ট্রেনে ছিলেন। লন্ডনে তিনি সেইদিনই ব্যবসার কাজে গিয়েছিলেন। ট্রেনের কামরায় তাঁর সঙ্গে আরো চারজন যাত্রী ছিলো। স্টেশনে নেমে তিনি স্থানীয় বাসে চড়েন, এবং ট্রেনে চার যাত্রীর দুজন ওই বাসে তাঁর সঙ্গী হয়। ''পাইন রিজ'' কাফেতে তিনি বাস থেকে নামেন। সেখানে চায়ের আসরে তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর যোগ দেবার কথা ছিলো। সময় তখন চারটে পঁচিশ। তিনি দুজনের জন্যে চায়ের ফরমাশ দেন, কিন্তু বলেন তাঁর স্ত্রী না আসা পর্যন্ত সেগুলো যেন টেবিলে না দেওয়া হয়। তারপর তিনি বাইরে এসে স্ত্রীর প্রতীক্ষায় পায়চারি করতে থাকেন। অবশেষে পাঁচটায় সময়েও যখন সে এলো না তখন ভদ্রলোক চিন্তিত হয়ে পড়লেন—ভাবলেন, সে হয়তো পায়ে চোট লাগিয়ে কোথাও বসে আছে। কারণ কথা ছিলো গ্রামে তাঁরা যেখান ছিলেন, সেখানে থেকে মেয়েটি পায়ে হেঁটে বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করে পাইন রিজ কাফেতে আসবে, আর সেখান থেকে বাসে করে তাঁর ঘরে ফিরে যাবেন। কাফে থেকে সীজার্স গ্রোভের দূরত্ব বেশি নয়, এবং সকলের অনুমান,

হাতে সময় থাকার দরুন মেয়েটি সীজার্স গ্রোফের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে ওখানে কিছুসময় কাটাতে মনস্থ করে। এই সময় কোন ভবঘুরে অথবা উন্মাদ ঘটনাচক্রে তার সাক্ষাৎ পায় এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাকে আক্রমণ করে। মেয়েটির স্বামী সন্দেহের ছায়া থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্রই সারে পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয়, ওই মৃত্যুর সঙ্গে নীলি পার্সন্সের মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে—নীলি পার্সন্স মানে সেই অস্থিরমনা পরিচারিকা, যাকে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মার্লে কন্সে পাওয়া যায়। ওদের বিশ্বাস, একই লোক ওই দুটো খুনের জন্যে দায়ী, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই লোককে ওরা ধরতে পারেনি—আর ধরা তো দূরে কথা, তার টিকিটি পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি! ওদের হাজারো তদন্তের ফলাফল একট বিরাট শূন্য।'

একটু থেমে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'আর এখন—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তৃতীয় একজন মহিলা মারা গেলেন—এবং জনৈক ভদ্রলোক, যাঁর নাম করতে চাই না, একই মহিলা সন্দেহের দৃশ্যপটে উপস্থিত।'

তিনি থামলেন।

তাঁর অন্তর্ভেদী বিচক্ষণ চোখ স্থির হলো পোয়ারোর চোখে। উত্তরের প্রত্যাশায় তিনি নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পোয়ারো ঠোঁট নড়ে উঠলো। ইন্সপেক্টর কলগেট সামনে ঝুঁকে এলেন।

পোয়ারো তখন অস্ফুট কণ্ঠে বলছেন, '—কোন, টুকরোটা লোমের কম্বলের আর কোন টুকরোটা বেড়ালের লেজের বুঝে ওঠা ভারী শক্ত।'

'কি বলছেন, স্যার?' চমকে উঠে বললেন ইন্সপেক্টর কলগেট।

পোয়ারো তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি নিজস্ব চিন্তায় একটু অনমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।'

'লোমের কম্বল, বেড়ালের লেজ—এ সব কি?'

'কিছু না—কিছু না।' তিনি একটু থামলেন। বলুন, ইন্সপেক্টর কলগেট যদি আপনার সন্দেহ হয় যে কেউ একজন মিথ্যে কথা বলছে—অজস্র, অজস্র মিথ্যে কথা, কিন্তু আপনার হাতে কোন প্রমাণ নেই, তাহলে আপনি কি করবেন?'

ইন্সপেক্টর কলগেট কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।

'বলা শক্ত। তবে আমার মনে হয়, কেউ যদি অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যায়, তাহলে শেষের দিকে মিথ্যে তোলগোল পাকিয়ে সে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।'

পোয়ারো সম্মতি জানালেন।

'হ্যাঁ, আপনার কথা খাঁটি সত্যি। কারণ দেখুন, আমি শুধু মনে মনে জানি যে কিছু কিছু বিবৃতি পুরোপুরি মিথ্যে। আমার বিশ্বাস সেগুলো মিথ্যে, কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি না অবশ্য একটা পরীক্ষা করে দেখতে বাধা নেই—এটা ছোট্ট তুচ্ছ মিথ্যের কষ্টিপাথর পরীক্ষা। এবং সত্যিই যদি সেটা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে অবশিষ্ট বক্তব্যগুলো নির্ভেজাল মিথ্যে।'

ইন্সপেক্টর কলগেট কৌতূহলী চোখে পোয়ারো দিকে তাকালেন।

'আপনার মন বড় অদ্ভুতভাবে কাজ করে, তাই না, স্যার? কিন্তু আমার অনুমান, শেষ পর্যন্ত আপনিই জিতবেন। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা প্রশ্ন করছি : শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনাগুলোর দিকে আপনার নজর গেলো কি কারণে?'

পোয়ারো ধীর স্বরে বললেন, 'আপনার ভাষায় একটা শব্দ আছে—পরিপাটি। এই অপরাধটা আমার কাছে অত্যন্ত পরিপাটি অপরাধ বলে মনে হয়েছে। কখনও কখনও অবাক হয়ে ভেবেছি, হয়তো এটাই খুনীর প্রথম অপরাধ নয়।'

ইন্সপেক্টর কলগেট বললেন, 'ও—বুঝেছি।'

পোয়ারো বলে চললেন, 'আমি নিজের মনেই বললাম, এ ধরনের অতীত খুনের ঘটনা একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক, এবং যদি দেখা যায়, অতীতের কোন খুনের সঙ্গে এই খুনের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে, তাহলে—বলাই বাহুল্য একটা বহুমূল্য সূত্র আমাদের হাতে আসবে।'

'একই রকম খুনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে বলে, স্যার?'

'না না, আমি তার চেয়েও বেশি কিছু বলতে চাইছি। যেমন নীলি পার্সন্সের মৃত্যু আমাকে কোন সূত্রই দেয়নি। কিন্তু অ্যালিস করিগানের মৃত্যু—বলুন, ইন্সপেক্টর কলগেট, বর্তমান খুনের সঙ্গে ওই মৃত্যুর একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য কি আপনার নজরে পড়ছে না?'

ইন্সপেক্টর কলগেট মনে মনে প্রশ্নটা উলটে-পালটে খতিয়ে দেখলেন। অবশেষে তিনি বললেন, 'না, স্যার, ঠিক যে নজরে পড়ছে তা বলতে পারছি না। অবশ্য যদি এটা না হয় যে দুটো ক্ষেত্রেই শ্রীযুক্ত পতিদেবতার হিমালয় প্রমাণ অ্যালিবাই রয়েছে।'

পোয়ারো হালকা স্বরে বললেন, 'ও—তাহলে আপনার নজরে পড়েছে?'

৪

'এই যে, পোয়ারো! আপনাকে দেখে খুশি হলাম। আসুন, ভেতরে আসুন। ঠিক এই মুহূর্তে যে মানুষটিকে চাইছিলাম।'

এরকুল পোয়ারো সে আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন।

পুলিশ-প্রধান এক বাক্স সিগেরেট এগিয়ে দিলেন, নিজে একটা নিয়ে ধরালেন। ধোঁয়ার মুখ ঝাপসা করে তিনি বললেন, 'একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা আমি একরকম ঠিক করে ফেলেছি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার আগে সে বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'বলুন, বন্ধু।'

ওয়েস্টন বললেন, 'ঠিক করেছি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডেকে পাঠিয়ে মামলাটা ওদের হাতে তুলে দেবো। আমার মতে, যদিও দু-একজনকে সন্দেহ করবার জোরালো যুক্তি রয়েছে, পুরো ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে ওই মাদকদ্রব্য চোরাচালানের ওপর।

পোয়ারো সম্মতি জানালেন।

'আমি একমত।'

'শুনে সুখী হলাম। এবং আমাদের এই চোরাচালানকারী ব্যক্তিটি যে কে, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। হোরেস ব্ল্যাট।'

আবারও সম্মতি জানালেন পোয়ারো। তিনি বললেন, 'সে ইঙ্গিতও মোটামুটি স্পষ্ট।'

'আমাদের চিন্তাধারা একই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে দেখতে পাচ্ছি। ব্ল্যাট তাঁর নৌকো নিয়ে হরদম সমুদ্রে বেরিয়ে পড়তেন। কখনও কখনও সঙ্গী হিসেবে কাউকে সঙ্গে নিলেও বেশির ভাগ সময় তিনি একাই যেতেন। তাঁর নৌকোয় গোটাকয়েক লোক দেখানো লাল-রঙা পাল আছে, কিন্তু আমরা আবিষ্কার করেছি, এছাড়াও কয়েকটি সাদা পাল লুকোনো ছিলো। আমার ধারণা, একটা ভালো দিন দেখে তিনি নৌকো বেয়ে উপস্থিত হন নির্দিষ্ট কোন জায়গায়, এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে দ্বিতীয় কোন নৌকো সাধারণ পাল-তোলা নৌকো অথবা মোটরবোট জাতীয় কিছু তার তখনই আসল জিনিসের হাতবদল হয়। তারপর ব্ল্যাট পিক্সি কোভে ফিরে আসেন উপযুক্ত সময় দেখে।'

এরকুল পোয়ারো সামান্য হাসলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরুন দেড়টা নাগাদ, যখন ইংরেজদের মধ্যাহ্নভোজের সময়;তখন প্রত্যেকেই যে খাবার ঘরে থাকবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বীপটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখানে বাইরের লোকেরা কখনও পিকনিক করতে আসেন না। কখনও কখনও বিকেলে, পিক্সি কোভে যখন পড়ন্ত সূর্যের আলো থাকে, অতিথিরা

হোটেল থেকে চা নিয়ে সেখানে যান, আর যদি তাঁরা পিকনিক করতে চান, তাহলে তাঁরা যাবেন অনেক অনেক মাইল দূরে কোন প্রান্তরে—পিক্সি কোভে নয়।'

পুলিশ-প্রধান সমর্থনে মাথা নাড়লেন।

'ঠিক বলেছেন।' তিনি বললেন, 'সুতরাং, ব্ল্যাট পিক্সি কোভে নেমে সেই গুহার তাকে জিনিসটা লুকিয়ে রাখেন। জিনিসটা সেখান থেকে যথাসময়ে সরিয়ে নেবার দায়িত্ব ছিলো দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির ওপর।'

পোয়ারো মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'আপনার মনে আছে, খুনের দিন একটা দম্পতি মধ্যাহ্নভোজ সারতে এ দ্বীপে এসেছিলো?' এটা সম্ভবত জিনিসটা পিক্সি গুহা থেকে সরিয়ে নেবার একটা পথ। মুর অতএব সেন্ট লু-র হোটেলে থেকে গ্রীষ্মের অতিথিরা কখনও কখনও স্মাগলার্স দ্বীপে আসেন। তাঁরা হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রথমে তাঁরা গোটা দ্বীপটা ঘুরে দেখতে বেরোন। তারপর সমুদ্র সৈকতে নেমে, স্যান্ডউইচের বাক্সটা নিয়ে মাদামের হাতে ঝোলানো স্নান-ব্যাগে ভরে নেওয়াটা একটু কঠিন কাজ নয়—এবং, যখন বাকি সবাই খাওয়ার ঘরে উপস্থিত, তখন নিজেদের আনন্দ-ভ্রমণ শেষ করে তাঁরা মধ্যাহ্নভোজ সারতে ফিরে আসেন হোটেলে। হয়তো একটু দেরিতে, ধরুন দুটো বাজতে দশে।'

ওয়েস্টন বললেন, 'হ্যাঁ, কাজটা অসম্ভব নয়। আর এ জাতীয় চোরাচালান দলের লোকেরা ভীষণ নৃশংস হয়। যদি কেউ আকস্মিকভাবেই তাদের কার্যকলাপ জানতে পেরে থাকে, তাহলে তাকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিতে তাদের হাত এতটুকু কাঁপবে না। আমার মনে হয়, আর্লেনা মার্শালের মৃত্যুও ঠিক এইভাবে ঘটেছে। হতে পারে, সেদিন সকালে ব্ল্যাট হয়তো পিক্সি কোভে ওগুলো লুকিয়ে রাখছিলেন। সেইদিনই তাঁর সঙ্গীদের সেখানে আসবার কথা ছিলো জিনিসটা সরিয়ে নেবার জন্যে। এমন সময় আর্লেনা উপস্থিত হলেন তাঁর ভেলা নিয়ে এবং বাক্স হাতে ব্ল্যাটকে দেখলেন গুহায় ঢুকতে। সে বিষয়ে তিনি ব্ল্যাটকে প্রশ্ন করায় ব্ল্যাট তাঁকে খুন করেন, এবং নৌকো নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়েন।'

পোয়ারো বললেন, 'তাহলে আপনার স্থির বিশ্বাস ব্ল্যাটই খুনী?'

'সেটাই সবচেয়ে বেশি সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য এও হতে পারে যে আর্লেনা আসল ব্যাপারটা আগেই জানতে পেরেছিলেন, সে সম্পর্কে ব্ল্যাটকে হয়তো কিছু বলেও ছিলেন, এবং দলের অন্য একজন লোক মিথ্যে সাক্ষাৎকারে নাম করে আর্লেনাকে ডেকে পাঠায় ও তাঁকে খুন করে। সুতরাং, যা বললাম, আমার মতে সবচেয়ে ভালো পথ হলো গোটা ব্যাপারটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতে তুলে দেওয়া। চোরাচালান দলের সঙ্গে ব্ল্যাটের সম্পর্ক প্রমাণ করবার সুযোগ আমাদের চেয়ে ওদের হাতে অনেক বেশি আছে।'

এরকুল পোয়ারো চিন্তান্বিতভাবে মাথা নাড়লেন।

ওয়েস্টন বললেন, 'আপনার কি মনে হয়? কাজটা ঠিক হবে, হুঁ?'

পোয়ারো তখনও চিন্তাকুল। অবশেষে তিনি বললেন, 'হয়তো ঠিক হবে।'

'ওসব হেঁয়ালি ছাড়ুন, মশাই। সত্যি করে বলুন তো, আস্তিনে কোন তুরুপের তাসটি লুকিয়ে রেখেছেন।'

পোয়ারো বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'লুকিয়ে রাখলেও জানি না, শেষ পর্যন্ত তা প্রমাণ করতে পারবো কি না।'

ওয়েস্টন বললেন, 'অবশ্য জানি, আপনার এবং কলগেটের ধারণা অন্যরকম। আমার কাছে সেটা একটু অবিশ্বাস্য ঠেকলেও একথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে তার ভেতরে সত্যি কিছু থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আপনার ধারণা যদি ঠিকও হয়, তাহলেও আমার বিশ্বাস এটা ইয়ার্ডের মামলা। আমরা ওদের সমস্ত তথ্য জানিয়ে দেবো, তাহলে ওরা সারে পুলিশের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে পারবে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এ মামলা আমাদের জন্যে না। কারণ এর সীমানা অনেক বিস্তৃত।'

তিনি একটু থামলেন।

'আপনার কি মনে হয়, পোয়ারো। এ বিষয়ে কি করা উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন?'

পোয়ারোকে দেখে চিন্তামগ্ন বলে মনে হলো। অবশেষে তিনি বললেন, ‘শুধু এটুকু জানি, এখন আমার কি করতে ইচ্ছে করছে।’

‘কি?’

পোয়ারো শান্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, ‘একটা পিকনিকে গেলে মন্দ হয় না।’

কর্নেল ওয়েস্টন স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন পোয়ারোর গম্ভীর মুখের দিকে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

'পিকনিক, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

এমিলি ব্রুস্টার এমনভাবে পোয়ারোর দিকে তাকালেন যেন পোয়ারো তাঁর সুস্থতার সীমারেখা পার হয়ে গেছেন।

মুগ্ধ একাগ্র স্বরে বললেন পোয়ারো, 'আপনার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত খারাপ লাগছে, তাই না? কিন্তু আমার ধারণা, এই মুহূর্তে এর চেয়ে সুন্দর প্রস্তাব সত্যিই আর নেই। বর্তমান পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে তুলতে গেলে আমাদের প্রয়োজন স্বাভাবিক, নিত্যনৈমিত্তিক আচরণের। ডার্টমুর অঞ্চলে বেড়াতে যাবার জন্য আমি বিশেষ উদগ্রীব, তাছাড়া আবহাওয়া এখন চমৎকার। এতে—ঠিক কিভাবে বলবো?—এতে সকলেই অত্যন্ত খুশি হবে।—সুতরাং, এব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন, মাদমোয়াজেল। প্রত্যেককে এ পিকনিকে রাজি করান।'

অপ্রত্যাশিত সাফল্যের সঙ্গে প্রস্তাব গৃহীত হলো। প্রথম প্রথম প্রত্যেকেই একটু ইতস্তত করলেন, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করলেন, প্রস্তাবটা নেহাত মন্দ নয়।

ক্যাপ্টেন মার্শালকে অনুরোধ করার কথা উত্থাপিত হয়নি। তিনি নিজেই বলেছেন সেইদিন তাঁকে প্লিমাউথ যেতে হবে। মিঃ ব্ল্যাট পিকনিকের প্রস্তাবে রাজি হলেন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে। অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে উঠতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি ছাড়া আরও ছিলেন এমিলি ব্রুস্টার, রেডফার্নরা স্টিফেন লেন, গার্ডেনাররা, যাঁদের আরও একদিন থেকে যেতে রাজি করানো হয়েছে, রোজামণ্ড ডার্নলি ও লিন্ডা।

পোয়ারো তাঁর কথার মায়াজালে আচ্ছন্ন করেছেন রোজমণ্ডকে এবং বারংবার এই কথাটাই ওকে বুঝিয়েছেন যে এই পিকনিক লিন্ডাকে ওর বর্তমান মানসিক অবস্থা থেকে অন্তত সাময়িকভাবে হলেও মুক্তি দেবে। রোজমণ্ড তাঁকে সমর্থন জানালো। ও বললো, 'আপনার কথাই ঠিক। ওই বয়েসের একটা বাচ্চার কাছে এই মানসিক আঘাত ভীষণ ক্ষতিকর। এতে ওর মনের বাঁধুনি অনেক দুর্বল হয়ে গেছে।'

'সেটা নিছকই স্বাভাবিক, মাদমোয়াজেল। কিন্তু ওই বয়সে মানুষ সহজে সবকিছু ভুলে যেতে পারে। ওকে আসতে রাজী করান। আপনি পারবেন, আমি জানি।'

মেজর ব্যারী দৃঢ়তার সঙ্গে এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পিকনিক তিনি পছন্দ করেন না। 'একগাদা বাক্স বয়ে নিয়ে যাওয়া,' তিনি বলেছেন, 'আর অসুবিধের তো অন্ত নেই! টেবিলে সে খাওয়াটাই আমার বেশি পছন্দ।'

সকাল দশটায় সকলে জমায়েত হলেন। তিনটে গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিলো। মিঃ ব্ল্যাট সরব এবং উৎফুল্ল কণ্ঠে জনৈক ট্যুরিস্ট গাইডের অনুকরণ করছেন।

'এইদিকে আসুন, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ—ডার্টমুরে যাবার পথ এইদিকে। এখানে রয়েছে বুনো ঝোপ ও জাম গাছের ছায়া, রয়েছে, ডেভনশায়ারের বৈশিষ্ট্য ও অভিযুক্ত অপরাধীদের সমাবেশ। আপনাদের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আসুন, ভদ্রমহোদয়গণ, অথবা সঙ্গে নিন, সুন্দরী সঙ্গিনীদের। প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। জানাই স্বর্গীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখানোর প্রতিশ্রুতি। তাড়াতাড়ি চলুন। তাড়াতাড়ি চলুন।'

শেষ মুহূর্তে চিন্তার ছায়া চোখে নিয়ে নিচে নেমে এলো রোজমণ্ড ডার্নলি। ও বললো, 'লিন্ডা আসবে না। ও বলছে ওর নাকি ভীষণ মাথা ধরেছে।'

পোয়ারো বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু এলে ওর পক্ষে ভালো হতো। ওকে রাজি করান, মাদমোয়াজেল।'

রোজামণ্ড দৃঢ় কণ্ঠে বললো, কোন লাভ নেই। ও একেবারে মনস্থির করে ফেলেছে। আমি কয়েকটা অ্যাসপিরিনি দিয়েছি, সেগুলো খেয়ে ও শুয়ে পড়েছে।'

রোজমণ্ড একটু ইতস্তত করলো, তারপর বললো, 'মনে হয়, আমার যাওয়াটা হয়তো ঠিক হবে না।'

সেটি হচ্ছে না, দেবী সেটি হচ্ছে না।' ইয়ার্কির ছলে ওর হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ ব্ল্যাট, 'আনুষ্ঠানকে মধুর করে তুলতে আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। উহুঁ, কোন আপত্তি শুনছি না। আপনাকে আমি বন্দী করলাম, হা, হা। ডার্টমুরের কারাগারে আপনাকে নির্বাসন দেওয়া হবে।'

অচ্ছেদ্য বন্ধনে ওকে সঙ্গী করে প্রথম গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন ব্ল্যাট। যেতে যেতে পোয়ারোর দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে গেলো রোজামণ্ড।

'আমি লিন্ডার কাছে থাকছি।' বলল, ক্রিস্টিন রেডফার্ন, 'আমার কোন আপত্তি নেই।'

প্যাট্রিক বলল, 'কি হচ্ছে, ক্রিস্টিন—চলো।'

এবং পোয়ারো বললেন, 'না, না, আপনি আসবেন বৈকি, মাদাম। মাথা ধরলে কারও পক্ষে একা থাকাটাই ভালো। চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

তিনটে গাড়ি চলতে শুরু করলো।

ওঁরা প্রথমে গেলেন শীপস্টরের আসল পিক্সির গুহায়, তার প্রবেশপথ অনুসন্ধান করে যথেষ্ট আনন্দ পেলেন, অবশেষে, একটা ছবি-পোস্টকার্ডের সাহায্য পথটা খুঁজে পেলেন।

বড় বড় পাথরে পা ফেলে চলার পথটা ছিলো অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এরকুল পোয়ারো সে চেষ্টা করলেন না। তিনি অসংযত চোখে অনুসরণ করে চললেন পাথর থেকে পাথরে হালকাভাবে লাফিয়ে যাওয়া ক্রিস্টিন রেডফার্নকে এবং লক্ষ্য করলেন, ওর স্বামী কোন সময়েই ওর থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই। রোজামণ্ড ডার্নলি ও এমিলি ব্রুস্টার অনুসন্ধানের কাজে যোগ দিয়েছিলেন, অবশ্য শেষোক্ত জন একবার পা ফস্কেছেন এবং ফলস্বরূপ নিজের গোড়ালিতে সামান্য মোচড় দিয়েছেন। স্টিফেন লেন ছিলেন অক্লান্ত অভিযাত্রী, তাঁর দীর্ঘকায় কৃশ শরীর সুবিশাল পাথরের সমাবেশ সর্বদাই ছিলেন কর্মব্যস্ত। মিঃ ব্ল্যাট কিছুটা পথ এগিয়ে ক্ষান্ত হলেন এবং সরবে উৎসাহবাণী জানিয়ে চললেন; কিন্তু সেই সঙ্গে অনুসন্ধানকারীদের ছবি তুলতে ভুললেন না।

গার্ডেনাররা এবং পোয়ারো পথের একপাশে স্থিরভাবে বসে রইলেন, এবং মিসেস গার্ডেনারে মসৃণ কণ্ঠস্বর সরব হলো সুষম লয়ের ভাষণে, যে ভাষণে—তাঁর স্বামীর অনুগত 'হ্যাঁ, সোনা' দিয়ে থেকে থেকে যতিচিহ্নিত।

'আর সব সময় আমার যা মনে হয়েছে, মঁসিয়ে পোয়ারো, এবং মিঃ গার্ডেনারও আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, তা হলো, আচমকা তোলা ছবি, ভীষণ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য, যদি না সেগুলো কেবল বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে তোলা হয়। ওই মিঃ ব্ল্যাটের সত্যিই কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। তিনি প্রত্যেকের সামনে গিয়ে হঠাৎ করে হাজির হন, একনাগাড়ে কথা বলতে থাকেন আর ছবি তুলতে শুরু করেন—এ অত্যন্ত অশিক্ষিত আচরণ, মিঃ গার্ডেনারকেও আমি সেই কথাই বলেছি। কি, বলিনি, ওডেল?'

'হ্যাঁ, সোনা।'

'সেদিন সমুদ্রতীরে তিনি আমাদের সকলের বসা অবস্থায় একটা ছবি তুলেছেন। তা, তুলেছেন ভালোই করেছেন, কিন্তু প্রথমে তাঁর জিগ্যেস করা উচিত ছিলো। কারণ, ঠিক তখনই মিস ব্রস্টার হোটেলে ফিরে যাবেন বলে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন, সুতরাং তাঁর সেই অবস্থায় তোলা ছবি যে অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!'

'কথাটা মিথ্যে নয়।' আকর্ণ হেসে বললেন মিঃ গার্ডেনার।

'আর মিঃ ব্ল্যাট কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই সেই ছবির একটা করে কপি সকলকে দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আপনাকেও একটা দিয়েছেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি দেখেছি।'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন। তিনি বললেন, 'ওই ছবির মূল্য আমার কাছে অনেক।'

মিসেস গার্ডেনার বলে চললেন, 'আর তাঁর আজকের ব্যবহার দেখুন—মামুলি হৈ-হুল্লোড়ে সর্বক্ষণ মেতে আছেন। দেখেশুনে আমার তো কাঁপুনি দিচ্ছে। এই লোকটাকে বাড়িতে রেখে আসার ব্যবস্থাই আপনার করা উচিত ছিলো, মঁসিয়ে পোয়ারো।'

এরকুল পোয়ারো অস্ফুট স্বরে বললেন, 'হায়, মাদাম, সেটা অত্যন্ত কঠিন কাজ হতো।'

'কঠিন বলে কঠিন। ওই লোকটা সর্বক্ষেত্রে গুঁতোগুঁতি করে হলেও নিজের জায়গা করে নেয়। ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান বলে কোন পদার্থ নেই।'

সেই মুহূর্তে নিচে থেকে ভেসে আসা সমবেত উল্লাস-চিৎকার জানিয়ে দিলো পিক্সি গুহার প্রবেশপথ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এরকুল পোয়ারোর পরিচালনায় পিকনিক দল এবার উপস্থিত হলো এমন একটা জায়গায় যেখানে গাড়ি রেখে পাহাড়ি ঝোপের পাশ দিয়ে সামান্য এগোলেই চোখে পড়ে একটা ছোট নদীর তীরে মনোরম এক সবুজ প্রান্তর।

নদী পার হওয়ার সেতু একটা সরু কাঠের তক্তা এবং পোয়ারো ও মিঃ গার্ডেনার মিসেস গার্ডেনারকে সেতু পার হতে রাজী করালেন। নদীর পরেই গুল্মঝোপে ঘেরা চোখজুড়ানো একটা ছোট্ট সবুজ জায়গা, সেখানে আগাছার চিহ্নমাত্র নেই এবং পিকনিকের পক্ষে আদর্শ স্থান।

সরু সেতু অতিক্রম করার সময় তাঁর বিচিত্র অনুভূতি সম্পর্কে উচ্চ স্বরে ভাষণ দিতে দিতে মিসেস গার্ডেনার গুছিয়ে বসলেন। হঠাৎ শোনা গেলো সামান্য কোলাহল।

অন্যান্যরা খুব সহজেই দৌড়ে পার হয়েছে কাঠের সেতুটা, কিন্তু এমিলি ব্রুস্টার সেই সরু তক্তার ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর দু চোখ বোজা, শরীরটা অনিশ্চিতভাবে এপাশ-ওপাশ দুলছে।

পোয়ারো এবং প্যাট্রিক রেডফার্ন ব্যস্তভাবে ছুটে গেলেন তাঁকে উদ্ধার করতে।

এমিলি ব্রুস্টার লজ্জিত কণ্ঠে সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিলেন, 'ধন্যবাদ ধন্যবাদ। দুঃখিত। খরস্রোতা নদী পার হওয়ার ব্যাপারে কোনদিনই তেমন পটু ছিলাম না। কেমন যেন মাথা ঝিমঝিম করে। নেহাৎই বোকার মতো।'

খাবার ভাগ করে দেওয়া হলো এবং পিকনিক শুরু হলো।

উপস্থিত প্রত্যেকেই এই ছোট্ট অনুষ্ঠানটুকু কত ভালো লাগছে ভেবে ভেতরে ভেতরে অবাক হলেন। এর কারণ, সম্ভবত, এই অনুষ্ঠান সন্দেহ ও ত্রাসে ঘেরা এক পরিবেশ থেকে তাঁদের সাময়িক মুক্তি দিয়েছে। এখানে চঞ্চল জলের স্বনন, জলজ উদ্ভিদের নেশা ধরানো হালকা গন্ধ এবং গুল্ম পর্ণের উষ্ণ রঙিন ছটা, হত্যা পুলিশি তদন্ত ও সন্দেহভরা পৃথিবীকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছে, যেন কোনদিনই সে পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিলো না। এমন কি মিঃ ব্ল্যাট পর্যন্ত অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে উঠতে ভুলে গেলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর কাছাকাছি একটা শোবার জায়গা বেছে নিলেন তিনি এবং তাঁর সুখের অচেতন অবস্থায় সাক্ষ্য দিয়ে চললো চাপা নাক ডাকার শব্দ।

অবশেষে জিনিসপত্রর গোছগাছ করে প্রত্যেকেই পোয়ারোকে তাঁর সুন্দর পরিকল্পনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

সরু আঁকাবাঁকা গলিপথ ধরে যখন তাঁরা ফিরে আসছেন তখন সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। লেদারকোম্ব উপসাগর সংলগ্ন পাহাড়ের চূড়া থেকে দূরে দ্বীপের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা হোটেলবাড়িটাকে তাঁরা ক্ষণেকের জন্য দেখতে পেলেন।

অস্তায়মান সূর্যের আলোয় বাড়িটাকে শান্ত নিষ্পাপ বলে মনে হলো।

মিসেস গার্ডেনার এই প্রথম বাকসংযমের পরিচয় দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনাকে সত্যিই ধন্যবাদ জানাই, মঁসিয়ে পোয়ারো। আমার নিজেকে ভীষণ শান্ত লাগছে। আজকের দিনটা একটা কথায়

কাটলো চমৎকার।'

২

হোটেল পৌঁছলে মেজর ব্যারী তাঁদের সম্বর্ধনা জানাতে বেরিয়ে এলেন।

'এই যে!' তিনি বললেন, 'দিনটা ভালো কাটলো তো?'

মিসেস গার্ডেনার বললেন, 'নিশ্চয়ই। খোলা সবুজ মাঠগুলোর তুলনা হয় না। একেবারে খাস ইংরেজি আর সাবেকী। সেখানকার সতেজ বাতাসে শুধু তৃপ্তির ছোঁয়া। আলসেমি করে না যাওয়ার জন্যে আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।'

মেজর চাপা হাসি হাসলেন।

'জলার মেঝে বসে স্যান্ডউইচ খাওয়া—ও সবের বয়েস কি আর আছে।'

একজন পরিচারিকা তখন হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাস ছন্দহীন, গভীর। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে ক্ষিপ্র পায়ে এসে উপস্থিত হলো ক্রিস্টিন রেডফার্নের সামনে।

এরকুল পোয়ারো তাকে গ্ল্যাডিস ন্যারাকট বলে চিনতে পারলেন। ওর এলোমেলো দ্রুত কণ্ঠস্বর কানে এলো। 'মাপ করবেন, মাদাম, ছোট দিদিমণির জন্যে আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মিস মার্শালের জন্যে। এইমাত্র তাঁর ঘরে চা নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে জাগাতে পারলাম না, আর তাঁকে এত—এত অদ্ভুত দেখাচ্ছে...'

ক্রিস্টিন দিশেহারা হয়ে চারপাশে তাকালো। মুহূর্তের মধ্যে পোয়ারো ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওর কনুই ধরে শান্ত স্বরে তিনি বললেন, 'চলুন, গিয়ে দেখা যাক।'

চঞ্চল পায়ে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা পেরিয়ে ওঁরা দুজনে লিন্ডার ঘরে উপস্থিত হলেন।

লিন্ডার দিকে এক পলক তাকিয়েই ওঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ওর মুখের রঙ কেমন অদ্ভুত ধরনের আর শ্বাস-প্রশ্বাসের লক্ষণ চোখে পড়ছে না বললেই চলে।

পোয়ারো ওর নাড়ি দেখলেন। একই সঙ্গে তাঁর নজরে পড়লো বিছানার পাশে টেবিল-ল্যাম্পের নিচে চাপা দেওয়া একটা খাম। খামটা তাঁর নামেই। ক্যাপ্টেন মার্শাল ত্রস্ত পায়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। তিনি বললেন, লিন্ডার নামে এসব কি শুনছি? কি হয়েছে ওর?'

শঙ্কা মেশানো এক টুকরো চাপা কান্না বেরিয়ে এলো ক্রিস্টিন রেডফার্নের মুখ দিয়ে।

এরকুল পোয়ারো বিছানার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন। মার্শালকে বললেন, 'একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসুন—যত শীগগির পারেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে—ভীষণ আশঙ্কা হচ্ছে—আমাদের হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

নিজের নাম লেখা খামটা তুলে নিলেন, তিনি, খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলেন। তাতে রয়েছে লিন্ডার ছিমছাম কিশোরী হাতে লেখা কয়েকটি লাইন।

আমার মনের হয় এটাই মুক্তির সবচেয়ে সহজ পথ। বাবাকে বলবেন তাঁর বিচারে আমাকে ক্ষমা করতে। আর্লেনাকে আমিই খুন করেছি। এতে আমার খুশি হওয়ার কথা—কিন্তু হইনি। সব কিছুর জন্যে আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে।

৩

ওঁরা সকলে জমায়েত হয়েছেন বিশ্রাম কক্ষে—মার্শাল রেডফার্নরা রোজমণ্ড ডার্নলি এবং এরকুল পোয়ারো।

প্রত্যেকেই চুপচাপ বসে—প্রতীক্ষারত...

দরজা খুলে ডাঃ নীসডন ভেতরে এলেন। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, 'যতটুকু করা সম্ভব করেছি। এ যাত্রা মেয়েটা টিকে গেলেও যেতে পারে—তবে এ কথা না বলে পারছি না, আশা খুব বেশি নেই।'

তিনি একটু থামলেন।

কঠিন মুখে কুয়াশাঘন শীতল নীল চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মার্শাল, 'কিন্তু জিনিসটা ও হাতে পেলো কেমন করে?'

দরজা খুলে নীসডন কাকে যেন ডাকলেন।

পরিচারিকাটি ঘুরে ঢুকলো। ওর চোখে মুখে কান্নার স্বাক্ষর।

নীসডন বললেন, 'তুমি যা দেখেছো আমাদের আর একেবারে বলো।'

বার কয়েক শব্দে নাক টেনে মেয়েটি বললো, 'আমি মোটেই ভাবিনি—এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি ভেতরে ভেতরে কোন গলদ রয়েছে—অবশ্য ছোড়দিদিমণিকে দেখে তখন একটু অবাক লেগেছিলো।' ডাক্তারের কাছ থেকে সামান্য অধৈর্যসূচক ইঙ্গিত পেয়ে ও আবার শুরু করলো, 'মিস মার্শাল তখন অন্য দিদিমণির ঘরে ছিলেন। মিসেস রেডফার্নের ঘরে। আপনার ঘরে মাদাম। বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, একটা ছোট শিশি হাতে নিয়ে। আমাকে ঢুকতে দেখেই তিনি ভীষণ চমকে ওঠেন, আর আপনার ঘর থেকে মিস লিন্ডার না বলে কোন জিনিস নেওয়াটা আমার কাছে কেমন অদ্ভুত ঠেকেছে, অবশ্য, এও হতে পারে, ওটা হয়তো তাঁরই জিনিস—আপনাকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। তিনি শুধু বললেন, 'এই তো, এটাই খুঁজছিলাম—' এবং ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।'

ক্রিস্টিন প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'আমার ঘুমের ট্যাবলেটগুলো।'

ডাক্তার রূঢ় স্বরে বললেন, 'সে খবর মিস লিন্ডা পেলো কি করে?'

ক্রিস্টিন বললো, 'আমি ওকে একটা দিয়েছিলাম। আর্লেনা মারা যাওয়ার দিন রাতে। ও বলছিলো ঘুম আসছে না। ও আমার মনে আছে ও বলেছিলো—'একটাতেই হবে তো?'—আর আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, এই ট্যাবলেটগুলো খুব জোরালো—আমাকে কখনও একসঙ্গে দুটোর বেশি খেতে বারণ করা হয়েছে।'

নীসডন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

মেয়েটা ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার কোন পথ রাখেনি, তিনি বললেন, 'একসঙ্গে ছ-ছ'টা ট্যাবলেট গিলেছে।'

ক্রিস্টিন আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

'ওঃ, এ সবই আমার দোষে হলো, ট্যাবলেটের শিশিটা আমার তালাচাবি দিয়ে রাখা উচিত ছিলো।'

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকালেন।

'হয়তো সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হতো, মিসেস রেডফার্ন।'

ক্রিস্টিন হতাশ সুরে বলে উঠলো, 'ও মারা যাচ্ছে—সম্পূর্ণ আমার দোষে...'

কেনেথ মার্শাল নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন।

তিনি বললেন, 'না আপনার কোন দোষ নেই। লিন্ডা যা করেছে জেনেশুনে করেছে। ও ট্যাবলেট খেয়েছে স্ব-ইচ্ছায়। হয়তো—হয়তো এ-ই সবচেয়ে ভালো হলো।'

তিনি চোখ নামিয়ে দেখলেন তাঁর হাতে ধরা ভাঁজ করা চিঠিটার দিকে—যে চিঠিটা পোয়ারো নীরবে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।

রোজামন্ড ডার্নলি চিৎকার করে উঠলো, 'আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না লিন্ডা আর্লেনাকে খুন করেছে। কারণ সেটা পুরোপুরি অসম্ভব—অন্তত সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুয়ায়ী।'

ক্রিস্টিন আগ্রহের সুরে বললো, 'হ্যাঁ, সে কাজ ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়। হয়তো অতিরিক্ত মানসিক দুশ্চিন্তায় পুরো ব্যাপারটা ও কল্পনা করে নিয়েছে।'

দরজা খুলে গেলো এবং কর্নেল ওয়েস্টন ঘরে ঢুকলেন। তিনি বললেন, 'এ সব কি শুনছি?'

ডাঃ নীসডন মার্শালের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পুলিশ-প্রধানের হাতে তুলে নিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি সেটা পড়লেন। তিনি অবিশ্বাসী বিস্ময়ভরা স্বরে বলে উঠলেন, 'কি? কিন্তু এর কোন মানে হয় না—একেবারে

অর্থহীন। সম্পূর্ণ অসম্ভব!' নিশ্চিত সুরে তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন, 'অসম্ভব! তাই না, পোয়োরো?'

এরকুল পোয়ারো এই প্রথম নড়েচড়ে বসলেন। ধীর বিষণ্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'না, আমার ধারণা অসম্ভব নয়।'

ক্রিস্টিন রেডফার্ন বললো, 'কিন্তু আমি ওর সঙ্গে ছিলাম, মঁসিয়ে পোয়ারো। পৌনে বারোটা পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমি পুলিশকেও তাই বলেছি।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনার সাক্ষ্যই ওকে অ্যালিবাই জুগিয়েছে—হ্যাঁ। কিন্তু আপনার সাক্ষ্য কিসের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে? লিন্ডা মার্শালের হাতঘড়ির ওপর ভিত্তি করে। আপনি নিজে থেকেই নিশ্চিত করে বলতে পারেন না যে ঠিক পৌনে বারোটার সময় আপনি মিস মার্শালকে ছেড়ে চলে আসেন—ও আপনাকে যা যা বলেছে আপনি শুধু সেইটুকুই জানেন। আপনি নিজে বলেছেন, সময় খুব তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হয়েছে বলে আপনার মনে হয়েছিলো।'

বিস্ময়াহত অপলক চোখে ও তাকিয়ে রইলো।

তিনি বললেন, 'এবারে ভাবুন মাদাম, যখন আপনি বেলাভূমি ছেড়ে চলে আসেন, তখন হোটেলে তাড়াতাড়ি না ধীরে ধীরে ফিরে গিয়েছিলেন?'

'আমি—যতদূর মনে পড়ছে—বেশ ধীরে সুস্থেই ফিরে গিয়েছিলাম।'

'ওই ফিরে যাওয়ার ঘটনাটা আপনার ভালোমতো মনে আছে?'

'না, খুব বেশি মনে নেই। আমি—আমি চিন্তা করছিলাম।

পোয়ারো বললেন, 'এ প্রশ্ন করার জন্য আমি দুঃখিত, মাদাম, কিন্তু দয়া করে বলবেন, সে সময়ে আপনি কি চিন্তা করেছিলেন?'

ক্রিস্টিনের গালে রক্তের ঝলক ছায়া ফেললো।

'আমি—যদি সেটা একান্তই জানতে চান... আমি এখান থেকে—চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। আমার স্বামীকে না জানিয়ে চুপচাপ চলে যাওয়ার কথা। সেই সময়ে আমার—আমার ভীষণ খারাপ লাগছিলো, জানেন।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন অপেক্ষাকৃত উঁচু গলায় বলল, 'ও ক্রিস্টিন। আমি জানি... আমি জানি...'

পোয়ারো নিখুঁত কণ্ঠস্বর এই আলোচনার মাঝে নিজের জায়গা করে নিলো, 'ঠিক তাই। আপনি তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবার কথা ভাবছিলেন। আমি বলবো, আপনি সেই মুহূর্তগুলোয় আপনার পারিপার্শ্বিকের প্রতি সম্পূর্ণ বধির এবং অন্ধ ছিলেন। সম্ভবত আপনি অত্যন্ত ধীর পায়ে হাঁটছিলেন এবং সময়ে সময়ে মিনিটখানেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে আপনার মানসিক সমস্যার সমাধান খুঁজছিলেন।'

ক্রিস্টিন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

আপনার তো দারুণ বুদ্ধি। সত্যি তাই হয়েছিলো। হোটেলের দরজায় পৌঁছে আমি যেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন নিয়ে জেগে উঠি এবং দেরি হয়ে যাবে ভেবে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকি, কিন্তু হঠাৎ লাউঞ্জের ঘড়িটা আমার নজরে পড়লো তখন বুঝলাম হাতে তখনও অনেক সময় রয়েছে।

এরকুল পোয়ারো আবার বললেন, 'ঠিক তাই।'

তিনি ফিরলেন মার্শালের দিকে।

'খুনের পরে আপনার মেয়ের ঘর থেকে এমন কতকগুলো জিনিস আমি পেয়েছি। যেগুলো আপনাকে এখন বলা প্রয়োজন। ঘরের চুল্লীতে আমি পেয়েছি বিশাল এক টুকরো গলা মোম, কিছু পোড়া চুল, পিচবোর্ড ও কাগজের কিছু ছেঁড়া অংশ এবং একটা সাধারণ আলপিন। কাগজ ও পিচবোর্ডের টুকরোগুলো হয়তো অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু অন্য তিনটে জিনিস যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ—বিশেষ করে যখন বইয়ের তাকে স্থানীয় পাঠাগারের ডাকিনীবিদ্যা ও মায়াবিদ্যাসংক্রান্ত একটি বই আমি লুকনো অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। একটা বিশেষ পৃষ্ঠায়

খুব সহজেই বইটা খুলে গেলো। সেই পৃষ্ঠায় মোমের পুতুলের সাহায্যে, যা ইপ্সিত শত্রুর প্রতীক, মত্যু সাধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা আছে। তারপর সেই মোমের পুতুলকে ধীরে ধীরে গলিয়ে ফেলা হয় উত্তাপের সাহায্যে—অথবা বিকল্প হিসেবে একটা আলপিন আপনি বসিয়ে দিতে পারেন ওই পুতুলের হৃৎপিণ্ডে। ফলে ইপ্সিত ব্যক্তির আসন্ন মৃতুক্ষণ নির্ধারিত হয়ে যাবে। পরে মিসেস রেডফার্নের কাছে আমি শুনেছি যে সেইদিন ভোরে লিন্ডা মার্শাল ওর ঘরে ছিলো না, বেরিয়েছিলো, এবং কিনে এনেছিলো এক প্যাকেট মোমবাতি, আর ওর সেই কিনে আনা জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়লে ওকে দেখে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। তারপরে কি ঘটেছে সে বিষয়ে
আমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। মোমবাতির মোম দিয়ে লিন্ডা কাঁচা হাতে একটা পুতুল তৈরি করে—সম্ভবত আর্লেনার মাথা থেকে কেটে নেওয়া লাল চুল দিয়ে সেটাকেও সাজিয়ে নেয় যাদুশক্তি জাগিয়ে তোলার জন্য—তারপর একটা আলপিন বসিয়ে দেয় পুতুলটার হৃৎপিণ্ডে এবং সবশেষে পিচবোর্ডের টুকরো জ্বেলে পুতুলটাকে ও গলিয়ে ফেলে।

'এটা অপরিণত শিশুসুলভ মনের কুসংস্কার কিন্তু একটা জিনিস এ থেকে স্পষ্ট হয় : খুনের আকাঙ্ক্ষা।

'এই আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি কিছু থাকার সম্ভাবনা কি সেখানে রয়েছে? লিন্ডা মার্শালের পক্ষে ওর সৎমাকে খুন করা কি সত্যি সম্ভব ছিলো?'

'প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ওঁর নিখুঁত অ্যালিবাই রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, একটু আগেই যেটা আমি আপনাদের নজরে এনেছি, সেই সময়ের সাক্ষ্য লিন্ডা নিজেই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। সঠিক সময়কে সিকি ঘণ্টা বাড়িয়ে খুব সহজেই ও সময় বলে থাকতে পারে।

'মিসেস রেডফার্ন সৈকত ছেড়ে চলে যেতেই তাঁকে অনুসরণ করে ওপরে উঠে আসা লিন্ডার পক্ষে অসম্ভব ছিলো না, অসম্ভব ছিলো না দ্বীপের গ্রীবাসদৃশ অংশটুকু অতিক্রম করে পিক্সি কোভের লোহার মইয়ের কাছে পৌঁছনো, মই বেয়ে তাড়াহুড়ো করে নেমে যাওয়া, সৎমার সঙ্গে দেখা করা, তাঁকে খুন করা এবং মিস ব্রুস্টার ও প্যাট্রিক রেডফার্ন নৌকো নিয়ে দৃশ্যপটে উপস্থিত হওয়ার আগেই মই বেয়ে ফিরে আসা। তারপর ও হয়তো ফিরে আসে গাল কোভে, স্নান সেরে ধীরেসুস্থে ফিরে যায় হোটেলে।

'কিন্তু দুটো জিনিস এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। আর্লেনা মার্শাল যে পিক্সি কোভে থাকবেন সেটা ওর পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানা প্রয়োজন, এবং দৈহিক শক্তির দিক থেকে সেই বিশেষ কর্ম সম্পাদনে ওকে হতে হবে সক্ষম।

'হ্যাঁ, এই দুয়ের প্রথমটি সম্পূর্ণ সম্ভব—যদি লিন্ডা মার্শাল অন্য কারও নামে আর্লেনাকে কোন চিঠি দিয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়টির কথা যদি বলেন, লিন্ডার হাত যথেষ্ট প্রশস্ত এবং শক্তিশালী। কোন পুরুষের মতোই সুদীর্ঘ ওর হাত। শক্তির কথা যদি বলেন, ও এখন এমন একটা বয়েসে রয়েছে যখন মানসিক অস্থিরতার প্রবণতার দেখা দেয়। প্রায়শই এই মানসিক বিশৃঙ্খলার সঙ্গী হয় অমানুষিক শক্তি। এছাড়া একটা ছোট ঘটনা আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত। লিন্ডা মার্শলের মাকে খুনের দায়ের অভিযুক্ত করা হয় এবং আদালতে তাঁর বিচারও হয়।'

কেনেথ মার্শাল মাথা তুললেন। ভয়ঙ্কর সুরে তিনি বলে উঠলেন, 'বিচারে ও মুক্তি পেয়েছিলো।'

'বিচারে উনি মুক্তি পেয়েছিলেন।' পোয়ারো একমত হলেন।

মার্শাল বললেন, 'আর—একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, মঁসিয়ে পোয়ারো। রুথ—আমার স্ত্রী—সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলো। সে কথা আমি নির্ভুল এবং নিশ্চিতভাবে জানি। আমাদের দাম্পত্যজীবনের অন্তরঙ্গতায় ওর পক্ষে আমাকে প্রতারিত করা সম্ভব ছিলো না। ও পরিস্থিতির এক নির্দোষ শিকার হয়ে পড়েছিলো।'

তিনি একটু থামলেন।

'আর লিন্ডা আর্লেনাকে খুন করেছে, এ আমি বিশ্বাস করি না। এ সম্পূর্ণ অসম্ভব—অবাস্তব।'

পোয়ারো বললেন, 'তাহলে আপনি মনে করেন, ওই চিঠিটা জাল?'

মার্শাল চিঠিটার জন্য হাত বাড়ালেন এবং ওয়েস্টন সেটা তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

মার্শাল মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পরীক্ষা করলেন। তারপর মাথা নাড়লেন।

'না', অনিচ্ছার সুরে তিনি বললেন, 'আমার ধারণা, এটা লিন্ডারই লেখা।'

পোয়ারো বললেন, 'চিঠিটা যদি ও লিখে থাকে, তাহলে এর মাত্র দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। হয় চিঠিটা ও নির্ভেজাল বিশ্বাসে লিখেছে, নিজেকে সত্যি খুনী জেনে, অথবা—আমার ধারণা; এই চিঠি ও লিখেছে অন্য কাউকে রক্ষা করার জন্য— এমন কাউকে, যাকে পুলিশ সন্দেহ করছে বলে ওর আশঙ্কা ছিলো।'

কেনেথ মার্শাল বললেন, 'আপনি আমার কথা বলছেন?'

'সেটা খুবই সম্ভব, নয় কি?'

মার্শাল কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপর শান্ত স্বরে বললেন, 'না, আমার মনে হয়, সে ধারণা নিতান্ত অসম্ভব। লিন্ডা প্রথম প্রথম হয়তো ভেবে থাকবে, পুলিশ আমাকে সন্দেহ করছে। কিন্তু এখন ও নিশ্চিতভাবেই জানতো, সে সন্দেহ ধুয়েমুছে মিলিয়ে গেছে—জানতো, পুলিশ আমার অ্যালিবাই মেনে নিয়েছে এবং তাদের মনোযোগ এখন অন্যদিকে।'

পোয়ারো বললেন, 'আর যদি ধরে নেওয়া যায়, লিন্ডা শুধু ভাবেনি যে পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করছে, বরং জানতো, আপনিই প্রকৃত অপরাধী?'

মার্শাল অবাক চোখে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তিনি শব্দ করে ছোট্ট হাসলেন।

'এ রীতিমতো হাস্যকর।'

পোয়ারো বললেন, 'কি জানি। মিসেস মার্শালের মৃত্যু সম্পর্কে একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে, জানেন। একটা ব্যাখ্যা বলছে, তাঁকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছিলো, সেদিন সকালে তিনি সেই ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং সে তাঁকে খুন করে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা বলছে, পিক্সি কোভ ও পিক্সি গুহাকে মাদকদ্রব্য চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করা হতো, এবং তিনি ঘটনাচক্রে সে সম্পর্কে কিছু জেনে ফেলায় তাঁকে খুন করা হয়। একটা তৃতীয় সম্ভাবনা রয়েছে—যে কোন ধর্ম-উন্মাদ ব্যক্তির হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। আর চতুর্থ সম্ভাবনাও একটা আছে—আপনার স্ত্রীর মৃত্যুতে আপনার আর্থিক লাভের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়, ক্যাপ্টেন মার্শাল?'

'আমি তো একটু আগেই আপনাকে বললাম—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—মানছি, আপনার পক্ষে আপনার স্ত্রীকে খুন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিলো—যদি অবশ্য, আপনি একাই এ কাজে নেমে থাকেন। কিন্তু কেউ যদি আপনাকে সাহায্য করে থাকে?'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

শান্ত মানুষটা এতক্ষণে বিক্ষুব্ধ হলো। তিনি চেয়ার ছেড়ে অর্ধেক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর। একটা কঠিন ক্রুদ্ধ রোশনাই তাঁর দু চোখে জ্বলছে।

পোয়ারো বললেন, 'আমি বলতে চাই, এটা সে ধরনের অপরাধ নয়, যা সংঘটিত হয়েছে কারো একার হাতে। দুজন মানুষ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একথা সত্যি যে একই সঙ্গে আপনার পক্ষে পিক্সি কোভে যাওয়া ও সেই চিঠিটা টাইপ করা সম্ভব ছিলো না—কিন্তু চিঠিটা শর্টহ্যান্ডে লিখে রাখার মতো সময় আপনার হাতে ছিলো—এবং যখন আপনি নিজে অনুপস্থিত ছিলেন, ব্যস্ত ছিলেন জল্লাদ কর্মে, তখন অন্য কেউ হয়তো সে চিঠি আপনার ঘরে বসে টাইপ করে থাকবে।'

এরকুল পোয়ারো তাকালেন রোজামণ্ড ডার্নলির দিকে। তিনি বললেন, 'মিস ডার্নলি বলেছেন, তিনি এগারোটা দশে সানি লেজ ছেড়ে চলে আসেন। এবং আপনাকে আপনার ঘরে টাইপ করতে দেখেন। কিন্তু মোটামুটি এই সময়েই মিঃ গার্ডেনার হোটেলে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীর জন্য একটা উলের বল নিয়ে যেতে।

মিস ডার্নলির সঙ্গে তাঁর কথা অথবা দেখা হয়নি। ব্যাপারটা একটু অসাধারণ। দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে হয় মিস ডার্নলি কখনও সানি লেজ ছেড়ে আসেননি, নয় তিনি অনেক আগেই সে জায়গা ছেড়ে চলে আসেন এবং আপনার ঘরে পরিশ্রমের সঙ্গে টাইপ করতে থাকেন। আর একটা কথা, আপনি বলেছেন যে মিস ডার্নলি সওয়া এগারোটার সময় আপনার ঘরে উঁকি মারলে আপনি সামনের আয়নায় তাঁকে দেখতে পান। কিন্তু খুনের দিন আপনার টাইপরাইটার, কাগজ, সমস্ত ঘরের এক কোণে লেখার টেবিলে রাখা ছিলো, অথচ আয়নাটা ছিলো দু-জানলার মাঝখানে। সুতরাং আপনার সেই বিবৃতি নিছকই সাজানো মিথ্যে। পরে, আপনি টাইপরাইটারটা সরিয়ে নিয়ে যান আয়নার সামনে রাখা টেবিলটায়, আপনার গল্পকে প্রমাণ করার জন্য—কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি জানতাম, আপনি এবং মিস ডার্নলি, দুজনেই মিথ্যে কথা বলছেন।'

রোজামণ্ড ডার্নলি মুখ খুললো। ওর স্বর নিচু অথচ স্পষ্ট।

'ও বললো, কি সাংঘাতিক চালাক আপনি।'

উঁচু পর্দায় স্বর তুলে এরকুল পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু আর্লেনা মার্শালের খুনীর মতো অত সাংঘাতিক এবং অত চালাক নই। একটিবার ভেবে দেখুন। সেদিন সকালে আর্লেনা মার্শাল কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বলে আমি ভেবেছিলাম—আপনারা প্রত্যেকে ভেবেছিলেন? আমরা সকলে একই সিদ্ধান্তে একমত হয়েছি। প্যাট্রিক রেডফার্ন। কোন ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে দেখা করতে তিনি যাননি। তাহলে তাঁর মুখের চেহারাই সেকথা আমাকে জানিয়ে দিতো। উঁহু, তিনি দেখা করতে যাচ্ছিলেন কোন প্রেমিকের সঙ্গে—অন্তত তিনি তাই ভেবেছিলেন।

'হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর্লেনা মার্শাল যাচ্ছিলেন প্যাট্রিক রেডফার্নের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তার মিনিটখানেক পরেই প্যাট্রিক রেডফার্ন সৈকতে উপস্থিত হন এবং তাঁর চোখ বেশ স্পষ্টভাবেই আর্লেনা মার্শালের খোঁজ করতে থাকে। সুতরাং তাহলে?'

প্যাট্রিক রেডফার্ন চাপা ক্রোধের সুরে বললো, 'কোন বদমাইস আমার নাম ব্যবহার করে থাকবে।'

পোয়ারো বললেন, 'মিসেস মার্শালের অনুপস্থিতিতে আপনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বিরক্ত এবং বিস্মিত হন। সম্ভবত, বড় বেশিরকম স্পষ্টভাবে। আমার মত হলো, মিঃ রেডফার্ন, যে তিনি পিক্সি কোভে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি তাঁকে সেখানে খুন করেন।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো। তারপর তার খোশ মেজাজী আইরিশ সুরে উঁচু গলায় বললো, আপনি কি মশাই পাগল হয়ে গেলেন? মিসেস ব্রুস্টারের সঙ্গে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে ওর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি তো সৈকতে আপনার সঙ্গে ছিলাম।'

এরকুল পোয়ারো বললেন, মিস ব্রুস্টার নৌকো নিয়ে পুলিশ ডাকতে গেলে পর আপনি আর্লেনা মার্শালকে খুন করেন। আপনি যখন পিক্সি কোভে নামেন তখন তিনি বেঁচে ছিলেন, গুহায় লুকিয়ে থেকে রাস্তা পরিষ্কার হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন।'

কিন্তু সেই দেহটা। মিস ব্রুস্টার এবং আমি, দুজনেই সেটা দেখেছি।'

দেহ—ঠিক কথা। কিন্তু মৃহদেহ নয়। সেই মহিলার জীবন্ত দেহ, যিনি আপনাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর হাতে পায়ে ছিলো বাদামী রঙের প্রলেপ, মুখ ঢাকা ছিলো সবুজ পিচবোর্ডের টুপিতে। ক্রিস্টিন, আপনার স্ত্রী (অথবা, সম্ভবত আপনার স্ত্রী নয়—কিন্তু তবুও আপনার দুষ্কর্মের সাথী) আপনাকে এ খুনে সাহায্য করেছেন, যেমন করেছিলেন অতীতে যখন তিনি অ্যালিস করিগানের দেহ 'আবিষ্কার' করেন অ্যালিস করিগানের মৃত্যুর কুড়ি মিনিট আগে—অ্যালিসকে খুন করেছিলো তার স্বামী, এডওয়ার্ড করিগান—আপনি।'

ক্রিস্টিন কথা বললো। ওর স্বর তীক্ষ্ণ—শীতল। ও বললো, 'সাবধান, প্যাট্রিক, মাথা গরম কোরো না।'

পোয়ারো বললেন, 'শুনলে হয়তো খুশি হবেন, এখানে তোলা একটা গ্রুপ ফটো দেখে সারে পুলিশ খুব সহজেই আপনাকে এবং আপনার স্ত্রী ক্রিস্টিনকে চিনতে পেরেছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সনাক্ত করেছে, এডওয়ার্ড করিগান ও ক্রিস্টিন ডেভারিল বলো—ক্রিস্টিন ডেভারিল, অর্থাৎ সেই মহিলাটি, যিনি অ্যালিসের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিলেন।'

প্যাট্রিক রেডফার্ন উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সুন্দর মুখ অনেক বদলে গেছে। সে মুখে ফেটে পড়ছে রক্ত, সে মুখ ক্রোধে অন্ধ। সব মিলিয়ে সে মুখ কোন খুনীর—কোন বাঘের। সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, শালা হতচ্ছাড়া নাকগলানো টেকো গুঁফো গোয়েন্দা!'

সে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তার হাতের আঙুল হাওয়া আঁকড়ে ধরছে, তার ক্ষিপ্ত স্বরে অশ্রাব্য শব্দের ফুলঝুরি, এবং তার দু'হাতের দশ আঙুল এরকুল পোয়ারোর গলায় চেপে বসলো...

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

চিন্তার সুরে বললেন, পোয়ারো, 'কোন এক সকালে সৈকতে আমরা বসেছিলাম, আলোচনা করছিলাম কসাইয়ের দোকানে সাজানো মাংসের মতো পড়ে থাকা সূর্যস্নাত শরীরগুলো নিয়ে, এবং তখনই আমার মনে হয়েছে, দুটো ভিন্ন শরীরের মধ্যে কি সামান্যই না পার্থক্য। যদি কেউ গভীর এবং নিরীক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন, তাহলে, হ্যাঁ পার্থক্য আছে—কিন্তু অসর্তক অমনোযোগী দৃষ্টির কাছে? একজন মোটামুটি স্বাস্থ্যের তরুণীর সঙ্গে দ্বিতীয় কোন তরুণীর মিল প্রচুর। দুটো তামাটে পা, দুটো তামাটে বাহু, এবং দুয়ের মাঝে এক টকুরো সাঁতার-পোশাক। সূর্য—কিরণে শুয়ে থাকা শুধুই একটা দেহ। যখন কোন মহিলা চলাফেরা করেন, কথা বলেন, হাসেন, মাথা ঘুরিয়ে তাকান, হাতের ভঙ্গী করেন—তখন হ্যাঁ, তখন একটা ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ে—চোখে পড়ে স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু সূর্যসাধনের সময় না।

'সেই দিনই আমরা অশুভ শক্তির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম—মিঃ লেনের কথা অনুযায়ী শক্তির প্রভাব রয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। মিঃ লেন অত্যন্ত সচেতন মানুষ—অশুভের প্রভাব তিনি অনুভব করেন—বুঝতে পারেন তাঁর উপস্থিতি—কিন্তু তাঁর মতো সূক্ষ্ম যন্ত্রও সঠিক জানতো না অশুভের অবস্থান ছিলো ঠিক কোন জায়গায়। তাঁর মতে, অশুভ শক্তি লুকিয়ে ছিলো আর্লেনা মার্শালের ব্যক্তিতে, এবং কার্যত প্রত্যেকেই তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন।'

'কিন্তু আমার মতে, অশুভ শক্তি উপস্থিতি থাকলেও সে আর্লেনা মার্শালের মধ্যে আদৌ কেন্দ্রীভূত ছিলো না। তাঁর সঙ্গে অশুভের যোগ ছিলো, মানছি—কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। আমি তাঁকে প্রথমে, শেষে এবং সর্বসময়েই দেখেছি অশুভের চিরন্তন নিশ্চিত শিকার হিসেবে। যেহেতু উনি সুন্দরী ছিলেন, যেহেতু তাঁর চেহারায় চটক ছিলো, তাঁর মতো মহিলারাই ঘর ও জীবন নষ্ট করেন। কিন্তু আমি তাঁকে দেখেছি একেবারে অন্যভাবে। সর্বনাশা আকর্ষণে পুরুষদের উনি কখনও টানতেন না বরং পুরুষেরাই তাঁকে টানতো। উনি ছিলেন সেই ধরনের মহিলা, যাঁদের প্রতি পুরুষেরা যেমন সহজে আগ্রহ দেখায়, তেমন সহজেই আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এবং তাঁর সম্পর্কে যা কিছু আমি দেখেছি, শুনেছি, সব আমার ধারণাকে আরও জোরদার করেছে। তাঁর সম্পর্কে প্রথম যে কথাটি শোনা যায় তা হলো কিভাবে সেই লোকটি, যার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় উনি জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে, আর ঠিক তখন আমাদের ক্যাপ্টেন মার্শাল, যাঁর বিপাদাপন্ন-রমণী-সেবার ব্রত চিকিৎসার অযোগ্য, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব জানালেন। ক্যাপ্টেন মার্শালের মতো লাজুক নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে যে কোনরকম প্রকাশ্য বিচার ছিলো এরকম যন্ত্রণা—সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই প্রথম স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং করুণা, যাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো খুনের অপরাধে, যে খুন তিনি কখনও করেননি। ক্যাপ্টেন মার্শাল তাঁকে বিয়ে করেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন, স্ত্রী চরিত্র নির্ণয়ে তিনি কোন ভুল করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর আর একজন সুন্দরী মহিলা, হয়তো একই ধরনের (কারণ লিন্ডার মাথার চুল লাল, যা সে ওর মায়ের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকবে), অভিযুক্ত হলেন প্রকাশ্য কলঙ্কে। আবারও মার্শাল তাঁর ত্রাণকার্য সম্পন্ন করলেন। কিন্তু এইবার আকর্ষণ জীইয়ে রাখার মতো কিছুই তিনি স্ত্রীর কাছে পেলেন না। আর্লেনা নির্বোধ, তাঁর করুণা প্রতিরক্ষার অযোগ্য এবং হৃদয়হীনা। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, স্ত্রীর মোটামুটি সত্যিকারের অযোগ্য এবং হৃদয়হীনা। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, স্ত্রীর মোটামুটি সত্যিকারের ছবিটা তাঁর আজানা ছিলো না। স্ত্রীর সঙ্গে ভালোবাসা শেষ হয়ে তাঁর উপস্থিতিতে বিরক্ত হতে লাগলেন মার্শাল, কিন্তু তার অনেক পরেও আর্লেনার প্রতি একটা দুঃখবোধ তাঁর মনে বরাবরের জন্য থেকে গিয়েছিলো। তাঁর কাছে আর্লেনা ছিলেন একটা শিশুর মতো, যিনি জীবন-কেতাবের একটা বিশেষ পৃষ্ঠা কোনরকমেই অতিক্রম করতে পারছেন না।

'পুরুষে আসক্ত আর্লেনা মার্শালকে আমি দেখেছিলাম বিশেষ একধরনের বিবেকহীন পুরুষের অনিবার্য শিকার হিসেবে। আর সেই বিশেষ ধরনের পুরুষকে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম প্যাট্রিক রেডফার্নের মধ্যে, তাঁর সুন্দর চেহারা, সহজ আত্মবিশ্বাস ও মহিলাদের আকর্ষণ করার অকাট্য ক্ষমতার মধ্যে। এ ধরনের ফাটকাবাজ পুরুষেরা, এভাবে ওভাবে যেভাবেই হোক, মহিলাদের মূলধন করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। সৈকতে বসে যেটুকু আমার নজরে পড়েছে, তাতে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে আর্লেনাই ছিলো প্যাট্রিকের শিকার, তার উলটোটা নয়। এবং অশুভের কেন্দ্রবিন্দুতে আমি প্যাট্রিক রেডফার্নকেই দেখেছি, আর্লেনা মার্শালকে নয়।

'আর্লেনার জনৈক বয়স্ক প্রেমাস্পদ, যিনি আর্লেনার প্রতি ক্লান্ত হয়ে পড়ার সময় পাননি, সম্প্রতি অঙ্কের অর্থ তাঁর জন্য রেখে গেছেন। এ ধরনের মহিলারা সাধারণত অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কোন না কোন পুরুষের হাতে অনিবার্যভাবে প্রতারিত হয়ে থাকেন। মিস ব্রুস্টার একজন যুবকের কথা আমাদের বলেছেন, যে আর্লেনার জন্য 'নষ্ট' হয়ে গিয়েছিলো, সে আলেনাকে হীরে জহরতে সাজানের ইচ্ছে প্রকাশ করে থাকলেও (যে ইচ্ছে প্রকাশে কোন খরচ নেই) প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া একটা চেকের প্রাপ্তিসংবাদ জানিয়েছে, যার সাহায্যে সে আদালত এড়াতে পারবে বলে আশা করে। কোন অপব্যয়ী তরুণীর হাতে আর্লেনার শোষিত হওয়ার এক স্পষ্ট উদাহরণ। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে ''ব্যবসায়িক লগ্নীর'' নাম করে মাঝে মধ্যে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে নেওয়াটা যে রেডফার্নের কাছে সম্ভবত বিরাট সুযোগের লম্বা চওড়া গল্প ফেঁদে আর্লেনাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিলেন—বলেছিলেন কিভাবে তিনি ওঁর এবং নিজের জন্য বিশাল সম্পত্তি গড়ে তুলবেন। অরক্ষিত, নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোকেরাই এ ধরনের লোকের সহজ শিকার হয়—এবং সাধারণত সে নিশ্চিন্তে লুঠের মাল নিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু যদি একজন স্বামী, ভাই অথবা বাবা দৃশ্যপটে উপস্থিত থাকেন, তাহলে প্রতারকের পক্ষে ব্যাপার একটু খারাপের দিকে মোড় নিলেও নিতে পারে। ক্যাপ্টেন মার্শাল যদি একবার জানতে পারতেন তাঁর স্ত্রীর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কি কাণ্ডটা হচ্ছে, তাহলে প্যাট্রিক রেডফার্নের ভাগ্যে অর্ধচন্দ্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিলো অত্যন্ত প্রবল।

অবশ্য, সেজন্য রেডফার্ন বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হননি, কারণ অত্যন্ত ঠান্ডা মেজাজে তিনি স্থির করেছিলেন। প্রয়োজন বুঝলেই আর্লেনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবেন—অতীতের একটা খুনের সাফল্য তাঁকে আরও বেশি সাহসী করে তুলেছিলো—যে মেয়েটিকে তিনি খুন করেছিলেন তাকে তিনি করিগান নাম নিয়ে বিয়ে করেন এবং বিশাল অঙ্কের এক জীবনবীমা করাতে মেয়েটিকে রাজি করান।

'তাঁর পরিকল্পনা তাঁকে সর্বরকমে সাহায্য করেছে একটি স্ত্রীলোক, যিনি এখানে রেডফার্নের স্ত্রীর পরিচয়ে বাস করছেন এবং যাঁর সঙ্গে রেডফার্নের সত্যিকারের সম্পর্ক রয়েছে। যেসব মহিলারা রেডফার্নের শিকার, তাদের সঙ্গে এই অল্পবয়সী মহিলার স্বাভাবিকভাবেই কোন মিল নেই—শীতল, শান্ত, আবেগহীন, কিন্তু রেডফার্নের প্রতি আনুগত্যে অবিচল, আর তাঁর অবিশ্বাস্য অভিনয়দক্ষতাকে কোনরকমেই অবহেলা করা যায় না। এই দ্বীপে উপস্থিত হওয়া থেকে ক্রিস্টিন রেডফার্ন একটা বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছেন, 'হতভাগিনী বেচারা' স্ত্রীর ভূমিকায়—দুর্বল, অসহায় এবং স্বাস্থ্যবতী না হলেও বুদ্ধিমতী। উনি কিভাবে একের পর এক নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন একবার ভেবে দেখুন। সূর্যস্নানে তাঁর শরীরে ফোস্কা পড়ে, যে কারণে তাঁর গায়ের রঙ সাদা ফ্যাকাশে, উঁচু জায়গায় উঠলে তাঁর মাথা ঘোরে—যেমন মিলান, গীর্জায় উঠে মাঝপথে আটকে পড়ার গল্পটা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে নিজের দুর্বল অসহায় ভাবটাকে ফুটিয়ে তোলা—প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ছোটখাটো মহিলা'। অথচ উনি আর্লেনা মার্শালের সমান লম্বা, যদিও তাঁর হাত-পায়ের গড়ন অপেক্ষাকৃত খাটো। ক্রিস্টিন বলেছেন, তিনি স্কুলের দিদিমণি ছিলেন, এবং এর দ্বারা উনি জোর দিয়েছিলেন নিজের বই-পড়ে শেখাবিদ্যে ও শারীরিক অপটুতার ওপর। আসলে একথা সত্যি যে ক্রিস্টিন স্কুলে চাকরি করতেন, কিন্তু সেখানে তাঁর

চাকরি ছিলো খেলার দিদিমণি হিসেবে, এবং উনি অত্যন্ত চটপটে তৎপর মহিলা যিনি বেড়ালের মতো বেয়ে উঠতে পারেন, দৌড়তে পারেন কোন দৌড়বাজের মতো।

'এই খুনের পরিকল্পনা ও সময়ের ছক ছিলো নিখুঁত। এ খুন ছিলো, আমি আগেও যেমন বলেছি অত্যন্ত পরিপাটি। এর সময়ের ছক সত্যিই কোন প্রতিভাধরে চিন্তার ফসল।

'প্রথমত, মুখবন্ধ হিসেবে কতকগুলো দৃশ্যের অবতারণা করা হয়...একটি দৃশ্য অভিনীত হয় পাথুরে কুঠুরীতে, যখন তাঁরা জানতেন পাশের কুঠুরীতে আমি বসে আছি—ঈর্ষান্বিত স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে নিছক গতানুগতিক কথোপকথন পরে ক্রিস্টিন আমার সঙ্গেও ওই একই অভিনয় করেন। সেই সময়ে আমার কেমন ঝাপসাভাবে মনে হয়েছিলো এ সব আমি কোন বইয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা বাস্তব বলে আমার মনে হয়নি। কারণ অবশ্যই, সেটা মোটেও বাস্তব ছিলো না—ছিলো অভিনয়। তারপর এলো খুনের দিন। দিনটা ছিলো চমৎকার যা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিলো। রেডফার্নের প্রথম কাজ হলো খুব ভোরে সকলের নজর এড়িয়ে বেরিয়ে পড়া—বারান্দার দরজা দিয়ে যে দরজা তিনি ভেতর থেকে চাবি দিয়ে খুলেছিলেন (যদি কেউ খোলা দরজাটা ঘটনাচক্রে আবিষ্কার করে ফেলেন, তাহলে তিনি ভাবেন কেউ ভোরে স্নান করতে বেরিয়েছেন)। তাঁর স্নান-পোশাকের আড়ালে তিনি লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা সবুজ চীনে টুপি, ঠিক যেরকম টুপি আর্লেনা প্রায়ই পরতেন। দ্বীপ পেরিয়ে, মই বেয়ে নেমে নির্ধারিত জায়গা মতো কয়েকটা পাথরের আড়ালে রেডফার্ন টুপিটা লুকিয়ে রেখে আসেন। প্রথম পর্ব।

'আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি আর্লেনার সঙ্গে দেখা করে গোপন সাক্ষাৎকারের এক ব্যবস্থা করেন। আর্লেনা স্বামীকে একটু ভয় করতেন, তাই তাঁরা দেখাসাক্ষাতের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান হতেন। পরদিন সকালে তিনি পিক্সি কোভে দেখা করতে রাজি হলেন। সকালে সেখানে কেউ যায় না। রেডফার্ন সুযোগ বুঝে সকলের চোখ এড়িয়ে তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করবেন। যদি তিনি কারো মই বেয়ে নামার শব্দ শোনেন, বা কোন নৌকোকে পাড়ে আসতে দেখেন তাহলে যেন পিক্সির গুহায় লুকিয়ে পড়েন এবং পথ পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তাঁকে পিক্সির গুহার কথা রেডফার্নই বলেছিলেন। সমাপ্ত হলো দ্বিতীয় পর্ব।

'ইতিমধ্যে ক্রিস্টিন লিন্ডার ঘরে গেছেন, এমন—সময়ে, যখন উনি জানতেন লিন্ডা রোজকার মতো ভোরে স্নান করতে বেরিয়ে থাকবে। তখন উনি লিন্ডার ঘড়ির সময়ে বদলে দেবেন, ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দেবেন কুড়ি মিনিট, অবশ্য এ ভয় ছিলো যে ঘড়ি ভুল সময়টা হয়তো লিন্ডার নজরে পড়ে যাবে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হতো না। ক্রিস্টিনের আসল অ্যালিবাই ছিলো তাঁর ছোট ছোট হাতের গড়ন, যার ফলে, দৈহিক শক্তির দিক থেকে খুনটা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। তা সত্ত্বেও অতিরিক্ত একটা অ্যালিবাই থাকা ভালো। লিন্ডার ঘরে গিয়ে তাঁর নজরে পড়ে যাদুবিদ্যা ও ডাকিনীবিদ্যার বইটা একটা বিশেষ পৃষ্ঠায় খোলা রয়েছে। উনি সেই পাতাটা পড়েন, এবং যখন লিন্ডা ঘরে আসে ও হাত থেকে মোমবাতির প্যাকেটটা মেঝেতে ফেলে দেয় তখন বুঝতে পারেন লিন্ডার মনে কি রয়েছে। এর ফলে ক্রিস্টিনের মনে কয়েকটা নতুন মতলবের উদয় হয়। আমাদের অপরাধী যুগলের প্রথম মতলব ছিলো কেনেথ মার্শালের ওপর যথেষ্ট সন্দেহ আরোপ করা। সেই কারণেই দৃশ্যপটে আবির্ভাব ইঙ্গিতবহ পাইপের—যার কিছু ভাঙা টুকরো পাওয়া গেছে পিক্সি কোভে মইয়ের নিচে।

লিন্ডা ফিরে এলে ক্রিস্টিন খুব সহজেই ওকে গাল কোভে যাবার পরিকল্পনায় রাজি করিয়ে ফেলেন। তারপর তিনি নিজের ঘরে ফিরে আসেন, তালাবন্ধ স্যুটকেস থেকে বের করেন এক শিশি নকল সূর্যস্নানের প্রলেপ, সেটা বিশেষ যত্নে শরীরে মেখে শিশিটা ছুড়ে ফেলে দেন জানলা দিয়ে, যেটা স্নানরত এমিলি ব্রুস্টারকে অল্পের জন্য আঘাত করেনি। অতএব তৃতীয় পর্ব সুষ্ঠুভাবে শেষ হলো।

'ক্রিস্টিন তারপর পরে নিলেন সাঁতারু-পোশাক, তার ওপরে ঢোলা হাতা জামা ও পাজামা, সুতরাং তাঁর নতুন রঙ করা বাদামী হাত-পা ঢাকা পড়লো পোশাকের নিচে।

'সওয়া দশটায় আর্লেনা বেরিয়ে পড়লেন তাঁর গোপন সাক্ষাৎকার সারতে, তাঁর মিনিট কয়েক পরেই প্যাট্রিক রেডফার্ন এসে উপস্থিত হলেন সমুদ্রসৈকতে, আমাদের দেখালেন বিস্ময়, বিরক্তি ইত্যাদি। ক্রিস্টিনের কাজ ছিলো খুবই সহজ। নিজের হাতঘড়ি লুকিয়ে রেখে এগারোটা পঁচিশে লিন্ডাকে জিগ্যেস করলেন ক'টা বাজে। লিন্ডা ঘড়ি দেখে জবাব দিলো, পৌনে বারোটা। তারপর ও সমুদ্রে নামে স্নান করতে, আর ক্রিস্টিন ছবি আঁকার সরঞ্জাম গোছগাছ করতে শুরু করেন। লিন্ডা তাঁর দিকে পেছন ফিরতেই ক্রিস্টিন লিন্ডার হাত ঘড়িটা তুলে নেন, কারণ স্বাভাবিকভাবেই স্নান করতে নামার আগে লিন্ডা ঘড়িটা খুলে রেখে গেছে, এবং কাঁটা ঘুরিয়ে ঘড়ির সময় আবার ঠিক করে দেন। তারপর পাহাড়ি পথ ধরে তিনি রওনা হয়ে পড়েন, সরুর জমিটুকু এক ছুটে পার হয়ে পৌঁছে যান মইটার কাছে, ঢোলা জামা-পাজামা ছেড়ে, সেগুলো এবং ছবি আঁকার সরঞ্জাম একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে অভ্যাসলব্ধ দক্ষতায় তরতর করে মই বেয়ে নেমে যান ক্রিস্টিন।

'আর্লেনা তখন সৈকতে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন প্যাট্রিকের এত দেরি হচ্ছে কেন? হঠাৎ মইয়ের কাছে কাউকে উনি দেখতে পান বা তার শব্দ শুনতে পান। খুব সন্তর্পণে লক্ষ্য করেন তিনি। এবং অসীম বিরক্তির সঙ্গে আবিষ্কার করেন সেই অবাঞ্ছিত মেয়েটিকে—স্ত্রীরত্নটিকে! সুতরাং তাড়াতাড়ি সৈকত পার হয়ে তিনি ঢুকে পড়েন পিক্সির গুহায়।

'লুকোনো জায়গা থেকে টুপিটা বের করে নেন ক্রিস্টিন; টুপিটার পেছনে কানায় লাল রঙের পরচুলায় গুচ্ছ আলপিন দিয়ে আঁটা ছিলো। তারপর টুপি ও পরচুলায় ঘাড় ও মুখ ঢেকে হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন তিনি। সময়ের হিসেবে একেবারে নিখুঁত। কারণ মিনিট দুয়েক পরেই প্যাট্রিক ও এমিলি ব্রুস্টার নৌকো নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিতি হন। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি নিচু হয়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করেছেন তিনি প্যাট্রিক, প্যাট্রিকই অবাক হয়েছেন—আঘাত পেয়েছেন ভেঙে পড়েছেন তাঁর প্রেমিকার মৃত্যুতে। তিনি সাক্ষী বেছে নিয়েছিলেন অনেক ভাবনাচিন্তা করে। মিস ব্লুস্টারের মাথাঘোরা রোগ আছে, তিনি কখনোও মইটা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন না। তিনি গেলে নৌকো নিয়েই যাবেন, এবং প্যাট্রিক থাকবেন মৃতদেহের কাছে—''কারণ খুনী হয়তো আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে।'' নৌকো নিয়ে মিস ব্রুস্টার চলে গেলেন পুলিশ খবর দিতে। তিনি চলে যেতেই চটপট উঠে পড়লেন ক্রিস্টিন, প্যাট্রিকের লুকিয়ে আনা কাঁচিটা দিয়ে টুপিটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন, টুকরোগুলো লুকিয়ে ফেললেন সাঁতার পোশাকের ভেতর এবং প্রথমবারের অর্ধেক সময়ে মই বেয়ে উঠে ঢোলা জামা-পাজামা পরে নিয়ে ছুটে চললেন হোটেলের দিকে। তখন কোনরকমে স্নান সেরে নকল সূর্যস্নানের প্রলেপ ধুয়ে, টেনিস খেলার পোশাক পরে বেরোবার মতো সময়টুকু হাতে রয়েছে। আরও একটা কাজ উনি করেছেন। পিচবোর্ডের টুপির সবুজ টুকরোগুলো এবং লাল পরচুলার গুচ্ছ উনি পুড়িয়ে ফেলেন লিন্ডার ঘরে তাপচুল্লীতে—সঙ্গে যোগ করেন একটা ক্যালেন্ডারের পাতা, যাতে পোড়া পিচবোর্ডের সঙ্গে ক্যালেন্ডারে একটা যোগসূত্র গড়ে ওঠে। অর্থাৎ যা পোড়ানো হয়েছে সেটা একটা ক্যালেন্ডার, টুপি নয়। তাঁর সন্দেহ অনুয়াযী লিন্ডা যাদুবিদ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলো—মোমের পিণ্ড ও আলপিন তারই সাক্ষী।

'তাঁরপর তিনি উপস্থিত হলেন টেনিস কোটে, সবার শেষে, কিন্তু তাড়াহুড়ো অথবা অগোছালো ভাব—দুটোই তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত।

'আর, ইতিমধ্যে, প্যাট্রিক ঢুকে পড়েছেন পিক্সির গুহায়। আর্লেনা কিছুই দেখেননি এবং শুনতেও পেয়েছেন খুব সামান্যই—একটা নৌকো—কিছু কথাবার্তা—উনি বুদ্ধি করে লুকিয়েই ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে ডাকছেন প্যাট্রিক।

'আর ভয় নেই, সোনা' এবং আর্লেনা বেরিয়ে এলেন বাইরে। তারপর প্যাট্রিকের হাত চেপে বসলো তাঁর গলায়—আর সেই হলো বেচারো নির্বোধ সুন্দরী আর্লেনা মার্শালের জীবনকাহিনির পরিসমাপ্তি...'

পোয়ারো কণ্ঠস্বর নিচু করে মিলিয়ে গেলো।

এক মুহূর্তের নীরবতা তারপর রোজমণ্ড ডার্নলি সামান্য শিউরে উঠে বললো, 'আপনি সব কিছু ছবির মতো দেখিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এ তো অন্য তরফের কাহিনী। আপনি এখনও আমাদের বলেননি কি করে আপনি আসল সত্যিটা জানতে পারলেন?'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'আপনাদের আগেও একবার বলেছি, আমার মন অতি সরল। সব সময়, সেই প্রথম থেকেই, আমার মনে হয়েছে যে সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যক্তিই আর্লেনা মার্শালকে খুন করেছেনে। এবং সেই সম্ভাব্য ব্যক্তি নিঃসন্দেহে প্যাট্রিক রেডফার্ন। তাঁর চরিত্র এমন কোন মানুষের, যে আর্লেনার মতো মেয়েদের কাজে লাগায়। তাঁর চরিত্র এমন কোন মানুষের যে আর্লেনার মতো মেয়েদের কাজে লাগায়—তাঁর চরিত্র কোন খুনীর চরিত্র—তিনি সেই ধরনের লোক যাঁরা কোন মহিলার সঞ্চয় শুষে নিয়ে তাঁর গলা কাটতে পারেন। সেদিন সকালে আর্লেনা কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন? তাঁর মুখ, তাঁর হাসি,তাঁর আচরণ, আমার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন আমাকে জানিয়ে দিয়েছে সেই ব্যক্তির নাম—প্যাট্রিক রেডফার্ন। সুতরাং স্বাভাবিক ঘটনাপরম্পরা অনুয়াযী, আর্লেনাকে যিনি খুন করেছেন, তিনি প্যাট্রিক।

'কিন্তু সেই মুহূর্তে, আপনারা জানেন, আমি মুখোমুখি হয়েছি এক অসম্ভব পরিস্থিতির। প্যাট্রিক রেডফার্নের পক্ষে আর্লেনাকে খুন করা সম্ভব ছিলো না, কারণ মৃতদেহ আবিষ্কার করা পর্যন্ত তিনি প্রথম সৈকতে ও পরে মিস ব্রুস্টারের সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং অন্যান্য সম্ভাবনার দিকে আমাকে নজর ফেরাতে হলো—এবং তাদের সংখ্যাও ছিলো একাধিক। আর্লেনাকে তাঁর স্বামী খুন করে থাকতে পারেন—মিস ডার্নলির নীরব সমর্থন পেয়ে। (তাঁরা দুজনেও একটা বিষয়ে মিথ্যে কথা বলেছেন, যা অত্যন্ত সন্দেহজনক।) আকস্মিকভাবে মাদকদ্রব্য চোরাচালানের খবর জানতে পারার ফলেও আর্লেনা মার্শালের মৃত্যু ঘটে থাকতে পারে। কোন ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিও তাঁকে খুন করে থাকতে পারেন, এবং তাঁর সৎমেয়ের পক্ষেও তাঁকে খুন করা অসম্ভব ছিলো না। এর মধ্যে শেষেরটাই প্রকৃত সমাধান বলে আমার একবার মনে হয়েছিলো পুলিশের সঙ্গে লিন্ডার প্রথম সাক্ষাৎকার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। পরে ওর সঙ্গে এক আলোচনায় একটা বিষয়ে আমার বিশ্বাস স্থির হয়। লিন্ডা নিজেকে অপরাধী মনে করে।'

'আপনি বলতে চান ও ভেবেছিলো ও সত্যি সত্যিই আর্লেনাকে খুন করেছে?'

রোজমণ্ডের স্বরে অবিশ্বাসের সুর।

এরকুল পোয়ারো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

হ্যাঁ।—মনে রাখবেন—ও নেহাতই শিশু। ডাকিনীবিদ্যার বইটা পড়ে ও সেটা প্রায় বিশ্বাস করে বসে। ও আর্লেনাকে ঘৃণা করতো। সুতরাং উদ্দেশ্য নিয়ে ও্ তৈরি করলো মোমের পুতুল, পড়লো, মন্ত্র পুতুলের হৃদপিণ্ড বিদ্ধ করলো আলপিন দিয়ে, পুতুলটা গলিয়ে ফেললো—এবং ঠিক সেইদিন মারা গেলেন আর্লেনা। লিন্ডার চেয়ে বয়স্ক ও প্রাজ্ঞ মানুষেরাও অন্ধভাবে যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই লিন্ডাও বিশ্বাস করে এ সব সত্যি—যে যাদুবিদ্যার ক্ষমতা ওর সৎমাকে ও খুন করেছে।'

রোজমণ্ড ডুকরে উঠলো।

'ওঃ, বেচারা লিন্ডা। আর আমি ভেবেছি—আমি ভেবেছি—সম্পূর্ণ অন্য কথা—যে ও এমন কিছু জানতো যাতে—'

রোজামণ্ড থামলো। পোয়ারো বললেন, 'আপনি কি ভেবেছিলেন আমি জানি। প্রকৃতপক্ষে আপনার ব্যবহার লিন্ডাকে আরও বেশি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো। ও বিশ্বাস করেছিলো, আর্লেনার মৃত্যুর জন্য সত্যিই ও নিজে দায়ী এবং সেকথা আপনি জানেন। ক্রিস্টিনও ওর কানে মন্ত্র জোগান, ওর মনে গেঁথে দেন ঘুমের বড়ির কথা, দেখিয়ে দেন ও অপরাধের দ্রুত যন্ত্রণাহীন প্রায়শ্চিত্তের পথ। বুঝতেই পারছেন, একবার যদি প্রমাণিত হয় ক্যাপ্টেন মার্শালের অ্যালিবাই রয়েছে, তাহলে নতুন কোন সন্দেহভাজন খুঁজে বের করাটা হয়ে পড়বে

একান্ত জরুরী। ক্রিস্টিন অথবা তাঁর স্বামী মাদকদ্রব্য চোরাচালানের ব্যাপারটা জানতেন না। সুতরাং বলির পাঁঠা হিসেবে লিন্ডাকেই তাঁরা বেছে নিলেন।'

রোজমণ্ড বললো, কি শয়তান।'

পোয়ারো সম্মতি জানালেন নীরবে।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন ঠান্ডা রক্তের এক নৃশংস মহিলা। আর আমি—আমি পড়লাম মহা মুশকিলে। লিন্ডা কি শুধুমাত্র যাদুবিদ্যা প্রয়োগের শিশুসুলভ অপরাধে অপরাধী, নাকি ওর ঘৃণা ওকে আরও গভীরে নিয়ে গেছে—লিপ্ত করেছে প্রকৃত অপরাধে? আমি চেষ্টা করেছি ওর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে। কিন্তু সবই বিফলে গেছে। সেই মুহূর্তে আমি দুলতে লাগলাম দুরন্ত অনিশ্চয়তায়। পুলিশ-প্রধান রাজি ছিলেন মাদকদ্রব্যের ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করতে। আমিও সেখানেই ক্ষান্ত দিলেন পারতাম। সমস্ত তথ্য আমি আবার সন্তপর্ণে খতিয়ে দেখতে লাগলাম। আমার হাতে তখন বুঝতেই পারছেন, টুকরো-ছবির ধাঁধার অনেকগুলো টুকরো, বিচ্ছিন্ন কতকগুলো ঘটনা, নিছক তথ্য। সেগুলোর নিশ্চয়ই একটা সুষম সম্পূর্ণ নকশায় খাপ খেয়ে যাবে। প্রথমে রয়েছে বেলাভূমিতে পাওয়া একটা কাঁচি—জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলা একটা শিশি—একটা স্নানের খবর যা কেউই করেছেন বলে স্বীকার করেননি—অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নির্দোষ কতকগুলো ঘটনা, কিন্তু সেগুলোর প্রতি প্রত্যেকের অস্বীকার ঘটনাগুলোকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। সুতরাং সেগুলোর তাৎপর্য নিশ্চয়ই একটা রয়েছে ক্যাপ্টেন মার্শাল, লিন্ডা অথবা চোরাচালানকারীদের দায়ী করলে ওই ঘটনাগুলোর কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু তবুও সেগুলোর নিশ্চিত কোন অর্থ রয়েছে। সুতরাং আমি ফিরে গেলাম আমার প্রথম সমাধানে—যে প্যাট্রিক রেডফার্নই খুনটা করেছেন। এর সমর্থনে কি কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, আর্লেনার তহবিল থেকে যে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা উধাও হয়েছে সে কথা আমরা জানি। কে নিলো সেই টাকা? অবশ্যই প্যাট্রিক রেডফার্ন। আর্লেনা ছিলেন সেই রকম মেয়ে যাঁদের সুন্দর চেহারার যুবকেরা সহজেই ঠকিয়ে নিতে পারে—কিন্তু ব্ল্যাকমেল হবার মতো মেয়ে কখনই উনি ছিলেন না। প্রয়োজনের চেয়েও বেশি খোলা ছিলো তাঁর মন, গোপন কথা উনি গোপন রাখতে পারতেন না। তাই ওই ব্ল্যাকমেলারের গল্প একবারও আমার মনে সত্যি বলে নাড়া দেয়নি। কিন্তু তবুও হঠাৎ শুনে ফেলা সেই কথাবার্তার সাক্ষ্যটুকু আমাদের সামনে থেকে যাচ্ছে—হুঁ, কিন্তু সেই কথাবার্তা শুনেছেন কে? না প্যাট্রিক রেডফার্নের স্ত্রী। এটা সম্পূর্ণ তাঁর গল্প—দ্বিতীয় কারো সাক্ষ্যর সমর্থন সেখানে নেই। তাহলে এ গল্প বানানো হলো কেন। বিদ্যুৎচমকের মতো এর উত্তর ঝলসে উঠলো আমার মনে। আর্লেনার উধাও হয়ে যাওয়া টাকার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা যোগাতে।

'প্যাট্রিক ও ক্রিস্টিন রেডফার্ন। ওঁরা দুজনেই এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। আর্লেনাকে গলা টিপে খুন করার মতো দৈহিক শক্তি অথবা মানসিক প্রস্তুতি, কোনটাই ক্রিস্টিনের ছিলো না। না, হত্যাপর্বের নায়ক প্যাট্রিক নিজে—কিন্তু সে তো অসম্ভব! কারণ আর্লেনার দেহ আবিষ্কার করার আগে পর্যন্ত প্রতিটি মিনিটের অ্যালিবাই তাঁর রয়েছে।

'দেহ—এই দেহ শব্দটা আমার মনে নাড়া দিলো—সৈকতে শুয়ে থাকা দেহ—সব একরকম। প্যাট্রিক রেডফার্ন ও এমিলি ব্রুস্টার পিক্সি কোভে গেছেন এবং একটা দেহ বেলাভূমিতে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। একটা দেহ—যদি ধরে নেওয়া যায় সে দেহ আর্লেনার নয়, অন্য কারো? কারণ তাঁর মুখ ঢাকা ছিলো বিশাল চীনে টুপিতে।

'কিন্তু একটা মাত্র মৃতদেহই আমরা পেয়েছি—আর্লেনার। তাহলে সেই দেহ কি কোন জীবন্ত দেহ—এমন কেউ, যিনি মৃতের ভান করে শুয়ে রয়েছেন। আর্লেনা নিজে নন তো? প্যাট্রিকের প্ররোচনায় উনি হয়তো এরকম লোকঠকানো মজা করতে রাজি হয়েছেন। আমি মাথা নাড়লাম—উঁহু, তাতে ঝুঁকি অনেক। একটা জীবন্ত দেহ—কার? এমন কোন মেয়ে কি এখানে আছেন, যিনি রেডফার্নকে সাহায্য করতে পারেন?

অবশ্যই আছেন—তাঁর স্ত্রী। কিন্তু তাঁর গায়ের রঙ ফ্যাকাশে সাদা। মানলাম, কিন্তু সূর্যস্নানের নকল প্রলেপ সহজেই শিশি থেকে লাগানো যেতে পারে—শিশি—একটা শিশি—খুঁজে পেলাম আমার টুকরো-ছবির ধাঁধার একটা টুকরো। হ্যাঁ, তারপর, অবশ্যই প্রয়োজন একটা স্নানের—টেনিস খেলতে যাবার আগে সর্বনাশা প্রলেপের দাগ ধুয়ে ফেলতে হবে তো। আর কাঁচিটা? কেন, কাঁচিটা নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো পিচবোর্ডের টুপিটাকে টুকরো টুকরো করে কাটবার জন্যে—ওরকম অসুবিধে জনক বিশাল বস্তুটাকে লোকচক্ষুর আড়ালে না সরালেই নয়, এর তাড়াহুড়োর কাঁচিটা থেকে যায় অকুস্থলে—এই একটামাত্র জিনিস যেটা আমাদের খুনী দম্পত্তি ভুল করে রেখে আসেন।

'কিন্তু এতক্ষণ আর্লেনা ছিলেন কোথায়? সে উত্তরও অত্যন্ত স্পষ্ট। হয় রোজমণ্ড ডার্নলি নয় আর্লেনা মার্শাল পিক্সির গুহায় গিয়েছিলেন, তাঁরা যে সুগন্ধী ব্যবহার করতেন তার গন্ধই আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রোজামণ্ড ডার্নলি ওখানে যাননি। সুতরাং আর্লেনাই গিয়েছিলেন পিক্সির গুহায়, লুকিয়ে ছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পথ পরিষ্কার হয়।

'যখন এমিলি ব্রুস্টার নৌকো নিয়ে চলে গেলেন, প্যাট্রিক তখন সৈকতে একা এবং খুন করার পুরোপুরি সুযোগ তাঁর ছিলো। আর্লেনা মার্শাল খুন হন পৌনে বারোটার কিছু পরে, কিন্তু ডাক্তারি সাক্ষ্য শুধু মাথা ঘামায় সবচেয়ে কত বেশি আগে খুনটা হয়ে থাকতে পারে, সেই সময়টা নিয়ে। পৌনে বারোটার সময় আর্লেনা যে মৃত ছিলেন সে কথা ডাক্তারকেই বলা হয়েছে, ডাক্তার মোটেও পুলিসকে বলেননি।

আরও দুটো রহস্যের সমাধান তখনও বাকি। লিন্ডা মার্শালের সাক্ষ্য ক্রিস্টিন রেডফার্নকে একটা অ্যালিবা জুগিয়েছে। মানছি, কিন্তু সে সাক্ষ্য দাঁড়িয়ে আছে লিন্ডা মার্শালের হাতঘড়ির ওপরে। এখন শুধু যেটুকু দরকার, তা হলো, প্রমাণ করা যে ওই হাতঘড়ির সময় বদলের অন্তত দুটো সুযোগ ক্রিস্টিনি পেয়েছিলেন। খুব সহজেই সে প্রমাণ পেলেন। সেদিন সকালে তিনি লিন্ডার ঘরে একা ছিলেন—এছাড়াও একটা পরোক্ষ প্রমাণ আছে। লিন্ডাকে বগলতে শোনা গেল যে ''ওর ভয় হচ্ছিলো ওর হয়তো দেরি হয়ে গেছে,'' কিন্তু যখন ও নেমে আসে তখন বিশ্রামকক্ষের ঘড়িতে মাত্র দশটা পঁচিশ। দ্বিতীয় সুযোগটা ছিলো অনেক বেশি সহজ—যখন লিন্ডা পেছন ফিরে সমুদ্রে স্নান করতে নামে তখন ঘড়ির সময় আবার পিছিয়ে দেওয়াটা ক্রিস্টিনের পক্ষে কিছু অসম্ভব ছিলো না।

'এরপর আসছে মইয়ের প্রশ্ন। ক্রিস্টিন বরাবরই জোর গলায় বলেছেন যে উঁচু জায়গা তাঁর ধাতে সয় না। আরো একটা সযত্নে সাজানো মিথ্যে।

'আমার নকশা এবার সম্পূর্ণ—প্রতিটি টুকরো নিখুঁতভাবে খাপ খেয়ে গেছে নিজের নিজের জায়গায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আমার হাতের নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। সমস্তটাই রয়েছে আমার মনের ফলকে গাঁথা।

'তখন একটা মতলব আমার মাথায় এলো। এই খুনের মধ্যে নিহিত রয়েছে একটা আত্মবিশ্বাসের ভাব—একটা পরিপাটি ছিমছাম পরিকল্পনা। প্যাট্রিক রেডফার্ন যে ভবিষ্যতেও তাঁর দুষ্কর্মের পুনরাবৃত্তি করবেন সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিলো না। তাহলে তাঁর অতীত কি বলে? এটা সম্ভব হলেও হতে পারে যে এ তাঁর প্রথম খুন নয়। এবং এই খুনের পদ্ধতি, শ্বাসরোধ করে হত্যা, প্যাট্রিকের প্রকৃতির সঙ্গে একই সুরে বাঁধা—শুধু ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, নিছক আনন্দের জন্যও তিনি খুন করেন। যদি এটা তাঁর খুন না হয়, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস অতীতেও তিনি একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আমি ইন্সপেক্টর কলগেটের কাছে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে এমন মেয়েদের একটা তালিকা চাইলাম। এর ফলাফল আমাকে ভীষণ খুশি করলো। নির্জন ঝোপের পাশে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া নীতি পার্সন্সের খুন প্যাট্রিক রেডফার্নের কাজ হতেও পারে, নাও হতে পারে, হয়তো এ ঘটনা শুধুমাত্র স্থান নির্বাচনে তাঁকে সাহায্য করেছে, কিন্তু অ্যালিস করিগানের মৃত্যুতে আমি ঠিক যা খুঁজেছিলাম তাই পেয়ে গেলাম। সার কথায় বলতে গেলে হুবহু একই পদ্ধতি। সেই সময় নিয়ে কারচুপি, একটা খুন বা অনুমতি সময়ের আগে সংঘটিত হয়নি, সাধারণত যা হয়ে

থাকে-বরং ঘটেছে এরই সময়ের পরে। সওয়া চারটের সময় ‘আবিষ্কৃত’ হয় ‘মৃতদেহ’। আর, একজন স্বামী, যার অ্যালিবাই রয়েছে চারটে পঁচিশ পর্যন্ত।

‘তাহলে সত্যি সত্যি কি ঘটেছিলো? বলা হয়েছে যে এডওয়ার্ড করিগান পাইন রিজে গিয়ে উপস্থিত হয়, তার স্ত্রীকে সেখানে পায় না, এবং তখন বাইরে এসে পায়চারি করতে থাকে। অবশ্য কার্যত সে প্রাণপণে ছুটে যায় তাদের দেখা করার জায়গায় সীজার্স গ্রোভে। (আশা করি আপনাদের মনে আছে যে জায়গাটা ছিলো খুন কাছেই) স্ত্রীকে খুন করে এবং কাফেতে ফিরে আসে। পথচারী যে মেয়েটি খুনের খবর দেয়, সে ছিলো একজন সম্ভ্রান্ত যুবতী, সুপরিচিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের খেলার দিদিমণি। আপাতদৃষ্টিতে এডওয়ার্ড করিগানের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিলো না। খুনের খবর জায়গা মতো জানাতে তাকে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে যেতে হয়। পুলিশের ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করেন সেই পৌনে ছ’টা নাগাদ। এবং এখনকার মতো তখনও খুনের সময়টা সকলেই বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন।

‘একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা আমি করলাম। আমাকে সঠিকভাবে জানতেই হবে মিসেস রেডফার্ন মিথ্যাবাদী কিনা। সুতরাং ডার্টমুরে বেড়াতে যাওয়ার নির্দোষ বন্দোবস্ত করলাম। উচ্চতা ধাতে সয় না এমন কেউ কখনও সুস্থভাবে বয়ে যাওয়া জলের ওপরে দিয়ে সরু সাঁকো পার হতে পারে না। মিস ব্রুস্টার, যিনি প্রকৃত রোগী, নিজেকে সুস্থ রাখতে পারেননি। কিন্তু ক্রিস্টিন রেডফার্ন নিশ্চিন্তভাবে নির্বিকারে ছুটে পার হয়ে যান সাঁকোটা। ঘটনাটা ছোট হলেও একটা নিশ্চিন্ত পরীক্ষা। যদি তিনি বিনা প্রয়োজনে একটা মিথ্যে বললে থাকতে পারেন —নাহলে অন্যান্য মিথ্যেগুলোও অসম্ভব নয়। ইতিমধ্যে কলগেট সারে পুলিশ দিয়ে ছবিটা সনাক্ত করিয়াছেন। তখন আমি যেভাবে জেতা সম্ভব সেভাবেই হাতে তাস খেলেছি। প্যাট্রিক রেডফার্নকে নিরাপত্তার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ঠেলে দিয়ে আকস্মিকভাবে তাঁকে আক্রমণ করেছি, যাতে তিনি আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেন তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তাঁকে যে করিগান বলে সনাক্ত করা হয়েছে সেকথা শুনেই তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়।’

চিন্তারতভবে গলায় হাত বোলালেন এরকুল পোয়ারো।

‘আমি যা করেছি,’ গুরুত্ব দিয়ে বললেন তিনি, ‘তা অত্যন্ত বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে করেছি—কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ নেই। আমি জিতেছি। বিনা কারণে আমি কষ্ট করিনি।’

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর মিসেস গার্ডেনার এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

‘সত্যি, মঁসিয়ে পোয়ারো, তিনি বললেন, কি ভীষণ ভালো লাগলো শুনতে—কিভাবে আপনি ধাপে ধাপে সমাধানে পৌঁছলেন, আশ্চর্য। আপনার প্রত্যেকটি কথা মুগ্ধ করার মতো, যেন অপরাধ-বিজ্ঞানের ওপর কোন বক্তৃতা। আসলে সত্যিই তো এটা অপরাধ-বিজ্ঞানের ওপর কোন বক্তৃতা, তাই না? আর ভাবতে কিরকম লাগছে যে আমার বেগুনি উল আর ওই সূর্যস্নান-নিয়ে কথাবার্তা, দুটোরই একটা করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। ওঃ, আনন্দে আমি কি বলবো ঠিক করতে পারছি না, আর আমার বিশ্বাস মিঃ গার্ডেনারের অবস্থাও একই রকম, তাই না, ওডেল?’

‘হ্যাঁ সোনা।’ বললেন, মিঃ গার্ডেনার।

এরকুল পোয়ারো বললেন, মিঃ গার্ডেনারও আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি মিসেস মার্শাল সম্পর্কে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির অভিমত চেয়েছিলাম। আমি মিঃ গার্ডেনারকে প্রশ্ন করেছিলাম মিসেস মার্শালকে তাঁর কিরকম মহিলা বলে মনে হয়।’

‘তাই নাকি?’ বললেন, মিসেস গার্ডেনার, ‘আর তুমি কি বলেছো, ওডেল?’

মিঃ গার্ডেনার কাশলেন।

তিনি বললেন, ‘তুমি তো জানো, সোনা, ওঁকে, আমার কখনই সেরকম কিছু মনে হয়নি।’

‘লোকে তাদের বউদের সব সময় এই কথাই বলে।’ বললেন, মিসেস গার্ডেনার, ‘তাহলে আর যদি আমাকে জিগ্যেস করো তাদের বলবো, এমন কি এই মঁসিয়ে পোয়ারো পর্যন্ত মিসেস মার্শালকে একটু যাকে বলে প্রশ্রয় দিয়েছেন, বিশেষ করে ওঁকে ঘটনাচক্রের স্বাভাবিক শিকার ইত্যাদি বলে উল্লেখ করে। অবশ্য এ কথা সত্যি যেন শিক্ষা-দীক্ষার বালাই ভদ্রমহিলার মোটেও ছিলো না, আর ক্যাপ্টেন মার্শাল যখন এখানে নেই তখন বলতে বাধা নেই যে ওঁকে আমার সব সময়েই কেমন বোকা-সোকা বলে মনে হয়েছে। সে কথা আমি মিঃ গার্ডেনারকেও বলেছি, বলিনি, ওডেল?’

‘হ্যাঁ, সোনা’, বললেন মিঃ গার্ডেনার।

২

গাল কোভে এরকুল পোয়ারোর সঙ্গে বসে ছিলো লিন্ডা মার্শাল।

ও বললো, ‘ভাগ্যিস শেষ পর্যন্ত আমি মরে যাইনি। কিন্তু, মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার অপরাধ তো সত্যি সত্যি ওকে খুন করারই সমান, তাই না? আমি তো সেটাই চেয়েছিলাম।

এরকুল পোয়ারো উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ‘না, দুটো এক জিনিস নয়। খুন করার ইচ্ছে আর খুন করা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যদি তোমার শোবার ঘরে সেই ছোট্ট মোমের পুতুলের বদলে তুমি তোমার সৎমাকে বন্দী অসহায় অবস্থায় পেতে, আর তোমার হাতে আলপিনের বদলে একটি ছুরি থাকতো, তাহলে তুমি সে ছুরি তাঁর বুকে বিঁধিয়ে দিতে পারতে না! তোমার ভেতর থেকে কেউ একজন বলে উঠতো ‘না’। আমার নিজের বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। কোন নির্বোধের ওপর রাগ করে আমি বলি, ‘ব্যাটাকে লাথি মারতে পারলে ভালো হতো।’ কিন্তু পরিবর্তে আমি লাথি মারি টেবিলের গায়ে। বলি, ‘এই টেবিলটা, এটা একটা বোকা গর্দভ, তাই এটাকে লাখি মারছি।’ আর তারপর, যদি পায়ের আঙুলে খুব একটা ব্যথা না পেয়ে থাকি, তাহলে আমার মেজাজ অনেক ভালো হয়, আর সাধারণত টেবিলেরও কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু সেই নির্বোধ গর্দভ যদি সত্যি সত্যিই আমার সামনে থাকতো তাহলে আমি তাকে লাথি মারতে পারতাম না। মোমের পুতুল বানানো, তাতে আলপিন ফোটানো, এসব বোকার মতো ছেলেমানুষী কাজ, ঠিক কথা—কিন্তু এর উপকারী দিকটাও একটা আছে। তোমার মনে সমস্ত ঘৃণা এখন চলে গেছে সেই ছোট্ট পুতুলের ভেতর। আর আলপিন ও আগুন দিয়ে তুমি ধ্বংস করেছো—সৎমাকে নয়—বরং তাঁর প্রতি তোমার মনের ঘৃণাকে। পরে, তাঁর মৃত্যুসংবাদ শোনার আগেই, তুমি নিজেকে শুদ্ধ মনে করেছো, করোনি—তোমার মনের ভাব অনেক হালকা হয়ে গেছে—তুমি হয়েছো অনেক সুখী?’

লিন্ডা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

ও বললো, ‘আপনি কি করে জানলেন? সত্যিই আমার সেরকম মনে হয়েছিলো।’

পোয়ারো বললেন, ‘সুতরাং ভবিষ্যতে এরকম বোকামি আর করো না। এর পরে সৎমাকে যাতে ভালোবাসতে পারো তার জন্য এখন থেকে মনকে তৈরি করে নাও।’

লিন্ডা চমকে উঠে বললো, ‘আপনার কি মনে হয় আমার ভাগ্যে আবার একটা সৎমা জুটছে? ও, বুঝেছি, আপনি রোজামণ্ডের কথা বলছেন। ওকে আমার ভালো লাগে।’ এক মিনিট ইতস্তত করলো ও, ‘ওর যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা আছে।’

পোয়ারো নিজে হয়তো ঠিক এই বিশেষণটা রোজমণ্ড ডার্নলির জন্য বেছে নিতেন না, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন লিন্ডার কাছে এই বিশেষণ চূড়ান্ত প্রশংসার।

৩

কেনেথ মার্শাল বললেন, রোজামণ্ড, তোমার মাথায় কি এই উদ্ভট চিন্তা ঢুকেছিলো যে আর্লেনাকে আমি খুন করেছি।’

রোজামণ্ডের মুখ লাজুক হলো। ও বললো, ‘আমার মতো বোকা আর কেউ নেই।’

‘সে আর বলতে।’

‘মানলাম, কিন্তু কেন, তুমি নিজেকে ঝিনুকের মতো এমন গুটিয়ে রাখো যে আমি কখনও জানতেই পারলাম না আর্লেনার সম্পর্কে সত্যিসত্যি তোমার কি ধারণা। কখনও বুঝিনি, তুমি ওকে সব জেনেশুনে মেনে নিয়ে ওর সঙ্গে অস্বাভাবিক ভালো ব্যবহার করতে নাকি—নাকি, ওকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে। আর আমি ভেবেছি যদি শেষেরেটা হয়, আর তুমি যদি হঠাৎ জানতে পারো ও তোমাকে ঠকাচ্ছে, তাহলে তুমি হয়তো রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে। তোমার নামে অনেক গল্প আমার কানে এসেছে। তুমি সব সময়ই ভীষণ শান্ত থাকো, কিন্তু সময়ে সময়ে তোমাকে দেখলে ভয় হয়।’

‘আর তাই তুমি ভেবেছো আমি সোজা গিয়ে ওকে গলা টিপে খুন করেছি?’

‘হ্যাঁ, মানে—সত্যিই আমি তাই ভেবেছিলাম। আর তোমার অ্যালিবাইটাও কেমন যেন হালকা ঠেকছিলো। তখনই তো আমি ঠিক করলাম, তোমাকে সাহায্য করবো। তাই তোমাকে তোমার ঘরে টাইপ করতে দেখেছি বলে বোকার মতো একটা গল্প ফেঁদে বসলাম। আর পরে যখন শুনলাম তুমি বলেছো যে তুমি আমাকে দরজায় উঁকি মারতে দেখেছো—তখন, ইয়ে, মানে...আমি ধরেই নিলাম আমার সন্দেহ পুরোপুরি সত্যি। এছাড়া রয়েছে লিন্ডার অদ্ভুত ব্যবহার।’

কেনেথ মার্শাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘বুঝতে পারছো না, সেকথা আমি তোমার গল্পকে সমর্থন করবার জন্যেই বলেছিলাম। আমি—আমি ভেবেছিলাম, তুমি চাও যে তোমার গল্পটাও আমি সমর্থন করি।’

রোজামন্ড অপলকে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো।

‘তার মানে তুমি ভেবেছো তোমার বউকে আমি খুন করেছি?’

কেনেথ মার্শাল অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসলেন। অস্পষ্ট স্বরে তিনি বললেন, ‘কেন, রোজামণ্ড, তোমার মনে নেই, একটা কুকুরের জন্যে কিভাবে তুমি সেই ছেলেটাকে প্রায় খুন করে বসেছিলো? কিভাবে তুমি ওর গলা টিপে ধরেছিলে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলো না।’

‘কিন্তু সে তো বহু বছর আগের কথা।’

‘হ্যাঁ, জানি—’

রোজামণ্ড তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো, ‘আর্লেনাকে খুন করার পেছনে আমার কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে?’

কেনেথ মার্শাল চোখ সরিয়ে নিলেন, অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বললেন।

রোজমণ্ডের স্বর পর্দায় উঠলো, ‘কেন, সত্যি বুদ্ধির ঢেঁকি? তুমি ভেবেছো তোমার সুখের জন্যে আমি ওকে খুন করেছি, হ্যাঁ? নাকি—নাকি ভেবেছো আমি তোমাকে চাই বলে আমার পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছি?’

‘না, মোটেও তা ভাবিনি।’ ঘৃণা ও ক্রোধের সুরে বললেন, কেনেথ মার্শাল, ‘কিন্তু সেদিন তুমি কি বলেছিলে, আশা করি তোমার মনে আছে—লিন্ডার সম্পর্কে, আমাদের সম্পর্কে—আর—আর তখন তোমাকে আমার অবস্থার জন্য যথেষ্ট চিন্তিত মনে হয়েছিলো।’

রোজামণ্ড বললো, ‘সে নিয়ে সব সময়েই আমি চিন্তা করেছি।’

‘আমি তো তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। জানো, রোজামণ্ড আমি সাধারণত এটা ওটা নিয়ে বেশি কথা বলতে পারি না, ভালো করে কথা বলা আমার আসে না। কিন্তু একটা কথা আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই। আর্লেনাকে আমি নিজের করে কখনও ভাবিনি—শুধু প্রথম দিকে ওকে একটু ভালোবেসেছিলাম—এছাড়া ওকে নিয়ে দিনের পর দিন কাটানো—সে যে কি দুঃসহ কষ্ট। সত্যি কথা বলতে কি, এ যেন সুদীর্ঘ এক নরকবাস। কিন্তু ওর জন্যে আমার ভীষণ দুঃখ হতো। ও এত সরল আর বোকা ছিলো—পুরুষ দেখলে পাগল হয়ে যেতো—নিজেকে সামলে রাখতে পারতো না, আর পুরুষেরা সব সময়েই ওকে ঠকাতে এবং ওর সঙ্গে বাজে ব্যবহার করতো। আমার শুধু মনে হতো, আর যাই করি, ওকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে

দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ওকে বিয়ে করেছি, সুতরাং যথাসম্ভব ভালোভাবে ওর দেখাশোনা করা আমার কর্তব্য : আমার ধারণা, ও সেটা জানাতো, আর সে জন্যে আমার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ ছিলো। ওকে-ওকে দেখে আমার করুণার পাত্র বলে মনে হতো।'

রোজামণ্ড শান্তস্বরে বললো, 'জানি কেন। এখন আমি সব বুঝতে পারছি।'

ওর দিকে না তাকিয়ে কেনেথ মার্শাল সযত্নে পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'তুমি—তুমি চট করে সব কিছু বুঝতে পারো, রোজামণ্ড।'

একটা হালকা হাসির ঢেউ তুললো রোজামণ্ডের শ্লেষভরা ঠোঁটের রেখায়। ও বললো, 'তুমি কি এখনই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, কেন, নাকি ছ'মাস অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করেছো?'

কেনেথ মার্শাল পাইপ খসে পড়লো ঠোঁট থেকে, নিচের পাথরে পড়ে চুরমার হয়ে গেলো।

তিনি বললেন, 'যাঃ, এখানে এসে এ নিয়ে আমার দু-দুটো পাইপ গেলো। সঙ্গে আর পাইপও নেই। কিন্তু তুমি কি করে জানলে যে অপেক্ষা করার পক্ষে ছ'মাসই মোটামুটি ঠিক সময় বলে আমি ভেবে রেখেছি?'

'কারণ সত্যিই সেটা ঠিক সময়। কিন্তু দয়া করে এখনই আমাকে স্পষ্ট কথা দাও। নয়তো আগামী ছ'মাসের মধ্যে তুমি হয়তো আবার কোন নির্যাতিত অসহায় মেয়ের দেখা পাবে আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করতে বীরের মতো ছুটে যাবে।'

তিনি সশব্দে হাসলেন।

'এবারে সেই নির্যাতিত অসহায় মেয়ে তুমি, রোজামণ্ড। তবে তোমার ওই হতচ্ছাড়া পোশাক তৈরির ব্যবসা তোমাকে ছাড়তে হবে, তারপর আমরা চলে যাবো গ্রামে, সেখানেই থাকবো।'

'তুমি কি জানো না, ওই সব ব্যবসা থেকে আমার অনেক আয় হয়? বুঝতে পারছো না, ওটা আমার নিজস্ব—ব্যবসা, আমিই ওটা সৃষ্টি করেছি, নিজের হাতে গড়ে তুলেছি, আর তার জন্যে আমার যথেষ্ট গর্ব আছে। আর তোমার এত সাহস, হঠাৎ এসে হুট করে বসলে, 'ওসব ছেড়ে দাও, সোনা।'

হ্যাঁ, আমার এতই সাহস।'

'আর তোমার বিশ্বাস তোমার জন্যে একথায় আমি রাজী হয়ে যাবো?'

'যদি রাজী না হও', বললেন, কেনেথ মার্শাল, 'তাহলে তুমি আমার কোন উপকারেই আসবে না।'

রোজামণ্ড অস্ফুট স্বরে বললো, 'ওঃ কেন সোনা, তোমাকে নিয়ে আমি সারাটা জীবন আমি শুধু গ্রামে কাটাতে চেয়েছি। এখন আমার সে স্বপ্ন সত্যি হবে...।'

